বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির বৈপ্লবিক চিন্তা ও চেতনার বিকাশধারা (১৮৫৮-১৯৪৭)

The Developmental Trends of Revolutionary Thought and Ideas of the Bengali Middle Class (1858-1947)

একটি পিএইচডি অভিসন্দর্ভ

গবেষক

শরিফুল ইসলাম ভূঁইয়া

শিক্ষাবর্ষ: ২০২৩-২০২৪

রেজিস্ট্রেশন : ৩৯/২০২৩-২০২৪ (পুন:)

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

তত্ত্বাবধায়ক

ড. আবদুল বাছির

অধ্যাপক

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

মে-২০২৬

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির বৈপ্লবিক চিন্তা ও চেতনার বিকাশধারা (১৮৫৮-১৯৪৭)

The Developmental Trends of Revolutionary Thought and Ideas of the Bengali Middle Class (1858-1947)

একটি পিএইচডি অভিসন্দর্ভ

গবেষক

শরিফুল ইসলাম ভূঁইয়া

শিক্ষাবর্ষ: ২০২৩-২০২৪

রেজিস্ট্রেশন : ৩৯/২০২৩-২০২৪ (পুন:)

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

তত্ত্বাবধায়ক

ড. আবদুল বাছির

অধ্যাপক

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

মে-২০২৬

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির বৈপ্লবিক চিন্তা ও চেতনার বিকাশধারা (১৮৫৮-১৯৪৭)

The Developmental Trends of Revolutionary Thought and Ideas of the Bengali Middle Class (1858-1947)

শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত

শরিফুল ইসলাম ভূঁইয়া

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

মে-২০২৬

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র		পৃষ্ঠা নং
তত্ত্বাবধায়কের প্রত্যয়নপত্র		i
গবেষকের ঘোষণাপত্র		ii
কৃতজ্ঞতা স্বীকার		iii
শব্দ সংক্ষেপ		vi
শব্দ সংকেত		vii
অভিসন্দর্ভের সারসংক্ষেপ		viii
	ভূমিকা	০১
প্রথম অধ্যায়	বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব ও বিকাশধারা	৩০
দ্বিতীয় অধ্যায়	বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির চিন্তা ও চেতনার ক্রমবিকাশ	৮৫
তৃতীয় অধ্যায়	বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির ব্রিটিশ বিরোধিতার স্বরূপ সন্ধান	১৭২
চতুর্থ অধ্যায়	বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণি ও বিপ্লব প্রচেষ্টার ক্রমধারা	২৬৩
পঞ্চম অধ্যায়	বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিপ্লব প্রচেষ্টা ও এর বিচার-বিশ্লেষণ	৪০৭
	উপসংহার	৪২৩
	পরিশিষ্ট (ক)	৪৫২
	পরিশিষ্ট (খ)	৪৬৮

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০
ফোন: ৯৬৬১৯০০-৭৩/৬৩৩০

Department of Islamic History & Culture
University of Dhaka
Dhaka 1000
Phone: 9661900-73/6330
E-mail : ihc@du.ac.bd

নং :.....

তারিখ : .....

০৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩/১৯ মে ২০২৬

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের পিএইচডি গবেষক **শরিফুল ইসলাম ভূঁইয়া** (রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ৩৯ (পুন:), শিক্ষাবর্ষ: ২০২৩-২০২৪) এর পিএইচডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত "বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণির বৈপ্লবিক চিন্তা ও চেতনার বিকাশধারা (১৮৫৮-১৯৪৭)" শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় রচিত। ইহা একটি মৌলিক গবেষণা। এই অভিসন্দর্ভ বা এর অংশ বিশেষ গবেষক অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে বা প্রতিষ্ঠানে কোন ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করেন নি। আমি অভিসন্দর্ভের পাণ্ডুলিপিটি পাঠ করেছি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি ডিগ্রির জন্য দাখিল করার সুপারিশ করছি।

আমি তাঁর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

(অধ্যাপক ড. আবদুল বাছির)'
তত্ত্বাবধায়ক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক
এম.ফিল/পিএইচডি
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

গবেষকের ঘোষণা পত্র

আমি ঘোষণা করছি যে, **"বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির বৈপ্লবিক চিন্তা ও চেতনার বিকাশধারা (১৮৫৮-১৯৪৭)"** শীর্ষক পিএইচডি অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণভাবে আমার একক ও নিজস্ব রচনা। এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি ডিগ্রির জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। এই অভিসন্দর্ভের সম্পূর্ণ কিংবা অংশ বিশেষ কোথাও প্রকাশিত হয়নি এবং তা কোন ডিগ্রি বা ডিপ্লোমার জন্য পেশ করা হয়নি।



শরিফুল ইসলাম ভূঁইয়া
পিএইচডি গবেষক
রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ৩৯/২০২৩-২০২৪ (পুনঃ)
শিক্ষা বর্ষ: ২০২৩-২০২৪
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

মে-২০২৬

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

'বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির বৈপ্লবিক চিন্তা ও চেতনার বিকাশধারা (১৮৫৮-১৯৪৭)' শীর্ষক গবেষণা কর্মটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে আমার দীর্ঘ সময়ের গবেষণার ফসল। এ বিভাগে আমি আমার সম্মানিত শিক্ষক অধ্যাপক ড. আবদুল বাছির এর উৎসাহ এবং তাঁর তত্ত্বাবধানে ২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষে পিএইচডি ডিগ্রির জন্য পূর্ণকালীন গবেষক হিসেবে গবেষণা শুরু করি। বাঙালির বিপ্লববাদ ও বৈপ্লবিক চিন্তা-চেতনার তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ থেকে শুরু করে এর বিশ্লেষণ পর্যন্ত গবেষণার প্রতিটি স্তরেই তিনি আমাকে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। এককথায় তিনি আমাকে অভিসন্দর্ভ রচনার পদ্ধতি হাতে কলমে শিখিয়েছেন। এই অভিসন্দর্ভের প্রতিটি পৃষ্ঠা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংযোজন করেছেন। এমনকি প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত এবং বইপত্র কোথায় পেতে পারি তা জানিয়ে দিয়েছেন। বেশ কয়েকটি দুর্লভ বই তিনি আমাকে সরবরাহ করেছেন। এ সুযোগে আমি অধ্যাপক ড. আবদুল বাছির এর প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

গবেষণার দীর্ঘ পথপরিক্রমায় আমার দিকে অনেকেই সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক সম্মানিত ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গবেষণা কর্মটি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে উৎসাহিত করে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রাক্তন চেয়ারম্যান এবং শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক মো. আতাউর রহমান বিশ্বাসের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। বিভাগের বর্তমান চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত) ও কলা অনুষদের ডিন ড. মো. আবুল কালাম সরকার এর নিকট আমি কৃতজ্ঞ। আমার শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রক্টর অধ্যাপক ড. এ কে এম গোলাম রব্বানী যথাসময়ে গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করায় পরামর্শ ও উৎসাহ দিয়েছেন। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। গবেষণার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমাকে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন বর্তমানে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান। তাঁর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা অসীম। আমার তত্ত্বাবধায়কের পর যে মানুষটির কাছ থেকে সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা পেয়েছি বা নিয়েছি তিনি হলেন বিভাগের অধ্যাপক ড. এ. টি. এম. সামছুজ্জোহা, তাঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতা জানানোর সীমাপরিসীমা নেই। এছাড়াও বিভাগের সকল শিক্ষক বিশেষ করে অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইব্রাহিম, অধ্যাপক ড. মো. আতাউর রহমান মিয়াজী, অধ্যাপক ড. এস. এম. মফিজুর রহমান, অধ্যাপক ড. সুরাইয়া আক্তার, ড. মো. আবদুর রহিম, অধ্যাপক ড. মো. নুরুল আমিন নানা পরামর্শ ও সাহায্য সহযোগিতা করে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ বিশেষ করে জনাব মো. ছরোয়ার হোসেন, মি. মিঠুন দাস ও জনাব সাজেদা সুলতানা আমাকে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন। তাদের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণাকর্মটি সম্পাদনের জন্য প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ব্যবহার করেছি ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ স্মৃতি পাঠাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রিয় গ্রন্থাগার, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি গ্রন্থাগার এবং বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগারের দুর্লভ পত্রিকা শাখা। এসকল গ্রন্থাগারের কর্মচারীরা আমাকে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন। গবেষণাকর্মের প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের জন্য বাংলাদেশ জাতীয় আর্কাইভস এ অনেকবার গিয়েছি। এখানকার গবেষণা কর্মকর্তা মো. ইলিয়াছ মিয়া সহ অন্যান্য কর্মচারীরা আমাকে সহযোগিতা করেছেন। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রিয় গ্রন্থাগার, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ গ্রন্থাগার, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রিয় গ্রন্থাগার, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (কুষ্টিয়া) কেন্দ্রিয় গ্রন্থাগার এবং সরকারি সাঁদত কলেজ কেন্দ্রিয় গ্রন্থাগার (টাঙ্গাইল) থেকেও সহায়তা নিয়েছি। এসকল গ্রন্থাগারের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। রাজশাহীতে বিভিন্ন গ্রন্থাগার ব্যবহারে সহায়তা প্রদান করে আমাকে কৃতজ্ঞ করেছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সম্মানিত শিক্ষক অধ্যাপক ড. মো. জাহাঙ্গীর আলম, অধ্যাপক ড. কাজী মো. মোস্তাফিজুর রহমান, অধ্যাপক ড. মো. ফজলুল হক। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. মাহবুবর রহমানের ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হেরিটেজ আর্কাইভসটি আমাকে একইসাথে মুগ্ধ ও সমৃদ্ধ করেছে। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. আতিয়ার রহমান এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সম্মানিত শিক্ষক অধ্যাপক ড. গোলাম কিবরিয়া ভূইয়া স্যারের বিভিন্ন লেখা পড়ে সমৃদ্ধ হয়েছি। তাদের সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

গবেষণার প্রয়োজনে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করার কাজে বাংলাদেশের বাইরে যে সকল গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছি তার মধ্যে অন্যতম কলকাতা ন্যাশনাল লাইব্রেরি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগার ও কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি গ্রন্থাগার। এসকল গ্রন্থাগার ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমাকে সহযোগিতা করেছেন ভারতের পশ্চিমবঙ্গের গবেষক ও ইতিহাসবিদ সৌমব্রত দাশগুপ্ত ও সৈকত নিয়োগী ও অমিত দেবনাথ। কলকাতার প্রতিটি পাঠাগারের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ আমাকে আন্তরিকভাবে অতি দ্রুততার সাথে তথ্য উপাত্ত ও বই সরবরাহ করে সহযোগিতা করেছেন। আমি তাদেরকে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি। কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির সহকারী গ্রন্থাগারিক ড. সংঘামিত্রা চৌধুরীর সহায়তা আমাকে সমৃদ্ধ করেছে। তাদের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সম্মানিত অধ্যাপক ও আমার শিক্ষাগুরু ড. মো. আনোয়ার হোসেন, অধ্যাপক ড. মো. জাহাঙ্গীর হোসেন, অধ্যাপক ড. মো. শরিফুল ইসলাম, অধ্যাপক ড. ত. ম.

Dhaka University Institutional Repository

লোকমান হাকিম, অধ্যাপক ড. মো. মহিব্বুল ইসলাম, অধ্যাপক ড. মো. এমতাজ হোসেন, অধ্যাপক ড. রুহুল কুদ্দুস মো. সালেহ বিভিন্ন পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা প্রদান করে গবেষণা কর্মে আমাকে উৎসাহিত করেছেন। তাঁদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

অন্য যাঁদের সুচিন্তিত পরামর্শ ও সহযোগিতা আমার গবেষণাকে সমৃদ্ধ করেছে তাদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. হাসনা বেগম, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের শিক্ষক অধ্যাপক ড. এ এম মাসুদুজ্জামান, ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. মেজবাহ কামাল এবং অধ্যাপক ড. আকসাদুল আলমের নাম আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. এ কে এম শাহনেওয়াজ, ইতিহাস বিভাগের প্রাক্তন চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. এমরান জাহান আমাকে দিক নির্দেশনা দিয়ে ঋণী করেছেন।

আমি আমার শ্রদ্ধেয় পিতা **মো. জহির উদ্দিন ভূঁইয়া (রাহিমাহুল্লাহ)** এবং শ্রদ্ধেয়া মাতা **মোসাম্মৎ মোমেনা খাতুন (রাহিমাহাল্লাহ)** এর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই। তাদের দোয়া, ত্যাগ ও শিক্ষাই আমাকে আজকের এই অবস্থানে আসতে সাহায্য করেছে। মহান আল্লাহ সুবহানাহুওয়াতায়ালা তাঁদের কবরকে জান্নাতের বাগান বানিয়ে দিন (আমিন)।

আমার গবেষণার গবেষণার মূল প্রেরণা আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মো. মাহিদুল ইসলাম, সহকারী কমিশনার (অব.) এবং ভাবী ডা. ফাতেমা আক্তার। তাঁদের অনুপ্রেরণা, সহযোগিতা এবং বিশ্বাসই আমাকে এই দীর্ঘ পথে এগিয়ে নিয়ে গেছে।

সবশেষে ধন্যবাদ জানাই বরিশালের সাংবাদিক জনাব মো. আনিছুর রহমান স্বপন, আজিজ সুবপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা সন্ধিপাঠ -এর সত্ত্বাধিকারী শ্রী জয়ন্ত দাশ সহ আমার সহকর্মী ও বন্ধুমহল ও আমার স্ত্রীর প্রতি, যাঁরা আলোচনা, তথ্য সংগ্রহ ও মানসিক সাপোর্ট দিয়ে পাশে থেকেছেন। কোনো ভুলত্রুটি থাকলে তার দায় সম্পূর্ণ আমার।

শরিফুল ইসলাম ভূঁইয়া

মে-২০২৬

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ সংক্ষেপ

ABG : Aurobindo Ghosh.
AICC : All India Congress Committee.
AIML : All India Muslim league.
AITUC : All India Trade Union Congress.
ANP : Anushilan Samiti.
BMC : Bengali Middle Class.
CDM : Civil Disobedience Movement.
EIC : East India Company.
Ghadar : Ghadar Party.
HB : History of Bengal.
HSRA : Hindustan Socialist Republican Association.
KPP : Krishak Praja Party.
NCM : Non-Cooperation Movement.
IHQ : Indian Historical Quarterly.
INA : Indian National Army.
INC : Indian National Congress.
JAS : Journal of the Asiatic society.
JARS : Journal of the Royal Asiatic society.
JASB : Journal of the Asiatic society of Bengal.
JASP : Journal of the Asiatic society of Pakistan.
JPHS : Journal of the Pakistan Historical society.
JMN : Jugantar Party.
QIM : Quit India Movement.
Rin : Royal Indian Navy.
SW : Swadeshi Movement.
WBSA : West Bengal State Archives.

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ সংকেত

অনু. : অনুবাদ
সম্পা. : সম্পাদক
খ্রি. : খ্রিস্টাব্দ
দ্র. : দ্রষ্টব্য
পৃ. : পৃষ্ঠা
প্রা. : প্রাইভেট
লি. : লিমিটেড
সং. : সংকলন/সংস্করণ
প্রাগুক্ত : পূর্বে উল্লিখিত
Co. : Company.
ed. : Edited by.
ff. : Following.
Fn. : Footnote.
Ltd. : Limited.
op.cit. : Opera citato (in the same work)=প্রাগুক্ত
p. : Page.
pp. : Pages.
Pvt. : Private.
Trans. : Translated by.

Dhaka University Institutional Repository

অভিসন্দর্ভের সারসংক্ষেপ (Abstract)

গবেষণার শিরোনাম : বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির বৈপ্লবিক চিন্তা ও চেতনার বিকাশধারা (১৮৫৮-১৯৪৭)

The Developmental Trends of Revolutionary Thought and Ideas of the Bengali Middle Class (1858-1947)

পিএইচডি গবেষক
শরিফুল ইসলাম ভূঁইয়া
শিক্ষাবর্ষ: ২০২৩-২০২৪
রেজিস্ট্রেশন : ৩৯/২০২৩-২০২৪ (পুনঃ)

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

শিরোনাম: বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির বৈপ্লবিক চিন্তা ও চেতনার বিকাশধারা(১৮৫৭-১৯৪৭)

স্বাধীনতার অদম্য আকাঙ্ক্ষা বাঙালির স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। বাঙালি যখনই সুযোগ পেয়েছে তখনই আধিপত্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধাচারণ করেছে। ১৭৫৭ খ্রি. ২৩ জুন পলাশীর প্রান্তরের যুগান্তকারী ঘটনার ফলে বাংলা স্বাধীনতা হারায়। কিন্তু এই পরাধীনতা বাঙালি সহজে মেনে নেয়নি। ব্রিটিশ শাসন-শোষণ বিরোধী ফকির-সন্নাসী বিদ্রোহ ও জমিদার-মহাজন বিরোধী সকল আন্দোলন-সংগ্রামে বাংলার এক ধারাবাহিক বিপ্লবী তৎপরতা লক্ষ্যণীয়। বাঙালির এই বৈপ্লবিক কার্যক্রম পরবর্তীতে সমগ্র ভারতব্যাপী পরিব্যাপ্ত হয়।

শোষণ-নির্যাতনের প্রভাব পড়ে জনগণের সর্বস্তরে। এতে দুইটি পথ খোলা থাকে;একটি নির্বিবাদে মেনে নেওয়া অন্যটি বিদ্রোহ। আঠারো শতকের মধ্যভাগ থেকে উনিশ শতকের শুরু অবধি ব্রিটিশ আধিপত্য স্থাপনের সূচনা থেকেই ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে উঠে। কৃষক, শ্রমিক ও কারিগর শ্রেণির জীবন বিপর্যস্ত হওয়ায় তারাই প্রথম বিদ্রোহের আগুন প্রজ্বলিত করে। আঠারো শতকের শেষার্ধ থেকে সমগ্র উনিশ শতক এবং বিশ শতকের শুরু পর্যন্ত ব্রিটিশ শাসননীতি ও ভূমি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অসংখ্য কৃষক ও আদিবাসী সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটে। এসকল অভ্যুত্থানে বাঙালি, আদিবাসী, অনাদিবাসী ও অন্যান্য নিম্নবর্গের শ্রমজীবী মানুষের অংশগ্রহণ লক্ষ্যণীয়।

এসকল বিদ্রোহ ও আন্দোলনের পৃথক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তাদের মধ্য থেকেই নেতার আবির্ভাব ঘটে এবং তাঁরাই নেতৃত্ব দেন। কিন্তু ১৮৫৯-১৮৬০ খ্রি. নীল বিদ্রোহে খানিকটা ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের একাংশ এগিয়ে এলেন তাদের সমর্থনে। তন্মধ্যে সাংবাদিক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও চা কুলিদের ওপর দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়ের অগ্নিঝড়া লেখনি হিন্দু পেট্রিয়ট-এ ও সঞ্জীবনী পত্রিকাতে নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে। তাঁদের এ ভূমিকা শিক্ষিত সমাজের বৃহৎ অংশে জাগ্রত করেছে ইংরেজ বিরোধী চেতনা। একই ধারায় মহারাষ্ট্রের কেশরী ও মাদ্রাজের হিন্দু পত্রিকার বৈপ্লবিক ভূমিকাও স্মরণযোগ্য। বাংলার পঞ্চাশ লক্ষ কৃষক এ নীল বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করে। সংগ্রামী কৃষক ও বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের মিলিত প্রয়াসের ফলে নীল বিদ্রোহ বাংলায় জাতীয় সংগ্রামের রূপধারণ করে। এধরণের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ইতোপূর্বে বাংলায় আর কখনো ঘটেনি।

১৭৯৩ খ্রি. চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কারণে যে নতুন জমিদার এবং কোম্পানির এদেশীয় মুন্সি, বাণিয়া ও দালাল শ্রেণির উদ্ভব ঘটে, তারা প্রায় সকলেই ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়ভূক্ত। এ অবস্থায় ইংরেজরা একটি শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্তশ্রেণি গড়ে তুলতে তৎপরতা চালায়। বাংলায় মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব সমাজের ক্রমবির্তনের ফল। ১৭৫৭-১৮৫৭ খ্রি. মধ্যে বাংলায় ব্রিটিশ প্রশাসন কতগুলো পদক্ষেপগ্রহণ করে। এগুলোর মধ্যে ভূমিব্যবস্থার নতুন বিন্যাস, ব্যবসায়-বাণিজ্যে পুজিবাদী চেতনার বিকাশ, ইংরেজি শিক্ষার বিস্তার, আইন-আদালত স্থাপন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এসকল পদক্ষেপের ফলেই বাংলায় মধ্যবিত্তশ্রেণির উদ্ভব অনিবার্য হয়ে ওঠে। ইংরেজ সরকারের নীতির কারণে প্রধানত চারশ্রেণির মধ্যবিত্তের বিকাশ ঘটে, যেমন; (ক) ব্যবসায় নির্ভর, (খ) শিল্প নির্ভর (গ) ভূমি নির্ভর ও (ঘ) শিক্ষা নির্ভর মধ্যবিত্ত। তবে এই শ্রেণিরগুলোর মধ্য আমাদের আলোচনায় প্রাধান্য পাবে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি। সাধারণত ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত এবং তাদেরই সৃষ্ট স্বীকৃত পেশা সমূহে নিয়োজিত সম্প্রদায়কে ইঙ্গিত করে। তারা মানসিক গঠন,

Dhaka University Institutional Repository

নৈতিকতা, মূল্যবোধ, জীবন দর্শন ও জাতীয়তাবোধে অন্যান্য মধ্যবিত্তশ্রেণি থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্টের অধিকারী হয়। কলকাতাকে কেন্দ্র করেই মধ্যবিত্তশ্রেণি বিকশিত হয়।

উনিশ শতকের শুরুতে পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংস্পর্শে মধ্যবিত্ত শ্রেণির মনে সামাজিক ন্যায়বিচার ও রাজনৈতিক অধিকার সম্বন্ধে নতুন ধ্যান-ধারণার উদ্ভব ঘটে যাকে বঙ্গীয় নবজাগরণ নামে অভিহিত করা হয়। বঙ্গীয় এ নবজাগরণের ক্ষেত্রে বিপরীতমূখী দু'টি ভিন্নধারার আদর্শের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। একটি পাশ্চাত্য প্রভাব অপরটি প্রাচ্যচিন্তার প্রভাব। পাশ্চাত্যধারার স্রষ্টা ছিলেন রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) এবং প্রাচ্যচিন্তার প্রভাব লক্ষ্য করা যায় রাধাকান্ত দেবের (১৭৮৪-১৮৬৭) আদর্শে। উনিশ শতকের পুনর্জাগরণ আন্দোলন যেমন তাঁর নেতৃত্বে অন্তর্মুখী প্রবণতা লাভ করেছিল তেমন রাজা রামমোহন রায়ের নেতৃত্বে যে আদর্শের বিস্তার ঘটে তা ছিল বহির্মুখী। এই আদর্শের নেতৃত্বের প্রকৃতিকে আবার দুই ভাবে বিশ্লেষণ করা যায়। রাজা রামমোহন রায়ের নেতৃত্ব ছিল উদারনীতি ও নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের ধারা এবং আপসকামিতা। অপরদিকে তাঁর উত্তরসূরী ইয়ংবেঙ্গল আন্দোলনের স্রষ্টা হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯-১৮৩১) এবং তাঁর অনুসারীগণ উগ্র, উদ্দাম ও আপসহীন নেতৃত্ব দানের এক অনন্য নজীর প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়াও বঙ্গীয় নবজাগরণে রাজা রামমোহন রায় থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) পর্যন্ত কয়েকজন যশস্বী মনীষীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অনস্বীকার্য। সর্বোপরি ভারতের পরাধীন অবস্থা এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির বৈপ্লবিক চিন্তা ও চেতনা বিকাশের দু'টি মূল উৎস অনুমিত হয়।

বঙ্গীয় নবজাগরণ উদ্ভুত বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণির প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল কৃষকের বৈপ্লবিক সংগ্রাম সম্বন্ধে বিরূপ মনোভাব প্রদর্শন এবং ইংরেজ শাসনের সাথে আপসের নীতিগ্রহণ। এই নীতিই রাজা রামমোহন রায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখকে ইংরেজ শাসকের মহিমা কীর্তন এবং সর্বদা তাদের দিকে আপসের নীতি প্রসারিত করে। ফলশ্রুতিতে বঙ্গীয় নবজাগরণের নায়কগণ প্রায় সকল কৃষক বিদ্রোহ এমনকি ১৮৫৭ খ্রি. সিপাহী বিদ্রোহ তথা ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রতিও তারা কোনো প্রকার সমর্থন জানায়নি। বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির এই আপসকামী মনোভাব তাদের সামাজিক দায়িত্ববোধ ও রাজনৈতিক চেতনার ইতিহাসকে অন্ধকারাছন্ন করে রেখেছে। এতোসব সমালোচনা সত্ত্বেও একেশ্বরবাদী ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তন, ইউরোপীয় সমাজের অনুকরণে কুসংস্কারাচ্ছন্ন বঙ্গীয় সমাজের সংস্কার সাধন এবং ইউরোপীয় সাহিত্য হতে নতুন সৃষ্টির প্রেরণালাভের মাধ্যমে বাঙালি প্রগতিশীলতার পথে অগ্রসর হয় যা বঙ্গীয় নবজাগরণের ইতিবাচক দিক প্রতিভাত হয়। তাছাড়া 'এই নবজাগরণের প্রভাবে তারা ইউরোপীয় সাহিত্য হতে ইংল্যান্ডের দীর্ঘকালের গণতান্ত্রিক আন্দোলন বিশেষত ১৬৪৮ খ্রি. বৈপ্লবিক ঐতিহ্য; এবং মিল্টন, শেলী ও বায়রনের রচনাবলি হতে শোষক-উৎপীড়কের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রেরণা পায়। এপথেই যুগান্তকারী ১৭৮৯ খ্রি. ফরাসি বিপ্লবের সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার আদর্শের সাথে বঙ্গীয় নবজাগরণের নায়কদের পরিচয় ঘটে। এসকল নায়কেরা ছিলেন ইউরোপীয় রেনেসাঁস ও ফরাসি বিপ্লবোদ্ভূত মানবতাবাদী মন্ত্রে দীক্ষিত।

১৮৫৭ খ্রি. মহাবিদ্রোহের সময় শাসকগোষ্ঠী উপলব্ধি করেছিল, ভারতের গণশক্তির ক্রমবর্ধমান বৈপ্লবিক সংগ্রাম সামরিক শক্তির দ্বারা সাময়িকভাবে পরাজিত করা সম্ভব হলেও এই শক্তিকে চিরতরে পদানত করে রাখা একাকী বৈদেশিক শাসকগোষ্ঠীর সাধ্যাতীত। এজন্য ভারতের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলোর সর্বাঙ্গীন সহযোগিতা অপরিহার্য। সুতরাং

Dhaka University Institutional Repository

মহাবিদ্রোহের পরেই ব্রিটিশ শাসকবর্গ সামন্ত রাজন্যবর্গ ও জমিদারগোষ্ঠীর সাথে বন্ধুত্ব ও ঐক্য গড়ে তোলার প্রয়াস পায়। একই সাথে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ নিজেদের প্রয়োজনে যে সামান্য সংস্কারকার্য আরম্ভ করেছিল এসময় তা পরিত্যাগ করে তৎপরিবর্তে সকল প্রকারের সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কার সুরক্ষা নীতিগ্রহণ করে। মহারানী ভিক্টোরিয়ার ১৮৫৮ খ্রি. ঘোষণায় 'ভারতীয়দের ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকার দৃঢ় সংকল্প ঘোষিত হয় এবং ভারতীয় সমাজের রক্ষণশীল সম্প্রদায়গুলোকে এইমর্মে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় যে, ভারতবর্ষের প্রাচীন ঐতিহ্য, প্রাচীন প্রথা ও অধিকার সর্বপ্রযত্নে সুরক্ষিত করা হবে। কিন্তু উনিশ শতকের শেষার্ধে ক্রমবর্ধমান কৃষি-সঙ্কট, ব্রিটিশ শোষণের মাত্রাবৃদ্ধি এবং শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ক্রমবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির মনোজগৎ ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হতে থাকে। তারা দেখে শাসন বিভাগের উচ্চ পদগুলো কেবলমাত্র ইংরেজদের জন্য সীমাবদ্ধ। ইংরেজ শাসনবিরোধী মনোবৃত্তি তখন থেকেই জেগে উঠে। তাদের একটি বৃহৎঅংশ আইন (Law) বিষয়ে ডিগ্রি লাভ করে কিন্তু খুব দ্রুতই যুবক উকিলের সংখ্যা মোট মামলা মোকদ্দমার সংখ্যা ছাড়িয়ে যায়। শাসকগোষ্ঠীর মুখপাত্র ভেরিনি লোভেট (Verney Lovett) বলেন, ভারতবর্ষে বিশেষত বাংলায় বহু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলেও সেগুলোতে শিক্ষক সংখ্যা অত্যধিক। তাঁদের বেতনও সামান্য। উনিশ শতকের শেষদিকে এই শিক্ষিত বেকার সম্প্রদায়ের দুর্দশা চরম আকার ধারণ করে। এছাড়াও মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে নানাপ্রকার অসন্তোষ ক্রমশ ঘনীভূত হয়ে উঠছিল। তারা ক্রমেই নিজেদের দাবি-দাওয়ার প্রতি সচেতন হয়ে উঠতে থাকে। এই সচেতনতা থেকে জন্ম নেয় পরাধীনতার বেদনা, জাতীয় চেতনা, আত্মসম্মানবোধ এবং স্বজাত্যগরিমা। ইংরেজ-সৃষ্ট বাঙালি মধ্যবিশ্রেণির অসন্তোষ ও বিক্ষোভের মধ্যেই জাগ্রত হয়েছে স্বাধীনতার স্পৃহা ও স্বাদেশিকতার অনুভূতি। এহেন অনুভূতির বশবর্তী হয়ে ১৯২১ খ্রি. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে এমএ শ্রেণিতে ভর্তি হন লীলাবতী নাগ (১৯০০-১৯৭০)। পরবর্তীতে ঢাকার বিপ্লবী সংগঠন 'শ্রী সংঘের' প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা অনিলচন্দ্র রায়ের (১৯০১-১৯৫২) সঙ্গে পরিণয় সূত্রে তিনি লীলা রায় নামে পরিচিত হন। ১৯৩০ খ্রি. লবণ সত্যাগ্রহের সময় তিনি 'ঢাকা মহিলা সত্যাগ্রহ সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেন। অনিলচন্দ্র রায়ের গ্রেফতারের পর তিনি 'শ্রী সংঘ' পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৩১ থেকে ১৯৩৭ খ্রি. পর্যন্ত তিনি ব্রিটিশ কারাগারে ছিলেন। ১৯৪০ খ্রি. হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ আন্দোলনের দায়ে লীলা রায় ও অনিলচন্দ্র রায় আবারও কারাবন্দী হন। বিপ্লবী লীলা রায় মুক্তিপেয়ে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর নির্দেশে 'ফরওয়ার্ড ব্লক' সাপ্তাহিকের সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন।

১৮৫৭ খ্রি. সিপাহী বিদ্রোহ তথা প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলন দমিত হওয়ার পরবর্তী সময়ে মুসলমান সম্প্রদায় গভীর হতাশায় নিমজ্জিত হয়। দীর্ঘকাল ব্রিটিশ শাসনের বিরোধিতা ও ইংরেজি শিক্ষার সুযোগগ্রহণ না করায় হিন্দু সম্প্রদায়ের তুলনায় তারা অনেকটা পিছিয়ে থাকে। এহেন অবস্থায় স্যার সৈয়দ আহমদ খান (১৮১৭-১৮৯৮), নবাব আবদুল লতিফ (১৮২৮-১৮৯৩), সৈয়দ আমীর আলী (১৮৪৯-১৯২৮) প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ মুসলিম সম্প্রদায়কে জাগ্রত করার উদ্যোগ গ্রহণ করায় একটু দেরিতে হলেও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যেও মধ্যবিত্ত শ্রেণির আবির্ভাব ঘটে। এ শ্রেণি ব্রিটিশ শাসনের প্রতি অনুগত থেকে মুসলিম সমাজের উন্নতি সাধনের নীতিগ্রহণ করে। ১৮৫৭ খ্রি. মহাবিদ্রোহ দমিত হওয়ার পরবর্তী সময়ে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির যুবকদের মধ্যে প্রথমে রাজনারায়ণ বসুর (১৮২৬-১৮৯৯) মনে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে দেশের মুক্তি অর্জনের চিন্তার উন্মেষ ঘটে এবং তিনি বাংলায় বৈপ্লবিক চিন্তার অনুকূল পটভূমি তৈরি করেন। ১৮৭৪ খ্রি. যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত 'আর্যদর্শন' বাংলা মাসিকপত্রে প্রকাশিত রচনাসমূহ বাংলার যুবকদের বৈপ্লবিক চিন্তায়

Dhaka University Institutional Repository

উদ্দীপ্ত করে। মাৎসিনি ও ইতালির স্বদেশ প্রেমিকদের নিকট থেকে তাঁরা ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন ভারতের চিন্তায় অনুপ্রাণিত হন। ১৮৭৫ খ্রি. কলকাতায় ও ১৮৭৬ খ্রি. মহারাষ্ট্রে বিপ্লবী গুপ্ত সমিতি গঠিত হয়।

এদিকে ইংরেজ গোয়েন্দাদপ্তর এক গোপন প্রতিবেদনে জানায়, মাতৃভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলো ভারতে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে চরমশত্রুতা করছে। ১৮৭৮ খ্রি. বড়লাট লর্ড লিটন মাতৃভাষায় প্রকাশিত সকল সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করার উদ্দেশে 'ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট' নামে এক দমনমূলক আইন পাস করেন। ১৮৭৬ খ্রি. কলকাতায় গড়ে ওঠা জাতীয়তাবাদী সংগঠন 'ভারতসভা' সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধকারী 'ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট'র বিরুদ্ধে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৪৮-১৯২৫) নেতৃত্বে ১৮৭৮খ্রি. ১৬ এপ্রিল ভারতব্যাপি প্রতিবাদ দিবস পালন করে। এভাবে ইংরেজদের দমননীতি, বাঙালির জাতীয় চেতনাকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করার পরিবর্তে ভারতব্যাপি জাতীয়তাবাদী চেতনাবোধ জাগ্রত করে। ১৮৮৩ খ্রি. ০৯ ফ্রেব্রুয়ারি প্রবর্তিত ইলবার্ট বিলকে কেন্দ্র করে এই ঘাত-প্রতিঘাত তীব্রতর হয়ে ওঠে।

ইংরেজ-শাসন ও দমননীতির বিরূদ্ধে বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণির দেশব্যাপী প্রতিবাদের সূচনায় অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজ অফিসার অ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম চিন্তিত হন। তারই উদ্যোগে ১৮৮৫ খ্রি. বোম্বাই শহরে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে সংগঠনটি ইংরেজ সরকারের নিকট আবেদন নিবেদনের মাধ্যমে বিভিন্ন দাবি-দাওয়া আদায়ের নীতিগ্রহণ করে। কিন্তু এহেন আবেদন নিবেদন নীতির সমালোচনা করে ১৮৯৭ খ্রি. বরিশালের অশ্বিনীকুমার দত্ত (১৮৫৬-১৯২৩) কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনকে তিন দিনের তামাশা বলে মন্তব্য করেন। এ মন্তব্যের মাধ্যমে কংগ্রেসের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী একটি ধারার প্রথম উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

বাংলার ক্রমবর্ধমান জাতীয় চেতনা ব্রিটিশ সরকারকে উদ্বিগ্ন করে তোলে। এহেন আন্দোলন দমন ও প্রশাসনিক সুবিধার্থে লর্ড কার্জন ১৯০৫ খ্রি. *বাংলা ভাগ* (Partition of Bengal) করে পূর্ববাংলা ও আসাম নামে নতুন একটি প্রদেশ গঠন করেন। এই বাংলা ভাগের বিরুদ্ধে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস তথা বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির নেতৃবৃন্দ তীব্র গণআন্দোলন গড়ে তোলেন যা *বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন* (Anti-Partition movement of Bengal) নামে পরিচিতি পায়। এ বাংলা বিভাজন উপনিবেশ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে নতুন গতিবেগ সঞ্চার করে এবং বাঙালির আন্দোলন সশস্ত্র বৈপ্লবিক পন্থায় প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথে অগ্রসর হয়। পূর্ণস্বাধীনতা দাবি করে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য তাঁরা বিদেশি শক্তির বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত ও দলবদ্ধ সশস্ত্র বৈপ্লবিক সংগ্রামের প্রত্যক্ষ ও গুপ্ত কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করে। বাংলার স্কুল-কলেজগুলো হয়ে উঠে সে বিদ্রোহের কেন্দ্রস্থল। শিক্ষকগণ কেন্দ্র পরিচালক এবং বৈপ্লবিক মন্ত্রের প্রচারক রূপে আবির্ভূত হন। তাঁরা ১৯০২ খ্রি. অনুশীলন এবং ১৯০৫ খ্রি. প্রমথনাথ মিত্র (পি.মিত্র) ঢাকায় অনুশীলন সমিতির শাখা প্রতিষ্ঠা করে পুলিনবিহারী দাশ (১৮৭৭-১৯৪৯) কে পরিচালক করেন। কলকাতায় বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ (১৮৮০-১৯৫৯) অনুশীলন সমিতির মুখপাত্র হিসেবে ১৯০৬ খ্রি. মার্চে মাসে যুগান্তর পত্রিকা প্রকাশ করেন। পরবর্তীতে আলীপুর ষড়যন্ত্র মামলাকে কেন্দ্র করে মতান্তর হওয়ায় যুগান্তর সংশ্লিষ্টরা পৃথকভাবে সশস্ত্র বৈপ্লবিক তৎপরতা শুরু করে। ১৯০৮ খ্রি. ৩০ এপ্রিল বিহারের মুজাফ্ফরপুর কিংসফোর্ড হত্যাপ্রচেষ্টার সূত্রধরে ইংরেজ সরকার ২১ মে আলীপুর ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে। ১৯০৯ খ্রি. ০৬ মে ঘোষিত রায়ে ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয় এবং **'একবার বিদায় দে মা, ঘুরে আসি'**-গানটি বাংলার শহরে-গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে গণমানুষের হৃদয়মনকে বিগলিত করে। এদিকে দেশে সশস্ত্রবৈপ্লবিক কর্মকান্ড

Dhaka University Institutional Repository

বৃদ্ধি পাওয়ায় পুলিনবিহারী দাশসহ ৫৫ জনকে গ্রেফতার করে সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যম, ডাকাতি ও নরহত্যার অভিযোগে ১৯১০ খ্রি. জুলাই মাসে ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলার বিচার আরম্ভ হয়। বিচারে পুলিনবিহারী দাশ সাত বছরের কারাদন্ড এবং অন্যদের বিভিন্ন মেয়াদে সাজা হয়। 'বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির এহেন বৈপ্লবিক আন্দোলনের প্রচন্ডতায় ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ১৯১১ খ্রি. ১২ ডিসেম্বর এক ঘোষণায় বাংলা বিভাগ রদ করা হয়। কিন্তু তবু বৈপ্লবিক আন্দোলন থামেনি।

এদিকে ১৯০৬ খ্রি. ঢাকায় মুসলিম লীগ গঠিত হয় এবং বাংলা বিভাগ সমর্থন জানায়। কিন্তু বাংলা বিভাগ রদ করা হলে মুসলিম লীগও ব্রিটিশ বিরোধীতায় অগ্রণী হয়। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ লক্ষ্ণৌ চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে সম্পর্কোন্নয়নের প্রচেষ্টা চালায়। ইতোমধ্যে ১৯১৪ খ্রি. ২৮ জুলাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে জাতীয় কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকারকে সমর্থন দেয়। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধের এই গোলমেলে পরিবেশকে কাজে লাগিয়ে বিপ্লবীরা স্বাধীনতা অর্জনের প্রচেষ্টা চালায়। এ সময় বিপ্লবী রাসবিহারী বসু (১৮৮৬-১৯৪৫) উত্তর-ভারত ও পাঞ্জাবে ব্রিটিশ ভারতের দেশীয় সৈন্যদের মধ্যে বৈপ্লবিক মতাদর্শ প্রচারপূর্বক তাদের মাধ্যমে ১৯১৫ খ্রি. ২১ ফেব্রুয়ারি সেনা অভ্যুত্থানের দিন ধার্য করা হয়। কিন্ত কার্তার সিং নামক এক সৈন্যের বিশ্বাসঘাতকতায় সে পরিকল্পনা নস্যাৎ হয়ে যায়। রাসবিহারী বসু ছদ্মবেশ ধারণ করে জাপান চলে যান। অপরদিকে জার্মানির সহায়তায় ১৯১৫ খ্রি. ০৯ সেপ্টেম্বর ভারতকে স্বাধীন করতে যেয়ে উড়িষ্যার বালেশ্বরে বুড়িবালামের তীরে কাপ্তিপোদায় এক সম্মুখযুদ্ধে প্রাণ দেন বিপ্লবী জ্যোতিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৭৯-১৯১৫) ওরফে বাঘা জ্যোতিন সহ চার বিপ্লবী। এদিকে ১৯১৫ খ্রি. ০১ ডিসেম্বর কাবুলে রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ সিং (১৮৮৬-১৯৭৯) কে রাষ্ট্রপতি, অধ্যাপক বরকতুল্লাহ (১৮৫৪-১৯২৭) কে প্রধানমন্ত্রী এবং মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধি (১৮৭২-১৯৪৪) কে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী করে এক অস্থায়ী বিপ্লবী ভারতীয় সরকার শপথ নেয়।

বাংলার প্রথম ও মূল গুপ্তসমিতি হলো কলকাতা অনুশীলন সমিতি। এ সমিতি হতে পরবর্তীতে ঢাকা অনুশীলন, যুগান্তর ও উত্তরবঙ্গ সমিতি গঠিত হয়। এ তিনটি সমিতি ক্রমশ বিস্তার লাভ করে সমগ্র বাংলাকে বৈপ্লবিক স্বাধীনতা সংগ্রামের বিস্তৃত ক্ষেত্রে পরিণত করে। এদিকে ১৯০৮ খ্রি. আলীপুর ষড়যন্ত্র মামলার পর ডিসেম্বর মাসে 'Criminal Law Amendment Act of 1908' আইন বলে ব্রিটিশ সরকার বাংলায় অনুশীলন সমিতি নিষিদ্ধ ঘোষণার সাথে সাথে সব শাখা পৃথক হয়ে যায়। একই সাথে কলকাতার আত্মোন্নতি সমিতি, সতিশচন্দ্র বসু প্রতিষ্ঠিত এ দলটি বিপিন বিহারীর দল নামে পরিচিতি পায়, অশ্বিনীকুমার দত্তের বরিশালের স্বদেশ বান্ধব সমিতি, ময়মনসিংয়ের হেমেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরীর সাধনা সমিতি, ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর সুহৃদ সমিতি ও ফরিদপুরের অম্বিকাচরণ মজুমদারের ব্রতি সমিতি নিষিদ্ধ করা হয়। অনুশীলন সমিতি বন্ধ করে দেয়ায় অনেকের মনে ক্ষোভের সঞ্চার হয়। আলীপুর মামলায় অরবিন্দকুমার ঘোষ (১৮৭২-১৯৫০) প্রমুখ শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের গ্রেফতার জনিত শূণ্যতায় যুগান্তর দলের নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (M.N.Roy), জ্ঞান মিত্র, সুধীররায় চৌধুরী, পাবনার অবিনাশ চক্রবর্তী ও অন্নদা কবিরাজের পাবনা সম্মিলনী প্রমুখ গুপ্তসমিতির নেতৃবৃন্দ এ অবস্থায় চুপচাপ বসে না থেকে জ্যোতিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের (বাঘাজ্যোতিন) সাথে যোগাযোগ ক্রমে তাঁকে ব্রিটিশ সরকারকে উপযুক্ত শায়েস্তা করার নিমিত্তে নেতৃত্বগ্রহণের প্রস্তাব দেয়। এতে তিনি সম্মতি জ্ঞাপন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

১৯০৮ খ্রি. ডিসেম্বরে অনুশীলন সমিতি নিষিদ্ধ করা হলে সমিতির নাম পরিবর্তন করে 'Bengal Youngmen's Zamindary Co-Operative Society' নামকরণ এবং জজ সারদাচরণ মিত্রকে এর সভাপতি করা হয়। বাহার পর পুনরায় ডাকাতির অপরাধে পি.মিত্র ঢাকা অনুশীলন থেকে পুলিনবিহারী দাশকে বহিস্কার করেন। প্রকৃতপক্ষে মুরারি পুকুরের গুপ্তআড্ডায় অস্ত্রসংগ্রহ, বিপ্লবাত্মক কর্মপ্রয়াস বিশেষত; বিহারের মুজাফফরপুর অভিযান বারীন ঘোষের নেতৃতেই সংগঠিত হয়। এতে সতীশচন্দ্র বসু এবং পি.মিত্রের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক দৃশ্যমান নয়। পরবর্তীকালে কলকাতা অনুশীলন সমিতির কর্মপ্রবণতা দেখা যায় না। ১৯১০ খ্রি. ২৩ সেপ্টেম্বর প্রমথনাথ মিত্রের (পি.মিত্র) মৃত্যুর সাথে সাথে সংস্থা হিসেবে কলকাতা অনুশীলন সমিতি ক্রমশঃ স্তিমিত হয়ে পড়ে। কিন্তু মূল সমিতির শাখা, ঢাকা অনুশীলন সমিতি সুবিস্তৃত হয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে অনুশীলন সমিতি বলতে ঢাকা অনুশীলন সমিতিকেই বুঝায়। ঢাকা অনুশীলন সমিতিই পূর্ব ও উত্তর বাংলায়, কলকাতায় এবং বাংলার বাইরে আসাম, বিহার, পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ এবং পুনা শহরেও বৈপ্লবিক কর্মকান্ড সম্প্রসারণ করে। পুলিনবিহারী দাশ, মাখনলাল সেন, প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলি, মহারাজা ত্রৈকল্যনাথ চক্রবর্তী, নগেন্দ্রনাথ দত্ত ওরফে গিরিজা বাবু প্রমুখ বিপ্লবীগণ এ দলের পরিচালক ছিলেন। পূর্ব বাংলাতেই এ দলের প্রায় ৫০০ এর অধিক শাখা ছিল বলে জানা যায়।

ইতোমধ্যে জ্যোতিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের (বাঘাজ্যোতিন) নেতৃত্বে বৈপ্লবিত কর্মকান্ড গতি পায়। তাঁর গতিশীল নেতৃত্বে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানদের সহায়তায় দেশব্যাপী এক বিদ্রোহ আয়োজন হয়। ইতোপূর্বে বাংলাদেশের সকল বিপ্লবী দলগুলোকে এক সংগঠনে শামিল করার চেষ্টা হয়। বাংলার অন্যান্য দল সে আহ্বানে সাড়া দিলেও ঢাকা অনুশীলন সমিতি ও কলকাতার বিপিন গাঙ্গুলীর দল এ উদ্যোগের বাইরে থাকলেও পুরোপুরি সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেয়। কার্যক্ষেত্রে সক্রিয় দলগুলো সকলেই এক সংগঠনের মধ্যে এসে যায়। বরিশাল দলের নিজস্ব সংগঠন, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ফরিদপুর, শ্রীহট্ট জেলায়। ময়মনসিংহের মণি চৌধুরী ও ক্ষিতিশ চৌধুরীর আগ্রহে ও চেষ্টায় ১৯১৪ খ্রি. বরিশাল দলের নরেন ঘোষ চৌধুরী ও সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র ময়মনসিংহে চলে গিয়ে সাধনা সমিতির প্রধান হেমেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরীর সঙ্গে আলোচনা ক্রমে উভয় দল একদলে মিলিত হওয়ার সিদ্ধান্ত করেন। পাবনার অবিনাশ চক্রবর্তীর আগ্রহে উত্তর বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত যতীন রায়ের দলের সঙ্গে বরিশাল দলের প্রায় একসংস্থায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার মতো ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হয়। এছাড়া ফরিদপুরের পূর্ণচন্দ্র দাশের দল, বরিশাল দলের পূর্বে জ্যোতিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের (বাঘাজ্যোতিন) দলের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল বলে জানা যায়। কার্যত জ্যোতিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘাজ্যোতিন) এই মিলিত দলের নেতা রূপে আভির্ভুত হন। যদিও ভোটের মাধ্যমে তিনি নেতা হননি; অপরিমেয় ত্যাগই তাঁকে ঐ পদে বরণ করে নেয়। এই দলগুলি কতকগুলি উপদলের সমষ্টি। তাঁদের নিজেদের আলাদা ইতিহাস, ঐতিহ্য, নেতৃত্ব ও শাসন-শৃঙ্খলা রয়েছে। কিন্তু দেশ মাতৃকার বৃহত্তর প্রয়োজনে একযোগে কাজ করার প্রয়াসে একসূত্রে গ্রথিত হয়েছে। এই উপদলগুলো হচ্ছে: ১. বরিশাল, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, শ্রীহট্ট জেলার শাখাসংগঠন নিয়ে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতি ও নরেন ঘোষ চৌধুরীর নেতৃত্বে গঠিত বরিশাল দল, ২. ময়মনসিংহের হেমেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরী, সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, আনন্দ রায়, মণি রায়, ক্ষিতিশ চৌধুরী, নরেন চৌধুরী প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গের দ্বারা পরিচালিত সাধনা সমিতি। ৩. উত্তর বঙ্গের যতীন রায়, যোগেশদে সরকার, কালী বাগচী, বাদল দাশগুপ্ত প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গের দ্বারা পরিচালিত যতীন রায়ের দল। ৪. ফরিদপুরের পূর্ণচন্দ্র দাশ, চিত্তপ্রিয় রায়, মনোরঞ্জন সেন, নীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গের দ্বারা পরিচালিত পূর্ণদাশের দল। ৫. ইদিলপুরের নিখিলগুহ রায়ের দল এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়

Dhaka University Institutional Repository

ছড়ানো জ্যোতিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘাজ্যোতিন), যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (M.N.Roy), অতুলকৃষ্ণ ঘোষ, হরিকুমার চক্রবর্তী, সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী, সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমূখ ব্যক্তিবর্গের নেতৃত্বাধীন জ্যোতিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের (বাঘাজ্যোতিন) দল। আরো অনেক পরে ঢাকার হেমচন্দ্র ঘোষের (১৮৮৪-১৯৮০) বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স (বি.ভি.) এবং চট্টগ্রামের সূর্যকুমার সেনের (১৮৯৪-১৯৩৪) দল এ সম্মিলিত স্রোতধারায় শামিল হয় বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। এ ছাড়াও রাধিকামোহন রায়ের ফ্রেন্ডস ইউনাইটেড ক্লাব, সতিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ডন সোসাইটি, চন্দননগর-গোন্দলপাড়ার বসন্তকুমার প্রমুখের বান্ধব সম্মিলনী, হরিকুমার চক্রবর্তী প্রমূখের ২৪ পরগণা চিংড়িপোতা গ্রুপ, ইন্দ্রনন্দী ও নিখিলেশ্বর রায় মৌলিকের ছাত্র ভান্ডার, কলকাতার ললিতমোহন ঘোষালের স্বদেশ সেবক সমিতি, নদীয়া রানাঘাটের শক্তি সমিতি এবং যুবক সমিতি (কলকাতা) প্রমূখ দল গুপ্ত সশস্ত্র বৈপ্লবিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করে বলে তথ্য পাওয়া যায়।

১৯১৭ খ্রি. রুশ বিপ্লবের প্রভাবে ভারতের বিপ্লবীদের মনে ভাবান্তর পরিলক্ষিত হয়। বিপ্লবীরা ক্রমে সশস্ত্র আন্দোলনের পথ পরিহার করে মার্কসবাদের দিকে আগ্রহী হতে থাকে। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার বন্দি, গদর আন্দোলন ও চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিবর্গ মার্কসবাদের দিকে আকৃষ্ট হন বলে জানা যায়। 'রুশ বিপ্লবের পর পরই ভারতে একটি স্ট্রাইক তরঙ্গ আরম্ভ হয় এবং ১৯২০ খ্রি. ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের জন্ম হয়। এর প্রভাবে ভারতীয় বিপ্লবীরা বৈপ্লবিক কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলে এবং কৃষকসভা গঠিত হয়। এভাবে ভারতের জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মূলধারার ওপর অধিকতর বিপ্লবী কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনের প্রভাব পড়তে থাকে।

ভারত সরকার ১৯১৭ খ্রি. ডিসেম্বরে বৈপ্লবিক আন্দোলন দমনের জন্য কুখ্যাত রাউলাট কমিটি গঠন করে। ১৯১৮ খ্রি. জুলাই মাসে প্রকাশিত সিডিশন কমিটির রিপোর্টে বলা হয়, বাঙালির মতো আর কোনো জাতি ব্রিটিশকে এতো বিব্রত করেনি। পাঞ্জাব বাংলার সাথে বৈপ্লবিক কাজে অংশ নিলেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিক থেকে তাদের সে আগ্রহ থাকেনি। বাংলায়ও ১৯১৮ খ্রি. সশস্ত্র বৈপ্লবিক কার্যক্রম স্তিমিত হয়ে পড়ে। ১৯১৯ খ্রি. মধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেমে যায়। কিন্তু ১৯১৯ খ্রি. মার্চে সরকার রাউলাট আইন পাস করে বিপ্লবীদের ওপর দমন ও নিপীড়ন চালায়। ফাঁসি, যাবজ্জীবন, দীপান্তর, দীর্ঘকালীন কারাদন্ড ও বিনা বিচারে আটকের ফলে এই সময় বৈপ্লবিক আন্দোলন পরাভূত হয়। এদিকে যুদ্ধজয়ের আনন্দে 'মন্টেগু-চেমসফোর্ড রিফর্ম' জারি করে সরকার বিনা বিচারে আটক রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তিদানের ব্যবস্থা করে। ১৯২১ খ্রি. মধ্যেই বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ ঘরে ফিরে দেখেন ভারতের রাজনৈতিক গগণে আবির্ভূত হয়েছেন আন্দোলনের মধ্যমণি মহাত্মাগান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮)। এসময় অধিকাংশ বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ আন্দোলনের কৌশল হিসেবে কংগ্রেসে যোগদান করে গণসংযোগ করার সিদ্ধান্ত নেন। বন্ধুদেরকে গুপ্ত-সমিতি পুনর্গঠনের কাজ সংগোপনে চলমান রাখতে এবং কোনো সশস্ত্র সংগ্রাম পরিহার করতে বলেন। এভাবে ১৯৩০ খ্রি. অবধি অতিসংগোপনে বৈপ্লবিক কার্যক্রম চলে।

এদিকে ১৯৩০ খ্রি. ১৮ এপ্রিল বিপ্লবী সূর্যকুমার সেনের নেতৃত্বাধীন বিপ্লবীরা চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করে ব্রিটিশ পতাকা নামিয়ে ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার ঘোষণা করা হয়। ওদিকে ০৮ ডিসেম্বর প্রকাশ্য দিবালোকে বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষের বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স (বি.ভি.) দলের কর্মী বিনয়কৃষ্ণ বসু, বাদল গুপ্ত ও দিনেশ

Dhaka University Institutional Repository

গুপ্ত কলকাতা রাইটার্স বিল্ডিং আক্রমণসহ বিভিন্ন সশস্ত্র বৈপ্লবিক কার্যক্রম শেষাবধি ১৯৩৪ খ্রি. দিকে স্তিমিত হয়ে যায়। একমাত্র বাংলায় এ সশস্ত্র বৈপ্লবিক তৎপরতা চলে প্রায় চল্লিশ বছর (১৯০৬ থেকে ১৯৪৬ খ্রি. ১৮ ফেব্রুয়ারির নৌবিদ্রোহ অবধি)। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর (১৮৯৭-১৯৪৫) নেতৃত্বাধীন আজাদ হিন্দ ফৌজের সশস্ত্র বৈপ্লবিক কর্মকান্ডের অভিঘাত এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতি মিটিয়ে বৃটেনের পক্ষে ভারতে শাসন কার্য পরিচালনা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠে। পরিস্থিতি বিবেচনায় ব্রিটিশ সরকার ভারত ত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এভাবে বাঙালির সশস্ত্র বৈপ্লবিক আন্দোলন সফলতার দ্বারপ্রান্তে উন্নীত হয়।

নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির সহচর হিসেবে উপর্যুক্ত পরিস্থিতিতে বিপ্লবী মধ্যবিত্তশ্রেণির আন্দোলনের ফসল কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ তাদের নিজেদের পক্ষে নেয়ার দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়। অবশেষে ১৯৪৭ খ্রি. ১৫ আগস্ট স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণির সশস্ত্র বৈপ্লবিক তৎপরতার অভিঘাতে স্বাধীনতা অর্জিত হলেও শেষাবধি তাদের কাঙ্ক্ষিত সেই স্বাধীনতা সাম্রাজ্যবাদের ক্রীড়নক ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের ওপর বর্তায়। এহেন যুগান্তকারী ঘটনায় বিপ্লবীদের কাঙ্খিত স্বাধীনতার স্বপ্ন ভূলুণ্ঠিত হয়; যা ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং বিষয়টি বিশদ গবেষণার দাবি রাখে।

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

বাংলা তথা ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের শুরু, যা আধুনিক যুগের সূচক, তখন থেকে বাংলার ইতিহাস নানা দিক থেকে দক্ষিণ এশিয়ায় বিশিষ্টতার দাবি রাখে। এ যুগে নানা সংস্কার মূলক আন্দোলন, আধুনিক যুক্তিবাদী ও উদার মানবিক চেতনার উন্মেষ নতুন মাত্রা পেয়েছে। স্বদেশ-স্বজাতি সম্পর্কে সচেতনতার এখানেই অঙ্কুরোদগম। সমাজ চেতনার ধারণায় উদ্বুদ্ধ ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত বাংলাতেই; অহিংস-সহিংস বিপ্লববাদী আন্দোলনের গোড়াপত্তনও এখানেই। স্বাধীনতার অদম্য আকাঙ্ক্ষা বাঙালির স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। বাঙালি যখনই সুযোগ পেয়েছে তখনই আধিপত্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধাচারণ করেছে। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশী প্রান্তরের যুগান্তকারী ঘটনার ফলে বাংলা স্বাধীনতা হারায়। কিন্তু এই পরাধীনতা বাঙালি সহজে মেনে নেয়নি। ব্রিটিশ শাসন-শোষণ বিরোধী ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ও জমিদার-মহাজন বিরোধী সকল আন্দোলন-সংগ্রামে বাংলার এক ধারাবাহিক বিপ্লবী তৎপরতা লক্ষ্যণীয়। বাঙালির এই বৈপ্লবিক কার্যক্রম পরবর্তীতে সমগ্র ভারতব্যাপী পরিব্যাপ্ত হয়।

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে ২৩ জুন পলাশীর প্রান্তরে যুগান্তকারী ঘটনার ফলে ব্রিটিশ শোষণ-নির্যাতনের প্রভাব পড়ে জনগণের সর্বস্তরে। এতে দুইটি পথ খোলা থাকে; একটি নির্বিবাদে মেনে নেওয়া অন্যটি বিদ্রোহ। আঠারো শতকের মধ্যভাগ থেকে উনিশ শতকের শুরু অবধি ব্রিটিশ আধিপত্য স্থাপনের সূচনা থেকেই ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে উঠে। কৃষক, শ্রমিক ও কারিগর শ্রেণির জীবন বিপর্যস্ত হওয়ায় তারাই প্রথম বিদ্রোহের আগুন প্রজ্বলিত করে।[১] আঠারো শতকের শেষার্ধ থেকে সমগ্র উনিশ শতক এবং বিশ শতকের শুরু পর্যন্ত ব্রিটিশ শাসননীতি ও ভূমি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অসংখ্য কৃষক ও আদিবাসী সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘটে। এসকল বিদ্রোহে বাঙালি, আদিবাসী, অনাদিবাসী ও অন্যান্য নিম্নবর্গের শ্রমজীবী মানুষের অংশগ্রহণ লক্ষ্যণীয়।[২] ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ (১৭৬৩-১৮০০), কৃষক-তাঁতীদের সংগ্রাম (১৭৭০-১৮০০), রংপুর বিদ্রোহ (১৭৮৩) ও নীল বিদ্রোহ (১৭৭৮-১৮০০), লবণশিল্পী (১৮০৬), মালঙ্গী (১৭৮০-১৮০৪) ও রেশম চাষীর সংগ্রাম (১৭৮০-১৮০০), ফরায়েজি (১৮১৮-১৮৬২) ও ওয়াহাবি আন্দোলন (১৮২০-১৮৭০), চোয়াড় (১৭৯৮-৯৯) ও লায়েক (১৮০৬-১৬), গারো (১৮৩৭-৮২), চাকমা (১৭৭৬-৮৭), রিয়াং (১৯৪৩-৪৫), কোল (১৮৫৭-১৯০০), সাওতাল (১৮৫৫-৫৬) ও মুন্ডা (১৮৫৭-১৯১৯) বিদ্রোহ এসময় কালেই ঘটে। এসকল বিদ্রোহ ও আন্দোলনের পৃথক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তাদের মধ্য থেকেই নেতার আবির্ভাব ঘটে এবং তাঁরাই নেতৃত্ব দেন।[৩] কিন্তু ১৮৫৯-১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে নীল বিদ্রোহে খানিকটা ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের একাংশ এগিয়ে এলেন তাদের সমর্থনে। তন্মধ্যে সাংবাদিক হরিশচন্দ্র

মুখোপাধ্যায় ও চা কুলিদের ওপর দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়ের অগ্নিঝড়া লেখনি হিন্দু পেট্রিয়ট-এ ও সঞ্জীবনী পত্রিকাতে নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে। তাঁদের এ ভূমিকা শিক্ষিত সমাজের বৃহৎ অংশে জাগ্রত করেছে ইংরেজ বিরোধী চেতনা।[৪] একই ধারায় মহারাষ্ট্রের কেশরী ও মাদ্রাজের হিন্দু পত্রিকার বৈপ্লবিক ভূমিকাও স্মরণযোগ্য।[৫] বাংলার পঞ্চাশ লক্ষ কৃষক এ নীল বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করে। সংগ্রামী কৃষক ও বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের মিলিত প্রয়াসের ফলে নীল বিদ্রোহ বাংলায় জাতীয় সংগ্রামের রূপধারণ করে।[৬] এধরণের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ইতোপূর্বে বাংলায় আর কখনো ঘটেনি।

১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কারণে যে নতুন জমিদার এবং কোম্পানির এদেশীয় মুন্সি, বাণিয়া ও দালাল শ্রেণির উদ্ভব ঘটে, তারা প্রায় সকলেই ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়ভূক্ত। এ অবস্থায় ইংরেজরা একটি শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণি গড়ে তুলতে তৎপরতা চালায়।[৭] বাংলায় মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব সমাজের ক্রমবির্তনের ফল। ১৭৫৭-১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বাংলায় ব্রিটিশ প্রশাসন কতগুলো পদক্ষেপগ্রহণ করে। এগুলোর মধ্যে ভূমিব্যবস্থার নতুন বিন্যাস, ব্যবসায়-বাণিজ্যে পুজিবাদী চেতনার বিকাশ, ইংরেজি শিক্ষার বিস্তার, আইন-আদালত স্থাপন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এসকল পদক্ষেপের ফলেই বাংলায় আধুনিক মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব অনিবার্য হয়ে ওঠে। ইংরেজ সরকারের নীতির কারণে প্রধানত চারটি শ্রেণি যেমন; (ক) ব্যবসায় নির্ভর, (খ) শিল্প নির্ভর (গ) ভূমি নির্ভর ও (ঘ) শিক্ষা নির্ভর মধ্যবিত্তের বিকাশ ঘটে।[৮] তবে এই শ্রেণিরগুলোর মধ্য আমাদের আলোচনায় প্রাধান্য পাবে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি। সাধারণত ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত এবং তাদেরই সৃষ্ট স্বীকৃত পেশা সমূহে নিয়োজিত সম্প্রদায়কে ইঙ্গিত করে। তারা মানসিক গঠন, নৈতিকতা, মূল্যবোধ, জীবন দর্শন ও জাতীয়তাবোধে অন্যান্য মধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্টের অধিকারী হয়। কলকাতাকে কেন্দ্র করেই মধ্যবিত্ত শ্রেণি বিকশিত হয়।

উনিশ শতকের শুরুতে পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংস্পর্শে মধ্যবিত্ত শ্রেণির মনে সামাজিক ন্যায়বিচার ও রাজনৈতিক অধিকার সম্বন্ধে নতুন ধ্যান-ধারণার উদ্ভব ঘটে;[৯] যাকে বঙ্গীয় নবজাগরণ নামে অভিহিত করা হয়। বঙ্গীয় এ নবজাগরণের ক্ষেত্রে বিপরীতমূখী দু'টি ভিন্নধারার আদর্শের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। একটি পাশ্চাত্য প্রভাব অপরটি প্রাচ্যচিন্তার *প্রভাব*। পাশ্চাত্যধারার স্রষ্টা ছিলেন রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) এবং প্রাচ্যচিন্তার প্রভাব লক্ষ্য করা যায় রাধাকান্ত দেবের (১৭৮৪-১৮৬৭) আদর্শে। উনিশ শতকের পুনর্জাগরণ আন্দোলন যেমন তাঁর নেতৃত্বে অন্তর্মূখী প্রবণতা লাভ করেছিল তেমন রাজা রামমোহন রায়ের নেতৃত্বে যে আদর্শের বিস্তার ঘটে তা ছিল বহির্মুখী। এই আদর্শের নেতৃত্বের প্রকৃতিকে আবার দুই ভাবে বিশ্লেষণ করা যায়। রাজা রামমোহন রায়ের নেতৃত্ব ছিল

উদারনীতি ও নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের ধারা এবং আপসকামিতা। অপরদিকে তাঁর উত্তরসূরী ইয়ংবেঙ্গল আন্দোলনের স্রষ্টা হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯-১৮৩১) এবং তাঁর অনুসারীগণ উগ্র, উদ্দাম ও আপসহীন নেতৃত্ব দানের এক অনন্য নজীর প্রতিষ্ঠা করেন।[১০] এছাড়াও বঙ্গীয় নবজাগরণে রাজা রামমোহন রায় থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) পর্যন্ত কয়েকজন যশস্বী মনীষীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অনস্বীকার্য। সর্বোপরি ভারতের পরাধীন অবস্থা এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির বৈপ্লবিক চিন্তা ও চেতনা বিকাশের দু'টি মূল উৎস অনুমিত হয়।

বঙ্গীয় নবজাগরণ উদ্ভুত বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল কৃষকের বৈপ্লবিক সংগ্রাম সম্বন্ধে বিরূপ মনোভাব প্রদর্শন এবং ইংরেজ শাসনের সাথে আপসের নীতিগ্রহণ। এই নীতিই রাজা রামমোহন রায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখকে ইংরেজ শাসকের মহিমা কীর্তন এবং সর্বদা তাদের দিকে আপসের নীতি প্রসারিত করে। ফলশ্রুতিতে বঙ্গীয় নবজাগরণের নায়কগণ প্রায় সকল কৃষক অভ্যুত্থান এমনকি ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহ তথা ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রতিও তারা কোনো প্রকার সমর্থন জানায়নি।[১১] বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির এই আপসকামী মনোভাব তাদের সামাজিক দায়িত্ববোধ ও রাজনৈতিক চেতনার ইতিহাসকে অন্ধকারাছন্ন করে রেখেছে।[১২] এতোসব সমালোচনা সত্ত্বেও একেশ্বরবাদী ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তন, ইউরোপীয় সমাজের অনুকরণে কুসংস্কারাচ্ছন্ন বঙ্গীয় সমাজের সংস্কার সাধন এবং ইউরোপীয় সাহিত্য হতে নতুন সৃষ্টির প্রেরণালাভের[১৩] মাধ্যমে বাঙালি প্রগতিশীলতার পথে অগ্রসর হয় যা বঙ্গীয় নবজাগরণের ইতিবাচক দিক প্রতিভাত হয়। তাছাড়া 'এই নবজাগরণের প্রভাবে তারা ইউরোপীয় সাহিত্য হতে ইংল্যন্ডের দীর্ঘকালের গণতান্ত্রিক আন্দোলন বিশেষত ১৬৪৮ খ্রিস্টাব্দের বৈপ্লবিক ঐতিহ্য; এবং মিল্টন, শেলী ও বায়রনের রচনাবলি হতে শোষক-উৎপীড়কের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রেরণা পায়।[১৪] এপথেই যুগান্তকারী ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে ফরাসি বিপ্লবের সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার আদর্শের সাথে বঙ্গীয় নবজাগরণের নায়কদের পরিচয় ঘটে।[১৫] এসকল নায়কেরা ছিলেন ইউরোপীয় রেনেসাঁস ও ফরাসি বিপ্লবোদ্ভূত মানবতাবাদী মন্ত্রে দীক্ষিত।

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে মহাবিদ্রোহের সময় শাসকগোষ্ঠী উপলব্ধি করেছিল, ভারতের গণশক্তির ক্রমবর্ধমান বৈপ্লবিক সংগ্রাম সামরিক শক্তির দ্বারা সাময়িকভাবে পরাজিত করা সম্ভব হলেও এই শক্তিকে চিরতরে পদানত করে রাখা একাকী বৈদেশিক শাসকগোষ্ঠীর সাধ্যাতীত। এজন্য ভারতের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলোর সর্বাঙ্গীন সহযোগিতা অপরিহার্য। সুতরাং মহাবিদ্রোহের পরেই ব্রিটিশ শাসকবর্গ সামন্ত রাজন্যবর্গ ও জমিদারগোষ্ঠীর সাথে বন্ধুত্ব ও ঐক্য গড়ে তোলার প্রয়াস পায়। একই সাথে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ নিজেদের প্রয়োজনে যে সামান্য সংস্কার কার্য আরম্ভ করেছিল এসময় তা পরিত্যাগ করে

তৎপরিবর্তে সকল প্রকারের সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কার সুরক্ষা নীতিগ্রহণ করে।[১৬] মহারানী ভিক্টোরিয়ার ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের ঘোষণায় 'ভারতীয়দের ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকার দৃঢ় সংকল্প ঘোষিত হয় এবং ভারতীয় সমাজের রক্ষণশীল সম্প্রদায়গুলোকে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় যে, ভারতবর্ষের প্রাচীন ঐতিহ্য, প্রাচীন প্রথা ও অধিকার সর্বপ্রযত্নে সুরক্ষিত করা হবে।[১৭] কিন্তু উনিশ শতকের শেষার্ধে ক্রমবর্ধমান কৃষি-সঙ্কট, ব্রিটিশ শোষণের মাত্রাবৃদ্ধি এবং শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ক্রমবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির মনোজগৎ ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হতে থাকে।[১৮] তারা দেখে শাসন বিভাগের উচ্চ পদগুলো কেবলমাত্র ইংরেজদের জন্য সীমাবদ্ধ। ইংরেজ শাসনবিরোধী মনোবৃত্তি তখন থেকেই জেগে উঠে।[১৯] তাদের একটি বৃহৎঅংশ *আইন* (Law) বিষয়ে ডিগ্রি লাভ করে কিন্তু খুব দ্রুতই যুবক উকিলের সংখ্যা মোট মামলা মোকদ্দমার সংখ্যা ছাড়িয়ে যায়।[২০] শাসকগোষ্ঠীর মুখপাত্র *ভেরিনি লোভেট* (Verney Lovett) বলেন, ভারতবর্ষে বিশেষত বাংলায় বহু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলেও সেগুলোতে শিক্ষক সংখ্যা অত্যধিক। তাঁদের বেতনও সামান্য।[২১] উনিশ শতকের শেষদিকে এই শিক্ষিত বেকার সম্প্রদায়ের দুর্দশা চরম আকার ধারণ করে।

এছাড়াও মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে নানাপ্রকার অসন্তোষ ক্রমশ ঘনীভূত হয়ে উঠছিল। তারা ক্রমেই নিজেদের দাবি-দাওয়ার প্রতি সচেতন হয়ে উঠতে থাকে। এই সচেতনতা থেকে জন্ম নেয় পরাধীনতার বেদনা, জাতীয় চেতনা, আত্মসম্মানবোধ এবং স্বজাত্যগরিমা। ইংরেজ-সৃষ্ট বাঙালি মধ্যবিশ্রেণির অসন্তোষ ও বিক্ষোভের মধ্যেই জাগ্রত হয়েছে স্বাধীনতার স্পৃহা ও স্বাদেশিকতার অনুভূতি।[২২] এহেন অনুভূতির বশবর্তী হয়ে ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে এমএ শ্রেণিতে ভর্তি হন লীলাবতী নাগ (১৯০০-১৯৭০)। পরবর্তীতে ঢাকার বিপ্লবী সংগঠন 'শ্রী সংঘের' প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা অনিলচন্দ্র রায়ের (১৯০১-১৯৫২) সঙ্গে পরিণয় সূত্রে তিনি লীলা রায় নামে পরিচিত হন।[২৩] ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে লবণ সত্যাগ্রহের সময় তিনি 'ঢাকা মহিলা সত্যাগ্রহ সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেন। অনিলচন্দ্র রায়ের গ্রেফতারের পর তিনি 'শ্রী সংঘ' পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৩১ থেকে ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ব্রিটিশ কারাগারে ছিলেন।[২৪] ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ আন্দোলনের দায়ে লীলা রায় ও অনিলচন্দ্র রায় আবারও কারাবন্দী হন। বিপ্লবী লীলা রায় মুক্তিপেয়ে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর নির্দেশে 'ফরওয়ার্ড ব্লক' সাপ্তাহিকের সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন।[২৫]

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহ তথা প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলন দমিত হওয়ার পরবর্তী সময়ে মুসলমান সম্প্রদায় গভীর হতাশায় নিমজ্জিত হয়। দীর্ঘকাল ব্রিটিশ শাসনের বিরোধিতা ও ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ না করায় হিন্দু সম্প্রদায়ের তুলনায় তারা অনেকটা পিছিয়ে থাকে। এহেন অবস্থায়

স্যার সৈয়দ আহমদ খান (১৮১৭-১৮৯৮), নবাব আবদুল লতিফ (১৮২৮-১৮৯৩), সৈয়দ আমির আলী (১৮৪৯-১৯২৮) প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ মুসলিম সম্প্রদায়কে জাগ্রত করার উদ্যোগ গ্রহণ করায় একটু দেরিতে হলেও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যেও মধ্যবিত্ত শ্রেণির আবির্ভাব ঘটে।[২৬] এ শ্রেণি ব্রিটিশ শাসনের প্রতি অনুগত থেকে মুসলিম সমাজের উন্নতি সাধনের নীতি গ্রহণ করে। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহ দমিত হওয়ার পরবর্তী সময়ে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির যুবকদের মধ্যে প্রথমে রাজনারায়ন বসুর (১৮২৬-১৮৯৯) মনে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে দেশের মুক্তি অর্জনের চিন্তার উন্মেষ ঘটে এবং তিনি বাংলায় বৈপ্লবিক চিন্তার অনুকূল পটভূমি তৈরি করেন।[২৭] ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত 'আর্যদর্শন' বাংলা মাসিকপত্রে প্রকাশিত রচনাসমূহ বাংলার যুবকদের বৈপ্লবিক চিন্তায় উদ্দীপ্ত করে। মাৎসিনি ও ইতালির স্বদেশ প্রেমিকদের নিকট থেকে তাঁরা ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন ভারতের চিন্তায় অনুপ্রাণিত হন। ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় ও ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে মহারাষ্ট্রে বিপ্লবী গুপ্ত সমিতি গঠিত হয়।[২৮]

এদিকে ইংরেজ গোয়েন্দা দপ্তর এক গোপন প্রতিবেদনে জানায়, মাতৃভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলো ভারতে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে চরম শত্রুতা করছে। ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে বড়লাট লর্ড লিটন মাতৃভাষায় প্রকাশিত সকল সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করার উদ্দেশে 'ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট' নামে এক দমনমূলক আইন পাস করেন।[২৯] ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় গড়ে ওঠা জাতীয়তাবাদী সংগঠন 'ভারতসভা' সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধকারী 'ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট'র বিরুদ্ধে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৪৮-১৯২৫) নেতৃত্বে ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দের ১৬ এপ্রিল ভারতব্যাপি প্রতিবাদ দিবস পালন করে।[৩০] এভাবে ইংরেজদের দমননীতি, বাঙালির জাতীয় চেতনাকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করার পরিবর্তে ভারতব্যাপী জাতীয়তাবাদী চেতনাবোধ জাগ্রত করে। ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দের ০৯ ফ্রেব্রুয়ারি প্রবর্তিত ইলবার্ট বিলকে কেন্দ্র করে এই ঘাত-প্রতিঘাত তীব্রতর হয়ে ওঠে।

ইংরেজ-শাসন ও দমননীতির বিরূদ্ধে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির দেশব্যাপি প্রতিবাদের সূচনায় অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজ অফিসার অ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম চিন্তিত হন। তারই উদ্যোগে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে বোম্বাই শহরে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে সংগঠনটি ইংরেজ সরকারের নিকট আবেদন নিবেদনের মাধ্যমে বিভিন্ন দাবি দাওয়া আদায়ের নীতিগ্রহণ করে।[৩১] কিন্তু এহেন আবেদন নিবেদন নীতির সমালোচনা করে ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে বরিশালের অশ্বিনীকুমার দত্ত (১৮৫৬-১৯২৩) কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনকে তিন দিনের তামাশা বলে মন্তব্য করেন।[৩২] এ মন্তব্যের মাধ্যমে কংগ্রেসের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী একটি ধারার প্রথম উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

বাংলার ক্রমবর্ধমান জাতীয় চেতনা ব্রিটিশ সরকারকে উদ্বিগ্ন করে তোলে। এহেন আন্দোলন দমন ও প্রশাসনিক সুবিধার্থে লর্ড কার্জন ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে *বাংলা ভাগ* (Partition of Bengal) করে পূর্ববাংলা ও আসাম নামে নতুন একটি প্রদেশ গঠন করেন।[৩৩] এই বাংলা ভাগের বিরুদ্ধে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস তথা বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির নেতৃবৃন্দ তীব্র গণআন্দোলন গড়ে তোলেন যা *বঙ্গভঙ্গ*[৩৪] *আন্দোলন* (Anti-Partition movement of Bengal) নামে পরিচিতি পায়।[৩৫] এ বাংলা বিভাজন উপনিবেশ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে নতুন গতিবেগ সঞ্চার করে এবং বাঙালির আন্দোলন সশস্ত্র বৈপ্লবিক পন্থায় প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথে অগ্রসর হয়। পূর্ণস্বাধীনতা দাবি করে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য তাঁরা বিদেশি শক্তির বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত ও দলবদ্ধ সশস্ত্র বৈপ্লবিক সংগ্রামের প্রত্যক্ষ ও গুপ্ত কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করে।[৩৬] বাংলার স্কুল-কলেজগুলো হয়ে উঠে সে বিদ্রোহের কেন্দ্রস্থল। শিক্ষকগণ কেন্দ্র পরিচালক এবং বৈপ্লবিক মন্ত্রের প্রচারক রূপে আবির্ভূত হন।[৩৭] তাঁরা ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে অনুশীলন[৩৮] এবং ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে প্রমথনাথ মিত্র (পি.মিত্র) ঢাকায় অনুশীলন সমিতির শাখা প্রতিষ্ঠা করে পুলিনবিহারী দাশ (১৮৭৭-১৯৪৯) কে পরিচালক করেন। কলকাতায় বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ (১৮৮০-১৯৫৯) অনুশীলন সমিতির মুখপাত্র হিসেবে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে যুগান্তর[৩৯] পত্রিকা প্রকাশ করেন। পরবর্তীতে আলীপুর ষড়যন্ত্র মামলাকে কেন্দ্র করে মতান্তর হওয়ায় যুগান্তর সংশ্লিষ্টরা পৃথকভাবে সশস্ত্র বৈপ্লবিক তৎপরতা শুরু করে। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে ৩০ এপ্রিল বিহারের মুজাফ্ফরপুর কিংস্ফোর্ড হত্যাপ্রচেষ্টার সূত্রধরে ইংরেজ সরকার ২১ মে আলীপুর ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে।[৪০] ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে ০৬ মে ঘোষিত রায়ে ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয় এবং **'একবার বিদায় দে মা, ঘুরে আসি'**-গানটি বাংলার শহরে-গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে গণমানুষের হৃদয়মনকে বিগলিত করে। এদিকে দেশে সশস্ত্রবৈপ্লবিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি পাওয়ায় পুলিনবিহারী দাশসহ ৫৫ জনকে গ্রেফতার করে সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যম, ডাকাতি ও নরহত্যার অভিযোগে ১৯১০ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলার বিচার আরম্ভ হয়।[৪১] বিচারে পুলিনবিহারী দাশ সাত বছরের কারাদন্ড এবং অন্যদের বিভিন্ন মেয়াদে সাজা হয়। 'বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির এহেন বৈপ্লবিক আন্দোলনের প্রচন্ডতায় ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের ১২ ডিসেম্বর এক ঘোষণায় বাংলা বিভাগ রদ করা হয়।[৪২] কিন্তু তবু বৈপ্লবিক আন্দোলন থামেনি।

এদিকে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় মুসলিম লীগ গঠিত হয় এবং বাংলা বিভাগ সমর্থন জানায়।[৪৩] কিন্তু বাংলা বিভাগ রদ করা হলে মুসলিম লীগও ব্রিটিশ বিরোধীতায় অগ্রণী হয়।[৪৪] কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ লক্ষ্ণৌ চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে সম্পর্কোন্নয়নের প্রচেষ্টা চালায়।[৪৫] ইতোমধ্যে ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের ২৮ জুলাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে জাতীয় কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকারকে সমর্থন দেয়।[৪৬] কিন্তু বিশ্বযুদ্ধের এই গোলমেলে পরিবেশকে কাজে লাগিয়ে বিপ্লবীরা স্বাধীনতা অর্জনের প্রচেষ্টা চালায়। এসময়

রাসবিহারী বসু (১৮৮৬-১৯৪৫) উত্তর-ভারত ও পাঞ্জাবে ব্রিটিশ ভারতের দেশীয় সৈন্যদের মধ্যে বিপ্লবী মতাদর্শ প্রচারপূর্বক তাদের মাধ্যমে ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি সেনা অভ্যুত্থানের দিন ধার্য করা হয়। কিন্তু কার্তার সিং নামক এক সৈন্যের বিশ্বাসঘাতকতায় সে পরিকল্পনা নস্যাৎ হয়ে যায়।[৪৭] রাসবিহারী বসু ছদ্মবেশ ধারণ করে জাপান চলে যান।[৪৮] অপরদিকে জার্মানির সহায়তায় ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের ০৯ সেপ্টেম্বর ভারতকে স্বাধীন করতে যেয়ে উড়িষ্যার বালেশ্বরে বুড়িবালামের তীরে কাপ্তিপোদায় এক সম্মুখযুদ্ধে প্রাণ দেন বিপ্লবী জ্যোতিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ওরফে বাঘা জ্যোতিন (১৮৭৯-১৯১৫) সহ চার বিপ্লবী।[৪৯] এদিকে ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে ০১ ডিসেম্বর কাবুলে রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ সিং (১৮৮৬-১৯৭৯) কে রাষ্ট্রপতি, অধ্যাপক মাওলানা বরকতুল্লাহ (১৮৫৪-১৯২৭) কে প্রধানমন্ত্রী এবং মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধি (১৮৭২-১৯৪৪) কে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী করে এক অস্থায়ী বিপ্লবী ভারতীয় সরকার শপথ নেয়।[৫০]

বাংলার প্রথম ও মূল গুপ্তসমিতি হলো কলকাতা অনুশীলন সমিতি। এ সমিতি হতে পরবর্তীতে ঢাকা অনুশীলন, যুগান্তর ও উত্তরবঙ্গ সমিতি গঠিত হয়। এ তিনটি সমিতি ক্রমশ বিস্তার লাভ করে সমগ্র বাংলাকে বৈপ্লবিক স্বাধীনতা সংগ্রামের বিস্তৃত ক্ষেত্রে পরিণত করে।[৫১] এদিকে ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে আলীপুর ষড়যন্ত্র মামলার পর ডিসেম্বর মাসে 'Criminal Law Amendment Act of 1908' আইন বলে ব্রিটিশ সরকার বাংলায় অনুশীলন সমিতি নিষিদ্ধ ঘোষণার সাথে সাথে সব শাখা পৃথক হয়ে যায়। একই সাথে কলকাতার আত্মোন্নতি সমিতি, সতিশচন্দ্র বসু প্রতিষ্ঠিত এ দলটি বিপিন বিহারীর দল নামে পরিচিতি পায়, অশ্বিনীকুমার দত্তের বরিশালের স্বদেশ বান্ধব সমিতি, ময়মনসিংয়ের হেমেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরীর সাধনা সমিতি, ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর সুহৃদ সমিতি ও ফরিদপুরের অম্বিকাচরণ মজুমদারের ব্রতি সমিতি নিষিদ্ধ করা হয়। অনুশীলন সমিতি বন্ধ করে দেয়ায় অনেকের মনে ক্ষোভের সঞ্চার হয়। আলিপুর মামলায় অরবিন্দকুমার ঘোষ (১৮৭২-১৯৫০) প্রমুখ শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের গ্রেফতার জনিত শূণ্যতায় যুগান্তর দলের নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (M.N.Roy), জ্ঞান মিত্র, সুধীররায় চৌধুরী, পাবনার অবিনাশ চক্রবর্তী ও অন্নদা কবিরাজের পাবনা সম্মিলনী প্রমুখ গুপ্তসমিতির নেতৃবৃন্দ এ অবস্থায় চুপচাপ বসে না থেকে জ্যোতিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যয়ের (বাঘাজ্যোতিন)[৫২] সাথে যোগাযোগ ক্রমে তাঁকে ব্রিটিশ সরকারকে উপযুক্ত শায়েস্তা করার নিমিত্তে নেতৃত্বগ্রহণের প্রস্তাব দেয়। এতে তিনি সম্মতি জ্ঞাপন করেন।[৫৩]

১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে অনুশীলন সমিতি নিষিদ্ধ করা হলে সমিতির নাম পরিবর্তন করে 'Bengal Youngmen’s Zamindary Co-Operative Society' নামকরণ এবং জজ সারদাচরণ

মিত্রকে এর সভাপতি করা হয়। বাহ্‌রার পর পুনরায় ডাকাতির অপরাধে প্রমথনাথ মিত্র (পি.মিত্র) ঢাকা অনুশীলন থেকে পুলিনবিহারী দাশকে বহিস্কার করেন।[৫৪] প্রকৃতপক্ষে মুরারি পুকুরের গুপ্তআড্ডায় অস্ত্রসংগ্রহ, বিপ্লবাত্মক কর্মপ্রয়াস বিশেষত; মুজাফফরপুর অভিযান বারীন ঘোষের নেতৃতেই সংগঠিত হয়। এতে সতীশচন্দ্র বসু এবং প্রমথনাথ মিত্র (পি.মিত্র) প্রত্যক্ষ সম্পর্ক দৃশ্যমান নয়। পরবর্তীকালে কলকাতা অনুশীলন সমিতির কর্মপ্রবণতা দেখা যায় না। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে ২৩ সেপ্টেম্বর প্রমথনাথ মিত্রের পি.মিত্র) মৃত্যুর সাথে সাথে সংস্থা হিসেবে কলকাতা অনুশীলন ক্রমশঃ স্তিমিত হয়ে পড়ে। কিন্তু মূল সমিতির শাখা, ঢাকা অনুশীলন সমিতি সুবিস্তৃত হয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে অনুশীলন সমিতি বলতে ঢাকা অনুশীলন সমিতিকেই বুঝায়। ঢাকা অনুশীলন সমিতিই পূর্ব ও উত্তর বাংলায়, কলকাতায় এবং বাংলার বাইরে আসাম, বিহার, পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ এবং পুনা শহরেও বৈপ্লবিক কর্মকান্ড সম্প্রসারণ করে।[৫৫] পুলিনবিহারী দাশ, মাখনলাল সেন, প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলি, মহারাজা ত্রৈকল্যনাথ চক্রবর্তী, নগেন্দ্রনাথ দত্ত ওরফে গিরিজা বাবু প্রমুখ এ দলের পরিচালক ছিলেন। পূর্ব বাংলাতেই এ দলের প্রায় ৫০০ এর অধিক শাখা ছিল বলে জানা যায়।

ইতোমধ্যে জ্যোতিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যয়ের (বাঘাজ্যোতিন) নেতৃত্বে বৈপ্লবিত কর্মকান্ড গতি পায়। তাঁর গতিশীল নেতৃত্বে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানদের সহায়তায় দেশব্যাপী এক বিদ্রোহ আয়োজন হয়। ইতোপূর্বে বাংলাদেশের সকল বিপ্লবী দলগুলোকে এক সংগঠনে শামিল করার চেষ্টা হয়। বাংলার অন্যান্য দল সে আহ্বানে সাড়া দিলেও ঢাকা অনুশীলন সমিতি ও কলকাতার বিপিন গাঙ্গুলীর দল এ উদ্যোগের বাইরে থাকলেও পুরোপুরি সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেয়। কার্যক্ষেত্রে সক্রিয় দলগুলো সকলেই এক সংগঠনের মধ্যে এসে যায়। বরিশাল দলের নিজস্ব সংগঠন, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ফরিদপুর, শ্রীহট্ট জেলায়।[৫৬] ময়মনসিংহের মণি চৌধুরী ও ক্ষিতিশ চৌধুরীর আগ্রহে ও চেষ্টায় ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে বরিশাল দলের নরেন ঘোষ চৌধুরী ও সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র ময়মনসিংহে চলে গিয়ে সাধনা সমিতির প্রধান হেমেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরীর সঙ্গে আলোচনা ক্রমে উভয় দল একদলে মিলিত হওয়ার সিদ্ধান্ত করেন।[৫৭] পাবনার অবিনাশ চক্রবর্তীর আগ্রহে উত্তর বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত যতীন রায়ের দলের সঙ্গে বরিশাল দলের প্রায় একসংস্থায় অন্তর্ভূক্ত হওয়ার মতো ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হয়। এছাড়া ফরিদপুরের পূর্ণচন্দ্র দাশের দল, বরিশাল দলের পূর্বে জ্যোতিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যয়ের (বাঘাজ্যোতিন) দলের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল বলে জানা যায়।[৫৮] কার্যত জ্যোতিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যয় (বাঘাজ্যোতিন) এই মিলিত দলের নেতা রূপে আভির্ভুত হন। যদিও ভোটের মাধ্যমে তিনি নেতা হননি; অপরিমেয় ত্যাগই তাঁকে ঐ পদে বরণ করে নেয়। এই দলগুলো কতকগুলি উপদলের সমষ্টি। তাঁদের নিজেদের আলাদা ইতিহাস, ঐতিহ্য, নেতৃত্ব ও শাসন-শৃঙ্খলা রয়েছে। কিন্তু দেশ মাতৃকার বৃহত্তর প্রয়োজনে একযোগে

কাজ করার প্রয়াসে একসূত্রে গ্রথিত হয়েছে।[৫৯] এই উপদলগুলো হচ্ছে: **(ক)** বরিশাল, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, শ্রীহট্ট জেলার শাখাসংগঠন নিয়ে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতি ও নরেন ঘোষ চৌধুরীর নেতৃত্বে গঠিত বরিশাল দল, **(খ)** ময়মনসিংহের হেমেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরী, সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, আনন্দ রায়, মণি রায়, ক্ষিতিশ চৌধুরী, নরেন চৌধুরী প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গের দ্বারা পরিচালিত সাধনা সমিতি। **(গ)** উত্তর বঙ্গের যতীন রায়, যোগেশদে সরকার, কালী বাগচী, বাদল দাশগুপ্ত প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গের দ্বারা পরিচালিত যতীন রায়ের দল। **(ঘ)** ফরিদপুরের পূর্ণচন্দ্র দাশ, চিত্তপ্রিয় রায়, মনোরঞ্জন সেন, নীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গের দ্বারা পরিচালিত পূর্ণদাশের দল।**(ঙ)** ইদিলপুরের নিখিলগুহ রায়ের দল এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ছড়ানো জ্যোতিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যয় (বাঘাজ্যোতিন), যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (M.N.Roy), অতুলকৃষ্ণ ঘোষ, হরিকুমার চক্রবর্তী, সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী, সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমূখ ব্যক্তিবর্গের নেতৃত্বাধীন জ্যোতিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যয়ের (বাঘাজ্যোতিন) দল।[৬০] আরো অনেক পরে ঢাকার হেমচন্দ্র ঘোষের (১৮৮৪-১৯৮০) বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স (বি.ভি.) এবং চট্টগ্রামের সূর্যকুমার সেনের (১৮৯৪-১৯৩৪) দল এ সম্মিলিত স্রোতধারায় শামিল হয় বলে উল্লেখ পাওয়া যায়।[৬১] এ ছাড়াও রাধিকামোহন রায়ের ফ্রেন্ডস ইউনাইটেড ক্লাব, সতিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ডন সোসাইটি, চন্দননগর-গোন্দলপাড়ার বসন্তকুমার প্রমুখের বান্ধব সম্মিলনী, হরিকুমার চক্রবর্তী প্রমূখের ২৪ পরগণা চিংড়িপোতা গ্রুপ, ইন্দ্রনন্দী ও নিখিলেশ্বর রায় মৌলিকের ছাত্র ভান্ডার, কলকাতার ললিতমোহন ঘোষালের স্বদেশ সেবক সমিতি, নদীয়া রানাঘাটের শক্তি সমিতি এবং যুবক সমিতি (কলকাতা)[৬২] প্রমূখ দল গুপ্ত সশস্ত্র বৈপ্লবিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করে বলে তথ্য পাওয়া যায়।

১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে রুশ বিপ্লবের প্রভাবে ভারতের বিপ্লবীদের মনে ভাবান্তর পরিলক্ষিত হয়। বিপ্লবীরা ক্রমে সশস্ত্র আন্দোলনের পথ পরিহার করে মার্কসবাদের দিকে ঝুকতে থাকে।[৬৩] লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার বন্দী, গদর আন্দোলন ও চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিবর্গ মার্কসবাদের দিকে আকৃষ্ট হন বলে জানা যায়। 'রুশ বিপ্লবের পর পরই ভারতে একটি স্ট্রাইক তরঙ্গ[৬৪] আরম্ভ হয় এবং ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের জন্ম হয়।[৬৫] এর প্রভাবে ভারতীয় বিপ্লবীরা বৈপ্লবিক কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলে এবং কৃষকসভা গঠিত হয়। এভাবে ভারতের জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মূলধারার ওপর অধিকতর বিপ্লবী কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনের প্রভাব পড়তে থাকে।

ভারত সরকার ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে ডিসেম্বরে বৈপ্লবিক আন্দোলন দমনের জন্য কুখ্যাত রাউলাট কমিটি গঠন করে।[৬৬] ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে প্রকাশিত সিডিশন কমিটির রিপোর্টে বলা হয়, বাঙালির

মতো আর কোনো জাতি ব্রিটিশকে এতো বিব্রত করেনি।[৬৭] পাঞ্জাব বাংলার সাথে বৈপ্লবিক কাজে অংশ নিলেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিক থেকে তাদের সে আগ্রহ থাকেনি। বাংলায়ও ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে সশস্ত্র বৈপ্লবিক কার্যক্রম স্তিমিত হয়ে পড়ে। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে মধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেমে যায়।[৬৮] কিন্তু ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের মার্চে সরকার রাউলাট আইন পাস করে[৬৯] বিপ্লবীদের ওপর দমন ও নিপীড়ন চালায়। ফাঁসি, যাবজ্জীবন, দীপান্তর, দীর্ঘকালীন কারাদন্ড ও বিনা বিচারে আটকের ফলে এই সময় বৈপ্লবিক আন্দোলন পরাভূত হয়।[৭০] এদিকে যুদ্ধজয়ের আনন্দে 'মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড রিফর্ম' জারি করে সরকার বিনা বিচারে আটক রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তিদানের ব্যবস্থা করে। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে মধ্যেই বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ ঘরে ফিরে দেখেন ভারতের রাজনৈতিক গগণে আবির্ভূত হয়েছেন আন্দোলনের মধ্যমণি মহাত্মা গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮)।[৭১] এসময় অধিকাংশ বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ আন্দোলনের কৌশল হিসেবে কংগ্রেসে যোগদান করে গণসংযোগ করার সিদ্ধান্ত নেন। বন্ধুদেরকে গুপ্ত-সমিতি পুনর্গঠনের কাজ সংগোপনে চলমান রাখতে এবং কোনো সশস্ত্র সংগ্রাম পরিহার করতে বলেন।[৭২] এভাবে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ অবধি অতিসংগোপনে বৈপ্লবিক কার্যক্রম চলে।

এদিকে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ১৮ এপ্রিল বিপ্লবী সূর্যকুমার সেনের নেতৃত্বাধীন চট্টগ্রামরে অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করে ব্রিটিশ পতাকা নামিয়ে ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার ঘোষণা করা হয়।[৭৩] ওদিকে ০৮ ডিসেম্বর প্রকাশ্য দিবালোকে বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষের বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স (বি.ভি.) দলের কর্মী বিনয়কৃষ্ণ বসু, বাদল গুপ্ত ও দিনেশ গুপ্ত কলকাতা রাইটার্স বিল্ডিং আক্রমণসহ[৭৪] বিভিন্ন সশস্ত্র বৈপ্লবিক কার্যক্রম শেষাবধি ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের দিকে স্তিমিত হয়ে যায়। একমাত্র বাংলায় এ সশস্ত্র বৈপ্লবিক তৎপরতা প্রায় চল্লিশ বছর (১৯০৬ থেকে ১৯৪৬ খ্রি. ১৮ ফেব্রুয়ারির নৌবিদ্রোহ অবধি) নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর (১৮৯৭-১৯৪৫) নেতৃত্বাধীন আজাদ হিন্দ ফৌজের বৈপ্লবিক কর্মকান্ডের অভিঘাত এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতি মিটিয়ে বৃটেনের পক্ষে ভারতে শাসনকার্য পরিচালনা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠে। পরিস্থিতি বিবেচনায় ব্রিটিশ সরকার ভারত ত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।[৭৫] এভাবে বাঙালির সশস্ত্র বৈপ্লবিক আন্দোলন সফলতার দ্বারপ্রান্তে উন্নীত হয়।

নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির সহচর হিসেবে উপর্যুক্ত পরিস্থিতিতে বিপ্লবী মধ্যবিত্ত শ্রেণির আন্দোলনের ফসল কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ তাদের নিজেদের পক্ষে নেয়ার দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়। অবশেষে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ আগস্ট স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির সশস্ত্র বৈপ্লবিক তৎপরতার অভিঘাতে স্বাধীনতা অর্জিত হলেও শেষাবধি তাদের কাঙ্ক্ষিত সেই স্বাধীনতা সাম্রাজ্যবাদের ক্রীড়নক ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের ওপর বর্তায়। এহেন

যুগান্তকারী ঘটনায় বিপ্লবীদের কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতার স্বপ্ন ভূলুণ্ঠিত হয়; যা ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং বিষয়টি বিশদ গবেষণার দাবি রাখে।

মধ্যবিত্ত শ্রেণি

মধ্যবিত্ত শ্রেণির সংজ্ঞা নির্ধারণ একটি জটিল বিষয়। সাধারণ অর্থে 'বুর্জোয়া' এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণি সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ফরাসি 'বুর্জোয়া' শব্দের অর্থ নাগরিক, মধ্যবিত্ত শ্রেণি বা ব্যবসায়ী। ইংল্যান্ডে পুঁজিবাদী অর্থনীতি ও সমাজ বিকাশের প্রাথমিক স্তরে বুর্জোয়ারাই মধ্যবিত্ত শ্রেণি হিসেবে বিবেচিত হতো। এর কারণ ছিল বুর্জোয়ারা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কল্যাণে সম্পদশালী হতো। অপরদিকে ভূস্বামীরা ছিল ভূমি নির্ভর। সুতরাং ভূমি নির্ভর না হয়ে স্বাধীন অবস্থান গ্রহণ করায় সেখানকার বুর্জোয়ারা মধ্যবিত্ত শ্রেণি হিসেবে অভিহিত হতো।[৭৬] কিন্তু পরবর্তীকালে ইংল্যান্ড বা অন্যান্য রাষ্ট্রে এমনকি বর্তমান যুগের ভারতেও বুর্জোয়ারা সর্বোচ্চ মর্যাদা ভোগকারী একটি প্রভাবশালী শ্রেণি। ফলে সেসব দেশে এখন মধ্যবিত্ত শ্রেণি বলতে পাতি বুর্জোয়াদেরকে বোঝায়।[৭৭] সে অর্থেই আমরা ঔপনিবেশিক বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে বুঝাতে চাই।

ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে 'মধ্যবিত্ত' হলো তাঁরা যারা ধর্মযাজকও নন এবং রাজবংশীও নন; কিন্তু শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ব্যবসা বাণিজ্যের বিনিময়ে প্রয়োজনীয় ধন-সম্পদ আহরণ করে থাকেন। সামন্ততান্ত্রিক সমাজে 'মধ্যবিত্ত' বলতে ব্যবসায়ী ও কেরানি শ্রেণিকে বুঝাতো। আর ধনতান্ত্রিক সমাজে মধ্যবিত্ত শ্রেণি বলতে তাদের বুঝায় যারা ভূমি থেকে প্রাপ্ত আয় দ্বারা ব্যয় নির্বাহ করতো। ষোড়শ থেকে সপ্তদশ শতকের রেনেসাঁস-উত্তর ইংল্যান্ডে এভাবেই মধ্যবিত্ত শ্রেণির সূচনা হয়। 'A Dictionary of Social Science'-উল্লিখিত সংজ্ঞানুসারে উচ্চবিত্ত ও শ্রমিকশ্রেণির মাঝামাঝি স্তরে মধ্যবিত্তশ্রেণি অবস্থান করে।[৭৮] এই বিভক্তিকে নিদিষ্ট কোন রেখা দ্বারা চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। তবে Columbia Encyclopaedia- তে মধ্যবিত্ত বলতে জমিদার ও কৃষকদের মধ্য অবস্থিত শ্রেণিকে নির্দেশ করা হয়েছে।[৭৯]

পাশ্চাত্য সমাজবিজ্ঞানী গ্রেটেনের মতে, সমাজের সেই শ্রেণিকেই আমরা মধ্যবিত্ত বলতে পারি, মুদ্রাই যাদের জীবনের প্রধান নিয়ামক এবং মুদ্রাই যাদের প্রাথমিক এবং নির্ভরযোগ্য অবলম্বন। এদের মধ্যে জমিদার ও কৃষকের কোন স্থান নেই, কেননা এদের জীবন যাত্রার প্রধান অবলম্বন হলো ভূমি, মুদ্রানয়।[৮০] অতএব অর্থই মধ্যবিত্তের সামাজিক নিরাপত্তা ও পদমর্যাদা নির্ধারণ করে থাকে। সমাজ বিজ্ঞানী *কার্ল মার্কসের* (Karl Marx) মতে, এশ্রেণিটি প্রধানত অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল শ্রেণির উপর

নির্ভরশীল হয়ে উচ্চবিত্তের আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান করে থাকে। কায়িক শ্রম পরিহার করে অপরের শ্রম থেকে এই শ্রেণিটি অর্থ উপার্জন করে থাকে এবং উচ্চবিত্তের বিপরীতে যেকোনো ধরণের আন্দোলনকে নিজেদের স্বার্থে সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় করে দিতে পারে।[৮১] তবে সাধারণভাবে এরূপ ধারণা করা হয় যে, প্রতিটি শ্রেণিবিভক্ত সমাজেই উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণির মাঝে অস্তিত্বশীল ও ক্রিয়াশীল অভিন্ন স্বার্থের শ্রেণিটিই হলো মধ্যবিত্ত শ্রেণি। আসলে সম্পদ যাদের বেশি নয় আবার একেবারে কমও নয় তারাই মধ্যবিত্ত। এ শ্রেণির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এরা সেকুলার শিক্ষা ব্যবস্থা পছন্দ করে এবং সন্তানের জন্য বিশেষ যত্নবান হয়।[৮২] প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী নাজমুল করিমের মতে, মধ্যবিত্ত শ্রেণির শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ থাকা বাঞ্চনীয়।[৮৩] ড.আব্দুল্লাহ ফারুকের মতে, মধ্যবিত্ত তারাই যাদের পরিবারে শিক্ষা আছে, আশ্রয় আছে এবং যারা রাজনৈতিকভাবে সচেতন।[৮৪] গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া'র মতে, মধ্যবিত্ত শ্রেণী হলো সমাজের সেই স্তর যা অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থানের দিক থেকে উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্তের মধ্যবর্তী অবস্থানে থাকে।[৮৪(ক)]

আধুনিক গবেষক বি.বি.মিশ্রের (১৯৬১খ্রি.) মতে, সম্পদের দিক দিয়ে শীর্ষস্থানে অবস্থানরত ব্যক্তিবর্গকে বাদ দিয়ে যারা ব্যবসায়ীশ্রেণি ও তাদের সহায়ক চাকরিজীবী শ্রেণি, তাদেরকে মধ্যবিত্ত শ্রেণি বলা যায়।[৮৫] সুতরাং মধ্যবিত্ত শ্রেণি বলতে আমরা তাদের বুঝি, যারা শিক্ষিত, রুচিবোধ সম্পন্ন, সমাজ ও রাজনীতি সচেতন, জীবনবোধ সম্পন্ন, উপার্জনের অর্থে চাহিদা মেটাবার ক্ষমতা রাখে, আর যাদের জীবনে থাকে কিছু স্বপ্ন এবং সে সাথে উচ্চশ্রেণিতে আরোহনের দুর্বার আকাঙ্ক্ষা।

বিপ্লব-ধারণা

সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে একটি দেশ স্বাধীন করার বা একটি সরকারকে তার স্বৈরাচারী কর্মকান্ডের কারণে উৎখাতের জন্য যে গোপন তৎপরতার সূত্রপাত ঘটে তাই সশস্ত্র বিপ্লব নামে অভিহিত। বিপ্লবের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Revolution' শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ 'Revolutio' থেকে। শব্দটির ইংরেজি অর্থ- 'a turnd around' বলতে বুঝায়, রাজনৈতিক ক্ষমতা বা প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে একটি মৌলিক ও সামাজিক পরিবর্তন যা তুলনামূলক ভাবে সংক্ষিপ্ত সময়ে ঘটে; জনগণ যখন চলমান কর্তৃপক্ষের বিরূদ্ধে বিদ্রোহ করে জেগে উঠে।[৮৬] এ সম্পর্কে বিপ্লবী হেমচন্দ্র কানুনগো তাঁর বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, ইংরেজি 'Revolution' শব্দটির মাধ্যমে বাংলায় বিপ্লব বা বৈপ্লবিক কার্যক্রমকে চিহ্নিত করা হয়। ইতিহাসে 'Revolution' শব্দটি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। কোন দেশের শাসন-প্রণালী যদি হঠাৎ কোন *ভীষণ* (Voilent) উপায়ে আমূল পরিবর্তিত হয়, যদি সেই পরিবর্তন সে দেশের জনসাধারণের সাহায্যে বা চেষ্টায় সাধিত হয়। যদি পরিবর্তিত শাসনকার্যে সে

দেশের জনসাধারণের সম্যক অধিকার লাভ হয়; তবে সেই পরিবর্তনকে *বিপ্লব* (Revolution) বলা হয়ে থাকে।[৮৭] কিন্তু বিপ্লবের চেষ্টাজনিত সংঘর্ষের পরিণামে যদি ওই প্রকার পরিবর্তন সাধিত না হয়, তবে কেবল পরিবর্তন আনবার চেষ্টাকে *বিপ্লব* (Revolution) বলা যায়না। আর এই চেষ্টার ফলে যদি শাসন প্রণালীর কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন সাধিত না হয়ে কেবলমাত্র শাসনকর্তার পরিবর্তন ঘটে; তবে সে অবস্থাকেও *বিপ্লব* (Revolution) নামে অভিহিত করা যাবেনা।[৮৮]

ফরাসি বিপ্লবের ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি, যদিও ফরাসি কৃষকদের অর্থনৈতিক অবস্থা জার্মানি, রুশ বা ইংল্যান্ডের কৃষকদের তুলনায় তখনও কিছুটা ভালো ছিল বলা চলে, তবুও তারাই বিপ্লবের আগুন প্রজ্জ্বলিত করেছিল। যাদের হাতে রাষ্ট্র ক্ষমতা ছিল–সেই তিন লক্ষ সুবিধাভোগী পাদ্রি ও অভিজাত বর্গের অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে দু'কোটি দুঃস্থ দরিদ্র মানুষ বিপ্লব সংগঠিত করলো।[৮৯] সর্বোপরি বিপ্লব বলতে বুঝায়, স্বাভাবিক পন্থায় যে সকল অধিকার স্বীকৃত নয়, পূর্বে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ছিল কিন্তু কৌশলে তা কেড়ে নেয়া হয়েছে; মৌল মানবাধিকার ঔপনিবেশিক শৃঙ্খলে বন্দি। সকল অধিকার অর্জন তথা হৃত স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার কল্পে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থাকে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে এই দেশ ত্যাগে বাধ্য করত; মধ্যবিত্ত শ্রেণির নেতৃত্বে বাঙালির স্বাধিকার তথা ভারতীয় স্বাধীনতা অর্জনের রক্তাক্ত পথ-পরিক্রমাকে বিপ্লব অভিহিত করে আলোচ্য অভিসন্দর্ভ রচনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

বাঙালির জাতীয় জীবনে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর যুগান্তকারী ঘটনার ফলে বাঙলায় ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ক্ষমতা লাভের মধ্য দিয়ে বাঙলায় বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। উনিশ শতকের প্রথম দিকে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণি নবজাগরণ বা রেনেসাঁ আন্দোলনের চেতনায় সর্বভারতীয় কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ গঠন করে। লর্ড কার্জন কর্তৃক ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলা প্রদেশকে বিভক্ত করার প্রতিবাদে কংগ্রেস বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন শুরু করে। পর্যায়ক্রমে অনুশীলন ও যুগান্তর গুপ্তদল গঠনের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র বৈপ্লবিক তৎপরতা শুরু হয়। অবশেষে ব্রিটিশ সরকার ভারত ত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ আগস্ট ভারত স্বাধীন হয়। স্বাধীনতা অর্জনে জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি ও কূটনীতির পাশাপাশি বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিপ্লবীদের ভূমিকা অনুসন্ধান ও সশস্ত্র বৈপ্লবিক তৎপরতার প্রায়োগিক দিকটি বিশদভাবে তুলে ধরাই হবে প্রস্তাবিত গবেষণার উদ্দেশ্য। যদিও এতদসংক্রান্ত 'বই-পুস্তকে বাঙালির বিপ্লব প্রচেষ্টার ইতিহাসকে ১৯০৬ থেকে ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত[৯০] সীমারেখা টানা হয়েছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা ১৯০৫-১৯৪৬

খিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রসারিত করা উচিৎ বলে মনে করি। এ বিষয়ে তথ্য অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ উপস্থাপন করাও গবেষণার অন্যতম উদ্দেশ্য।

গবেষণার পরিধি

আলোচ্য গবেষণার সময় সীমা ১৮৫৮-১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত প্রায় একশত বছর (৮৯বছর)। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের ০২ আগস্ট ব্রিটিশ সংসদে ভারত শাসন আইন পাসের মাধ্যমে ভারতে প্রায় একশ বছরের কোম্পানি শাসনের অবসান ঘটে এবং ব্রিটিশ সরকার সরাসরি ভারতবর্ষের দায়ভার গ্রহণ করে। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারত স্বাধীনতা লাভ করে এই গুরুত্ব বিবেচনায় উপর্যুক্ত সময়সীমা বেছে নেওয়া হয়েছে।

মূলত ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহ বা প্রথম সশস্ত্র স্বাধীনতা আন্দোলনে ব্যর্থতার পর বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে নবজাগরণ মথিত ব্রিটিশ বিরোধী চিন্তা-চেতনার সঞ্চার ঘটে এবং ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস গঠন, লর্ড কার্জন কর্তৃক ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ১৬ অক্টোবর বাংলা বিভাগ কার্যকরের বিরুদ্ধে বিপ্লবী চেতনা গতিলাভ করে সে বিষয়ে আলোকপাত করা হবে। অনুশীলন ও যুগান্তর গুপ্তদল গঠন এবং ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের ২১ মে আলিপুর বোমা মামলা সহ ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের ১২ ডিসেম্বর ব্রিটিশ সরকার বাংলা বিভাগ রদ করে; যা আলোচনায় আসবে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সুযোগ ব্যবহার করে সেনাবাহিনীর মাধ্যমে অভ্যুত্থান প্রচেষ্টার ব্যর্থতা এবং জার্মান অস্ত্রসংগ্রহের জন্য ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে উড়িষ্যার বুড়িবালামে ব্রিটিশ পুলিশের সাথে বিপ্লবীদের অসম সংঘর্ষ, লক্ষ্ণৌ চুক্তি (১৯১৬), ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী পাঞ্জাবের জালিয়ান-ওয়ালাবাগ হত্যাকান্ড; খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন (১৯১৯-১৯২২); কংগ্রেসের আহমেদাবাদ অধিবেশন (১৯২১) সহ বেঙ্গলপ্যাক্ট (১৯২৩); চট্টগ্রাম বিদ্রোহ (১৯৩০); ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ভারতশাসন আইনের প্রেক্ষাপট; ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচন সহ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের ১৭ জানুয়ারি থেকে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের ১৮ আগস্ট মৃত্যু অবধি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর বৈপ্লবিক কর্মকান্ড সহ তৎপরবর্তী ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের নৌ বিদ্রোহ এবং ঠিক কোন পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ সরকার ভারত ত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তা আলোচনায় আসবে। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ এবং ১৫ আগস্ট যথাক্রমে পাকিস্তান ও ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। সর্বোপরি জাতীয় কংগ্রেস, ভারতীয় মুসলিম লীগ এবং বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির সশস্ত্র বৈপ্লবিক তৎপরতার তুলনামূলক বিশ্লেষণ-পূর্বক ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে তাদের ভূমিকা পর্যালোচনা করা হবে।

গবেষণার পদ্ধতি

প্রস্তাবিত গবেষণাটি *সমন্বিত পদ্ধতিতে* (Mixed Method) পরিচালিত হবে, যাতে গবেষণার দুটি মৌলিক পদ্ধতি যথা-*গুণাত্মক গবেষণা পদ্ধতি* (Qualitative Research) ও *পরিমাণগত গবেষণা পদ্ধতি* (Quantative Research) অনৃসৃত হবে।

গবেষণাকর্মটিতে গুণগত গবেষণা পদ্ধতির অংশ হিসেবে ঐতিহাসিক গবেষণা পদ্ধতির প্রয়োগ করা হবে। অতীতের কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের নিরিখে পরিচালিত গবেষণাই ঐতিহাসিক গবেষণা।[৯১] তাই বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির বৈপ্লবিক চিন্তা ও চেতনার বিকাশধারা (১৮৫৮-১৯৪৭) কালক্রমিক গবেষণা হিসেবে ঐতিহাসিক গবেষণা পদ্ধতিতে পরিচালিত হবে। এই পদ্ধতিতে গবেষণা কর্মে সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত বিচার-বিশ্লেষণ ও বাছাই করে গবেষণার অভীষ্ট লক্ষ্যে ধাবিত হয়। নির্বাচিত বিষয় সম্পর্কে তথ্য প্রাপ্তির সঠিক উৎস চিহ্নিত করা এই পদ্ধতির একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। ঐতিহাসিক গবেষণা প্রেক্ষাপটে প্রাথমিক উৎস হিসেবে বিভিন্ন সরকারি দলিল-দস্তাবেজ ও বিভিন্ন অফিস আদালতের চিঠি-পত্র গ্রহণ করা হবে। কেননা ঐতিহাসিক গবেষণায় প্রাথমিক উৎস বা মূল উৎস বলতে তথ্যের এমন কোন উৎসকে বোঝায় যা অধীত ঘটনা ঘটার সময়ে সৃষ্টি হয়েছিল। সামাজিক গবেষণা বিবেচনায় দলিল-দস্তাবেজ দ্বৈতীয়িক উৎস হলেও এ গবেষণায় প্রাথমিক উৎস। কেননা বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, ঐতিহাসিক সাহিত্য, বিদেশিদের বিবরণ, স্মৃতিকথা, সরকারি-বেসরকারি দলিল-দস্তাবেজ, আর্কাইভাল রেকর্ডস ইত্যাদি ঐতিহাসিক গবেষণায় তথ্য-উপাত্ত ও উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়।[৯২] সর্বোপরি, ঐতিহাসিক গবেষণার উৎস সমূহ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ইতোপূর্বে সম্পন্ন গবেষণাকর্ম সমূহ থেকে সহায়তা নেওয়া হবে।

আলোচ্য গবেষণাকর্মটি সম্পাদনে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ ও বিপ্লবীদের ঘনিষ্টজন, বিভিন্ন রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কাজে যুক্ত ও তাঁদের ওপর গবেষণা করেছেন এমন গবেষক ও বিভিন্ন রাষ্ট্র দার্শনিকদের মধ্য থেকে দৈব চয়ন ভিত্তিতে মূখ্য সংবাদদাতার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হবে। তাঁদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্য, বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ ও বিপ্লবীদের রচিত বিভিন্ন গ্রন্থাদি, সরকারি দলিল-দস্তাবেজ ও তথ্যাদি ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে বর্ণনা, পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন করা হবে।

সংগৃহীত তথ্য-উপাত্তের পর্যালোচনা, তথ্য-উপাত্তের নির্ভরযোগ্যতা যাচাই, যাচাইকৃত তথ্য সমূহের মূল্যায়ন, তথ্য-উপাত্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং নতুন তথ্য উদ্‌ঘাটনের মাধ্যমে গবেষণাকর্মটিকে সম্পাদন

করে বাঙালির বৈপ্লবিক চিন্তা ও চেতনার প্রসারতায় গণতান্ত্রিক অগ্রগতি বিনির্মাণ ও অর্জনে ভূমিকা মূল্যায়নের প্রয়াস নেয়া হবে। সর্বোপরি এই গবেষণায় গবেষকের ব্যক্তিগত অবস্থান ও অভিলক্ষ্য অনুধাবনে *বর্ণনামূলক পদ্ধতি* (Descriptive Method) ও *বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি* (Analytical Method) অনুসরণ করা হবে।

সাহিত্য পর্যালোচনা

বর্তমান গবেষণা ক্ষেত্রের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মধ্যবিত্ত শ্রেণি এবং তাদের বৈপ্লবিক চিন্তা-চেতনার ক্রমবিকাশ ও বৈপ্লবিক কর্মপ্রয়াস। আধুনিক মধ্যবিত্ত শ্রেণির কার্যক্রম সম্পর্কে গবেষণার জন্য একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হলো- B.B.Misra কর্তৃক রচিত ***'The Indian Middle Classes:Their Growth in Mordern Times'***। গ্রন্থটি ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি, লন্ডন থেকে প্রকাশিত। গ্রন্থটিকে চারভাগে বিন্যস্ত করা হয়েছে। **প্রথম ভাগের** দুটি অধ্যায়ে প্রাক ব্রিটিশ যুগের ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার উপর আলোকপাত এবং **দ্বিতীয় ভাগের** ৫টি অধ্যায়ে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে গড়ে ওঠা ভারতবর্ষের মধ্যবিত্ত শ্রেণি সমূহের (বাণিজ্যিক, শিল্পভিত্তিক, ভূমিকেন্দ্রিক ও শিক্ষিত) বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে। **তৃতীয় ভাগের** ৪ টি অংশে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের সিপাহী বিপ্লবোত্তর ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ অবধি ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকাল পর্যন্ত ব্রিটিশ নীতি আলোচিত হয়েছে। এই গ্রন্থের **চতুর্থ ভাগটি** খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখানে দুটি অধ্যায়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণির ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বাদশ অধ্যায়ে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ পূর্ব পর্যন্ত এবং ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ১৯০৫ থেকে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণির ভূমিকা সম্পর্কে ধারাবাহিক ও তথ্যবহুল আলোচনা ওঠে এসেছে। তবে এখানে মধ্যবিত্ত শ্রেণির বৈপ্লবিক কর্মকান্ড সম্পর্কে কোনো আলোকপাত করা হয়নি; যা গ্রন্থটির সীমাবদ্ধতা।

Arabinda Poddar এর ***'Renaissance in Bengal Quests and Confrontations (1800-1860)'*** গ্রন্থটি ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব অ্যাডভান্স স্টাডি, সিমলা থেকে প্রকাশিত। লেখক গ্রন্থটিতে রাজা রামমোহন রায়ের চিন্তাধারা, ডিরোজিও এর কর্মকান্ড, ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের সৃষ্টিশীলতার বর্ণনাসহ বঙ্গীয় রেনেসাঁসের সাথে শহুরে মধ্যবিত্ত অভিজাত সম্প্রদায়ের সম্পর্ক নির্ণয় করা হয়েছে-যা প্রশংসার দাবি রাখে। গ্রন্থটিতে ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দ পরবর্তী রেনেসাঁস ব্যক্তিবর্গ এবং বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির বৈপ্লবিক কর্মকান্ড সম্পর্কেও কোনো আলোকপাত করা হয়নি।

David Kopf কর্তৃক রচিত ***'Britsh Orientalism and the Bengali Renaissance'*** গ্রন্থটি ১৯৬৯ খ্রি. ফার্মা কে.এল মুখোপাধ্যায়,কলকাতা থেকে প্রকাশিত। গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের সাংস্কৃতিক

নীতি, লর্ড ওয়েলেসলির 'প্রাচ্যের অক্সফোর্ড সংক্রান্ত বিবরণ, বাংলায় রেনেসাঁস ধারণার বিকাশ এবং লর্ড মেকলের নীতি সম্পর্কে আলোকপাত করা হলেও গ্রন্থটিতে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির বৈপ্লবিক কর্মকান্ড সম্পর্কেও কোনো তথ্য উল্লিখিত হয়নি।

Susobhan Sarkar এর ***'On the Bengal Renaissance'*** গ্রন্থটি ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ প্যাপিরাস, কলকাতা থেকে প্রকাশিত। ১০ টি অধ্যায়ে বঙ্গীয় রেনেসাঁস ও এর অভ্যন্তরীন দ্বন্দ্ব, রাজা রামমোহন রায়ের চিন্তাধারা, ডেভিড হেয়ার, ডিরোজিও এবং ইয়ংবেঙ্গল দল ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৃষ্টিভঙ্গী আলোচনা করা হলেও গ্রন্থটিতে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির বৈপ্লবিক কর্মকান্ড সম্পর্কেও আলোকপাত করা হয়নি।

Sirajul Islam রচিত ***'The Permanent Settlement in Bengal' A Study of its Operation'*** **(1790-1819)** গ্রন্থটি ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত। এটি লেখকের পিএইচডি অভিসন্দর্ভের গ্রন্থরূপ। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইনের প্রতি বাংলার জমিদারদের দৃষ্টিভঙ্গী,বড় বড় জমিদারির পতন, ভূমির সাথে সম্পর্কহীন জমিদার গোষ্ঠীর সৃষ্টি সম্পর্কে আলোকপাত করা হলেও গ্রন্থটিতে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির সশস্ত্র বৈপ্লবিক কর্মকান্ডের বর্ণনা অনুপস্থিত।

আমাদের আলোচ্য বিষয়রে উপর একটি দিক নির্দেশনামূলক গ্রন্থ হলো গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া'র ***'বাংলায় মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ।*** গ্রন্থটি ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তথ্যবহুল এ গ্রন্থটি লেখকের পিএইচডি অভিসন্দর্ভের গ্রন্থরূপ। লেখক সমকালীন বাংলার মুসলমানদের আর্থসামাজিক, শিক্ষা, সাংস্কৃতিক ও প্রশাসনিক অংশীদারিত্বের একটি সচিত্র প্রতিবেদন তাঁর গবেষণায় তুলে ধরে বিশেষতঃ বাঙালি মধ্যবিত্ত এবং পরে বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্তের উদ্ভব ও বিকাশ নিয়ে নির্মোহ আলোচনা করেছেন; যা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। তবে গ্রন্থটিতে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির মন-মনন ও সশস্ত্র বৈপ্লবিক কর্মকান্ড সম্পর্কে তথ্য অপ্রতুল।

সুপ্রকাশ রায় কর্তৃক রচিত ***'ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম'*** গ্রন্থটি ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে র‍্যাডিক্যাল ইমপ্রেশন, কলকাতা থেকে প্রকাশিত। এ গ্রন্থটিতে লেখক অত্যন্ত সুন্দর ও স্পষ্টভাবে বঙ্গীয় রেনেসাঁসের প্রকৃতি তুলে ধরার সাথে সাথে রেনেসাঁসের প্রবক্তাগণের মধ্যকার স্ববিরোধিতার ইঙ্গিত দিয়েছেন। বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির বৈপ্লবিক কর্মকান্ডের তথ্যও গ্রন্থটিতে অনুপস্থিত।

সুপ্রকাশ রায়ের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ একটি গ্রন্থ হলো ***'ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস'***। গ্রন্থটি ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে ডিএনবি ব্রাদার্স, কলকাতা থেকে প্রকাশিত। এ গ্রন্থটিতে ভারতবর্ষের বিশ শতকের বৈপ্লবিক সংগ্রাম ও শ্রেণি সংগ্রাম সম্পর্কে লেখক ব্যাখ্যা করার সাথে সাথে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস উল্লিখিত হলেও গ্রন্থটি রচনায় সুস্পষ্ট কোন গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় নি।

মুসা আনসারী কর্তৃক রচিত একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হলো ***'ইতিহাস সমাজ ও সংস্কৃতি ভাবনা'***। গ্রন্থটি ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত। লেখক ইউরোপীয় রেনেসাঁসের উদ্ভব ও বিকাশক্রম, উনিশ শতকে বঙ্গীয় বুদ্ধিজীবী সমাজের উদ্ভব, বিকাশ ও তাদের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে আলোকপাত করা হলেও গ্রন্থটিতে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির সশস্ত্র বৈপ্লবিক কর্মকান্ড সম্পর্কিত কোনো তথ্য উল্লিখিত হয়নি।

আবদুল বাছির রচিত ***'বাংলার কৃষক বিদ্রোহ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণি'*** আলোচ্য গবেষণার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। এটি ২০১২ খ্রিস্টাব্দে বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত। গ্রন্থটি লেখকের পিএইচডি অভিসন্দর্ভের গ্রন্থরূপ। সাতটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত উক্ত গ্রন্থটির মাধ্যমে মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব ও বিকাশ, তাদের আচরণ ও মন-মানসিকতা সম্পর্কে লেখকের স্বচ্ছ ও বিশ্লেষণধর্মী চিন্তা ও চেতনা ফুটে উঠেছে। তবে কৃষক বিদ্রোহীদের গণচেতনা প্রসূত যে প্রভাব যা বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিপ্লবীরা আত্মস্থ করেছিল তা অতি সংক্ষেপে গ্রন্থটিতে উল্লিখিত হয়েছে।

সুশোভন সরকার কর্তৃক রচিত ***'বাংলার রেনেসাঁস'*** গ্রন্থটি ১৩৩৭ বঙ্গাব্দে দীপায়ন, কলকাতা থেকে প্রকাশিত। গ্রন্থটিতে বাংলার রেনেসাঁস বিধৌত চেতনায় ব্রাহ্মসমাজের সদস্যগণের বিভিন্ন প্রাগ্রসর চিন্তা ও চেতনার ধারাবাহিকতায় নবীন ব্রাহ্মরা একপর্যায়ে রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে স্বাধীনতার বৈপ্লবিক কর্মসূচি গ্রহণের আহ্বান জানান। নবগজাগরণ বিধৌত বাঙালির এ বিপ্লবী চেতনাই ভারতের স্বাধীনতার আলোকবর্তিকা যা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পরিসরে এ গ্রন্থটিতে উল্লিখিত হয়েছে।

Amiya K. Samanta এর সম্পাদনায় এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক ***Terroririsom in Bengal: A Collection of Documents on Terrorist Activities From 1905 to 1939*** গ্রন্থটি ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত। ০৬ খন্ডের গ্রন্থটি বৈপ্লবিক তথ্যে পরিপূর্ণ হলেও এতে ধারাবাহিকতার অভাব লক্ষনীয়। যদিও গ্রন্থটিতে বাংলার বৈপ্লবিক তৎপরতাকে ব্রিটিশ বিরোধীতা

হিসেবে দেখানো হয়েছে, যা সর্বাংশে সঠিক নয়। কেননা এ তৎপরতায় বিপ্লবীদের স্বাদেশিক চিন্তা-চেতনার প্রকাশ ছিল।

ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায় কর্তৃক রচিত ***'ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব'*** *গ্রন্থটি* ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা থেকে প্রকাশিত। লেখক গ্রন্থটিতে ১৮৯৭ থেকে ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতে এবং বর্হিভারতে সংঘটিত বৈপ্লবিক নানা ঘটনার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং বহু অজ্ঞাত তথ্যের সমাবেশ ঘটিয়েছেন যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আলোচ্য গবেষণাকর্মকে তথ্যবহুল করতে গ্রন্থটি খুবই সহায়ক হবে।

নলিনীকিশোর গুহ কর্তৃক রচিত ***'বাংলায় বিপ্লববাদ'*** *গ্রন্থটি* ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা থেকে প্রকাশিত। ছোট ছোট শিরোনামের মাধ্যমে বাংলার বৈপ্লবিক ইতিহাস সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা পাওয়া যায়। তবে গ্রন্থটিতে ধারাবাহিকতার অভাব পরিলক্ষিত হয়।

রমেশচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক রচিত ***'বাংলা দেশের ইতিহাস'*** চতুর্থ খন্ড (মুক্তি সংগ্রাম) *গ্রন্থটি* ২০২১ খ্রিস্টাব্দে দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। লেখক উনিশ শতকের শেষভাগে কলকাতার বিভিন্নস্থানে আখড়া স্থাপনের বিবরণসহ অনুশীলন ও যুগান্তর সমিতি প্রতিষ্ঠার তথ্যাবলি উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ বিপ্লবীর সাক্ষাৎ লাভ করতে না পারা এবং বিভিন্ন বিপ্লবীর রচনা অপ্রকাশিত থাকায় বিপ্লবের পূর্নাঙ্গ ইতিহাস রচনা করা সম্ভব হয়নি। প্রস্তাবিত গবেষণাকর্মের সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে গ্রন্থটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আবুল কালাম এর ***'সুভাষ বসুর রণনীতি ও কূটনীতি'*** গ্রন্থটি ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত। গ্রন্থটিতে সুভাষচন্দ্র বসুর বাঙালি জাতীয়তাবাদ নয়; বরং তাঁর সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদ পরিলক্ষিত হয়। এক্ষেত্রে তাঁর কূটনৈতিক প্রজ্ঞা-রণনীতি ও রণকৌশল একই সঙ্গে ভারতের মুক্তি অর্জনে গৃহীত সাংগঠনিক কাঠামো সম্পর্কে আলোকপাত করা হলেও প্রস্তাবিত অভিসন্দর্ভ রচনায় সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে গ্রন্থটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

উপর্যুক্ত সাহিত্য গ্রন্থসমূহ পর্যালোচনা পূর্বক বলা যায় বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব ও বিকাশ; তাদের বৈপ্লবিক কর্মকান্ডের বিবরণ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিপ্লবীর স্মৃতিকথা মূলক গ্রন্থ থাকলেও সেগুলো স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষী বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির বৈপ্লবিক কর্মকান্ডের ভূমিকা সম্পর্কিত কোনো মৌলিক গবেষণাগ্রন্থ এখনো সম্পাদিত হয়নি; এমনকি আধুনিক গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে এ ধরণের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়নি। তাই আধুনিক ইতিহাস পদ্ধতি ব্যবহার ও বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিপ্লবের প্রায়োগিক দিক সমূহ যুক্তিভিত্তিক উপস্থাপনের মাধ্যমে তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ দ্বারা কিভাবে ভারতের স্বাধীনতা

অর্জনে বিপ্লবীরা মৌলিক অবদান রেখেছেন; তা পর্যালোচনা ও ভারতের শাসনতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসে বিপ্লবের প্রভাব মূল্যায়নের লক্ষ্যে আলোচ্য গবেষণা প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

প্রাথমিক উৎস

বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিপ্লবী নেতৃবৃন্দের রচিত গ্রন্থসমূহ, যথা বিপ্লবী সখারামগণেশ দেউস্কর রচিত *'দেশের কথা'*, বিপ্লবী হেমচন্দ্র কানুনগো রচিত *'বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা'*, বিপ্লবী নলিনীকিশোর গুহ রচিত *'বাংলায় বিপ্লববাদ'*, বিপ্লবী ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায় রচিত *'ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব'* এবং *'সবার অলক্ষ্যে :বাংলার বিপ্লব ইতিহাসের অপ্রকাশিত কাহিনী'*, বিপ্লবী ত্রৈকল্যনাথ চক্রবর্তী রচিত *'জেলে ত্রিশ বছর ও পাকভারতের স্বাধীনতা'*, বিপ্লবী বিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায় রচিত *'ভারতের সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রাম'*, বিপ্লবী নারায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত *'বিপ্লবের সন্ধানে'*, বিপ্লবী উল্লাসকর দত্ত *'কারা জীবনী'*, বিপ্লবী সতীশ পাকড়াশী রচিত *'অগ্নযুগের কথা'*, বিপ্লবী গঙ্গানারায়ণ চন্দ্র রচিত *'অবিস্মরণীয়'*, বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ রচিত *'বারীন্দ্রের আত্মকাহিনী ও সন্ত্রাসবাদীর প্রতি'*, বিপ্লবী অনন্ত সিংহ রচিত *'অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম'* এবং *'মহানায় সূর্য সেন ও চট্টগ্রাম বিপ্লব'*, বিপ্লবী কালীচরণ ঘোষ রচিত *'জাগরণ ও বিস্ফোরণ'*, বিপ্লবী ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত রচিত *'ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম'* এবং *'অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাস'*, বিপ্লবী পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত রচিত *'বিপ্লবের পথে'*, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু রচিত *'কেন দেশ ছেড়েছি'*, আজাদ হিন্দ ফৌজের লেফটেনান্ট এমজি মুলকর রচিত *'আজাদী সৈনিকের ডায়েরী'*, বিপ্লবী ডাঃ পবিত্র মোহন রায় রচিত *'নেতাজির সিক্রেট সার্ভিস'* সহ অন্যান্য বিপ্লবীদের রচিত গ্রন্থ। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু সহ অন্যান্য বিপ্লবীর বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত ভাষণের অডিও ও ভিডিও রেকর্ডিং, তাঁদের পাঠানো বার্তা; বিভিন্ন বিপ্লবীর সাক্ষাৎকার থেকে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হবে। এছাড়াও প্রাথমিক উৎস হিসেবে বিভিন্ন গ্রন্থাগার, ভারতীয় আর্কাইভস এবং ভারতীয় সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষিত তথ্য-উপাত্তকে প্রাধান্য দেওয়া হবে। এক্ষেত্রে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত Amiya K.Samanta সম্পাদিত *Terrorism in Bengal:A Collection of Documents on Terrorist Activities From 1905 to 1939,*Volume 1-6, গ্রন্থের তথ্যাদি গুরুত্বের সাথে ব্যবহার করা হবে। এছাড়াও *'অমূল্য সরকারের পত্রিকা, যুগান্তর পত্রিকা, সন্ধ্যা, ভবানী মন্দির, মুক্তি কোন পথে,* প্রভৃতি পত্রিকা থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হবে। সর্বোপরি বিপ্লবী পরিবারের সদস্যবৃন্দ এবং বিপ্লবীদের সংস্পর্শে এসেছেন এমন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের চেষ্টা করা হবে।

দ্বৈতীয়িক উৎস

সমসাময়িক পত্র-পত্রিকা যেমন: দৈনিক ইত্তেফাক, প্রথম আলো, দৈনিক জনকণ্ঠ, দেশকাল পত্রিকা, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, ইতিহাস সমিতি পত্রিকা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, *The Daily Star, NEW AGE*। **সমকালীন পত্র-পত্রিকা** যেমন: ঢাকা প্রকাশ, সংবাদ প্রভাকর, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, *Bengal Past and Present, The Bengalee, Englishman, Calcutta Review, English Historical Review*। **প্রকাশিত বিভিন্ন বই** যেমন, আবদুল মওদুদ রচিত *'মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ সংস্কৃতির রূপান্তর'*, ওয়াকিল আহমদ রচিত *'উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা'*, গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া রচিত *'বাংলায় মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ'*, আবদুল বাছির রচিত *'বাংলার কৃষক বিদ্রোহ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণি'*, সুপ্রকাশ রায় রচিত *'ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম'* ও *'ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস'* এবং *'ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস'*, কৃষ্ণধর রচিত *'ভারতের মুক্তি সংগ্রামে বাংলা,'* চিন্মোহন সেহানবীশ ও অন্যান্য রচিত *'মুক্তির সংগ্রামে ভারত'*, অমলেশ ত্রিপাঠী রচিত *'ভারতের মুক্তি সংগ্রাম ও চরমপন্থি পর্ব'*, রমেশচন্দ্র মজুমদার রচিত *'বাংলাদেশের ইতিহাস (চতুর্থ খন্ড), ১৯০৫-৪৭'*, বিপান চন্দ্র ও অন্যান্য *'ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ১৮৫৭-১৯৪৭'*, *B.B.Misra* রচিত *'The Indian Middle Classes:Their Growth in Mordern Times'*, A.R.Desai রচিত *'Social Background of Indian Nationalism'*। **বিভিন্ন প্রবন্ধ** যেমন: আবদুর রাজ্জাক এর *'ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মন'*, Hamza Alavi এর *'The Colonial Transformation of india'*। **জার্নাল ও গবেষণা সংশ্লিষ্ট গ্রন্থ** যেমন, *Journal of the Pakistan Historical Society, Journal of Asian Studies, Journal of Asian Society of Bengal,* এছাড়াও বিভিন্ন ওয়েবসাইট ও তথ্যচিত্র প্রভৃতি থেকে প্রাপ্ত তথ্য দ্বৈতীয়িক উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হবে।

অভিসন্দর্ভ গঠন পরিকল্পনা

'বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির বৈপ্লবিক চিন্তা ও চেতনার বিকাশধারা (১৮৫৮-১৯৪৭) শিরোনামে অভিসন্দর্ভটি' রূপদানের প্রয়াসে ভূমিকা ও উপসংহার ব্যতিত মোট পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। পরবর্তীতে প্রয়োজন সাপেক্ষে তত্ত্বাবধায়কের পরামর্শক্রমে অধ্যায় সমূহের পুন:বিন্যাস করা হতে পারে।

অধ্যায় বিন্যাস

ভূমিকাঃ

প্রথম অধ্যায়ঃ বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব ও বিকাশ

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির চিন্তা ও চেতনার ক্রমবিকাশ

তৃতীয় অধ্যায়ঃ বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির ব্রিটিশ বিরোধিতার স্বরূপ সন্ধান

চতুর্থ অধ্যায়ঃ বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণি ও বিপ্লব প্রচেষ্টার ক্রমধারা

পঞ্চম অধ্যায়ঃ বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিপ্লব প্রচেষ্টা ও এর বিচার-বিশ্লেষণ

উপসংহারঃ

ভূমিকাঃ

অভিসন্দর্ভের ভূমিকায় গবেষণার বিষয়বস্তু,পরিধি যৌক্তিকতা ও গবেষণা পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হবে। গবেষণা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ইতোপূর্বে সম্পন্ন গবেষণাকর্ম,প্রকাশিত গ্রন্থ ও সাহিত্যিক উৎসসমূহ পর্যালোচনা করে গবেষণার স্থান নির্নয় করা হবে। অভিসন্দর্ভের অধ্যায়সমূহ সম্পর্কে এই অধ্যায়ে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করা হবে।

প্রথম অধ্যায়ঃ বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব ও বিকাশ

মধ্যবিত্ত শ্রেণির পরিচয়, উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে। মধ্যবিত্ত শ্রেণির সংজ্ঞা ও বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রকারভেদ ও তাদের পৃথক পৃথক পরিচয় এই অধ্যায়ে স্থান পাবে। বাণিজ্যিক মধ্যবিত্ত শ্রেণি, শিল্পাশ্রয়ী মধ্যবিত্ত শ্রেণি, ভূমি নির্ভর মধ্যবিত্ত শ্রেণির সম্যক পরিচিতিদানের সাথে সাথে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ এবং বিস্তৃত পরিচয় এখানে উপস্থাপনের প্রয়াস নেয়া হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির চিন্তা ও চেতনার ক্রমবিকাশ

ইংরেজি শিক্ষার প্রসার ও কলকাতা ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী হওয়াতে সেখানেই প্রথম মধ্যবিত্ত শ্রেণি দ্রুত বিকাশ লাভ করেছিল। উনিশ শতকের গোঁড়া থেকে শুরু করে বিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত বাঙালির আধুনিক ভাষা ও সাহিত্য, সঙ্গীত ও শিল্প সাধনা, ধর্ম ও সমাজ চিন্তা, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংবাদপত্র সর্বত্রই এশ্রেণির গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা চোখে পড়ে। এশ্রেণি খুব সীমিত পরিসরে বিভিন্ন সভা, সমিতি ও সংঘ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একধরণের শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে চিন্তা ও চেতনার ক্ষেত্রে এক নব জাগরণমূলক আবাহন তৈরি হয়;যা ইতিহাসে বঙ্গীয় রেনেসাঁস নামে পরিচিতি লাভ করেছে। রাজা রামমোহন রায় কর্তৃক ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে আত্মীয়সভা ও ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে ব্রাহ্মসভার

পথপরিক্রমায় ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে রাজনৈতিক দল জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু স্বাধীনতার প্রশ্নে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের আপসকামিতার বিরুদ্ধাচরণ করে কংগ্রেসের স্বাধীনচেতা একটি অংশ একপর্যায়ে সশস্ত্র পন্থায় ব্রিটিশ বিরোধীতায় অবতীর্ণ হয়। বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির এ বৈপ্লবিক ভূমিকার কারণেই ভারতবর্ষের ভাগ্যাকাশে স্বাধীনতার সূর্য উঁকি দেয়।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির ব্রিটিশ বিরোধিতার স্বরূপ সন্ধান

ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাসে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে ব্রিটিশ বিরোধিতার সূত্রপাত এক যুগান্তকারি ঘটনা। বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির ব্রিটিশ বিরোধী চেতনার মূল কারণ হলো ভারতীয় ও ব্রিটিশ স্বার্থের সংঘাত। বলাবাহুল্য সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক,সামরিক ও প্রশাসনিক কারণেই ব্রিটিশ বিরোধীতার পটভূমি তৈরি হয়। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের পর জাতীয় আন্দোলনের পথ-পরিক্রমায় ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে ভাইসরয় লর্ড কার্জন বাংলা বিভাগ কার্যকর করলে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পথপরিক্রমায় স্বদেশী, বয়কট ও বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিপ্লবপন্থি অংশ ব্রিটিশ বিরোধি সশস্ত্র তৎপরতা শুরু করে। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে ১২ ডিসেম্বর বাংলা বিভাগ রদ করে।

এদিকে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলা বিভাগের সমর্থনে ঢাকায় মুসলিম লীগ গঠিত হয়। কিন্তু বাংলা বিভাগ রদ করায় দলটি ব্রিটিশ বিরোধীতায় অগ্রণী হলেও পরবর্তীতে ব্রিটিশ সরকারের সাথে আপস ও সমঝোতার মাধ্যমে সাংবিধানিক রাজনীতির পথঅনুসরণ করতে থাকে। ইতোমধ্যে ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকারকে সমর্থন দেয়। কিন্তু বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিপ্লবপন্থি নেতৃবৃন্দ কংগ্রেসের এই আপসপন্থি নীতির বিরোধীতা করে বিশ্বযুদ্ধের এই গোলমেলে পরিবেশ কে কাজে লাগিয়ে সশস্ত্র তৎপরতার মাধ্যমে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের প্রচেষ্টা চালায়। অর্থাৎ ১৯০৬ থেকে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অনুশীলন ও যুগান্তর সহ অন্যান্য সশস্ত্র বৈপ্লবিক দলের কর্মকান্ড থেকে শুরু করে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বাধীন আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচারের প্রশ্নে বোম্বের নৌ বিদ্রোহ পর্যন্ত বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে ব্রিটিশ বিরোধিতা অব্যাহত থাকে।

চতুর্থ অধ্যায়ঃ বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণি ও বিপ্লব প্রচেষ্টার ক্রমধারা

বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিপ্লব প্রচেষ্টা দুইটি ধারায় প্রবাহিত। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহ তথা প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম দমিত হওয়ার পর থেকেই বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির মনে বিদ্রোহ ও বিপ্লব প্রচেষ্টার স্বপ্ন বিচ্ছিন্নভাবে লালিত হয়ে এসেছে। উনিশ শতকের শেষভাগে ব্রিটিশের কবল থেকে ভারত মুক্তির

পরিকল্পনা করেন বাঙালি যুবক রাজনারায়ন বসু। ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে 'আর্যদর্শন' বাংলা মাসিকপত্রে প্রকাশিত তার রচনা সমূহ বাংলার যুবকদের বৈপ্লবিক চিন্তায় উদ্দীপ্ত করে।[৯৩] তারা মাৎসিনি ও ইতালির স্বদেশ প্রেমিকদের চিন্তায় অনুপ্রাণিত হয়। ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় ও ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে মহারাষ্ট্রে বিপ্লবী গুপ্ত সমিতি গঠিত হয়। সর্বপ্রথম একটি বিপ্লবী সংগঠনের মাধ্যমে বিপ্লবের বাণী প্রচার করেন মহারাষ্ট্রের বাসুদেব বলবন্ত ফাদকে।[৯৪] গুজরাটের বরোধা কলেজের অধ্যক্ষ অরবিন্দকুমার ঘোষ সে বৈপ্লবিক-বাণী নিয়ে কলকাতায় হাজির হন। ১৯০১-১৯০২ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় বৈপ্লবিক সংস্থা অনুশীলন এবং ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা অনুশীলন প্রতিষ্ঠা করা হয়; অনুশীলন সমিতির মুখপত্র যুগান্তর পত্রিকা কেন্দ্রিক নেতৃবৃন্দ পরবর্তীতে যুগান্তর দল নামে বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতা শুরু করে।

অরবিন্দকুমার ঘোষ ১৯০৫খ্রি. স্বদেশী আন্দোলনের সদ্ব্যবহার এবং 'বন্দেমাতরম্' কে বিপ্লবের মন্ত্র হিসেবে গ্রহণ করে বৈপ্লবিক আন্দোলনকে তুঙ্গে তোলেন। প্রকৃতপক্ষে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে লর্ড কার্জন বাংলা বিভাগ কার্যকর করলে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণি প্রতিবাদে গর্জে উঠে এবং বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন গড়ে তোলে। এই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের মাধ্যমে উত্থিত বৈপ্লবিক আন্দোলন তথা সশস্ত্র বৈপ্লবিক আন্দোলনের ধারাটি স্বাধীনতার দাবিতে উত্তরোত্তর শক্তিশালী হয়ে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারির বোম্বাই নৌবিদ্রোহ পর্যন্ত এ বৈপ্লবিক ধারা অব্যাহত থাকে।

পঞ্চম অধ্যায়ঃ বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিপ্লব প্রচেষ্টা ও এর বিচার-বিশ্লেষণ

সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে একটি দেশ স্বাধীন করার বা একটি সরকারকে তার স্বৈরাচারী কর্মকান্ডের কারণে উৎখাতের জন্য যে গোপন তৎপরতার সূত্রপাত ঘটে তাই সশস্ত্র বিপ্লব নামে অভিহিত। পৃথিবীর প্রত্যেকটি বিপ্লবের ইতিহাসেই চারটি স্তর বা ধাপ লক্ষ্য করা যায় ঃ (ক) প্রথম স্তর হলো রাষ্ট্র-প্রতীক বা *ব্যক্তি বিশেষ নিধন-পর্ব* (Stage of individual murder); (খ) দ্বিতীয় স্তর হলো *বাধ্যতামূলক সম্মুখ সংঘর্ষ পর্ব* (Force open fight); (গ) তৃতীয় স্তর হলো *খন্ড অভ্যুত্থান পর্ব* (Insurrection) ; এবং (ঘ) চতুর্থ স্তর বা শেষপর্ব হলো *বিপ্লব* (Revolutionn)[৯৫]।

বাঙালির প্রথম পর্বের বৈপ্লবিক কার্যক্রমে দুঃসাহসী যুবকেরা ব্রিটিশ কর্মকর্তা ও তাদের তাঁবেদার তথা ভারতের শত্রুদের হত্যার মাধ্যমে ইংরেজকে ভীত ও দেশবাসীকে ভয়হীন করে তোলার প্রচেষ্টা চালায়। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর এন্ড্রু হিন্ডারসন ফ্রেজার হত্যার প্রয়াস থেকে ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের ২৩ ডিসেম্বর দিল্লীতে বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জের ওপর বোমাবর্ষণ পর্যন্ত সকল বৈপ্লবিক কার্যক্রম উল্লিখিত *রাষ্ট্র-প্রতীক* বা *ব্যক্তি বিশেষ নিধন-পর্বের* (Stage

of individual murder) আওতাভুক্ত। কিন্তু ভারতবর্ষের বিপ্লব ইতিহাসেও বিপ্লবের প্রথম পর্ব শেষ না হতেই ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের ২৮ জুলাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ভারতের এবং বহির্ভারতের বিপ্লবীরা জার্মানির সাথে বন্ধুত্ব সূচিত করে ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব সংগঠনের পরিকল্পনা করেন। পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিপ্লবী রাসবিহারী বসু উত্তর-ভারত ও পাঞ্জাবে ব্রিটিশ ভারতের দেশীয় সৈন্যদের মধ্যে বিপ্লবী মতাদর্শ প্রচারপূর্বক তাদের মাধ্যমে ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি সেনা অভ্যুত্থানের দিন ধার্য করা হয়। কিন্তু কার্তার সিং নামক এক সৈন্যের বিশ্বাসঘাতকতায় সে পরিকল্পনা নস্যাৎ হয়ে যায়।[৯৬] বিপ্লবীরা বিপ্লবের দ্বিতীয় ধাপ *বাধ্যতামূলক সম্মুখ সংঘর্ষ পর্ব* (Force open fight) এবং তৃতীয় ধাপ *অভ্যুত্থান* (Insurrection) পর্বে অবতীর্ণ না হয়েই চতুর্থ ধাপ বা সরাসরি *বিপ্লব* (Revolutionn) সংগঠনে নেমে পড়লেন। এটি বিপ্লবীদের হিসেবে ভুল হলো। কারণ *বাধ্যতামূলক সম্মুখ সংঘর্ষ* (Force open fight) এবং *অভ্যুত্থান* (Insurrection) ও গণসংযোগ ব্যতীত বিপ্লবের পথ তৈরি হয়না। এসত্য বিপ্লবীদের জানা থাকা সত্ত্বেও তারা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণে সৃষ্ট অনুকূল সুযোগ উপেক্ষা করতে চাননি। সুতরাং সুযোগের অবহেলা না করেই বিপ্লবের দুটো ধাপ ডিঙিয়ে তারা চরমতম ধাপ তথা *বিপ্লব* (Revolutionn) সংগঠনে অবতীর্ণ হন। আপাতত তারা ব্যর্থ হলেও বিপ্লবের নতুন অভিজ্ঞতায় তারা ঋদ্ম হয়।

পাঞ্জাবে রাসবিহারী বসুর ব্যর্থতার পর ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের ০৯ সেপ্টেম্বর উড়িষ্যার বালেশ্বরে বুড়িবালাম নদীর তীরে কাপ্তি পোদায় চাষখন্ডে বিপ্লবী বাঘা জ্যোতিনের নেতৃত্বে ব্রিটিশ অফিসার টেগার্টের নেতৃত্বাধীন পুলিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে বাঙালি বিপ্লবীদের সম্মুখ-সশস্ত্র সংঘর্ষের মাধ্যমে[৯৭] *বাধ্যতামূলক সম্মুখ সংঘর্ষ পর্ব* (Force open fight) শুরু হয়। এভাবে বাঙালি বিপ্লবীরা জ্যোতিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের (বাঘাজ্যোতিন) নেতৃত্বে বিপ্লব ইতিহাসের দ্বিতীয় পর্বে উন্নীত হয়। এদিকে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ১৮ এপ্রিল বিপ্লবীরা সূর্যকুমার সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহের মাধ্যমে চট্টগ্রামের স্বাধীনতা ঘোষণা করে তৃতীয় ধাপের অর্থাৎ *খন্ড-অভ্যুত্থান পর্বের* (Insurrection) সূচনা করেন। এ বিদ্রোহের মাধ্যমে চারদিনের জন্য চট্টগ্রাম শহর ব্রিটিশ শাসনের বাইরে চলে যায়।

১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের ২১ অক্টোবর অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকার গঠন পূর্বক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ২৪ অক্টোবর ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার মাধ্যমে চতুর্থ ধাপ অর্থাৎ *বিপ্লব* (Revolutionn) বা শেষ পর্বের শুভ সূচনা করেন। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দের ১৪ জানুয়ারি বার্মার রাজধানী রেঙ্গুনে প্রধান সামরিক ঘাটি স্থাপন করেন। সেখান থেকে অভিযানের মাধ্যমে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের কোহিমায় এবং মণিপুরের রাজধানী ইম্ফলের অদূরে মৈরাং-এ জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। কোহিমা এবং মৈরাংসহ

ভারতীয় এলাকার ১৫০ মাইল ব্রিটিশ শাসনমুক্ত করে মণিপুরের রাজধানী ইম্ফল অধিকারের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হন। কিন্তু পথিমধ্যে প্রবলবর্ষণ শুরু হলে আজাদ হিন্দ বাহনীর ভারত অভিযান ব্যাহত হয়। কিন্তু ইতোমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অক্ষশক্তির পরাজয় এবং ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের ১৮ আগস্ট নেতাজির মৃত্যু; পরিস্থিতি বদলে দেয়।

এ সকল বিপ্লবী কর্মকান্ডের ফলে বৃটেনের পক্ষে ভারত শাসন করা অসম্ভবপর হয়ে উঠে। তাছাড়া আজাদ হিন্দ ফৌজের ক্যাপ্টেন রশিদ আলীর বিচার প্রশ্নে কলকাতার ছাত্রসমাজের আহ্বানে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের ১১ ফেব্রুয়ারি ধর্মঘট এবং আজাদ হিন্দ সৈন্যদের বিচার বন্ধের দাবিতে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের ২১ নভেম্বর এক বিক্ষোভ মিছিল কলকাতা শহর প্রদক্ষিণ করে। সর্বোপরি ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারি বোম্বাই বন্দরে ঐতিহাসিক নৌ বিদ্রোহ সংগঠিত হলে তা করাচি বন্দরে ছড়িয়ে পড়ে। রয়্যাল ইন্ডিয়ান নেভির এই বিদ্রোহের খবর বোম্বাই শহরের সাধারণ মানুষ ও ছাত্র-যুব-শ্রমিকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লে তারাও বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ছাত্র, সৈনিক, শ্রমিক ও সাধারণ জনতার এ সম্মিলিত বিপ্লব ব্রিটিশকে এমন আঘাত দিল; পরিস্থিতি বিবেচনায় ব্রিটিশ সরকার ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারত ত্যাগ করায় ১৫ আগস্ট ভারতের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা প্রাপ্তি নিশ্চিত হয়। এক্ষেত্রে সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লর্ড ক্লিমেন্ট এটলির মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'ব্রিটিশ সরকারের ভারত ত্যাগের সিদ্ধান্তে গান্ধীজির ভূমিকা 'স-ব-চে-য়ে-ক-ম'।[৯৮] তিনি আরও বলেন, 'তবে সুভাষ বসুর সামরিক কার্যকলাপে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী ও অনেক অফিসারদের মধ্যে ব্রিটিশ রাজশক্তির প্রতি আনুগত্যের অভাব পরিলক্ষিত হলে আমরা ভারত ত্যাগের সিদ্ধান্ত নেই।'[৯৯] অর্থাৎ বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বাধীন বৈপ্লবিক সরকারের সশস্ত্র বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতার অভিঘাতে ব্রিটিশ সরকারের উপর্যুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রেক্ষিতে ভারত ত্যাগের ঘটনা বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিপ্লব কে সফল্য মন্ডিত করে তোলে।

টিকা ও তথ্য নির্দেশঃ

১. কৃষ্ণধর,*ভারতের মুক্তি সংগ্রামে বাংলা,* তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, ১৯৭৭, পৃ.(ভূমিকা দ্র.)
২. কৃষ্ণধর, *প্রাগুক্ত*
৩. কৃষ্ণধর, *প্রাগুক্ত*
৪. কৃষ্ণধর, *প্রাগুক্ত*
৫. কৃষ্ণধর, *প্রাগুক্ত*
৬. কৃষ্ণধর, *প্রাগুক্ত*
৭. মোঃ শহীদুল্লাহ,*বাংলাদেশ বিষয়াবলি*:ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য, গ্রন্থ কুটির, ঢাকা, ২০১৬,পৃ. ৪৯
৮. আবদুল বাছির,*বাংলার কৃষক বিদ্রোহ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণি*,বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০১২, পৃ.৮
৯. কৃষ্ণধর,*প্রাগুক্ত*
১০. সরল চট্টোপাধ্যায়,*ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ*,পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ,কলকাতা,১৯৯০,পৃ.৩২-৩৩ (উদ্ধৃত: নিগার চৌধুরী, *বাঙালি জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ও বিকাশ,* সুবর্ণ, ঢাকা, ২০১৫, পৃ.৬৭-৬৮)
১১. সুপ্রকাশ রায়,*ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম,* র‍্যাডিক্যাল ইমপ্রেশন,কলকাতা,২০১৮,পৃ.২১৮

১২. আবদুল বাছির, *প্রাগুক্ত*,পৃ.২১৮
১৩. সুপ্রকাশ রায়, *প্রাগুক্ত*,পৃ.১৮৯
১৪. সুপ্রকাশ রায়, *প্রাগুক্ত*,পৃ.১৯০
১৫. সুপ্রকাশ রায়, *প্রাগুক্ত*,পৃ.১৯০
১৬. উনিশ শতকের শেষার্ধে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের একমাত্র প্রগতিশীল কাজ হলো–'১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের বিবাহের সম্মতি দানের বয়স সমন্ধীয় আইন' পাস।এই আইনে পূর্বেকার (Age of Concent Act of 1801) আইনের কন্যার বিবাহের সম্মতি দানের বয়স ১০ বৎসর হতে বর্ধিত করে ১২ বৎসর করা হয়।(উদ্ধৃত:সুপ্রকাশ রায়,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৩৭০)
১৭. সুপ্রকাশ রায়,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৩৭০
১৮. সুপ্রকাশ রায়,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৩৭০;নাজমা জেসমিন চৌধুরী,*বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি*,বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮০,পৃ.১৯
১৯. নাজমা জেসমিন চৌধুরী,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৯
২০. Lester Hutchinson, *The Empire of the Nobos:A Short History of British India*,George Allen and Unwine Ltd., London,1937, p.189
২১. Verney Lovett, *A History of the Indian Nationalist Movement*, Leopold Classic Library, London, 1920,p.232
২২. নাজমা জেসমিন চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*,পৃ.১৯
২৩. মালেকা বেগম, *দৈনিক প্রথম আলো*, তারিখ,০২.০৭.২০২১
২৪. কমলা দাশগুপ্ত, *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী*, র‍্যাডিক্যাল ইমপ্রেশন,কলকাতা,২০১৫,পৃ.৯৫
২৫. কমলা দাশগুপ্ত, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৯৬
২৬. কৃষ্ণধর,*প্রাগুক্ত*
২৭. কৃষ্ণধর,*প্রাগুক্ত*
২৮. কৃষ্ণধর,*প্রাগুক্ত*
২৯. চিন্মোহন সেহানবীশ ও অন্যান্য, *মুক্তির সংগ্রামে ভারত*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০১০,পৃ.৬
৩০. চিন্মোহন সেহানবীশ ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৬
৩১. চিন্মোহন সেহানবীশ ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৬
৩২. সুশোভন সরকার, *বাংলার রেনেসাঁস*, দীপায়ন, কলকাতা, কার্তিক ১৩৯৭, পৃ.৬৩
৩৩. A.R.Desai,*Social Background of Indian Nationalism*,Popular Book Depot,Bombay,1948,p.237.
৩৪. আমরা মনে করি, বাংলা ভাগের বিরেধিতা করে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস নেতবৃন্দ বাংলা ভাগকে ব্যঙ্গ করে এর নাম দেয় বঙ্গভঙ্গ ।
৩৫. শরিফুল ইসলাম ভূঁইয়া, *জাতীয় রাজনীতি ও টাঙ্গাইল জেলার নেতৃবৃন্দ(১৯৪৭-১৯৭১)*,মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০২২, পৃ.৩০
৩৬. সরল চট্টোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩০১
৩৭. সুপ্রকাশ রায়, *ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস (১৯০১-১৮)*, ডিএনবিএ ব্রাদার্স, কলকাতা, ১৯৭০, পৃ.২৪
৩৮. সুপ্রকাশ রায়, *ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৫১-৩
৩৯. সুপ্রকাশ রায়, *ভারতের বৈপ্লবিকসংগ্রামের ইতিহাস*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৫৬ (অত:পর পি.মিত্রকে হিসেবে প্রমথনাথ মিত্র উল্লেখ করা হবে)
৪০. সরল চট্টোপাধ্যায়,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৩০১
৪১. সুপ্রকাশ রায়,*ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস*, *প্রাগুক্ত*,পৃ.২৩৪
৪২. মো.আনোয়ার হোসেন,*বৃহত্তর যশোর জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*,গতিধারা,ঢাকা,২০১০,পৃ.৬৮
৪৩. মো.আনোয়ার হোসেন,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৬৭
৪৪. পারভীন আক্তার জেমী,*নজরুল সাহিত্যে বিপ্লবী চেতনা*,অনন্যা,ঢাকা,২০২০,পৃ.২১
৪৫. সুমিত সরকার,*আধুনিক ভারত(১৮৮৫-১৯৪৭)*,কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী,কলকাতা,২০১৩,পৃ.১২৭
৪৬. সুশোভন সরকার,*বাংলার রেনেসাঁস*,দীপায়ন,কলকাতা,কার্তিক ১৩৯৭,পৃ.৭৬
৪৭. ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত-রায়,*ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব*,র‍্যাডিক্যাল ইমপ্রেশন,কলকাতা,২০১৬,পৃ.১০৩-৭
৪৮. ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত-রায়, *প্রাগুক্ত*,পৃ.১০৭
৪৯. ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত-রায়,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১১১ (অত:পর বিপ্লবী বাঘাজ্যোতিন কে জ্যোতিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘাজ্যোতিন) হিসেবে উল্লেখ করা হবে। কেননা বাঘাজ্যোতিন নামেই তিনি বহুল পরিচিত)
৫০. ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত-রায়,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৩০;মুহাম্মদ আবদুল্লাহ,*মওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধিঃ জীবন ও কর্ম*,ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা,১৯৯২,পৃ,২৫
৫১. সুপ্রকাশ রায়,*ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস*,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৫৮

৫২. জীবনতারা হালদার,*অনুশীলন সমিতির ইতিহাস*,র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, ২০১৬, পৃ.৬৩-৪; সুপ্রকাশ রায়, *ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস*,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৫৫

৫৩. জীবনতারা হালদার,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৪০;ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত,*ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম*,র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, ২০১৭,পৃ.১০১;সুপ্রকাশ রায়,ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২২৫

৫৪. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, *প্রাগুক্ত*,পৃ.১০১

৫৫. জীবনতারা হালদার,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৪৩;সুপ্রকাশ রায়,*ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস, প্রাগুক্ত*,পৃ.১৫৯ এবং ৩৬৯

৫৬. জীবনতারা হালদার,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৭৩-৭৪

৫৭. জীবনতারা হালদার,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৭৩-৭৪

৫৮. জীবনতারা হালদার,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৭৩-৭৪

৫৯. জীবনতারা হালদার,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৭৩-৭৪

৬০. জীবনতারা হালদার *প্রাগুক্ত*,পৃ.৭৩-৭৪

৬১. জীবনতারা হালদার,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৭৩-৭৪

৬২. জীবনতারা হালদার,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৬৩-৬৪

৬৩. পারভীন আক্তার জেমী,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৩০

৬৪. আমরা মনে করি শ্রমিক ধর্মঘটের ধারা

৬৫. পারভীন আক্তার জেমী, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৩০

৬৬. সুপ্রকাশ রায়,*ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম(১৮৯৩-১৯৪৭)*,র‍্যাডিক্যাল ইমপ্রেশন, কলকাতা,২০১৩, পৃ.২১৮

৬৭. পারভীন আক্তার জেমী,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২৮

৬৮. ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত-রায়,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৩৪

৬৯. সুপ্রকাশ রায়,*ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম, প্রাগুক্ত*,পৃ.২২৯

৭০. ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত-রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৩৪

৭১. ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত-রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৩৪

৭২. ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত-রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৩৪

৭৩. সুপা সাদিয়া, *অগ্নিযুগ*, দ্যু প্রকাশন,ঢাকা,২০১৭,পৃ.২৭

৭৪. করলে কারাবিভাগের বড় কর্তা সিমসনকে নিহত ও কতিপয় ইংরেজ অফিসার আহত হয়। (উদ্ধৃত:ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত-রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৪৩

৭৫. পারভীন আক্তার জেমী,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২৮

৭৬. B.B.Misra, *The Indian Middle Classes:Their Growth in Modern Times,*Oxford University Press, London,1961,p.6

৭৭. A.K.Nazmul Karim,*The Dynamics of Banladesh Society,* Vikas, New Delhi,1980., p.178

৭৮. Julius Gould and William L.Kolt(eds.)*A Dictionary of Social Science,*Tavistock Publication, London,1964,p.302

৭৯. *The New Illustrated Columbia Encyclopaedia*,vol.3,Columbia University Press, New York,1978, p.207

৮০. আবদুল বাছির,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৯১

৮১. Letter From Marx to J.Weydemeyer,March 5,1852,in Marx and Engels,*Selected Works,*Vol.I, Moscow,1973.p.528 (উদ্ধৃত: আবদুল বাছির,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৯১।)

৮২. আবদুল বাছির, *প্রাগুক্ত*,পৃ.১৯১

৮৩. A.K.Nazmul Karim,*The Changing Society of India and Pakistan,*Ideal Publications,Dhaka,1961, p.98.

৮৪. আব্দুল্লাহ ফারুক, প্রাসঙ্গিক ভাবনা, *সুন্দরম*, জৈষ্ঠ শ্রাবণ,ঢাকা, ১৩৯৬, বাংলা, পৃ.৭৯

৮৪(ক). গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, *বাংলার মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ*, খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানি, ঢাকা ২০১৩, পৃ. ১৮-২০

৮৫. B.B.Misra,*op.cit.,*p.91

৮৬. *The New Fontana Dictionary of Mordern Thought* Third Edition,Allan Bullock and Stephen Trombley, Eds.1999,pp.754-56.(উদ্ধৃত:https://en.m.wikipedia.org>wiki,accessed on: 23.04.2022.)

৮৭. হেমচন্দ্র কানুনগো,*বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা*,র‍্যাডিক্যাল ইমস্প্রেশন,কলকাতা:২০১৬,পৃ.৭০

৮৮. হেমচন্দ্র কানুনগো,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৭০

৮৯. অনন্ত সিংহ,*সুর্য সেনের স্বপ্ন ও সাধনা*, র‍্যাডিক্যাল ইমস্প্রেশন,কলকাতা:২০১৯,পৃ.৭৭

৯০. সুপ্রকাশ রায়,*ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম, প্রাগুক্ত*,পৃ.১৫-১৯

৯১. আবু মো.দেলোয়ার হোসেন ও এস.এম.মোহসীন, *ইতিহাস তত্ত্ব ও ইতিহাস গবেষণা পদ্ধতি*,অপরাজেয় বাংলা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০২৩, পৃ.২৪৫

৯২. আবু মো.দেলোয়ার হোসেন ও এস.এম.মোহসীন, *প্রাগুক্ত*

৯৩. কৃষ্ণধর, *প্রাগুক্ত*

৯৪. কৃষ্ণধর, *প্রাগুক্ত*

৯৫. ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত-রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৯৫

৯৬. ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত-রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১০৩-৭

৯৭. ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত-রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১১১

৯৮. বিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, *ভারতের সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রাম*, র‍্যাডিক্যাল ইমপ্রেশন, কলকাতা,২০১৪,পৃ.৮৫

৯৯. বিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*

প্রথম অধ্যায়

বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব ও বিকাশ

'মধ্যবিত্ত' হলো এমন এক শ্রেণি যারা শিক্ষাদীক্ষা ও মননশীলতায় সমাজে বিশিষ্টতা অর্জন করেন। শিক্ষক, সাংবাদিক, চাকুরিজীবী, আইনজীবী, বুদ্ধিজীবী ও শিল্পীগোষ্ঠী প্রমুখ এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। সাধারণত সমাজের উচ্চবিত্তশ্রেণি ও নিম্নবিত্ত'র মধ্যবর্তীস্তরে যে শ্রেণি অবস্থান করে সামাজিকভাবে তাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণি হিসেবে অভিহিত করা হয়। মধ্যবিত্ত শ্রেণির ধারণা পাশ্চাত্য থেকেই নেয়া হয়েছে।

আঠারো শতকের মধ্যভাগে বাংলার নবাবী শাসনের অবসানের পর ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজনৈতিক ক্ষমতা গ্রহণের ফলে এদেশের জনজীবনে গভীর প্রভাব সৃষ্টি হয়। প্রকৃতপক্ষে এ শতকের প্রথম থেকে বাঙালি হিন্দুরা নবাবী শাসনে প্রশাসনিক পদগুলো প্রায় অধিকার করে এবং বৃহৎ জমিদার গোষ্ঠীতে পরিণত হয়ে রাজস্ব বিষয়ক সকল দপ্তরই করায়ত্ত্ব করে ফেলেছিল। নবাব মুর্শিদকুলী খান শাসনকার্য পরিচালনার জন্যে স্থানীয় প্রতিভার উপর বিশেষ জোর দেয়ায় তারা এ সুযোগ পায়।[১] ভূমির মালিকানাতেও তারা মুসলমানদের পিছনে ছিল না। এভাবে বাংলাদেশে হিন্দুরা এতখানি প্রভাব প্রতিপত্তি ও অর্থবলের অধিকারী হয়েছিল যে, রমেশচন্দ্র মজুমদার মনে করেন, হিন্দু জমিদারেরা নবাবীর ওপর সন্তুষ্ট না থাকায় নবাবকে সরিয়ে দেয়ার ষড়যন্ত্র শুরু করে।[২] অবশেষে আঠারো শতকের শুরু থেকে ইংরেজ বণিক ও বর্ণহিন্দুদের মধ্যে ব্যবসায়িক সম্পর্কের সূত্রধরে এক ত্রিমুখী মৈত্রী সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এ সম্পর্কের পরিণত পর্যায়ে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জুন পলাশীর আম্রকাননে সংগঠিত যুদ্ধের মধ্য দিয়ে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার পরাজয়ের ফলে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার স্বাধীনতা লুপ্ত হয় এবং নতুন বনিক শক্তির আবির্ভাব ঘটে।

এ ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা ও পরিচালক ছিল ইংরেজ জাতি, আর অংশীদার ছিল ইংরেজ সৃষ্ট ও ইংরেজ নির্ভর হিন্দু ভূমি মালিক, বণিক ও বুদ্ধিজীবিশ্রেণি; যারা মধ্যবিত্ত শ্রেণি রূপে সংগঠিত হয়ে ওঠে। এশ্রেণি সৃষ্টি হয়েছিল ইংরেজ সাম্রাজ্যের স্বার্থে, ইংরেজ শাসকদের খেয়াল খুশিতে ও অনুগ্রহে। এ শ্রেণিই ছিল এদেশে ব্রিটিশ শাসনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।[৩] মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি রাজা রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর ও কেশবচন্দ্র সেন প্রমূখের চোখে ইংরেজ শাসন ছিল বিধাতার আর্শীবাদস্বরূপ এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গীর এ ধারা উনিশ শতকের শেষাবধি পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ উল্লেখ করেছেন,

হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণ,কায়স্থ ও বৈশ্য ব্যতীত অন্য কোন শ্রেণিকে মধ্যবিত্ত বলে মান্য করা হতো না।তবে এ বিভাগ ইংরেজ পূর্বযুগের।ইংরেজরা এদেশে আগমন করার পর এ বিভাগ আর জাতিগত থাকে নি।একে তারা প্রতিষ্ঠিত করে অর্থনৈতিক সংস্থার উপর। ইংরেজরা এদেশে এসেছিল ব্যবসায়-বাণিজ্য করতে।ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল সুদূর প্রাচ্যের বাজারে ইংরেজদের তৈরি মালামাল অল্পমূল্যে ক্রয় করে ইউরোপের অন্যান্য দেশে অধিকমূল্যে বিক্রি করে মুনাফা করার উদ্দেশ্যে।এ মতলব হাসিল করার উদ্দেশ্যে ইংরেজরা এদেশে বেনিয়া, মুৎসুদ্দী,ফড়িয়া,দালাল প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণির সাহায্যকারি সৃষ্টি করত;হিন্দু সমাজেও এদের একটা বিশেষ স্থান করে দেয়।ফলশ্রুতিতে তথাকথিত অবনতসমাজের লোকেরাও মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে উন্নীত হয়।কাশিম বাজারের মহারাজা স্যার মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর পূর্বপুরুষ ছিলেন কান্তমুদী। কোম্পানির আমলে এ মুৎসুদ্দী হলেন এক বড়ো জমিদারির মালিক এবং পরবর্তীকালে উপাধি পেলেন 'মহারাজা'।সেরূপ খাস কলকাতা মেছুয়া বাজারের নবকৃষ্ণ দেব ছিলেন কোম্পানি আমলের মুৎসুদ্দী।তিনি কোম্পানিকে সহায়তা করায় হয়ে গেলেন রাজা।এভাবে নানাবিধশ্রেণি থেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে উন্নীত হয়ে এরা হিন্দু সমাজে কর্তৃত্ব করতে সক্ষম হলেন।কলকাতা জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি বা পাথুরেঘাটার ঠাকুরবাড়ির ভঙ্গকুলীন ব্রাহ্মণেরাও কোম্পানির ব্যবসায়ে সাহায্য সহায়তা করার জন্য বা কোম্পানি আমলের কোন বিশিষ্ট ইংরেজের সঙ্গে একযোগে ব্যবসায়-বাণিজ্য করার বদৌলতে রাতারাতি ধণিকশ্রেণিতে পরিণত হয়।এরা সকলেই প্রাথমিক পর্যায়ে ছিলেন মধ্যবিত্ত।তবে পরবর্তী পর্যায়ে এরা সকলেই অভিজাত শ্রেণিতে পরিণত হন।কাজেই ইংরেজ আমলে প্রাচীন মধ্যবিত্ত শ্রেণির পরিবর্তে জাতি-ধর্ম-শ্রেণি নির্বিশেষে এক অভিনব মধ্যবিত্ত শ্রেণি সৃষ্টি হয়।[৪]

হান্টার (WW Hunter) বলেন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যেসব নিম্নপদস্থ কর্মচারীরা কৃষকদের সঙ্গে ব্যবসায়-বাণিজ্য করত সেসব কর্মচারীদের জমিদার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া। তিনি আরও বলেন, এই বন্দোবস্তের ফলে যেসব হিন্দুরা নগণ্যপদে নিয়োজিত ছিল, তারা জমিতে মালিকানা স্বত্ব লাভ করলো এবং পূর্বে যে ধন মুসলমানদের ঘরে যেতো সেসব হিন্দুরা আত্মসাৎ করতে লাগলো।[৫]

মুর্শীদকুলি খাঁ'র প্রতিষ্ঠিত নবাবী আমলে বাংলায় হিন্দু জমিদারদের উৎপত্তি হয়। বাংলার অধিবাসীদের সকলেই সরকারি পদে নিয়োজিত হতো। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, প্রভৃতি সকল শ্রেণির হিন্দুগণ উত্তমরূপে ফারসি ভাষায় অভিজ্ঞতা অর্জন করে বহু উচ্চপদস্থ চাকরি অধিকার করতো। ছোট বড় জমিদারদের প্রায় তিন চতুর্থাংশ এবং তালুকদারদের অধিকাংশই ছিল হিন্দু। নবাব আলীবর্দী খাঁ'র আমলে হিন্দুদের প্রভাব প্রতিপত্তি আরো বৃদ্ধি পায়।[৬]

হিন্দু সমাজে আরো একটি পরিবর্তন ঘটে ১৭১০ খ্রিস্টাব্দে মুর্শীদকুলি খাঁ বাংলার স্থায়ী দেওয়ান হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার ফলে। হোসেন শাহের আমল থেকে বাঙালি হিন্দুরা ফারসি ভাষা শিক্ষা করে ও মুসলিম দরবারী আদব-কায়দা রপ্ত করে দিওয়ান, কানুনগো প্রভৃতি পদে নিযুক্ত হতেন। মুর্শীদকুলি খাঁ'র সময়ে এসব হিন্দু অর্থবলে জমিদার বংশাবলি প্রতিষ্ঠা করতে থাকে। এসব পদস্থ কর্মচারীরা, বৈদ্য, কায়স্থ এমনকি মোদককুল থেকে উদ্ভূত। আজকাল তাদের বংশধররা রাজা নামে কীর্তিত। নবাবী আমলে একাধিক বাঙালি 'রায়-রায়ান' মর্যাদাধিকারী ছিলেন।[৭]

বাংলায় মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব সমাজিক ক্রমবিবর্তনের ফল। আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাবে এবিবর্তন শুরু হয়। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জুন বাংলার রাষ্ট্রক্ষমতার বিপরীতে ইংরেজ শক্তির জয়লাভের ফলে বাঙালির আর্থ-সামাজিক জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। আঠারো শতকের শেষার্ধে এবং উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলায় ব্রিটিশ প্রশাসন কতগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এগুলোর মধ্যে ভূমিব্যবস্থার নতুন বিন্যাস, ব্যবসায়-বাণিজ্যে পুঁজিবাদী চেতনাসৃষ্টি, ইংরেজি ভাষার সরকারিকরণ, আইন-আদালত স্থাপন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং শিল্পস্থাপন উল্লেখযোগ্য। এই সকল সরকারি পদক্ষেপের ফলেই বাংলায় আধুনিক মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব অনিবার্য হয়ে উঠে। অথচ ইউরোপে এই শ্রেণির বিকাশের প্রেক্ষাপট কিন্তু ভিন্ন প্রকৃতির ছিল। সেখানে বিভিন্ন দেশে নানা ধরনের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বণিক সমাজ জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে নিয়ামক শক্তিতে পরিণত হয়।[৮]

১৮২৯ খ্রিস্টাব্দের ১৩ জুন, এই শ্রেণি সম্পর্কে কলকাতার 'বঙ্গদূত' পত্রিকা প্রথম আলোকপাত করে লেখে, যেসকল লোক পূর্বে কোনো পদেই গণ্য ছিলনা; এক্ষণে তারা উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্ট উভয়ের মধ্যে বিশিষ্ট রূপে খ্যাত; এবং দিনে দিনে দীনের হ্রস্বতা পেয়ে তাদের বাস্তবদিক প্রকাশ পাইতেছে।[৯] উক্ত মন্তব্যে উৎকৃষ্ট (উচ্চবিত্ত) ও নিকৃষ্ট (নিম্নবিত্ত) শ্রেণির মধ্যবর্ত্তী এক নতুন শ্রেণি অর্থাৎ মধ্যবিত্ত শ্রেণির অস্তিত্ব প্রকাশ পায়। এই শ্রেণিটি সমাজে বিশিষ্টতা বা গুরুত্বলাভ করেছিল বলে পত্রিকাটি মন্তব্য করে।

'বিত্ত' দিয়ে মধ্যস্থল চিহ্নিত করার কোন মাত্রা নেই। ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণির সংজ্ঞা নির্ধারণে ভুল বোঝার অবকাশ রয়েছে। সাধারণ অর্থে 'বুর্জোয়া' এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণি সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ফরাসি 'বুর্জোয়া' শব্দের অর্থ নাগরিক, মধ্যবিত্ত শ্রেণি বা ব্যবসায়ী। ইংল্যান্ডে পুঁজিবাদী অর্থনীতি ও সমাজ বিকাশের প্রাথমিক স্তরে বুর্জোয়ারাই মধ্যবিত্ত শ্রেণি হিসেবে বিবেচিত হতো। এর কারণ ছিল বুর্জোয়ারা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কল্যাণে সম্পদশালী হতো। অপরদিকে ভূস্বামীরা ছিল ভূমি নির্ভর। সুতরাং ভূমিনির্ভর না হয়ে স্বাধীন অবস্থান গ্রহণ করায় সেখানকার বুর্জোয়ারা মধ্যবিত্ত শ্রেণি হিসেবে অভিহিত হতো।[১০] কিন্তু পরবর্তীকালে ইংল্যান্ড বা অন্যান্য রাষ্ট্রে এমনকি বর্তমান যুগের ভারতেও বুর্জোয়ারা সর্বোচ্চ মর্যাদা ভোগকারী একটি প্রভাবশালী শ্রেণি। ফলে সেসব দেশে এখন মধ্যবিত্ত শ্রেণি বলতে পাতি বুর্জোয়াদেরকে বোঝায়।[১১] সে অর্থেই আমরা ঔপনিবেশিক বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে বুঝাতে চাই।

ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে 'মধ্যবিত্ত' হলো তাঁরা যারা ধর্মযাজকও নন এবং রাজবংশীও নন; কিন্তু শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ব্যবসা বাণিজ্যের বিনিময়ে প্রয়োজনীয় ধন-সম্পদ আহরণ করে থাকেন। সামন্ততান্ত্রিক সমাজে 'মধ্যবিত্ত' বলতে ব্যবসায়ী ও কেরানি শ্রেণিকে বুঝাতো। আর ধনতান্ত্রিক সমাজে মধ্যবিত্ত শ্রেণি

বলতে তাদের বুঝায় যারা ভূমি থেকে প্রাপ্ত আয় দ্বারা ব্যয় নির্বাহ করতো। ষোড়শ থেকে সপ্তদশ শতকের রেনেসাঁস-উত্তর ইংল্যান্ডে এভাবেই মধ্যবিত্ত শ্রেণির সূচনা হয়। 'A Dictionary of Social Science'- উল্লিখিত সংজ্ঞানুসারে উচ্চবিত্ত ও শ্রমিকশ্রেণির মাঝামাঝি স্তরে মধ্যবিত্ত শ্রেণি অবস্থান করে।[১২] এই বিভক্তিকে নিদিষ্ট কোন রেখা দ্বারা চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। তবে Columbia Encyclopaedia-তে মধ্যবিত্ত বলতে জমিদার ও কৃষকদের মধ্য অবস্থিত শ্রেণিকে নির্দেশ করা হয়েছে।[১৩]

পাশ্চাত্য সমাজবিজ্ঞানী গ্রেটেনের মতে, সমাজের সেই শ্রেণিকেই আমরা মধ্যবিত্ত বলতে পারি, মুদ্রাই যাদের জীবনের প্রধান নিয়ামক এবং মুদ্রাই যাদের প্রাথমিক এবং নির্ভরযোগ্য অবলম্বন। এদের মধ্যে জমিদার ও কৃষকের কোন স্থান নেই, কেননা এদের জীবন যাত্রার প্রধান অবলম্বন হলো ভূমি, মুদ্রানয়।[১৪] অতএব অর্থই মধ্যবিত্তের সামাজিক নিরাপত্তা ও পদমর্যাদা নির্ধারণ করে থাকে। সমাজ বিজ্ঞানী কার্ল মার্কসের মতে, এশ্রেণিটি প্রধানত অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল শ্রেণির উপর নির্ভরশীল হয়ে উচ্চবিত্তের আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান করে থাকে। কায়িক শ্রম পরিহার করে অপরের শ্রম থেকে এই শ্রেণিটি অর্থ উপার্জন করে থাকে এবং উচ্চবিত্তের বিপরীতে যেকোন ধরণের আন্দোলনকে নিজেদের স্বার্থে সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় করে দিতে পারে।[১৫] তবে সাধারণভাবে এরূপ ধারণা করা হয় যে, প্রতিটি শ্রেণিবিভক্ত সমাজেই উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণির মাঝে অস্তিত্বশীল ও ক্রিয়াশীল অভিন্ন স্বার্থের শ্রেণিটিই হলো মধ্যবিত্ত শ্রেণি। আসলে সম্পদ যাদের বেশি নয় আবার একেবারে কমও নয় তারাই মধ্যবিত্ত। এ শ্রেণির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এরা সেকুলার শিক্ষা ব্যবস্থা পছন্দ করে এবং সন্তানের জন্য বিশেষ যত্নবান হয়।[১৬] প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী নাজমুল করিমের মতে, মধ্যবিত্ত শ্রেণির শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ থাকা বাঞ্চনীয়।[১৭] ড.আব্দুল্লাহ ফারুকের মতে, মধ্যবিত্ত তারাই যাদের পরিবারে শিক্ষা আছে, আশ্রয় আছে এবং যারা রাজনৈতিকভাবে সচেতন।[১৮]

আধুনিক গবেষক ড. বি.বি.মিশ্রের (১৯৬১ খ্রি.) মতে, সম্পদের দিক দিয়ে শীর্ষস্থানে অবস্থানরত ব্যক্তিবর্গকে বাদদিয়ে যারা ব্যবসায়ীশ্রেণি ও তাদের সহায়ক চাকরিজীবী শ্রেণি, তাদেরকে মধ্যবিত্ত শ্রেণি বলা যায়।[১৯] সুতরাং মধ্যবিত্ত শ্রেণি বলতে আমরা তাদের বুঝি,যারা শিক্ষিত, রুচিবোধ সম্পন্ন, সমাজ ও রাজনীতি সচেতন, জীবনবোধ সম্পন্ন, উপার্জনের অর্থে চাহিদা মেটাবার ক্ষমতা রাখে,আর যাদের জীবনে থাকে কিছু স্বপ্ন এবং সে সাথে উচ্চশ্রেণিতে আরোহনের দুর্বার আকাঙ্ক্ষা।

অতএব মধ্যবিত্ত শ্রেণির সংজ্ঞা নির্ধারণ করা অত্যন্ত জটিল বিষয় সন্দেহ নেই। তবে সমাজ বিজ্ঞানীরা এ শ্রেণির কতকগুলো প্রবণতা ও বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে একমত হয়েছেন। তাঁদের মতে মধ্যবিত্ত শ্রেণির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এ শ্রেণির জনগণ শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং বুদ্ধিমত্তা ব্যবহারে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। এ শ্রেণিভুক্তরা মূলত সরকারি-বেসরকারি চাকুরিজীবী, ব্যবসায়ী, শিল্পী, আইনজীবী, প্রকৌশলী, ডাক্তার, ব্যাংক সমূহে কর্মরত সকল বেতনভোগী কর্মকর্তা, পরিদর্শক, সুপার-ভাইজার এবং শিক্ষা, সংস্কৃতি, আইন, সংবাদপত্র, ধর্ম ও ব্যবসা ইত্যাদিতে নিয়োজিত উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও কর্মচারী হয়ে থাকেন।[২০] এছাড়া আধুনিকশিক্ষা ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে পাশ্চাত্যের নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ প্রসঙ্গে Bottomore বলেন,

> '...The new Middle classes in the advanced industrial societies exhibit some at least of the same features in basing their claims to social position,upon educational and cultural characteristics, upon the nature of their occupations, and upon their particular styles of life.'[২১]

কিন্তু এ মাপকাঠিতে মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে নির্দেশ করলে ঔপনিবেশিক বাংলার (১৮৫৮-১৯৪৭ খ্রি.) মধ্যবিত্ত সমাজ বিকাশের বাস্তবতাকে অনুধাবন করা মুশকিল হয়ে পড়ে। সে সাথে এই সমাজের কাঠামোতে সৃষ্ট একই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভূক্ত অনেকেই মধ্যবিত্তের যোগ্য বলে বিবেচিত হয় না। ফলে একধরনের অস্পষ্টতা থেকেই যায়। তাই ঔপনিবেশিক যুগে আমরা 'মধ্যবিত্ত' শব্দটিকে সীমাবদ্ধ অর্থে প্রয়োগ না করে আরও প্রসারিত অর্থে গ্রহণের পক্ষপাতি। যেমন কায়িক শ্রম পরিহারকারী ও অপরের শ্রম আত্মসাৎকারী অথবা কায়িক শ্রমজীবিদের শ্রমের ওপর প্রধানত নির্ভরশীল এবং প্রচুর বিত্ত বা বৃহদায়তন উৎপাদন উপকরণের মালিক নন এমন ব্যক্তিকে আমরা মধ্যবিত্ত শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করতে চাই। আধুনিক সমাজতত্ত্ববিদদের বিশ্লেষণ অনুযায়ী সামন্তবাদী সমাজব্যবস্থার অবক্ষয় পর্বে এবং নতুন পুঁজিবাদী সমাজের অভ্যুদয় ও বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে বিত্তবান এবং বিত্তহীন শ্রেণির মধ্যবর্তী স্তরে বিকশিত উৎপাদনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্কহীন ও অর্থনৈতিক স্বার্থের বিচারে অভিন্ন জনগোষ্ঠিকেই আধুনিক মধ্যবিত্ত শ্রেণি বলে অভিহিত করা যায়।[২২] এ শ্রেণির কেউ বৃহদায়তন উৎপাদন উপকরণের মালিক অথবা প্রচুরবিত্তের অধিকারী হলে তাকে আর মধ্যবিত্ত বলা যায় না। মধ্যবিত্ত শ্রেণি বিত্তবানের সংস্কৃতির অনুসারী। এ শ্রেণি সমাজব্যবস্থার পুঁজিবাদী আধুনিকায়ন প্রক্রিয়ায় বিকাশ লাভ করে। এদের মধ্য থেকেই আধুনিক বিত্তবানের (বুর্জোয়া-পুঁজিপতি) উদ্ভব হতে পারে। আবার এদের কেউ সর্বহারা বা বিত্তহীন শ্রেণিতেও পতিত হতে পারে। তাই এরা অস্থিতিশীল এবং অর্থনৈতিক বিচারের মাপকাঠিতে সদা পরিবর্তনশীল।[২৩]

১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডের পুঁজিবাদী ভাবাদর্শ তাদের রাষ্ট্রীয় ও জীবন দর্শন হিসেবে বিবেচিত হয়। অধিকন্তু ১৬৮৮ খ্রিস্টাব্দের গৌরবময় বিপ্লবের ফলে বণিকশ্রেণি একটি শক্তিতে পরিণত হয়। অপরদিকে ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দের ফরাসি বিপ্লবের সংগঠক ছিল সে দেশের উদীয়মান বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্ত শ্রেণি। এই সামাজিক শ্রেণি সমাজ সংগঠনে এবং উৎপাদন ব্যবস্থায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার করে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গতি সঞ্চার করে; দাস, ভূমিদাস, কারিগর ও কৃষকদের জীবনে মুক্তি এনে দেয়। এরূপ সর্বাত্মক সমাজ বিপ্লবের কাজ করতে গিয়ে ভূমির সাথে সংশ্লিষ্ট অভিজাত ও শাসকশ্রেণির সাথে সংঘাতের সৃষ্টি হয়। এই সংঘাতে বংশমর্যাদা ও আভিজাত্য নতুন মূল্যবোধের কাছে পরাজিত হয়। এ মূল্যবোধই ইউরোপীয় সমাজ জীবনকে নতুন করে সৃষ্টি করে।[২৪] ইউরোপে ধনতন্ত্রের বিকাশের ফলে সমাজে নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করে বুর্জোয়াশ্রেণি। এরা ধনতন্ত্রের সুবাদে ব্যবসা-বাণিজ্যে একচেটিয়া প্রাধান্য বিস্তার করে। পক্ষান্তরে শ্রমজীবীশ্রেণি উৎপাদনের মালিকানা না পেলেও কায়িকশ্রমের বিনিময়ে স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্বাহ করতে সক্ষম হয়। কালক্রমে ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় বুর্জোয়া শ্রেণিতে উপশ্রেণি গড়ে উঠে। তখন শিল্পপতি, ধনীপুঁজিপতি ও ব্যাকিং হাউসের কতিপয় ব্যক্তি প্রচুরবিত্ত ও মর্যাদার অধিকারী হয়।ফলে তাদের নিয়ে সমাজে উচ্চবিত্তশ্রেণি বা বুর্জোয়াশ্রেণি গড়ে উঠে। একই সাথে যথেষ্টবিত্তের মালিক না হওয়া সত্ত্বেও শিক্ষা, সংস্কৃতি ও মনন দ্বারা সমাজে বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারীদের নিয়ে গড়ে উঠে মধ্যবিত্ত শ্রেণি বা পাতি-বুর্জোয়াশ্রেণি।[২৫]

অন্যদিকে ইংরেজ শাসকদের প্রবর্তিত অর্থনীতি তথা ভূমি ব্যবস্থা, বাণিজ্য, শিল্প, আইন, শিক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপ ও কার্য-ব্যবস্থাই বাংলায় আধুনিক মধ্যবিত্তের উদ্ভব ঘটায়। ঔপনিবেশিক ইংরেজ শাসন এদেশের সমাজ ব্যবস্থায় যে রূপান্তর ঘটায় তার প্রকৃতি ব্যাখ্যা করেছেন অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান। তাঁর মতে, ইংরেজ শাসনামলে আমাদের সমাজ-ব্যবস্থায় কতকগুলো মৌলিক পরিবর্তন দেখা দেয়। গ্রাম কেন্দ্রিক স্বয়ংসম্পূর্ণ সমাজে ভাঙ্গন ধরে, জীবন-যাত্রা হয়ে ওঠে শহরমুখী, আর অর্থনৈতিক জীবনের মূল মাপকাঠি ভূমি থেকে রূপান্তরিত হয় মুদ্রায়। অর্থনৈতিক কাঠামোর এই মৌলিক রূপান্তরের সাথে সাথে নতুন শ্রেণি-বিন্যাস দেখা দেয়। নবগঠিত এইসব শ্রেণি আবার ঐতিহাসিক নিয়মানুযায়ী নিজেদের ভূমিকা পালন করে সামাজিক অগ্রগতি সম্ভব করে তোলে।[২৬] ইংরেজ শাসনকালের শুরু থেকেই বাংলায় বা ভারতীয় সমাজে যে ধরনের আধুনিকতার ছোয়া লাগে তার সঙ্গে নগর-বন্দরের সমৃদ্ধি ওৎপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। আধুনিক গবেষকদের ধারণা ইংরেজ শাসনপূর্ব যুগেই ভারতে নগরায়ণের মাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং তখন হতে বাজার অর্থনীতিরও যথেষ্ট সমৃদ্ধি ঘটে।[২৭] সে সময় কেবল গ্রাম-সমাজের প্রয়োজনেই নয়, বাংলার সামন্ত শাসকদের শাসনকেন্দ্ররূপী শহর ও নগরের

অধিবাসীদের এবং বর্হিবাণিজ্যের প্রয়োজনেও বিভিন্ন নগরে পণ্য উৎপাদন হত। বিদেশী বণিকরা সে সময় নতুন শহর ও বন্দরগুলোর সঙ্গে ক্রমশ সম্পর্কিত হতে থাকে।[২৮]

ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, পাটনা ও কাশিমবাজার প্রভৃতি নগরের বণিকদের হাতে সেকালে প্রচুর অর্থ পুঞ্জীভূত হয়। কিন্তু ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে এ সব নগরের যথেষ্ট অবনতি ঘটে। কেননা কোম্পানি শাসনের শুরু থেকেই প্রশাসনিক ও বাণিজ্যিক দিক থেকে সুবিধাজনক শহরগুলোর মধ্যে কলকাতার বিকাশ বিশেষ পায় এবং পুরোনো শহরগুলো বিশেষত ঢাকা ও মুর্শিদাবাদ অবহেলিত হয়।[২৯] বাংলার তথা সারা ভারতে আধুনিক শহর হিসেবে কলকাতাই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। কলকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি কতিপয় শহর সতের শতক থেকেই বিদেশি বণিক প্রভাবিত বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠতে থাকে।[৩০] কলকাতা নগরী সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে,

> "Calcutta naturally monopolized the benefits of trade and commerce as well. The new middle classes first arose here and then spread gradually."[৩১]

সুতরাং সঙ্গত কারণেই ইউরোপীয় সভ্যতা ও ভাবধারায় কলকাতা নগরই প্রথম প্রভাবিত হয় এবং পরে তা বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে বিস্তার লাভ করে।[৩২] বাণিজ্যকেন্দ্র ছাড়াও কলকাতা ব্যক্তি স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও শিক্ষার নতুন ভাবাদর্শের কেন্দ্র হিসেবে বিকশিত হয়। আধুনিক মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশেও কলকাতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উনিশ শতকের পূর্বে বাংলায় মধ্যবিত্ত শ্রেণি ছিল না বলে একটি প্রচলিত ধারণা রয়েছে। এ ধারণার ভিত্তি হলো বার্ণিয়ারের ভ্রমণ কাহিনী। বার্ণিয়ার তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে মধ্যবিত্ত শ্রেণির কথা উল্লেখ করেন নি।[৩৩] তবে এ ধারণা যুক্তিযুক্ত নয়। কেননা ইংরেজ আগমনের পূর্বেও এদেশে একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণির অস্তিত্বের কথা W.H.Moreland উল্লেখ করেছেন।[৩৪] তবে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল ভিন্ন প্রকৃতির। ষোল শতকের কবি মুকুন্দরাম তাঁর সমসাময়িক গ্রামীণ জীবনের যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে একটি পরজীবী শ্রেণির উপস্থিতি লক্ষ্যণীয়।[৩৫] এই শ্রেণিটি সাধারণ মানুষের আয় থেকে আহরিত অর্থে জীবিকা নির্বাহ করতো। তবে ড. নাজমুল করিম, মুকুন্দরাম বর্ণিত শ্রেণিটিকে আধুনিক অর্থে মধ্যবিত্ত বলতে রাজী হননি। তাঁর মতে পাশ্চাত্য মধ্যবিত্তদের মত বাঙালি বা ভারতীয় মধ্যবিত্তের সামন্তবাদ বিরোধী চরিত্র ছিল না।[৩৬] তবে আধুনিক গবেষক বি.বি.মিশ্র তাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণি হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছেন। তাঁর মতে সতের শতকের বাণিজ্যিক মধ্যবিত্ত শ্রেণি পাইকার ও দালাল ইত্যাদি

লোকদের নিয়ে গঠিত ছিল। শিল্পাশ্রয়ী মধ্যবিত্ত শ্রেণিতেও একই ধরণের ব্যক্তিদের দেখা যেত। মুঘল শাসিত সুবে বাংলায় ভূমি নির্ভর মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে তালুকদার ও মুকাররারিদারদের প্রাধান্য ছিল।[৩৭]

বাংলায় ব্রিটিশদের আগমনের পূর্বে সামাজিক স্তরবিন্যাসে বিভিন্ন পেশাজীবী ও অপেশাজীবীদের সমন্বয়ে উচ্চ ও নিম্নবর্গের মাঝে একটি ছোট বর্গের অস্তিত্ব লক্ষণীয়। প্রাক ব্রিটিশ যুগে বাংলার সমাজে তিনটি সামাজিক বর্গ ছিল। এগুলো হলো: (ক) উচ্চবর্গ-শাসক, সভাসদ, জমিদার এবং রাজস্ব সংগ্রাহক; (খ) মধ্যবর্গ-শিক্ষার সাথে জড়িত পেশার ব্যক্তিগণ ও অধঃস্তন সরকারি কর্মকর্তা এবং ব্যবসায়ীদের নিয়ে গঠিত; এবং (গ) নিম্নবর্গ-কৃষক ও কুটির শিল্পে নিয়োজিত ব্যক্তিদের মধ্যে কাজী, দেওয়ান, নিম্নস্তরের কর্মকর্তা, কেরানি, মুৎসুদ্দি, মুহুররি, মুন্সী, জোতদার এবং বিচার বিভাগীয় কর্মচারীগণ।[৩৮] এ মধ্যবর্গকেই প্রাক ব্রিটিশ যুগের মধ্যবিত্ত শ্রেণিরূপে বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

বাংলাদেশে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব ঘটে মূলত আঠারো শতকে। এ শ্রেণিটি কোম্পানি প্রশাসনের ছত্র-ছায়ায় আত্মপ্রকাশ করে। বি.বি.মিশ্র ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে চারভাগে বিভক্ত করেছেন: (ক) শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি; (খ) ভূমি-নির্ভর মধ্যবিত্ত শ্রেণি; (গ) বাণিজ্যিক মধ্যবিত্ত শ্রেণি; (ঘ) শিল্পাশ্রয়ী মধ্যবিত্ত শ্রেণি।[৩৯] কোম্পানি আমলে এ দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার রূপান্তরের ফলশ্রুতিতে এ মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। তবে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার রূপান্তর বা পরিবর্তন সব অঞ্চলে, সব সম্প্রদায়ের মধ্যে সমভাবে ও অভিন্নকাল পর্বে সংঘটিত হয়নি। ফলে অনেক অপ্রত্যাশিত জটিলতা ও অস্বাভাবিকতার উদ্ভব ঘটে বাংলার সমাজ জীবনে।[৪০] মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে পেশাভিত্তিক উপ-শ্রেণি থাকলেও আমাদের আলোচনায় শিক্ষত মধ্যবিত্ত শ্রেণিই প্রাধান্য পাবে। কালক্রমে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণি সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে হিন্দু ও মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণি হিসেবে পরিচিতি পায়। কিন্তু বিশ শতকের শুরুতে এ শ্রেণির মধ্যে বৈপ্লবিক চিন্তা ও চেতনা বিকাশ লাভ করে। বিভিন্ন গুপ্ত বৈপ্লবিক সংস্থা ব্রিটিশ শাসন উচ্ছেদ কল্পে মাঠে নেমে পড়ে। সশস্ত্র বৈপ্লবিক কর্মকান্ড উচ্চাঙ্গে ওঠায় ব্রিটিশরা ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে এদেশ ত্যাগে বাধ্য হয়।

বাণিজ্যিক মধ্যবিত্ত শ্রেণি:

পাশ্চাত্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণির সমৃদ্ধি অর্জনের অন্যতম প্রধান উপায় ছিল বাণিজ্য উপার্জিত অর্থ। মধ্যযুগীয় ভারতে অল্পকিছু ব্যক্তির হদিস পাওয়া যায় যারা বৈদেশিক অথবা স্থানীয় বাণিজ্যের সাথে জড়িত ছিল।[৪১] তবে আঠারো শতকের মধ্যভাগে তথা ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশী বিপর্যয়ের পর ব্যবসায় ক্ষেত্রে যে মধ্যবিত্ত শ্রেণির আবির্ভাব হয় তাদের পূর্বপুরুষরা ইংরেজের বাণিজ্যিক ও ব্যাংকিং সংস্থায়

দালাল পর্যায়ে কর্মরত ছিল।[৪২] গোমস্তা, মুনিব, শারফ, বৈশ্য, বানিয়া, পাইকার, সরকার নামধারী এসব দালাল বা ব্রোকারদের ব্রিটিশরা নির্বিচারে গোমস্তা বা বানিয়া নামে আখ্যায়িত করতো। মাদ্রাজে তাদের নাম ছিল দোভাষী।[৪৩] জগৎশেঠ ও উমিচাঁদ এদের নেতা ছিল। এ শ্রেণিই ছিল এদেশে ব্রিটিশ বণিকদের বাণিজ্যিক এজেন্ট মাত্র। নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা ও মীর কাশিমের পতনে এবং ইংরেজ বণিকদের রাষ্ট্রক্ষমতা দখলে তারাই সহায়ক ভূমিকা পালন করে।[৪৪]

এজেন্ট বা ব্রোকারগণ ব্যবসার মাধ্যমে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে। এদের মধ্য থেকে মুষ্টিমেয় অংশ উপার্জিত অর্থে ছোট ছোট জমিদারি ক্রয় করে। কেউ কেউ ব্যবসায় প্রসারে মন দেয়। তবে এদের প্রায় সকলেই ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ভূক্ত। কোম্পানি আমলের প্রথম দিকে ব্যবসা-বাণিজ্য বিস্তৃতির সাথে সাথে বাঙালি বাণিজ্যিক মধ্যবিত্তের সংখ্যাও বাড়তে থাকে। এ শ্রেণি বিকাশের কারণ হলো কোম্পানি কর্মচারী ও এজেন্টদের মধ্যে মুনাফা ভাগ-ভাটোয়ারার খোলাখুলি ব্যবস্থা। ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকার খর্ব হওয়ার ফলে এদেশের বাণিজ্যিক মধ্যবিত্তের বিকাশে কিছুটা অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি হয়। প্রকাশ থাকে যে, কলকাতা ও অন্যত্র গড়ে ওঠা ইউরোপীয় বাণিজ্যিক ফার্মে বাঙালি হিন্দুসম্প্রদায়ের একাংশ প্রথমে ব্রোকার হিসেবে নিয়োজিত হয়ে ব্যবসায়ের কলা-কৌশল আয়ত্বকরে। পরবর্তীতে তারা নিজেরাই স্বাধীনব্যবসায় শুরু অথবা ব্যবসায় সংস্থা প্রতিষ্ঠায় অংশনেয়।[৪৫] ইতোমধ্যে তারা ইংরেজদের সাথে ব্যবসায়ে অংশীদারিত্ব লাভের সুযোগ পায়। গোবিন্দরাম এদেরই একজন। সে কোম্পানির কলকাতা জমিদারির তত্ত্বাবধানকালে প্রায় দেড়লাখ টাকা আত্মসাৎ করে। অথচ তার মাসিক বেতন ছিল মাত্র পঞ্চাশ টাকা। অনুসন্ধানে জানা যায়, সে সমস্ত টাকা খাটিয়ে প্রভূত ভূ-সম্পত্তির মালিক হয়।[৪৬] কলকাতা হাটখোলার মদনমোহন দত্ত ও রামচন্দ্র কোম্পানির সামান্য বেনিয়ান থেকে কয়েকটি জাহাজের মালিক ও প্রসিদ্ধ ব্যাংকার পর্যন্ত হয়েছিল।[৪৭] রায় দুলাল দে ছিল ফেয়ার্লী কোম্পানির পাঁচ টাকা বেতনের গোমস্তা। কিন্তু দালালী করে মৃত্যুকালে সে ষাট লাখ টাকার সম্পত্তি রেখে যায়। তারই পুত্র বিখ্যাত আশুতোষ দে, যিনি ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে পামার এন্ড কোম্পানির বিখ্যাত ব্যবসা ক্রয় করে।[৪৮] এ ছাড়া আন্তঃশুল্ক বিলোপের ফলে এবং অন্য ইউরোপীয়দের এদেশে প্রবেশ নিষিদ্ধ করার কারণে স্থানীয় বাঙালি ব্যবসায়ী গোমস্তা ও এজেন্টদের নিশ্চিত উন্নতি সম্ভব হয়। সে সাথে কোম্পানির স্বার্থে বাণিজ্যিক পণ্য যেমন নীল, চা, আফিম, রেশম, চিনি ও কফি চাষাবাদের কাজে বহু আমলা, দেওয়ান, গোমস্তা নিয়োগ করা হতো। তারা বেতন ও দস্তুরি ছাড়াও নানা উপায়ে প্রভূত অর্থ উপার্জন করতো।[৪৯] এছাড়া ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা ট্রেড অ্যাসোসিয়েশন, ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা চেম্বার অব কমার্স এবং ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে নীলকর সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়ে বাঙালি বাণিজ্যিক গোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষা ও বাণিজ্য বিকাশে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়।[৫০]

এ সময় ইংরেজ এজেন্সি বাণিজ্য প্রতিষ্ঠা, অবাধ বাণিজ্য নীতি প্রয়োগের ফলে হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ সম্ভব হয়। এ ছাড়া ব্রিটিশ রাজ্যের নিরাপত্তার জন্য অভ্যন্তরীণ নানা বিষয়ে তথ্য ও পরিসংখ্যান সংগ্রহ, জলপথ, সেচ প্রণালী, রাজস্ববিধি ও তৎসম্পর্কিত আইন সমূহ, ব্যক্তিগত সম্পত্তি, বাণিজ্য, শিল্প এমনকি বিচার বিভাগের কাজের জন্য ব্রিটিশরা এদেশীয় বাণিজ্যিক মধ্যবিত্ত শ্রেণির শরণাপন্ন হত।[৫১] কারণ তারাই ছিল এদেশে ব্রিটিশদের অকৃত্রিম বন্ধু। ভারতীয় সমাজ, জনজীবন, রীতি-নীতি ও বিধি-বিধান সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা তারাই সরবরাহ করতো। শাসন কার্যের ব্যাপারেও ইংরেজ সরকার এদের উপরই নির্ভর করতো। এই স্বার্থ সংরক্ষণ নীতিই এদেশে ইংরেজ ও বাণিজ্যিক মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে অন্তরঙ্গ ও ঘনিষ্ট করে তোলে।

কোম্পানি আমলের একশত বৎসরের ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যিক গতি-প্রকৃতির ইতিহাস অনুধাবন করলে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, বাঙালি হিন্দু বানিয়ান ও সরকাররাই বাণিজ্যের সকল ক্ষেত্রে স্থানীয়দের প্রতিনিধিত্ব করত। সাম্রাজ্য স্থাপনের সুচতুর ব্যবস্থাপনায় ইংরেজরা বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধাদান করে বাঙালি হিন্দুদের দিয়েই একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণি গড়ে তোলে। এই শ্রেণির অন্যতম সদস্য হিসেবে রাজা রামমোহন রায়ের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনিও ইংরেজদের সংযোগ-সাহচার্যে থেকে প্রভূত অর্থ আয় করেন, যা দিয়ে বিভিন্ন স্থানে জমি-জমা ও কলকাতায় একাধিক বাড়ির মালিক হন। তাঁর এই বৈষয়িক উন্নতি অন্য সাধারণের মতো তাঁর চিন্তা ও মানসজীবনকে বহুলাংশে প্রভাবিত করে। যে কারণে তিনি এদেশে ইংরেজ বিজয়কে বিধাতার আর্শীবাদ বলে মনে করতেন।[৫২] তবে সে সময়ে ব্যবসা বাণিজ্যের দ্বারা যাঁরা ভাগ্য নির্মাণ করেন সেই রামমোহন, রামদুলাল দে, দ্বারকানাথ ঠাকুর, আশুতোষদে, রামগোপাল ঘোষ তাঁদের কারো বংশগত পেশা কিন্তু ব্যবসা ছিল না।

সার্বিকভাবে বলা যায়, ইংরেজ শাসনামলে ব্যবসায়-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ, প্রধান প্রধান পণ্যের বাণিজ্যিকীকরণ, পুঁজির যোগান, কাগজের টাকার প্রচলন ও বিভিন্ন বাণিজ্যিক অফিস স্থাপনের মাধ্যমে বাংলায় বাণিজ্যিক মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ ঘটে। অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো বাংলার মুসলিম সমাজ পিছিয়ে ছিল। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে বেঙ্গল-ডাইরেক্টরি (বাণিজ্যিক) ও নিউ ক্যালকাটা ডাইরেক্টরি'র বাণিজ্যিক তথ্য থেকে জানা যায়, ইউরোপীয় গোষ্ঠীর তুলনায় বাঙালি হিন্দু বণিক ব্যবসায়ী এজেন্ট ও বেনিয়াদের সংখ্যা খুব কম ছিল না। কিন্তু সে তুলনায় মুসলমানদের সংখ্যা ছিল নগণ্য।[৫৩] কলকাতার বাণিজ্যিক শ্রেণির মধ্যে কিছু মুসলমান থাকলেও তারা অবাঙালি ছিল। থেকার্স বেঙ্গল ডাইরেক্টরিতে যে ১০টি মুসলিম ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম রয়েছে, তাদের সবাই ছিল বাংলার বাইরে থেকে আগত।[৫৪] উনিশ শতকের প্রথম ভাগে বাংলার বাণিজ্যিক শ্রেণির বিকাশ দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসে

গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলেও দেখা যায় যে, কলকাতার বাণিজ্যিক কার্যে নিয়োজিতদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ হলো উত্তর ভারতীয়। স্থানীয় মুসলমানরা যে, অনেক আগে থেকেই ব্যবসা বাণিজ্য থেকে দূরে ছিল এবং সে কারণেই তাদের মধ্য থেকে বাণিজ্যিক মধ্যবিত্ত শ্রেণি গড়ে ওঠেনি এর সত্যতা ড. এ. আর. মল্লিক স্বীকার করে নিয়েছেন।[৫৫] তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে (১৯৩৯-৪৫) ব্রিটিশ সরকারকে ওয়ার সাপ্লাইয়ের বড় বড় কন্ট্রাক্টর হিসেবে অবাঙালি টাটা-বিড়লা, ইস্পাহানী-আদমজীর দল মালামাল সাপ্লাই করে নগদ অর্থ কামিয়েছে। এসময়ে তাদের লাভের অঙ্কও ফুলেফেঁপে উঠেছে।[৫৬] ভবিষ্যতে আরও বেশি বাণিজ্যের আশায় টাটা-বিড়লা কংগ্রেস এবং ইস্পাহানী-আদমজীর দল মুসলিম লীগের পৃষ্ঠপোষকতা জোরদার করে।

শিল্পাশ্রয়ী মধ্যবিত্ত শ্রেণি:

বাংলায় ইংরেজি শিক্ষা প্রসারের ফলে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির সংখ্যা বৃদ্ধিপেলেও শিল্পক্ষেত্রে এই শ্রেণির আগমনঘটে বেশ দেরিতে।চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে সঞ্চিতপুঁজি শিল্প-কারখানা স্থাপনে ব্যয় না করে বিনিয়োগ হয় জমিদারিতে। জমিদারি পরিচালনা করা প্রভাবশালী পেশা হিসেবে গণ্য হওয়ায় পুঁজিপতিগণ ভূস্বামী হওয়া শ্রেয় মনে করত। তাছাড়া শিল্পে ইউরোপীয়ানদের সাথে প্রতিযোগিতা হওয়ার বিষয়টি স্থানীয় ব্যাংকার এবং পুঁজিপতিগণ ঝুকিপূর্ণ বিবেচনা করতো। উপরন্ত এদেশের হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শিল্প উদ্যোগের বিষয়ে রক্ষণশীল মনোভাব ছিল। বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির বেশিরভাগই বাণিজ্যিক এজেন্ট বা ব্রোকার হিসেবেই নিয়োজিত থাকে। এরা শিল্প-কারখানার পরিচালক বা তত্ত্বাবধায়ক হতে পারেনি।[৫৭] এ সময়ে যন্ত্র ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ের প্রয়াস বাংলায় তেমন চোখে পড়েনি। এছাড়া শিল্প-কারখানা স্থাপনে যে পরিমান অর্থ, সাধনা ও নৈপুণ্যের প্রয়োজন তা এদেশবাসীর আয়ত্বে ছিলনা।

শিল্পে কোম্পানির এদেশীয় পুঁজি প্রয়োগ করতে না দেবার সিদ্ধান্তই ছিল শিল্পক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত শ্রেণি তৈরী না হবার মূল কারণ। এদেশকে তারা কেবল তাদের পণ্যের বাজারে পরিণত করতে বেশি আগ্রহী ছিল। সেসূত্রে ইংল্যান্ড কৃষি বিপ্লব শেষ করে উপমহাদেশ থেকে আগত সম্পদের সদ্ব্যবহার করে শিল্প বিপ্লব করেছে। শিল্প বিপ্লবের পর যান্ত্রিক ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের মাধ্যমে ব্রিটিশপণ্য বাংলার শিল্পজাত পণ্যের মান অতিক্রম করতে সক্ষম হয়।[৫৮] ভারতে উৎপাদিত তুলা থেকেই ইংল্যান্ড স্বল্প খরচে উন্নত মানের বস্ত্র উৎপাদন করতে থাকে এবং ভারতের বাজারে বিক্রির জন্য তা সরবরাহ করা হয়। বাংলার উদীয়মান মধ্যবিত্ত শ্রেণির স্বদেশী শিল্পপণ্যের চেয়ে ইংল্যান্ডে তৈরী জিনিসই বেশি পছন্দ করতে থাকে। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষে ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির একক আধিপত্য বিলুপ্ত হবার কারণে এদেশে

বাণিজ্যের অবাধ সুযোগ উন্মুক্ত হয়। ফলে ইউরোপীয় ব্যক্তিপুঁজি বাংলায় অনুপ্রবেশ করতে থাকে। তবে ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে ইউরোপীয়দের এদেশে জমির মালিকানা লাভের পূর্বপর্যন্ত তা অবাধে আসতে পারেনি। বস্তুত সরকারি শিল্পনীতি ও বাণিজ্যনীতির কারণেই স্বদেশী বণিক ব্যবসায়ীদের পক্ষে শিল্পপুঁজি গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি এবং শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতেও সময় বেশ সময় লেগে যায়। তাছাড়া দেশীয় মালিকানাধীন শিল্পকেও ব্রিটিশ শ্রমিকশ্রেণি উৎপাদিত পণ্যের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হতো; যে প্রতিযোগিতায় পরাজয় ছিল অনিবার্য। শিল্পকারখানার এই বিলম্বিত ও দূর্বল বিকাশের জন্যই বাংলায় শিল্পাশ্রয়ী মধ্যবিত্তের বিকাশ ব্যাহত ও বিলম্বিত হয়। ইংরেজ শাসকদের অসহযোগিতা ও প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও বাংলার বস্ত্রশিল্প মুমুর্ষ অবস্থায় টিকেছিল। কিন্তু শিল্পপুঁজির প্রতাপ বাড়লে এই শিল্পও ম্যানচেস্টার থেকে আমদানী করা সুতার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।[৫৯] সেই সাথে নানাধরনের প্রতিবন্ধকতার কারণে এ অঞ্চলে স্বাধীন পুঁজির বিকাশ সম্পূর্ণ বাধামুক্ত ও শক্তিশালী হতে পারেনি। এছাড়া সহজপথে অর্থ উপার্জনের সুবিধা থাকায় শিল্পকারখানার ঝুকিই বা বাঙালিরা নিতে যাবে কেন? এমতাবস্থায় একচেটিয়া পুঁজির প্রতিনিধি পরগাছাধর্মী শিল্পাশ্রয়ী বিত্তবান ও মধ্যবিত্ত কিছু পরিমাণে বিকশিত হলেও তাদের আনুপাতিক হার ছিল কম। তদুপরি বিশেষ সামাজিক পরিস্থিতিতে এ দেশের উচুশ্রেণির হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পূর্ব থেকেই শিল্পকর্ম সম্মানজনক পেশা বলে বিবেচিত হতো না।[৬০]

প্রকৃতপক্ষে কোম্পানি বাংলা তথা ভারতকে ব্রিটেনের শিল্পের কাচামাল উৎপাদন ও সরবরাহকারী দেশে পরিণত করার নীতি গ্রহণ করে। পদক্ষেপ হিসেবে ভারতে ব্রিটেনের শিল্পপতিদের স্বার্থে পণ্যদ্রব্য আমদানী-রপ্তানী করার নিমিত্তে[৬১] ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে ভারতে রেলপথ তৈরির কাজ শুরু করে।[৬২] প্রকৃত পক্ষে, ১৮৫৮-১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ সময়ে ভারতে রেলওয়ের ব্যাপক প্রসার এবং ইংরেজ ও ভারতীয়দের উদ্যোগে শিল্পস্থাপনের সূচনা হয়।ভারতে রেলওয়ের ব্যাপক প্রসার এবং মিসরে সুয়েজ খাল খননের দরুন জলপথে ইউরোপের দূরত্ব প্রায় তিন সহস্রাধিক হ্রাস পাওয়ায় বর্হিবাণিজ্যে নবদিগন্ত উম্মোচিত হয়। ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আরও দেখা যায় যে, এ সময়ে বহুসংখ্যক চা-বাগান স্থাপিত হওয়া ছাড়াও কলকাতার পাশ্ববর্তী অঞ্চলে পাটকল এবং বোম্বাই এলাকায় কাপড়ের কল স্থাপিত হওয়া শুরু করে। পাটকলগুলো ইংরেজদের উদ্যোগে স্থাপিত হলেও কাপড়ের কলগুলো ভারতীয়দের বিশেষ করে পার্সীদের প্রচেষ্টায় চালু হয়। অবশ্য উপমহাদেশে প্রথম নাগপুরে ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত 'ইমপ্রেসমিল' এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন জে এন টাটা। এরই পাশাপাশি পশ্চিম বাংলা ও বিহার অঞ্চলে ইংরেজ ব্যবস্থাপনায় কয়লা খনিগুলো সম্প্রসারিত হলেও ভারতের সর্ববৃহৎ লৌহ ও ইস্পাত কারখানা ছিল পার্সি টাটা পরিবারের মালিকানাধীন।[৬৩]

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বা ব্রিটিশ সরকার ভারতে বুর্জোয়া শ্রেণির বিকাশ ঘটুক তা চায়নি। তবু উনিশ শতকের শেষদিকে ভারতে বুর্জোয়া শ্রেণির উদ্ভব ঘটে। ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে 'বোম্বাই উইভিং অ্যান্ড স্পিনিং কোম্পানির' উদ্যোগে ভারতে প্রথম কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হলেও ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে উৎপাদন শুরু হয়। ১৮৭২-৭৩ খ্রিস্টাব্দের দিকে বোম্বাইতে ১৮টি এবং বাংলায় ২টি কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতের বুর্জোয়ারা ব্রিটিশ শিল্প বুর্জোয়ার প্রতিদ্বন্দ্বি হয়ে উঠে কিনা, এই ভয়ে ব্রিটিশ বুর্জোয়ারা তাদের সরকারকে দিয়ে কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করায়। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে ভারতে ব্রিটিশ কাপড় আসার পথে যে আমদানি শুল্ক ছিল তা বাতিল করা হয়। সাথে সাথে ভারতে উৎপাদিত কাপড়ের উপর নতুন এক কর (excise duty) বসানো হলো। উনিশ শতকে ভারতে চা বাগান, কাপড়ের মিল ও জুট মিল গড়ে উঠেছিল। চা বাগানগুলো ছিল প্রধানত ইউরোপীয় মালিকাধীন।বস্ত্র শিল্পের ৯৯ শতাংশ পুঁজি ছিল ভারতীয়। জুটমিলে ইউরোপীয় কর্তৃত্বই প্রধান ছিল।[৬৪] প্রকৃতপক্ষে বাংলার উভয় সম্প্রদায়ের শিক্ষিতশ্রেণি শিল্পপ্রতিষ্ঠায় তেমন উৎসাহ দেখায়নি। তবে উনিশ শতকের শেষ দিকে শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে কিছু উদ্যোগ লক্ষ্য করে 'মোসলেম ক্রনিকল' মন্তব্য করে,

> Till very lately our Hindu fellow Countrymen were also apathetic towards the idea and the carrying out of it.Recently however,we are glad to see,they are beginnig to take a lead in the matter.[৬৫]

প্রকৃতপক্ষে এ সময়কালে কলকাতা কেন্দ্রিক শিল্পস্থাপনে মুসলমানদের তেমন কোনো ভূমিকার কথা উল্লেখ পাওয়া যায় না।[৬৬] তবে হিন্দুসম্প্রদায় নিজেদের ক্ষুদ্রশিল্পেও আত্মনিয়োগ করে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এসম্পর্কে ভারতীয় শিল্প কমিশনের রিপোর্টে উল্লেখ রয়েছে, They were also gradually taking part in small organised industries,such as pottery, tanning, pencil making.Some of them also owned small power factories for the rice husking and for oil milling.[৬৭] ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতে মোট শিল্পকারখানার সংখ্যা দাঁড়ায় ২৬৮৮টি। শিল্পে নিয়োজিত পুঁজির মধ্যে ভারতীয় অংশ ছিল নগণ্য আর বাঙালি মুসলমান পুঁজিপতি কেউ ছিল না। একই বৎসর ভারতীয় পুঁজি নিয়ে গঠিত ব্যাংকের সংখ্যা ছিল ০৯ টি। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে প্রথম ভারতীয় মালিকানাধীন 'টাটা আয়রণ এন্ড স্টীল কোম্পানি' গড়ে উঠে।[৬৮]

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ১৬ অক্টোবর Partition of Bengal Act জারির দিনে সাপ্তাহিক সঞ্জীবনী পত্রিকার সম্পাদক অধ্যাপক কৃষ্ণকুমার মিত্র ইংল্যান্ডের দ্রব্যের পরিবর্তে স্বদেশে উৎপাদিত পণ্য ব্যবহারের আহ্বান জানালে এদেশীয় বুর্জোয়ারা স্বদেশী শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কাজে মনোনিবেশ করে। কাপড়ের কল, ব্যাংক, ইনসুরেন্স কোম্পানি, সাবানের কারখানা, ওষুধের কারখানা চামড়ার কারখানা

ইত্যাদি শিল্পপ্রতিষ্ঠান দেশীয়পুঁজির দ্বারা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে সরলাদেবি চৌধুরানী 'লক্ষীর ভান্ডার' এবং অনুশীলন সমিতি'বেঙ্গল স্টোর' এবং যোগেশ চৌধুরী 'ইন্ডিয়ান স্টোর' নামে স্বদেশী দ্রব্যের কারবার শুরু করে দেয়।[৬৯] ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে লড়াই করেই ভারতীয় পুঁজি বিকাশ লাভ করে এবং শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগ হতে থাকে।

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের প্রাক্কালে দেখা যায় ৬০% শেয়ার বাজারে ছেড়ে দিয়েও ইংরেজ বণিকদের পক্ষে ব্যবসা পরিচালনা দূরূহ হয়ে উঠে। তখন কলকাতায় অনেক ব্রিটিশ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান অবাঙালিদের নিকট এবং অন্যান্য শহর-বন্দরে অমুসলিমদের নিকট হস্তারিত হয়। যুদ্ধের সময় স্টারলিং সিকিউরিটি জমা রেখে ১২০০ কোটি টাকার নোট বাজারে ছাড়া হয়, তার অধিকাংশই মাত্র অল্পকয়েক জন অমুসলিম ভারতীয় বণিকদের করতলগত হয়। এই টাকার জোরে ভারতীয় বণিকরা বহু কোম্পানির শেয়ার আটক করে ফেলে ম্যানেজিং এজেন্টদের কোনঠাসা করার ষড়যন্ত্র করতে থাকে। আবার তাদের একাংশ ইংরেজ বণিকদের সঙ্গে ভাগের কারবারে লিপ্ত হতে থাকে। বিড়লা ব্রাদার্সের সঙ্গে নুফিল্ড এবং টাটার সঙ্গে ইমপেরিয়াল কেমিক্যালের চুক্তি এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এর ফলে দেশি নামে বিদেশি পণ্য বিক্রয়ের পথটিও পরোক্ষভাবে চালু হয়।[৭০] ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের দেশবিভাগোত্তর ভারত ও পাকিস্তানে এধারা অব্যাহত রেখে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তাদের শিল্পপণ্য বিক্রি অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়। টাটা, বিড়লা, আদমজী, দাউদ ও ইস্পাহানী এক্ষেত্রে ব্রিটিশের সহযোগী হিসেবে আবির্ভূত হতে দেখা যায়।

ভূমি-নির্ভর মধ্যবিত্ত শ্রেণি:

ইংরেজদের দিউয়ানী লাভ বাংলার ভূমি ব্যবস্থার ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার সূত্রপাত করে। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানি সরকার বাংলার রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ে সর্ববিধ-ভার গ্রহণ করে। কোম্পানি এদেশের শাসন ও রাজস্ব বিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকায় পরবর্তী ২৮ বছর যাবৎ ভূমি ব্যবস্থায় নানা রকম পরিবর্তন ও বিবর্তন শুরু হয়। প্রতিফল স্বরূপ অর্থনৈতিক বিপ্লব ঘটে। নতুন শাসনের প্রয়োজনে নিলামে জমি ইজারা দেওয়ায় সৃষ্টি হয় নব্য এক জমিদার শ্রেণি। নিশ্চিত ও নির্বিঘ্ন রাজস্ব প্রাপ্তি স্বার্থে পাঁচশালা ও একশালা বন্দোবস্ত গৃহীত হয়। কিন্তু এতেও সুবিধা না হওয়ায় অবশেয়ে ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। এর মাধ্যমে ভূমিতে ব্যক্তি মালিকানা সৃষ্টির সাথে সাথে জমি ক্রয়-বিক্রয়ের পণ্যে পরিণত হয়। ভূমিতে এতসব পরীক্ষা-নিরিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল ব্যবসায়ের পুঁজি যোগান এবং রাজ্য সংগঠনের স্তম্ভ হিসেবে একটি শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত সমাজ সৃষ্টি করা।[৭১] সরকারের

প্রত্যাশা ছিল এ শ্রেণিটি সরকার ও শাসিতের মধ্যে সেতুবন্ধন স্বরূপ হবে। কিন্তু তারা ছিল ভূমির সাথে সম্পর্কহীন। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবিতার সাথে তাদের সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

মাটিতে যাদের ঠেকেনা চরণ
মাটির মালিক তারাই হন।[৭২]

মুঘল যুগে ভূমধ্যাধিকারীদের মধ্যে যে স্তরবিন্যাস ছিল তাতে প্রথমে ছিল জমিদার। তারপর তালুকদার, মুকাররারীদার, ইজারাদার, চুক্তিদার ও পেশকার ইত্যাদি। এদের মধ্যে তালুকদারের সংখ্যা ছিল বেশি। বাংলা, বিহার, গুজরাট, মাদ্রাজ সর্বত্র তাদের অস্তিত্ব ছিল। বেনারস ও উত্তর ভারতের প্রদেশ গুলিতে মুকাররারীদের প্রাধান্য ছিল। তাদের ছিল জমির যৌথ মালিকানা।বোম্বাই ও মাদ্রাজে তাদের বলা হত মিরাসদার বা কৃষি মালিক।[৭৩] জমি রেহেনাবদ্ধ বা হস্তান্তর প্রক্রিয়ায় তারা ছিল নিরঙ্কুশ ক্ষমতার ক্ষমতার অধিকারী। এরা ভূমিরাজস্ব সরকারের কাছে জমা না দিয়ে জমিদারের কাছে জমা দিত। মুঘল আমলে জমিদারের স্বত্ব ছিল বংশানুক্রমিক এবং বিক্রয়যোগ্য। এতে ব্যক্তিগত সম্পত্তির লক্ষণ ছিল স্পষ্ট। জমিদারেররা রাজস্ব সংগ্রহের কাজে তহশিলদার নিয়োগ করতেন, রাজস্ব বিষয়ক মামলার নিষ্পত্তি করতেন এবং নিজ এলাকার শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য দায়ী থাকতেন।

প্রাক-ব্রিটিশ বাংলায় ভূমি-ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল গ্রাম সমষ্টির প্রধান অর্থাৎ পঞ্চায়েতের নিকট থেকে সরকার নিয়োজিত রাজস্ব সংগ্রাহকেরা ভূমিকর আদায় করত। ভূমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল অনুপস্থিত। ভূমির মালিক ছিল গ্রাম প্রধানের নেতৃত্বে সকল গ্রামবাসী। নবাব মুর্শিদকুলী খানের শাসনামলে (১৭০৪-২৭) এদেশে প্রথম ভূমি ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে। এর মধ্যে লক্ষ্যণীয় হলো সুবে-বাংলাকে (বিহার উড়িষ্যাসহ) ১৩ টি চাকলা এবং চাকলাগুলোকে আবার ২৫ টি জমিদারি ও ১৩ টি জায়গিরদারিতে বিভক্ত করেন। এই সকল জমিদারী এক একজন বংশানুক্রমিক অথবা অস্থায়ী জমিদার ও ঠিকাদারদের অধীনে ন্যস্ত করেন। রাজস্ব প্রশাসনে তার গৃহীত এ ব্যবস্থার প্রতি ব্রিটিশদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। পরবর্তীকালে এর উপর ভিত্তি করেই ব্রিটিশ-ভারতীয় ভূমিব্যবস্থা গড়ে ওঠে বলে প্রতিভাত হয়।[৭৪] ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস ইজারা নীতি প্রবর্তন করায় ভূমিকেন্দ্রিক এক প্রকার মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব ঘটে।[৭৫] এ ইজারা নীতির ফলে পুরাতন অভিজাত শ্রেণির জমিদার গোষ্ঠীতে ভাঙ্গনধরে এবং নব্য বানিয়ানরা তাদের স্থান দখল করে। এর অন্যতম উদাহরণ জয়রাম। তিনি ছিলেন বাংলার বিখ্যাত ঠাকুর বংশের আদিপুরুষ। আমিন হিসেবে তিনি চব্বিশ পরগণা জেলার বন্দোবস্ত কার্যে নিয়োজিত হন। এ সুবাদে তিনি প্রভূত ভূমির মালিক হন। তার দ্বিতীয়পুত্র দর্পনারায়ণ ফরাসি সরকারের চাকুরি করে প্রচুর বিত্তের মালিক হন। সেসব অর্থ দিয়ে তিনি রাজশাহীর ব্রাহ্মণ জমিদারের বিশাল জমিদারী ক্রয় করেন।[৭৬] কিন্তু এর ফলে রাজস্ব আয় পূর্বের তুলনায় হ্রাসপ্রাপ্ত হওয়ায় ওয়ারেন হেস্টিংসের

পাঁচশালা ও একশালা ইজারা বন্দোবস্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এহেন পরিস্থিতিতে লর্ড কর্ণওয়ালিস বাংলার গভর্ণর হয়ে এসে ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে জমি দশ বছরের জন্য ইজারা প্রদান করেন। জমিদারদের স্বত্ব ওয়ারিসী হিসেবে স্বীকৃত হয়। কোর্ট অব ডিরেক্টরদের অনুমোদন লাভ করে এই বন্দোবস্ত ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে চিরস্থায়ী হিসেবে ঘোষিত হয়।

এ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে যে নতুন জমিদারশ্রেণি এবং জমির সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত কৃষকদের মধ্যবর্তী বিভিন্ন মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণির উদ্ভব ঘটে। জন্মনেয় তালুকদার, পত্তনিদার ইত্যাদি নামধারী বিভিন্ন মধ্যস্বত্বভোগী। তাছাড়াও কানুনগো, তহশিলদার এবং স্থানীয় রাজস্ব কর্মকর্তা প্রভৃতি পদের সৃষ্টি হয়।[৭৭] এই বন্দোবস্তের বৈশিষ্ট্যগুলো হলো, জমির মালিক হলেও এ জমিদার শ্রেণিটি শহরে বসবাস করতো। দ্বিতীয়ত মধ্যস্বত্বভোগী, যারা বিভিন্ন ধাপ[৭৮] বিশিষ্ট এবং সেই হিসেবে আর্থিক অবস্থা অনুযায়ী ছোট শহরে অথবা গ্রামে বাস করতো। তৃতীয় শ্রেণিটি হলো রায়ত, যারা ছিল সরাসরি ভূমির সাথে সম্পর্কিত উৎপাদনকারী কৃষক। এই মধ্যস্বত্বভোগীরাই কালক্রমে ভূমিনির্ভর মধ্যবিত্ত শ্রেণি হিসেবে পরিচিতি পায়।

স্থায়ীভাবে রাজস্বপ্রাপ্তি নিশ্চিত করা ছাড়াও এদেশের জনসাধারণের ওপর প্রভাবশালী একটি শ্রেণিকে সুহৃদ হিসেবে পাশে পাবার উদ্দেশ্যেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হয়। ফলে পুরনো জমিদারশ্রেণির পতন ঘটে এবং তদস্থলে জন্মনেয় নব ভাবধারায় প্রভাবিত এক নব্য জমিদারশ্রেণি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের একটি অন্যতম শর্ত ছিল, জমিদারগণ নির্দিষ্ট সময়ে রাজস্ব প্রদানে ব্যর্থ হলে তাদের জমিদারি থেকে প্রয়োজনীয় জমি বিক্রি করে বাকী রাজস্ব সংগ্রহ করা হবে। এ শর্তানুসারে অনেক অলস জমিদারের জমিদারি বা জমিদারির অংশ বিক্রয় হতে থাকে। এই আইনের সুবাদে পুঁজিপতি শ্রেণি, মহাজন এবং কোম্পানির বানিয়ান ও মুৎসুদ্দিগণ বাজেয়াপ্ত ভূসম্পত্তি সরকারের নিকট থেকে ক্রয় করে নেয়। এছাড়া অনেক ঋণগ্রস্থ জমিদারের ভূসম্পত্তি ঋণের দায়ে মহাজনদের গ্রাসে পরিণত হয়। এভাবে সমাজে পুরাতন অভিজাত জমিদারশ্রেণির পরিবর্তে একটি নতুন ব্যবসায়ী জমিদার শ্রেণির আর্বিভাব ঘটে। ব্রিটিশ দাক্ষিণ্যে যারা নতুন জমিদার হলো তারা স্বভাবতই ব্রিটিশ শাসনের প্রতি কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত হয়।[৭৯]

ব্রিটিশ শাসনামলের জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগীরা অবশ্য ইংল্যান্ডের আধুনিক ভূমি মালিক 'ব্যারনদের' মত স্বাধীন ও স্বনির্ভর ছিল না। এই জমিদার, তালুকদাররা প্রায়ই শহর-নগরে বসবাস করত বলে অনুপস্থিত জমিদারদের নায়েব-গোমস্তা বা কর্মচারীরা এবং ক্ষুদে মধ্যস্বত্বভোগীরা কৃষকদের নিকট থেকে

ইচ্ছেমত খাজনা ও নানা প্রকার 'আবওয়াব'আদায় করে সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠে।[৮০] এসব কর্মচারীদেরকেও আমরা এক ধরনের ভূমিনির্ভর মধ্যবিত্ত বলতে পারি। হেস্টিংসের শাসনামলে যেখানে মধ্যস্বত্বভোগীদের সংখ্যা ১০০'র বেশি ছিল না, সেখানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রায় এক শতক পরে এ সংখ্যা ১,৫৪,২০০ এ উন্নীত হয়।[৮১]

প্রাচীন জমিদারির ধ্বংস ও বিভক্তি এবং পত্তনিস্বত্ত্বের সংখ্যা-বৃদ্ধি প্রধানত এ দু'টি কারণেই বাংলাদেশে মধ্যস্বত্বভোগী মধ্যবিত্তের বিকাশ ঘটে। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলার প্রায় দুই তৃতীয়াংশ জমি তালুকদারি বা মধ্যস্বত্ত্বের অধীন হয়।[৮২] ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের আদমশুমারীর তথ্যে দেখা যায়, বাংলাদেশে কৃষিজমির খাজনার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তির মোট সংখ্যা দাঁড়ায়-১৩,১৯,৩০২ জন যা মোট জন সংখ্যার-২.৭৭%। যদিও এদের মধ্যকার অধিকাংশই ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ভূক্ত। হিন্দু অথবা মুসলমান জমিদার শ্রেণির অধীনস্ত কর্মচারিবৃন্দের বেশিরভাগ ছিল হিন্দু। হিন্দুসম্প্রদায়ের এ প্রাধান্য ব্রিটিশ পূর্বকাল থেকেই লক্ষণীয়। সুতরাং এটা বলা যায় যে, মুসলিম সমাজের চেয়ে হিন্দু সমাজেই ভূমিনির্ভর মধ্যবিত্ত শ্রেণি অধিকহারে বিকাশ লাভ করেছিল। এই ধারা পরবর্তী দশক গুলোতেও অব্যাহত থাকে। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে মুসলমান এবং হিন্দু জমিদার ও অবস্থাপন্ন কৃষকদের সংখ্যার শতকরা হার ছিল নিম্নরূপ।[৮৩]

সারণি ১

বিভিন্ন শ্রেণি	হিন্দু	মুসলমান
ছোট জমিদার,জোতদার ও ধনী কৃষক	৫%	৩%
স্বয়ং সম্পূর্ণ কৃষক	৩৭%	৪৪%
বর্গাদার কৃষক ও কৃষি শ্রমিক	৫৮%	৫৩%

সূত্রঃ গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া,*বাংলায় মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ*,খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানি,ঢাকা,পৃ.১০২

উপরোক্ত সারণিতে দেখা যায়, ছোট জমিদার, জোতদার ও ধনী কৃষকদের হার হিন্দু সমাজে বেশি হলেও স্বয়ংসম্পূর্ণ কৃষকের হার মুসলিম সমাজে বেশি লক্ষণীয়।

ছোট জমিদার,জোতদার ও ধনী কৃষকদের ভূমি নির্ভর মধ্যবিত্ত শ্রেণি বলা যায়। স্বয়ংসম্পূর্ণ কৃষক ও বর্গাদার কৃষকশ্রেণিকে নিম্নমধ্যবিত্ত বলা অধিক যুক্তিসঙ্গত হবে। ভূমিনির্ভর মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণির অন্তর্ভূক্ত মুসলমান ও হিন্দুদের মধ্যে সংখ্যার দিক দিয়ে বৈষম্য থাকলেও অন্যান্য পেশার তুলনায় এই ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবস্থান উল্লেখযোগ্য পর্যায়ে ছিল। ছোট জমিদার, জোতদার ও ধনী কৃষক, স্বয়ংসম্পুর্ণ কৃষক এবং বর্গাদারদের সন্তানরাই ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণে এগিয়ে আসে।[৮৪] এবং শিক্ষা সমাপনান্তে মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে শামিল হয়। সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় মুসলমান ভূমি মালিকদের সম্পর্কে বলা হয়: চাষীদের মধ্যে মুসলমানগণ হিন্দুদের দ্বিগুণ, জমিদারদের মধ্যে তেমনি হিন্দুগণ মুসলমানদের

দ্বিগুণ। শক্তিশালী ভূমি মালিকদের অধিকাংশই ছিল হিন্দু। দূরদর্শিতার অভাবে প্রায় সকল মুসলমান জমিদারই কপর্দ্দকশূণ্য হয়ে পড়েছে; যে ক'জন অবশিষ্ট তারাও এক প্রকার পতনোন্মুখ[৮৫] অবস্থায় উপনীত হয়। সার্বিকভাবে বলা যায় ভূমিনির্ভর মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে মুসলিম সম্প্রদায়ের চেয়ে হিন্দু-সম্প্রদায়ের উপস্থিতি বেশি লক্ষণীয়। দেশের পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে হিন্দু জমিদারদের অধিকাংশ কংগ্রেসের এবং মুসলমান জমিদারদের অধিকাংশ মুসলিম লীগের সমর্থকরূপে লক্ষণীয়ভাবে আবির্ভূত হতে দেখা যায়।

শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি:

১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কারণে যে নতুন জমিদার এবং কোম্পানির এদেশীয় মুন্সি, বাণিয়া ও দালালশ্রেণির উদ্ভব ঘটে, তারা প্রায় সকলেই ছিলেন হিন্দু-সম্প্রদায়ভূক্ত। অপরদিকে, মুসলমানরা যেমন ইংরেজদের ঘৃণা করতেন, ইংরেজরাও মুসলমানদের সন্দেহের চোখে দেখতেন। এ অবস্থায় ইংরেজরা একটি শিক্ষিত হিন্দু-মধ্যবিত্ত শ্রেণি গড়ে তুলতে তৎপরতা চালায়।[৮৬] এই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি বলতে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত এবং তাদের সৃষ্ট স্বীকৃত পেশাসমূহে নিয়োজিত সম্প্রদায়কে ইঙ্গিত করে। নতুন শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকেরা মানসিক গঠন, নৈতিকতা, মূল্যবোধ, জীবন দর্শন ও জাতীয়তাবোধে অন্যান্য মধ্যবিত্তেরে চেয়ে স্বতন্ত্র বৈশিষ্টের অধিকারী হয়। যদিও বলা হয়- Education is not blessing bestowed on India by the British Raj. It is older in Asia than Europe.[৮৭] তবে এই শিক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল ধর্মীয় মূল্যবোধকে প্রচ্ছন্ন রাখা। বস্তুত খ্রিস্টান মিশনারীদের মাধ্যমেই এদেশে আধুনিক ইংরেজি শিক্ষার সূচনা হয়। 'Society for promotion of the Christian Knowledge' নামক ধর্ম প্রচারক সমিতি কলকাতায় ১৭৩১ খ্রিস্টাব্দে একটি ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপন করে। এই স্কুলে শিক্ষার্থীদের বিনা খরচে শিক্ষা দেয়া হতো।[৮৮] এটিই হলো বাংলাদেশে পাশ্চাত্যধারার প্রথম স্কুল। মিশনারীদের প্রত্যাশা ছিল ইংরেজি জ্ঞান লাভ করে হিন্দুগণ মূর্তিপূজার অসারতা বুঝতে পেরে খ্রিস্টধর্মের দিকে ধাবিত হবে। পরবর্তীতে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে মিশনারীরা ধর্মপ্রচারের ছদ্মাবরণে রাজনীতি ও শাসনকার্যে ইংরেজই যে শ্রেষ্ঠ; তা প্রচারের উদ্দেশ্যেই মূলত ইংরেজরা মিশনারী স্কুল প্রতিষ্ঠা করে। ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে দ্বারকানাথ এ ধরনের সেরবোর্ণ স্কুলে ইংরেজি শিক্ষালাভ করেন।[৮৯] মিশনারীদের উদ্যোগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের এ ধারা বাংলাদেশের জন্য ছিল একেবারেই নতুন। শিক্ষার মাধ্যমে ধর্ম এবং রাজনৈতিক মতবাদ প্রচার সম্পর্কে এ ছিল এক অভিনব দৃষ্টিভঙ্গি।

ওয়ারেন হেস্টিং কলকাতার বিশিষ্ট মুসলমানদের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা মাদ্রাসা স্থাপন করেন। তবে এর পাঠসূচিতে ইংরেজি বিষয় পাঠ্য ছিল না। ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে বেনারসে সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হয়। এ সময়ে রাষ্ট্রের প্রয়োজনে বানিয়ান ও সরকারি প্রভৃতি কর্মচারীর চাহিদা মেটানো হতো বেসরকারিভাবে ইংরেজি শেখানোর ব্যবস্থা করে। ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা সুপ্রিয় কোর্টসহ বিভিন্ন আদালত চালুকরা হলে এদেশে ইংরেজি শেখার হিড়িক পড়ে যায়। সচরাচর চালু ইংরেজি শব্দ রপ্ত করাই ছিল প্রথম পর্যায়ের শিক্ষা। যিনি যত বেশি শব্দ রপ্ত করতে পারতেন তিনি ততো বড় বিজ্ঞপন্ডিত বলে বিবেচিত হতেন। এদের মধ্যে আঠারো শতকের শেষে পন্ডিত রামরাম মিশ্র, রামনারায়ণ মিশ্র, কৃষ্ণমোহন বসু, ভবানী দত্ত ও শিবু দত্ত প্রমূখ উল্লেখযোগ্য ছিলেন।[৯০] এই সকল পন্ডিত তাদের অর্জিত বিদ্যার সদ্ব্যবহার করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করতেন। বিদ্যাশিক্ষা হয়ে উঠে বিত্ত অর্জনের একটি সোপান। নতুন আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে বিত্ত ও বিদ্যা উভয়ই সামাজিক মর্যাদার জন্য অপরিহার্য হয়ে উঠে।

কোম্পানি শাসনের প্রথম দিকে ভারতীয়দেরকে শিক্ষাদান তাদের নীতির অংশ ছিল না। তবে কোম্পানির কতিপয় কর্মকর্তাকে প্রথম এদেশীয় জনগনকে শিক্ষা প্রদানে জন্য আগ্রহী হতে দেখা যায়। এদের মধ্যে ব্রিটিশ সিভিলিয়ান *গ্রান্ট* (Grant) ছিলেন অন্যতম। তিনি "Inquiry into the measures whice might be adopted by Great Britain for the improvement of the condition of her Asiatic Subject and answer to objection".[৯১] নামে একটি প্রবন্ধে ঔপনিবেশিক শক্তির স্থলে যুক্তির মাধ্যমে ভারতীয়দের অজ্ঞতা বিদূরিত করে আলোক প্রজ্জ্বলনের সুপারিশ করেন। কিন্তু তার সুপারিশ ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করেনি। পরবর্তীতে আরো অনেক কর্মকর্তা অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করলেও তাদের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ম্যালকম বলেন, একদিন ব্রিটিশের ক্ষমতা শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু তখনও তাদের নাম এদেশে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হবে। কারণ তাঁরা এক মহৎ নীতিবোধের মিনার (শিক্ষা) রেখে যাবে, যা মানুষের সব নির্মানের চেয়ে মহত্তর ও অবিনশ্বর।[৯২] লর্ড ওয়েসলি ইংরেজ কর্মচারীদেরকে বাংলা, সংস্কৃত, ফার্সি, হিন্দি, মারাঠী প্রভৃতি ভাষা শিক্ষাদানের জন্য ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপন করেন।[৯৩] তবে এখানে স্থানীয় শিক্ষার্থীদের প্রবেশাধিকার ছিল না বলে জানা যায়।

১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত যদিও শিক্ষার ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। তবে এই বৎসর কোম্পানির নবায়নকৃত চার্টারে শিক্ষারজন্য কোম্পানির বাজেটে একলক্ষ টাকা বরাদ্ধ দিয়ে ভারতীয়দের শিক্ষাদানের দায়িত্ব কোম্পানির উপর ন্যস্ত হয়। এই টাকা সংস্কৃত শিক্ষায় ব্যয় করবার সুপারিশ

থাকলেও আরবি-ফারসি শিক্ষায় অর্থসাহায্যের কোন উল্লেখ নেই।[৯৪] মিশনারীরা পাশ্চাত্য ধারার স্কুল স্থাপনের অনুমতি পায় মর্মে উল্লেখ পাওয়া যায়।

বাংলার হিন্দুসম্প্রদায় প্রথম থেকেই ব্রিটিশ শাসন ও ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করে। বিত্তশালী হিন্দুদের উদ্যোগে কলকাতার ভবানীপুরে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে এ শিক্ষা শুরু হয়। চিনসুরার ম্যাজিস্ট্রেট ফার্বিসের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দে সেখানেও একটি ইংরেজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ডেভিড হেয়ার, রাজা রামমোহন রায়, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়[৯৫] এবং আরো কতিপয় হিন্দুনেতার প্রচেষ্টায় ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দের ২০ জানুয়ারি কলকাতার আপার চিৎপুর রোডে গোরাচাঁদ বসাকের বাড়িতে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইংরেজি ভাষা শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে কলেজটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।[৯৬] ডেভিড হেয়ারের মনে সর্ব প্রথম এ হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার চিন্তা উদিত হয়।[৯৭]

প্রকৃতপক্ষে হিন্দু কলেজের মাধ্যমেই এদেশে ইংরেজি শিক্ষা প্রাতিষ্ঠানিক রূপলাভ করে। একই বছর কলকাতা এবং পাশ্ববর্তী এলাকায় বাঙালি হিন্দুদের মধ্যে ব্যাপকভাবে ইংরেজি শিক্ষা প্রসারের জন্য বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় কলকাতা বুক সোসাইটি। এই সোসাইটি স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজি এবং স্থানীয়ভাষায় বইবিক্রি করা।[৯৮] প্রতিষ্ঠা লাভের পর পরই সরকার এটিকে মাসিক পাঁচশত টাকা মঞ্জুর করে যা পরবর্তী ষাট বছর অব্যাহত ছিল।[৯৯] এ বিষয়ে রমেশচন্দ্র মজুমদার উল্লেখ করেছেন, হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার পর কয়েক বছরের মধ্যে দ্বারকানাথ ঠাকুর ও অন্যান্য বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিদের উদ্যোগে কলকাতা ও পাশ্ববর্তী জেলাগুলোতে কয়েকটি ইংরেজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। হিন্দু কলেজের ছাত্রগণ কয়েকটি ইংরেজি প্রতিষ্ঠা করে। ১৮৩৫-৩৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় ২০ টি ইংরেজি বিদ্যালয়ে ৬০০০ শিক্ষার্থী শিক্ষালাভ করতো।[১০০]

১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে 'জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন' গঠিত হয়। ইংরেজি শিক্ষা প্রসারে পরবর্তী প্রধান পদক্ষেপ হলো ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দের অ্যাক্ট। এতে বলা হয়, No Native of India, nor any natural born subject of his Majesty, should be disaled from holding any place or employment by reason of his religion,place of birth,decent or colour.[১০১] এ নীতির ফলে কোম্পানির অধীনে ভারতীয়দের চাকরি প্রাপ্তির সুবিধাবৃদ্ধি পায়। ইংরেজি শিক্ষার প্রসার দ্রুততর হয়। খ্রিস্টান মিশনারী *আলেকজান্ডার* ডফ (Alexander Duff) ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় এসে একটি উদীয়মান শিক্ষিত সমাজ থেকে চমৎকৃত হন।[১০২]

হিন্দুদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষা প্রসার লাভ করায় ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি একটি বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা ফারসির স্থলে ইংরেজিকে সরকারি ভাষা করার যুক্তি তুলে ধরে। ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দের ১৯ মার্চ একই সাপ্তাহিকী সরকারের নিকট দাবি করে যে, সরকারি চাকুরীতে নিয়োগের ব্যাপারে ফারসির পরিবর্তে ইংরেজি ভাষাজ্ঞানকে যোগ্যতার প্রধান গুণ বলে গ্রহণ করা উচিৎ।[১০৩] তখনো পর্যন্ত ফারসি ছিল সরকারি ভাষা। কিন্তু ঔপনিবেশিক সরকার নিজের স্বার্থেই এ ভাষার অবসান কামনা করে। ইংরেজিকে সরকারি ভাষা প্রচলনের ব্যাপারে আলোচনা শুরু হয়। প্রশাসনে প্রাচ্যবিদ হিসেবে খ্যাতনামাদের অনেকেই এখানকার শাসন কার্যের সুবিধার্থে ফারসিকেই চালু রাখার পক্ষে জোর মতপ্রকাশ করেন। কিন্তু গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিল সদস্য *টি.বি.মেকলে* (T.B.Macaulay) প্রাচ্য ভাষার বিলুপ্তি ঘটিয়ে তদস্থলে ইংরেজির পক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখেন এবং তা প্রতিবেদন আকারে সবিস্তারে পেশ করেন। এ প্রতিবেদনে তিনি এ মর্মে মন্তব্য করেন যে, এদেশে ইংরেজি শিক্ষা প্রচলনের মাধ্যমে এমন একটি শ্রেণির সৃষ্টি হবে; যারা রক্তে ও রঙে ভারতীয় হলেও রুচি, মূল্যবোধ ও বুদ্ধিবৃত্তির দিক দিয়ে হবে খাঁটি ইংরেজ।[১০৪] আধুনিক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি উদ্ভবে মেকলের এই উক্তি গভীর তাৎপর্যবাহী। লর্ড বেন্টিঙ্ক তার সুপারিশ গ্রহণ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইংরেজিকে শিক্ষার মাধ্যমে ঘোষণা দেন।[১০৫] ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে সরকার কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করে। শিক্ষার মাধ্যম করা হয় ইংরেজি। এ বছরই মহসিন ফান্ডের টাকায় সরকারি উদ্যোগে হুগলি কলেজ স্থাপিত হয়।[১০৬]

কিন্তু প্রাচ্যপন্থি এডাম কমিটির রিপোর্ট [১০৭] এড়িয়ে ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দের ০১ এপ্রিল থেকে সরকারি সকল কাজকর্মে ফারসিকে বিদায় জানিয়ে ইংরেজিকে স্বাগত জানানো হলো। সরকারের এই সিদ্ধান্ত ভারতে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারে সুদূরপ্রসারী অবদান রাখতে সক্ষম হয়। বেন্টিঙ্ক এবং তার উত্তরসূরিগণ ইংরেজি প্রচলনের প্রয়োজনে বিভিন্ন স্থানে স্কুল-কলেজ স্থাপনে প্রয়াস পায়।[১০৮] ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে সরকার শিক্ষার তত্ত্বাবধানের জন্য জনশিক্ষা সাধারণ সমিতির স্থলে পরিষদ বা কাউন্সিল Council of Education গঠিত হয়।[১০৯] ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দের পর হতে সকল কাজ-কর্মে ধীরে ধীরে ইংরেজি ব্যবহার শুরু হয়।[১১০] এ বৎসরেই লর্ড হার্ডিঞ্জের (১৮৪৪-৪৮) এক ঘোষণায় বলা হয়,

> "Preference Shal be given in the selection of candidates for public employment to those who have been educated in the institutions thus estublished and especially to those who have distinguished themselves theirin by more than ordinary degree of merit and attachment."[১১১]

এ ঘোষণার মাধ্যমে কার্যত তিনি এদেশে সরকারি চাকরি লাভের যোগ্যতা হিসেবে ইংরেজি শিক্ষার শর্তারোপ করেন। ফলশ্রুতিতে এদেশীয় লোকদের ইংরেজির প্রতি আগ্রহ ও শিক্ষার হার বৃদ্ধি পায়। তবে বাংলার জনগণের সব অংশের মধ্যে সমভাবে এই আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়নি।

১৮৩৩-৫৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে ব্রিটিশনীতি তিনটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে প্রণীত হয়। এগুলো হলো: (ক) পাশ্চাত্য জ্ঞানের প্রসার; (খ) প্রশাসনিক কাজে নিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্য প্রার্থীর সহজ প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ; (গ) সরকারি কাজে ভারতীয়দের সহযোগীতা লাভ। ব্রিটিশ নীতির ফলে ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দের এক পরিসংখ্যানে বাংলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার অগ্রগতির চিত্র পাওয়া যায়।[১১২] এ সময় ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণে হিন্দু সমাজের সচেতন অংশের আগ্রহ এবং অর্থনৈতিক সামর্থের কারণে সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুসলিম শিক্ষার্থীদের তুলনায় হিন্দু শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি ছিল বলে মনে হয়। তা ছাড়া তারা বুঝতে পেরেছিল ব্রিটিশ শাসন এদেশে দীর্ঘস্থায়ী হবে। ইংরেজি শিক্ষা অচিরেই প্রাধান্য পাবে। ফলে তারা মানসিকভাবে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণে প্রস্তুত ছিল। এক্ষেত্রে ধর্মও তাদের অন্তরায় হয় নি। অন্যদিকে মুসলিম সমাজের নেতৃস্থানীয় অংশ বাস্তবতাকে উপলব্ধ করতে ব্যর্থ হয় এবং তারা তাদের অতীত ঐতিহ্যকে আঁকড়ে ধরে রেখে নিজেদের সম্প্রদায়কে পাশ্চাত্য শিক্ষার পথ থেকে সরিয়ে রাখে।[১১৩]

লর্ড কর্নওয়ালিসের ভূমিনীতির কারণে উনিশ শতকের বাংলা আইনজীবিদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়। স্বাধীন পেশা হিসেবে আইনজীবী ও চিকিৎসা সেবা পেশা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। তারা স্বাধীনভাবে পেশা চর্চার সুযোগ পায়। ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দের পর হতে আইন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যবিধি ইংরেজি ভাষায় প্রণীত হওয়ায় ইংরেজি শিক্ষায় অগ্রসর হিন্দুরা এতে একচেটিয়া অবস্থান নেয়। সঙ্গত কারণেই মুসলমানেরা এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠা এবং সিভিল ও পেনাল কোর্ড উৎসাহ পায়। ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দের একবিধানে সকলের জন্য আইনপেশা উন্মুক্ত করা হয়। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে রাজস্ব বিভাগীয় সরকারি কর্মচারী তালিকায় থাকা ৩৩৬ জনের মধ্যে মাত্র ৫৪ জন মুসলমান, ০৯ জন খ্রিস্টান অবশিষ্ট সবাই ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায় ভূক্ত।[১১৪]

নতুন গজিয়ে ওঠা হিন্দুজমিদার ও বিত্তশালীশ্রেণি শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে যে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন, তার নজীর অন্য কোথাও খুঁজে পাওয়া কঠিন। ইংরেজদের লুণ্ঠন-সহচর এই গোষ্ঠী শোষণ ও লুণ্ঠন চালিয়েছেন নিজেদের মুসলিম প্রধান জমিদারি এলাকায়। কিন্তু মুসলিম রায়ত-প্রজাদের কাছ থেকে লুণ্ঠিত ধন-সম্পদ থেকে স্কুল-কলেজ স্থাপনের জন্য ব্যয় করেছেন হিন্দু প্রধান অন্য এলাকায়। নোয়াখালীর জমিদার প্রতাপচন্দ্র কিংবা জোড়াসাকোর ঠাকুরপরিবার, সবার দৃষ্টিভঙ্গী এক্ষেত্রে ছিল অভিন্ন। প্রতাপচন্দ্র স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন হিন্দুপ্রধান বীরভূম এলাকায়। ঠাকুর পরিবারের জমিদারি ছিল পূর্ব বাংলার বিভিন্ন এলাকায়; কিন্তু তারা কলকাতায় থেকেছেন এবং জমিদারির আয় থেকে যা কিছু

খরচ করেছেন সেখানেই।[১১৫] কোন কোন জমিদার প্রজাদের শিক্ষার বিরোধী ছিলেন। তারা মনে করতেন, প্রজারা শিক্ষিত হলে জমিদারীতে তাদের কর্তৃত্ব দূর্বল হয়ে পড়বে।[১১৬]

বাংলায় ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ আধুনিক বিষয় শিক্ষাদানে ইংরেজি ভাষা যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হয়। এ লক্ষ্যে স্থানীয়দের মধ্যে ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার ঘটাতে সরকারি শিক্ষাখাতে সরকারি বরাদ্ধের সবটাই আধুনিক ও ইংরেজি শিক্ষায় ব্যয় হতে থাকে।[১১৭] যদিও বণিক সরকারের গৃহীত নীতি ছিল সমাজের সর্বস্তরে শিক্ষা সম্প্রসারিত করা, বাস্তবে তা নগরবাসী উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে সীমিত থাকে। অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনসাধারণ এ শিক্ষার সুযোগ গ্রহণে বঞ্চিত হয়। উল্লেখ্য এদেশের জনসাধারণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ মুসলমানদের চেয়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি শ্রেণির মধ্যে এ নতুন শিক্ষার ধারাবাহিক বিস্তৃতি ঘটে। ঔপনিবেশিক যুগে আধুনিক শিক্ষায় মুসলামানদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত করুণ। এই শিক্ষাব্যবস্থা আর্থিকভাবে অসচ্ছল মুসলমানদের অনুকূলে ছিল না।[১১৮] তাই হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্যই এ শিক্ষা কল্যাণকর হয়। খ্রিস্টান মিশনারী ও নব্য পুঁজিপতি দালাল হিন্দুদের সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত দেশীয় ভাষাশিক্ষার স্কুল বা বাংলা পাঠশালা গুলোতে বাংলা ভাষার নামে যা শিখানো হতো তা আসলে সংস্কৃতেরই নামান্তর। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত বাংলা জবানকে নির্বাসিত করা হয়। পাঠ্যপুস্তকের অধিকাংশ রচনা ছিল হিন্দুদেব-দেবীর পৌরানিক কাহিনী নিয়ে। ছাত্রদের জন্য ক্লাসে স্বরস্বতী বন্দনা ছিল বাধ্যতামূলক।

১৮৪১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মুসলিম অধ্যুষিত পূর্ব বাংলায় কোন কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়নি। ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার স্কুল-কলেজে ২৬৩ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে মুসলমান ছিল মাত্র ১৮জন। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর মাত্র চার দশকের মধ্যে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় পঁচিশ গুণ। এদের প্রায় সবাই বর্ণহিন্দু; বিহারী, অসমীয়া কিংবা উড়িয়া ভগ্নাংশ মাত্র। বাঙালি মুসলমানের সংখ্যা ধর্তব্যের মধ্যেই ছিল না।একই বছর গোটা উপমহাদেশে ৪২৩ জন এমএ ডিগ্রি লাভ করে। এদের মধ্যে ৩৪০ জনই ছিল বাঙালি বর্ণহিন্দু। ভারতবর্ষের অন্য সকল স্থানের শিক্ষার্থীর সম্মিলিত সংখ্যা ছিল মাত্র ৮৩ জন। বাঙালি বর্ণহিন্দুদের এই উত্থান যে ইংরেজদের প্রত্যক্ষ মদদের ফল, তা ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত।[১১৯]

ইংরেজ শাসনে শিক্ষক সমাজ অবহেলিত হয়। সরকারি স্কুলের তুলনায় বেসরকারি স্কুলের সংখ্যা আজকের মতো সেদিনও বেশি ছিল। তবে কম বেতন এবং স্বল্প সুযোগ-সুবিধা সত্ত্বেও শিক্ষকরা

ঐতিহ্যগত মর্যাদার অধিকারী ছিলেন।মাদ্রাসায় আরবি, ফারসির শিক্ষক ব্যতীত শিক্ষা বিভাগে মুসলমানদের কোন প্রতিনিধিত্ব ছিল না। এছাড়া কবি, লেখক এবং সাংবাদিকতা পেশার সূচনা এ সময়ই শুরু হয়। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের একটি সরকারি বিবরণী থেকে জানা যায়, মুদ্রণযন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে পঞ্চাশ বছরে বাংলায় মোট ৫১৫ জন কবি ও লেখক বাংলা ভাষায় গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এতে হিন্দু-মুসলিম অনুপাত দাঁড়ায় ৩০৩:১০।[১২০] এ প্রসঙ্গে কাজী আমিনুল ইসলাম উল্লেখ করেন, ইংরেজ আমলে রাজনৈতিক কারণে মুসলমান অভিজাত সম্প্রদায়ের উচ্ছেদ ঘটে। বাংলা সাহিত্যকে পৃষ্ঠপোষকতা করার লোক মুসলমানদের থাকলো না। ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক সাহিত্যের আবির্ভাব হলো, মঙ্গল কাব্যরূপ সাহিত্য এগিয়ে এলো। ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণকারী হিন্দুদের মধ্য হতে আধুনিক সাহিত্যিক এগিয়ে এলেন। হিন্দু দেব-দেবীদের নাম জড়িয়ে যে সাহিত্য, তারই মধ্যে বিচরণ করে তারা আধুনিক সাহিত্যের মধ্যে বাংলাকে আনলেন। বাংলা সাহিত্যের গতি ঘুরে গেল। একচেটিয়া ভাবে হিন্দুরা বাংলা সাহিত্যকে লালন করাতেই বাংলা সাহিত্যের যে মুসলিম ঐতিহ্য, আচার ব্যবহারের গন্ধ ছিল; তা সরে গেল। ভারত চন্দ্র হতে আরম্ভ করে নন্দকুমার, জগতধীর রায় প্রমূখের রচনাবলি যে বাংলা ভাষায় আরবি-ফারসি শব্দের প্রাধান্য ছিল তা মুছে গেল। সেই থেকে ইংরেজি শিক্ষার বদলে হিন্দুরা বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন করে নিল।[১২১]

জেম্‌স লঙের ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দের এক পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, তখন বাংলা মুদ্রণযন্ত্রের সংখ্যা ছিল ৪৬ টি। সর্বমোট ছাপা হওয়া ২৫২ টি গ্রন্থের প্রচার সংখ্যা ছিল ৪,১৮,২৭৫ কপি। সংবাদপত্র ও সাময়িকীর সংখ্যা ছিল ১৯টি এবং এগুলোর প্রচারসংখ্যা ছিল ৮,১০০কপি।[১২২] শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা বই ও পত্র পত্রিকা প্রকাশ করে ইউরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞান প্রসারে ভূমিকা রাখতে সমর্থ হয়। তবে নিজেদের সামাজিক বিচ্ছিন্নতার কারণে তারা সমাজের সর্বস্তরে এই শিক্ষা সমানভাবে ছড়িয়ে দিতে পারেননি। মুদ্রণ যন্ত্রের সুবাদে উনিশ শতকের প্রথম ভাগেই কলকাতা, ঢাকা, মুর্শিদাবাদসহ অন্যান্য স্থানে সংবাদ পত্রের আবির্ভাব ঘটে। এর সাথে অনেক ব্যক্তিবর্গ সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে। এর মাধ্যমে একটি মানসিক জাগরণ লক্ষ্য করা যায়। বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির চরিত্রেও পাশ্চাত্যের বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করা যায়। এদেশের শিক্ষিত শ্রেণিও সামাজিক পদ মর্যাদা ও উন্নত জীবন যাত্রার প্রতি আগ্রহশীল, সমাজ ও রাজনীতি সচেতন হয়। পরিস্থিতি অনুসারে এই শ্রেণির লোকেরা নিজেদেরকে তৈরী করে নেয়। বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নতুন সমাজ চেতনার জন্ম দেয়। এ নতুন চেতনা উচ্চবিত্ত বা জমিদার শ্রেণি থেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে আলাদা করে ফেলে।[১২৩] এ মধ্যবিত্ত শ্রেণির আরও একটি আস্থা ছিল ইংরেজি শিক্ষা ও সংস্কৃতির ওপর। ইংরেজের বিরুদ্ধে পরিচালিত বিভিন্ন বিদ্রোহ সম্পর্কে বিরূপ ধারণা পোষণ করতো। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহ বা প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলনে তারা বিশেষ কোনো

প্রকার সমর্থন জানায়নি। এদেশে ব্রিটিশ শাসনের স্থায়িত্বের প্রত্যাশাই করতো। বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির এই আপসকামী মনোভাব তাদের সামাজিক দায়িত্ববোধ ও রাজনৈতিক ইতিহাসকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে রাখে।

ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের সিপাহী বিপ্লবের একটি বিশেষ প্রভাব রয়েছে। মূলত ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের সূচনা হয়েছিল জন্মলগ্ন থেকেই।[১২৪] আর এ বিপ্লব ছিল সেই ধারাবাহিকতার অংশ মাত্র। কাজেই বিষয়টি বিশদ আলোচনার দাবি রাখে। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের এ বিদ্রোহ ছিল একটি সশস্ত্র বিদ্রোহ যেখানে এ দেশীয় সিপাহীরা ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে ধরেছিল। তৎকালীন ভারত সচিব স্টানলি একে নিছক একটি বিদ্রোহ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হাউজ অব কমন্সের বিরোধী দলীয় নেতা বেঞ্জামিন ডিসরেলি একে ভারতীয়দের জাতীয় বিদ্রোহ বলে উল্লেখ করেছেন।[১২৫] স্যার লরেন্স এর মতে, তা দেশীয় সিপাহীদের নিছক সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বৈ অন্য কিছু নয়।[১২৬] আর আলফ্রেড লগরোল একে ইংরেজদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের ষড়যন্ত্র বলে বর্ণনা করেছেন। সমকালীন ভারতীয় ব্যক্তিত্ব সৈয়দ আহম্মদ খান, কিশোরী চাঁদ প্রমূখ মনে করেন এটি একটি নিছক বিদ্রোহই। কারণ এ বিদ্রোহের পিছনে কোনো সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্য ও পরিকল্পনা ছিলনা।[১২৭] তবে অনেকেই মনে করেন প্রথমে এ বিদ্রোহ সিপাহী বিদ্রোহ হিসেবে শুরু হলেও পরবর্তীতে তা ব্যাপকতা পায় এবং জাতীয় আন্দোলনের চরিত্র গ্রহণ করে। এ বিদ্রোহ ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার দ্বারা ভারতীয়দের স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করে তোলে। ইংরেজ শাসন উচ্ছেদ করে দেশীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করাই ছিল বিদ্রোহের অন্যতম লক্ষ্য। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের অংশগ্রহণ একে জাতীয় আন্দোলনে পরিণত করে।[১২৮] কিন্তু রমেশ চন্দ্র মজুমদার এ ঘটনাকে জাতীয় সংগ্রাম বা স্বাধীনতার যুদ্ধ না বলে সিপাহী বিদ্রোহ হিসেবেই মত প্রকাশ করেছেন।[১২৯] ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহ নিয়ে মত ভিন্নতা থাকলেও একথা অস্বীকার করবার সুয়োগ নেই যে, ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার পর ভারতবর্ষে এটিই ছিল ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভ্যুত্থান। বিদ্রোহ দমনে ব্রিটিশ সরকারের তৎপরতা লক্ষ্য করলে এর প্রমাণ মেলে। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে যখন বিদ্রোহ শুরু হয় তখন ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেল ছিলেন লর্ড ক্যানিং। শুরুতে সিপাহীদের দ্বারা এ বিদ্রোহের সূত্রপাত ঘটলেও তা ভারতের ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে এবং ভারতে কোম্পানির ভিত্তিকে ব্যাপকভাবে নাড়িয়ে দেয়। এর পিছনে নানাবিধ বিষয় কাজ করেছে। তবে অনেকে গরু বা শুকরের চর্বি মাখানো কার্তুজের বাধ্যতামূলক ব্যবহারের ফলে আহত ধর্মীয় মানসিকতাই এ যুদ্ধের কারণ; তা মেনে নিতে পারেন নি। নর্টন লিখেছেন-

"চর্বি মাখানো কার্তুজ না থাকলে বিদ্রোহ হতো না। এমন আজগুবি ধারণা পোষণ করার মতো বোকা কেউ নেই বলে আমার বিশ্বাস...এই কারণেই রেজিমেন্টে বিদ্রোহ ঘটেছে– এমন কথা অঅর ভাবা সম্ভব নয়"।[১৩০]

কিন্তু একথা অস্বীকার করার সুযোগ নেই যে, কার্তুজের বাধ্যতামূলক ব্যবহার সিপাহীদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করেনি। তবে সামগ্রিক পরিস্থিতি এ বিদ্রোহের পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। অন্যসব বিষয়ের সাথে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সিপাহী বিদ্রোহে বেশ জোরালো ভূমিকা পালন করেছিল। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ব্রিটিশদের হস্তগত হওয়ার পর থেকে বিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত সময়ের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড মানুষের দুর্দশাকে চরমে নিয়ে যায়। ভূমিরাজস্বে নানাবিধ পরীক্ষা নিরীক্ষা, কোম্পানির ব্যবসায়িক মানসিকতা, ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থায় কড়াকড়ি আরোপের দ্বারা এদেশের অর্থনৈতিক কাঠামোকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে ঠেলে দেওয়া হয়। দেশীয় শিল্পের ধ্বংস,ব্যবসায় বাণিজ্যের অবনতি, বিপুল পরিমাণ সম্পদ ইংল্যান্ডে পাচার এদেশের কৃষক ও ভূস্বামীদের জীবনে বিপর্যয় ডেকে আনে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রসূত ভূমিবন্দোবস্ত ব্যবস্থা ও সুর্যাস্ত আইনের প্রয়োগে বাংলার অনেক বনেদি পরিবারের অবলুপ্তি ঘটে এবং অনেক বনেদি পরিবার সামাজিক ও অর্থনৈতিক দুর্দশার শিকার হয়। কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্ঘটনা বা অন্য কোনো কারণে জমিদারদের রাজস্ব আদায়ে দেরি হলে রাজস্ব মওকুফের কোনো ব্যবস্থা ছিলনা।[১৩১] কৃষক তার জমির মালিকানা হারায় এবং অযৌক্তিক রাজস্বের ভারে কৃষক একেবারে নাস্তানাবুদ হয়ে পড়ে। কৃষক ও কৃষি অর্থনীতিতে বিপর্যয় দেখা দেয়। কৃষক সম্পুর্ণভাবে জমিদারের দয়ার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। যার ফল ছিল মারাত্মক।[১৩২]

সমসাময়িক লেখক ও দার্শনিক কার্ল মার্কস (১৮২৫-৮১) সিপাহী বিদ্রোহের পিছনে নিম্নলিখিত অর্থনৈতিক কারণগুলোকে তুলে ধরেছেন। প্রথমত: চিরস্থায়ী ব্যবস্থা ছিল ঔপনিবেশিক শাসনের স্থায়ী ভিত্তি তৈরী করার ও এদেশীয় কৃষকদের ওপর শোষণতান্ত্রিক কার্যকর ব্যবস্থা। দ্বিতীয়ত: কৃষকদের ওপর অতিরিক্ত রাজস্বারোপ। তৃতীয়ত: কৃষির প্রতি গুরুত্বারোপ না করা। চতুর্থত: দেশীয় শিল্পের ধ্বংস ও বাণিজ্যে একচেটিয়া কর্তৃত্ব লাভ। এসব পদক্ষেপ এদেশের অর্থনীতিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে যা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের আন্দোলনে ভূমিকা রাখে।[১৩৩] ব্রিটিশ প্রবর্তিত রাজস্ব ব্যবস্থায় বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা, ভূমি বন্দোবস্তের নতুন নিয়ম, ভূমি কেন্দ্রিক শ্রেণিগুলোর তৎপরতা কৃষকদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার করে। ফলে জন্ম নেয় কৃষক বিদ্রোহের।[১৩৪] ভূমি মালিকানায় অব্যবস্থাপনা, চিরাচরিত ভূমি থেকে কৃষকদের অধিকার হারানো, অতিরিক্ত করারোপ এবং ভূমি কেন্দ্রিক নতুন সরকার সমর্থক শ্রেণি উদ্ভবের কারণে কৃষকদের মনে ক্ষোভ ক্রমেই পুঞ্জিভূত হচ্ছিল। মোট উৎপাদনের অধিকাংশ রাজস্ব প্রদান, ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দের হাফতম (৭ নং আইন), ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দের ৩ নং আইন, ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দের

পাঞ্জম (৫ নং আইন) ইত্যাদি আইন এবং অনুশীলনে যে ক্ষোভের জন্ম নেয় তা বিদ্রোহকে অনিবার্য করে তোলে।[১৩৫]

ব্রিটিশ শাসন ভারতের শিল্প অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দিয়েছিল। ব্রিটিশদের একচেটিয়া বাণিজ্য এদেশে অন্যান্য ইউরোপীয় বণিক গোষ্ঠীগুলোকে যেমন কোনঠাসা করে, তেমনি এদেশীয় শিল্প ও বাণিজ্যকেও ধ্বংস করে দেয়। একচেটিয়া বাণিজ্য চিরাচরিত ভারতীয় বাণিজ্যপ্রথার মূলে আঘাত করে। বাণিজ্যে বৈষম্যমূলক শুল্ক প্রথা ও ভারতকে ব্রিটিশ শিল্পের বাজার হিসেবে গড়ে তোলায় দেশীয় শিল্পের পতন ঘটে।[১৩৬] তাছাড়া কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসায় জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলে। বাংলার কিছু নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য যেমন-লবণ, আফিম, চুন, সুপারি, তামাক ইত্যাদিতে ব্রিটিশরা একচেটিয়া কর্তৃত্ব স্থাপন করে। ফলে এসব পণ্যের দাম বেশ বৃদ্ধি পায়।[১৩৭]

ব্রিটিশরা ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভের মাধ্যমে বাংলার রাজনীতিতে যে প্রবেশাধিকার লাভ করে তা ক্রমান্বয়ে তাদের স্থায়ী উপনিবেশে পরিণত করে। কোম্পানি ছিল সম্পূর্ণ একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, অর্থ উপার্জনই ছিল তাদের প্রধান কাজ। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে দিওয়ানী লাভের ফলে কোম্পানি বিপুল পরিশাণ অর্থ লাভ করে যা কোম্পানির আর্থিক অবস্থাকে বেশ শক্ত ভিত্তি প্রদান করে। পলাশীর পরবর্তী সময় থেকে কোম্পানি বিপুল পরিশাণ অর্থ ভারতের বাইরে বিশেষ করে ইংল্যান্ডে প্রেরণ করে দেয়। এদেশ থেকে নিয়মিতভাবে বিপুল পরিমাণ সম্পদ পাচার হয়ে যাওয়াকে সমাজ বিজ্ঞানীরা '*আর্থিক নিষ্ক্রমণ*' (Economic drain) বলে অভিহিত করেছেন। ১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দে সিলেক্ট কমিটির নবম রিপোর্টটি রচনাকালে এডমন্ড বার্ক কোম্পানি ও তার কর্মচারীদের কঠোর সমালোচনা করেন। তার মতে, কোম্পানি বাংলাকে লুণ্ঠন করে ধ্বংস করছে।[১৩৮] আর ভারতের সম্পদ ইংল্যান্ডের অর্থনীতির ভীতকে আরও শক্ত ও বেগবান করে। ভারতের মুদ্রার সঙ্কট তৈরি হয় এবং আর্থিক লেনদেন ব্যাহত হয়। কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে স্থবিরতা দেখা দেয়।[১৩৯] বিপুল পরিমান সম্পদ এদেশ থেকে পাচার হওয়া, দেশীয় শিল্পের অবক্ষয়, গ্রামীণ মহাজনদের অত্যাচার, বেকারত্ব ও ভূমি কেন্দ্রিক বেণিয়া শ্রেণির আবির্ভাবের কারণে গ্রামীণ পেশাদার শ্রেণির জীবনে দুর্দশার সৃষ্টি করে এবং অসন্তোষ ক্রমেই পুঞ্জিভূত হতে থাকে। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহের জন্য *কার্ল মার্কস* (Karl Marx) সহ প্রায় প্রত্যেক লেখকই (de-Industrialization) এর প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। দেশীয় শিল্পের ধ্বংসজনিত দূরাবস্থা সামগ্রিক-ভাবে দেশে অর্থনৈতিক অস্থিরতার সৃষ্টি করে, যা বিপ্লবের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করেছিল।[১৪০]

ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের সিপাহী বিপ্লবের পেছনে বেশ ভূমিকা পালন করেছিল। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশী যুদ্ধের মাধ্যমে ভারতের রাজনীতিতে ইংরেজরা সরাসরি সম্পৃক্ত হওয়ার পর থেকে ঔপনিবেশিক শাসন কায়েম করতে নানা কৌশলে ভারতের সার্বভৌমত্ব করায়ত্ব করেছে। ভারতের রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করে সর্বত্র ব্রিটিশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাকে ভারতীয়রা সহজভাবে গ্রহণ করেনি। মুঘল সম্রাটের ক্ষমতা নামে মাত্র অবস্থায় উপনীত হলেও জনগণের নিকট তিনি বেশ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। সম্রাটের প্রতি ইংরেজদের অবজ্ঞা প্রদর্শন জনগণের মনে ক্ষোভের সঞ্চার করে। সম্রাটের পক্ষ হতে ভারতে কোম্পানির নবাগত গভর্নরকে 'খেলাত' প্রদান করা হতো, যা সম্রাটের সার্বভৌমত্বের চিহ্ন বহন করতো। লর্ড মিন্টো দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের নিকট থেকে খেলাত গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। তিনি জানিয়ে দেন যে, ব্রিটিশ সরকার মুঘল সম্রাটকে নামে মাত্র সার্বভৌম বলে বিবেচনা করে।[১৪১] ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে মুদ্রা হতে মুঘল সম্রাটের নাম প্রত্যাহার এবং সম্রাটকে আনুষ্ঠানিক সম্মান প্রদর্শনের রীতি তুলে দেওয়া হয়। ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে লর্ড ডালহৌসী ঘোষণা করেন যে, বাহাদুর শাহের উত্তসুরীগণ 'বাদশাহ' উপাধি ব্যবহার করতে পারবেন না। তারা কেবলমাত্র 'শাহ' উপাধিতে পরিচিত হবেন।[১৪২]

দিল্লীতে কোনো মৃত্যুদন্ড কার্যকর করার ক্ষেত্রে সম্রাটের অনুমতি নেয়ার নিয়ম প্রচলিত ছিল। কিন্তু কোম্পানি প্রশাসন এ নিয়ম রহিত করে তাঁর সকল ক্ষমতা রহিত করার ইঙ্গিত দেয়। সম্রাট ইংরেজদের এহেন অবজ্ঞা প্রদর্শনমূলক কার্যক্রমে খুবই অপমানিত হন। এমনও প্রমাণ আছে বাহাদুর শাহ ভারত থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত ও নিজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারস্যের সম্রাটের সাহায্য প্রার্থী হয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে উপর্যুক্ত কারণে মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহের ব্রিটিশ বিরোধী অবস্থান গ্রহণ ছিল স্বাভাবিক। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে বিদ্রোহের প্রথম দিকে সিপাহীদের সাথে একাত্মতা প্রকাশে ইতস্তত করলেও শেষ পর্যন্ত তিনি সিপাহীদের সাথে যোগদান করেন এবং ভারতীয় রাজন্য ও দলপতিদের সিপাহীদের সাথে যোগদানের আহ্বান জানান।[১৪৩]

ব্রিটিশদের ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠা শুরুর প্রাক্কালে একটি অঘোষিত নীতি ছিল দেশীয় প্রভাবশালী গোষ্ঠীগুলোর ক্ষমতা খর্ব করা। আর এই নীতিতে তারা বেশ সফলতা লাভ করে। ক্ষমতাহীন শাসকদের নিজেদের বলয়ে আবদ্ধ রেখে স্বীয় স্বার্থ হাসিল করা তথা উপনিবেশ স্থাপন করা ছিল তাদের লক্ষ্য। রাজনৈতিকভাবে মুঘল সম্রাটের পাশাপাশি দেশীয় রাজন্যবর্গকেও ক্ষমতাহীন করার নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল। ডালহৌসির 'স্বত্ববিলোপ নীতি' তার মধ্যে অন্যতম। ডালহৌসির সম্প্রসারণ নীতি ছিল পূর্বেকার গভর্নরদের গৃহীত নীতির পূর্ণতা প্রদান মাত্র। তার এই নীতির ফলে কেবল রাজনৈতিকভাবে

দেশীয় রাজ্যগুলোর পতন নয়, সর্বত্রই ব্রিটিশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা পায়।[১৪৪] এক এক করে ভারতের স্বাধীন রাজ্যগুলোর পতন যেমন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে সম্প্রসারিত করে তেমনি দেশীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে হারানো মসনদ ফিরে পাবার ব্যাকুলতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাদের সম্প্রসারণ নীতি বিপুল পরিমাণ দেশীয় সৈন্যকে বেকারে পরিণত করে। অযোধ্যার নবাবকে সিংহাসনচ্যুত করার পর নবাবের অধীনে থাকা ৬০ হাজার সৈন্যকে বরখাস্ত করা হয়।[১৪৫] স্বত্ত্ববিলোপ নীতি প্রচলিত হিন্দু ধর্মের বিশ্বাস ও উত্তরাধিকারের মূলে আঘাত করে। ফলে অনেক হিন্দু রাজা ক্ষমতাচ্যুত হন। একদিকে পাঞ্জাব, পেগু, সিকিম দখল এবং অন্যদিকে সাতারা, জৈৎপুর, সম্বলপুর, ভগৎ, ঝাঁসী, উদয়পুর ও নাগপুর স্বত্ত্ব বিলোপ নীতির মাধ্যমে ব্রিটিশ সম্রাজ্যভুক্ত করা হয়। সুশাসন প্রতিষ্ঠার দোহাই দিয়ে অযোধ্যাকেও ব্রিটিশ শাসনভুক্ত করা হয়। কর্ণাটক ও তাঞ্জোরের নবাবদের উপাধি তুলে দেওয়া, দ্বিতীয় পেশোয়ার বাজি রাওয়ের দত্তকপুত্র নানা সাহেবের ভাতা হ্রাস করা ভারতীয়দের মনে দারুণভাবে আঘাত করে।[১৪৬] সিপাহী বিদ্রোহের পেছনে তৎকালীন প্রশাসনিক অবস্থাও ভূমিকা রেখেছিল। ভারতে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার পর থেকে ব্রিটিশদের প্রবর্তিত নীতির প্রয়োগে জনগণের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশী যুদ্ধের মাধ্যমে ভারতে রাজনৈতিক কর্তৃত্বের সূচনা করে ভারতে ইউরোপীয় রীতিনীতির প্রবর্তন করে। এ সকল নীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তি মজবুত করা এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে আরো বেশি লাভবান হওয়া। জন্মগতভাবেই ভারতীয়রা নানাবিধ আচার আচরণের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবোধ প্রদর্শন করে। ব্রিটিশরা তাদের সে শ্রদ্ধাবোধের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করলে ভারতীয়রা তা সহজে মেনে নিতে পারেনি। ভারতীয়দের অসুবিধার কারণগুলো ছিল নিম্নরূপ: প্রথমত; এ দেশীয়রা তাদের চিরায়ত অভ্যাস অনুযায়ী নিজেদের অভিযোগ অনুযোগ সরাসরি ব্যক্ত করতে পারেনা। দ্বিতীয়ত; ভারতীয় ও ইংরেজদের মধ্যে ভাষা ও সংস্কৃতিগত পার্থক্যের কারণে ঘনিষ্ট যোগাযোগ সম্ভব হয়নি। তৃতীয়ত; নৈব্যক্তিক শাসনের সাথে অপরিচিত ভারতীয়রা ব্রিটিশ প্রশাসনের প্রতি বিক্ষুব্ধ হয়। সব শেষে আইন ও বিচারের নতুন প্রকৃতি এবং স্বজনপ্রীতি ব্রিটিশ শাসনের প্রতি জনগণকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে।[১৪৭] বিখ্যাত মুসলিম ব্যক্তিত্ব সৈয়দ আহমদ খান প্রশাসন ও আইন বিভাগে ভারতীয়দের অন্তর্ভুক্তিতে অনীহা ও বঞ্চনাকে সিপাহী বিদ্রোহের মূল কারণ বলে মনে করেন। এছাড়া সরকারের সকল ক্ষেত্র হতে দেশীয়দের বর্জন, প্রশাসনে ফার্সির পরিবর্তে ইংরেজি ভাষার প্রচলন, দেশীয়দের বিশেষ করে মুসলমান সম্প্রদায়কে আয়ের উৎস হতে বঞ্চিত করা, ভারতীয় জনগণের মধ্যে প্রবর্তিত নতুন আইন, বিচার ও শাসন পদ্ধতির উদ্ভূত পরিস্থিতির প্রতি বিরাগভাজনই সিপাহী বিদ্রোহের অন্যতম কারণ বলে তিনি মনে করেন।[১৪৮]

সিপাহী বিদ্রোহের প্রেক্ষাপট ছিল ব্যাপক বিস্তৃত। অনেকগুলো কারণ একসাথে সমন্বিত হয়ে সিপাহী বিদ্রোহকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছিল। সিপাহীদের বিদ্রোহে জড়িয়ে পড়াটা অনেক কারণ দ্বারা ব্যাখ্যা করা হলেও তাৎক্ষণিক কিছু ঘটনাকে সবাই গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। যার কারণে বিদ্রোহের মতো ঘটনার সূত্রপাত ঘটে। সেনাবাহিনীতে বিভিন্ন কারণে দেশীয় সৈন্যদের মধ্যে অসন্তোষ বিরাজিত ছিল। সংখ্যায় বেশি হলেও দেশীয়দের সুয়োগ-সুবিধা ইংরেজদের চেয়ে ছিল অনেক কম এবং বেতনভাতার মধ্যে ব্যাপক বৈষম্য বিদ্যমান ছিল। দেশীয় সিপাহীদের পদোন্নতি ছিল শ্লথ ও সীমিত। ভারতে সিপাহীদের বিদ্রোহাত্মক মনোভাব কেবল ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দেই দেখা যায়নি, এর পূর্বেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। বিভিন্ন সময় সিপাহীদের ওপর বলপূর্বক আরোপিত শর্ত, দেশীয় সিপাহীদের প্রতি ইউরোপীয় সৈন্য ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের অবজ্ঞামূলক মনোভাব, উভয় সেনাদলের মধ্যে সুযোগ-সুবিধাগত বৈষম্য ইত্যাদি সিপাহীদের বিদ্রোহী হতে বাধ্য করে।[১৪৯]

ভারতীয়দের প্রতি ব্রিটিশদের আচার-আচরণ ও মনোভাবের কারণে সিপাহীদের মধ্যে ক্ষোভ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। সিপাহীরা তাদের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ডাক বিভাগের মাধ্যমে অন্যান্য রেজিমেন্টের সৈন্যদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে।[১৫০] চর্বি মাখানো কার্তুজের ব্যবহার সিপাহী বিদ্রোহকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে এনফিল্ড রাইফেল সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ সময় গুজব রটে যে, কার্তুজে গরু ও শুকরের চর্বি ব্যবহার করা হয়েছে। ফলে দেশীয় সিপাহীরা এটিকে সুপরিকল্পিত ভাবে তাদের ধর্মনাশের প্রয়াস হিসেবে মনে করে কার্তুজ ব্যবহারে অসম্মতি জানায়। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৯ মার্চ ব্যারাকপুরে ৩৪ নং দেশীয় পদাতিক ডিভিশনের মঙ্গল পান্ডে নামক একজন ব্রাহ্মণ সিপাহী প্রশিক্ষণ কালে কার্তুজ ব্যবহারে অসম্মতি জানায় এবং এক পর্যায়ে বিক্ষুব্ধ হয়ে সেনাধ্যক্ষকে হত্যা করে।[১৫১] এ ঘটনার প্রেক্ষিতে ৩৪ নং পদাতিক ডিভিশনের সকল সৈন্যকে নিরস্ত্র ও অন্তরীণ করা হয়। মে মাসে মিরাটে ৩ নং অশ্বারোহী বাহিনীর ৮৫ জন সিপাহী এই কার্তুজ ব্যবহারে অসম্মতি জানালে তাদের যাবজ্জীবন কারাদন্ড দেয়া হয়। উত্তেজিত হয়ে ১০ জুন মীরাটের সিপাহীগণ উচ্চপদস্থ ইউরোপীয় অফিসারদের হত্যা করে এবং মহাবিদ্রোহের সূচনা ঘটায়।

সিপাহী ও জনসাধারণের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টিতে প্রচলিত কিছু ভবিষ্যৎবাণী ভূমিকা পালন করে। হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে ভবিষ্যৎবাণী ছিল যে, পলাশী যুদ্ধের একশত বছর পর কোম্পানি শাসনের অবসান ঘটবে।[১৫২] ব্রিটিশ ভারতের নৌবাহিনীর ইতিহাস প্রণেতা ও সিপাহী বিদ্রোহে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারী সি.আর.লো নিজে বহুসংখ্যক ফার্সি বয়ান সংগ্রহ করেন। যার মধ্যে তৎকালীন মুসলমানদের মধ্যকার ভবিষৎবাণী উঠে এসছে। বলা হয়ে থাকে যে, এসব ফার্সি বয়ান ও ভবিষৎবাণী সাতশ বছর পূর্বে

নিয়ামত উল্লাহ নামক জনৈক ভারতীয় সম্পাদনা করেন। এতে ভারতের শাসকবর্গের অবলুপ্তি সম্পর্কে ভবিষৎবাণী রয়েছে। এসব ভবিষৎবাণী অনুযায়ী ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটবে ১২৬০ হিজরী অর্থাৎ ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে। এই প্রচারপত্র প্রায় সমগ্র উত্তর ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। ভারতের বিভিন্ন স্থানে সিপাহীরা বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করতে থাকে। মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ ব্রিটিশ বিরোধী ভূমিকায় নিজেকে তুলে ধরেন। বিক্ষুব্ধ সিপাহীগণ আওয়াজ তোলে–

'খালক-ই-খুদা
মুলক-ই-বাদশা
হুকুম-ই-সিপাহ'।[১৫৩]

অর্থাৎ, পৃথিবী ইশ্বরের; সাম্রাজ্য বাদশাহের এবং নেতৃত্ব সিপাহীদের।

ভারতের বিভিন্ন স্থানে সিপাহীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ব্রিটিশ সরকার সর্বশক্তি দিয়ে তা দমন করার চেষ্টা করে এবং অবশেষে তারা সফল হয়।ব্যাপকভাবে বিদ্রোহ সংগঠিত হলেও এর কেন্দ্রীয় শক্তি ছিল দূর্বল। সাংগঠনিক দুর্বলতা ও বিচ্ছিন্নতা এবং অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ না থাকা ব্যর্থতার অন্যতম কারণ। সিপাহী বিদ্রোহ ছিল বিদেশী শাসন, শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে ভারতীয় সিপাহী, রাজন্যবর্গ ও জনগণের একাংশের বৃহত্তম প্রতিক্রিয়া। তবে তা ব্রিটিশদের কঠোর দমন কৌশল, ভারতের নব্য ধনিকশ্রেণি ও ভূমিকেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত শ্রেণি ব্রিটিশদের অনুকূলে কাজ করায় ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। লর্ড কর্ণওয়ালিশ প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে যে নব্য অভিজাত শ্রেণির সৃষ্টি হয়েছিল তারা ব্রিটিশদের স্বার্থরক্ষায় ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। তাছাড়া অনেক শিক্ষিত ভারতীয় ব্যক্তিত্ব ব্রিটিশদের পক্ষাবলম্বন এবং প্রচারণায় অংশগ্রহণ করে বিদ্রোহের বিপক্ষে প্রচারণা চালায়। রাজা রামমোহন রায়, সৈয়দ আমির আলী, নওয়াব আবদুল লতিফ, স্যার সৈয়দ আহম্মদ খান প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া ভারতের সবস্থানে একই সঙ্গে বিদ্রোহ সংগঠিত না হওয়ায় ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর পক্ষে বিদ্রোহাত্মক অঞ্চলের বিদোহ দমন করা অনেক সহজ হয়ে পড়ে। বিদ্রোহ ব্যর্থ হলেও ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তা আমুল পরিবর্তন এনে দেয়। ভারতে কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটে এবং ব্রিটিশ সরকার সরাসরি ভারতের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে। ভারতে জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটে। রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। তবে একটা বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, যুদ্ধে যোগদানকারী অধিকাংশ সিপাহী ও রাজন্যবর্গের মধ্যে পূর্বতন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ সুস্পষ্ট। এই বিদ্রোহ পূর্ব পরিকল্পিত ছিলনা, অসন্তুষ্ট সিপাহীদের সাথে কোন কোনো ক্ষেত্রে জনগণের একাংশের ঐক্য লক্ষ্য করা গেছে। যাতে জাতীয় চেতনার বহিঃ প্রকাশ ঘটে।[১৫৪]

সিপাহী বিদ্রোহের ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কেই তা প্রভাবিত করে। ব্রিটিশরা মনে করতো এ বিদ্রোহের পেছনে মুসলমানরাই দায়ী। তাই বিদ্রোহ পরবর্তী সময়ে মুসলিম সমাপ্রদায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। মুসলমানদের মধ্যে চাকরিচ্যুতির ঘটনা বেশি ঘটে। ব্রিটিশরা নানাভাবে মুসলমানদের হয়রানি করা শুরু করে।[১৫৫] ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহ ভারতে ব্রিটিশ শাসন কাঠামোতে পরিবর্তন নিয়ে আসে। বিদ্রোহ ব্যর্থ হলেও এর প্রভাব ব্রিটিশদের শাসন কাঠামোতে পড়ে। ব্রিটিশ সরকার এর পেছনে কোম্পানির ব্যর্থতাকে চিহ্নিত করে সরাসরি শাসনক্ষমতা গ্রহণ করে। সরকার ভারত শাসন ব্যবস্থায় বেশ কিছু পরিবর্তন নিয়ে আসে। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের ০২ আগস্ট ব্রিটিশ পার্লামেন্ট এক আইন পাশ করে ভারতের শাসনভার রাণী ভিক্টোরিয়ার হাতে অর্পণ করে। বিলুপ্তি ঘটে কোম্পানির পরিচালক সভার। ব্রিটিশ কেবিনেটের একজন সদস্যকে ভারত শাসনের লক্ষ্যে 'ভারত সচিব' হিসেবে নিয়োগ করা হয়। গভর্নর জেনারেল পদ রহিত করে 'ভাইসরয়' করা হয়।

বিদ্রোহের সময় ব্রিটিশদের কঠোর দমননীতি ভারতীয়দের মনে শঙ্কার উদ্রেক করে। তাই বিদ্রোহ পরবর্তী সময়ে ভারতীয়দের মনে ব্রিটিশ শাসনের প্রতি আস্থাহীনতার জন্ম দেয়। ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের মনোভাব আঁচ করতে পেরে জনগণের মধ্যে আস্থা তৈরি করতে ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের ০১ নভেম্বর রাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্র জারির মাধ্যমে আর কোনো দেশীয় রাজ্য অন্তর্ভূক্ত না করার অভিপ্রায়ে ব্রিটিশদের রাজ্য বিস্তারের নীতি বর্জন করার ঘোষণা দেওয়া হয়। ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে পানি পথের প্রথম যুদ্ধের মাধ্যমে সম্রাট জহির উদ্দীন মুহাম্মদ বাবুর মুঘল সাম্রাজ্যের যে ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন সুদীর্ঘকাল পর ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে আনুষ্ঠানিকভাবে তার পতন ঘটে। প্রকৃতপক্ষে যদিও বহু পূর্বেই মুঘল শাসনের অবসান ঘটেছিল তথাপি নামে মাত্র তা ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত টিকে ছিল। বিদ্রোহের পর যার চূড়ান্ত পতন ঘটে। বিদ্রোহে দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের অংশগ্রহণের অপরাধে তাঁর উত্তরাধিকারীদের হত্যা এবং তাঁকে সস্ত্রীক রেঙ্গুনে নির্বাসন দেয়া হয়।

সিপাহী বিদ্রোহের ফলে শাসক ও শাসিতের মধ্যে এক ধরণের দূরত্ব তৈরি হয়। বিদ্রোহকালীন হিংসাত্মক কার্যাবলি এ দূরত্ব তৈরিতে ভূমিকা রাখে। জন্ম নেয় পারস্পারিক অবিশ্বাসের। ভারতীয়রা কখনো ব্রিটিশ শাসনকে মন থেকে গ্রহণ করতে পারেনি। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের পর ধীরে ধীরে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে। ভারতীয়দের মধ্যে শিক্ষিতশ্রেণি তাদের অধিকার আদায়ে ক্রমশ সোচ্ছার হতে শুরু করে। ক্রমশ দেশাত্মবোধ তৈরি হতে শুরু করে যা পরবর্তী সময়ে স্বাধীনতা অর্জনের দাবিকে ক্রমশ ঘনীভূত করে তোলে। ভারতের রাজনৈতিক ধারায় ক্রমশ পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। পরিবর্তন ঘটে প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক রাজনৈতিক চিন্তাচেতনার। এ সময় থেকেই

উপমহাদেশ একই শাসন কর্তৃপক্ষের অধীনে থাকায় ভারতের রাষ্ট্রীয় ঐক্য দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটে। যা ভারতে শিক্ষার হার বৃদ্ধির সাথে সাথে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত অভিজাত শ্রেণির জন্ম দেয়। এশ্রেণি চিন্তা ও চেতনায় ইউরোপীয় ভাবধারাকে অনুসরণ করা শুরু করে। ফলশ্রুতিতে ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয়তাবোধের জন্ম নেয়। এদেশের জনগণের ওপর পাশ্চাত্যের প্রভাব পড়তে শুরু করে। পলাশী পরবর্তী সময়ের কর্মকান্ড ভারতে পাশ্চাত্যকরণ প্রক্রিয়ার সূত্রপাত ঘটালেও এর গতি ছিল শ্লথ এবং সাধারণ জনগণ তাতে তেমন গুরুত্বারোপ করেনি। পাশ্চাত্যকরণের এই প্রক্রিয়াকে বলা যেতে পারে ব্রিটিশ রাজের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম; যা এদেশে সর্বব্যাপী ও সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের সূচনা করেছিল। ব্রিটিশরা ইচ্ছাকৃতভাবে এদেশে ইংল্যান্ডের শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে না চাইলেও তাদের নানাবিধ পদক্ষেপ ও ব্যবস্থা গ্রহণের দ্বারা এদেশে পাশ্চাত্য চিন্তা ও চেতনা ক্রমে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। ভারতে ইংরেজ শাসনের প্রভাব সম্পর্কে কার্ল মার্কসের (১৮১৮-১৮৮৩) একটি বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে লিখিত একটি প্রবন্ধে এই মত ব্যক্ত করেন যে, 'ইংরেজ শাসনের ফলে ভারতের প্রাচীন আর্থসামাজিক কাঠামো ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে বটে, কিন্তু নতুন বা উন্নততর কোনো ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়নি। তবু পুরনো ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার ফলে সমাজ বিপ্লবের মাধ্যমে নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তনের পথ সুগম হয়েছে'।[১৫৬]

এদেশে শাসন পরিচালনা করতে গিয়ে কোম্পানি ভারতের প্রাচীন স্বৈরতান্ত্রিক ঐতিহ্যকেই অনুসরণ করেছিল। অবশ্য এর পেছনে বেশজোরালো যুক্তিও ছিল। এদেশের সমাজ ও সংস্কৃতির সাথে ব্রিটিশদের পূর্বপরিচয় ছিলনা। তাই প্রতিটি উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার মতো এখানেও একই নীতির প্রতিফলন ঘটে। সমাজতান্ত্রিকরা ঔপনিবেশিক শাসনকে সাম্রাজ্যবাদীদের শোষণক্ষেত্র বলে মনে করে থাকেন। ব্রিটিশরা তাদের পথচলাকে মসৃন করতেই প্রচলিত ঐতিহ্যকে আলিঙ্গন করে শাসন পরিচালনা করে, যা তাদের স্ব-ভূমির সাথে ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। বড়োলাট *লর্ড ডাফরিন* (Lord Dufferin)(1884-1888) ভারতে ব্রিটিশ শাসনকে *একটি অনমনীয় স্বৈরাচার* (A strong and uncompromising despotism) বলে অভিহিত করেছেন।[১৫৭] কিন্তু এই স্বৈরাচার ছিল ভিন্নধরণের। ব্রিটিশদের পূর্বে এদেশের স্বৈরাচার ছিল শাসকদের খেয়াল খুশির ওপর নির্ভশীল। যার কোনো জবাবদিহিতা ছিলনা। কিন্তু ব্রিটিশরা এদেশীয়দের নিকট জবাবদিহি না করলেও ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিকট তারা দায়বদ্ধ ছিল। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে এ জবাবদিহিতা ও দায়িত্ববোধ আরো বৃদ্ধি পায়।

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহ তথা স্বাধীনতা আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ায় ফলে বাংলাদেশের জনগণের উপর ব্রিটিশ সরকারের নির্যাতন ও শোষণের মাত্রা বেড়ে যায়। এছাড়া বিদ্রোহোত্তর ভারতীয়দের মধ্যে

জাতীয়তাবোধ ও রাজনৈতিক সচেতনতার সূচনা ঘটেছিল কালের আবর্তে তা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। এর ফলে শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্তশ্রেণি ইংরেজবিরোধী মনোভাব পোষণ করতে থাকে। ১৮৭৩-৭৪ খ্রিস্টাব্দে ভারতে স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠার দাবি জানানো হয়। এরই প্রেক্ষিতে ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে শিশির কুমার ঘোষের নেতৃত্বে *'ভারত সভা'* (India League) প্রতিষ্ঠিত হয়। অপরদিকে ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী (১৮৪৮-১৯২৫) ও আনন্দ মোহনের উদ্যোগে *'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন'* (Indian Association) প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই সংগঠনের উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টি, দেশের জনমতকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখা এবং জনসাধারণকে বৃহত্তর রাজনৈতিক আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত করা। হিন্দু, মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এতে যোগদান করায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ জাগরণের পথ সুগম হয়। এজন্য সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের অগ্রদূত ও আদিগুরু বলা হয়।[১৫৮]

লর্ড লিটনের (Robert Bulwer-Lytton) শাসনামলে ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে দেশীয় সংবাদপত্র সমূহের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করার উদ্দেশ্যে 'ভার্ণাকুলার প্রেস অ্যাক্ট', 'আর্মস অ্যাক্ট' ও 'লাইসেন্স অ্যাক্ট'সহ কতিপয় কালাকানুন পাস হয়। Indian Association'র নেতাগণ এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। এসব বিক্ষোভের রেশ কাটতে না কাটতেই ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে লর্ড রিপনের (১৮৮০-৮৪) *ইলবার্ট বিল* নতুন বিতর্কের সূচনা ঘটায়। চলমান ঘটনাবলিকে কেন্দ্র করে ইংরেজ সরকারের প্রতি ভারতীয় জনগণ তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করে। ইংরেজ সরকার এ অসন্তোষ দমনে একদিকে দমননীতি, অন্যদিকে গণবিক্ষোভকে শান্তিপূর্ণ পথে পরিচালনা করার জন্য চিন্তাভাবনা করতে থাকে। এদিকে ভারতের বড়োলাট *লর্ড ডাফরিন* (Lord Dufferin) ও *অ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম* (Allan Octavian Hume) ব্রিটিশ অনুগত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের কথা অনুভব করে সিমলায় বসে 'সর্ব ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস' প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।[১৫৯] আলাপ আলোচনায় ভারতীয় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির আগ্রহে, হিউমের উদ্যোগে এবং লর্ড ডাফরিনের সমর্থনে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের ২৮ ডিসেম্বর মাসে মুম্বাই শহরের গোকুলদাস তেজপাল সংস্কৃত কলেজের হলঘরে বাঙালি ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র ব্যানার্জীর সভাপতিত্বে সর্বভারতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়।[১৬০] কংগ্রেস ভারতীয়দের দাবি-দাওয়া গুলোকে নিয়মতান্ত্রিক ভাবে উপস্থাপনের পথকে উন্মুক্ত করে দেয়। পথচলা শুরু হয় সর্বভারতীয় রাজনৈতিক সংগঠনের। হিউম মনে করতেন, দেশের জনগণ বিশেষকরে দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত শ্রেণির মধ্যে সরকারের প্রতি ক্রমান্বয়ে জমা হওয়া ক্ষোভ ব্যাপক আকার ধারণ করতে পারে। যার পরিণতি কখনো শুভ হবেনা। তাই তিনি

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছিলেন।[১৬১] বস্তুত ভারতীয়দেরকে হিংসাত্মক কার্যক্রম থেকে বিরত রেখে শাসনতান্ত্রিক পথে চালিত করাই ছিল এ সংগঠন প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্দেশ্য।

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে মার্কসবাদী ঐতিহাসিক *রজনীপাম দত্ত* (R.P.Datta) একটি *ষড়যন্ত্র তত্ত্বের* (Conspiracy Theory) অবতারণা করেছেন। তাঁর মতে লর্ড ডাফরিন প্রাক্তন আমলা হিউমের সাহায্যে ভারতীয়দের অসন্তোষকে দমিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে কংগ্রেসকে সেফটি ভাল্‌ভ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে। এস.আর মেহরোত্রা অনুরূপ মত দিয়েছেন। রজনী পাম দত্তের মতে, শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের মধ্যে যারা ছিল *আনুগত্যপরায়ণ* (Loyalist) তারা যাতে চরমপন্থিদের সাথে মিলে না যায়, তাদের ধরে রাখার জন্যেই লর্ড ডাফরিন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্র করেন। যে উদ্দেশ্য হাছিলে এটি করা হয়েছিল ভারতবাসীর ক্রমবর্ধমান ব্রিটিশ বিরোধী বিক্ষোভ ও ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাবের হাত থেকে ব্রিটিশ শাসন সুরক্ষিত করা। তিনি মনে করেন জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করে ব্রিটিশ সরকার এক অবশ্যম্ভাবী বিদ্রোহ দমন বা নস্যাৎ করতে সমর্থ হন। *রজনী পাম দত্ত'র* (R.P.Datta) মতে,

> "More than that what is less universally known the National Congress was infact brought into being through the initiative and under the guidence of direct British governmental Policy on a plan secretly pre arranged with the viceroy... as an intended weapon for safeguarding British Rule against the rising forces of popular unrest and anti-British feeling."[১৬২]

কংগ্রেস নেতা গোপালকৃষ্ণ গোখলের ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের একটি মন্তব্যে এর সমর্থন মেলে। তিনি বলেছেন,

> কোনো ভারতীয়ের পক্ষে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব ছিল না। কোনো ভারতীয় যদি সারা ভারত জুড়ে একটা আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য এগিয়ে আসতেন তাহলে ভারতে রাজকর্মচারীরা নিশ্চয়ই সেই আন্দোলন গড়ে ওঠার পথ রুদ্ধ করে দিতেন। রাজনৈতিক আন্দোলন সম্পর্কে সরকারের সন্দেহ তখন এত প্রবল ছিল যে, কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা যদি একজন বিখ্যাত ও সম্ভ্রান্ত ইংরেজ এবং প্রাক্তন আমলা না হতেন তাহলে কর্তৃপক্ষ কোনো না কোনো অছিলায় এই আন্দোলন দমন করতেন।[১৬৩]

সর্বভারতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দাদাভাই নওরজী, স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য নেতাগণ কংগ্রেসে যোগদান করেন। এর ফলে ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনে ভারতীয় ব্রিটিশ অনুগত শিক্ষিত শ্রেণির আশা আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্ররূপে ইংরেজ সরকারের আর্শীবাদপুষ্ট ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হয়। কংগ্রেসের জন্ম ব্রিটিশ সরকারের শত্রু নয়, মিত্র হিসেবে বলা হয়। ব্রিটিশ সরকারের মূল লক্ষ্য ছিলন ভারতের মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে আন্দোলনের পথ থেকে সরিয়ে ব্রিটিশ শাসনের অনুকূলে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলা।[১৬৪] ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠালগ্নে বলা হয়, এটি সরকারের সমালোচনায় নরম পন্থা অবলম্বন করবে। ব্রিটিশ

সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশই হবে এর মূল ভিত্তি।[১৬৫] কংগ্রেস প্রথম থেকেই স্বায়ত্বশাসনের বিকাশ ঘটানো, সামরিক ব্যয় হ্রাস, ইন্ডিয়া কাউন্সিলের অবসান ঘটানো, বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ, ভারতীয় জনগণকে সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদান প্রভৃতি দাবি ব্রিটিশ সরকারের নিকট উত্থাপন করতে থাকে। এ ব্যাপারে কংগ্রেসের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল, এটি ইংরেজ শাসক ও রাজতন্ত্রের প্রতি অবিচল আস্থা এবং ব্রিটিশ সরকারের উদারনীতি ও ন্যায়বিচারের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস স্থাপন করা। প্রথম দিকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ছিল ব্রিটিশ সরকারের প্রতি অনুগত উদারনৈতিক মধ্যপন্থি রাজনৈতিক দল যার সদস্য ছিল নব্য অভিজাত ও শিক্ষিত উচ্চবিত্তশ্রেণি। যারা সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে ছিল। ফলে এর শ্রেণি চরিত্র বিশ্লেষণ করলে তা সর্বসাধারণের প্রতিনিধিত্বকারী দল বলে বিবেচিত হয়না। ব্রিটিশ সরকারের নানামুখী পদক্ষেপ ও ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন এদেশীয় জনগোষ্ঠীর একটি অংশকে ব্রিটিশদের অনুগত শ্রেণিতে পরিণত করেছিল। আর এরাই ছিল কংগ্রেসের মূল শক্তি, যার অধিকাংশই ছিল হিন্দু। তবে কংগ্রেস যে কেবল হিন্দুদের প্রতিষ্ঠান ছিল একথা বলা যায়না। প্রথম দিকে কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে কিছুটা দ্বিধা ছিল। তাই অল্প কয়েকজন মুসলমান এতে অংশ নেন। সরকার ও কংগ্রেস নেতাদের কার্যক্রমে মুসলমানদের মধ্যে এক ধরণের দ্বিধার জন্ম নেয়। মুসলিম নেতৃবৃন্দ পুরোপুরি সন্দেহমুক্ত হতে পারেননি। তাই সৈয়দ আহম্মদ খানের মতো মুসলিম নেতা কংগ্রেসের আচরণে শঙ্কিত হয়ে মুসলমানদের কংগ্রেসে যোগদান থেকে বিরত থাকতে বলেন।

ব্রিটিশের কংগ্রেস প্রীতি এবং কংগ্রেসের হিন্দু ঘেষা নীতি মুসলমানদের ক্রমশ দূরে ঠেলে দেয়। ইংরেজি শিক্ষাকে ভালোভাবে গ্রহণ না করার ফলে মুসলিম সমাজে অবক্ষয়ের সূচনা ঘটে। মুসলমানরা চাকরি থেকে বাদ পড়তে শুরু করে।সরকার মুসলমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে পঙ্গু করে দিলে ক্রমান্বয়ে মুসলমানরা অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। অন্যদিকে হিন্দুরা ইংরেজি শিক্ষাকে সাদরে গ্রহণ করে চাকরি ক্ষেত্রে সুবিধা গ্রহণ করে। হিন্দুদের ক্রমান্বয়ে প্রশাসন ও অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রচারণা বৃদ্ধি পায় এবং মুসণমানরা ক্রমশ দরিদ্র হতে শুরু করে। শিক্ষা ও সম্পদের পার্থক্য হিন্দু এবং মুসলিম সম্প্রদায়কে ক্রমশ দূরে ঠেলতে থাকে। অঙ্কুরিত হয় সম্প্রদায়গত বিদ্বেষের। ঊনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে এই দুই সম্প্রদায়ের বিদ্বেষের চিত্র অঙ্কিত হয়। খ্যাতনামা গোড়া হিন্দু সাহিত্যিকগণ নানাভাবে মুসলমান সম্প্রদায়কে অবজ্ঞা করতে শুরু করলে বিদ্বেষভাব আরো ঘনীভূত হয়। উন্মেষ ঘটে হিন্দু জাতীয়তাবাদী চেতনার যা পরবর্তীতে রাজনৈতিক রূপ পরিগ্রহ করে বিশ শতকের রাজনীতিতে বড় বিষয় হিসেবে দেখা দেয়। ঊনিশ শতকের মধ্যভাগ হতে হিন্দু সমাজে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের সূচনা ঘটে। হিন্দু পন্ডিতগণ তাদের লেখনি দ্বারা জাতীয়তাবাদের আদর্শে জনগণকে উজ্জীবিত করা শুরু করেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-৫৯), রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র ও নবীন সেন প্রমূখ উল্লেখযোগ্য।[১৬৬]

১৮৮৫ থেকে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কংগ্রেসের আন্দোলনের প্রধান বিষয় ছিল ভারতীয়দের উচ্চপদে নিয়োগ প্রদান এবং প্রশাসনে ভারতীয়দের দাবি সুপ্রতিষ্ঠিত করা। কিন্তু ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে *বাংলা ভাগের* (Partition of Bengal) সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে চরমপন্থী কংগ্রেস নেতাগণ মাথাচারা দিয়ে উঠে। এর ফলে অরবিন্দ ঘোষ, লালা লাজপাত, বাল গঙ্গাধর তিলক, প্রমুখ চরমপন্থী নেতৃবৃন্দ আনুগত্য রাজনীতির পরিবর্তে আন্দোলন, বয়কটসহ বৈপ্লবিক আন্দোলনের উপর গুরুত্ব প্রদান করেন। তাঁরা ভারতীয় সংস্কৃতি বিশেষ করে হিন্দুধর্মের অতীত গৌরবের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাপোষণ করতেন। ফলে চরমপন্থি কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের আন্দোলন ভারতীয় মুসলমানদের মনে সন্দেহের সৃষ্টি করে। অবশ্য বাংলা বিভাজনের ঘটনা হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের অবনতি ঘটায়। চরমপন্থি নেতাদের এ আন্দোলন দ্রুত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে রূপনেয় এবং এটি সকল শ্রেণির লোকের মধ্যে সম্প্রসারিত হয়।[১৬৭] জাতীয় কংগ্রেসের উপর ব্রিটিশ সরকারের দমননীতি বৃদ্ধি পেলে ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন দানা বেধে উঠে। বাংলায় এ আন্দোলন ক্রমান্বয়ে বৈপ্লবিক রূপ পরিগ্রহ করে। অরবিন্দকুমার ঘোষ, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ও ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ এ আন্দোলনের নায়ক হিসেবে আবির্ভূত হন। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে মুজাফ্ফরপুরে জেলা প্রশাসক *কিংস্ফোর্ড* (Douglas Kingsford) কে হত্যা পরিচালনায় প্রফুল্ল চাকী আত্মহত্যা করে ও ক্ষুদিরাম বসুর ফাঁসি হয়। এ দু'জন ভারতীয় জনগণের নিকট বৈপ্লবিক আন্দোলনের মহানায়কে পরিণত হয়। স্বদেশী ও বৈপ্লবিক এ দ্বিমুখী আন্দোলনের চাপে ব্রিটিশ সরকার ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের ১২ ডিসেম্বর এক রাজকীয় ঘোষণায় বঙ্গবিভাগ রদ ঘোষণা করায় হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিজয় সূচিত হয়। বিজয়ের এ চেতনা হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণির চেতনাকে শাণিত করে।

১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে মোহনদাশ করমচাঁদ গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮) ভারতে আগমন করে কংগ্রেসের রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত হন। তিনি ব্রিটিশ বিরোধী বৈপ্লবিক কর্মকান্ডের বিরোধীতা করেন। তিনি ধর্ম নিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী ছিলেন এবং হিন্দু-মুসলিম বিরোধকে মানবতা ও স্বার্থ বিরোধী কাজ বলে গণ্য করতেন। তাঁর অহিংস ও ধর্মনিরপেক্ষ নীতি এবং সহজ-সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাপন সকলের নিকট আবেদন সৃষ্টি করে। সকল ধর্ম ও বর্ণের মানুষ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাঁকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে আসীন করতে তাঁর এ ব্যক্তিগত ইমেজ সহায়ক হয়। তিনি মুসলিম লীগকে সাথে নিয়ে ব্রিটিশ বিরোধী খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন শুরু করলেও চূড়ান্ত পর্যায়ে আপসপন্থার মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী হিসেবে আবির্ভূত হন।

পলাশী উত্তর (১৭৫৭-১৮৫৭) মুসলমানদের অবস্থান মূল্যায়ন করে ড.ওয়াকিল আহমদ লিখেছেন, বস্তুত ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশী যুদ্ধে পরাজয়ে রাজক্ষমতা-চ্যুতি, ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে

জমিদারীর সংখ্যা হ্রাস, ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে বাজেয়াপ্ত আইনে নিষ্কর ভূমির রায়তিস্বত্ব লোপ, ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে ফারসির রাজভাষাচ্যুতি-পর পর এই চারটি বড় আঘাতে পূর্বের শাসকশ্রেণি নিঃস্ব, রিক্ত; নিরক্ষর-নিষ্ক্রীয় ও নির্জীব জাতিতে পরিণত হয়। ইংরেজের প্রশাসনিকও শিক্ষানীতির ফলেই এরূপ হয়।[১৬৮] বাংলার মুসলমানদের জন্য যা ছিল ইতিহাসের ভয়াবহতম বিপদ-বিপর্যয়, এই বর্ণহিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণির জন্য তা ছিল প্রভূপরিবর্তন এবং নব্যপ্রভূর সিঞ্চিত আর্শীবাদে জীবনের সকলদিক কানায় কানায় পূর্ণ ও পুষ্ট করার ঘটনা। মুসলমানদের এহেন লাঞ্চনার পটভূমিতে বঙ্কিমগুরু ঈশ্বর গুপ্ত প্রমূখ কবিকণ্ঠে ধ্বণিত হলো ইংরেজ প্রভূর বিজয় বন্দনাঃ

'ভারতের প্রিয় পুত্র হিন্দু সমুদয়
মুক্ত মুখে বল সবে ব্রিটিশের জয়।'[১৬৯]

বস্তুত ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দ মধ্যবর্তী সময়ে বাংলা তথা ভারতীয় রাজনৈতিক অঙ্গনে বিশেষ অস্থিরতা দেখা দেয়। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে সিপাহীদের মাধ্যমে যে বিদ্রোহ সূচিত হয় তা সফলভাবে দমনের ফলে ভারতের ক্ষমতা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পরিবর্তে সরাসরি ব্রিটিশ সরকার গ্রহণ করে।[১৭০] ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহ এবং ওয়াহাবী আন্দোলনের ফলে ভারতের ব্রিটিশ প্রশাসনের একটি অংশ মুসলমানদের বিরুদ্ধে শক্তনীতি প্রয়োগের সুপারিশ করে। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার তাতে দ্বিমত প্রকাশ করে মুসলমানদের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে সেগুলো সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশনা দেয়।[১৭১] ফলশ্রুতিস্বরূপ ব্রিটিশ আমলা *হান্টার* (W.W.Hunter) মুসলমানদের সমস্যাগুলো উল্লেখ করে *'দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস্'* (The Indian Musulmans) গ্রন্থটি রচনা করেন।[১৭২] আলোচিত এ গ্রন্থটিতে যদিও মুসলিম সম্প্রদায়ের সঠিক চিত্র তুলে ধরা হয়নি। গ্রন্থটিতে লেখক বাংলার মুসলমানদের শিক্ষা বিষয়ে আলোকপাত করেন। ভাইসরয় লর্ড মেয়ো এ বছরই মুসলমানদের শিক্ষা বিষয়ক একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন। প্রস্তাবটিতে মুসলমানদের শিক্ষারপ্রতি মনোযোগী হতে প্রশাসনকে বলা হয়। প্রস্তাবটিকে মুসলমানদের শিক্ষাক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি বলে বিবেচনা করা হয়।[১৭৩] এহেন ইংরেজ আনুকূল্যে মুসলিম সম্প্রদায় ক্রমশঃ শিক্ষাদীক্ষায় অগ্রসর হতে থাকে।

বাংলায় মুসলিম মধ্যবিত্ত হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণির মতো সৃষ্টি হয়নি। পাঠান বা মুঘল রাজত্বকালে একদল মধ্যবিত্তের সৃষ্টি হয়। ভূমিসংক্রান্ত বা অন্যান্য রাজকীয় পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার ফলে এদেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণির সর্বপ্রথম উদ্ভব ঘটে। পাঠান বা মুঘল আমলে কোন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা ছিল না। প্রত্যেক পরগণা বা একাধিক পরগণাতে স্থায়ী শাসন পরিচালনার জন্য একজন জমিদার নিয়োগ দেয়া হতো। তিনি তার এলাকার দেওয়ানি ও ফৌজদারি সংক্রান্ত শাসনকার্য পরিচালনা অথবা প্রজাদের নিকট থেকে খাজনা আদায় করে কমিশন স্বরূপ শতকরা ৩ থেকে ৪ অথবা ৫ থেকে ৬ লাভ করতেন। চৌধুরীরা

জমিদারদের নিকট থেকে রাজস্ব আদায় করে তা জেলার খাজাঞ্চির নিকট দাখিল করে কর্তব্য আদায় করতেন।[১৭৪] জরিপাদি কাজের জন্য প্রত্যেক পরগণায় মজুমদার, পুরকায়স্থ বা পটোয়ারী নিযুক্ত থাকতেন। আইন-আদালতে ছিলেন আলাসদর আমিন, মুন্সেফ প্রভৃতি লোকেরা। কাজী ছিলেন বিচারের কর্তা। ইসলামী আইনের ব্যাখ্যা করতেন মুফতিরা। তাছাড়া বড়বড় পীর দরবেশের দরগাতে চেরাগবাতি দেবার জন্য মুসলিম যুগে উপযুক্ত লোককে মদই-ই-মাল বা আহার সংস্থানের সাহায্যকল্পে বিশাল ভূ-সম্পত্তি দেয়া হতো। কোন সেনাধ্যক্ষ বা আলেমকে লাখেরাজ ভূ-সম্পত্তি দান করা হতো। পূরুষাণুক্রমে এরা এসবভূ-সম্পত্তি ভোগ করতেন। কেবল এরাই নয়, পুরকায়স্থ, পাটোয়ারী, কাজী, রাজপন্ডিত ও মুফতিদের পদ বংশানুক্রমিক ছিল বলে পাঠান ও মুঘল আমলে একদল মধ্যবিত্তের সৃষ্টি হয়।[১৭৫] ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় ইংরেজরা পূরাতন আমলের মুসলিম জমিদারদের সঙ্গে বন্দোবস্ত না করে তাদেরসৃষ্ট সদ্যোত্থিত মধ্যবিত্তের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে। জমিদার পরিবারের লোকদের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দিলেও তৎকালীন বেনিয়া, মুৎসুদ্দি প্রভৃতিদের কারসাজিতে এরা তাদের বন্দোবস্তকৃত ভূমি নিজেদের দখলে রাখতে সমর্থ হয়নি। কাজেই এদের অধিকাংশই জমিদারশ্রেণি থেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে পরিণত হয়।[১৭৬]

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের স্বাধীনতা আন্দোলনের হতাশাজনক অভিজ্ঞতা পরবর্তী সময়ে উত্তর ভারতে সৈয়দ আহমদ খান মুসলমানদের শিক্ষা আন্দোলন শুরু করেন। অল্পকয়েক নব্যশিক্ষিত মুসলমান ব্যক্তিগত ভাবে অথবা সভাসমিতি গঠনের মাধ্যমে বাংলায় এ আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটান। যদিও উপমহাদেশের প্রথম মুসলিমসংগঠন হিসেবে ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় 'আঞ্জুমান-ই-ইসলামি' প্রতিষ্ঠিত হয়।[১৭৭] এ সংগঠনটি তার লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হলেও বাংলায় মুসলিম সমাজের আধুনিক শিক্ষায় পথিকৃৎ নবাব আবদুল লতিফ এই সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলেন। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের পর তিনি মুসলমান সমাজের উন্নতির জন্য উদ্যোগ নেন এবং ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে' *মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি*' (Mohamedan Literary Society) প্রতিষ্ঠা করেন।

ড. ওয়াকিল আহমদ বলেন, এই সোসাইটি মুসলমান সমাজে শিক্ষা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কারের জন্য গঠিত কমিশনে নবাব আবদুল লতিফ সদস্য হন। সোসাইটির সভায় আলোচিত সুপারিশসমূহ এই কমিশনে গৃহীত হয়।[১৭৮] আবদুল লতিফ ইংরেজি শিক্ষার পাশাপাশি আরবি-ফার্সি শিক্ষার উপর জোর দেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে একথা বলা যায় আবদুল লতিফের শিক্ষা সম্পর্কীয় কার্যক্রমের ফলে উর্দু-ফার্সি ভাষী উচ্চবিত্ত মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে আগ্রহ সৃষ্টি হয়। সাথে সাথে ব্রিটিশ প্রশাসনের সাথে উচ্চবিত্ত মুসলমান শ্রেণির

নিবিড় যোগাযোগের পথ সুগম হয়। তাঁরই প্রচেষ্টায় ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা হিন্দু কলেজ প্রেসিডেন্সি কলেজে রূপান্তরিত হয়[১৭৯] ও মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র আসনের ব্যবস্থা করে ইংরেজি শিক্ষার কিছু ব্যবস্থা করা হয়।[১৮০] তারই ফলশ্রুতিতে মুসলমান গ্রাজুয়েট, জজ, ব্যবহারজীবি, ডাক্তার ও জননেতার সাক্ষাৎ মেলে যা পূর্বে দেখা যায়নি।

নবাব আবদুল লতিফের পর সৈয়দ আমীর আলী মুসলিম সমাজের কল্যাণ সাধনে তৎপর হন। রাজনৈতিক অধিকার আদায় এবং ইংরেজি ও আধুনিক শিক্ষার প্রতি প্রতি জোর দেন। এ লক্ষ্যে তিনি ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে *'ন্যাশনাল মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন'* (National Mohamedan Association) প্রতিষ্ঠা করেন এবং শীঘ্রই মাদ্রাজ থেকে সিন্ধু পর্যন্ত প্রায় সকল প্রদেশে চৌত্রিশটি শাখা খোলা হয়। এজন্য সংগঠনটির নাম কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করে *'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন'* (Central National Mohamedan Association) রাখা হয়।[১৮১] এ সমিতির উদ্দেশ্য সম্পর্কে সৈয়দ আমীর আলী বলেন, আইনগত ও নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় ভারতীয় মুসলমানদের কল্যাণের জন্য এই সমিতি গঠন করা হয়েছে। এ সমিতি ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্যের নীতি অনুসরণ করবে। মুসলমানদের অতীতের গৌরবময় ঐতিহ্য হতে অনুপ্রেরণা গ্রহণ করবে এবং তাদের মধ্যে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান ও প্রগতিশীল মতবাদে আগ্রহী করে তুলতে প্রচেষ্টা চালাবে। ভারতীয় মুসলমানদের নৈতিক জীবন সুসংহত, তাদের পুনর্জাগরণের পথ সুগম করবে। এ সমিতি ভারতের বিশেষত মুসলমানদের স্বার্থের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।[১৮২] সৈয়দ আমীর আলী ভারতীয় মুসলিম সমাজের উন্নতির জন্য এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রচেষ্টা শুরু করেন। প্রতিষ্ঠা পরবর্তী দশবছরে সমগ্রভারতে এর ৫২টি শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়।[১৮৩] মুসলিমসমাজের সার্বিক উন্নতি প্রধানলক্ষ্য হলেও শিক্ষাক্ষেত্রে অ্যাসোসিয়েশনের প্রচেষ্টার কমতি ছিল না। মুসলমান শিক্ষার্থীদের জন্য রিপনবৃত্তির প্রবর্তন ও কলকাতা মাদ্রাসাকে কলেজস্তরে উন্নীতকরণ প্রচেষ্টার ফলে প্রশাসন ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে মাদ্রাসায় কলেজ মানের শিক্ষার ব্যবস্থা করে। তবে অ্যাসোসিয়েশনটি নারীশিক্ষা প্রসারে রক্ষণশীলদের বিরুদ্ধে সক্রিয় ছিলনা বলে জানা যায়।[১৮৪] সাংগঠনিক তৎপরতায় পদক্ষেপ হিসেবে খুলনা শাখা মুসলিম ছাত্রদের বোডিং স্থাপনের জন্য চাঁদা তোলার আহ্বান এবং মেদিনীপুর শাখার নেতৃবৃন্দ মাদ্রাসা ও স্কুল বোডিংয়ের উন্নতির জন্য তৎকালীন ছোটলাট ইলিয়ট সমীপে একটি স্মারকলিপি প্রদান করে। রংপুর মাদ্রাসার বৃহৎভবন এবং ছাত্রাবাস নির্মাণে রংপুর শাখার সাফল্যের পরিচয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। উক্ত অ্যাসোসিয়েশনের শাখাসমূহ বাংলার অন্যান্য শহরেও রাজনৈতিক কর্মকান্ডের সাথে সাথে শিক্ষাক্ষেত্রেও ভূমিকা রেখেছিল মর্মে তথ্য পাওয়া যায়।

এদিকে ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের আদমশুমারিতে দেখা যায় বাংলায় মুসলমান জনগোষ্ঠী মোট জনসংখ্যায় ৪৮.৮%।[১৮৫] কিন্তু ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দের আদমশুমারীতে দেখা যায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় মুসলমান সম্প্রদায় বাংলায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে।[১৮৬] পরবর্তী বছরগুলোতে এই বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে। এ রিপোর্টের ফলে মুসলমান সমাজে বিশেষত নেতৃস্থানীয় লোকদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ সচেতনতা বৃদ্ধি পায় যা পরবর্তীতে বাংলার সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসকে প্রভাবিত করে। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে *'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন'* (Central National Mohamedan Association) ভাইসরয় লর্ড রিপনের নিকট একটি স্মারকলিপি পেশ করে মুসলমানদের শিক্ষা এবং সরকারি অফিস-আদালতে একেবারেই অল্পসংখ্যক মুসলমানের নিয়োগ সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়। মুসলমানদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট সমস্তআইন প্রণয়নের প্রতিও সরকারের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে।[১৮৭] ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে সংগঠনটি পুনরায় বাংলা সরকারের নিকট স্মারকলিপি পেশ করে উচ্চপদস্থ চাকুরির ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষার পরিবর্তে মুসলমানদের মনোনয়নদানের দাবি জানায়। এ সকল কার্যক্রমের মাধ্যমে মুসলমানরা একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে বিকশিত হওয়ার প্রচেষ্টা চালায়।

হিন্দুসমাজে ইংরেজিশিক্ষা প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজদের ভাবধারাও অনুপ্রবেশ করে। ভারতীয়দের নানাবিধ দাবি-দাওয়া ইংরেজ সরকারের গোচরীভূতকল্পে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হলেও পরবর্তীকালে এই কংগ্রেসের মধ্যেই ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব দানা বাধতে থাকে। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের স্বার্থে লর্ড কার্জন (১৮৯৯-১৯০৫) কর্তৃক বাংলা বিভাগ সম্পুর্ণ করা হলে এর বিরুদ্ধে সমগ্র বাংলায় আগুন জ্বলে উঠে।[১৮৮]

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের *বঙ্গ বিভাগ* (The Partition of Bengal,1905) ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের প্রথমস্বাধীনতা আন্দোলন বা সিপাহী বিপ্লবোত্তর মুসলমানদের প্রতি ব্রিটিশদের মনোভাব, হিন্দুদের ব্রিটিশঘেষা নীতিগ্রহণ, শিক্ষা ও চাকরি ক্ষেত্রে মুসলমানদের পশ্চাৎপদ অবস্থান, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রগুলোতে হিন্দুদের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা বাংলার হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়কে স্বতন্ত্র ধারায় প্রবাহিত করে। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের বাংলা বিভাগের দ্বারা তা আরো বেশি স্পষ্ট ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে গতিদান করে। বস্তুত শাসনতান্ত্রিক প্রয়োজনে বাংলাকে দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল। তৎকালীন ভারতে বাংলা প্রেসিডেন্সি ছিল সবচেয়ে বড় প্রদেশ। বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে এপ্রদেশ বিস্তৃত ছিল। এর আয়তন ছিল ১৭৯,০০০ বর্গমাইল। একজন গভর্নরের পক্ষে যা পরিচালনা করা ছিল অসম্ভব।[১৮৯] লর্ড কার্জন ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলা বিভক্ত করলেও এর জন্য তিনি এককভাবে দায়ী নন। বাংলার ভৌগলিক বিভাজন তার পূর্বসূরীদের নীতির প্রতিফলন মাত্র।[১৯০]

তিনি ভাইসরয় থাকাকালে এবিষয়ে তার অজান্তেই আলোচনা চলে। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে লর্ড ডালহৌসী (১৮৪৮-১৮৫৬) বাংলার লেফট্যানেন্ট গভর্নরের ওপর এত বেশি প্রশাসনিক দায়িত্ব চাপিয়ে ছিলেন যে, যা কোনো একজনের পক্ষে তা পালন করা অসম্ভব ছিল। ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে স্যার উইলিয়াম গ্রে এর পুনরাবৃত্তি করেন এবং এ বছরে উড়িষ্যায় সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ একে আরো অবশ্যম্ভাবী করে তোলে।[১৯১]

বাংলা প্রেসিডেন্সির আয়তনের বিশালতা ও জনসংখ্যার কারণে তা একজনের দ্বারা চালাতে গিয়ে ব্রিটিশ প্রশাসনের রীতিমত হিমশিম খেতে হয়েছিল। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের আদমশুমারিতে জনসংখ্যা ০৬ কোটি ৭০ লক্ষ[১৯২] হলেও ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তা ০৭ কোটি ৮৫ লক্ষে উন্নীত হয়।[১৯৩] বিস্তৃত অঞ্চল ও বিশাল সংখ্যক জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করতে নানা পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে জনগণের মধ্যে সরকারের এক কেন্দ্রিক শাসনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। বাংলা প্রেসিডেন্সিকে পূনর্বিন্যাস করার ক্ষেত্রে প্রশাসনে নানা প্রস্তাব আসতে থাকে। লর্ড কার্জন প্রশাসনিক দায়িত্ব নেওয়ার পূর্বেই এর কার্যক্রম শুরু হয় এবং কার্জনের সময়ে তা বাস্তবায়িত হয়। ভারত ত্যাগের পরে '*The Statement and Friend of India*'-এ প্রকাশিত কার্জনের মন্তব্যসমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বাংলা বিভাজন কার্জনের আকস্মিক কোন খেয়াল নয়, বরং তা ছিল ব্রিটিশ প্রশাসনের দীর্ঘ বিবেচনার ফসল।[১৯৪] ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে আসামের প্রধান কমিশনার উইলিয়াম ওয়ার্ড ঢাকা ও ময়মনসিংহকে আসামের সাথে অন্তর্ভূক্ত করার যে পরামর্শ দিয়েছিলেন তা পুনরুজ্জীবিত করা হয়। কেননা যদি চট্টগ্রামকে আসামের সাথে যুক্ত করা যায় তাহলে আসাম প্রদেশ নিজেদের কার্যকর স্বতন্ত্র ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারবে। রাজস্ব বোর্ডের অনেক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এ ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দেন। এসব সত্ত্বেও ভারত সরকার এর সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সচেতন ছিল। কিন্তু জনগণের বৃহৎ স্বার্থের কথা বিবেচনা করে রদবদলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।[১৯৫]

বাংলা প্রেসিডেন্সি বিভক্তির খসড়া বা পরিকল্পনা প্রকাশিত হলে ধারণা অনুযায়ী তা ব্যাপক আলোচনার সূত্রপাত করে। এ বিভক্তির বিরোধিতা করে বিভিন্ন মহল থেকে সরকারের নিকট বিভিন্ন স্মারকলিপি প্রদান করা হয় এবং সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতে অনুরোধ করা হয়।[১৯৬] পূর্ব বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসের এ পরিকল্পনা সমর্থন করেন এই যুক্তিতে যে, এর ফলে বাংলার অবহেলিত এ অঞ্চলের জনগণ এতে লাভবান হবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, দুর্ভিক্ষ মোকাবিলা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন, প্রতিরক্ষা ও ভাষাগত সমস্যা সমাধান এবং অধিকতর সুশাসন নিশ্চিত করার সদিচ্ছা সরকারকে বৃহৎ বাংলা প্রদেশকে বিভক্ত করতে উদ্বুদ্ধ করে। পূর্বাঞ্চলকে আরও উন্নত ও প্রশাসনের কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ম্যাকফারসন যে ধারণা দিয়েছিলেন তাতে বাংলা বিভাজনের প্রয়োজনীয়তার বীজ লুক্কায়িত ছিল।[১৯৭]

বাংলার পূর্বাঞ্চল নানাদিক দিয়ে পিছিয়ে ছিল। এখানকার অর্থনীতি ছিল কলকাতা কেন্দ্রিক। জমিদারার কলকাতাতে বসবাস করতেন। ফলে ভূমিতে অনুপস্থিত জমিদারদের কল্যাণে এক ধরণের সুবিধাভোগী শ্রেণির জন্ম হয় যাদের অত্যাচারে চাষীরা চরম দুর্গতিতে পড়ে। এ অঞ্চলের শিক্ষা-দীক্ষাও ছিল অপরিপক্ক ও অবহেলিত।[১৯৮] পূর্ব বাংলার যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল একমাত্র নদী কেন্দ্রিক। যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের তেমন কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। ফলে এ অঞ্চলের অর্থনীতি ক্রমশ স্থবির হতে শুরু করে। এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক অনগ্রতার কারণ সম্পর্কে ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে বিধান সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে সৈয়দ শামসুল হুদা উল্লেখ করেন যে, বাংলা বিভক্তির পূর্বে পূর্ব বাংলার বেশিরভাগ অর্থ কলকাতা ও তার আশেপাশের অঞ্চলে খরচ করা হতো। স্কুল-কলেজ ও হাসপাতালগুলো কলকাতাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। অথচ পূর্বাঞ্চল সে তুলনায় কত পিছিয়ে আছে।[১৯৯]

পূর্ব বাংলার অবহেলিত জনগণের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন ও আইন শৃঙ্খলার উন্নয়নের বিষয়টিকে বিশেষ বিবেচনায় নিয়ে ব্রিটিশ সরকার বাংলাকে বিভক্তকরে। তবে বাংলার বিভক্তিতে ব্রিটিশদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য যে একেবারেই নেই তা বলা মুশকিল। বাংলা ছিল ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সূতিকাগার বা মূলকেন্দ্র। বাংলাকে কেন্দ্র করেই সকল আন্দোলন-সংগ্রাম পরিচালিত হতো। ব্রিটিশ সরকার বাংলাকে বিভক্ত করে আন্দোলনের গতিকে স্তিমিত করতে চেয়েছিল বলে মনে করা হয়। এছাড়া বাংলার জনগণের মধ্যকার বিভক্তি রেখা টেনে ব্রিটিশরা তাদের শাসনের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা করেছিল অনুমিত হয়।[২০০] নতুন প্রদেশের খসড়া অনুসারে তা ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিভাগ এবং মালদহ জেলা, পার্বত্য ত্রিপুরা রাজ্য ও আসাম নিয়ে গঠিত হবে। ঢাকা হবে নবগঠিত প্রদেশের রাজধানী। ভারত সচিব সেন্টজন ফ্রেডরিক ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ০৯ জুন এ পরিকল্পনা অনুমোদন করেন। ১৯ জুলাই ভারত সরকার তা চূড়ান্ত অনুমোদন করে এবং ১৬ অক্টোবর ব্যামফিল্ড ফুলার নবগঠিত প্রদেশের ছোট লাট নিয়োগ করে বাংলা বিভাগ কার্যকর করা হয়। এ বিভক্তিতে নবগঠিত পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমরা তাদের উন্নতির আশায় উল্লসিত হয়। কিন্তু এ বিভক্তিকে কংগ্রেস ভালো চোখে দেখেনি।

১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে যখন এপরিকল্পনা প্রথম প্রকাশিত হয় তখন অনেকে এর বিরোধিতা করেন। বাংলা বিভাগের মূল বিরোধিতাকারী ছিল শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণি। *'দি বেঙ্গলি'* (The Bengalee) প্রত্রিকার সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী এর তীব্র প্রতিবাদ করেন। তিনি জনগণকে এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের আহ্বান জানান।[২০১] বাংলা বিভাগের বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল তা ছিল অনেকটা স্বার্থবাদী সুবিধাভোগী শ্রেণির তৎপরতা মাত্র। কলকাতাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠা অর্থনৈতিক

বলয় ভেঙ্গে যাওয়ার আশঙ্কা থেকেই তা অনুরিত হয়েছিল। কলকাতার আইনজীবী, জমিদারশ্রেণি, সংবাদপত্র মালিকেরা এবং ব্যবসায়ীশ্রেণি নিজেদের আশু ক্ষতির কথা চিন্তা করে সরকারের ঘোষিত নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠে।[২০২] শিক্ষিত বাঙালি হিন্দুরা মনে করতো কার্জন ইচ্চাকৃতভাবে বিকাশমান বাঙালি জাতীয় চেতনাকে স্তব্ধ করতে বাঙালিদের মধ্যে বিভক্তি রেখা টেনেছেন।[২০৩] তারা আরও বিশ্বাস করতো যে ব্রিটিশ সরকার ইচ্ছাকৃত ভাবে রাজনৈতিক সুবিধা গ্রহণের জন্যে হিন্দু শক্তি প্রতিরোধে মুসলিম শক্তিকে বিকাশের সুযোগ করে দিচ্ছে; যা তাদের প্রতিবাদী করে তোলে।[২০৪] অপরদিকে পূর্ব বাংলার মুসলমানগণ ব্রিটিশ সরকারের এ সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানায়। মুসলমানরা তাদের আশু উন্নতির কথা চিন্তা করে পূর্ব বাংলার গভর্নর লেফটেন্যান্ট ব্যামফিল্ড ফুলারকে বিপুল সংবর্ধনা প্রদান করে। নবগঠিত প্রদেশের রাজধানী ঢাকাকে কেন্দ্র করে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের পথ চলা শুরু হয়। বাংলা বিভাগ সম্পর্কে নবাব স্যার সলিমুল্লাহ লিখেন যে, 'নবগঠিত প্রদেশের ব্যাপক উন্নতির সম্ভাবনা এতে জেগে উঠল। জনগণ একথা ক্রমশ উপলব্ধি করছে যে, এতদ্বঅঞ্চলের উন্নতির জন্যেই বাংলাকে বিভক্ত করা হয়েছে। এতে করে মুসলমানদের মনে চেতনার সঞ্চার হয়েছে। শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে।[২০৫] পূর্ব বাংলা ও আসামের সুবিধা বঞ্চিত মুসলমান সম্প্রদায়ই শুধু বাংলা বিভাগকে স্বাগত জানায়নি বরং কলকাতার কিছু সংখ্যক মুসলমানও একে সমর্থন করেন। বাংলা বিভক্তি সম্পর্কে মুসলমানদের মনে যাতে কোনোরূপ সংশয় না থাকে সে উদ্দেশ্যে '*মুসলিম সাহিত্য সমিতি*' ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে একটি ঘোষণাপত্র প্রকাশ করে। সাতজন নেতৃস্থানীয় মুসলমান[২০৬] কর্তৃক স্বাক্ষরিত এ ঘোষণাপত্র মুসলমানদের মধ্যে প্রচার করা হয়। এতে বলা হয়:

> "We have therefore the honour to point out the guidence and Information of such Muslims who are in doubt, the policy of government in affecting the partition of Bengal, besides ensuring numerous generous administrative advantages is calculated to confer a great boon upon the Mohamedan community at large, and it in the opinion of the committee of Mohamedan Literary society of Calcutta incumbent upon every true and loyal Muhammadan faithfully to support the poilicy of government in every possible way in his power".[২০৭]

হিন্দু জমিদার, পেশাজীবীশ্রেণি, সাংবাদিক, আইনজীবী ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এর বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলেন। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী বলেন,'বাংলাকে বিভক্ত করে হিন্দু সম্প্রদায়কে অপমান করা হয়েছে।[২০৮] কলকাতার হিন্দুরা প্রতিবাদস্বরূপ বাংলা বিভাগকে ব্যঙ্গ করে '*বঙ্গভঙ্গ*' নাম দেয়।[২০৯] এ বাংলা বিভাগের বিরুদ্ধে কংগ্রেস ও হিন্দুদের পরিচালিত এ আন্দোলন ক্রমে *বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন* নামে পরিচিতি পায়। এ '*বঙ্গভঙ্গ*' শব্দটি ইতিহাসে বহুলভাবে ব্যবহৃত হলেও তা শব্দগত বিকৃতি বৈ অন্য

কিছু নয়। তারা ১৬ অক্টোবরকে জাতীয় শোক দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। হিন্দু নেতৃবৃন্দ বাংলা বিভাগকে বাতিল করার শপথ গ্রহণ করে। কংগ্রেস বাংলা বিভাগের প্রতিবাদে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের ০৭ আগষ্ট স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ করে। আন্দোলনে বিলাতী দ্রব্য বয়কটের আহ্বান করা হয়। ছাত্ররা স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় বর্জন করে। কংগ্রেসের মারাঠা নেতা বালগঙ্গাধর তিলক বাংলা বিভাগের বিরুদ্ধে হিন্দু জাতীয়তাবাদ সুসংহত করার জন্য ভারতের সকল হিন্দুদের মারাঠা নায়ক শিবাজীকে জাতীয় বীরের মর্যাদা দানের আহ্বান জানান। এ সময় বিভিন্ন আত্মঘাতী সশস্ত্র বৈপ্লবিক দলের উদ্ভব ঘটে। যারা গোপনে ব্রিটিশ কর্মচারীদের হত্যা করার মধ্য দিয়ে সরকারকে নীতিগত ভাবে বাংলা বিভাজনের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতে চাপ প্রয়োগ করে।[২১০] এর ফলে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যকার দূরত্ব এবং পরস্পর বিরোধী বিদ্বেষ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে।

বাংলা বিভাগের বিরুদ্ধে হিন্দুদের ক্রমবর্ধমান বিক্ষোভ বাঙালি মুসলমানদের মনে নতুন উপলব্ধির জন্মদেয়। ফলশ্রুতিতে তারা অবাঙালি মুসলমানদের সাথে সহযোগিতার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠে। বিশেষত ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে গভর্ণর ফুলারের পদত্যাগ মুসলমানদের রাজনৈতিক নিষ্ক্রিয়তার বিপদ সম্পর্কে শঙ্কিত করে তোলে। বাংলা বিভাগ বিরোধী আন্দোলন মুসলমানদের সম্প্রদায়গত রাজনৈতিক দল গঠনে উদ্বুদ্ধ করে। নবাব স্যার সলিমুল্লাহ, টাঙ্গাইল জেলার ধনবাড়ির নবাব সৈয়দ নওয়াব আলি চৌধুরী প্রমূখ নেতৃবৃন্দ সর্বভারতীয় মুসলিম রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠার গুরুত্বের বিষয়টি অনুধাবন করেন। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে নবাব স্যার সলিমুল্লাহ ভারতের মুসলিম নেতাদের তাঁর পরিকল্পনার কথা জানান। যাতে তিনি মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষায় *'সর্ব ভারতীয় মুসলিম সংঘ'* নামে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রস্তাব করেন। সর্বভারতীয় মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনের (All India Muslim Education Conference) অধিবেশন ডিসেম্বর মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। এ সম্মেলনে যাতে তাঁর প্রস্তাবিত রাজনৈতিক দল গঠনের পরিকল্পনা আলোচিত হতে পারে সে জন্য তিনি সবাইকে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিয়ে আসতে অনুরোধ করেন।[২১১]

এ অবস্থায় মুসলমানদের স্বার্থরক্ষায় ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের ২৭ ডিসেম্বর ঢাকার শাহবাগে শিক্ষা সম্মলনের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রায় আট হাজার প্রতিনিধি এ সম্মলনে যোগদান করেন। এ সম্মেলনে নবাব সলিমুল্লাহ সভাপতিত্ব করেন। শিক্ষা সম্মেলনের শেষ দিনে মুসলমানদের রাজনৈতিক সমস্যাদি নিয়ে আলোচনা হয় এবং সর্বসম্মত ভাবে প্রতিনিধিরা সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ (All India Muslim League) নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন।[২১২] ব্রিটিশ সরকার তখন বাধ্য হয়ে মুসলিম সমাজকে আবার আগবাড়ানোর জন্য নানাবিধ পদে নিয়োগ আরম্ভ

করে। তার ফলে একদিকে মুসলিম সমাজ ইংরেজি শিক্ষায় অগ্রসর হয়, অপরদিকে এক নব্য মধ্যবিত্ত সমাজ গড়ে উঠে।[২১৩] কিন্তু কংগ্রেসের তুমুল বিরোধিতার মুখে ব্রিটিশ সরকারের সিদ্ধান্তক্রমে ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের ১২ ডিসেম্বর স্বয়ং সম্রাট পঞ্চম জর্জ দিল্লির দরবারে বাংলা বিভাগ রদ ঘোষণা করে পূর্ব বাংলা ও আসামকে পূর্বাবস্থায় স্থিত করে।[২১৪] এতে মুসলমানরা হতাশ হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে মুসলিম নেতৃবৃন্দের অব্যাহত দাবির মুখে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক পূর্ব বাংলায় ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ফলে মুসলমানদের অবস্থার আরো উন্নতি ঘটতে থাকে। এভাবে বাংলাসহ একটি ভারতীয় মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ পরিণতির দিকে এগোয়।

এ প্রসঙ্গে ড. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া উল্লেখ করেছেন, ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে ইংরেজি শিক্ষা প্রসারের সাথে মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণি বিকশিত হতে শুরু করে। বলাবাহুল্য ১৮৩০'র দশকে হিন্দুসমাজে মধ্যবিত্ত শ্রেণি আত্মপ্রকাশ করলেও মুসলিম সমাজে মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ বিলম্বিত হয়। মূলত: ১৮৭০'র দশক থেকে মুসলিম সমাজে ইংরেজি শিক্ষা প্রসারের জন্য সরকারি পদক্ষেপ ও মুসলিম সমাজপতিদের ইতিবাচক ভূমিকার কারণে মুসলিম সমাজে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার ঘটতে থাকে। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলিম তরুণেরা বিভিন্ন পেশায় নিযুক্তি লাভের মাধ্যমে সমাজে মধ্যবিত্ত শ্রেণির আত্মপ্রকাশে সহায়ক হয়।[২১৫] প্রকৃতপক্ষে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে প্রশাসনিক কারণে বাংলা বিভক্তির পরই উল্লেখযোগ্য ভাবে নব্য মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ এবং প্রসার জোরদার হয়।

হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণির আবির্ভাব ঘটে কলকাতা কেন্দ্রিক এবং তাদের নেতৃবর্গের প্রায় সকলেই কলকাতার সন্তান, খাঁটি শহুরে আবহাওয়ায় লালিত, গ্রামীণ এলাকার সাথে কোনো সংশ্রব না থাকায় প্রত্যক্ষ পরিচয়ও ছিল না বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সাথে। কিন্তু মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণির আবির্ভাব ঘটেছে নিজের মধ্যেই এবং স্বাভাবিকভাবেই। সুদূর পল্লী অঞ্চল চাখার থেকে ফজলুল হকের মতো জননেতার আবির্ভাব ঘটেছিল। একারণে গ্রামীণ জীবন ও সমস্যা সমন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান থাকায় মুসলিম লীগ নেতারা বাস্তবভিত্তিক কর্মসূচির মাধ্যমে বৃহত্তর জনগণের কল্যাণ সাধনে উদ্ধুদ্ধ হয়।[২১৬] এই বিশেষ কারণে বাংলায় এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের কৃষক সমাজ মুসলিম জাতীয়তার আবেদনে যতটুকু স্বতঃস্ফুর্ত সাড়া দেয়, ভারতীয় জাতীয়তার ক্ষেত্রে তা দেখা যায়নি; রাজনৈতিকভাবে অনগ্রসর পল্লীর নিষ্প্রাণ কৃষক সমাজ জেগে উঠে। তারাও মুসলিম সংহতির নামে উৎসাহিত হয়ে মুসলিম লীগের পতাকাতলে সমবেত হতে থাকে।[২১৭] কৃষকসমাজই বাংলার বৃহত্তম জনগোষ্ঠী। এই জনগোষ্ঠী মুসলিম সংহতির নামে এবং আর্থিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতির আশায় মেতে উঠে। মহাজনী আইন[২১৮] পাস করে মুসলিম লীগ কৃষকের

দাবি মেটায়। সাম্রাজ্যবাদী ও জমিদারি শোষণ থেকে তাদের মুক্তির বার্তা মুসলিম লীগ নয়া জাতীয়তার আদর্শ স্থাপন করে। এ কারণে মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। বস্তুত মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণি শুধু মুসলিম লীগই সৃষ্টি করেনি এটিকে ভারতীয় মুসলমানদের জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে এবং নতুন জাতীয়তা জ্ঞানে উদ্বুদ্ধ করে। এমহৎ কাজটি সম্ভব হয়েছিল নীচের থেকে এবং গ্রামীণ এলাকা থেকে মুসলিম মধ্যশ্রেণির আবির্ভাবের ফলে।

১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের নির্বাতন পরবর্তী স্বায়ত্বশাসিত বাংলায় ফজলুল হকের নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা গঠনের মাধ্যমে সে মধ্যবিত্ত আরো শক্তিশালী হয়। এ মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির বৈশিষ্ট্য হলো যে, তারা সামন্ত যুগের ভেদাভেদ ও মর্যাদাবোধ সংক্রান্ত পঙ্কিলতার উর্ধ্বে ছিল। যতই বিশ শতক এগিয়ে চলছিল ততই বাংলার মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণি ক্রমশ সামন্ত প্রভাবমুক্ত হয়ে দেশকে বলিষ্ঠ নেতৃত্বদানে এগিয়ে এসেছে। এ মধ্যবিত্ত শ্রেণি যে বাঙালি মুসলিম উচ্চবর্গ থেকে এসেছে তা নয়;বরং প্রধানত অন্যান্য স্তর থেকেই মধ্যবিত্তের সৃজন হয়েছে।[২১৯]

সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশের মধ্যে বাংলাদেশেই মুসলিম মধ্যবিত্তের প্রথম বিকাশ এবং সেহেতু রাজনৈতিক দিক দিয়ে বাংলার মুসলমানেরা ছিল অনেক বেশি সচেতন। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে গণসংযোগের কর্মসূচি গ্রহণকরায় কয়েক বছরের মধ্যেই আহরার পার্টি, খোদাই-খিদমতগার, খাকসার পার্টি, জমিয়াত-ই-উলেমা মুসলিম সংহতির প্রশ্নে একমত পোষণ করে ক্রমে ক্রমে মুসলিম লীগে লীন হয়ে গেল, না হয় ব্যতিক্রমীরা বৃহত্তর মুসলিম জনগোষ্ঠীর দ্বারা উপেক্ষিত হলো। এভাবে মুসলিম লীগ ভারতীয় মুসলমানদের একক সংগঠন হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। বস্তুত মুসলমান কৃষক সমাজকে আপন বলয়ে আনয়ন করতে পারায় মুসলীম লীগ ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলার বৃহত্তম রাজনৈতিক দল হিসেবে আর্বিভূত হয়। এসব কারণে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে কেন্দ্রীয় বিধানসভা নির্বাচনে মুসলিম লীগ প্রত্যেকটি মুসলিম আসনে জয়লাভ করে।[২২০] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে হিন্দুদের সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম ব্যবসায়ীরাও অগ্রসর হয়ে নানাবিধ কন্ট্রাক্ট ও সরবরাহের কাজে লিপ্ত হয়ে দু'পয়সা উপার্জনে নেমে পড়ে। এদের দ্বারা আবার এক নতুন মধ্যবিত্তের সৃষ্টি হয়। সরকার কর্তৃক জমিদারি প্রথা রহিত করার ফলে পুরাতন বনেদি জমিদার বা পরবর্তীকালে খরিদসূত্রে মালিক জমিদারেরাও মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে এবং কোন কোন জায়গায় বিত্তহীন মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে পরিণত হয়।[২২১]

সামন্ততন্ত্রের শেষপ্রতীক ও তার ধারক ও বাহক নওয়াব-রাজা প্রমূখ উচ্চশ্রেণি কর্তৃক মুসলিম লীগ গঠিত হলেও একথা সত্য যে, এসব স্যার, নওয়াব উপাধিধারীরা ছিলেন মুসলিম লীগের প্রথম স্তরের

উৎসাহী সভ্য।[২২২] কিন্তু অনতিকালেই তাঁদের বিদায় ঘনিয়ে আসে এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণি বিশেষত শিক্ষিত মধ্যবিত্তরাই মুসলিম লীগের কর্ণধার ও প্রধান নেতা হয়ে উঠেন। কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ, আল্লামা ইকবাল, শেরেবাংলা এ.কে.ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কেউই সামন্ততান্ত্রিক গোষ্ঠী উদ্ভূত নন। একেবারে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সন্তান। এসকল নেতৃবৃন্দ পর্যায়ক্রমে রাজনৈতিক ভাবে অধিকার সচেতন হয়ে কংগ্রেসের আধিপত্যবাদী হিন্দুত্ববাদ থেকে মুসলিম সম্প্রদায়কে রক্ষার প্রয়াসে ব্রিটিশ সরকারের সাথে আপস রফার মাধ্যমে এক পর্যায়ে মুসলমানদের জন্য পৃথক আবাসভূমি হাছিলের আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

সবশেষে বলা যায়, পৃথিবীর সকল আন্দোলন ও সংগ্রাম মধ্যবিত্ত শ্রেণির নেতৃত্বেই সংগঠিত হয়েছে। সে আলোকে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের বাংলা বিভাজন কেন্দ্রিক বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণি জেগে ওঠে। এ জাগরণ ক্রমে সশস্ত্র বৈপ্লবিক আন্দোলনে রূপ লাভ করে এবং অনুশীলন ও যুগান্তর নামক গুপ্ত দল গঠনের মাধ্যমে তারা স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র বৈপ্লবিক তৎপরতা শুরু করে। অবশেষে ভারতীয় কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের ভাবধারা মুক্ত বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির নেতৃত্বে সংগঠিত সশস্ত্র বৈপ্লবিক তৎপরতার অভিঘাতে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ আগস্ট ভারত স্বাধীনতা লাভ করে।

তথ্যসূত্র ও টীকাঃ

১. সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়,*প্রাক-পলাশী বাংলার সামাজিক ও আর্থিক জীবন*,কেপি বাগচী এ্যান্ড কোম্পানি, কলিকাতা, ১৯৮২, পৃ.৭

২. আবদুল মওদুদ, *মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ;সংস্কৃতির রূপান্তর,* মাওলা ব্রাদার্স,ঢাকা:২০১১,পৃ.৫০

৩. আবদুল মওদুদ, *প্রাগুক্ত,* পৃ.৫০-৫১

৪. এ.কে.এম.শওকত আলী খান,*বাংলাদেশের সমাজ কাঠামো,* গ্রন্থকুটির, ঢাকা, ২০১৬,পৃ.২৩৬-৭

৫. এ.কে.এম.শওকত আলী খান, *প্রাগুক্ত*,পৃ.২৩৭

৬. রমেশচন্দ্র মজুমদার,*বাংলার ইতিহাস মধ্যযুগ*,পৃ.২২২-৩ ।(উদ্ধৃত,ড.এ.কে.এম.শওকত আলী খান,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২৩৭)

৭. J.N.Sarkar, *The History of Bengal,*Vol.II, Dacca University, Dacca, 1965,p.409-10.

৮. আবদুল বাছির, *বাংলার কৃষক বিদ্রোহ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণি*,বাংলা একাডেমী,ঢাকা,২০১২,পৃ.১৯২

৯. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, *বাংলায় মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ*, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি,ঢাকা,২০১৩,পৃ.১৫

১০. B.B.Misra, *The Indian Middle Classes:Their Growth in Modern Times,*Oxford University Press,London,1961,p.6.

১১. A.K.Nazmul Karim,*The Dynamics of Banladesh Society,* Vikas, New Delhi,1980., p.178.

১২. Julius Gould and William L.Kolt(eds.)*A Dictionary of Social Science,*Tavistock Publication, London,1964,p.302.

১৩. *The New Illustrated Columbia Encyclopaedia*,vol.3,Columbia University Press, New York,1978, p.207.

১৪. আবদুল বাছির,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৯১

১৫. Letter From Marx to J.Weydemeyer,March 5,1852,in Marx and Engels,*Selected Works,* Vol.I, Moscow,1973.p.528. (উদ্ধৃতঃ আবদুল বাছির,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৯১)

১৬. আবদুল বাছির, *প্রাগুক্ত*,পৃ.১৯১

১৭. A.K.Nazmul Karim,*The Changing Society of India and Pakistan,*Ideal Publications,Dhaka,1961,p.98.

১৮. আব্দুল্লাহ ফারুক, প্রাসঙ্গিক ভাবনা, *সুন্দরম*, জৈষ্ঠ শ্রাবণ, ঢাকা, ১৩৯৬, বাংলা, পৃ.৭৯

১৯. B.B.Misra,*op.cit.,*p.91.

২০. B.B.Misra,*op.cit.,*p.107.

২১. T.B.Bottomore,*Classes in Mordern Society*,George Allen and Unwin,London,1963,P.26.

২২. Max Weber, *Essays in Soceity,(*Trans.) by H.H.Greth and Wright Mills,Nutt,London,1946,p.412.

২৩. আবদুল বাছির,*প্রাগুক্ত*, পৃ.১৯২

২৪. Susobhan Sarkar, *Bangali Renaissance and Other Essays,*Oxford Press,New Delhi,1970, p.275.

২৫. আবদুল বাছির, *প্রাগুক্ত*,পৃ.১৯৩।

২৬. আনিসুজ্জামান,*মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য(১৭৫৭-১৯১৮)*,মুক্তধারা,ঢাকা,১৯৭১,পৃ.৫

২৭. Hamza Alavi,The Colonial Transformation of India,*The Journal of Social Studies*,No-8,1980, p.37.

২৮. Irfan Habib, *Agrarian System of Mughal India,*Asia Publishing House,Delhi,1979,p.73.

২৯. Hamza Alavi, *op.cit.*;p.40.

৩০. বিনয় ঘোষ,*বাংলার নবজাগৃতি*, হাওলাদার প্রকাশনী,ঢাকা,২০১৬,পৃ.৫২।

৩১. B.B.Misra,*op.cit.*;p.75:A.R.Mallick,*British Policy and the Muslims in Bengal 1757-1856,* Bangla Academy,Dacca,1977,p.280;অধ্যাপক মুসা আনসারী,*ইতিহাস:সমাজ ও সংস্কৃতি ভাবনা*,বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ১৫১

৩২. A.K.Nazmul Karim,The Dynamics of Banladesh Society,*op.cit.,*p.178.

৩৩. Francois Bernier,*Travels in the Moghul Empire,*S.Chand and Co.,New Delhi,1972, p.94.

৩৪. W.H.Moreland*, India at the Death of Akbar,* Oxford University Press,London,1920,p.24.

৩৫. আবদুল বাছির,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৯৪।

৩৬. A.K.Nazmul Karim,*The Role of Middle Class in Bangladesh,*Bangladesh Journal of Sociology, Dhaka, 1976, Vol.II,No-1,p.4.

৩৭. B.B.Misra,*op.cit*.,p.92.

৩৮. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, *প্রাগুক্ত*,পৃ.১৮

৩৯. B.B.Misra,*op.cit.,*p.12-17.

৪০. আবদুল বাছির, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৯৪

৪১. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১০৩

৪২. আবদুল মওদুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৬২

৪৩. B.Datta Ray(ed.),*The Emergence and Role of Middle Class in North-East India,*Uppal Pub. House, New Delhi,p.37.

৪৪. আবদুল মওদুদ, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৬৩

৪৫. B.B.Misra,*op.cit.,*p.103.

৪৬. *Calcutta Review*,Vol.III,No-7,1885.

৪৭. B.B.Misra, *op.cit.,*p.101.

৪৮. বিনয় ঘোষ,*বাংলার বিদ্বৎসমাজ*,দে'জ পাবলিশিং,কলিকাতা,১৯৭৮,পৃ.১০৫;*Bengal Directory*,1854, p.470.

৪৯. আবদুল মওদুদ,*প্রাগুক্ত*, পৃ.৬৫

৫০. বিনয় ঘোষ,বাংলার বিদ্বৎসমাজ,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১০৯

৫১. *ঊনবিংশ শতাব্দীর পথিক*,পৃ.১০;আবদুল মওদুদ,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৬৯

৫২. আবদুল বাছির, *প্রাগুক্ত*,পৃ.১৯৬

৫৩. B.B.Misra, *op.cit.,*p.104-6.

৫৪. Topomohan Chatterjee, *Road to Plassey,* p.98.(উদ্ধৃত: গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১০৪)

৫৫. A.R.Mallick,*op.cit.,*p.281.

৫৬. নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়,*বিপ্লবের সন্ধানে*,র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেসন,কলকাতা,২০১৫,পৃ.৩৭৯

৫৭. B.B.Misra, *op.cit.,*p.113.

৫৮. B.Mitra, *The Cotton Weaver of Bengal,1757-1833,* Firma K.L.M.,Calcutta,1978,p.40.

৫৯. N.K.Sinha,*The Economic History of Bengal,Vol.1,* Firma L.K.M.,Calcutta,1965,p.151.

৬০. Nurul H.Choudhury, *Peasant Radicalism in Nineteenth Century Bengal,*Asiatic Society of Bangladesh,Dhaka,2001,p.28.

৬১. হোসেনউদ্দীন হোসেন,*বাঙলার বিদ্রোহ (৬০০-১৯৪৭)*,প্রথম খন্ড,বিদ্যা প্রকাশ,ঢাকা,২০১৬,পৃ.২১০

৬২. এম আর আখতার মুকুল, *কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী*,অনন্যা,ঢাকা,২০১৪,পৃ.১৬৩

৬৩. এম আর আখতার মুকুল,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৬৪

৬৪. হায়দার আকবর খান রনো,*পলাশী থেকে মুক্তিযুদ্ধ*,প্রথম খন্ড,ছায়াবীথি,ঢাকা,২০১৮,পৃ.৪৮-৯

৬৫. *The Moslem Chronicle,*18 April,1895.

৬৬. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১০১।

৬৭. *Report of Indian Industrial Commission,*1916-18,p.15.

৬৮. হায়দার আকবর খান রনো,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৪৯

৬৯. হোসেনউদ্দীন হোসেন *প্রাগুক্ত*,পৃ.২৬৫-৬৬

৭০. আবদুল মওদুদ,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৭৭

৭১. Ranjit Guha, *A Rule of property for Bengal,* Orient Langman,New Delhi,1981,p.97.

৭২. *নজরুল রচনাবলী*,২য় খন্ড,বাংলা একাডেমী,ঢাকা, ১৯৯২,পৃ.৩৯

৭৩. আবদুল মওদুদ,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৭৮

৭৪. আবদুল বাছির, *প্রাগুক্ত*,পৃ.১৯৮-৯

৭৫. গভর্নর জেনারেল কর্তৃক পাঁচশালা বন্দোবস্তে নিলাম প্রদান করা হয়।এতে তালুকদার ও ক্ষুদ্র জমিদারদের সঙ্গে সরাসরি রাজস্ব ব্যবস্থা চুক্তি সম্পাদিত হয়।ইজারা প্রথায় সঙ্গত কারণে জমিদার শর্তপূরণ করতে না পারায় জমিদারদের শক্তি খর্ব হতে থাকে এবং বড় বড় জমিদারগুলি ভেঙ্গে পড়তে থাকে। ইজারা প্রদান নিলাম ডাকে আরম্ভ হওয়ায় ভূমিতে বাজার গরম হয়ে ওঠে এবং ফটকাবাজারী চলতে থাকে। এরূপ পরিস্থিতিতে কোম্পানির বানিয়ান, মুৎসুদ্দি,সরকার,গোমস্তারা ব্যবসায়ে উপার্জিত অঢেল অর্থ ভূমি স্বত্বে বিনিয়োগ করে। ১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দে কাউন্সিল সদস্য ফিলিপ ফ্রান্সিস পরিসংখ্যান দিয়ে দেখান যে,বাংলার বহু লাভজনক ইজারাদারী কোম্পানির বানিয়ানদের হাতে গিয়ে পড়েছে।(উদ্ধৃত:11th.Rep.Sel.Com.H.C.1782-83;Quted in Nurul H. Chouhury, *op.cit.,*p.31.)

৭৬. আবদুল মওদুদ, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৮০

৭৭. B.B.Misra,*op.cit.,*p.137.

৭৮. বর্গাদার,পত্তনিদার,দরপত্তনিদার,তালুকদার,কানুনগো,তহশিলদার প্রভৃতি।

৭৯. সিরাজুল ইসলাম,চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমিদারদের প্রতিক্রিয়া,মুনতাসির মামুন (সম্পাদিত),*চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বাঙালি সমাজ*,মাওলা ব্রাদার্স,ঢাকা,২০০২,পৃ.৭৫

৮০. R.P.Dutt, *India today and tomorrow,*people's Pub.,Bombay,1949,p.84.

৮১. Ratnalekha Ray,*Change in Bengal Agranian Society,C.1760-1850,* Monohar,Delhi,1979, p.41.

৮২. B.B.Misra,*op.cit.,*p.134.

৮৩. Rangolal Sen, *Political Elites in Bangladesh,* UPL,Dhaka,1986.p.19.

৮৪. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১০২৩

৮৫. *শিখা*, ১ম বর্ষ,চৈত্র,১৩৩৩

৮৬. মো.শহীদুল্লাহ,*বাংলাদেশ বিষয়াবলি:ইতিহাস সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য*, গ্রন্থকুটির,ঢাকা:২০১৬,পৃ.৪৯

৮৭. A.G.Stock, *Memories of Dacca University,1947-51,*Dacca University, 1965,p.65.

৮৮. এম.এ.রহিম.বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস(১৭৫৭-১৯৪৭),আহমদ পাবলিশিং হাউস,ঢাকা,২০১৭,পৃ.১০৪

৮৯. আবদুল বাছির, *প্রাগুক্ত*,পৃ.২০২

৯০. আবদুল বাছির, *প্রাগুক্ত*,পৃ.২০২-৩

৯১. Syed Mahmood, *A History of English Education in India (1781-1893)*,K.P.Bagchi, Calcutta,1991, p.11.

৯২. আবদুল বাছির,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২০৩

৯৩. এম.এ.রহিম.*বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস(১৭৫৭-১৯৪৭), প্রাগুক্ত*,পৃ.১০৪

৯৪. এম.এ.রহিম.*বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস(১৭৫৭-১৯৪৭), প্রাগুক্ত*, পৃ.১০৫

৯৫. এম আর আখতার মুকুল,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৭৩

৯৬. ডেভিড হেয়ার ও সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার এডওয়ার্ড হাইড ইস্ট এ হিন্দু কলেজের জন্য প্রচুর অর্থ দান করেন। একলেজে শুধুমাত্র হিন্দু ছাত্র ভর্তি করা হতো।(উদ্ধৃত:এম.এ.রহিম.বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস ১৭৫৭-১৯৪৭, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১০৩; হোসেনউদ্দীন হোসেন, *বাঙলার বিদ্রোহ প্রথম খন্ড (৬০০-১৯৪৭)*, বিদ্যা প্রকাশ,ঢাকা, ২০১৬, পৃ.১৫২)

৯৭. ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দের ৪ মে এই কলেজ প্রতিষ্ঠা করার প্রকাশ্য উদ্যোগ নেয়া হয়। ঐদিন চিফ জাস্টিস হাইডের বাস ভবনে লর্ড ময়রার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় কলকাতার সকল সম্ভ্রান্ত হিন্দু অধিবাসীদের উপস্থিতিতে এ কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব উত্থাপিত হয় বলে জানা যায়।(উদ্ধৃত:হোসেনউদ্দীন হোসেন, *প্রাগুক্ত*,পৃ.১৫২)

৯৮. *Report of the Indian Education Commission 1882*,Chapter-V,p.187.

৯৯. বিনয়ভূষণ রায়,'কলকাতা স্কুল সোসাইটি',*এক্ষণ*,১৭শবর্ষ,১-২সংখ্যা,১৯৩১,পৃ.২।(উদ্ধৃত,গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৩৯)

১০০. উদ্ধৃত: এ.রহিম.বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস ১৭৫৭-১৯৪৭, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৩

১০১. S.N.Mukherji, *History on Education on India (Mordern Period)*,Gian Publishing House,Delhi, 1983, p.52.

১০২. আবদুল বাছির,*প্রাগুপ্ত*,পৃ.২০৪

১০৩. এ.রহিম. বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস(১৭৫৭-১৯৪৭),*প্রাগুক্ত*,পৃ.১০৪

১০৪. H.Woodrow,*Macaulay's Minutes on Education in India,*Ashish Publishing House, Calcutta, 1862, p.115.

১০৫. B.B.Misra,*op.cit.,*p.205.

১০৬. এ.রহিম.বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস ১৭৫৭-১৯৪৭, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৭

১০৭. W.Adam,*Report of the Indian Education Commission*, *1835,* Low Price Publication, Culcutta,1976,Chapter-V,p.187.

১০৮. *Report of the Indian Education Commission1882*,*op.cit.,*p.187.

১০৯. এ.রহিম.বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস ১৭৫৭-১৯৪৭, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১০৭

১১০. C.L.Thorpe,Education and Development of Muslim Nationalism in pre-partition India'.*Journal of Pakistan Historical Society,*Vol.XIII,part-1,1965,p.32.(উদ্ধৃত: গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৪১)

১১১. উদ্ধৃত: ড.গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া,*প্রাগুক্ত*, পৃ.৪১

১১২. S.N.Mukherji, *op.cit.,*p.70.

১১৩. Begum Rowshan Ara,'*Education of the Muslims in Bengal.,(1780 to 1882)'*.Un published M.phil., Thesis, JNU,New Delhi,1979,p.70.(উদ্ধৃত,ড.গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৪৩)

১১৪. B.B.Misra,*op.cit.,*p.209.

১১৫. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান,*আমাদের জাতি সত্তার বিকাশধারা*,আশা প্রকাশন,ঢাকা,১৯৯৪,পৃ.৪৭

১১৬. এ.রহিম.বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস ১৭৫৭-১৯৪৭, *প্রাগুক্ত*,পৃ.১১২

১১৭. C.H.Phillip &M.Doreen,*Indian Society and African Studies,*Praaeger Publishers, London,1976, p.34.

১১৮. তাজুল ইসলাম হাশমী,*ঔপনিবেশিক বাংলা*,প্যাপিরাস,কলকাতা,১৯৮৫,পৃ.১০

১১৯. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৪৭

১২০. A.R.Mallic,*British Policy and the Muslims in Bengal 1757-1856,*Bangla Academy, Dhaka,1977,p.320.

১২১. কাজী আমিনুল ইসলাম,*বাংলার রূপরেখা*,কলকাতা,পৃ.৭০।(উদ্ধৃত: মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *প্রাগুপ্ত*,পৃ.৫৩)

১২২. আবদুল বাছির,*প্রাগুপ্ত*,পৃ.২০৬

১২৩. আবদুল বাছির,বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির (১৭৫৭-১৮৫৭ খ্রি.) উদ্ভব ও বিকাশ:একটি পর্যালোচনা,*দর্শন ও প্রগতি:* ২৪শ বর্ষ: ১ম ও ২য় সংখ্যা:জুন-ডিসেম্বর,২০০৭,পৃ.১৩৫

১২৪. Ranajit Guha, *A Rule of Property for Bengal,*Orient Longman,Delhi,1982,p.1;নরহরি কবিরাজ,*স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা*,ন্যাশনাল বুক এজেন্সি,কলকাতা,১৯৬১,পৃ.৭৮

১২৫. Benain Desraeli,*Military Mutiny or National Revolt,India in 1857*,Ed.Ember, Delhi,1963, pp.10-21.

১২৬. R.Bosworth Smith,*Life of Lord Lawrence,*Charles Scribner's Sons,New york,1883,Vol.2, pp.251-54.

১২৭. G.F.I.Gaham,*The Life and Work of Sir Syed Ahmed Khan*,Oxford University Press, Karachi,1974 (Reprint),p.21.

১২৮. Soshi Bhushan Chowdhury,*Civil Rebilion in the Indian Mutinies,*World Press Private, Calcutta,1957,pp.558-261;V.D.Savarkar,*The Indian War of Independence of 1857*, Phoenix Publications,Bombay,1947,pp.4-9;Surendra Nath Sen,*Eighteen Fifty Seven*, Publications Divition,New Delhi,1957, p.398.

১২৯. R.C.Mujumdar,*The Sepoy Mutiny and the Revolt of 1857*,Firma K.L.Mukhopadhyay, Calcutta,1963,p.224.

১৩০. Norton, *Rebellion In india:How to Prevent another*,Richardson Brothers,London,1857, p.19;জেপি দিক্ষীত,১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ প্রসঙ্গে,'*অনীক*' দশম বর্ষ,সংখ্যা ১১,মে ১৯৭৪,পৃ.১৯

১৩১. H.T.Colebrook, *Remarks on the Peasant State of Husbandary and Commerce of Bengal*, Calcutta,1804,p.90.

১৩২. সিরাজুল ইসলাম,*বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থা ও সামাজিক সমস্যা*,কথা বিচিত্রা,ঢাকা,১৯৮১,পৃ.১৪৫;সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়,*বাংলার আর্থিক ইতিহাস*,অষ্টাদশ শতাব্দী,কে.পি.বাগচী এন্ড কোং.,কলকাতা,১৯৮৫,পৃ.৪২

১৩৩. Karl Marx and Federic Angel, *Selected Works*,International Publishers, London, 1968, p.42.

১৩৪. আবদুল বাছির,প্রাগুক্ত,পৃ.৭৬;নরহরি কবিরাজ,প্রাগুক্ত,পৃ.৬৫

১৩৫. সিরাজুল ইসলাম,বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থা ও সামাজিক সমস্যা,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৬৫

১৩৬. সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়,অষ্টাদশ শতাব্দী,প্রাগুক্ত,পৃ.৬৮-৬৯

১৩৭. N.K.Sinha,*History of Bengal,*University of Calcutta,Calcutta,1967,p.2.

১৩৮. Edmand Burk,.Gaham,*Opening of the Impeachment,18 feb*,Writing and Speaches of Edmand Burk vi India:The Lanching of the Hesting Impeachment,1786-88(ed.), P.J.Marshal, Oxford University Press, London,1922,p.433.

১৩৯. N.K.Sinha,*op.cit.*,p.237.

১৪০. রতন লাল চক্রবর্তী,*সিপাহী যুদ্ধ ও বাংলাদেশ*,ঢাকা,১৯৯৬,পৃ.৪

১৪১. R.C.Mujumdar, *op.cit.*,p.16.

১৪২. রতন লাল চক্রবর্তী,*প্রাগুপ্ত*,পৃ.৫

১৪৩. O.P.Singh Bhatia, *History of India,* S. Amardeep Publishers, New Delhi,1975,p.8.

১৪৪. Micheal Edwards, *Battles of Indian Mutiny*,London,1957,pp.17-18.

১৪৫. R.C.Mujumdar,*op.cit.*,pp.17-18;Satindra Singh, *Sociological Interpretation of Indian*

Mutiny, Calcutta Review,November,1946.
১৪৬. R.C.Mujumdar, *An Advance History of India*,Macmillan India Ltd.,Delhi,2003,pp.765-66.
১৪৭. R.C.Mujumdar, *The Sepoy Mutiny and the Revolt of 1857*,op.cit.,pp.17-18.
১৪৮. G.F.I.Gaham, *op.cit.*,p.23.
১৪৯. রতন লাল চক্রবর্তী,*প্রাগুপ্ত*,পৃ.১০
১৫০. B.L.Graver and R.R. Sethi., *A New Look on Mordern Indian History,* S.Chand and Co., Ltd.,New Delhi,1979.p.234.
১৫১. J.W.Kaye, *A History of the Sepoy War in India,1857-58.* London,1877,Vol.I,p.570.
১৫২. James Leasor,*The Red Fort:An Account of Sige of Delhi in 1857,*W.Laurie,Delhi,1957,p.99.
১৫৩. J.W.Sherer,*Daily life During the Indian Mutiny,Personal Experience of 1857,* Legend Publications, London,1974,p.29.
১৫৪. জে.পি. দীক্ষিত,*১৮৫৭ সিপাহী বিদ্রোহ প্রসঙ্গ*, কে.পি.বাগচী,কলকাতা,১৯৭৫,পৃ.৩
১৫৫. Harapasad Chattopadhyaya, *The Sepoy Mutiny and the Hindu Muslim Reaction,* Calcutta Review,Vol.142,March,1957,p.297.
১৫৬. Karl Marxs and Federick Engel, *Selected Works, Internatrional Publishers, Mutiny,* London, 1968, p.21.
১৫৭. A.C.Benerjee(ed.,), *Indian Constitutional Documents,Vol.2,* A Mukherjee and Co., Calcutta,1948, p.54.
১৫৮. মো.শহীদুল্লাহ,*বাংলাদেশ বিষয়াবলি*, গ্রন্থকুটির, ঢাকা,২০১৬,পৃ.৫০
১৫৯. R.P.Datta,*India Today*,People's Publishing House,Bombay,1949,p.293;মো.শহীদুল্লাহ, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৫০
১৬০. ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখী বর্মণ,*ব্রিটিশ ভারতে রাজনৈতিক উন্নয়ন*,*আজিজিয়া বুক ডিপো*,ঢাকা,২০০৬, ঢাকা, পৃ.২১৩; মো.শহীদুল্লাহ,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৫০
১৬১. R.C.Majumder(ed), *British Paramountacy and the Indian Renaissance, Part-II,Bhartiya Vidya Bhawan*,Bombay,1956,p.532.
১৬২. R.P.Dutta,*op.cit.,* p.256.
১৬৩. বিপান চন্দ্র ও অন্যান্য,*ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম(১৮৫৪৭-১৯৪৭)*,কে পি বাগচী,কলকাতা,২০১৪,পৃ.৫৭
১৬৪. নরহরি কবিরাজ,*স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা*,মনীষা, কলিকাতা,১৯৮৬,পৃ.১৯৪
১৬৫. Ambika Charan Majumder,*Indian National Evolution.,*Natesan & Co.,Madras,1917, p.234.
১৬৬. R.C.Majumder,*Glimpses of Bengal in Nineteenth Century,*Firma K.L.Mukhopadhyay, Calcutta,1985,p.76.
১৬৭. A.R.Desai,S*ocial Background of Indian Nationalism.,*Popular Book Depot., Bombay, 1959.,p.237.
১৬৮. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *প্রাগুপ্ত*,পৃ.৫৫
১৬৯. উদ্ধৃত:মোহাম্মদ আবদুল মান্নান,*প্রাগুপ্ত*,পৃ.৫৫
১৭০. P.Hardy,*The Muslims of British India,* Cambridge at the University Press,1972,p.82.
১৭১. P.Hardy,*op.cit.,*p.70-91.
১৭২. W.W.Hunter,*The Indian Musulmans*,Primier Book House,1968.
১৭৩. Syed Mahmood, *A History of English Education in India (1781-1893)*,K.P.Bagchi, Calcutta,1991, p.148.
১৭৪. উদ্ধৃত: এ.কে.এম.শওকত আলী খান,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২৩৮
১৭৫. উদ্ধৃত: এ.কে.এম.শওকত আলী খান,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২৩৮
১৭৬. উদ্ধৃত: এ.কে.এম. শওকত আলী খান,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২৩৮
১৭৭. Joyanti Maitra, *Muslim Politics in Bengal (1805-1906),*K.P.Bagchi and Co.,Calcutta, 1984,p.74.
১৭৮. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৫০

১৭৯. হিন্দু কলেজ ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজ নামাঙ্কিত হলেও ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের ২৭ ফেব্রুয়ারি তারিখে বর্তমান প্রেসিডেন্সি কলেজ ভবনটির প্রতিষ্ঠা ও মুসলমানদের জন্য এ কলেজটির দ্বার উন্মুক্ত হয়।

১৮০. আবদুল মওদুদ,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২৬৩

১৮১. K.K.Aziz,Amir Ali:*His Life and Work,* Lahore,1968.p.8.

১৮২. এম.এ.রহিম.বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস(১৭৫৭-১৯৪৭),*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৩৪

১৮৩. Ram Gopal,*Indian Muslims,A Political History(1858-1947),*Asia Publishing House, Calcutta,1964,p.329.

১৮৪. *The Moslem Chronicle,*March 21,1895.

১৮৫. *GRPI,*1874-75,p.100. (উদ্ধৃত,ড.গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৪৬)

১৮৬. *Report on the Census of Bengal,* 1881,part-1.

১৮৭. মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক,*ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন (১৭০৭-১৯৪৭)*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ.১১২-১৩

১৮৮. অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, দৈনিক বাংলা,১৮ আগ্রহায়ণ,১৩৮০ সন

১৮৯. এম.এ.রহিম,বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস,(১৭৫৭-১৯৪৭),*প্রাগুক্ত*,পৃ,১৬৬

১৯০. A.C.Muzumdar,In*dian National Evolution,* Natesan & Co.,Madras,1917,p.201.

১৯১. *The Administration of Bengal under Sir Andrew Fraser1903-08,*The Government of Bengal, Calcutta, 1908,p.63;*সংসদীয়দলিল পত্রাদি*,১৯৬৮খ্রিস্টাব্দ,সংগ্রহশালা ৩৬৩,খন্ড-৪৯, দলিল সংখ্যা ২৫৬ঃ বাংলার প্রশাসন

১৯২. *বাংলার আদমশুমারি প্রতিবেদন*,১৮৭ *খ্রিস্টাব্দ*,পৃ.৮৫

১৯৩. *সংসদীয় দলিল পত্রাদি*, ১৯০৫ *খ্রিস্টাব্দ*,অনুচ্ছেদ-২,কোড-২৬৫৮,পূর্ববাংলা ও আসাম প্রদেশ সমূহ পুণর্গঠন সংক্রান্ত দলিল পত্রাদি। P/W 118(I.O.L)

১৯৪. Sufia Ahmed, *Muslim Commuunity in Bengal (1884-1912),*University Press Ltd.,1996,p.184.

১৯৫. *সংসদীয় দলিল পত্রাদি*, ৩ ডিসেম্বর ১৯০৩ *খ্রিস্টাব্দ*,অনুচ্ছেদ ২৬-২৭

১৯৬. বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নরকে ময়মনসিংহ জেলাবাসীর স্মারক লিপি,অনুচ্ছেদ-১,সংসদীয় দলিল পত্রাদি,১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ, কোড-২৭৪৬

১৯৭. Sufia Ahmed, *op.cit.*,p.187.

১৯৮. L.Freser, *India under Curzon and after,* Heinemann,London,1911,p.371.

১৯৯. K.Salimolla,The New Province-Its Future Possibilities,*The Journal of Muslim Instititute,* 1906,p.408.

২০০. এম.এ.রহিম,বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস,(১৭৫৭-১৯৪৭),*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৬৮;A.R.Mallick,*The Muslim and the Partition of Bengal*,1905,in Mahmud Husain (ed.),*A History of the Freedom Movement,*Vol.III,Part-I, Pakistan Historical Society,Karachi,1963,p.24.

২০১. *The Bengalee*, 13th December,1903.

২০২. Earl of Ronaldshay,*Life of Lord Curzon,*Vol.II,Kessinger Publishing,London,1924,p.32; R.P.Kakaria, *Lord Curzon,*the Calcutta Review,July,1905,p.540.

২০৩. S.N.Benerjee,*A Nation in Making,*Oxford University Press,London,1963,p.188.

২০৪. A.C.Muzumdar,op.cit.,p.207.

২০৫. K.Salimolla, *op.cit*.,p.408.

২০৬. স্বাক্ষরকারী ব্যক্তিরা হলেন:১.মোহাম্মদ বখতিয়ার শাহ(সাহেবজাদা সি.আই.ই.),২.সৈয়দ মাহমুদ,৩.আব্দুল হাই, ৪.আতাউর রহমান, ৫. বেলায়েত হোসেন, ৬. মীর্জা আশরাফ আলী, ৭. এ এফ এম আবদুর রহমান

২০৭. *The Moslem Cronicle,*11th November,1905.

২০৮. S.N.Benerjee,*op.cit.,*p.18.

২০৯. উদ্ধৃত,শরিফুল ইসলাম ভূঁইয়া,*জাতীয় রাজনীতিতে টাঙ্গাইল জেলার রাজনীতিবিদদের ভূমিকা(১৯৪৭-১৯৭১)*, একটি অপ্রকাশিত এমফিল থিসিস, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ,ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়,কুষ্টিয়া,২০১৭, পৃ.১৭

২১০. এম.এ.রহিম,বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস,(১৭৫৭-১৯৪৭),*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৬৯-৭০

২১১. নবাব সলিমুল্লাহর পরিকল্পনারবিস্তারিত বিবরণ আছে,*The Bengalee*,14th December,1906;I.H.Qureshi, *The Struggle for Pakistan,*2nd ed.,University of Karachi,Karachi,1969,p.35.

২১২. *The Pioneer,* 2 January 1907.

২১৩. অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ,*দৈনিক বাংলা*,১৮ আগ্রহায়ণ,১৩৮০ সন

২১৪. মো.মকসুদুদুর রহমান,*বঙ্গভঙ্গ ও বাঙালির ঐক্য ?* প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা,ঢাকা,২০১৪,পৃ.৯২

২১৫. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া,*প্রাগুক্ত*,অবতরণিকা দ্রষ্টব্য

২১৬. আবদুল মওদুদ,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২০৪

২১৭. আবদুল মওদুদ,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২০৫

২১৮. মহাজনী আইন,কৃষি খাতক,বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব(সংশোধন) আইন প্রভৃতি

২১৯. নাজমুল করিম,*সমাজ বিজ্ঞান সমীক্ষণ*,১৯৭৩,পৃ.১৬০-৬১

২২০. C.W.Smith,*Mordern Islam in India, A Social analysis,* Ripon Printing Press,London,1947, pp.273-90.

২২১. অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, *দৈনিক বাংলা*, ১৮ আগ্রহায়ণ, ১৩৮০ সন

২২২. আবদুল মওদুদ,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২০৬

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির চিন্তা ও চেতনার ক্রমবিকাশ

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধ এবং ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে বক্সারের যুদ্ধে জয়লাভের মাধ্যমে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা দখল করে। পর্যায়ক্রমে তাঁরা পুরো ভারতবর্ষ অধিকার করে শাসন করে। এ বিশাল ভারতবর্ষ শাসনের প্রয়োজনে তাঁরা প্রথমে একদল অনুগত শ্রেণি তৈরির চেষ্টা করে। এশ্রেণির মধ্যে স্থান পায় বহুধরণের স্বার্থ, পেশা, গোষ্ঠী ও উপগোষ্ঠী। এদের আবির্ভাব ঘটে মূলত একটি সামাজিক গোষ্ঠী হিসেবে। একই ধরণের আচার-ব্যবহার,রীতি-নীতি ও চিন্তা-চেতনা তাদের ঐক্যের বন্ধন দৃঢ় করে। কোম্পানি শাসনের শুরু থেকেই এদেশীয়দের মধ্যে বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ই মূলত সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধার সদ্ব্যবহার করে স্বীয় যোগ্যতার স্বাক্ষরপূর্বক সকলক্ষেত্রে অগ্রগামী গোষ্ঠীতে পরিণত হয়। নিঃসন্দেহে তারাই বাঙালি মধ্যবিত্তের পথপ্রদর্শক। সাম্রাজ্য স্থাপনের সুচতুর ব্যবস্থাপনায় ইংরেজরা বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা দান করে বাঙালি হিন্দুদের নিয়েই বাংলায় মধ্যবিত্ত শ্রেণি রূপ সুদৃঢ় কাঠামো গঠন করে। পরবর্তীতে উনিশ শতকের শেষ দিকে বাঙালি মুসলমান সম্প্রদায়ও বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির একাংশ রূপে আবির্ভূত হয়। সব মিলিয়ে উনিশ শতকের শেষদিকে এক বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির আবির্ভাব হয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে এদের মধ্যে প্রতিযোগিতা বা অমিল ছিল ঠিকই তবে মিল ছিল অনেক বেশি। জমির উপর নির্ভরশীলতা, কায়িক-শ্রমবিমুখতা, সরকারি চাকরি প্রত্যাশী এবং পেশাদারি বৃত্তিতে নিযুক্ত এ মধ্যবিত্ত শ্রেণির চিন্তা-ভাবনা, জীবনযাত্রা, মনমানসিকতা সম্পদের উৎস, রূপ ও ব্যয় করার পদ্ধতিও অনেকটা একই রকম। এরা আধুনিকতা, গণতন্ত্র ও উদারনীতির পক্ষপাতী। এরা নয়া বাঙলার রূপকার মধ্যবিত্ত সমাজ।[১] প্রকৃতপক্ষে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার পতনের পর বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের উচ্চশ্রেণি তথা ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈশ্য প্রভৃতি দ্রুত ইংরেজ শাসন ও ইংরেজ ব্যবসায়ীদের সহযোগী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে প্রচুর ধনসম্পদ সংগ্রহ করে। সর্বোপরি বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণি হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়গতভাবে বিভাজন থাকলেও তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক চরিত্র প্রায় একই রকম।

ভারতবর্ষে ইংরেজদের সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবতই বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণি ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সবচেয়ে বড় সহযোগী সম্প্রদায় হিসেবে আবির্ভূত হয়। হিন্দুসমাজ পাশ্চাত্য চিন্তা-চেতনা, শিক্ষার প্রসার এবং ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে নবসৃষ্ট ব্যবস্থাকে সহজে ও স্বতঃস্ফুর্তভাবে গ্রহণ করার ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ দ্রুত হয়। অন্যদিকে কথিত আশরাফ মুসলমানগণ যখন তাঁদের অবস্থা উন্নয়নে এগিয়ে আসে তখন তাঁরা নিজেদেরকে পিছিয়ে থাকা অবস্থায় দেখতে পায়।[২] এবং বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রাধান্য লক্ষ্য করে। সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রথম যুগে যে বিশাল কর্মক্ষেত্র তৈরি হয়

সে সুযোগের পূর্ণসদ্ব্যবহার করে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণি। উনিশ শতকের মধ্যভাগে সমগ্র ভারতবর্ষের সর্বত্র বাঙালিদের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে নিযুক্ত হতে দেখা যায়। নতুন ভূমিব্যবস্থা,বাণিজ্য, সরকারি চাকরি ও প্রশাসনের প্রয়োজনে গড়ে ওঠা নতুন প্রতিষ্ঠানগুলোর পেশাদার হিসেবে একমাত্র শিক্ষিত বাঙালিদের একচেটিয়া প্রভাব ছিল। বিশেষ করে ব্রিটিশ ভূমি রাজস্ব আইনে ভূমিরস্বত্ত্ব, স্বামীত্ব সমন্ধে বিধান থাকায় মামলা-মোকদ্দমার যে দিগন্ত খুলে গিয়েছিল সে সব ক্ষেত্রে বহুশ্রেণির চাকুরে ও উকিল মোক্তারের ভিড় বাড়তে থাকে। ফলশ্রুতিতে ধীরে ধীরে মধ্যবিত্ত শ্রেণি ও তাদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। ইংরেজি শিক্ষার প্রসার ও কলকাতা ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী হওয়াতে সেখানেই প্রথম মধ্যবিত্ত শ্রেণি দ্রুত বিকাশ লাভ করেছিল। এবিষয়ে বাংলাকে অগ্রণি বলা যেতে পারে। ইংরেজি শিক্ষিত পেশাজীবীরাই ছিল বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির মূলধারা। উনিশ শতকের গোঁড়া থেকে শুরু করে বিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত বাঙালির আধুনিক ভাষা ও সাহিত্য, সঙ্গীত ও শিল্প সাধনা, ধর্ম ও সমাজ চিন্তা, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংবাদপত্র সর্বত্রই এশ্রেণির গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা চোখে পড়ে। এশ্রেণি ব্রিটিশ বাংলায় খুব সীমিত পরিসরে বিভিন্ন সভা, সমিতি ও সংঘ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এক ধরণের শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে চিন্তা ও চেতনার ক্ষেত্রে এক নব জাগরণমূলক আবাহন তৈরি হয়; যা ইতিহাসে বঙ্গীয় রেনেসাঁস নামে পরিচিতি লাভ করেছে। রাজা রামমোহন রায় কর্তৃক ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে আত্মীয়সভা ও ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে ব্রাহ্মসভা প্রতিষ্ঠাসহ ব্যক্তি ও সংঘের উদ্যোগে বিভিন্ন ধরণের সংগঠন প্রতিষ্ঠার পথপরিক্রমায় ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে রাজনৈতিক দল জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠত হয়। বিভিন্ন দাবি-দাওয়া আদায়ের পথপরিক্রমায় এ শ্রেণিই একপর্যায়ে ভারতীয় স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখায়। কিন্তু স্বাধীনতার প্রশ্নে কংগ্রেস নেতৃত্বের ব্রিটিশ আনুগত্য প্রত্যক্ষ করে ভারতীয় স্বাধীনতা বিলম্বিত হবার অভিযোগ করে এ দলটির মধ্য থেকে একটি অংশ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের আবেদন-নিবেদনের নীতি প্রত্যাখ্যান করে। একপর্যায়ে ব্রিটিশ বিরোধীতায় তারা সশস্ত্র বৈপ্লবিক পন্থায় অবতীর্ণ হয়। বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির এ সশস্ত্র বৈপ্লবিক ভূমিকার কারণেই ভারতবর্ষের ভাগ্যাকাশে স্বাধীনতার সূর্য উকি দেয়।

বাংলায় কোম্পানি শাসন প্রতিষ্ঠার পাঁচ বৎসর পরেই ১৭৬২ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মদদপ্রাপ্ত বাংলার নবাব মীর কাশিম আলী খান (১৭৬০-১৭৬৩) গভর্নরের কাছে এক স্মারকলিপির মাধ্যমে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীদের নামে অভিযোগপত্রে উল্লেখ করেন, কৃষক ও ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে মাত্র এক-চতুর্থাংশ দাম দিয়ে তারা জোর করে জিনিসপত্র নিয়ে নেয় এবং বলপ্রয়োগ ও অত্যাচারের দ্বারা কৃষককে এক টাকার জিনিস পাঁচ টাকায় কিনতে বাধ্য করছে।"[৩] ১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যন্ড পার্লামেন্টের সিলেক্ট কমিটির নবম রিপোর্টে বলা আছে যে, ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারত থেকে ব্যবসায়ের নামে যতো জিনিস রপ্তানি করেছে, তা কেনা-বেচার বিনিময়

প্রথায় করেনি। একেবারে একপয়সা বা অনুরূপ কিছু না দিয়েই করেছে। এই লুণ্ঠন যজ্ঞের মধ্যে বাংলার রূপাও ছিল। অপর একতথ্যে জানা যায়, ভারতে ব্যবসায়ের জন্য ইংল্যন্ড থেকে একরত্তি স্বর্ণও আনার প্রয়োজন হয়নি। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য উইলিয়াম ফুলারটন ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দেই বলেন-সেকালে বাংলা অন্যান্য দেশের শস্যভান্ডার ছিল;প্রাচ্য মহাদেশের উৎপাদন,ব্যবসা-বাণিজ্য ও সম্পদের আকর ছিল এইদেশ। কিন্তু আমাদের কুশাসনের লোলুপ ব্যাগ্রতা বিশ বৎসরের মধ্যে এদেশের অনেকাংশকে মরুভূমিতে পরিণত করেছে। কৃষক লুণ্ঠিত, কারিগর বা শিল্পব্যবসায়ীরা অত্যাচারিত। ফলে বারবার এদেশকে দুর্ভিক্ষ সইতে হচ্ছে।[৪] এদিকে প্রাচীন গ্রামসমাজের অচলায়তন ইংরেজ বণিকদের ব্যবসায়িক স্বার্থসিদ্দির পথে পর্বতসম বাধার সৃষ্টি করেছিল। কাজেই শাসনক্ষমতা হস্তগত করার সঙ্গে সঙ্গেই বাংলা ও বিহারের প্রাচীন গ্রামসমাজের ভিত্তি ভেঙ্গে চুরমার করতে আরম্ভ করে। প্রাচীন স্বয়ংসম্পুর্ণ গ্রামসমাজের কঠিন খোলস ভেঙ্গে কৃষককে মুক্তকরা এবং বনিক-রাজের পণ্য-ব্যবসায় ও ইংল্যন্ডের ক্রমবর্ধমান শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহের উদ্দেশ্যে যে দু'টি পদ্ধতিগ্রহণ করে তা হলো-(১) ভূমিরাজস্বের নতুন ব্যবস্থা এবং (২) ভূমিরাজস্ব হিসেবে ফসল বা দ্রব্যের পরিবর্তে মুদ্রার প্রচলন।[৫] উপর্যুক্ত পদ্ধতি গ্রহণের ফলে গ্রামসমাজের ভিত্তি বিলিন হওয়ার সাথে সাথে বাংলা ও বিহার শ্মশানে পরিণত হয়।

বাংলা ও ভারতের অন্যান্য অংশে ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা প্রচলনের মাধ্যমে এরূপ একটি অর্থনৈতিক শোষণ ব্যবস্থার প্রবর্তণ করা হয়, যাতে করে ভারতীয় কৃষক কেবলমাত্র ব্রিটিশ শিল্পের কাচামালের চাহিদা পূরণ করবে। এবং ব্রিটিশ কারখানায় যন্ত্রদ্বারা উৎপাদিত পণ্যসম্ভার ক্রয় করবে। ব্রিটিশ শিল্পের প্রয়োজনেই ভূমির ওপর ব্যক্তিগত অধিকার প্রতিষ্ঠা করে নতুন কৃষিবিপ্লব সম্পন্ন করা হয়। একই প্রয়োজনে গ্রামাঞ্চলে মুদ্রা অর্থনীতির প্রচলন করে প্রাচীন গ্রামসমাজের ধ্বংসাবশেষ এবং কৃষকদের বস্ত্র, রেশম, লবণ প্রভৃতি শিল্পগুলোকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলার ব্যবস্থা করা হয়। দেশীয় শিল্প ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশপণ্য দ্বারা অত্যন্ত সুপরিকল্পিত ভাবে বাংলা সহ সমগ্র ভারতবর্ষ প্লাবিত হতে থাকে।[৬]

১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে *লর্ড কর্নওয়ালিশ* (Lord Charles Cornwallis) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে যে জমিদারশ্রেণি সৃষ্টি করেছিলেন; সে জমিদারশ্রেণি তাদের সহকারী হিসেবে এ মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে গড়ে তোলে। কলকাতাকে কেন্দ্র করেই এ মধ্যবিত্ত শ্রেণি বিকশিত হয়।[৭] এদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সুপ্রকাশ রায় উল্লেখ করেছেন, নতুন জমিদার গোষ্ঠী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণি ভূসম্পত্তির একচ্ছত্র অধিকারবলে ব্রিটিশ শাসনের রক্ষণাবেক্ষণে থেকে সমাজের শীর্ষস্থানে আরোহন এবং সামাজিক নেতৃত্ব লাভের জন্য উন্মুখ হয়ে উঠে। উন্নত ইউরোপীয় শিক্ষা ও সভ্যতা তাদেরকে সামাজিক নেতৃত্বলাভের সংগ্রামে বিশেষভাবে সহায়তা করে। সামাজিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ইউরোপীয় শিক্ষা ও সভ্যতার প্রেরণায় তারা একত্রে

ইউরোপীয় *রিনাসান্স'র* (Renaissance) অনুকরণে উনিশ শতকের গোড়ার দিকে প্রথমে বাংলায় এবং পরে সমগ্র ভারতে *রিনাসান্স* (Renaissance) বা নব জাগরণ আন্দোলন আরম্ভ করে। এ আন্দোলন কেবলমাত্র জমিদার এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণির নিজস্বার্থে পরিচালিত হয়েছিল বলে আন্দোলন চলাকালীন প্রথম থেকেই তারা শোষিত কৃষক সম্প্রদায়কে বর্জন করে চলে। এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে এ আন্দোলকারীরা কৃষক-সংগ্রামের বিরোধীতা করতেও কুণ্ঠিত হয় নাই।[৮] ইংরেজি শিক্ষাগ্রহণের ফলে তারা ইউরোপের বুর্জোয়া ধ্যান-ধারণার সাথে পরিচিত হয়। তাদের ধারণা হয়েছিল যে, শিক্ষিত ইউরোপীয়ানগণ ভারতে বসবাস করলে এবং আধুনিক বিজ্ঞানলব্ধ তাদের জ্ঞানভিত্তিক ব্যবসা-বাণিজ্য করলে ভারতের বৈষয়িক উন্নতি হবে। ব্রিটেনে যে নিয়মতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র রাজাকে মাথায় রেখেও বিকাশ লাভ করেছিল; সে দৃষ্টান্ত তাদেরকে ব্রিটেন সম্পর্কে আশান্বিত করেছিল। তাদের এ ধারণা জন্মেছিল যে, ইংরেজদের সাহায্যেই ভারত একদিন উন্নত হবে এবং স্বায়ত্তশাসন লাভ করবে। এ শ্রেণি ভারতে ব্রিটিশ শাসনকে ঈশ্বরের দান মনে করতো। এদিকে দ্বারকানাথ ঠাকুর ইংরেজকে তাঁর ব্যবসায়ে অংশীদার করার প্রচেষ্টার মধ্যে ইংরেজের যে সকল অনিষ্টকর আচরণ লক্ষ্য করা গিয়েছিল তা থেকেই দ্বারকানাথের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইংরেজের মতলব কিছুটা বুঝতে পারেন। অধিকাংশ ইংরেজ ব্যবসায়ীরা যে একপয়সা দেশ থেকে না এনে এদেশের লোকের নিকট থেকে টাকা ধার নিয়ে অথবা লুণ্ঠন করে যে ব্যবসা বাণিজ্য করেছে; সেটা রাজা রামমোহন রায় এবং দ্বারকানাথ ঠাকুরের অনুসারীদের নিকট পরিষ্কার হতে থাকে।[৯] তাছাড়া ধনসম্পদ ও উন্নত শিক্ষা লাভের ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণির অধিকাংশই জমির প্রত্যক্ষ সম্পর্ক হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তারা ভাগচাষী, আধিয়ার, কৃষিশ্রমিক প্রমূখের ওপর কৃষিকার্যের ভার অর্পণ করে 'ভদ্রলোক' হন। এভাবে বাংলা এবং সমগ্র ভারতের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি ভূমির সম্পর্ক হতে নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন করে ভদ্রলোক বা বাবু শ্রেণিতে পরিণত হয়। জমিদার গোষ্ঠীর ন্যায় এদের একটি অংশ কৃষিক্ষেত্র হতে বহু দূরে থেকে কৃষক শোষণের দ্বারা জীবিকা নির্বাহের পন্থা অবলম্বন করে। কিন্তু অপর অংশটি গ্রামাঞ্চলে থেকেই কৃষক শোষণের কার্য চালাতে থাকে। মধ্যবিত্ত শ্রেণির এই ভূমিকা ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলন তথা মহাবিদ্রোহ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির পুরোধা ব্যক্তিত্ব রাজা রামমোহন রায় যেমন ধর্মসংস্কারের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে সংহতি ও রাজনৈতিক সুবিধা আদায়ের জন্য ভারতে ঐক্যগড়ার চেষ্টা করেছিলেন; তেমনি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাঁর সহযোগী রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ খ্রিস্টান ধর্মের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মাধ্যমে এদেশে আধুনিক জাতীয়তাবাদের সূচনা করেন। তবে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহ তথা প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় ইংরেজের নৃশংস আচরণ, মহাবিদ্রোহ পরবর্তী ক্রমবর্ধমান কৃষি-সঙ্কট, ব্রিটিশ শোষণ এবং শিক্ষিত বেকারের সংখ্যার ক্রমবৃদ্ধির ফলে পূর্বেকার ইংরেজ-ভক্ত মধবিত্তশ্রেণির

মধ্যকার অনেকেরই ইংরেজ শাসন সম্পর্কে মোহভঙ্গ ঘটে। এমনকি এই সঙ্কট ও ব্রিটিশ শোষণ বৃদ্ধির ফলে জমিদারশ্রেণির এক বৃহৎঅংশের মধ্যেও ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব জেগে উঠতে থাকে। তাদের অনেকেই এসময় কলকারখানা স্থাপন করে ধনিক বা বুর্জোয়া শ্রেণিরূপে বাংলার তথা ভারতীয় সমাজে আর্বিভূত হয়। ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী এই বুর্জোয়াশ্রেণির শক্তিবৃদ্ধিতে বাধা দিতে থাকলে তারা ব্রিটিশ বিরোধীতায় নেমে পড়ে। এবং বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণি সে সময় বুর্জোয়াশ্রেণির সহযোগীতায় তাদেরই প্রতিনিধিরূপে জাতীয়সংগ্রামের পথ ধরে। সে সময় হতে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণি একদিকে বিক্ষুব্ধ জমিদারগোষ্ঠী এবং অপরদিকে ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণির প্রতিনিধি ও মুখপাত্ররূপে জাতীয় সংগ্রামের পরিচালক পদে নিযুক্ত হয়।

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহের সময় শাসকগোষ্ঠী উপলব্ধি করেছিল,ভারতের গণশক্তির ক্রমবর্ধমান বৈপ্লবিক সংগ্রাম সামরিক শক্তির দ্বারা সাময়িকভাবে পরাজিত করা সম্ভব হলেও এই শক্তিকে চিরতরে পদানত করে রাখা একাকী বৈদেশিক শাসকগোষ্ঠীর সাধ্যাতীত। এজন্য ভারতের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলোর সর্বাঙ্গীন সহযোগীতা অপরিহার্য। সুতরাং মহাবিদ্রোহের পরেই ব্রিটিশ শাসকবর্গ সামন্ত রাজন্যবর্গ ও জমিদারগোষ্ঠীর সাথে বন্ধুত্ব ও ঐক্য গড়ে তোলার প্রয়াস পায়। একই সাথে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ নিজেদের প্রয়োজনে যে সামান্য সংস্কারকার্য আরম্ভ করেছিল এসময় তা পরিত্যাগ করে তৎপরিবর্তে সকলপ্রকারের সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কার সুরক্ষা নীতিগ্রহণ করে।[১০] হিন্দু ও মুসলমানের ঐক্য তথা অসাম্প্রদায়িকতাই ছিল মহাবিদ্রোহের সমস্ত শক্তির মূল উৎস। এ পর্যায়ে ব্রিটিশ সরকার সংগ্রামের এই মূল উৎসটিকে চিরকালের জন্য বন্ধ করতে ভারতে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ বৃদ্ধি তথা সাম্প্রদায়িকতায় উৎসাহ দান শুরু করে।

ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতির মধ্যযুগীয় ঐতিহ্য নিয়ে বাঙালি ব্রিটিশ যুগে প্রবেশ করে; বাঙালির ইতিহাসে এটাই আধুনিক যুগ। আরবদের মত ইংরেজ বাণিজ্য তরীও প্রথমে বাংলার মাটিতে নোঙর করেছিল। ১৬৯০ খ্রিস্টাব্দে জব চার্নক সূতানটি, গোবিন্দপুর ও কলকাতা ক্রয় করে বাণিজ্য-কুঠি নির্মাণ করেন। ১৬৯৬ খ্রিস্টাব্দে নিরাপত্তার কারণে কলকাতায় ফোর্টউইলিয়াম দুর্গ নির্মিত হয়। ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দিল্লীর সম্রাট ফররুখশিয়রের নিকট থেকে এক ফরমান বলে বাংলায় বিনাশুল্কে বাণিজ্য করার সুবিধা পায়। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে সিরাজ-উদ-দৌলার পরাজয় ঘটলে কোম্পানি সামরিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হয়। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বক্সারের যুদ্ধে ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে মীর কাশিমকে পরাজিত করার মাধ্যমে দিল্লীর সম্রাট শাহ্আলমের ফরমান বলে দেওয়ানী লাভকরে বাংলার রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা পায়। ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে

দ্বৈতশাসনের অবসান ঘটায় এবং মুর্শিদাবাদের পরিবর্তে কলকাতায় রাজধানী স্থাপন করে কোম্পানি বাংলার সর্বময় প্রভুত্ব লাভ করে। আঠারো শতকের শেষার্ধে ইউরোপে শিল্পবিপ্লব হয়। নতুন নতুন যন্ত্রের আবিস্কার ও কলকারখানা প্রতিষ্ঠার ফলে শিল্পবিপ্লব ঘটে। ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দের ফরাসি বিপ্লব সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি-সংস্কৃতি ও ধর্মব্যবস্থার ধারণা বদলে দেয়। সামন্ততন্ত্রের স্থলে ধনতন্ত্র বিকশিত হয়। পুঁজিবাদ তথা ব্যক্তিমালিকানা ও ভোগাধিকার প্রতিষ্ঠা পায়। ব্যক্তিত্ববোধ ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র চেতনা ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থারই ফল। সামন্ততন্ত্রে ব্যক্তি ছিলো অবহেলিত,ব্যক্তি সমষ্টির অধীন। ব্যক্তিত্ববোধে উজ্জীবিত মানুষ জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা দ্বারা মানসিক উৎকর্ষতা লাভ করে এবং মনুষত্বের নতুন মূল্যবোধ রচনা করে।[১১] ইউরোপীয় রেনেসাঁসের এটি ছিল প্রধান লক্ষণ। ইংরেজগণ যখন এদেশে প্রভুত্ব বিস্তার করে, তখন তারা এই রেনেসাঁসের মন্ত্রে উজ্জীবিত। যন্ত্র চালাবার জন্য কাঁচামাল সংগ্রহ এবং শিল্পোৎপাদিত পণ্যবিক্রয়ের জন্য বাজার সৃষ্টি প্রয়োজন। তাই ভারতের মতো বৃহৎ উপমহাদেশে উপনিবেশ স্থাপন অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। পরস্পর বিবদমান ক্ষয়িষ্ণু সামন্তশক্তির দূর্বলতার সুযোগ নিয়ে ইংরেজগণ ছলেবলে কৌশলে ভারতে উপনিবেশ স্থাপনে সফল হয়। কোম্পানির লক্ষ্য ছিল অপরিমিত শোষণ। ইংরেজরা নিজ দেশের পণ্য আমদানির স্বার্থে এদেশের কুটিরশিল্প ধ্বংস করে। তাঁরাই রাজ্যের মালিক, রাজস্বের মালিক ও বাণিজ্যের মালিক। ভারতবর্ষের সমস্তপুঁজি কোম্পানির জাহাজে করে ইংল্যান্ডে নিয়ে সেখানকার পুঁজিপতির উদর স্ফিত করতে থাকে। কোম্পানির শাসনে বাংলা তথা ভারতের অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়ে, জনগণের দুর্দশা চরমে ওঠে। বস্তুগত লাভের চেয়ে ভারতবাসীর অর্থনৈতিক ক্ষতি হয় বেশি। লাভ যা হয় সেটি হলো-তাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি, মন ও মানস তথা চিন্তা ও চেতনার জগতের বৈপ্লবিক পরিবর্তন। কোম্পানির বাণিজ্য তরীতে পণ্যের সাথে ইউরোপের রেনেসাঁসের ফসলও আসে। পাশ্চাত্য বিদ্যাশিক্ষা ও সভ্যতা তখন বৈচিত্রময় ও গতিশীল। গতানুগতিক আবর্তসঙ্কুল আবহমান ভারতীয় সংস্কৃতির উপর প্রাণচঞ্চল ইউরোপীয় সংস্কৃতির প্রভাব সুদূরপ্রসারী ফল বয়ে আনে। এই প্রথম ভারতীয় চিত্ত জেগে ওঠে, তার অন্তঃজীবনে বড়ো ধরণের পরিবর্তন আসে। জীবনের পুরাতন মূল্যবোধ ধ্বসে পড়ে এবং নতুন মূল্যবোধ সৃষ্টি হয়; যার মধ্য দিয়ে নব জাগরণের লক্ষণ বিকশিত হয়।[১২]

ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রথম পঞ্চাশ বৎসর ছিল ক্রান্তিকাল। এসময় প্রশাসনিক কাঠামো গঠন, নীতি উদ্ভাবন, নীতি নির্ধারণ ইত্যাদি কাজে নিয়োজিত ছিল। উনিশ শতকের গোড়া থেকেই ইউরোপীয় সভ্যতার প্রত্যক্ষ ফল ফলতে শুরু করে। ইংরেজ সিভিলিয়ানদের দেশিভাষা ও বিদ্যা শিক্ষা দেয়ার জন্য ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হয়। এতে দেশীয় লোকেরা শিক্ষালাভের সুযোগ না পেলেও শিক্ষাদান ও গ্রন্থপ্রণয়নের সুযোগ পেলেন। ইংরেজ শিক্ষক ও পন্ডিতের

সাথে বাঙালি শিক্ষক ও পন্ডিতগণ বাংলা গদ্যে পুস্তক রচনা করেন যা বাঙালির সাংস্কৃতিক জগতে নব অধ্যায়ের সূচনা করে। আধুনিক মন ও মনন,বিদ্যা ও বুদ্ধি, চিন্তা ও চেতনা বিকাশের অন্যতম বাহন গদ্য। এ গদ্য শিল্পের উদ্ভবকে ইংরেজদের একটা বড়ো দান বলে স্বীকার করতে হয়। বাংলাভাষা জন্মের প্রায় একহাজার বৎসর পর বাংলাগদ্য দলিল দস্তাবেজের অঙ্গন ছেড়ে সাহিত্য রচনায় এই প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। এ গদ্য শিল্প অল্পকাল পরে স্কুল-কলেজ শিক্ষায়, পাঠ্যপুস্তক ও সাহিত্য রচনায়, ধর্মীয় ও সামাজিক আন্দোলনে, বাক-বিতন্ডায়, পত্র-পত্রিকায় সৃজনশীল ও মননশীল লেখায়, সভা-সমিতিতে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। গদ্যের মধ্য দিয়েই ব্যক্তি কেন্দ্রিক আধুনিক বাংলা সাহিত্যের উদ্ভব।[১৩]

কোন কোন ব্যক্তি ও খ্রিস্টান মিশনারীর উদ্যোগে প্রথমে কলকাতা শহর ও শহরতলীতে ইংরেজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় হিন্দু কলেজ স্থাপিত হলে বর্ণহিন্দুর সন্তানেরা উচ্চ ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ পায়। এ কলেজকে কেন্দ্র করেই ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে 'ইয়ং বেঙ্গল দলে'র আবির্ভাব ঘটে। ইংরেজি বিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষার মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা আসে। ধর্মের পরিবর্তে মানবিক ও বৈজ্ঞানিক শাখার নানাবিধ জ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা হয়।[১৪] ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে হুগলি কলেজ স্থাপন এবং ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে ফারসির স্থলে ইংরেজি রাজভাষা হলে ইংরেজি শিক্ষার গুরুত্ব বেড়ে যায়। ক্রমে জেলা স্কুল ও কলেজ স্থাপন করে শহরের বাইরে আধুনিক শিক্ষা সম্প্রসারণ করা হয়। ইংরেজি ভাষা শিক্ষা এবং সে ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিল্প, সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষার ভেতর দিয়ে বাঙালির আত্মার জাগরণ, ব্যক্তি চিন্তার উন্মেষ এবং সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ ঘটে। ব্যক্তিত্ববোধের উদ্ভোধন, মনুষত্বের উপলব্ধি, স্বদেশ ও স্বজাতি চিন্তা, সামাজিক ও রাজনৈতিক সচেতনতা এরূপ বিদ্যাচর্চার ফল। ব্যক্তিগত ভাবে এবং ক্রমশ যৌথভাবে ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলন তখনই সম্ভব হয়েছে। মানুষত্বকে জলাঞ্জলি দিয়ে যেসব কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ও অন্যায় আচরণ সমাজের বুকে জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসেছিল, এতোকাল পরে সে সবের বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়। সমাজ শাস্ত্রের স্থলে মানবতার জয় ঘোষিত হয়। গঙ্গাজ্বলে সন্তান বিসর্জন, সতীদাহ প্রথা নিরোধ এবং বিধবা আইন প্রবর্তনের ভিতর দিয়ে লাঞ্চিত মানবতার মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়। পাশ্চাত্যের *সেকুলার* (Secular) শিক্ষার প্রভাবে মানুষ যুক্তিবিদ্যা ও মুক্তবুদ্ধির অধিকারী হয়।

কলকাতার মতো আধুনিক কসমোপলিটান শহর এবং শহরকেন্দ্রিক আধুনিক মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব ও বিকাশ ব্রিটিশ শাসনামলে সম্পন্ন হয়। কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির দরুন বাংলার সংস্কৃতি ছিল মূলত গ্রামীণ সংস্কৃতি। প্রাচীন ও মধ্যযুগে শহর ও বন্দর ছিল,কিন্তু সেগুলো মূখ্যত দূর্গকেন্দ্রিক ছিল। রাজা-বাদশাহ,

আমীর-ওমরাহ-পারিষদ দুর্গের অভ্যন্তরে বাস করতেন। দুর্গের চতুষ্পার্শ্বে সেনাবাহিনী শিবির করে থাকতো। রাজপুরুষ ও সেনাবাহিনীর খাদ্যপানীয় সরবরাহ ও সেবাশুশ্রূষার জন্য কিছু লোক শহরে বাস করতো। ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্য দোকান পাঠ থাকত, মুসাফির খানা, মন্দির, মসজিদ থাকতো। মুঘল যুগের ভূমির মালিকানার মতো দরবারেও ব্যক্তি সম্পত্তির মালিকানা ছিল না। আমির-উজির মৃত্যুবরণ করলে *ফৌৎ আইনে* তাঁর অর্জিত সম্পত্তির বেশিরভাগ চলে যেতো রাজভান্ডারে,তাঁর পরিবার-পরিজন সামান্য ভাগ পেতেন।[১৫]

সমস্ত ভূমির মালিকানা স্বয়ং সম্রাটের; জায়গীরদার, মনসবদার, নবাব-নাজিম কেবল রাজস্ব আদায় ও তার অংশবিশেষ ভাগ ও ভোগের অধিকার পেতেন। ভূমি বন্টন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ রাজার ইচ্ছাধীন ছিল। ব্যক্তিগত সম্পত্তি অর্জন এবং বংশধরদের জন্য সঞ্চয় করার প্রবৃত্তি না থাকায় মানুষ শহরমূখী হয়নি। মুঘল যুগে ভোগের প্রবণতা এজন্য খুবই বেশি ছিল। ইংরেজের তৈরি শহরের রীতিনীতি এর সম্পূর্ণ বিপরীত। ব্যক্তি-সম্পত্তির উপর ভোগাধিকার এবং সঞ্চয়ের নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তা ছিল বলে ধনবান লোকেরা শহরে এসে গৃহনির্মাণ করে বসবাস শুরু করে। এ সম্পর্কে প্যারিচাঁদ মিত্রের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন,

> When Fort William was built, the Hindu seem to have looked upon it was a place of refuge and the setts, Gobardhan Mitra, Nabaskissen, and other families settle there.[১৬]

নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা ঢাকার নায়েব নাজিমের সহকারী রায়দুর্লভের নিকট অর্থ চেয়ে পাঠালে তিনি পুত্র কৃষ্ণদাসকে দিয়ে ঐসম্পত্তি কলকাতায় ইংরেজের আশ্রয়ে পাঠিয়ে দেন। ইংরেজ কর্তৃক ক্ষমতা লাভের পর শাসন কাঠামোর পরিবর্তন,ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার, শিক্ষা-দীক্ষার উন্নতি, কল-কারখানার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির ফলে কলকাতার গুরুত্ব অনেক বেড়ে যায়। সরকারি, বেসরকারি কর্মচারী, কারখানার শ্রমিক, ছোট-বড়ো ব্যবসায়ী ও বুদ্ধিজীবীশ্রেণির রাজধানী শহরে আগমন ঘটে। আগমনকৃত এই শ্রেণি এবং শহরবাসীর সমন্বয়েই একটি শ্রেণি সচেতন মধ্যবিত্ত সমাজ গড়ে উঠে। উৎপাদনের সাথে সম্পর্কহীন একটি মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণি মধ্যযুগেও ছিল, কিন্তু সেটি সংখ্যায় ক্ষীণ এবং নানাস্থানে বিক্ষিপ্তাবস্থায় ছিল। তারা নির্জীব ও নিষ্ক্রীয় ছিল; শ্রেণি সচেতনতা না থাকায় সমাজকে নতুন করে কিছু দিতে পারেনি। ঐতিহাসিক *পোলার্ড* (A.F.Pollard) বলেছেন, Without commerce and industry there can be no middle class;where you had no middle class,you had no Renaissance and no Reformation.[১৭] কিন্তু কলকাতায় বসতি স্থাপনকারী এ বাঙালি সমাজে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে ব্যক্তিত্ববোধের উন্মেষ ঘটে এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণি কর্মচঞ্চল ও অধিকার সচেতন হয়ে ওঠে।

ব্যক্তি-অধিকার রক্ষা ও শ্রেণিস্বার্থে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সমাজের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব গ্রহণ করে। গণস্বার্থের সাথে একাত্মতা স্থাপন করে এবং ঔপনিবেশিক শত্রুর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়। তবে পরনির্ভরশীল জীবিকা এবং সীমিত ক্ষমতার কারণে কায়েমী স্বার্থের এশ্রেণি ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে সরাসরি দ্বন্দ্বে নামতে পারেনা। আর্থিক কারণেই সে স্বার্থপর হয়ে পরে। এসকল দোষত্রুটি সত্ত্বেও ব্রিটিশ শাসনামলে কলকাতা কেন্দ্রিক একটি শক্তিশালী বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণি গড়ে ওঠে।

ইংরেজের আবির্ভাবের ফলে বাঙালির অন্তঃজীবন ও বহির্জীবনে যে পরিবর্তন সূচিত হয় তা বাঙালি মধ্যশ্রেণির হিন্দু ও মুসলমান সমাজকে কতটুকু প্রভাবিত করে সে প্রশ্নটাই বড়ো হয়ে দেখা দেয়। একথা ঠিক যে, এসব পরিবর্তনের সূত্র ধরেই আংশিকভাবে হলেও বাংলায় নবজাগরণ আসে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে এ নবজাগরণের পদধ্বনি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আধুনিক ভাষাশিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা, পত্রপত্রিকা প্রকাশ, সভাসমিতি গঠন, বাংলা গদ্যের বিকাশ ও তার মাধ্যমে আধুনিক সাহিত্য সৃষ্টি, কলকারখানা স্থাপন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, নগর সৃষ্টি এবং নগরে মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব, শিক্ষা-ধর্ম ও সমাজসংস্কার আন্দোলন এবং তার মধ্যদিয়ে মুক্তবুদ্ধি ও মানবতাবোধের বিকাশবোধ জাগ্রত হওয়া- আধুনিকতার এসব লক্ষণ দিয়ে নবজাগরণের আত্মপ্রকাশ হয়। ব্রিটিশ শাসনের প্রথম থেকে এসব লক্ষণ হিন্দুসমাজকে যতোখানি আলোড়িত ও স্পন্দিত করেছিল, মুসলমান সমাজকে ততোখানি করেনি। পূর্ব থেকে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাথে ব্যবসায়ের লেনদেনে যাঁরা দোভাষী,দালাল, খাজাঞ্চী, ঠিকাদার, মহাজন, বেনিয়ান, গোমস্তা, মুৎসুদ্দী, সরকার, দেওয়ান, মুনশী ও কেরানি হিসেবে কাজ করতেন, তাঁরাই কোম্পানির শাসনকালে আর্থিক সুবিধা ভোগের অধিকারী হন।[১৮]

ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উপর্যুক্ত সহযোগি শ্রেণিই কোম্পানি আমলে সরকারি-বেসরকারি অফিস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মিলকারখানায় চাকুরির সুবিধা পায়। ঐসব কাজে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকের সাথে ইংরেজদের প্রথমে যোগাযোগ হয়েছিল। মুসলমান শাসনামলে ব্যবসায় ও মহাজনি কারবারে হিন্দুগণ অধিকতর নিযুক্ত ছিলেন। কলকাতার ভৌগলিক অবস্থানহেতু হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, মেদিনীপুর প্রভৃতি পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অধিবাসী পায়ে হেঁটে কলকাতার সাথে যোগাযোগের সুযোগ পেয়েছে। এজেলাগুলো হিন্দুপ্রধান অঞ্চল ছিল, ফলে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন অধিক পরিমাণে কলকাতায় সমবেত হয়। দূরবর্তী জেলাগুলো বিশেষত: পূর্ববঙ্গে মুসলমানের সংখ্যা বেশি ছিল। শহরে যাতায়াত ও অবস্থান করার মতো আর্থিক অবস্থা যাদের ছিল,সাধারণত তারাই শহরমুখী হয়েছে। মুসলমান সম্প্রদায়ের অধিকাংশ ছিল কৃষিজীবী। মুসলমান আমলে চাকরি সম্প্রসারিত ছিল না। ভূমির স্থায়ী ও আর্থিক নিরাপত্তা ত্যাগ করে মুসলমানগণ শহরের অনিশ্চিত আর্থিক জীবনের প্রতি আকর্ষণ

অনুভব করেনি। যাঁরা চাকরি ও অন্যান্য রাজকার্যে নিয়োজিত ছিলেন, শাসন ক্ষমতা হারানোর পর তারা কৃষিকর্মে যোগ দেয়। তাছাড়া খ্রিস্টান শাসকের অধীনে চাকুরি করা পছন্দ করেনি। খন্দকার ফজলে রাব্বী বলেছেন, অভিজাত শ্রেণির জীবিকার্জনের সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বাধিক সম্মানজনক পেশা ছিল তরবারি, কলমপেশা ও ভূসম্পত্তি থেকে প্রাপ্ত আয়। তাঁরা এগুলো ছাড়া অন্য সমস্ত পেশা যেমন: হস্তশিল্প, মুদি দোকানদারি ও অন্যান্য ব্যবসায় ইত্যাদি কাজকে মর্যাদার পক্ষে হানিকর মনে করতেন।[১৯] আধুনিক যুগের উন্মেষ পর্বে বাংলার হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের গতি ছিল ভিন্নমুখী। ব্রিটিশ সরকারের পূর্ণসহযোগিতা লাভ করে এবং ইংরেজি শিক্ষার দ্বারা চাকুরির সুযোগ নিয়ে হিন্দুগণ উন্নতির দিকে এবং ব্রিটিশ সরকারের প্রতি অমনোযোগী ও ইংরেজি শিক্ষার প্রতি বিমুখ থেকে চাকুরি ও ব্যবসায়ের সুযোগ হারিয়ে মুসলমানগণ অবনতির দিকে ধাবিত হয়। হিন্দু-মুসলমান সমাজ: বিশেষ করে মধ্যবিত্তের এই অসম বিকাশ বাংলার সামাজিক ইতিহাসের একটি বড় রকমের দুর্ঘটনা। বিনয় ঘোষ ঐসময়ে মধ্যবিত্ত মুসলিম বুদ্ধিজীবীর অনুপস্থিতিকে সমাজের *ট্র্যাজেডী* (Tragedy) বলে উল্লেখ করেছেন।[২০]

প্রকৃতপক্ষে আঠারো শতকের শেষার্ধে এবং উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলায় ব্রিটিশ সরকার কতগুলো প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ভূমিব্যবস্থার নতুন বিন্যাস, ব্যবসায় বাণিজ্যে পুঁজিবাদী চেতনা সৃষ্টি, ইংরেজি ভাষার সরকারি করণ, আইন আদালত স্থাপন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং শিল্পস্থাপন উল্লেখযোগ্য। এসকল সরকারি পদক্ষেপের ফলে বাংলায় সামগ্রিকভাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব অনিবার্য হয়ে উঠে। ব্রিটিশ প্রবর্তিত নতুন প্রশাসনিক ব্যবস্থা, বাণিজ্যনীতি, শিল্পকারখানা যোগাযোগ এবং সর্বোপরি ইংরেজি শিক্ষা প্রসারের ফলেই মূলত এদেশে নতুন সামাজিকশ্রেণি হিসেবে মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব ঘটে। সুতরাং বলা যায় যে, এদেশের মাটি থেকে স্বতস্ফুর্তভাবে শ্রেণিটির জন্ম হয়নি, স্বার্থপ্রণোদিত হয়েই ইংরেজ জাতি এদেশে অনুগ্রহ প্রত্যাশী মধ্যবিত্ত শ্রেণি সৃষ্টি করেছিল। ইংরেজরা এ শ্রেণির জন্ম দিয়েছিল তাবেদার হওয়ার বীজমন্ত্র দিয়ে; নতুন ও মহৎ মূল্যবোধের শিক্ষা দিয়ে নয়। সাম্রাজ্যবাদের প্রতি এজাতীয় নিঃশর্ত ভালোবাসা বিশ্বের ঔপনিবেশিক শোষণে জর্জরিত কোনো মধ্যবিত্ত শ্রেণির বুদ্ধিজীবীদের চরিত্রে নেই। এবিশেষত্ব সম্পুর্ণ ভারতীয়।[২১] এ মধ্যবিত্ত শ্রেণি আধুনিক বাংলার ইতিহাসে এক বিশেষস্থান অধিকার করে আছে। তবে এর অর্থ এই নয় যে, ইতোপূর্বে বাংলায় মধ্যবিত্ত শ্রেণির কোন প্রকার অস্তিত্ব ছিল না। যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ তা হলো ঔপনিবেশিক যুগে সৃষ্ট মধ্যবিত্ত শ্রেণিটি পূর্বের মধ্যবিত্ত শ্রেণিটির তুলনায় ভিন্ন বৈশিষ্টের অধিকারী ছিল।[২২] কার্যত: উনিশ শতকের গোঁড়া থেকে শুরু করে বিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত বাঙালির যা কিছু শ্রেয়, যা কিছু শ্লাঘনীয়, যা কিছু বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তার পশ্চাতে রয়েছে এ মধ্যবিত্ত শ্রেণির অবদান। বাঙালির আধুনিক ভাষা ও সাহিত্য, সঙ্গীত ও শিল্পসাধনা, ধর্ম ও সমাজচিন্তা, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংবাদপত্র সর্বত্রই এই শ্রেণির

গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা চোখে পড়ে। মুঘল যুগের অবসানে এদেশে যে নতুন বাংলা গড়ে উঠলো তার ভিত গড়ে দেয় এ মধ্যবিত্ত শ্রেণি। এ মধ্যবিত্ত শ্রেণির মাধ্যমে ব্রিটিশ বাংলায় এক ধরণের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জাগরণ তৈরি হয় যাকে আধুনিক ঐতিহাসিকগণ *বঙ্গীয় রেনেসাঁস* (Renaissance of Bengal) নামে আখ্যায়িত করেন।

'রেনেসাঁস' শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল পুনর্জন্ম বা জাগরণ। খ্রিস্ট্রীয় পনের শতকে ইউরোপের নগর কেন্দ্রিক শিক্ষিত ও উচ্চবিত্তশ্রেণির মধ্যে প্রাচীন গ্রীক, রোমান সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রতি যে প্রবল আকর্ষণ ও অনুরাগ পরিলক্ষিত হয় এবং সমকালীন ভাবজগতে তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি করে সেটাই কালক্রমে *রেনেসাঁস* নামে পরিচিতি লাভ করেছে। ফরাসি ঐতিহাসিক *মিশেলে* (Jules Michelet) ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম 'র‍্যানেশাঁস' শব্দটি ব্যবহার করেন।[২৩] রেনেসাঁসের একদিকে ছিল প্রচন্ড বিদ্রোহ, অন্যদিকে সম্মুখপানে ধাবমান হওয়ার আহ্বান।[২৪] তাদের বিদ্রোহ ছিল সমসাময়িক পারলৌকিক মানসিকতা ও মূল্যবোধের বিরুদ্ধে। রেনেসাঁস ছিল সামন্ত যুগের অবক্ষয়ের আলামত এবং যুগসন্ধিক্ষণের বার্তাবাহক। মধ্যযুগের ইউরোপের অন্ধবিশ্বাস, যুক্তিহীনতা ও কুসংস্কারের অচলায়তন থেকে ইউরোপবাসীর চিন্তা ও মননশীলতার মুক্তি ছিলো পনের শতকের রেনেসাঁসের প্রাণশক্তি। ব্যক্তির সার্বিক মুক্তি, প্রকৃতির বাস্তব বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ, অলৌকিক ও দৈবশক্তিতে বিশ্বাসের পরিবর্তে যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা, মানবতাবাদ প্রভৃতি ছিল পনের শতকের রেনেসাঁসের বৈশিষ্ট্য। ইউরোপীয় রেনেসাঁসের মূল লক্ষণ ছিলো অনুসন্ধানী, যুক্তিবাদী, প্রশ্নকারী ও আত্মবিশ্বাসী দৃষ্টিভঙ্গীর জাগরণ।[২৫] ঐতিহাসিক সুপ্রকাশ রায়ের মতে, ইউরোপের রেনেসাঁস ছিল সামন্তপ্রথার বিরুদ্ধে ব্যবসায়ী-বুর্জোয়াশ্রেণির নেতৃত্বে পরিচালিত বৈপ্লবিক আন্দোলন। পনের শতকের প্রথমভাগ হতে আঠার শতকের শেষভাগ পর্যন্ত ইউরোপ জুড়ে যে যুগান্তকারী বৈপ্লবিক আন্দোলন চলেছিল, তার অনিবার্য পরিণতিস্বরূপ ইউরোপের সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি ধসে পড়েছিল, প্রতিক্রিয়াশীল ও ধ্বংসোন্মুখ সামন্তপ্রথার বিরুদ্ধে তৎকালের প্রগতিশীল ধনতন্ত্রের চূড়ান্ত জয় ঘোষিত হয়েছিল।[২৬] সামন্তপ্রথার সামাজিক ভিত্তিস্বরূপ *ভূমি দাসত্বের* (Serfdom) শৃঙ্খলে আবদ্ধ কৃষক জনসাধারণ ছিল ইউরোপের ব্যবসায়ী বুর্জোয়াশ্রেণির নেতৃত্বে পরিচালিত সে বৈপ্লবিক সংগ্রামের প্রধান শক্তি। অথচ বাংলার কথিত রেনেসাঁস আন্দোলন ছিল বিদেশি ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর সহায়তাপুষ্ট ও সৃষ্ট জমিদার এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের নিয়ে গঠিত সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামি-গোষ্ঠীর আত্মসংহতি ও আত্মপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন। এবং বাংলার বিপুল কৃষক জনসাধারণকে তারা শ্রেণি-শত্রু জ্ঞান করে।

রেনেসাঁসের প্রাথমিক বিকাশ ঘটে ইতালির স্বাধীন নগর সমূহে। ইতালির ফ্লোরেন্স, জেনোয়া, পিসা, ভেনিস বা পদুয়া শহরগুলো ছিল ইউরোপীয় রেনেসাঁসের জন্মভূমি। এখানে চৌদ্দ ও পনের শতক ধরে রেনেসাঁসের ধারণা জন্মলাভ করে। রেনেসাঁসের প্রাথমিক বিকাশ ইতালির নগর সমূহে ঘটলেও সেখানেই এর স্থায়িত্ব আসেনি। বরং উনিশ শতকের পূর্বে রেনেসাঁসের মর্মবাণী এখানে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। তবে তা ইউরোপের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। উদাহরণস্বরূপ এর পরবর্তীকালে ফ্রান্সে তার পরিপুষ্টি সাধিত হয়। কিন্তু বাস্তবে ইউরোপে ইংল্যান্ডে পনের ও ষোড়শ শতকব্যাপী রেনেসাঁসের বিকাশ একটি পরিণতি লাভ করে। সমগ্র ইউরোপে সামন্তযুগের অবক্ষয় এবং শহরাঞ্চলের নাগরিক অর্থনীতির বিকাশের মাধ্যমে এ পরিবর্তন শুরু হয়। ইউরোপীয় আর্থ-সামাজিক কাঠামোর এরূপ রূপান্তরের ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণির জীবনযাত্রায় দ্রুত পরিবর্তন আসে এবং তাদের অভ্যন্তরীন বিরোধ প্রকট হতে থাকে। বাস্তব অবস্থায় বিরোধের ফলেই তাদের চিন্তা-ভাবনায় বিরোধ দেখা দেয়; যার ধারাবাহিকতায় তারাই সর্বপ্রথম ইউরোপীয় রেনেসাঁসের আলোক বিকিরণ করে।[২৭] রেনেসাঁসের মাধ্যমে নতুন প্রাণের সূচনাকারীদের অন্যতম ছিলেন ফ্রান্সিসকো প্রেত্রাক (১৩০৪-৭৪খ্রি.) এবং জিওভান্নি বোকাচ্চো (১৩০৩-৭৫খ্রি.)। তাঁরা মানুষকে নানারূপে নানা বর্ণে সাহিত্যের উপজীব্য করে প্রথম পরিবেশন করেন। পরবর্তীকালে রাফায়েল (১৪৮৩-১৫২০খ্রি.), লিউনার্দো দ্যা ভিঞ্চি (১৪৫২-১৫১৯ খ্রি.), মাইকেল অ্যাঞ্জেলা (১৪৭৫-১৫৬৪ খ্রি.) প্রমূখ শিল্পীগণ রূপ দিলেন ব্যাপক জীবনের নতুন ব্যাঞ্জনা; নানা কলা-কৌশলে,নতুন রেখা ও বর্ণের প্রয়োগে। রেনেসাঁসের এ নতুন নেতৃত্ব গির্জার অনুশাসন হতে মুক্ত হয়ে মানবিক শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন। এ মানবতাবাদী জ্ঞান হলো সেই সত্যের জ্ঞান; যা সমগ্র মানবসমাজের জন্য প্রযোজ্য। এর মূলমন্ত্র হলো ব্যক্তিমর্যাদা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র, কুল কৌলিন্য নয়। এ নবজাগৃতি বর্তমান কর্মচাঞ্চল্য, অতীতের দম্ভে আর ভবিষ্যতের স্পর্ধিত কল্পনায় মুখর হয়ে ওঠে। তাদের প্রচেষ্টার মধ্যে পান্ডিত্যবাদী ও বন্ধ্যা বুদ্ধিবাদের বিরুদ্ধে মানবতাবাদের বিদ্রোহ ছিল। এসময় বুদ্ধিমুক্তির আন্দোলন, মানবতার জয়গান ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদের মহিমার প্রচারনাই মূখ্য ছিল। রেনেসাঁস আন্দোলন ইতালিতে শুরু হয় তবে সেখানে প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বেই এর ভাবধারা সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল। ইতালিতে এ আন্দোলন শুরু হয়ে মাত্র কয়েকটি শহরেই সীমাবদ্ধ ছিল। এটা সর্বসাধারণের মধ্যে প্রবেশ করতে পারেনি। কারণ সামন্ততন্ত্র তখনও শক্তিশালী অবস্থানে এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণি ছিল খুবই দূর্বল। তাছাড়া ষোড়শ শতকের শুরুতে অটোমান সাম্রাজ্য মিশর ও উত্তর আফ্রিকা জয় করলে ইতালিয় বণিক সমাজ প্রাচ্য দেশের বাণিজ্য হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং এবণিক বুর্জোয়াদের পতনের কারণে রেনেসাঁস আন্দোলনেরও পরিসমাপ্তি ঘোষণা করে। ফ্রান্সে এ জাগরণের প্রথম বাহক ছিল রঁসা (১৫২৪-৮৫) ও রেব্লে (১৪৯৪-১৫৫৩) পরিচালিত সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান। ষোড়শ শতকের শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ *মঁতেঞ*

(Montaigne) (১৫৩৩-৯২) সকল প্রকার সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামি পরিহার করে মানবতার মর্যাদা তুলে ধরেন। অন্যদিকে স্পেনের সেরভান্টিসের (১৫৪৭-১৬১৩) বিখ্যাত গ্রন্থ *ডন কুইকসোট* ছিল সামন্ত রীতিনীতির ওপর প্রচন্ড কষাঘাত। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, ইংল্যান্ড ব্যতীত রেনেসাঁসের এ ভাবধারা আর কোথাও বাস্তবরূপ লাভ করতে পারেনি। ইতালিতে রেনেসাঁস আন্দোলন শুরু হলেও নানা প্রতিবন্ধকতায় যখন তা ব্যর্থ হতে চলেছিল তখনই তাদের সে ভাবধারা প্রাপ্ত হয় ইংল্যান্ড। ঐতিহাসিকভাবেই এখানে সামন্তবাদের একচেটিয়া প্রভাব ছিল না। পরবর্তীতে ষোড়শ শতকের ইংল্যান্ডে এক নতুন আর্থ-সামাজিক কাঠামো লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। তখন থেকেই সামন্ত শক্তির ভাঙ্গনের পাশাপাশি দ্রুতগতিতে নাগরিক অর্থনীতির বিকাশ হতে থাকে। এক কথায় বলা যায় এ সময়কালে, ক্ষয়িষ্ণু সামন্তগর্ভে মুদ্রা অর্থনীতির প্রভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিশেষ করে টিউডর যুগে (১৪৮৫-১৬০৩) কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে পরিবর্তন সাধিত হয়ে নতুন সামাজিক গঠন প্রক্রিয়ার উদ্ভব হয়। এযুগে ইংল্যান্ডের এ নতুন অর্থনৈতিক বুনিয়াদ দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হতে থাকায় মানুষের চিন্তা ও চেতনার রাজ্যও এসময় প্রসারিত হতে থাকে। বাণিজ্যিক পণ্যদ্রব্যের সাথে যখন ইতালীয় রেনেসাঁসের ভাবাদর্শ ও গ্রীক সাহিত্য, ল্যাতিন ব্যাকরণ এদেশে আমদানি হয়; তখনই মূলত তাদের সামনে সমগ্র হেলেনীয় জগৎ উম্মুক্ত হয়। প্লুটাস (২৫৪-১৮৪ খ্রি.পূ.), সেনেকা (৪-৬৫ খ্রি.পূ.), প্লুটার্কসহ (৪৬-১২০খ্রি.) পেত্রাক, বোকাচ্চো, বান্দোল্লো (১৪৮০-১৫৬২ খ্রি.) ইংল্যান্ডের মানস পরিমন্ডলকে সমৃদ্ধ করে। ধীরে ধীরে ইংল্যান্ডে মনোবিপ্লব শুরু হয়। তবে তাদের নতুন জীবন দর্শনের পথে সবচেয়ে বড়ো বাঁধা ছিল চারিদিকের সামন্ততান্ত্রিক পরিবেশ। গির্জা ও ধর্মের বন্ধনে আবদ্ধ মানুষের চিন্তা শক্তিকে মুক্তি দিতে প্রয়োজন হয় নতুন শিক্ষা সংস্কার ও ধর্ম সংস্কার আন্দোলন। টিউডর বংশের রাজা ৮ম হেনরী (১৫০৯-৪৭ খ্রি.) নতুন শিক্ষা ও নব ধর্মের আশায় এবং দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে রোমের সাথে সম্পর্ক ছেদ করে গড়ে তোলেন নিজেদের অ্যাংলিকান চার্চ। এভাবে ইংল্যান্ডে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জিত হয়। এর মাধ্যমে মধ্যবিত্ত বণিক বুর্জোয়াশ্রেণির বিকাশে স্বাচ্ছন্দ আসে এবং রেনেসাঁসের ভাবাদর্শ দৃঢ়মূল হয়।[২৮] ইংল্যান্ডের এ আর্থ-সামাজিক পটভূমিতে যে নব জাগৃতির জোয়ার আসে তাতে গড়ে ওঠে এক বলিষ্ঠ জীবনবাদী নব সংস্কৃতি। এ নব সংস্কৃতির রূপকার হলেন অ্যাডমন্ড স্পেন্সার (১৫৫২-৯৯ খ্রি.), ক্রিস্টোফার মার্লো (১৫৬৪-৯৩ খ্রি.), উইলিয়াম সেক্সপীয়ার (১৫৬৪-১৬১৬খ্রি.), ফ্রান্সিস বেকন (১৫৬১-১৬২৬ খ্রি.) এবং আরও অনেকে।

সুতরাং উপর্যুক্ত আলোচনান্তে রেনেসাঁস আন্দোলনের মাধ্যমে ইউরোপে মধ্যযুগের অবসান হয় এবং আধুনিক যুগের শুরু মনে করা হয়। ইউরোপীয় মধ্যযুগীয় সভ্যতার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো এভাবে চিহ্নিত করা যায়-(ক) চিন্তার ক্ষেত্রে স্বাধীনতার অভাব। (খ) ধর্মীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে রক্ষণশীলতা, অন্ধ

বিশ্বাস ও গোড়ামীর প্রাধান্য। (গ) আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে সামন্তবাদ ও শ্রেণি বৈষম্য। (ঘ) রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে স্বেরাচারী শাসনের প্রাধান্য।

এদিকে প্রাক মধ্যযুগের অর্থাৎ প্রাচীন যুগের সভ্যতার যে দিকগুলো পনের শতকের ইউরোপীয় বুদ্ধিজীবীদের এবং নবগঠিত বুর্জোয়া শ্রেণির ধারকদের প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছিল সেগুলো হলো– (ক) অনুসন্ধিৎসু মনোভাবের জাগরণ; (খ) যুক্তির আলোকে সবকিছু গ্রহণ করার প্রবণতা অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর উন্মেষ; (গ) সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইহজাগতিকতা ও মানবতাবাদ অর্থাৎ মানবমুখীনতার প্রাধান্য; (ঘ) রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের সূচনা।[২৯]

বাস্তবিক অর্থে ইতিহাসে কোন কিছুর পুনর্জন্ম না হলেও অতীত ইতিহাস হতে প্রেরণা লাভ এবং সেখান থেকে শিক্ষাগ্রহণ করা যায়।ফলে দেখা যায় যে, পনের শতকের রেনেসাঁস আন্দোলনের ফলে প্রাচীন গ্রীক বা রোমান সভ্যতাকে ফিরিয়ে আনা যায়নি সত্য, কিন্তু এ আন্দোলনের ফলে হাজার বছরের মধ্যযুগীয় সভ্যতার অবসান হয়েছে এবং যাকে বলা হয় আধুনিক সভ্যতা তার আবির্ভাব ঘটেছে। অর্থাৎ ইউরোপের ইতিহাসে এক নব যুগের সূচনা হয়েছে। আধুনিকতার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো ইহজাগতিকতা, মানবতাবাদ ও গণতন্ত্র। যার উৎস সক্রেটিস (৪৭০-৩৯৯ খ্রি.পূ.), প্লেটো (৪২৭-৩৪৭ খ্রি.পূ.), এরিস্টেটল (৩৮৪-৩২২ খ্রি.পূ.)'র যুগেই প্রাচীন গ্রীক সভ্যতায় দেখা যায়। ইউরোপের পনের শতকের রেনেসাঁস আন্দোলনের ফলে যে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল সেটা পরিণতি লাভ করে আঠার শতকের শেষের দিকের চিন্তা ক্ষেত্রে দার্শনিক বিপ্লব, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শিল্প বিপ্লব এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ফরাসি বিপ্লবের মধ্য দিয়ে; মোদ্দাকথা গোটা এ প্রক্রিয়ার ফলেই গোড়াপত্তন হয় আধুনিক আর্থ–সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার।

উনিশ শতকের প্রথম দিকে পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে এবং সমকালীন ইউরোপীয় চিন্তাধারার প্রভাবে শহরবাসী বেশ কিছু সংখ্যক বাঙালির জীবন ও মানসে যে আমূল পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল বা পরিবর্তনের স্বপক্ষে যে আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল সেটাই আমাদের সময়কালে 'বাংলার রেনেসাঁস' বা বাংলার 'নবজাগরণ' নামে আখ্যাত হয়ে এসেছে।[৩০] প্রকৃতপক্ষে আঠার শতকের শেষ দিকে ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য এদেশে ও বিদেশে সরকারি ও বেসরকারি স্তরে আন্দোলন গড়ে ওঠে। কলকাতা ও তার আশেপাশে বেসরকারি উদ্যোগে ইংরেজি শিক্ষার সূত্রপাত হয়েছিল। উনিশ শতকের প্রথম দিক হতেই বাংলায় ইংরেজি শিক্ষার এক প্লাবন এসেছিল। সকলেই ইংরেজি পড়তে আগ্রহী হয়ে ওঠে। বিশেষ করে কলকাতার শহরতলী অঞ্চলে ইংরেজি শিক্ষার দাবি এ সময় অত্যন্ত প্রবল হয়ে ওঠেছিল।

এ সময় বাংলার নব শিক্ষার প্রসারে উদীয়মান অভিজাতদের সমবেত প্রচেষ্টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একদিকে শিক্ষা প্রসারের কারণ যেমন স্পষ্ট; তেমনি এ শিক্ষা ব্যবস্থায় শ্রেণিগত, সম্প্রদায়গত ও বর্ণগত চরিত্র এবং তাঁর সীমাবদ্ধতা খুবই লক্ষ্যণীয়। এ নয়া অভিজাত শ্রেণির শিক্ষা প্রসারের মূলে পাশ্চাত্য জীবন দর্শনের কোনো যোগাযোগ ছিল বলে মনে করার কোন কারণ নেই। তবে তাঁদের বাস্তব বৈষয়িক জ্ঞান যে ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। জমিজমা বা ব্যবসায়ের মতো ইংরেজি বিদ্যাশিক্ষা করা যে একটি অর্থনৈতিক মূলধন; তা অনুধাবন করার মতো বুদ্ধি তাদের ছিল।[৩১]

উনিশ শতকের নবজাগরণকে ব্যাখ্যা করার জন্য রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩ খ্রি.) প্রথম 'রেনেসাঁস' শব্দটি ব্যবহার করেন। এ ধারাবাহিকতায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪ খ্রি.), অরবিন্দকুমার ঘোষ (১৮৭২-১৯৫০ খ্রি.) এবং বিপিনচন্দ্র পালও (১৮৫৮-১৯৩২ খ্রি.) তাঁদের লেখনির মাধ্যমে উক্ত সময়কালকে বাংলার জন্য রেনেসাঁস হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।[৩২] উনিশ শতকে বঙ্গীয় মানসলোকে নিঃসন্দেহে এক অভূতপূর্ব ভাবতরঙ্গ সৃষ্টি হয়।[৩৩] অন্যান্য দেশের মত ব্রিটিশ বাংলার তথা ভারতবর্ষের উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণি, মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণির মধ্যে যে কিঞ্চিত গতিশীলতা ও প্রাণশক্তি ছিল তা অস্বীকার করা যায়না। সে গতিশীলতা ও প্রাণশক্তির জোরেই উনিশ শতকের বাংলার নবজাগৃতি আন্দোলন উত্থান পতনের বন্ধুর পথে রাজা রামমোহন রায় থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১খ্রি.) পর্যন্ত প্রবাহিত হয়েছে নতুন মনীষা, গঠন কুশলী, সমাজসংস্কার, সৃষ্টিশীল সাহিত্য ও শিল্প প্রতিভার বিকাশ হয়েছে।[৩৪] স্যার যদুনাথ সরকার দ্বিধাহীন ভাবে এবং অত্যন্ত স্পষ্ট করে উনিশ শতকের বাংলার নব জাগরণকে রেনেসাঁস নামে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন, কনস্টান্টিনোপলের পতনের পর ইউরোপে যে রেনেসাঁ দেখা দেয়, উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণ ছিল তাঁর চেয়েও ব্যাপক, গভীর এবং অধিকতর বৈপ্লবিক। এ নবজাগরণ ছিল প্রকৃতই একটি রেনেসাঁস।[৩৫] অধ্যাপক সুশোভনচন্দ্র সরকার বিশ্লেষণী যুক্তির দ্বারা উনিশ শতকের নবজাগরণের বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করেও একে রেনেসাঁস হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশেই সর্বপ্রথম ব্রিটিশ শাসন, বুর্জোয়া অর্থনীতি ও আধুনিক পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাব অনুভূত হয়। তার ফলে যে জাগরণ ঘটে তাকে সাধারণত রেনেসাঁস বলা হয়ে থাকে।[৩৬] তিনি আরও বলেন, "বাংলার নবজাগরণ ভারতের নবজাগরণে যে ভূমিকা নেয়; ইউরোপের রেনেসাঁসে ইতালির ভূমিকার সঙ্গে তা তুলনীয়।"[৩৭] উনিশ শতকের প্রথমভাগ হতে প্রথমে এককভাবে বিত্তশালী সম্প্রদায়ের দ্বারা এবং পরে স্বয়ং ইংরেজ শাসকগণের উদ্যোগে ব্রিটিশ বাংলায় উন্নত ইউরোপীয় শিক্ষা প্রবর্তিত হয়। কিন্তু তাতে বিত্তবান জমিদার ও মধ্যবিত্ত শ্রেণি ব্যতীত সমাজের অপর কোন শ্রেণির পক্ষে অংশগ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। সে শিক্ষাব্যবস্থা কেবল শহরাঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এ শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের পরবর্তীতে যে সকল সমাজসংস্কার মূলক

আন্দোলন শুরু হয় তাও কলকাতা ও বাংলার কয়েকটি প্রধান শহরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এছাড়া গ্রামাঞ্চলের যে সকল স্থানে এ শিক্ষা ও সমাজসংস্কার আন্দোলনের বিস্তার ঘটে তা ছিল প্রধানত হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণি অধ্যুষিত অঞ্চল। অর্থাৎ শহরসীমার বাইরে এ আন্দোলনের প্রভাব বিস্তৃত হয়নি। মূলত শহরবাসী বিত্তশালী সম্প্রদায় নিজেদের স্বার্থেই বঙ্গদেশের তথাকথিত রেনেসাঁস বা নবজাগৃতি আন্দোলন আরম্ভ করে। বঙ্গীয় রেনেসাঁস সংক্রান্ত গবেষণাগুলো থেকেও এটা প্রতীয়মান হয় যে, এ রেনেসাঁসের ধারক ও বাহক ছিলেন নগরবাসী ইংরেজি শিক্ষিত হিন্দু বুদ্ধিজীবীরা। সে সময়ে এ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের যে একটা প্রচন্ড জাগরণ ঘটেছিল, বহুধারায় প্রবাহিত হয়েছিল তাদের উদ্যম–তা অস্বীকার করার উপায় নেই।[৩৮] এ রেনেসাঁ আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব রাজা রামমোহন রায় ছিলেন এ নতুন বিত্তশালী জমিদার শ্রেণিরই অন্তর্ভূক্ত।

১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের 'সেন্সাস' রিপোর্টে সংগৃহীত তথ্যসমূহ পর্যালোচনা করে 'সেন্সাস কমিশনার' শ্রী অশোক মিত্র যে ঐতিহাসিক সত্যে উপনীত হয়েছেন তা বঙ্গীয় রেনেসাঁসের চরিত্র উদঘাটনের পক্ষে বিশেষ উল্লেখযোগ্য–

> লক্ষ লক্ষ কৃষকের সহায়-সম্পদ লুণ্ঠিত ধনবান এ ভূস্বামী শ্রেণিই শহরে নিয়ে আসে সাংস্কৃতিক জাগরণ। তাদের মূখপাত্র ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। এ নবজাগরণকে অনেক সময় ভ্রমবশত রেনেসাঁস বলা হয়ে থাকে। যে শ্রেণির লোক এটা হতে লাভবান হয়েছিল তারাই আদর করে এর নাম দিয়েছিল 'রেনেসাঁস'। যে শ্রেণির মধ্যে এ জাগরণ দেখা দিয়েছিল, তারই অনপনেয় ছাঁপ ছিল তথাকথিত এ 'রেনেসাঁসে'। এজাগরণ এসেছিল প্রধানত শহরে এবং লর্ড বেন্টিঙ্ক যাদের পরজীবী বলে অভিহিত করেছেন; সে ভূস্বামি শ্রেণির মধ্যেই এটা সীমাবদ্ধ ছিল। এ মুৎসুদ্দি জমিদার গোষ্ঠীর অন্তরের কামনা ছিল গ্রাম হতে দূরবর্তী শহরে বসে শাসক গোষ্ঠীর গৌণ অংশীদার হওয়া। এটা ছিল 'রেনেসাঁসের' একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য; এবং বৈশিষ্ট্যটি পরিণতি লাভ করেছিল শাসক গোষ্ঠীর সাথে উক্ত পরজীবী জমিদারশ্রেণি ও ইংরেজ বণিকগণের মুৎসুদ্দিদের মৈত্রীর ভিতর দিয়ে।[৩৯]

লর্ড কর্নওয়ালিস কর্তৃক প্রবর্তিত ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরবর্তী সময়ে নানা ঘটনা প্রবাহে প্রথম যুগের জমিদারি অবসান হয়ে এক নতুন জমিদার শ্রেণির আবির্ভাব ঘটে। তাদের নিকট হতে জমি ইজারা নিয়ে জোতদার বা তালুকদার নামধারী অধস্তন শ্রেণিটিও মধ্যবিত্ত শ্রেণি রূপে আবির্ভূত হয়ে অভিজাত শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হয়। এ শ্রেণিটি ইংরেজ শাসক গোষ্ঠীর কৃপায় অর্থনৈতিক প্রভুত্ব লাভ করলেও সামাজিক নেতৃত্ব তাদের ছিল না। এর মূলকারণ ছিল হিন্দু সমাজের রক্ষণশীলতা এবং ব্রাহ্মণসমাজের প্রভুত্ব। এ ব্রাহ্মণসমাজের মাধ্যমে পরিচালিত হিন্দুধর্মের সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্যে নতুন অভিজাত শ্রেণিটি বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তাদের আন্দোলনের ফলেই ব্রাহ্মধর্ম ও নব হিন্দুবাদ প্রবর্তিত হয়। এছাড়াও সে সময়ের বঙ্গীয় সমাজকে উন্নততর করে তোলার জন্য চিন্তা ও চেতনার ক্ষেত্রে বেশ কিছু অপরিহার্য উপাদান পাওয়া যায়-যেমন নতুন ধরণের শিক্ষা, সাহিত্য, সামাজিক আদর্শ ও

রীতিনীতি, জাতীয়তাবাদের ধারণা ইত্যাদি। এসকল সমাজ সংস্কারমূলক সামগ্রিক ক্রিয়াকলাপই ইউরোপীয় রেনেসাঁসের অনুকরণে বঙ্গীয় রেনেসাঁস বা বাংলার নবজাগৃতি নামে অভিহিত হয়ে থাকে।

উনিশ শতকের বঙ্গীয় রেনেসাঁসকে বাঙালি বিদ্বানেরা পদ্ধতিগতভাবে চারটি পর্বে গড়ে তোলেন। ***প্রথমত,*** তারা বাংলা গদ্যভাষা ও নতুন বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি করেন। ***দ্বিতীয়ত,*** ভারতের স্বর্ণযুগ নামে আখ্যাত ধ্রুপদী যুগের পুনরাবিষ্কার করেন; যার সঙ্গে রয়েছে গ্রীস ও রোমের গৌরবময় ঐশ্বর্যের সমতুল্যতা সনাক্তকরণ। ***তৃতীয়ত,*** ভারতীয় বিদ্বানেরা নিজেদের ঐতিহাসিক অবস্থার সঙ্গে শ্রীরামপুরের মিশনারীদের দেওয়া প্রোটেস্ট্যান্ট রিফর্মেশন সম্পর্কে নতুন ব্যাখ্যার সাদৃশ্য লক্ষ্য করেন। ***চতুর্থত,*** বৈশ্বিক প্রগতি সম্পর্কে একটি ধর্ম নিরপেক্ষ ধারণায় উপনীত হন, যার ওপর নির্ভশীল ছিল তাদের প্রত্যাশা। তবে একথা সত্য যে, এ নতুন প্রত্যাশার ধারায় তারা অতীতকে পুরুদ্ধার করতে অনাগ্রহী হওয়া সত্ত্বেও তারা কিন্তু ভবিষ্যতের মধ্যে অতীতের স্বর্ণযুগকে তুলে ধরতে সচেষ্ট ছিল।

ঊনিশ শতকের প্রথমভাগে বাংলার সমাজ ব্যবস্থায় মূলত দুটি শ্রেণি ছিল। একটি হলো ইংরেজ আর্শীবাদ পুষ্ট ভূস্বামি গোষ্ঠী এবং অপরটি কৃষক সম্প্রদায়। ভূস্বামি গোষ্ঠী জমিদার ও মধ্যবিত্ত শ্রেণি অর্থনৈতিক ক্ষমতার জোরে সমাজে নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। এ সংগ্রামে মধ্যবিত্ত শ্রেণিই ছিল জমিদার গোষ্ঠীর প্রধান সহায়, প্রধান কার্যকরি শক্তি এবং বঙ্গীয় রেনেসাঁসের প্রধান কর্মীদল। রেনেসাঁস আন্দোলনের যা কিছু নতুন সৃষ্টি তার প্রায় সকলই এদের কীর্তি। মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে এক ভাগ ছিল গ্রামাঞ্চলের স্থায়ী অধিবাসী। ভূমিস্বত্ত্বই ছিল তাদের প্রধান জীবিকা। তারা কিছুটা প্রতিক্রিয়াশীলও ছিল। মধ্যবিত্ত শ্রেণির অপর অংশটি ছিল প্রধানত শহরবাসী। তালুকদারির আয় ছাড়াও তারা শহরের চাকরিজীবী হিসেবে অর্থ উপার্জন করতো। বহু ক্ষেত্রেই তারা ছিল প্রগতিশীল। ফলে এ মধ্যবিত্ত শ্রেণির মাধ্যমে বঙ্গীয় রেনেসাঁসে প্রতিক্রিয়াশীলতা ও প্রগতিশীলতা উভয়ই দেখা যায়। সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়; ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে এখানে পাঠ্যপুস্তক রচনাসহ ইউরোপীয় শিক্ষাপদ্ধতি ও ছোটবড়ো কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠা গড়ে ওঠে। ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা তার একটি বড়ো নিদর্শন। কলকাতার উচ্চশ্রেণির লোকেরা এটি গড়ে তোলেন। তখন এ কলেজটি ছিল সমগ্র এশিয়ায় ইউরোপীয় আদলে উচ্চ শিক্ষার প্রথম প্রতিষ্ঠান।[৪০] এ সময়ে কলকাতায় বাংলা ও ইংরেজিতে সংবাদপত্র, সাময়িক পত্রিকা এবং বিভিন্ন বিষয়ের গ্রন্থ নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকে। কলকাতায় একটি সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়। ক্রমশ বিদ্বজ্জনেরা আধুনিক বিশ্বে নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠেন। সেই সঙ্গে নিজেদের ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার এবং

ইউরোপীয় ঘটনাবলি ও জ্ঞানবিজ্ঞানের দিকে মনোযোগ দেন। এভাবে ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে জনমনে ক্রমশ সচেতনতা বেড়ে চলে।

এখানে উল্লেখ করা যায় যে, উনিশ শতকে বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র ছিল বিভিন্ন রকম সভা ও সমিতি। অবশ্য আঠার শতকের শেষার্ধ হতে ইংরেজ শাসক বণিকরাই প্রথমে এ ধরণের সোসাইটি স্থাপন করতে শুরু করে। এরপর নবযুগের আদর্শে উদ্বুদ্ধ বিত্তবান ও শিক্ষিত বাঙালিরা উদ্যোগী হয়ে এ ধরণের সভা ও সমিতি স্থাপন করতে শুরু করে। উনিশ শতকের গোঁড়া থেকে শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের বড়ো বড়ো বিদ্বৎসভা গুলোর পরিচালক মন্ডলীর সামাজিক শ্রেণি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়; যারা বিদ্বান ও বিত্তবান দুই-ই, তারাই এগুলোর প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক। রাজা রামমোহন রায়, রাধাকান্ত দেব, রাজকমল সেন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, শশীপদ পাল, শিবনাথ শাস্ত্রী, বিজয় গোস্বামী, স্বামী বিবেকানন্দ, রমেশদত্ত প্রমূখ ছিলেন বঙ্গীয় বিদ্বৎ সমাজের মধ্যমণি। তাঁরা সবাই ছিলেন দেশের উচ্চবিত্ত; তাদের প্রভাব প্রতিপত্তির উৎস ছিল ভূমিস্বত্ত্ব, ভূমিখাজনা এবং ব্রিটিশ রাজত্বের প্রতি প্রগাঢ় আনুগত্য ও আস্থা।[৪১]

রাজা রামমোহন রায়ের আত্মীয়সভা থেকে শুরু করে গৌড়ীয় সমাজ, অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন, ব্রাহ্মসমাজ, তত্ত্ববোধিনী সভা, বেথুন সোসাইটি, সুহৃদ সমিতি, সর্বতত্ত্বদিপিকা সভা, সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা, বিদ্বোৎসাহিনী সভা, কেশবচন্দ্র সেনের *গুড উইল ফ্যাটারনিটি* (Goodwill Fraternity) ও সঙ্গতসভা প্রভৃতি সকল বিদ্বৎসভায় এ উচ্চশ্রেণির বুদ্ধিজীবীরাই প্রাধান্য লাভ করেছেন। এ বিদ্বোৎসভাগুলোই ছিল নবযুগের আদর্শ প্রচারের প্রধান প্রতিষ্ঠান ও মাধ্যম। এ প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমেই বুদ্ধিজীবীরা সমাজের সর্বশ্রেণির মধ্যে তাদের নৈতিকপ্রভাব বিস্তার করতেন।[৪২] তখন থেকেই প্রকৃতপক্ষে আদর্শিক সংগ্রাম শুরু হয় এবং সে আন্দোলন কলকাতাকে কেন্দ্র করে ধীরে ধীরে বাংলার সমাজ জীবনে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে।

বঙ্গীয় রেনেসাঁস আন্দোলনের শুরু মূলত ইংরেজ শাসকগণ কর্তৃক প্রবর্তিত ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে। উন্নত ইউরোপীয় শিক্ষা-দীক্ষা ও ইউরোপীয় বুর্জোয়া বিপ্লব ছিল এ রেনেসাঁসের প্রগতিশীলতার উৎস। বিশেষত, খ্রিস্টান ধর্মের আদর্শের অনুকরণে একেশ্বরবাদী ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তন, ইউরোপীয় সাহিত্য হতে নতুন সৃষ্টির প্রেরণা লাভ এবং ইউরোপীয় আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার মত বঙ্গীয় সমাজের সংস্কারসাধন ছিল বঙ্গীয় রেনেসাঁস আন্দোলনের উদ্দেশ্য। ব্রিটিশ শাসনাধীনে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হতে উদ্ভূত অভিজাত শ্রেণিটি ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমেই যে বঙ্গীয় রেনেসাঁসের প্রবর্তন করে; এ প্রসঙ্গে আর.পি.দত্ত বলেন,

সাম্রাজ্যবাদী শাসনকার্যের দক্ষ পরিচালনার জন্য (ভারতবর্ষের ওপর) যে শিক্ষাব্যবস্থা চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল, সেই শিক্ষাব্যবস্থাই এমনকি পীট-হেস্টিংস, ওয়েলিংটন প্রমূখ শাসকশ্রেণির স্বেচ্ছাচারী শাসনের পরিচালক বৃন্দের ভারত গ্রাস ও শোষণের এবং উৎপীড়নের বিরুদ্ধেও ইংল্যান্ডের জনসাধারণের সংগ্রামের ঐতিহ্য ও প্রেরণা এবং সেই সংগ্রামের ঐতিহ্যবাহী মিল্টন-শেলী-বায়রনের সাহিত্য সম্ভারের বিপুল স্রোতের পথ উম্মুক্ত করে দিয়েছিল।[৪৩] মধ্যযুগের তন্দ্রা, আত্মবিশ্বাস ও কুসংস্কার হতে যেমন রেনেসাঁসের গতিধারায় ইতালি প্রথম মুক্তিরপথ দেখায়; তদ্রুপ ভারতের মধ্যযুগের আত্মবিশ্বাস ও কুসংস্কার থেকে উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণ মুক্তির পথ নির্দেশ করে। ইতালির রেনেসাঁসে দ্রুপদী সাহিত্য যথা গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্যের যে ব্যাপক চর্চা হয়, বাংলাতেও প্রাচ্যবাদীরা সেরূপ ভারতের প্রাচীন সংস্কৃত ও মধ্যযুগের ফার্সি সাহিত্যের চর্চা করে। *ডেভিড কফের* (David Kopf) মতে, ওয়ারেন হেস্টিংসের আমল থেকেই প্রাচ্য বিদ্যায় অনুরাগী পন্ডিতরা প্রাচ্য দেশীয় সাহিত্য ও দর্শন চর্চার সূত্রপাত করেন। স্যার উইলিয়াম জোনস, ম্যাক্সমুলার, উইলসন প্রমূখের নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীতে রাজা রামমোহন রায় এই প্রাচ্যবিদ্যার চর্চাকে বরণ করেন। তিনি নিজে বেদ ও উপনিষদের যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনা করে প্রাচীন ঐতিহ্যের পুনর্জীবন ঘটান। ইউরোপীয় রেনেসাঁসে যে স্বাধীন, অনুসন্ধানী ও যুক্তিবাদী মানসিকতা দেখা যায়, বাংলার ইয়ংবেঙ্গল এবং ডিরোজিও গোষ্ঠীর তীব্র যুক্তিবাদী দৃষ্টি ও প্রচলিত কুসংস্কার বিরোধী আন্দোলনে তা প্রতিফলিত হয়। ইউরোপীয় রেনেসাঁসের মানবতাবাদ রাজা রামমোহন রায় এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কার আন্দোলনের মধ্যে বিকশিত হতে দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে রেনেসাঁস প্রসূত যুক্তিবাদ ও বস্তুবাদ থেকে জন্মলাভ করে বিজ্ঞান চর্চার প্রয়াস।

মূলত বাংলার নবজাগরণের বা চিন্তা ও চেতনার বীজ ছিল মিশ্র, এতে কিছুটা প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি এবং কিছুটা পাশ্চাত্য বিশেষত ইংল্যান্ডের সংস্কৃতির মিশ্রণ বিদ্যমান। একটি বিদেশি শাসকের শৃঙ্খলিত শাসন ও তার সংস্কৃতির ছোয়ায় বাংলায় নবজাগরণ ঘটেছিল বলেই ইউরোপীয় রেনেসাঁসের বিরাট গতিবেগ এবং প্রচন্ড উদ্যম ও বিভিন্নমূখী সৃজনশীলতা বাংলার রেনেসাঁসে ছিল অনুপস্থিত।[৪৪] এসময় বাংলার নবজাগরণে দুটি পৃথক চিন্তা ও চেতনা ধারার সমন্বয় দেখা যায়। প্রথমটি হলো পাশ্চাত্যের উদারপন্থী ভাবধারা এবং দ্বিতীয়টি হলো পুনরুজ্জীবনবাদী প্রাচ্যবাদ। প্রথম ভাবধারার প্রভাবে সমাজ সংস্কারের চেষ্টা, সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও নারীমুক্তি আন্দোলন প্রভৃতি ঘটে। এ ধারায় সতীদাহ নিরোধ, বিধবা বিবাহ, স্ত্রী শিক্ষা বিস্তার, বহুবিবাহ প্রথা বন্ধের চেষ্ট করা হয়। এ সময় যুক্তির আলোকে প্রচলিত প্রথা ও আচারগুলো যাচাই করা হয়। মূলত পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের ফলেই যুক্তিবাদের প্রসার ঘটে; আর যুক্তিবাদের সঙ্গে আসে মানবতাবাদ। দ্বিতীয়ধারা অনুযায়ী সরকারি

আইনের সাহায্যে সামাজিক কুসংস্কার ও কুপ্রথা রদ করার প্রচেষ্টাকে ভুল নীতি বলা হয়। এ ধারার অনুসারীগণ ভারতের প্রাচীন সভ্যতার নেতৃত্বে বিশ্বাস করতেন। ইউরোপের সকল কিছুই শ্রেষ্ঠ এবং ভারতীয় সবকিছুই নিকৃষ্ট একথা তারা মানতেন না। সুশোভন সরকারের মতে, উনিশ শতকের বাংলায় পাশ্চাত্যবাদ ছিল অধিকতর প্রগতিশীল প্রবণতা। ইতিহাসগত বিচারের আমাদের এই নবজাগরণ ঘটেছিল নতুনের প্রতি আকর্ষণের ফলেই; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যাকে অভিহিত করেছিলেন যাদুস্পর্শ বলে।[৪৫] ভারতীয় জাতি গড়ে তোলার ব্যাপারে পাশ্চাত্যবাদ অনেক বেশি উপযুক্ত ও প্রাসঙ্গিক। কেননা এ দৃষ্টিভঙ্গী ধর্মনিরপেক্ষভাবে মানুষকে মানুষের অধিকার দেয়; এর যুক্তিবাদ ধ্বংস করে পরিবর্তন বিরোধী ধর্মীয় ও সামাজিক গোঁড়ামিকে, এর সামাজিক সংস্কারগুলো উজ্জ্বল করে তোলে নিপীড়িত মানুষের মুক্তির সম্ভাবনাকে। পাশ্চাত্যবাদের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা গুলো আজও নিঃশেষ হয়ে যায়নি। *ডেভিড কফের* (David Kopf) মতে, ইউরোপীয় প্রাচ্যবাদীরাই ভারতের প্রাচীন সভ্যতার শ্রেষ্ঠ দিকগুলোকে অনুসন্ধান করে প্রথমে তুলে ধরেন।[৪৬] পরবর্তী সময়ে রাজা রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমূখ ব্যক্তিবর্গ সে ধারাকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করেন। পুনরুজ্জীবনবাদীদের একাংশ হিন্দু সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বে এতোই মোহগ্রস্ত ছিলেন যে, তারা ভারতীয় সভ্যতা বলতে প্রাচীন হিন্দু সভ্যতাই বুঝতেন। মধ্যযুগের মুসলমানদের সভ্যতা ও সমন্বয়কে তারা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করেন। শেষপর্যন্ত বাংলার নবজাগরণের বা চিন্তা ও চেতনায় একটি তৃতীয় ধারার উদ্ভব হয়। যাকে বলা হয় সমন্বয়বাদী ধারা। প্রাচীন যুগের যা কিছু শ্রেষ্ঠ ও যুক্তিসিদ্ধ তার সঙ্গে প্রতীচ্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানের যা কিছু শ্রেষ্ঠ উভয়ের সমন্বয় দ্বারা বাংলা তথা ভারতের ভবিষ্যৎ অগ্রগতির পথনির্দেশ ছিল এ সমন্বয়বাদী ধারার বৈশিষ্ট্য। মূলত সমন্বয়ের এ পথ ধরেই আধুনিক ভারত গড়ে উঠে। এ সমন্বয়বাদের প্রধান প্রবক্তা ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমন্বয়বাদ জীবন্তভাবে মূর্ত হয়। এমনকি বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রেও প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সমন্বয়ী চিন্তার পরিচয় স্যার জগদীশচন্দ্র বসু ও আচার্য স্যার প্রফুলচন্দ্র রায়ের মধ্যে লক্ষ্যণীয়। তাঁরা একাধারে নিউটন ও ফ্যারাডের চিন্তাধারার সাথে হিন্দু বস্তুবাদী বিজ্ঞান যথা উদ্ভিদবিদ্যা ও রসায়ন বিদ্যার তত্ত্বও গ্রহণ করেন। কার্যত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ ভাবধারার সমন্বয়ে গঠিত এ জাগরণকে তার নিজস্ব প্রকৃতির ওপর তার সমন্বয়বাদী চরিত্রের দ্বারাই বিচার করতে হবে।

অবশ্য বাঙালি বিদ্বানেরা মনস্তাত্ত্বিকভাবে রেনেসাঁস সম্পর্কে প্রথম দিকে কিছুটা অনিশ্চিত ছিলেন। দুটি ভিন্ন ধরনের সভ্যতার যোগাযোগ ও সংঘাত এবং নব আবিষ্কৃত ঐতিহাসিক মাত্রা রেনেসাঁসের ধারণাকে গতিশীল করলেও তার মধ্যে একটি অভিজ্ঞতা ছিল ভিন্ন রকম। একদিকে বাঙালি পন্ডিতেরা প্রাচ্যবিদদের নিকট থেকে প্রথম অবহিত হন ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতা সম্পর্কে; অপরদিকে মিশনারীদের

নিকট থেকে জেনেছেন প্রোটেস্ট্যান্টদের মনোভাব, যাঁরা ইতোমধ্যে ইউরোপের মধ্যযুগকে অন্ধকার যুগ হিসেবে চিহ্নিত করেন। এ দু'টি ধারণা রেনেসাঁসের সৌষম্য মানবতাবাদ সম্পর্কে বাঙালিদের ভাবতে উদ্বুদ্ধ করে। তাঁরা সনাক্ত করেন, নেতিবাচক ঐতিহাসিক কারণে তাঁদের সংস্কৃতি ও সভ্যতার শ্রেষ্ঠ সম্পদ ক্ষয়িষ্ণু হয়ে পড়েছে; এবং এ ক্ষয়িষ্ণু সংস্কৃতি পুনরুজ্জীবিত হওয়া সম্ভব, তাঁরা নিজেরাই যার প্রতিনিধিত্ব করেন।

রাজা রামমোহন রায়ের চিন্তা ও চেতনা:

রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩ খ্রি.) ভারতবর্ষের প্রথম আধুনিক পুরুষ হিসেবে স্বীকৃত। তিনি ছিলেন সনাতন ধর্মের (হিন্দুধর্ম) এক মহান সংস্কারক। বর্তমান ভারতের পশ্চিম বাংলার রাধানগর গ্রামে এক রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁর জন্ম হলেও বাল্যকাল হতে তিনি গতানুগতিক সনাতনী শিক্ষা লাভ করেন। এছাড়াও পরবর্তীতে তিনি হিন্দি ও বেশ কয়েকটি প্রাচ্যভাষা, যেমন সংস্কৃত, আরবি ও ফারসিতে বুৎপত্তি লাভ করেন। তিনি হিন্দুধর্মগ্রন্থ সমূহ ভালোভাবে আয়ত্ত্ব করেন এবং মুসলমান পন্ডিত ও ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সরকারের রাজস্ব ও বিচার বিভাগের কর্মকর্তাদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের মাধ্যমে তিনি ইসলামি ধর্মতত্ত্ব ও আইনশাস্ত্রে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করেন। আরবি ভাষার মাধ্যমে প্রাচীন গ্রীক দর্শনশাস্ত্র ও বিজ্ঞান যেমন অ্যারিস্টোটলের যুক্তিবিদ্যা ও ইউক্লিডের মূলনীতি সমূহের প্রাথমিক পর্যায়ের সাথে তার পরিচয় ঘটে। ফলে তিনি কিছুটা সমালোচনামূলক ও যৌক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি আত্মস্থ করেন। ইসলাম ও সনাতন ধর্মের (হিন্দুধর্ম) শাস্ত্রসম্মত বিধান সমূহের তুলনামূলক অধ্যয়ন এবং পারস্যের সুফি মরমিবাদী কবিদের কাব্যসমূহের সাথে তাঁর পরিচিতি ও সেই সাথে অ্যারিস্টোটলীয় যুক্তিবিদ্যা অল্পবয়সে তাঁকে সনাতনধর্ম সমূহের ব্যাপারে কিছুটা বিপ্লবী মনোভাবাপন্ন করে তোলে।

রাজা রামমোহন রায়ের প্রথম দিকের রচনাসমূহ ছিল আরবি ও ফারসি ভাষায়। ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর গবেষণামূলক পুস্তিকা *তুহফাতুল মুহাহহিদিনে* (Gift to Monotheists)[৪৭] তিনি ঘোষণা করেন, কোন রকম পার্থক্য ব্যতিরেকে সকল ধর্মেই সচরাচর ভ্রান্ত মত পরিদৃষ্ট হয়। এবং তিনি এমত পোষণ করেন যে, কোন নবি, ধর্মীয় কর্তৃত্ব ও প্রত্যাদেশের সাহায্য ছাড়াই নিজস্ব কর্মক্ষমতার মাধ্যমে সর্বজনীন সর্বোৎকৃষ্ট সত্ত্বাকে অনুধাবন করা সম্ভব।[৪৮] বস্তুত, তুহফাত প্রকাশিত হওয়ার কয়েক বছর পূর্বে রাজা রামমোহন রায় সনাতন হিন্দুদের প্রতিমাপূজা মেনে নিতে অস্বীকার করেন। প্রকৃতপক্ষে এ সময় থেকেই তিনি যুগ যুগ ধরে চলে আসা হিন্দুপ্রথা ও আচার অনুষ্ঠানের প্রতি সমালোচনা মূখর ছিলেন। কোম্পানি আমলের শুরুর দিকে তিনি কলকাতা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও সদর দিওয়ানি

আদালতের সাথে যুক্ত নেতৃস্থানীয় ভারতীয় পন্ডিতদের সাথে পরিচিত হন। এ ছাড়াও তিনি ইউরোপীয় কর্মকর্তা ও বণিকদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন, যাঁদের অনেকেই উদারবাদী চিন্তা ও ফরাসি বিপ্লবের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁর ইংরেজ বন্ধুদের সান্নিধ্যে এসেই মূলত তিনি সমকালীন ইউরোপীয় চিন্তাধারা সাথে পরিচিত হন।

১৮১৪ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে রাজা রামমোহন রায় কলকাতায় বসতি স্থাপন করেন। এর মাধ্যমে তাঁর জীবনের নতুন এক পর্ব শুরু হয়। এসময় তিনি সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারের উদ্দেশ্যে তাঁর জীবনকে উৎসর্গ করবেন মর্মে সিদ্ধান্ত করেন। কলকাতা পৌঁছার এক বছরের মধ্যেই তিনি সমমনা ব্যক্তিদের নিয়ে 'আত্মীয় সভা' নামে একটি একান্ত সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন।[৪৯] এ সভার সূত্রে তিনি কিছু অভিজাত ও নয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদারনীতিবাদীর সমর্থন এবং তাঁদের বন্ধুত্ব লাভ করেন। বন্ধুদের মধ্যে ভারতীয় এবং ইউরোপীয় উভয়ই ছিলেন। রংপুরে কিছুদিন সরকারি পদে চাকরি করার সুবাদে নিজের ঘনিষ্ঠজনদের নিয়ে সেখানে যেভাবে আলোচনা সভার আয়োজন করতেন; কলকাতাতেও এ নয়া বন্ধুদের নিয়ে তিনি ঠিক সেভাবেই নিয়মিত আলোচনা সভার আয়োজন করতে শুরু করেন।

রাজা রামমোহন রায় হিন্দু ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের এক মহান যুগের সূত্রপাত করেন। সমকালীন সময়ে বিদ্বান ও চিন্তাশীল ব্যক্তিরা অশিক্ষিত জনসাধারণের প্রতি ঘৃণা ও করুণার কারণে প্রাচীন হিন্দুধর্মের বিকৃতিগুলো নীরবে সহ্য করে যেতেন। কিন্তু এ বিকৃতিগুলোর প্রতিবাদে রাজা রামমোহন রায় রুখে দাঁড়ান। হিন্দুধর্মের সারতত্ত্ব বেদান্তগ্রন্থটি একেশ্বরবাদের সম্পূর্ণ পরিপেষক। এতে পৌত্তলিকতার স্থান নেই। খোদ হিন্দুধর্ম গ্রন্থ সমূহেই যে একেশ্বরবাদের কথা বলা হয়েছে তা মানুষের সামনে সহজবোধ্য করার জন্য ১৮১৫ থেকে ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বেদান্তে পারদর্শী অধ্যাপক না থাকায় রাজা রামমোহন রায়কে গুরুতর পরিশ্রম করে একটি সংক্ষিপ্তসারসহ বেদান্তের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করতে হয়। তিনি প্রধান পাঁচটি উপনিষদও বাংলায় অনুবাদ করেন। এই প্রকার অভাবনীয় শ্রমসাধ্য শাস্ত্রচর্চা এবং ধর্ম ও শিক্ষাসংস্কার প্রভৃতি কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করেন।[৫০] কিন্তু সনাতনী হিন্দুগণ তাঁর এ কার্যক্রমের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন গড়ে তোলে। শঙ্করশাস্ত্রী, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার এবং সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর মতো গোড়া পন্ডিতদের সঙ্গে তাঁকে এক প্রবল বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে হয়। এ সময়ে তিনি একগুচ্ছ বিতর্কমূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এ প্রবন্ধগুলোয় রাজা রামমোহন রায় নিজের বক্তব্যকে অত্যন্ত চমৎকার ও জোরালোভাবে উপস্থাপন করেন। পুরোহিততন্ত্র, কুসংস্কারাচ্ছন্নতা ও মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে সমালোচনা মূখর রাজা রামমোহন রায়ের কর্মকান্ড ইউরোপের প্রোটেস্ট্যান্ট বিপ্লবের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

খ্রিস্টান সম্প্রদায় হিন্দুধর্মের বহুদেবতার পূজার জন্য নিন্দায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠে। কিন্তু রাজা রামমোহন রায়ের শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যায় তারা নিরস্ত্র হতে বাধ্য হয়। বস্তুতঃ রামমোহন খ্রিস্টানদের *ত্রিত্ববাদ* (Trinity) বা তিন সৃষ্টিকর্তার উপাসনার ঘোর সমালোচনা করেন। তাঁরা যে হিন্দু পৌত্তলিকতাবাদের নিন্দার অনধিকারী তা প্রমাণ করেন। একদিকে সনাতনী হিন্দুরা এবং অন্যদিকে খ্রিস্টান পাদ্রীরা তাঁর ওপর খড়্গহস্ত হলেও তিনি কিন্তু দমে যাননি। হিন্দুত্বের দৃঢ়ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে তিনি লড়ে যান।[৫১] ১৮২১-২৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত *ব্রহ্মনিক্যাল ম্যাগাজিনে* (Brahmanical magazine) তিনি ভারতবর্ষের সর্বোত্তম ঐতিহ্যগুলোর প্রতি তিনি তাঁর গভীর ভালবাসার কথা ব্যক্ত করেন। একই সাথে তিনি খ্রিস্টধর্ম প্রচারকদের বিরুদ্ধে ধর্মান্তরণের প্রতিবাদ জানান এবং হিন্দু একেশ্বরবাদের উন্নত চিন্তার পক্ষে দাঁড়িয়ে খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারকদের মতবাদের বিভ্রান্তিকর দিকগুলো অত্যন্ত চমৎকারভাবে উদঘাটন করতে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে রাজা রামমোহন রায় খ্রিস্টান ধর্মের প্রকৃত আদর্শের বিরোধী ছিলেন না। বাইবেলের সুসমাচারগুলোর বাংলা অনুবাদের কাজে শ্রীরামপুরের কয়েকজন মিশনারীকে তিনি সাহায্যও করেছিলেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়।

ডেভিড হেয়ারের (David Hare) চিন্তা ও রাজা রামমোহন রায়ের পরামর্শে দেওয়ান বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি *স্যার এডওয়ার্ড হাইড ইস্টের* (Sir Edward Hyde East) নিকট কলকাতায় ইংরেজি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রস্তাব করেন। বিচারপতি ইস্টের নেপথ্য ও কলকাতার হিন্দুদের অবিরাম প্রচেষ্টা ও অর্থ সাহায্যে ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দের ২০ জানুয়ারি ৩০৪ নং চিৎপুর রোডস্থ গোরাচাঁদ বসাকের বাসভবনে কলকাতা হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইংরেজি চর্চা আরম্ভ হয়।[৫২] তিনি সতীদাহের মত কুপ্রথার বিরুদ্ধেও জনমত গড়ে তুলতে সক্ষম হন। যার ফলে লর্ড বেন্টিঙ্ক ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে এক বিশেষ আইনের মাধমে এ প্রথা বন্ধের ব্যবস্থা করেন। তিনি প্রতিমা পূজাকেও দৃঢ়ভাবে বর্জন করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, হিন্দুধর্ম এক সার্বজনীন ঈশ্বরের পূজা করতে নির্দেশ দেয়। ১৮২৮ খ্রিস্টব্দে তিনি 'ব্রাহ্মসভা' (পরবর্তীতে ব্রাহ্মসমাজ) প্রতিষ্ঠা করেন।[৫৩] এটি হিন্দু ধর্মের একটি শাখা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। তাঁর ধর্মীয় চিন্তাধারা মৌলিক হলেও তা ইসলাম ও খ্রিস্টধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। সংস্কারমূলক ও উদারবাদী ধারণাসমূহ প্রচারের জন্য তিনি ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে 'সম্বাদ কৌমূদী' নামে একটি বাংলা সংবাদপত্র এবং ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে 'মিরাত-উল-আখবার' নামে একটি ফারসি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। উপমহাদেশে জাতীয় চিন্তা ও চেতনার উন্মেষেও তাঁর প্রভূত অবদান ছিল। তিনি ও তাঁর অনুসারীগণ ব্রিটিশরাজ এর অনুগত ও সমর্থক ছিলেন। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, কালক্রমে ব্রিটিশ জনগণ তাদের নিজের দেশে যে রাজনৈতিক সুযোগ সুবিধা ভোগ করে তা পরবর্তীতে ব্রিটিশ ভূখন্ডসমূহের জনগণের জন্যও প্রসারিত হবে। ভারতীয় জনগণের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের বিভিন্ন

বৈষম্যমূলক আচরণে তাঁরা ক্ষুব্ধ হন এবং এর প্রতিবাদও করেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে গভর্নর জেনারেল *জন অ্যাডাম* (Jhon Adam) (১৮২৩-২৩) যখন ভারতীয় প্রেসের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করেন, তখন তিনি ও তাঁর বন্ধুগণ 'প্রিভি কাউন্সিলে' স্মারকলিপি পেশ করে অত্যন্ত জোরালোভাবে এর প্রতিবাদ করেন।[৫৪] এ স্মারক লিপির মাধ্যমে অবাধে মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার স্বপক্ষে রাজা রামমোহন রায় তাঁর নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেন। এয়াড়াও রাজা রামমোহন রায় ও তাঁর বন্ধু দ্বারকানাথ ঠাকুর উদ্যোগ গ্রহণ করে ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দের ভারতীয় জুরি আইনের নির্দিষ্ট কিছুসংখ্যক বৈষম্যমূলক ধারার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে কলকাতার হিন্দু ও মুসলমান নাগরিকদের পক্ষে একটি স্বাক্ষরিত আবেদনপত্র ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পাঠান। বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার জমিদারদের স্বার্থ বিরোধী সরকারের রাজস্ব নীতির বিরুদ্ধেও তিনি ও তাঁর বন্ধুগণ গভর্নর জেনারেল *লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের* (William Henry Cavendish Bentinck) (১৮২৮-৩৫) নিকট ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে আরেকটি আবেদনপত্র পেশ করেন। ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সনদ সংশোধনের প্রাক্কালে যে আন্দোলন দেখা দিয়েছিল, তার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। কোম্পানির বাণিজ্যিক অধিকারের বিলুপ্তি এবং রপ্তানির ওপর বিপুল শুল্কের অবসান দাবি করেছিলেন তিনি। দিল্লীর মুঘল সম্রাটের সঙ্গে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিবাদ চলার সময় রাজা রামমোহন রায়কে ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট দ্বিতীয় আকবর (১৮০৬-১৮৩৭) রাজা উপাধিতে ভূষিত করেন; অতঃপর রাজা রামমোহন রায় সম্রাটের পক্ষে ব্রিটিশ রাজ ও পার্লামেন্টে ওকালতি করার জন্য ইংল্যান্ড গমন করেন। সেখানে ইংরেজদের জাতীয় বিশ্বাস ও ন্যায় বোধের কাছে আবেদন জানান।

সত্য ও সুন্দরের পক্ষে সমর্থন জানাতে রাজা রামমোহন রায় কখনোই কুণ্ঠিত হন নাই। *নারীদের প্রাচীন অধিকার* (Ancient Rights of the Females,1822) শীর্ষক এক প্রবন্ধে তিনি হিন্দু নারীদের জন্যও সম্পত্তির অধিকার দাবি করেন। পুরুষদের বহু বিবাহের বিরুদ্ধেও তিনি সোচ্ছার হন। ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে রাজস্ব ও বিচার ব্যবস্থা, রায়তদের অবস্থা এবং সামগ্রিকভাবে ভারতবর্ষের ঘটনাবলি সমন্ধে বিভিন্ন বিবৃতি তিনি ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টের কাছে পেশ করেন। কৃষকদের দূরাবস্থা এবং জমিদারি অপশাসনের বিরুদ্ধেও তাঁর কণ্ঠে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। তিনি দাবি করেন, খাজনার নির্দিষ্ট তালিকা প্রকাশ করতে হবে। কৃষকদের জন্য স্থায়ী কর নির্ধারণ করে দিতে হবে এবং গঠন করতে হবে একটি কৃষক বাহিনী। শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের জন্য তিনি যে কর্মসূচি পেশ করেন তা হলো-"সরকারি বিভাগের ভারতীয়করণ, বিচার বিভাগ থেকে শাসন বিভাগকে পৃথক করা এবং জুরিদের দ্বারা বিচারের ব্যবস্থা করা।"[৫৫] তাঁর এ দাবিগুলো পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের সংবিধানগত আন্দোলনের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করে।

বাংলা গদ্যের অন্যতম প্রবর্তক হিসেবেও রামমোহনের নাম উচ্চারিত হয়। ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান হিসেবে যোগদান করে বাংলা ভাষাকে একটি অনির্দিষ্ট প্রাকৃত ভাষার স্তর থেকে একটি নিয়মিত সুনির্দিষ্ট ভাষায় উন্নীত করার প্রচেষ্টা শুরু করেছিলেন। এ ক্ষেত্রেও রাজা রামমোহন রায়কেই পথিকৃতের ভূমিকায় দেখা যায়। ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে প্রকাশিত তাঁর বিভিন্ন অনুবাদ, ভূমিকা এবং গবেষণামূলক প্রবন্ধগুলো বাংলা গদ্যকে এক নতুন উৎকর্ষতা দান করে। তাঁর এসকল কর্মকান্ড এবং তৎপরতা প্রমাণ করেছিল যে, গুরুগম্ভীর বিষয়কে চমৎকারভাবে প্রকাশ করার মাধ্যম হিসেবে বাংলা ভাষাও অচল নয়। নিজের রচনাপত্রে পাশ্চাত্যের ধাঁচে তিনি যতিচিহ্ন ব্যবহার করতেন। রাজা রামমোহন রায়ের বাংলা ব্যাকরণ গ্রন্থটিও আধুনিক বিশেষজ্ঞদের প্রশংসা অর্জন করেছে।

প্রকৃতপক্ষে বাংলায় বৈপ্লবিক চিন্তা ও চেতনা এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রথম সূত্রপাত করেন রাজা রামমোহন রায়।[৫৬] এপথেই বাংলার নবজাগরণ এবং হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ সাধিত হয়। সকল সংকীর্ণতার উর্ধ্বে এবং যুক্তিবাদ ও উদারনৈতিক চিন্তাধারার বশবর্তী হয়ে রাজা রামমোহন রায় সমাজ ও ধর্মসংস্কার এবং শিক্ষা প্রসারে প্রচেষ্টা চালায়। কলকাতা হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ অবদানসহ পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতি তাঁর আগ্রহ এবং প্রগতিশীল চিন্তাধারা ভারতে একটি শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্তশ্রেণির বিকাশকে ত্বরান্বিত করে।[৫৭] প্রধানত রাজা রামমোহন রায়ের উদ্যোগেই বিদেশি সরকারের বিরুদ্ধে জনসাধারণের প্রতিবাদ সমূহের মধ্যেই জাতীয় চেতনাবোধের প্রাথমিক প্রকাশ পরিদৃষ্ট হয়। তাঁর সময়ে সংগঠিত ইংল্যান্ডের সংস্কার আন্দোলন এবং ইউরোপীয় উদারবাদী ও জাতীয়তাবাদী বিপ্লব সমূহের অগ্রগতি তিনি গভীর আগ্রহের সাথে পর্যবেক্ষণ করতেন। তিনি নিশ্চিত ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, স্বাধীনতার শত্রুরা ও স্বৈরতন্ত্রের বন্ধুরা কখনও সাফল্য মন্ডিত হয়নি এবং কখনও হবেও না।

হিন্দু সমাজ কাঠামোর ওপর মূর্তিপূজার অশুভ প্রভাব এবং জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে রামমোহন ঘোষণা করেন, "জাতিভেদ প্রথাই হচ্ছে আমাদের অনৈক্যের মূল কারণ।"[৫৮] এছাড়া ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে একটি চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেন, জাতিভেদ প্রথাই মানুষের দেশ প্রেমের চেতনায় উদ্দীপ্ত হতে বাধা দিয়েছে এবং মানুষের রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা ও সামাজিক স্বাচ্ছন্দের জন্য ধর্মীয় সংস্কার সাধন একান্তই জরুরি। কারণ হিন্দুধর্মের অনুশীলন মানুষের রাজনৈতিক স্বার্থরক্ষা করার পক্ষে খুব একটা মানানসই নয়। রাজা রামমোহন রায় অনুভব করেছিলেন, 'ইংরেজ শাসন ভারতবর্ষে এক মধ্যবিত্ত শ্রেণির জন্ম দিচ্ছে এবং এ শ্রেণির নেতৃত্বেই গড়ে উঠবে স্বাধীনতার সর্বাত্মক আন্দোলন।'[৫৯]

প্রকৃতপ্রস্তাবে ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটিয়ে জন্ম নিচ্ছে এক স্বাধীন ভারতবর্ষ–এদৃশ্য যেনো রাজা রামমোহন রায় চোখের সামনে দেখতে পেতেন।

চিরায়ত ভারতে ইংরেজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার কারণ ও ফলাফল সম্পর্কিত এক মন্তব্যে রাজা রামমোহন রায় বলেন, ধর্ম ও সংস্কৃতি ভিত্তি করেই চিরকাল ভারতবর্ষের এক অখন্ড ভাবমূর্তি ছিল। ইউরোপের সংস্পর্শে এসে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয়, ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনের স্থবিরতা হ্রাস পাবে এবং এখানে একটি গতিশীল শক্তির সৃষ্টি হবে। তাই এদেশের মঙ্গলের জন্য এদেশে ইংরেজ শাসন প্রয়োজন। তিনি সকল বিষয়ে উন্নতি করায় ইউরোপকে শ্রদ্ধা জানান। তিনি মনে করেন, রাজতন্ত্রে মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেনা। কাজেই নিয়মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাই শ্রেষ্ঠ। ভারতবর্ষের সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সমালোচনা করে তিনি বলেন, কর্নওয়ালিসের আমলেই ব্রিটিশ শাসন দৃঢ় হয়। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে শাসনতন্ত্রের প্রতিটি বিভাগে বিশেষত ভূমিরাজস্ব ও বিচার বিভাগে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে। এ পরিবর্তন সম্পর্কে রাজা রামমোহন রায় মন্তব্য করেনঃ These as changes approximating to the institutions existing in England,are calculated to operate beneficially,if regularly reduced to practices.[৬০] রাজা রামমোহন রায়ের মতে, দেশীয় নৃপতিবৃন্দের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহ ও কাপুরুষতা এবং অজ্ঞানতার কারণেই বিপর্যয় ঘটে। আধুনিক যুদ্ধপদ্ধতি, নৌবহর ও সামরিক শক্তির সাহায্যে ইংরেজরা সাফল্য অর্জন করে এবং এদেশে ইংরেজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

সরকারি ভাবে ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা ও জনশিক্ষা কমিটি গঠন করা হয়। কিন্তু রাজা রামমোহন রায় সংস্কৃত শিক্ষার বিরোধিতা করে তৎপরিবর্তে ইংরেজি শিক্ষার পক্ষে মত দেন। মুসলমান ও ইংরেজের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মেলামেশা করায় তাঁর মনমানস আবর্তিত ও পরিবর্তিত হয়। ইংরেজের আশ্রয়ে ও সাহচর্যে লাভবান অনেকের মতো তিনিও ভারতে ইংরেজ বিজয়কে বিধাতার আর্শীবাদ জ্ঞান করেছেন। তাঁর বিশ্বাস জন্মে যে, এদেশে ইংরেজ শাসন চিরকাল থাকবে; অতএব ইংরেজের ভাষা, শিক্ষা, সভ্যতার পূর্ণাঙ্গভাবে অনুশীলন ও অনুসরণেই এদেশবাসীর কল্যাণ নিহিত। এক আবেদনে তিনি বলেন,ইংরেজ এমন এক জাত যারা শুধুমাত্র নিজেরা নাগরিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা উপভোগ করেনা, যে দেশে তাদের প্রভাব বিস্তৃত হয় সেখানেও সামাজিক সুখ শান্তি, সাহিত্য ও ধর্ম বিষয়ে নিরপেক্ষ চর্চা ও অনুশীলন ইত্যাদির ব্যবস্থা করে। অত্যন্ত সচেতন ভাবেই ইংরেজ শাসনকে তিনি সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করেন। ইংরেজি শিক্ষার প্রবল প্রবক্তা হিসেবে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান প্রসারে স্কুল-কলেজ স্থাপনের দিকে তিনি বিশেষ জোর দেন।[৬১]

ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় রামমোহন বিশ্ববিধাতাকে ধন্যবাদ জানান। তবে তিনি ভারতের জন্য অব্যাহতভাবে ব্রিটিশ শাসন প্রয়োজন মনে করেননি। যিনি বিদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে উৎসাহ প্রকাশ করেন, দাস প্রথার অবসানে উল্লসিত হন, তাঁর পক্ষে চিরকাল ব্রিটিশ শাসন মেনে নেয়া সম্ভব ছিল না। তিনি আশা পোষণ করেন, ভারতবর্ষ ইউরোপের বিজ্ঞান ও মানববিদ্যার সাহচর্য পেলে এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ধারণা লাভ করলে অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ জানাবে। রাজা রামমোহন রায় মনে করেন, ভারতবাসীর মঙ্গলের জন্য চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসর এই দেশে ব্রিটিশ শাসন থাকা প্রয়োজন। অর্থাৎ ব্রিটিশ শাসনের মাধ্যমে ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও গণতন্ত্র ভারতবাসীর চিন্তায় আমূল পরিবর্তন আনলে আর বিদেশী শাসনের প্রয়োজন হবে না।[৬২]

কোম্পানির শাসনের চেয়ে পার্লামেন্টারি শাসনপদ্ধতিকে রাজা রামমোহন রায় ভালো এবং ব্রিটিশ গণতান্ত্রিক শাসনকেই আদর্শ মানেন। তাঁর মতে, ভারতবর্ষের সঙ্গে ইংল্যন্ডের সম্পর্ক তখনই স্থায়ী হতে পারে যদি ভারতবর্ষকে ইংল্যন্ডের পার্লামেন্টের তত্ত্বাবধানে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুযায়ী শাসন করা হয়। রিফর্ম বিলের সময় তিনি ইংল্যন্ডের পার্লামেন্টারি রাজনীতিতে নবপর্যায়ের সূচনা দেখে উল্লসিত হয়ে বিলটিকে ন্যায়ের সঙ্গে অন্যায়ের লড়াই মনে হয়। বিলের বিরোধিতাকারী ইংল্যান্ডের কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠী সম্পর্কেও তিনি সচেতন ছিলেন। তিনি লেখেন, যারা জনসাধারণকে নিঃশেষ করে দিয়ে নিজেদের সম্পদ বৃদ্ধি করছে সমগ্রজাতি তাদের শিকারে পরিণত হতে পারেনা। তাঁর আশঙ্কা হয় রিফর্ম বিলটি গৃহীত নাও হতে পারে। সেক্ষেত্রে তিনি ইংল্যন্ডের প্রতি শ্রদ্ধা হারাবেন এবং ইংল্যন্ডের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করবেন। বস্তুত এই রিফর্ম বিল সম্পর্কে রামমোহনের গভীর প্রত্যাশা জন্মে। কিন্তু ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডের পার্লামেন্ট তাঁকে হতাশ করে। একই সময়ে তিনি সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার সংস্পর্শে আসেন। কিন্তু ধর্মপরিত্যাগ করে সমাজতন্ত্রকে গ্রহণকরা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। উনিশ শতকের শুরু থেকে মৃত্যু অবধি ধর্মনির্ভর যুক্তিবাদই ছিল রাজা রামমোহন রায়ের চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। বস্তুত তাঁর মধ্যে আধ্যাতিকতা ও যুক্তিবাদের এক অপূর্ব সমন্বয় পরিলক্ষিত হয়।[৬৩]

স্বাধীনতার চিন্তা করলেও ইংরেজের আনুকূল্য ত্যাগের কথা চিন্তাও করতে পারেননি। এ বিষয়ে তাঁর মধ্যে এক ধরণের অন্তর্বিরোধ লক্ষ্য করা যায়। রাজা রামমোহন রায়ের কণ্ঠ থেকে বারংবার বিশ্ব জনগণের স্বাধীনতার নির্ঘোষ ধ্বনিত হয়েছিল, অথচ অত্যাচারী নীলকর সাহেবদের পক্ষাবলম্বন করে জনসভায় দেয় এক বক্তৃতায় তিনিই বলেন, নীলকর সাহেবরা কোথাও অল্পবিস্তর অন্যায় করে থাকতে পারে। কিন্তু সর্বাঙ্গীণভাবে অন্যান্য ইউরোপীয় অপেক্ষা তারাই এদেশীয় জনসাধারণের অধিকতর উপকার সাধন করেছে।[৬৪] এ সকল বক্তব্য এবং ভারতে ব্রিটিশ শাসন ও কলোনাইজেশন সমর্থন,

নীলকরদের এবং ভারতীয়দের সভ্য করার বিষয়ে ইংরেজ ভূমিকার প্রশংসাসহ জমিদারি প্রথা সমর্থন করায় রাজা রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধে দেশাত্মবোধহীনতার অভিযোগ ওঠে।

ভারতবর্ষে ইউরোপীয়দের বসবাস করার নীতি সম্পর্কে রামমোহন রচিত 'On Settlement in India by Europeans' পাঠে দেখতে পাওয়া যায় যে,এর সুবিধা ও অসুবিধা সম্পর্কে তিনি সম্যক অবহিত ছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, গণতান্ত্রিক আদর্শে আলোকপ্রাপ্ত এবং ব্যবসা, বাণিজ্য ও কৃষিতে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা যদি বসবাস শুরু করেন তাহলে সবদিক থেকেই ভারতবর্ষের জন্য মঙ্গলজনক হবে। তাঁর এ মন্তব্য বিতর্কের জন্ম দেয়।[৬৫] কিন্তু ভারতীয়দের মধ্যে রাজা রামমোহন রায় সর্বপ্রথম এ বিষয়ে সতর্ক হন। সমসাময়িক ইংরেজ লেখকদের রচনার মাধ্যমে তিনি *ড্রেন তত্ত্ব* (Drain theory) সম্পর্কে সচেতন ছিলেন তা তাঁর রচনা থেকে জানা যায়। প্রতিবৎসর দুই মিলিয়ন পাউন্ড দেশের বাইরে চলে যাওয়া সম্পর্কে তিনি বলেন, As a Some of money is now annually drawn from India by Europeans retiring from it with the fortunes realished there, a system whice would encourage Europeans of capital to become permanent settlers with their families,would necessarily greatly improve the resources of the country.[৬৬] এ বিষয়ে ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে রাজা রামমোহন রায় রচিত পুস্তিকায় অনেক তথ্য পাওয়া যায়। এছাড়া তিনি Irish Economic Drain সম্পর্কেও সচেতন ছিলেন। Mirat-ul-Akhbar নামক ফারসি সাপ্তাহিক কাগজে রাজা রামমোহন রায় তাঁর 'Ireland, the Causes of its Distress and Discontent' প্রবন্ধে এ বিষয়ে আলোচনা করেন। তাঁর মতে, absentee landlordism এর ফলে আইরিশ অর্থপাচার হয়। Irish Economic Drain এবং Indian Economic Drain নিয়ে তুলনামূলক আলোচনার প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যায়নি। অথচ পরবর্তীকালে দাদাভাই নওরোজীর মতো ব্যক্তিও আইরিশ ড্রেন সম্পর্কে রামমোহনের মতো সচেতন ছিলেন না মর্মে ইতিহাসবিদ অমলেন্দু দে উল্লেখ করেছেন।

অবাধ বাণিজ্য নীতির সঙ্গে একচেটিয়া বাণিজ্য নীতির দ্বন্দ্ব দেখা দিলে রামমোহন কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যের বিরোধিতা করেন। স্মরণযোগ্য যে, অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথের (১৭২৩-১৭৯০) Wealth of Nation প্রকাশিত হয় ১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দে। ম্যালথাসের (১৭৬৬-১৮৩৪) Essay on population প্রকাশিত হয় ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে রিকার্ডোর Principles of Political Economy and Taxation প্রকাশিত হয় ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে। মজুরি, খাজনা, অবাধ বাণিজ্যনীতি, জনসংখ্যা ইত্যাদি বিষয়ে রাজা রামমোহন রায় যেসব মতামত ব্যক্ত করেন তাতে এই তিনজনের মতামতের প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়। সাথে সাথে মন্টেস্কু, ব্লাকস্টোন ও বেন্থামের প্রভাবও অনস্বীকার্য।[৬৭] অর্থনীতির ক্ষেত্রে

প্রতিযোগিতার ফলে পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি পাবে, কৃষিশ্রমিক ভালো মুজুরি পাবে ও গরীব কৃষকদের উপর অত্যাচার কম হবে এই সব চিন্তাও রামমোহন করেন।

অবাধ বাণিজ্য নীতির ফলে মূলধনের মালিক এমন ইউরোপীয়রা এদেশে এলে ও পুঁজি বিনিয়োগ করলে দেশের মঙ্গল হবে। কৃষিপণ্যের উন্নতি ও জমিজমার মূল্যবৃদ্ধি পাবে। ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দ থেকেই কৃষিপণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। রামমোহন লক্ষ্য করেন,নীলচাষ প্রবর্তনে অনেকে নীলের কারখানায় কাজ পেয়ে যায়, নীলকুঠি সংলগ্ন এলাকার রাস্তাঘাটের উন্নয়ন হয়। আশেপাশের লোকের উন্নতি এবং জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায়। তিনি নীলকরদের অত্যাচার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকা সত্ত্বেও বেন্টিং ও দ্বারকানাথের মতো তাঁরও মনে হয়েছে নীলকরেরা যে উপকার করছে তার তুলনায় তাদের অত্যাচার ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। তাঁরা মনে করেন, নীলচাষহীন এলাকার চেয়ে নীলচাষকৃত এলাকার কৃষকদের অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নত। এর ফলে অনেক অনাবাদী জমি চাষের আওতায় আসে। ইংল্যান্ড এবং ভারতবর্ষ উভয়েই লাভবান হয়। কিন্তু নীলচাষ প্রথম থেকেই যে নিপীড়নমূলক পদ্ধতির মাধ্যমে গড়ে ওঠে তা রাজা রামমোহন রায় উপলব্ধি করতে পারেননি।[৬৮] একথা ঠিক যে, রাজা রামমোহন রায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অবসান দাবি করেননি। তবে তিনি চিরস্থায়ী ও রায়তওয়ারী উভয় ব্যবস্থায় কৃষকদের দূরাবস্থা বৃদ্ধির বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে জমির মূল্য দশগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে বিশ গুণও বৃদ্ধি পায়। সর্বত্র পতিত জমিতে চাষ শুরু হওয়ায় এবং কৃষকদের দেয় খাজনার পরিমান বৃদ্ধি পাওয়ায় জমির মূল্যবৃদ্ধি ঘটে। এ দুটো কারণই তিনি গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করেন। unearned increament of land value সম্পর্কে সচেতন থাকায় তিনি বলেন, যে সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে তাতে কতিপয় সুবিধাভোগীই লাভবান হচ্ছেন, দেশের সাধারণ মানুষ নয়। তিনি পরিস্কার করেই বলেন, জমির মূল্যবৃদ্ধি পাওয়ায় জমিদারেরাই লাভবান হয়েছে, রায়তেরা নয়। রায়তদের সাথেও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা উচিৎ মর্মে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।[৬৯] তিনি পরিস্কার করে বলেন, ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দ ও পরবর্তীকালের রেগুলেশন অনুযায়ী কতিপয় জমির মালিকেরাই লাভবান হয়েছে, অন্যদিকে লক্ষ লক্ষ কৃষকের দূরাবস্থা বৃদ্ধি পেয়েছে। এইসব আইনে সরকারের কোন সুবিধা হয়নি একথা তথ্যনির্ভর নয়। প্রকৃতপক্ষে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে সরকার ও জমিদারদেরই সুবিধা হয় বেশি। রাজা রামমোহন রায় বলেন, In my paper on the Revenue System I expressed an opinion that the permanent settlement has been beneficial to both the contracting parties'i.e. the government and the landholders.This position,which,as regards the former,was long much controverted, does not now rest upon theory; but can be proved by the results of about forty years'

practise.[৭০] তিনি আরও বলেন, জমিদারি ব্যবস্থায় বাংলাদেশে রাজস্ব মাদ্রাজের রায়তওয়ারি ব্যবস্থা থেকে অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। জমিদারি ব্যবস্থায় যে সমৃদ্ধি হয়েছে তা রাজস্বের অন্যান্য শাখাতেও ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু রায়তওয়ারি ব্যবস্থা রাজস্বের অন্যান্য উৎসগুলোকে চাঙ্গা করে তুলতে পারেনি। নিজস্ব তথ্য সংগ্রীহিত তথ্যের আলোকে তিনি বলেন, By a comperative view of the Revenues of Bengal,Bihar,and Orissa, From the period of the Perpetual Settlement,it appears that,in the thirty five years, from 1792-3 to 1827-28, there was a total increase on the whole amount of the Revenue of above 100 percent.(101.71), and that this increase has been steady and proggressive upto the present time...By comparative view of the Revenue of the old British territory in Madras,it appears that during the same period thirty five years (i.e.,1793 to 1828),there was an increase of only 40 percent,(40.15) on the total amount of the whole Revenue.[৭১] এসব তথ্য পর্যালোচনা করে বলা চলে জমিদার রাজা রামমোহন রায় গভীর দরদ দিয়েই কৃষকদের দূরাবস্থার কথা ভেবেছেন। আর নিজে জমিদার হয়েও জমিদারি ব্যবস্থার ত্রুটি উল্লেখ করতে সঙ্কোচবোধ করেননি। তাছাড়া রমেশ দত্তের মতামতের সাথে তুলনা করলে উনিশ শতকের শুরুতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলাফল সম্পর্কে রাজা রামোহন রায়ের চিন্তাধারা কতটা স্বচ্ছ ছিল ক্রমশ তা প্রতিভাত হবে।

কারিগর, শ্রমিকশ্রেণি ও সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই রাজা রামমোহন রায় এসব আলোচনা করেন। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর রচনা থেকে কলকাতায় একজন দক্ষ কারিগর প্রতিমাসে ১০ থেকে ১২ টাকা রোজগার করত। অদক্ষ কারিগর ৫ থেকে ৬ টাকা,রাজমিস্ত্রী ৫ থেকে ৭ টাকা, সাধারণ শ্রমিক ৩.৫০ থেকে ৪ টাকা। ছোট শহরে তাদের আয় আরো কম ছিল। এরা সাধারণত ভাত, কিছু শব্জি, লবণ ও মাছ এবং দরিদ্রশ্রেণির লোকেরা শুধু লবণ-ভাত খেত। এসব আলোচনার মাধ্যমে রামমোহন ভারতীয়দের ধর্মীয় কুসংস্কার পরিহার করে খাদ্যাভাসে পরিবর্তন এনে মাংস খাওয়ার পরামর্শ দেন।[৭২] অর্থাৎ তিনি যে ভারতবর্ষের কথা চিন্তা করেন, সেখানে শুধু উন্নত মনের অধিকারী হলেই চলবে না, উন্নত দেহেরও অধিকারী হতে হবে। ভারতবর্ষের শ্রমজীবী মানুষ সম্পর্কে তিনি যে গর্ব অনুভব করতেন, তা তাঁর রচনা থেকে জানা যায়। তিনি তাদের সম্পর্কে বলেন: They have the same capability of improvement as any other civilized people. তাছাড়া হিন্দু ও মুসলমান শ্রমজীবী মানুষ সম্পর্কেও রামমোহন বলেন: The Mohamadans are more active and capable of exertion than the Hindus,but the later are also generally patient of labour and diligent in their employments.and those of the upper Provinces are not inferior to the Mohamadans themselves in industry.[৭৩] রামমোহন রায় উত্তর প্রদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীরও

পশ্চাৎপদ অর্থনৈতিক অবস্থার কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বেশ কয়েকটি নিবর্তনমূলক আইনকে দায়ী করেন। এ ছাড়াও মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় আকবরের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ড গমন করেন। সেখানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থায় জমিদারেরা লাভবান কিন্তু কৃষকের দুর্দশা চরমে উঠেছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। সম্রাটের পক্ষ থেকে করভারে জর্জরিত কৃষকের খাজনার ভার লাঘবে জোর সুপারিশ করেন।

উপরোক্ত চিন্তাধারা থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারি, রাজা রামমোহন রায় ইংরেজের সহযোগিতায় বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক ভাবধারাকে বিকশিত করতে প্রয়াস পান। সে সময় উপনিবেশ বিরোধী আন্দোলন দানা বাঁধেনি। তখনও এ সত্য ধরা পড়েনি যে, উপনিবেশ সাম্রাজ্যবাদী শোষণেরই একটি কৌশল। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ভাবধারায় উজ্জীবিত রাজা রামমোহন রায়ের পক্ষে ঔপনিবেশিক অর্থনীতির তাৎপর্য বুঝে ওঠাও সম্ভব হয়নি। তবে ব্রিটিশ শাসনেই ভারতে রাষ্ট্রনৈতিক ঐক্য সম্পাদনের মধ্যে ঐক্যের বোধ জাগতে শুরু করে। টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা এ বোধকে শাণিত করে। নিজের স্বার্থেই ব্রিটিশ শাসকেরা মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে এবং সাময়িকপত্র প্রকাশের পথ সহজ করে দেয়। ফ্রি প্রেসকে ব্রিটিশ শাসনের এক অভিনব দান বলা যায়। ভারতবর্ষের জাতীয় চেতনা বিকাশে এর মূল্য অপরিসীম। ইউরোপে বাষ্পীয়যান আবিষ্কার এবং ধনতান্ত্রিক শোষণ ব্যবস্থার চাপে ভারতবাসীর জীবনী শক্তিহ্রাস পায়। ইউরোপের বাজারের সঙ্গে ভারতবর্ষের যোগাযোগ বৃদ্ধির ফলে পণ্য আসা-যাওয়া করতে থাকে এবং বৃহৎবিশ্বের জ্ঞান বিজ্ঞানের জগতও ভারতীয়দের নিকট উন্মুক্ত হয়। ভারতে রেলপথ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্রুত পরিবর্তন এবং আধুনিক শিল্পের উদ্ভব ঘটে। বর্ণপ্রথা ও জাতিভেদকে ভিত্তি করে প্রাচীনকাল থেকে যে শ্রমবিভাগ গড়ে উঠেছিল তার অপরিহার্যতা লোপ পায় এবং এক আমূল পরিবর্তন ঘটে। ভারতীয় সমাজের অগ্রগতি ব্যাহত হতে থাকা প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর হবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। এক সচ্ছল মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব হয়। এ শ্রেণি ব্রিটিশ শাসনের প্রতি যেমন অনুগত ছিল তেমনি নতুন চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়ে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান আহরণ করে। একদিকে যেমন প্রাচীন মূল্যবোধের সঙ্গে তাদের সঙ্গাত সৃষ্টি হয়, তেমনি অন্যদিকে আনুগত্যের মধ্যেও মাত্রাবেধে বিরোধের উপকরণ স্পষ্ট হয়। মোদ্দাকথা ব্রিটিশ শাসন এক গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করে। *কার্ল মার্কস* (Karl Marx) এ আলোক প্রত্যক্ষ করেই বলেন, Only Social Revolution ever heard of in Asia.[৭৪] রাজা রামমোহন রায়ের সমগ্র জীবন ও কর্মকান্ড বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে তিনিও এ *সামাজিক বিবর্তনকে* (Social Revolution) বড়ো করে দেখেন। ইংরেজের সহযোগিতায় এক নতুন ভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখেন।

প্রকৃতপক্ষে রাজা রামমোহন রায় ছিলেন সকল সংকীর্ণতার উর্ধ্বে এবং যুক্তিবাদ ও উদারনৈতিক চিন্তাধারার মানুষ। কলকাতা হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ অবদানসহ পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতি তাঁর আগ্রহ এবং প্রগতিশীল চিন্তাধারা ভারতে একটি শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্তশ্রেণির বিকাশকে ত্বরান্বিত করে। রাজা রামমোহন রায় নিজেকে সমাজ সংস্কারক, ধর্মসংস্কারক ও শিক্ষা প্রসারে আমৃত্যু প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। কলকাতা জীবনের শুরুতেই সুপরিকল্পিত ভাবে তিনি তাঁর চারপাশে ছোট কিন্তু প্রভাবশালী একটি বন্ধুমহল গড়ে তুলতে সমর্থ হন। বন্ধুদের মধ্যে ভারতীয় এবং ইউরোপীয় উভয়ই ছিলেন। তাঁর ঘনিষ্ঠ ভারতীয় বন্ধুদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪-১৮৪৬ খ্রি.) ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর (১৮০১-৮৬ খ্রি.)। তাঁরা দুজনেই ছিলেন নেতৃস্থানীয় ও সম্পদশালী জমিদার এবং ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের সাথে তাঁদের ঘণিষ্ঠ বাণিজ্যিক সমন্ধ ছিল। যদিও ধর্মীয় বিষয়ে রাজা রামমোহন রায়ের আমূল সংস্কারের সাথে তাঁরা একমত হননি, তবু সামাজিক সংস্কার সাধন ও পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের জন্য তাঁর সকল প্রচেষ্টাকে তাঁরা মনে প্রাণে সমর্থন করেছেন। ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর এ নব জাগরণের দায়িত্ব এসে পড়ে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন, প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের উপর।

ইয়ংবেঙ্গল আন্দোলন

বাংলার নবজাগরণের বা চিন্তা ও চেতনার শুরুতে *ইয়ংবেঙ্গল আন্দোলন* বা নব্য বঙ্গ আন্দোলন একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর অন্যতম সদস্য প্যারীচাদ মিত্র এ গোষ্ঠীকে *ইয়ং ক্যালকাটা* নামেও অভিহিত করেন। বিনয় ঘোষ তাদের পরিচয় সম্পর্কে বলেন, রাজা রামমোহন রায়ের যুগের উপান্তে উনিশ শতকের দ্বিতীয় পর্বে এ তরুণ দলের বিকাশ হয়। তাদের সবাই ছিলেন হিন্দু কলেজের ছাত্র। সেখানে ইংরেজি শিক্ষালাভ করে নবযুগের পাশ্চাত্য ভাবধারার সংস্পর্শে এসেছিলেন। শিক্ষকদের মধ্য থেকে যিনি ছাত্রদের এই নব যুগমন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছিলেন তিনি বাঙালি নন; একজন ইউরোপীয়, বয়সে প্রায় ছাত্রদের মতো তরুণ, নাম *হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও* (Henry Luies Vivian Derozio) (১৮০৯-৩১)। হিন্দু কলেজের তরুণ ছাত্রগোষ্ঠীর দীক্ষাগুরু ডিরোজিও ছিলেন বলে তাদের 'ডিরোজিয়ান' বলা হত। 'ইয়ংবেঙ্গল' নামে বাংলার যে তরুণদল ইতিহাসে সুপরিচিত তাঁরাই 'ডিরোজিয়ান'।[৭৫] রাজা রামমোহন রায়ের জীবদ্দশাতেই অতি চরমপন্থি এই গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটে এবং সমাজে আতঙ্কের সৃষ্টি করে। রাজা রামমোহন রায় কিন্তু এ নব্যগোষ্ঠীর কার্যক্রম সমর্থন করতে পারেননি। ফরাসি বিপ্লব এবং ইংরেজ চরমপন্থার ঐতিহ্যজাত এ আন্দোলনের মধ্যে অবাধ বা মুক্তচিন্তার বিশেষ ভূমিকা ছিল। মুক্তচিন্তার ব্যাপারটি আহত করেছিল রামমোহনের রুচিবোধ এবং ঈশ্বর বিশ্বাসী ভাববাদকে। ইয়ংবেঙ্গলের তরুণরাও রাজা রামমোহন রায় সমন্ধে খুব বেশি ইতিবাচক ধারণা পোষণ

করতো না। তাদের মুখপাত্র *এনকোয়্যারার* রামমোহন রায়ের আন্দোলনকে আধেক ধর্ম, আধেক রাজনীতি বলে অভিহিত করেছিল।[৭৬]

উনিশ শতকের বিশের দশক থেকে চল্লিশ দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত ইয়ংবেঙ্গল আন্দোলন চলে। এ আন্দোলনের প্রাণপুরুষ ইউরোশীয় পর্তুগীজ বংশীয় ডিরোজিও যুক্তিবাদী চিন্তা ও ইংরেজি সাহিত্যে দক্ষতার জন্য সুপরিচিত ছিলেন। ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি সাহিত্য ও ইতিহাসের শিক্ষক হিসেবে হিন্দু কলেজে যোগদান করেন।[৭৭] অতি অল্পদিনের মধ্যেই তিনি উচুশ্রেণির বেশ কিছু মেধাবী ছাত্রকে চুম্বকের মতো নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হন। ছাত্ররা তাঁকে ভক্তি শ্রদ্ধা করতে শুরু করে এবং আবিষ্ট হয় মুক্তচিন্তার নেশায়। অবাধে বিতর্ক করা এবং যে কোন কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলার জন্য ডিরোজিও এই ছাত্রদের উৎসাহিত করতেন। তাঁর বাড়িতে অবাধে প্রবেশের অধিকার ছিল সকল ছাত্রের। মুক্তির প্রতীক হিসেবে পরমউল্লাসে তারা *নিষিদ্ধ খাদ্য ও পানীয়* (Beef & Wine)[৭৮] গ্রহণ করতো। ডিরোজিও তাঁর ছাত্রদের স্বাধীন চিন্তা ও যুক্তিবাদ স্ফুরণের জন্য *অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন* নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। সংগঠনটির মাসিক মুখপাত্র ছিল *এথেনিয়াম*। এ পত্রিকায় তাঁর ছাত্র মাধব চন্দ্র ঘোষণা করেন যে, তিনি ও তার বন্ধুরা হিন্দু ধর্মকে অন্তর থেকে ঘৃণা করেন।[৭৯] নির্ধারিত পাঠ্যসূচির বাইরেও ডিরোজিও তাঁর ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য রাখতেন। সে সকল বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি তাঁর ছাত্রদের মধ্যে যুক্তিবাদ, ন্যায়বিচার বোধ ও সর্বোপরি স্বদেশ হিতৈষণার বীজ বপন করেন। তিনি ধর্মীয়, সামাজিক ও নৈতিক বিষয়ে ছাত্রদের স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশের সুযোগ দিতেন। তিনি নিজেও বিভিন্ন বিষয়ে যুক্তির আলোকে তার নিজস্ব মতামত প্রকাশ করতেন। হিন্দু কলেজের সেরা ছাত্ররা সমবেত হয়েছিল ডিরোজিওর চারপাশে। তাঁকে কেন্দ্র করেই ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। তাঁর প্রভাবেই তাঁর অনুগামী ছাত্ররা হিন্দু সমাজের কুসংস্কার ও ধর্মীয় অন্ধবিশ্বাসকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেন। ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের সভায় স্রষ্টার অস্তিত্ব, পৌত্তলিকতা, পুরোহিততন্ত্র ও সামাজিক কুসংস্কার সম্পর্কে স্বাধীন ও খোলামেলা আলোচনা ও বিতর্ক অনুষ্ঠিত হতো। এ গোষ্ঠী *ভলতেয়ার* (Voltaire), হিউম, লক, টমাস পেইনের রচনা থেকে উজ্জীবিত হয়ে হিন্দু সমাজের কুপ্রথার বিরুদ্ধে সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠে। তাঁরা তাঁদের ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত *পার্থেনন* পত্রিকায় সামাজিক কুসংস্কারের তীব্র সমালোচনা এবং স্ত্রী শিক্ষার দাবি উত্থাপন করে। ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে তারা ইংরেজিতে *এনকোয়্যারার* এবং বাংলায় *জ্ঞানান্বেষণ* নামে দুটি মুখপত্র প্রকাশ করতে শুরু করে। ইতোমধ্যে কয়েকজন ডিরোজিওপন্থির খ্রিস্টান ধর্মগ্রহণের সংবাদে কলকাতা শহর চমকে উঠে। তাঁদের মধ্যে মহেশচন্দ্র ঘোষ এবং কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যতম।

ডিরোজিও পন্থিদের প্রভাব ক্রমে অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছড়িয়ে পড়তে থাকলে কলকাতার রক্ষণশীল সমাজে দারুণ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। সংবাদ প্রভাকর ও সমাচার চন্দ্রিকার মত পত্রিকাগুলো ইয়ংবেঙ্গলের কর্মকান্ডের প্রতিবাদ জানায়। সবকিছুর জন্য ডিরোজিওকে দায়ি করা হয় এবং ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দের ২৫ এপ্রিল হিন্দু কলেজ থেকে তাঁকে পদত্যাগে বাধ্য করা হয়। এ বছরই কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়ে ডিরোজিও মৃত্যুবরণ করেন। তবে তিনি তাঁর ছাত্রদের মধ্যে যে স্বাধীন চিন্তা ও চেতনার বীজ বপন করেছিলেন তা নষ্ট হয় নি।[৮০] ডেভিড কফের মতে, তিনি ছিলেন ভারতের সক্রেটিস।[৮১] প্রাথমিক উগ্রতা ত্যাগ করে পরবর্তী সময়ে এই গোষ্ঠী বাংলার নবজাগরণে গঠনমূলক অবদান রাখার চেষ্টা করে। এ সময় ব্রিটিশ শাসনের কুফল ও অত্যাচার মূলক দিক সম্পর্কে অনেক বক্তৃতা ও প্রবন্ধ রচিত হয়।

ডিরোজিওপন্থিদের ক্রিয়াকলাপ

১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দের দিকে নতুন চার্টার অ্যাক্টে ভারতীয়দের জন্য সরকারি চাকরি গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হলে ডিরোজিওপন্থিদের বেশ কয়েকজন সরকারি চাকরিতে যোগদান করেন। ১৮৩৪-৩৫ খ্রিস্টাব্দে ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর রসিককৃষ্ণ মল্লিক কোম্পানির সনদপত্র সংশোধন এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সম্পর্কে বিভিন্ন জনসভায় চমৎকার বক্তৃতা দেন। ডিরোজিও'র অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনকেও তাঁরা ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চালু রেখেছিলেন। একই সাথে নিজেদের মধ্যে মতামত বিনিময়ের জন্য তাঁরা ইপিসটোলারি অ্যাসোসিয়েশন (লিপি-লিখনসভা) গড়ে তুলেছিলেন। এছাড়া মনে করা হয় যে, ইংল্যান্ডের চরমপন্থি কার্যকলাপের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তারা *সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা* (Society for the Acquisition of General Knowledge) এবং *বলবিদ্যা বিষয়ক প্রতিষ্ঠান* (Mechanics Institution) প্রতিষ্ঠা করেন। হিন্দু কলেজে অধ্যয়নকালে প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর যে ঘৃণার সৃষ্টি হয়েছিল; তাঁদের উত্তরসূরিদের মধ্যেও প্রবাহিত হয়। এই সুযোগে খ্রিস্টান ধর্মের প্রসার বৃদ্ধি পায়। হিন্দু কলেজের উজ্জ্বল নক্ষত্র মধুসূদন দত্ত এবং জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের খ্রিস্টান ধর্মগ্রহণ; ডিরোজিওপন্থি মুক্তচিন্তাদর্শ বহির্ভূতদের মদ্যপান বৃদ্ধির বিষয়টিও দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। এসব কিছু ছাপিয়ে সুদূর মরিসাসে ভারতীয় শ্রমিকদের দুরবস্থা, জুরিদের দ্বারা বিচার অনুষ্ঠিত করার অধিকারের সম্প্রসারণ, ইংরেজিকে আদালতের ভাষা হিসেবে চালু করা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সরকারের বিভিন্ন বিভাগ কর্তৃক কুলিদের জোর করে খাটানো প্রমূখ বিষয়াদি ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর সদস্যদের চেতনায় প্রকৃত আলোড়ন সৃষ্টি করে। ফলশ্রুতিতে ডিরোজিওপন্থিরা আরও সক্রিয় রাজনীতির দিকে আকৃষ্ট হতে শুরু করেন।

ডিরোজিওপন্থিরা ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে বেঙ্গলি স্পেক্টেটর নামে একটি নতুন মুখপত্র প্রকাশ করতে শুরু করে। পত্রিকাটিতে অন্যান্য বিষয়াদি থেকে অর্থনীতি ও রাজনৈতিক ভাষ্য প্রাধান্য পায়। এ সময় সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনার মঞ্চে পরিণত হয়। এককালে রামমোহনের সহযোগী কিন্তু পরবর্তীকালে ডিরোজিওপন্থিদের নেতা ও কুইল পত্রিকার সম্পাদক তারাচাঁদ চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে হিন্দু কলেজ ক্যাম্পাসে সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকার সভা চলছিল। সভায় এক বক্তার বক্তব্যকে উষ্কানিমূলক মন্তব্য করে প্রতিবাদ জানান অধ্যক্ষ ভি.এল.রিচার্ডসন। কিন্তু সভার চেয়ারম্যান তারাচাঁদ চক্রবর্তী অধ্যক্ষ রিচার্ডসনের সে বক্তব্যকে নাকচ করে দেন। তখন থেকে ডিরোজিওপন্থিদের চক্রবর্তীগোষ্ঠী নামে অভিহিত করা হত।

দাসপ্রথা বিরোধী বিখ্যাত বক্তা জর্জ টমসনের অনুপ্রেরণায় এবং ইয়ংবেঙ্গলগোষ্ঠীর পরিচালনায় ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দের ২৩ এপ্রিল গড়ে ওঠে রাজনৈতিক সংস্থা: *বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি* (Bengal British India Society)। এ সংগঠনে যে কেউই যোগ দিতে পারতো। উদ্দেশ্য ছিল নাগরিকদের বৈধ অধিকারগুলো রক্ষার জন্য সুচিন্তিত প্রচেষ্টা চালানো। *বেঙ্গল স্পেক্টেটর* অথবা *বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি* কোনটাই বেশি দিন টিকে থাকতে পারেনি। যদিও অল্পদিনের মধ্যেই তারা রাজনীতি মনস্কতা সৃষ্টি করতে পেরেছিল। ইতোমধ্যে সুবক্তা হিসেবে খ্যাতিমান ডিরোজিওপন্থি যিনি ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে পত্রপত্রিকা কর্তৃক *ভারতের ডিমস্থিনিস* (Demosthenes) হিসেবে চিহ্নিত সেই রামগোপাল ঘোষ ১৯৪৯-৫০ খ্রিস্টাব্দে কথিত *কালা বিলের* (Black Bill) সমর্থনে *রিমার্কস অন দ্যা ব্লাক অ্যাক্ট'স* (Remarks on the Black Acts) শীর্ষক প্রবন্ধ লিখে আরও বিখ্যাত হয়ে উঠেন। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে অন্যান্য গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ডিরোজিওপন্থিরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে *ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন* (British Indian Assciation) গড়ে তোলেন।[৮২] রাজনৈতিক উম্মাদনার এ বছরগুলোতেও কিন্তু ইয়ংবেঙ্গলের সাংস্কৃতিক কার্যক্রম অব্যাহত থাকে। ইয়ংবেঙ্গলের প্যারীচাদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার তখনকার সংস্কৃত-ঘেঁষা মার্জিত বাংলা লিখন-শৈলীর প্রতিবাদস্বরূপ '*মাসিক পত্রিকা*' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেন। এ পত্রিকা সহজ সরল ভাষা চালুর উদ্যোগ নেয়।

বাংলার বুকে ডিরোজিওপন্থিরা জীবন ও জিজ্ঞাসার স্পন্দন সৃষ্টি করলেও ডিরোজিওভক্ত গোষ্ঠীর বাইরে কোন আন্দোলন তারা গড়ে তুলতে পারেননি। তাদের নিজস্ব গোষ্ঠিটাও কোন তাৎপর্যপূর্ণ আদল নিয়েও টিকে থাকেনি। স্মরণযোগ্য যে, ইয়ংবেঙ্গলের অধিকাংশ সদস্যই এসেছিলেন মধ্যবিত্ত শ্রেণিভুক্ত পরিবার থেকে। স্বাভাবিকভাবেই জীবিকা অর্জনের একটি দায় তাদের ছিল। তাছাড়া তৎকালীন সময়ে পাশ্চাত্য

ধাঁচের র‍্যাডিক্যাল রাজনীতির অভ্যুদয় ঘটানো প্রায় অসম্ভব ছিল। সেজন্য পরিস্থিতির কারণেই ডিরোজিওপন্থিদের মধ্যকার উজ্জ্বল সম্ভাবনাটি কখনোই কোন সুদৃঢ় ভিত খুঁজে পায়নি।

এদিকে রাজা রামমোহনের ঐতিহ্যটা তাঁর সহযোগীরা কিছুটা দূর্বলধারায় বজায় রাখতে সক্ষম হন। তাদের মধ্যে বিশিষ্টতম ছিলেন ঠাকুর পরিবারের প্রধান দ্বারকানাথ ঠাকুর। এঠাকুর বংশের প্রসন্নকুমার ঠাকুর রির্ফমার পত্রিকাটি চালাতেন। এরির্ফমার ছিল ত্রিশের দশকের প্রথম দিকে র‍্যাডিক্যাল মতাদর্শবাহী এনকোয়্যারার পত্রিকার নরমপন্থি প্রতিরূপ। একপর্যায়ে সমকালীন র‍্যাডিক্যালদের মতো নরমপন্থিরাও বিভিন্ন সংগঠন গড়ে তোলার টেষ্টা করেন। ১৮৩৭-৩৮ খ্রিস্টাব্দে তারা *ভূম্যধিকারী সভা* (Land holders Assciation) গড়ে তোলেন। এ সংস্থাটি পুরুষানুক্রমে নিষ্কর জমির ওপর খাজনা বসানোর বিরুদ্ধে পুরনো আন্দোলন শুরু করে। যে কোন ধরনের ভূমির মালিকগণ এ সংগঠনের সদস্য হতে পারতো।[৮৩] এই ভূমি মালিকদের সভায় দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং প্রসন্নকুমার ঠাকুরের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন রাধাকান্ত দেব ও রামকমল সেন।

রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর ব্রাহ্মসভা (পরবর্তীকালের কলকাতা ব্রাহ্মসমাজ) ম্রিয়ম্রাণ হয়ে পড়ে। দ্বারকানাথ ঠাকুরের অর্থের যোগান ও পন্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ উপাসনার কাজ চালিয়ে কোন প্রকারে এ সমাজকে টিকিয়ে রাখেন। পরবর্তীতে দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুত্র ও রবীন্দ্রনাথের পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫ খ্রি.) ব্রাহ্মসমাজের কার্যক্রম বেগবান করতে প্রয়াস পান। রাজা রামমোহন রায় তাঁর ধর্মমতকে কোন বিশেষ সম্প্রদায়রূপে গঠন করতে চাননি। তিনি সকল ধর্মের লোকদের একেশ্বরবাদ অবলম্বন করে সমাজে মিলিত করতে সংকল্প করেন। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্ম আন্দোলনকে একটি ধর্মমত এবং ব্রাহ্মসমাজকে একটি বিশেষ সম্প্রদায় হিসেবে রূপ দেন। তিনি হিন্দু কলেজে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন এবং রাজা রামমোহন রায়ের ভাবধারায় অণুপ্রাণিত হয়ে ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে তত্ত্ববোধিনী সভা এবং এই 'সভার মুখপাত্র স্বরূপ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশ করেন।[৮৪] এছাড়া তিনি রাজনারায়ণ বসু, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রমূখ জ্ঞানী ও গুণীদের এই তত্ত্ববোধিনী সভায় যোগদানে উদ্বুদ্ধ করেন।[৮৫] দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবিতকালেই দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এ সকল কর্মকান্ডে ব্যাপৃত হন। তত্ত্ববোধিনী সভা এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বাঙালিদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করণে উদ্যোগ নেয়। বেদান্তের ওপর ভিত্তি করে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজ পুনর্গঠন কাজে হাত দেয়। সংস্কার প্রিয় শিক্ষিত দলের ভিতরও ধীরে ধীরে স্বজাতিপ্রীতি ও স্বধর্মপ্রীতি জাগতে থাকে। এসময় ইংরেজ সরকারে সহনুভূতিশীল ধর্মীয় নীতির কারণে মাইকেল মধুসূদন দত্ত সহ অনেক বঙ্গসন্তান খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে। এতে হিন্দুসমাজ খুবই বিচলিতবোধ করে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় ব্রাহ্মসমাজ নেতা নবীনপন্থি

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের মুখপাত্র রাধাকান্তদেবের সাথে তৎপর হন।[৮৬] এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মাধ্যমে তিনি খ্রিস্টানদের প্রভাব প্রতিরোধে অগ্রণী পদক্ষেপ নেন। এসময় অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁকে সহায়তা করেন বলে জানা যায়।

রাজা রামমোহন রায়ের পর বঙ্গীয় রেনেসাঁসের অন্যতম প্রবক্তা হিসেবে অত্যন্ত সুপরিচিত হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)। একাধারে তিনি একজন সংস্কৃত পন্ডিত, শিক্ষাবিদ, লেখক, সমাজ সংস্কারক ও জনহিতৈষী হিসেবে বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে তাঁর জন্ম। বাল্যকাল হতেই তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রতিভাধর শিক্ষার্থী; যে কারণে ছাত্রাবস্থায়ই তিনি স্বীকৃতিস্বরূপ বিদ্যাসাগর উপাধি লাভ করেন। কর্মজীবনের শুরুতে তিনি কলকাতা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা ভাষার প্রধান পন্ডিতের পদ লাভ করেন। ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তিনি সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক পদ লাভ করেন। এবং পরবর্তী মাসেই তিনি ঐ কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। অধ্যক্ষ হিসেবে তিনি সংস্কৃত কলেজের অনেক সংস্কার সাধন করেন। ইতোপূর্বে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ এবং বৈদ্য শিক্ষার্থীদের এ কলেজে প্রবেশাধিকার ছিল। কিন্তু তিনি সকল শ্রেণির হিন্দু শিক্ষার্থীর জন্য এ কলেজের দ্বার উম্মুক্ত করেন। এছাড়াও তিনি কলেজে অধ্যয়নের জন্যে ছাত্রদের নামেমাত্র বেতন প্রদানের ব্যবস্থা করেন। প্রতিপদ এবং অষ্টমীর পরিবর্তে রবিবার সাপ্তাহিক ছুটি চালু করেন। কলেজের ডিগ্রি লাভের পর ছাত্ররা যেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে চাকরি লাভ করতে পারে, সরকারের সাথে আলোচনা করে তিনি সে প্রতিশ্রুতি আদায় করেন। কলেজের পাঠ্যক্রমেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার সাধন করেন। পূর্বে ব্যাকরণ, বীজগণিত ও গণিত শেখানো হতো সংস্কৃত ভাষায়। কিন্তু তিনি সংস্কৃতের পরিবর্তে ব্যাকরণ বাংলার মাধ্যমে এবং গণিত ইংরেজির মাধ্যমে পড়ানোর নিয়ম চালু করেন। ইংরেজি ভাষা শেখাকে তিনি বাধ্যতামূলক করেন। বাংলা শিক্ষার ওপরও তিনি জোর দেন। তবে সব থেকে ব্যাপক পরির্তন করেন দর্শন পাঠ্যক্রমে। তিনি সাংখ্য এবং বেদান্ত দর্শনকে ভ্রান্ত এবং প্রাচীনপন্থি বলে বিবেচনা করতেন। সে জন্যে তিনি *বার্কলের* (George Berkeley) দর্শন এবং অনুরূপ পাশ্চাত্য দর্শন শিক্ষাদানের বিরোধিতা করেন এবং তৎপরিবর্তে তিনি *বেকনের* (Francis Bacon) দর্শন এবং *মিলের* (John Stuart Mill) তর্কশাস্ত্র পড়ানোর সুপারিশ করেন।

১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে *চালর্স উডের* (Sir Cherles Wood) শিক্ষাসনদ গ্রহীত হওয়ার পর সরকার গ্রামীণ এলাকায় শিক্ষা সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত নেয়। এ উদ্দেশে ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে বিদ্যাসাগরকে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদের অতিরিক্ত সহকারি স্কুল পরিদর্শকের দায়িত্ব দেয়া হয়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিভিন্ন জেলায় স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। দু'বছরের মধ্যে তিনি ২০-টি আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপন

করেন। এসকল স্কুলের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্যও তিনি একটি স্কুল স্থাপন করেন। তিনি নিজ গ্রামে নিজ খরচে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এসব বাংলা মডেল স্কুল ছাড়াও সরকার বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনেরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অবশ্য রক্ষণশীল সমাজের তীব্র বিরোধিতার মুখে এ ধরণের স্কুল প্রতিষ্ঠা করা কঠিন ছিল। ফলে স্ত্রী শিক্ষার বিশেষ সমর্থক বিদ্যাসাগরকেই সরকার এ কাজের দায়িত্ব প্রদান করে। তিনি নিজ উদ্যোগে মেদিনীপুর, হুগলী, বর্ধমান ও নদীয়ায় স্ত্রী শিক্ষার জন্য স্কুল স্থাপন করেন।[৮৭] পরবর্তীতে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর থেকে ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের মে মাসের মধ্যে এধরণের আরও ৩৫-টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করতে সমর্থ হন। বাঙালিদের মধ্যে সম্ভবত তিনিই এরকম উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পরে শিক্ষা সম্পসারণের কাজে,বিশেষ করে মেয়েদের শিক্ষা দেয়ার কাজে সরকারের সঙ্গে সহযোগীতা করেন। যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি আজ তাঁর নামে চিহ্নিত, সে প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে একেবারে শুরু থেকেই তিনি জড়িত ছিলেন। তাঁর অবিরাম প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠানটি পুরোপুরি ভারতীয় শিক্ষকদের নিয়ে গড়ে ওঠা উচ্চ শিক্ষার একটি বেসরকারি, ধর্মনিরপেক্ষ ও জনপ্রিয় বিদ্যানিকেতনে পরিণত হয়। মেয়েদের উচ্চশিক্ষার ব্যাপারেও সমান আগ্রহী ছিলেন বিদ্যাসাগর। এসময় কিছুদিন তিনি বেথুন স্কুলের সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করেন।

শিক্ষাক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান হলো পাঠ্যপুস্তক রচনা ও প্রকাশ করা। ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে তাঁর রচিত বর্ণ পরিচয় প্রকাশের পূর্বপর্যন্ত শিক্ষার্থীদের হাতে খড়ির জন্য এরকম কোন আদর্শ পাঠ্যপুস্তক ছিল না। বর্ণ পরিচয়ের মতোই সাফল্য লাভ করেছিল বোধোদয়, কথামালা, চরিতাবলি এবং জীবন চরিত। সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা ও বর্ণপরিচয়ের মত অভিনব কোন সংস্কৃত ব্যাকরণ ইতোপূর্বে বাংলা ভাষায় ছিল না। এছাড়াও চার খন্ডে লেখা ব্যাকরণ কৌমুদীও তাঁর ঐতিহাসিক অবদানের স্বাক্ষর বহন করছে। তাঁর পাঠ্যপুস্তক গুলো বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, তিনি কেবলমাত্র লেখাপড়া শেখানোর কৌশল হিসেবে এগুলো লেখেননি। ছাত্রদের নীতিবোধ উন্নত করা এবং আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদানও তাঁর লক্ষ্য ছিল। যেমন চরিতমালায় প্রাচীন ভারতের মুনি-ঋষিদের জীবনী না লিখে তিনি ইউরোপের ষোলজন বিখ্যাত ব্যক্তির পরিচয় দিয়েছেন।

তেমনি জীবনচরিতে তিনি কোপারনিকাস, গ্যালিলিও, নিউটন এবং হার্শেলের মত বিজ্ঞানীদের এবং উইলিয়াম জোনসের মতো পন্ডিত ব্যক্তিদের সংক্ষিপ্ত জীবন পরিচিতি লিখেছেন। নীতিবোধেও একই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় মেলে। এতে তিনি আনুষ্ঠানিক ধর্ম এবং আচার অনুষ্ঠানের কোন উল্লেখ করেননি। বরং যেসব নীতিবোধ সকল মানুষের থাকা উচিৎ, সেগুলোই লিখেছেন। কথামালায় তিনি নীতিমূলক গল্পসংগ্রহ করেছেন। আবার তিন খন্ডের আখ্যান মঞ্জুরিতে আরব, পারস্যের পাশাপাশি ইউরোপ এবং

আমেরিকার সত্যিকার এবং জনপ্রিয় গল্প সন্নিবেশিত করেছেন। এসব গল্পের শিরোনাম মাতৃভক্তি, পিতৃভক্তি, ভ্রাতৃস্নেহ, গুরুভক্তি, আতিথেয়তা, পরোপকার এবং সাধুতার পুরস্কার থেকেই বোঝা যায় যে, তিনি কেবলমাত্র শিক্ষার্থীদের নীতিবোধ উন্নত করতে চাননি, সেই সঙ্গে চেয়েছিলেন তাদের দৃষ্টিকে প্রসারিত করতে। তাঁর পাঠ্যপুস্তক গুলো দীর্ঘদিন বঙ্গদেশের সর্বত্র পাঠ্য ছিল। এগুলোর মাধ্যমে তিনি একই সঙ্গে প্রামাণ্য ভাষা ও বানান যেমন শিক্ষা দিতে পেরেছিলেন, তেমনি পেরেছিলেন নীতিবোধ উন্নত করতে। তিনি কেবল পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে নয়, বরং তাঁর অন্যান্য রচনা দিয়েও বাংলা গদ্যের সংস্কার এবং তার মান উন্নত করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

রাজা রামমোহনের মৃত্যুর পর থেকে সমাজ সংস্কারের চমৎকার ঐতিহ্যের ধারাটি ক্রমশই ভোঁতা হয়ে পড়ছিল। সেটিকে আবার নতুন করে জাগিয়ে তোলেন বিদ্যাসাগর এবং গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যা গুলোকে মানুষের সামনে তুলে ধরেন। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ না করলেও তত্ত্ববোধিনী গোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট অন্তরঙ্গতা ছিল। ব্যক্তিগত জীবনে একান্ত গোঁড়া আবার ইয়ংবেঙ্গলের থেকেও কট্টর ও সুপন্ডিত এ মানুষটিই ছিলেন নির্যাতিতদের প্রতি রাজা রামমোহন রায়ের সামাজিক জেহাদের শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যগুলোর প্রকৃত উত্তরসূরি।

আধুনিক মনোভাবাপন্ন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর উপলব্ধি করেছেন, পুরনো মূল্যবোধ এবং পরিবারের ভেতর থেকে পরিবর্তন আনতে না পারলে সমাজ এবং দেশের কখনো প্রকৃত উন্নতি হবে না। এ জন্যে তিনি বিধবা বিবাহ প্রচলন, বহুবিবাহ ও বাল্য বিবাহ নিষিদ্ধ করা এবং স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের জন্য আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন। ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দেই তিনি মুখর হয়ে উঠেছিলেন বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে। ১৮৭১-৭৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে পুরুষদের বহুবিবাহের বিরুদ্ধে প্রচার চালিয়েছিলেন। তবে ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সামাজিক কুসংস্কারের চরম বিরোধিতা সত্ত্বেও মুক্তকণ্ঠে বিধবা বিবাহের স্বপক্ষে প্রচার চালিয়ে এক তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। সমালোচকদের মুখ বন্ধ করার জন্য রাজা রামমোহন রায়ের মতো তিনিও হিন্দুধর্মগ্রন্থ থেকে নিজের মতের সমর্থনে প্রচুর উদ্ধৃতি দেন। রাজা রামমোহন রায়ের ন্যায় তাঁর ক্ষেত্রেও প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল হতভাগ্য ও নির্যাতিতদের প্রতি গভীর মমত্ববোধ এবং মানবতার প্রতি তার শ্রদ্ধা। ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে ইয়ংবেঙ্গলের মুখপত্র *বেঙ্গল স্পেক্টেটর*' এ বিধবা বিবাহের পক্ষে কিছু বক্তব্য উত্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রচারের ফলেই বিষয়টি আলোচনার কেন্দ্র বিন্দু হয়ে ওঠে।[৮৮] তিনি বিধবাদের পুনর্বিবাহের পক্ষে আইন প্রণয়নের জন্য ৯৮৭ জনের স্বাক্ষরসহ সরকারের নিকট দাবি জানান। রক্ষণশীল সমাজও এরূপ আইনের বিরোধিতা করে ৩৬,৭৬৩ জনের স্বাক্ষরসহ সরকারের

নিকট আবেদন পাঠায়। তাঁদের যুক্তি ছিল এরকম আইন পাস করে দেশবাসীর ধর্মে হস্তক্ষেপ করা সরকারের পক্ষে উচিৎ হবে না। কিন্তু বিরোধীদের পক্ষে পাল্লা ভারী থাকলেও ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জুলাই বিধবা পুনর্বিবাহ আইন প্রণীত হয়।[৮৯] রক্ষণশীল সমাজের বিক্ষোভ ও বাধার মুখে মুখে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও তাঁর বন্ধুরা মিলে ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে এক বিধবার বিবাহ সম্পাদন করে আইনের বাস্তব প্রয়োগ করেন। নিজের একমাত্র পুত্রের সঙ্গেও বিধবার বিবাহ দিতেও তিনি কুণ্ঠিত হননি।

সর্বোপরি মাতৃভাষায় শিক্ষা, গণশিক্ষা, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, শিক্ষার প্রসার ও মাধ্যম, নারী শিক্ষা, বিবাহ সমস্যা, ইত্যাদি মৌলিক সামাজিক বিষয়ে বিদ্যাসাগরের কীর্তি আজ সমগ্র বাঙালি জীবনের অঙ্গ, সুদৃঢ় বুনিয়াদ ও অক্ষয় গৌরব। ধর্ম আন্দোলনের পথে পা বাড়াননি অথচ রাশি রাশি শাস্ত্রীয় বচন দিয়ে শাস্ত্রীয় মশায়দের ঘায়েল করতে কখনো তিনি দ্বিধা করেন নি। তাছাড়া নিজের চারিত্রিক শক্তি ও উচ্চ নৈতিক গুণাবলীর সাহায্যে মানুষের মনে এক চিরস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাছাড়া স্বাধীনচেতা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সরকারের অনধিকার হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে পদত্যাগ করে প্রতিবাদের যে নজীর স্থাপন করে গেছেন তা আজও অনুসরণযোগ্য।

ইতোপূর্বে কালা আইন বিতর্কের চরম উত্তেজনার মন্থনে চরমপন্থি ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি ও নরমপন্থি ভুমধ্যধিকারী সভার বিলোপ ঘটিয়ে ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে *ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন* (British Indian Assciation) প্রতিষ্ঠিত হলে চরমপন্থি, নরমপন্থি এমনকি রক্ষণশীল সমস্ত গোষ্ঠীই এই সংগঠনে সমবেত হয়। বিলোপকৃত উক্ত সংগঠনদ্বয়ে যে কেউ সদস্য হতে পারত। কিন্তু নবগঠিত ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন'র সদস্য হতে পারত কেবলমাত্র ভারতীয়রাই। নতুন এই সংগঠনটির সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতবর্ষের স্বার্থ ও ভারতীয়দের অধিকার রক্ষা এবং সুসংহত ঐক্য গড়ে তোলার প্রয়াস পান। তিনি এক বিজ্ঞপ্তিতে ভারতবর্ষের অন্যান্য মহানগরীগুলোতেও সংগঠিত প্রচার আন্দোলন শুরু করার আহ্বান জানান।[৯০] ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সনদপত্র সংশোধন আসন্ন হয়ে উঠলে এই সংগঠনটি ভারতীয়দের দাবি-দাওয়া সম্বলিত একটি স্বারকলিপি পেশ করার সিদ্ধান্ত নেয়। স্বারকলিপির এ খসড়াটি ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দেই রচনা করেছিলেন প্রতিভা সম্পন্ন তরুণ সাংবাদিক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। এ স্মারকলিপিতে ভারতীয়দের অভাব-অভিযোগগুলো অতি সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়। স্মারকলিপির উল্লেখযোগ্য দাবিগুলোর মধ্যে ছিল ছিল-(ক) নীল চাষ ও লবণ উৎপাদনের ব্যাপারে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া অধিকারের অবসান ঘটানো; (খ) ভারতীয় শিল্পকারখানার জন্য রাষ্ট্রীয় সাহায্য মঞ্জুর করা; (গ) বিভিন্ন উচ্চ পদে ভারতীয়দের নিয়োগ করা;

(ঘ) ভারতীয় সংখ্যাধিক্য বিশিষ্ট একটি ভারতীয় *আইনসভা* (Legislature) গঠন করা প্রমূখ দাবি দাওয়া পেশ করা হয়। এক কথায় উঠতি বুর্জোয়া শ্রেণির প্রথম রাজনৈতিক আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেছিল এ স্মারক লিপিতে। যা পরবর্তীকালে একাধিক আন্দোলনের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

বাংলার ইতিহাসে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের স্বাধীনতা আন্দোলন পরবর্তী নীল বিদ্রোহের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল সৃজনশীল সাহিত্যের এক বিপুল স্ফুরণ। সাহিত্যের নবজাগরণ শুরু হয়েছিল মাইকেল মধুসূদন দত্তের কাব্য, দীনবন্ধু মিত্রের নাটক এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস থেকে। শিক্ষিত বাঙালি সমাজের অন্তর নিঃসৃত মর্মকথা প্রকাশের সঙ্গেই শুরু হয়ে যায় আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা। উনিশ শতকের মহাকবি, নাট্যকার, বাংলা ভাষায় সনেটের প্রবর্তক, মাইকেল মধুসূদন দত্তকে (১৮২৪-১৮৭৩) নবজাগরিত বাংলা সাহিত্যের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব হিসেবে গণ্য করা হয়। কায়স্থ বংশে জন্ম হলেও যৌবনে তিনি খ্রিস্টান ধর্ম ও মাইকেল নাম গ্রহণ করেন। এবং ইংরেজি ভাষায় সাহিত্য রচনায় মনোনিবেশ করেন। একাজে ব্যর্থ হয়ে জীবনের দ্বিতীয় পর্বে তিনি আকৃষ্ট হন মাতৃভাষা বাংলার প্রতি। এসময়েই তিনি বাংলায় নাটক,প্রহসন ও কাব্য রচনা করতে শুরু করেন। তিনি বাংলা ভাষায় সনেট ও অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক। পাশ্চাত্য সাহিত্যের আদর্শকে বাংলা সাহিত্যে তিনিই প্রথম সার্থক ভাবে প্রয়োগ করেন। তিনি কাব্যের বীজ সংগ্রহে বেরিয়েছিলেন পশ্চিমপৃথিবীতে এবং বাংলা কবিতাকে সম্পুর্ণ বদলে দিয়েছিলেন। শুধুমাত্র কবিতা নয়; তিনি বদলে দিয়েছিলেন বাংলা সাহিত্যকেই।[৯১]

তখনকার বাংলা সাহিত্যে রচনার শৈলীগত এবং বিষয় ভাবনাগত যে আড়ষ্টতা ছিল, মাইকেল মধুসূদন দত্ত স্বীয় অসাধারণ প্রতিভা ও দক্ষতাগুণে তা দূরীভূত করেন। ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে মঞ্চস্থ হয় তাঁর প্রথম নাটক 'শর্মিষ্ঠা'। চিরাচরিত রীতির বাইরে ব্যতিক্রমী ধারায় রচিত এ নাটকটি প্রচন্ড সাড়া জাগায়। একই ধাচে ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে তিনি রচনা করেন দুটি প্রহসন, 'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'। প্রথমটিতে ইংরেজি শিক্ষিত নব বাবু সম্প্রদায়ের উচ্ছৃঙ্খলতা এবং দ্বিতীয়টির মাধ্যমে সনাতনপন্থি সমাজপতিদের নৈতিক চরিত্রের অধঃপতনের বিরুদ্ধে কষাঘাত হানেন তিনি। ফলে নাটকের বিষয়বস্তু নব্য ও সনাতনপন্থি উভয় সমাজকেই বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দেই তিনি বাংলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের সূত্রপাত করেন। ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর অমর সৃষ্টি 'মেঘনাদবধ' মহাকাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের দীপ্তিময় ব্যবহার করেছেন প্রাণভরে।

'মেঘনাদ বধ' রচিত হলে বাঙালির প্রাণে নতুন আশার সঞ্চার করে। সিপাহী-বিদ্রোহ সমর্থন বা তার প্রশস্তিবাদ করতে কেউ ভরসা পেত না। ক্যানিংয়ের আমলে প্রেস আইন নতুন করে বিধিবদ্ধ হয়। সে ক্ষমতা বলে সংবাদপত্র ও পুস্তক-পুস্তিকা সবই বাজেয়াপ্ত হতে পারতো। শিক্ষিত বাঙালি মন তখন এতটা অসাড় হয়ে পড়েনি, তাই সিপাহী বিদ্রোহের ব্যর্থতার গ্লানির সঙ্গে সঙ্গে সংগ্রামের বিরত্বও উপলব্ধি করতে পারতো। হয়তো কেউ কেউ এই বিরত্ব লক্ষ্য করে ও নির্জ্ঞানের এই অবদমিত বাসনাকে প্রাচীন কাব্যের ছাঁচে ঢেলে সাধারণের কাছে প্রকাশও করতে চেয়েছে। আর জ্ঞাতি শত্রু বিভীষণ-যার গোপন কথা প্রকাশের ফলে হল রাক্ষসকূলের পরাজয়, তাকে সাজালেন দেশদ্রোহী করে! তিনি কাব্যছন্দে বিভীষণের দেশদ্রোহিতা ও জ্ঞাতিদ্রোহিতা এবং তার বিষময় ফল স্বদেশবাসীর চোখের সামনে ধরিয়ে দেন।[৯২] সিপাহীযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই যে এ কাব্যখানি খুবই সমাদর লাভ করে। রামের বিপরীতে রাবণকে নায়ক বানিয়ে মহাকাব্য রচনায় কবির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দায় মোচনের চেষ্টা[৯৩] লক্ষ্যণীয়। শুধু ছন্দের নতুনত্ব বা রসের গভীরতাই নয়, এর উপরে আরেকটি জিনিষও রয়েছে, তা হ'ল বাঙালি তথা ভারতবাসীর তখনকার অব্যক্ত মনের বেদনা প্রকাশ করে মাইকেল মধুসূদন দত্ত ব্রিটিশ আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে দেশপ্রেম তথা বাঙালি বীর্যেরই প্রার্থনা করেন। প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও বাঙালির চিন্তা ও চেতনা জাগরণী এ প্রয়াস এক বিরল দৃষ্টান্তস্বরূপ। শুধু তাই নয়, দেশের পরাধীনতায় আক্ষেপ করে একপর্যায়ে মাইকেল মধুসূদন দত্ত লেখেন:

আমরা দূর্বল,ক্ষীণ,কুখ্যাত জগতে
পরাধীন,হা বিধতঃ আবদ্ধ শৃঙ্খলে?[৯৪]

'মেঘনাদবধ' বাংলা ভাষায় রচিত একটি মৌলিক মহাকাব্য মেঘনাদবধ কাব্য রামায়ণ আহৃত কাহিনীর পুণরাবৃত্তি নয়; এটি নবজাগ্রত বাঙালির দৃষ্টি নিয়তি লাঞ্চিত নব মানবতাবোধের সকরুণ মহাকাব্যের রূপে অপূর্ব গীতি কাব্য। একাব্যের মাধ্যমেই তিনি মহাকবির মর্যাদা লাভ করেন। এবং তাঁর নব আবিস্কৃত অমিত্রাক্ষর ছন্দও বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। রামায়নে বর্ণিত অধর্মাচারী, অত্যাচারী ও পাপী রাবণকে একজন দেশপ্রেমিক, বীরযোদ্ধা ও বিশাল শক্তির আধাররূপে চিত্রিত করে মধুসূদন উনিশ শতকের বাঙালির নবজাগরণের শ্রেষ্ঠ কবির মর্যাদা লাভ করেন। এক্ষেত্রে তিনি ভারতবাসীর চিরাচরিত বিশ্বাসের মূলে আঘাত হেনে প্রকৃত সত্যের সন্ধান ও দেশপ্রেমের যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন, বাংলা সাহিত্যে তা তুলনাহীন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন,"মেঘনাদবধ কাব্য কেবল ছন্দোবন্ধে ও রচনাপ্রণালীতে নয়, তাঁর ভিতরকার ভাব ও রসের মধ্যে একটা অপূর্ব পরিবর্তন দেখতে পাই।...এর মধ্যে একটা বিদ্রোহ আছে।"[৯৫]

সর্বোপরি মাইকেল মধুসূদন দত্ত অত্যন্ত দুঃসাহসিক ও প্রথাবিরোধী ভঙ্গীতে তাঁর রচনার উপজীব্য করেছেনে পৌরাণিক বিষয়কে; পাশ্চাত্য সাহিত্যের আদর্শ অনুযায়ী পুনর্মূল্যায়ন করেছেন চিরাচরিত মূল্যবোধের। ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালির জীবন দর্শন ও রুচির উপযোগী করে তিনি তাঁর কাব্যে বিদ্রোহী সত্ত্বাকে মহিমান্বিত করে তুলেছেন। তাঁর মধ্য দিয়েই বাংলা সাহিত্যে এক নবযুগের সূচনা হয়। উনিশ শতকের বাঙালি নবজাগরণের এই অন্যতম পথিকৃৎ তাঁর অনন্যসাধারণ প্রতিভার দ্বারা বাংলা ভাষার অন্তর্নিহিত শক্তি আবিস্কার করে এ ভাষা ও সাহিত্যের যে উৎকর্ষ সাধন করেন, তা অতুলনীয়। তাঁর অসামান্য প্রতিভা তাঁকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক চিরস্থায়ী আসন দান করেছে।

উনিশ শতকের বঙ্গীয় রেনেসাঁসের অন্যতম প্রতিনিধি দীনবন্ধু মিত্র (১৮২৮-৭৩)। তিনি ছিলেন বাংলা নাটকের শ্রেষ্ঠতম রূপকার। আধুনিক বাংলা নাট্যধারার প্রবর্তক মাইকেল মধুসূদন দত্তের মতো পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক নাট্য রচনার পথে না গিয়ে বাস্তবধর্মী সামাজিক নাট্য রচনায় মনোনিবেশ করেন। এই ধারায় তিনিই হয়ে ওঠেন পরবর্তীকালের নাট্যকারদের আদর্শস্থানীয়।

নদিয়ার সন্তান দীনবন্ধু মিত্র বাল্যকাল থেকেই বিদ্যোৎসাহী ছিলেন বলে পারিবারিক বাঁধার কারণে কলকাতায় পালিয়ে গিয়ে লেখাপড়া করেন। হিন্দু কলেজ (বর্তমান প্রেসিডেন্সি কলেজ) হতে পাস করে তিনি ডাক বিভাগে পোস্ট মাস্টার হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। পরবর্তীকালে ডাক বিভাগের উর্ধ্বতন পদে আসীন হলেও সে পরিমাণ সম্মানি তিনি পাননি। তবে ডাক বিভাগে যুক্ত থাকার সুবাদে গ্রাম বাংলার কৃষকদের দূরাবস্থার চিত্র তিনি অতি নিকট থেকে অবলোকন করতে সক্ষম হন।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত দীনবন্ধু মিত্রের নাটক নীল দর্পণ অনন্য মর্যাদায় আসীন। এটি তাঁর প্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক। স্বাদেশিকতা, নীল বিদ্রোহ ও সমসাময়িক বাংলার সমাজব্যবস্থার সঙ্গে এই নাটকের যোগাযোগ অত্যন্ত গভীর। এ নাটকটি তিনি রচনা করেছিলেন নীলকর-বিষধর-দংশন-কাতর-প্রজানিকর-ক্ষেমঙ্করেণ-কেনচিৎ-পথিক ছদ্মনামে। এ নাটক তাঁকে খ্যাতি ও সম্মানের চূড়ান্ত শীর্ষে উন্নীত করে। বিনয় ঘোষের মতে, দীনবন্ধু মিত্রই তখনকার সমাজ জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ বাস্তব সত্যকে নাট্যাকারে রূপ দেন। উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে–নাটকে, উপন্যাসে বা কাব্যে এই রূপায়নের দ্বিতীয় কোন নিদর্শন নেই। নীল দর্পণ বাদ দিলে বাংলা সাহিত্যের ও বাংলার সমাজ জীবনের ইতিহাসের মধ্যে একটি বড়ো ব্যবধান থেকে যেতো। নীল দর্পণ শূন্য বাংলা সাহিত্য হতো সমগ্র বাঙালি জাতীয় জীবনের একটি খন্ডিত ইতিহাস। *নীল দর্পণ, সধবার একাদশী*–এ দুইয়ে মিলিয়ে তখনকার 'টোটাল রিয়েলিটি', অর্থাৎ সমগ্রতার ছবি এবং দীনবন্ধু মিত্র তাঁর শিল্পী। বাংলার

কৃষকশ্রেণি থেকে গ্রাম্য ও শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণি ও উচ্চশ্রেণির সম্পূর্ণ পরিচয় এই দুটি নাটকের মধ্যে পাওয়া যায়।[৯৬] অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায়, 'নীল দর্পণ' নাটক প্রকাশিত হলে এবং এর ইংরেজি অনুবাদ প্রচারিত হলে একদিনেই এ নাটিক বাঙালি মহলে যতোটা প্রশংসিত হয়েছিল; শ্বেতাংঙ্গ মহলে ঠিক ততটাই ঘৃণিত হয়েছিল। এ নাটক অবলম্বন করে বাঙালির স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের সূচনা, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি ও রায়তদের মধ্যে মৈত্রীবন্ধন স্থাপিত হয়। এবং এ নাটকের মধ্য দিয়েই শ্বেতাঙ্গ নীলকরদের বর্বর চরিত্র উদঘাটিত হয়। নাটকটির মূল উপজীব্য বিষয় হলো বাঙালি কৃষক ও ভদ্রলোক শ্রেণির প্রতি নীলকর সাহেবদের অকথ্য অত্যাচারের কাহিনী। আঞ্চলিক ভাষার সাবলীল প্রয়োগ নাটকটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। নীল দর্পণ নাটকের ইংরেজি অনুবাদ ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টে প্রেরিত হয়। স্বদেশে ও বিদেশে নীলকরদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়। ফলে সরকার ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে *নীল কমিশন* (Indigo Commission) বসাতে বাধ্য হন। আইন করে নীলকরদের বর্বরতা বন্ধের ব্যবস্থা করা হয়।[৯৭] সে সময়কার বাংলা সাহিত্য ও বাঙালির সমাজ জীবনে এ নাটক গভীর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল। সমাজের তৃণমূল স্তরের মানুষজনের জীবনকথা এমনই স্বার্থক ও গভীরভাবে নীলদর্পণ নাটকে প্রতিফলিত হয়েছে যে, অনেকেই এই নাটককে বাংলার প্রথম গণনাটক হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। আবার বিদেশি শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর কথা বলে এ নাটকই প্রথম জাতীয় জীবনে জাতীয়তাবোধের সঞ্চার ঘটিয়েছিল।

বঙ্গীয় রেনেসাঁসের আরেকজন প্রবাদ পুরুষ হচ্ছেন সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৮)। বাংলা গদ্য ও উপন্যাসের বিকাশে তাঁর অসীম অবদানের জন্য তিনি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করেছেন। তাঁকে প্রথম আধুনিক বাংলা ঔপন্যাসিক হিসেবে গণ্য করা হয়। তিনি ছিলেন ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত বাংলা ভাষার আদি সাহিত্যপত্র বঙ্গদর্শন পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল বাংলা ভাষার যথার্থ সাংস্কৃতিক পত্রিকা। এ পত্রিকার চারপাশে জড়ো হওয়া একদল লেখক এবং পাঠকসমাজের চোখে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ই ছিলেন তখনকার সাহিত্য জগতের অবিসংবাদিত নেতা।

শিশু বয়সেই বঙ্কিমের অসামান্য মেধার পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দে পিতার কর্মস্থল মেদিনীপুরে তাঁর শিক্ষার সূচনা হয়। ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি হুগলি কলেজে ভর্তি হন। এখানে অধ্যয়নকালেই তিনি কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের (১৮১২-৫৯) 'সংবাদ প্রভাকর' ও 'সংবাদ সাধু রঞ্জনে' গদ্য-পদ্য রচনা আরম্ভ করেন। পরবর্তীকালে তাঁর বহু রচনা এ দুটি কাগজে প্রকাশিত হয়। কর্মজীবনে তিনি ব্রিটিশ রাজের অধীনে চাকরি করেন। তবে সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে নয়; বরং একজন লেখক এবং

হিন্দু পুনর্জাগরণের দার্শনিক হিসেবেই তিনি সমধিক প্রসিদ্ধ। লেখক হিসেবে তাঁর আর্বিভূত হওয়ার পশ্চাতে চারটি স্বতন্ত্র ধারা ক্রিয়াশীল ছিল। প্রথমত, উনিশ শতকের শুরুতে রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমূখ মনীষীর আধুনিক চিন্তাধারার ফলে বাংলা গদ্যের বিকাশ; দ্বিতীয়ত, সংবাদপত্র ও সাময়িকীর ক্রমবিকাশ; তৃতীয়ত, নব্য হিন্দুত্ববাদের উত্থান এবং চতুর্থত, কলকাতায় ইংরেজি ও পাশ্চাত্য শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধিকারী বুদ্ধিজীবী ও বিত্তবান মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব। বঙ্কিমচন্দ্র এই ধারার স্রষ্টা নন বরং প্রচলিত ধারারই ফল। তিনি পূর্বসূরিদের সৃষ্ট ধারার সুযোগ সুবিধা পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ করেন এবং প্রগতির ধারাকে আরও অগ্রসর করে একটি স্বতন্ত্র রূপ দিতে অনন্য অবদান রাখেন। এ প্রসঙ্গে মোহিতলাল মজুমদার বলেন যে, উনিশ শতকে বাঙালির যে নবজাগরণ হয়েছিল, তার সবটাই যুগপ্রবৃত্তি বা ইউরোপীয় প্রভাবের বশে ঘটেনি। কিন্তু যখন তা বঙ্কিমচন্দ্রে এসে পৌঁছালো; তখন জাতি গুরুতর চৈতন্যে সারা জাগিয়েছে, অতএব বাঙালির নিজস্ব দানও তাতে ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রসহ অন্যান্য কবি মনীষীগণ ভুঁইফোর ছিলেন না–তাদের ব্যক্তিগত প্রতিভায় জাতির সংস্কার এবং সংস্কৃতিও শক্তি সঞ্চার করেছিল।[৯৮] ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দ থেকে তিনি একজন পুনরুত্থানবাদী সংস্কারক হওয়ার চেষ্টা করেন। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত আনন্দমঠ তাঁর অন্যতম স্মরণীয় সাহিত্যকীর্তি। পরবর্তীকালে তাঁর সকল চিন্তাধারা ধর্মীয় পুনরুত্থান ও জাতীয় নবজাগরণের কর্মকান্ডে আবর্তিত হয়। এসময় থেকে তাঁর লেখনি যে ধারণা দেয় তাতে তাঁকে সৃষ্টিশীল চিন্তাবিদ ও লেখকের চেয়ে একজন দেশপ্রেমিক ও গর্বিত হিন্দু বলেই মনে হয়। তিনি প্রাচীন ভারতের নৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ঐতিহ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা চেয়েছিলেন। তাঁর এ ধারণা আনন্দ মঠ (১৮৮২খ্রি.) ও দেবি চৌধুরাণী (১৮৮২খ্রি.) গ্রন্থে এবং ধর্মশাস্ত্রে ও গীতার ভাষ্যে পরিস্কারভাবে ফুটে উঠেছে। তিনি নব্য হিন্দুবাদের একজন সংস্কারক ছিলেন এবং একটি হিন্দুজাতি গঠনের চেষ্টা করেছিলেন। এ উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়োজনে তিনি আশ্চর্যজনক ভাবে ইতিহাসের ধারাকে উপেক্ষা কছিলেন। বিগত কয়েক শতকে বাংলার সমাজ ও হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কে যে পরিবর্তন ও পুনর্গঠন হয়েছে তা তাঁর মানসপটে ধরা পড়েনি। ইতোমধ্যে বাংলাঅঞ্চল যে একটি মুসলমান প্রধান অঞ্চলে পরিণত হয়েছে এবং এখানকার হিন্দু-মুসলমানরা যে শতকের পর শতক ধরে পারস্পারিক সহমর্মিতা ও সহযোগিতামূলক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে বসবাস করেছে, একথা তাঁর লেখায় পাওয়া যায়না। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সুসম্পর্ক হওয়া অসম্ভব। তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাস সমূহে, যেগুলোর সঙ্গে প্রকৃত ইতিহাসের সম্পর্ক খুবই কম, হিন্দু দেশপ্রেম এবং হিন্দু জাতীয়তাবাদ প্রচারের প্রবণতাই লক্ষ্য করা যায়। তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে মুসলমানের বিরুদ্ধে হিন্দুর বিজয় দেখানো হয়েছে। যেমন-রাজসিংহ

(১৮৮২খ্রি.) এবং সীতারাম (১৮৮৮খ্রি.)। কোন কোনটিতে আবার ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধেও হিন্দু জাতির বিজয় দেখানো হয়েছে।যেমন–দেবী চৌধুরাণী এবং আনন্দমঠ।

ইতিহাসবিদ সুপ্রকাশ রায় রাজা রামমোহন রায়ের পর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জনক হিসেবে মেনে নিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দ মঠে ইংরেজ শাসনের বিরোধিতা নয় বরং ইংরেজ শাসকদের সহযোগতার পরামর্শ রয়েছে। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর প্রান্তরে ইংরেজের বিজয়ে উল্লসিত বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য, ইংরেজ বাংলাদেশকে অরাজকতার হাত থেকে উদ্ধার করেছে। বঙ্কিমের ভাষায়, মুসলমান শাসনামলে হিন্দুধর্মের প্রভূত ক্ষতি সাধিত হয়েছে। কিন্তু ইংরেজ আমলে তা আবার পুনরুজ্জীবন লাভ করবে।[৯৯]

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর হিন্দুজাতির পুনরুত্থান বিষয়ক প্রবন্ধ ও গ্রন্থে 'বন্দে মাতরম', 'মাতৃভূমি', 'স্বরাজ', 'মন্ত্র', প্রভৃতি নতুন শ্লোগান তৈরি করেন। হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা পরবর্তীতে এই শ্লোগানগুলো ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে।[১০০] ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যপন্থি রাজনৈতিক নেতারা প্রথম দিকে তাঁর এই রাজনৈতিক শ্লোগানে খুব বেশি আগ্রহী না হলেও স্বদেশী যুগের যুবসমাজের কাছে তাঁর প্রচন্ড জনপ্রিয়তা সৃষ্টি হয়। যা কংগ্রেসকে নতুনভাবে উজ্জীবিত করে এবং পরবর্তীকালে একটি জাতীয়তাবাদী দলে পরিণত হতে প্রভাবিত করে। একপর্যায়ে ভারতীয় কংগ্রেস তাঁর জাতীয় রাজনীতির শ্লোগান হিসেবে 'বন্দে মাতরম্' কে আনুষ্ঠানিক ভাবে গ্রহণ করে। এবং এই শ্লোগানটি সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে। অতীতের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক আদর্শ প্রচার এবং পরবর্তী জীবনে সাহিত্য ব্যক্তিত্ব হিসেবে নিষ্ক্রিয়তা সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) ও কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬) আবির্ভাব পর্যন্ত সকলের কাছে; এমনকি শিক্ষিত মুসলিম সমাজের কাছেও সে সময়ের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক হিসেবে পরিগণিত হতেন।

বাংলার চিন্তা ও চেতনার ক্ষেত্রে ভূমিকা তথা বিভিন্ন বিষয়ের গবেষণাপত্র নিয়ে আলোচনা করার নিমিত্তে ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে 'বেঙ্গল সোসাল সায়েন্স অ্যাসোসিয়েসন' প্রতিষ্ঠায় অন্যান্যের সাথে জড়িত রেভারেন্ড জেমস লং[১০১] তাঁর "Five Hundred Questions on the Subjects Requiring Investigation in the Social Condition of the Natives of Bengal" নামক প্রবন্ধে বাংলার সমাজ সম্পর্কে তাঁর প্রত্যক্ষ উপলব্ধি এবং উপনিবেশের জনগণের ওপর ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকারের অপশাসন ও প্রভাব সম্পর্কে তাঁর দুর্ভাবনার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেন। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে অনুপ্রাণিত করার প্রয়াসে হোমিওপ্যাথ ডা.মহেন্দ্রলাল সরকার "Indian Association for

the Cultivation of Science" প্রতিষ্ঠা করেন। এতদসঙ্গে উল্লেখ্য ভারতীয় বিদ্রোহ তথা ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম চলাকালীন ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এক পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়টি সমগ্র উত্তর ভারতের শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়। শিক্ষিত বাঙালিরা তাদের নবজাগরণের মশাল হাতে নিয়ে ছড়িয়ে পড়ছিল ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে। ইতোপূর্বে রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২-৯১খ্রি.) সৃজনশীল সাহিত্যের পাশাপশি বাংলার ইতিহাস বিষয়ক গবেষণার সূত্রপাত করেন। তিনি ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে বাংলা শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠা *স্বারস্বত সমাজ'র* সভাপতি ছিলেন। এছাড়াও বিভিন্ন গণকার্যকলাপ এবং প্রচার আন্দোলনে তার ভূমিকার কথা উল্লেখ পাওয়া যায়।

ধর্মীয় পুরুত্থধানবাদ:

সাহিত্য ও জ্ঞানচর্চার পাশাপশি এসময় ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কারের জোয়ার লক্ষ্য করা যায়। এসময় ধর্মীয় *পুরুত্থানবাদ* (revivalism) জেগে ওঠে এবং পাশ্চাত্য প্রভাবের বিরুদ্ধাচরণ শুরু করে। একদিকে কেশবচন্দ্র সেন ও তরুণ ব্রাহ্মদের কার্যক্রম অপরদিকে ওয়াহাবী আন্দোলন, নব্য হিন্দুমতবাদ ও রামকৃষ্ণ পরমহংসের মতবাদ বাঙালি সমাজ ও জনজীবনকে আন্দোলিত করে।

কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-৮৪) ছাত্রাবস্থা থেকেই বিভিন্ন সমাজকল্যাণ মূলক কাজ এবং ধর্মীয় চিন্তাভাবনার ব্যাপারে তাঁর গভীর উৎসাহ লক্ষ্যণীয়। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে দুঃস্থদের জন্য একটি নৈশ বিদ্যালয়, ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে 'গুডউইল ফ্লাটারনিটি' সভা প্রতিষ্ঠা করেন। এসময় তিনি একজন সুবক্তা হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের কথিত সিপাহী বিদ্রোহ তথা প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের পরের বছর কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজে যোগদেন।

সে সময় ব্রাহ্মসমাজের নেতা দেবেন্দ্রনাথের অতিরিক্ত বেদ-উপনিষদও ব্রাহ্মমণ্য ধর্মপ্রীতি, বেদকে প্রত্যাদিষ্ট গ্রন্থ বলে প্রচার ব্রাহ্মসমাজে অস্থিরতার জন্ম দেয়। তিনি হিন্দুধর্মে বিশ্বাসী এবং আন্তর্জাতিক বিবাহের পক্ষে সায়[১০২] এবং ব্রাহ্ম হয়েও ব্রাহ্মণদের পৈতা ত্যাগের বিরোধীতা করেন। বস্তুবাদী ও উদারনৈতিক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাই দেবেন্দ্রনাথের কিছু মতামত অপছন্দ করতেন। ব্রাহ্মসমাজের মুখপাত্র তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার[১০৩] সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্তের সঙ্গেও চিন্তার কিছু মৌলিক পার্থক্যের স্বীকৃতি দিয়ে দেবেন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, আমি কোথায় আর তিনি (অক্ষয়কুমার দত্ত) কোথায়! আমি খুঁজি ঈশ্বরের সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ, আর তিনি খুঁজিতেছেন যা বস্তুর সাথে মানব প্রকৃতির কি সম্বন্ধ, আকাশ-পাতাল পার্থক্য।[১০৪] বস্তুতপক্ষে অক্ষয়কুমার দত্ত ইউরোপের হিউম্যানিজম ও রিফর্মেশন

আন্দোলনের ইতিহাস পাঠ করে রাজা রামমোহন রায়ের ব্রাহ্ম আন্দোলনে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন। ইউরোপে রেনেসাঁসের প্রস্তুতি (১৫১৬-১৫৭৮) পর্বে *স্যার থমাস মুর* (Thomas More), *ফ্রান্সিস বেকন* (Fracis Bacon), *হার্বার্ট স্পেনসার* (Herbert Spencer) প্রমুখ যে চিন্তার জাগরণ ঘটান; স্বদেশের মানুষের মধ্যে তিনি সেই চিন্তার প্রতিধ্বনি করতে সচেষ্ট হন। কুসংস্কার জনিত ভ্রান্তির বিরুদ্ধে ফ্রান্সিস বেকন (১৫৬১-১৬২৬) যেমন বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন অক্ষয়কুমার দত্তও ঠিক তেমনি তাঁর বাহ্যবস্তুর সাথে মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার প্রবন্ধে নিজের মতামতের ব্যাখ্যা তুলে ধরেন। তিনি ঘোষণা করেন, প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী কাজ করাই ধর্ম এবং কাজ না করাই অধর্ম।[১০৫] এই দর্শন চিন্তার আলোকেই তিনি তাঁর মতবাদের নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত দেন:

'পরিশ্রম=শস্য
প্রার্থনা+পরিশ্রম=শস্য
অতএব প্রার্থনা=০;[১০৬]

অর্থাৎ কর্মই হচ্ছে মূল। জাগতিক ও ইহজাগতিক শস্য পেতে হলে কর্মসাধন ছাড়া প্রার্থনার কোন মূল্য নেই। সমসাময়িক অবস্থা বিচার বিশ্লেষণ করেই তিনি একথা বলেন; এতে কোন সন্দেহ নেই। কার্যত তৎকালে সামাজিক প্রথা ও নানা কুসংস্কার ধর্মের নামে বহাল ছিল। এসব ক্ষেত্রে রাজা রামমোহন রায় ও তাঁর অনুসারীরা যখন যুক্তি ও বুদ্ধির আন্দোলন শুরু করেন, তখন তা সর্বপ্রকার ধর্মচিন্তা ও আধ্যাত্মিক ভাবধারা বিরোধী হয়ে পড়ে। শাস্ত্রবাক্যে অন্ধবিশ্বাস, গোঁড়ামী, কুসংস্কার, পশ্চাদগতি, সামাজিক শোষণ ও কায়েমী স্বার্থের সংরক্ষণই ধর্ম নামে বিবেচিত হতো। অক্ষয়কুমার দত্ত নিজে বৈজ্ঞানিক সংযম ও দার্শনিক চিন্তাধারা অধিকারী হওয়ায় এ আলোকে ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দের ১৫ ডিসেম্বর বাংলার সামাজিক উন্নতির জন্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সভাপতি করে "The Association of Friends for the promotion of social Improvement" প্রতিষ্ঠা করেন। এ সমিতির সম্পাদক ছিলেন স্বয়ং অক্ষয়কুমার দত্ত ও কিশোরীচাঁদ মিত্র।

কেশবচন্দ্র সেনের উদ্যমী কর্মতৎপরতার ফলে কয়েক বছরের মধ্যেই তত্ত্ববোধিনী আন্দোলনের গৌরবোজ্জ্বল পরবর্তী নিশ্চলতায় নিমজ্জিত ব্রাহ্মসমাজ উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। তিনি ব্রাহ্মধর্মকে এতোটাই উদ্দীপ্ত করতে পেরেছিলেন যে, যুবকরা দলে দলে ব্রাহ্ম সমাজে যোগদান করতে থাকে। ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি একটি ব্রাহ্ম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও ধর্মীয় আলোচনার জন্য ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে *সঙ্গত সভা* চালু এবং ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত ইন্ডিয়ান মিরর প্রত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব লাভ করেন। ব্রাহ্মধর্মের স্বার্থে তাঁর কর্মতৎপরতার স্বীকৃতিস্বরূপ মহর্ষী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কেশবচন্দ্রকে *ব্রহ্মানন্দ* নামে অভিহিত করেন। ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে চালু করেন বাংলা পত্রিকা *ধর্মতত্ত্ব*। পরবর্তী বছর গঠিত হয় *ব্রহ্মবন্ধু সভা*।

নতুন বিশ্বাস ও চিন্তাধারার ক্ষেত্রে জৈষ্ঠ নেতৃবৃন্দ কিছু প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত ব্যাতীত কিছুই করতেন না। এজন্য ১৮৬৪-৬৫ খ্রিস্টাব্দে কেশবচন্দ্র, বাংলার বাইরে ব্রাহ্মধর্ম প্রসারে বিশেষ ভূমিকা নেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন, সর্বভারতীয় আন্দোলনের পথপ্রদর্শক। যদিও এ আন্দোলন ছিল ধর্মীয় ও সমাজ সংস্কার আন্দোলন। ফলে সারা ভারতে পরিচিত হয়ে ওঠেন তিনি। ড. রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে ব্রাহ্ম আন্দোলনকেই ভারতের প্রথম সর্বভারতীয় আন্দোলন বলা চলে।[১০৭] অবশ্য কেশবচন্দ্র সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো জাতীয়তাবাদী আদর্শ প্রচার না করে ব্রিটিশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। তাঁর প্রচারের ফলে পূর্ব বাংলায় একই সঙ্গে উদ্দীপনা ও আশঙ্কার সৃষ্টি হয়। জেলা শহরগুলোতে ছোট ছোট ব্রাহ্ম গোষ্ঠী ও ব্যক্তি কাজ শুরু করে। প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর নির্যাতনের মুখোমুখি হতে হয়।

কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যে ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে থাকে একটি র‍্যাডিক্যাল[১০৮] গোষ্ঠী। এবং এ গোষ্ঠীর সদস্যরা পূরনো নেতাদের সমালোচনা করতে শুরু করে। অক্ষয়কুমার দত্তের প্রভাবে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বেদের অলংঘনীয়তায় তাঁর বিশ্বাস ত্যাগ করলেও বিভিন্ন পুরনো পন্থাই মেনে চলতেন। তার আন্দোলনের সাথে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সাথে যাতে দূরত্ব বৃদ্ধি না পায়। কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে এসময় তরুণ ব্রাহ্মরা দাবি করেন যে, যেসব ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক ব্রাহ্মণত্বের প্রতীক উপবীতটি পরিত্যাগ করেননি তাঁদেরকে ধর্মোপদেশ দানের বেদিতে প্রবেশ করতে দেয়া হবেনা। মেয়েদেরকে উপাসনা সভায় যোগদানের অধিকার দিতে হবে। অসবর্ণ বিবাহকে উৎসাহিত করতে হবে। এ সময় কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্ম যুবকদের জন্য একটি সভা এবং ব্রাহ্ম নারীদের জন্য একটি সংস্থা সংগঠিত করেন।

দেবেন্দ্রনাথসহ রক্ষণশীল ব্রাহ্মদের মনোভাবের বিরুদ্ধে ব্রাহ্ম আন্দোলনের মধ্যেই ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে ব্রাহ্মসমাজের যুবক ব্রাহ্মরা আলাদা হয়ে যায়।[১০৯] ফলশ্রুতিতে দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মসমাজ *আদি ব্রাহ্মসমাজ* নামে এবং কেশবচন্দ্র সেন প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজ *ভারতীয় ব্রাহ্মসমাজ* নামে অভিহিত হতে থাকে।[১১০] কেশবচন্দ্র সেন এমনসব উদ্দীপনাময় তরুণদের নিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন যারা কিছুদিনের মধ্যে তাঁর অগ্রসর চিন্তাভাবনায় তাঁকে ছাড়িয়ে যেতে শুরু করে। তাদের মধ্যে অন্যতম বিদ্যান ও সুপন্ডিত শিবনাথশাস্ত্রী, বরিশালের সংস্কারক দূর্গামোহন দাস, নারী মুক্তি ও সমাজের নীচুতলার মানুষদের একনিষ্ট সমর্থক ঢাকার দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ময়মনসিংহের শান্ত অথচ দুঃসাহসী আনন্দমোহন বসু।[১১১] কেশবচন্দ্র সেন সুরেন্দ্রনাথের মতো জাতীয়তাবাদী ভাবধারা প্রচার করতেন না। তবে তিনি ছিলেন ব্রিটিশরাজের অনুগত। ব্রিটিশরাজ ও ভারত সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশকে তিনি ব্রাহ্মসমাজের প্রতিজ্ঞাপত্রে অঙ্গীভূত করেন।[১১২] তাঁর মানস সরোবর গঠিত হয় ইংরেজ

সংসর্গে। ইংরেজ শাসনকে অন্যান্যের মতো তাঁর কাছেও বিধাতার আশীবাদ স্বরূপ। আবেগ-উৎফুল্ল কৃতজ্ঞতায় তিনি স্বয়ং বলেছেন, করুণার বশবর্তী হয়ে ঈশ্বর ভারতবর্ষকে উদ্ধার করার জন্য ব্রিটিশ জাতিকে প্রেরণ করেন। ঈশ্বরেরই আজ্ঞাবহ রুপে ইংল্যান্ড এলো এবং ভারতের তিমির-গুন্ঠিত দরজায় আঘাত করে বললো, *উঠো এবার, দীর্ঘকাল সুপ্তছিলে তুমি* (Noble sister, rise, thou has slept too long)। তাঁর মতে, বর্তমান ভারত বাইবেলের মর্মবাণী গ্রহণ না করে বাঁচতে পারেনা।[১১৩] তিনি প্রার্থনা সমাজ প্রতিষ্ঠা করত: মতবাদ প্রচারে বোম্বাই ও মাদ্রাজ এমকি রাজা রামমোহন রায়ের মতো ইংল্যান্ড সফর করেন। শেষে চৈতন্যের ভক্তিবাদ প্রচার এবং তাঁকে কেন্দ্র করে মানবপূজা বা অবতারবাদ আরম্ভ হয়।

কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্ব এবং উপাসনাগৃহ পরিচালনার ব্যাপারে তাঁর তথাকথিত স্বেচ্চাচারের বিরুদ্ধে ক্রমেই প্রতিবাদ মূখর হয়ে উঠেন নবীন ব্রাহ্মরা। অনুগত শিষ্যরা কেশবচন্দ্র সেনকে যেভাবে তোষামোদ করতো, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে আস্তে আস্তে যেভাবে বেড়ে উঠেছছিল অতীন্দ্রিয়বাদী প্রবণতা; তাতে আহত হচ্ছিল ঐসকল নবীন ব্রাহ্মদের গণতান্ত্রিক মনোভাব। কেশবচন্দ্র সেন নিজের উদ্যোগেই ব্রাহ্মদের মধ্যে নতুন বিবাহরীতি চালু করেন। কিন্তু তিনি নিজেই তা অস্বীকার করে '১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁর চতুর্দশী কন্যা সুনীতিবালাকে কুচবিহারের নাবালক হিন্দু রাজার সঙ্গে হিন্দুমতে বিবাহ দান করেন।[১১৪] এই বিবাহের ঘটনায় নবীনেরা তাঁর বিরোধিতা করে। ফলশ্রুতিতে ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দের ১৫ মে ব্রাহ্মসমাজে দ্বিতীয়বার ভাঙ্গন ধরে এবং শিবনাথশাস্ত্রীর নেতৃত্বে তাঁরা 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' গড়ে তোলে। এ সংগঠনের একটি গণতান্ত্রিক গঠনতন্ত্র রচিত হয়। এ ভাঙ্গনের পর কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁর অনুসারী ব্রাহ্মদের নাম হয় 'নব-বিধান ব্রাহ্মসমাজ'। কিন্তু *ডেভিড কফের* (David Kopf) মতে, কেশবচন্দ্র সেন শুধু সর্ব ভারতীয় স্তরে তাঁর ধর্ম আন্দোলনকে ছড়িয়ে দেন নাই, কুচবিহার ও ময়ুরভঞ্জের রাজ পরিবারে নিজ কন্যাদ্বয়ের বিবাহ দ্বারা এ দুই দেশীয় রাজ্যে নব জাগরণের হাওয়া ঢুকিয়ে দেন। বাঙালি সংস্কৃতি এ দুই দেশীয় রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে।[১১৫]

কেশবচন্দ্র সেনের গ্রুপটি জাতিভেদ মানতেন না, পৈতা পরার বিরুদ্ধাচারণ এবং পৌত্তলিকতার সাথে সংশ্রব না রাখার কথা বলতেন। এ গ্রুপটিকে প্রগতিশীল ভাবধারার অধিকারী মনে করা হয়। কেশবচন্দ্র আবার স্ত্রী শিক্ষার পক্ষে হলেও তাদের স্বাধীনতার বিপক্ষে ছিলেন। ব্রাহ্মপরিবারের মেয়েরা পর্যন্ত প্রকাশ্য রাজপথে একাকী তো নয়ই; পুরুষের সঙ্গেও বের হতো না।[১১৬] এমনকি ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দেও বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষারত মাত্র ৩০ জন ছাত্রীর কথা জানা যায়। অন্যদিকে বিশ শতকের শুরুতে বেগম রোকেয়া কর্তৃক কলকাতায় সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মুসলমান

মেয়েদের শিক্ষা শুরু হয়। নারীর শিক্ষা ও মুক্তি প্রসঙ্গে বেগম রোকেয়ার এই বৈপ্লবিক ভূমিকা প্রশংসার দাবি রাখে।

কুচবিহার বিবাহকে কেন্দ্র করে ভাঙ্গন ঘটে যাওয়ার পর কেশবচন্দ্র সেনের অনুগামীরা আরও বেশি করে ঝুঁকে পড়েন আবেগপ্রবণতার দিকে। এবং তাঁর 'নব বিধান ব্রাহ্মসমাজ' তখন থেকেই সকল ধর্মের এক নতুন মিশ্রণ বা সংশ্লেষণের কথা বলতে শুরু করে।[১১৭] কেশবচন্দ্র সেন বলতেন জগতের পরিত্রানের জন্য যতো বিধান আছে সমুদয় বিধানের শেষ ফল এই ব্রাহ্মধর্ম। ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে তিনি ব্রাহ্মধর্মকে সর্বধর্ম সমন্বয়কারী নববিধান বলে ঘোষণা করেন। এর আদর্শ হলো সকল সম্প্রদায় এবং সকল শাস্ত্রের সত্যকে সম্মান ও গ্রহণ করা; সাম্প্রদায়িকতা রূপ পাপ সর্বতোভাবে বর্জন করা, সাধু ভক্তদের ভিতর দিয়ে ঈশ্বরের যে বাণী প্রকাশিত হয়েছে তা বিশ্বাস করা, ভগবৎ প্রেম, প্রার্থনা ও অনুশোচনা প্রভৃতি সত্যের প্রতি অবিচল থাকা। সর্বশেষে ব্রাহ্মসমাজ, আদি ব্রাহ্মসমাজ, নব-বিধান ব্রাহ্মসমাজ এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এ তিনভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জনপ্রিয়তা আরও বৃদ্ধি পায়।

'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের' নেতা শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর শিষ্যদের ব্রিটিশবিরোধী অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করেন। তিনি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির নেতৃত্বে বিশ্বাসী হলেও আন্দেলন-সংগ্রামে গরীব শ্রমজীবী জনগণের অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। তাদের জাগ্রত করার প্রত্যয়ে গণসঙ্গীতও রচনা করেন।[১১৮] সংগঠনের বাংলা মুখপত্রে ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয় যে, শুধুমাত্র ধর্মীয় ক্ষেত্রে র‍্যাডিক্যাল চিন্তাভাবনাই ব্রাহ্ম আদর্শের একমাত্র কথা নয়। ব্রাহ্ম আদর্শ হলো গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের পতাকাতলে বিশ্বের সকল মানুষের মুক্তি। তৎকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনে মনপ্রাণ দিয়ে ঝাপিয়ে পড়ে নবীন ব্রাহ্মরা। তাঁদের সহযোগিদের মধ্যে ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো সর্বভারতীয় নেতারাও। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দেই শিবনাথ শাস্ত্রীর নেতৃত্বে তাঁরা কয়েকজন স্বাধীনতার প্রতি তাঁদের বিশ্বাসের কথা ঘোষণা করেন; বিদেশি সরকারের অধীনে চাকরি করতে অস্বীকার করেন। তবে দেশের পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে তাঁরা শান্তিপূর্ণ উপায়ে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দেন। নবীন ব্রাহ্মদের এই আপসহীন, অনমনীয় প্রচেষ্টার ফলে ইয়ং বেঙ্গলের শেষ দু'জন প্রতিনিধি, শিবচন্দ্র দেব আর রামতনু লাহিড়ী তাঁদের সাথে যোগদেন। তাঁদের মুখপাত্র 'ব্রাহ্মপাবলিক ওপিনিয়ন' সে সময়কার রাজনৈতিক প্রচার-অভিযানে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে।

ধর্মীয় চেতনার পুনরুত্থান

সমাজের সযত্ন লালিত প্রথাগুলোকে শুধু কথায় নয়; কর্মেও অস্বীকার করায় কেশবচন্দ্র সেন এবং নবীন ব্রাহ্মরা স্বাভাবিক নিয়মেই প্রাচীনপন্থিদের জোরদার পতিরোধের মুখে পড়ে। গোড়াপন্থিরা এদেরকে

সামাজিকভাবে নির্যাতন করে প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করে। প্রতিবাদে নতুন বিশ্বাসে দীক্ষিত অনেক যুবককে তাদের পৈত্রিক বাড়ি ত্যাগ করেতে হয়। রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের মধ্যে এই প্রতিবাদী আন্দোলনের নৈতিক গুণাবলি সমন্ধে বিরাজিত অস্বস্তি ছিল। সেজন্য ব্রাহ্মদের নীতিবাগিশতা নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করার রেওয়াজ চালু হয়। ব্রাহ্মদের বিরুদ্ধে প্রাচীনপন্থিরা যে প্রতিরোধী পদক্ষেপ গড়েছিল তাকে যুক্তিগ্রাহ্য করে তোলারও চেষ্টা চলে। এমনকি মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন এই ধারার অনুসারী।[১১৯] রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে গর্ববোধ আর আত্মবিশ্বাসও বেড়ে চলে। মুসলিমদের পশ্চাদপদতার দরুণ হিন্দুত্বের বোধন পূর্বাপেক্ষা আরও বেশি করে জাগ্রত হয়। দেশপ্রেমিক লেখকরা তাঁদের লেখায় শুধুমাত্র হিন্দু কাঠামো বিশিষ্ট প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতিকেই মহিমান্বিত করে তুলতেন না; একই সঙ্গে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার দৃষ্টান্ত হিসেবে তাঁরা রাজপুত, মারাঠা এবং শিখদের সংগ্রামের কথা তুলে ধরতেন। বস্তুতপক্ষে এইসকল জাতির প্রত্যেকটি সংগ্রামেই এক ও অভিন্ন প্রতিপক্ষ ছিল মুসলিমরা। ফলে বাঙালি জাতীয় চেতনায় হিন্দুত্ববাদ আরও তীব্র হয়ে উঠেছিল।

এদিকে রাজা রামমোহন রায়ের সমসাময়িক সৈয়দ আহমদ বেরলভি (১৭৮৬-১৮৩১খ্রি.) আরবদেশ থেকে অ্যানাব্যাপটিস্ট[১২০] ধাঁচের ওয়াহাবি মতবাদ এদেশে নিয়ে আসেন এবং পাটনাকে কেন্দ্র করে এ মতবাদ বিস্তার লাভ করে। আরবি 'ওয়াহাবি' শব্দের অর্থ নবজাগরণ।[১২১] এই আন্দোলনকে ব্রিটিশ সরকার যথেষ্ট সন্দেহের চোখে দেখতেন। তাঁরাই ছিল এই দেশের প্রথম বৈপ্লবিক ও সশস্ত্র সংগ্রামী। ওয়াহাবি মতবাদ বাংলার কোন কোন অঞ্চলে হতদরিদ্র মুসলমানদের মধ্যে আলোড়ন জাগিয়ে তোলে। ওয়াহাবি নেতা আমির উদ্দিন খাঁকে ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে নীল বিদ্রোহে নেতৃত্ব দানের অভিযোগে কারারুদ্ধ হন।[১২২] সরকার ওয়াহাবিদেরকেই সর্বপ্রথম রাজনৈতিক আসামি হিসেবে দিপান্তরে পাঠায়। ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দের ২০ সেপ্টেম্বর কলকাতা হাইকোর্টের অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি *স্যার নরম্যান* (Jhon Paxton Norman) হত্যাকান্ডের শিকার হন। নরম্যান হত্যাকারী শেখ আবদুল্লাহ'র ফাঁসি হয়। কিন্তু আতঙ্কিত ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তাঁর লাশটিকে কবর দেয়ার অনুমতি না দিয়ে পুলিশী তত্ত্বধানে পুড়িয়ে ফেলে। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের ০৮ ফেব্রুয়ারি ভাইসরয় *লর্ড মেয়ো* (Lord Mayo) আন্দামানের বন্ধিশালা পরিদর্শনে গেলে ওয়াহাবি বন্দি শের আলি খান আফ্রিদি তাকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করেন।[১২৩]

সাহিত্য ও ধর্মের ক্ষেত্রে রেনেসাঁসের যে প্রস্ফুটন ঘটেছিল, তা স্বাভাবিকভাবেই সব থেকে বেশি ছাপ ফেলেছিল জাতীয় রাজনৈতিক সচেতনতার ওপর। প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করছিল জাতীয়তাবোধ; আর তার ঝোকটা একটু বেশি ছিল হিন্দু মানসিকতার দিকে।[১২৪] মুসলিম জাতীয় সচেতনতার অস্পষ্ট আত্মপ্রকাশও এসময়েই দেখা যায়।

ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন তথা ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের কথিত সিপাহী বিদ্রোহ পরবর্তী পর্যায়ে হিন্দু জাতীয় সচেতনতার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিলেন রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-৯৯খ্রি.)। রক্ষণশীল ব্রাহ্মণদের সাথে যুক্ত রাজনারায়ণ বসু ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন 'জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা' এবং জাতীয়তাবোধ উদ্দীপ্তকরণ সমিতি'র একটি প্রস্তাবনাপত্র প্রকাশ করেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, হিন্দু শ্রেষ্ঠত্বই হচ্ছে তাঁর আন্দোলনের মূল সূর। তাঁর সহযোগি ভূদেব মুখোপাধ্যায় নানা প্রবন্ধ এবং ঐতিহাসিক রচনাবলির মাধ্যমে হিন্দিকে জাতীয় ভাষা হিসেবে গ্রহণের মাধ্যমে ভারতীয় ঐক্যসাধনের প্রচারণা চালান।

রাজনারায়ণ বসুর সহযোগি নবগোপাল মিত্র জাতীয় বিদ্যালয়, জাতীয় ছাপাখানা,জাতীয় সংবাদপত্র এবং জাতীয় জিমনেশিয়াম প্রতিষ্ঠা করেন। 'জাতীয় শব্দটি' এতোটাই মুগ্ধতা ছড়ায় যে সাধারণ্যে নবগোপাল মিত্র 'জাতীয় মিত্র' হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে রাজনারায়ণ বসু এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র জ্যোতিন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি *স্বদেশ প্রেমী সভা* (Patriots Association) প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু তাঁদের শ্রেষ্ঠ কীর্তি ছিল ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে হিন্দুমেলা[১২৫] নামক এক বার্ষিক মেলার প্রচলন। হিন্দুমেলার মূল উদ্দেশ্যগুলো সংজ্ঞায়িত হয়েছে গগেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখায়। এগুলোর মধ্যে ছিল-উন্নত জাতীয়তাবোধ এবং স্বাবলম্বী হওয়ার মনোভাব বাড়িয়ে তোলা। অসংখ্য মানুষ সোৎসাহে এই মেলায় যোগদিত। ভারতীয় শিল্প ও হস্তশিল্পের প্রদর্শনী; ভারতীয় উৎপাদকদের উৎসাহিত করা এবং সাধারণ মানুষকে নিজেদের মাতৃভূমি সমন্ধে ওয়াকিবহাল করে তোলা। বাংলা ভাষায় মদনমোহন বসুর দেশপ্রেম মূলক বক্তৃতা হিন্দুমেলার একটি আকর্ষণীয় ঘটনা ছিল। দেশাত্মবোধক গান গাওয়ার রীতিও চালু হয়। গানের প্রথম স্ত্রোস্তটা রচনা করেছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এ সময় দেশাত্মবোধক কবিতা লেখার জোয়ার আসে। বস্তুতপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সহ তৎকালীন যাবতীয় লেখকদের লেখাকেই গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল হিন্দুমেলা। এই মেলার বার্ষিক অধিবেশন গুলো সমগ্র কলকাতাকে আলোড়িত করেছিল। সত্তরের দশকে (১৮৭০খ্রি.) হিন্দুমেলার কিছুটা জঙ্গী হিন্দুত্ব খানিকটা নরম হয়ে আসে; জাতীয় সচেতনতাও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধিপায় এবং জঙ্গী ব্রাহ্ম এবং তাদের সহযোগিরাও এধারায় অন্তর্ভুক্ত হন। এ প্রেক্ষাপটে আধুনিক ধাঁচের লাগাতার রাজনৈতিক প্রচার এবং পাশ্চাত্যের বিভিন্ন ধারণা ও কৌশলের অবাধ ব্যবহার শুরু হয়। এ পর্যায়ে হিন্দুমেলার পদ্ধতিগুলো ম্লান ও পরিবর্তিত হয় এবং তৎপরবর্তী প্রচেষ্টাগুলো অনেক বেশি রাজনৈতিক চরিত্র পায়। হিন্দুমেলার কার্যক্রম এবং তৎপরবর্তী অভিঘাতে কংগ্রেসের উদ্ভব ঘটে।

পরিবর্তনকামী এপর্যায়ে অন্যতম নেতা ছিলেন শিশিরকুমার ঘোষ (১৮৪৮-১৯১১)। সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রমের গঠনমূলক সমালোচনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি যশোর থেকে প্রকাশ করেছিলেন 'অমৃত বাজার পত্রিকা'।[১২৬] ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে তিনি এই পত্রিকার মাধ্যমে ভারতে পাশ্চাত্যধাঁচের সংসদীয় প্রতিষ্ঠান চালুর সুস্পষ্ট দাবি উত্থাপন করেন।[১২৭] এই অমৃতবাজার পত্রিকাই অত্যন্ত জোরের সঙ্গে ঘোষণা করেছিল, শাসক ইংরেজ ও শাসিত ভারতবর্ষের স্বার্থ কখনও এক হতে পারেনা। বস্তুত তাদের স্বার্থই যখন পরস্পরের পরিপন্থি।[১২৮] রাষ্ট্রীয় চেতনার উন্মেষ সাধনে শিশিরকুমার ঘোষ আত্মনিয়োগ করেন। ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত *ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন* নামে জমিদারদের একটি সংগঠনের সদস্যপদ প্রাপ্তিকে গণতান্ত্রিক রীতিসম্মত করে তোলার স্বপক্ষে প্রচারণা চালান। তিনি জনগণের পক্ষে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের অভাববোধ করেন এবং তাঁর উদ্যোগেই সে অভাব পূর্ণ হয়। প্রাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতামুক্ত সর্বভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে শিশিরকুমার ঘোষ ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে *ইন্ডিয়ান লীগ* গঠন করেন।[১২৯] উল্লেখ্য, শিশিরকুমার ঘোষ প্রবর্তিত ইন্ডিয়ান লীগ'র ইন্ডিয়ান শব্দটি ব্রিটিশ ভারত নয়, শুধুমাত্র ভারত-চেতনা ও ভারত ভূখন্ডকেই সূচিত করে।

ইন্ডিয়ান লীগের উদ্দেশ্যগুলোও ছিল তাৎপর্যপূর্ণ–(ক) সর্ব সাাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা বিশেষতঃ এক জাতিত্ববোধের উন্মেষ সাধন; (খ) বিভিন্ন সম্প্রদায়ের স্বত্ত্বরক্ষার নিমিত্ত উপায় নির্ধারণ; (গ) দেশের অর্থোৎপাদিকা শক্তি যাতে সম্যক বিকাশ লাভ করতে পারে, সে উপায় অবলম্বন। এছাড়াও ইন্ডিয়ান লীগের আন্দোলনের ফলেই সরকার ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের কলকাতা সিটি কর্পোরেশনে জনপ্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে নির্বাচন প্রথা প্রবর্তনের আইন বিধিবদ্ধ করে।[১৩০] এ সকল কার্যক্রম মূল্যায়নে ভারতের রাজনীতিতে শিশিরকুমারের দান সহজেই অনুমেয়। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে শিশিরকুমার ঘোষের সাথে মতান্তরের ফলে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী (১৮৪৮-১৯২৫) ও তাঁর বন্ধুরা ইন্ডিয়ান লীগ থেকে সরে দাঁড়ান। তাঁরা ইন্ডিয়ান লীগের ছায়া অবলম্বনে ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে *ভারত সভা* (Indian Association) প্রতিষ্ঠা করেন।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের[১৩১] সহযোগিদের মধ্যে ছিলেন আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় সহ সকলেই ছিলেন নবীন ব্রাহ্ম আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। *ইন্ডিয়া লীগের* অনেকেই *ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনে* যোগদান করার ফলে সংগঠনটি শক্তিশালী হয়। পুরনো প্রজন্মের অবদানকে স্বীকৃতিদানের জন্য ইয়ংবেঙ্গল আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা বর্ষীয়ান রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভারত সভার সভাপতি মনোনীত করা হয়। স্বল্পবিত্ত মানুষের সুবিধার জন্য সদস্য চাঁদা ইচ্ছাকৃতভাবে স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক কম রাখা হয়। বিভিন্ন জেলায় ভারতসভার শাখা এবং বাংলার

বাইরের সংগঠনগুলোর সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা হয়। এভাবে ভারত জুরে জনমত গঠন করার দায়িত্ব সচেতন ভাবেই হাতে তুলে নেয় ভারতসভা। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একপ্রজন্ম ধরে শুধু বাংলার নেতাই ছিলেন না, সেই সঙ্গে তিনি প্রথম সারির সর্বভারতীয় নেতাতেও পরিণত হন। ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে তিনি *বেঙ্গলি* নামে একটি মুখপাত্র প্রকাশ করতে শুরু করেন।

ব্রিটিশ সরকার সিভিল সার্ভিসে নানাবিধ বিধি নিষেধের দ্বারা ভাতীয়দের উচ্চপদে নিযুক্তির ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করতে থাকে। এ বিধিনিষেধ সংস্কারের স্বপক্ষে প্রচার চালাতে ১৮৭৭-৭৮ খ্রিস্টাব্দে বিভিন্ন প্রদেশ সফর শুরু করেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। দুর্ভিক্ষ তহবিলের টাকা আফগান যুদ্ধখাতে বরাদ্ধ করায় ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে এক প্রবল বিক্ষোভ দেখাদিলে সরকার হিংসার আশ্রয় নেয়। ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দের *সংবাদপত্র আইনে* (Vernacular Press Act,1978) দেশীয় সংবাদপত্রগুলোর কণ্ঠরোধ করা হয়। এছাড়া ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দের *অস্ত্র আইনে* (Arms Act) ভারতীয়দের হাতে অস্ত্র থাকা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। প্রজাদের এসকল জনপ্রিয় দাবি নিয়ে মাঠে নামেন এবং প্রচার প্রচারণা চালান ভারত সভার নেতৃবৃন্দ। উৎসাহ যোগায় রায়তদের সমিতি গঠনে। বিভিন্ন জেলায় বিশাল বিশাল জনসভায় ভাষণদেন ভারতসভার বক্তারা। কোন কোন জায়গার জনসভায় দশ থেকে বিশ হাজার লোক হাজির থাকতো বলে কথিত আছে। তাছাড়া *ইলবার্ট বিল* (Ilbert Bill) প্রসঙ্গ তো ছিলই। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে যখন ভারতীয় অফিসারদের হাতে ইউরোপীয়দের বিচারিক ক্ষমতা দেওয়ার আইনটি প্রস্তাবিত হয়; তখন ইউরোপীয়দের মধ্যে একটি প্রবল বিক্ষোভ দেখা দেয়, ঠিক যেমনটি ঘটেছিল কালা আইনের ক্ষেত্রে। ইউরোপীয়দের এ প্রচারণার বিরুদ্ধে ভারতীয়রাও আগ্রহ ও উদ্দীপনার সাথে প্রচারণায় নেমে পড়েন। ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে আদালত অবমাননার দায়ে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কারারুদ্ধ হলে কলকাতা শহর বিক্ষোভে ফেটে পড়ে; এর ফলে সুনিশ্চিতভাবে দেশব্যাপী প্রচার আন্দোলনের গতিবেগ বৃদ্ধি পায়। একদিকে লাগাতার রাজনৈতিক আন্দোলন, অপরদিকে ভাইসরয় *লর্ড রিপনের* (Lord Ripon) গ্লাডস্টোনিয় উদারতাবাদ; এ দুইয়ের ফলে বাস্তবায়িত হয় ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের *প্রজাস্বত্ব আইন* (Tenancy Act) এবং আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন। সংবাদপত্র আইন খারিজ করেছিলেন *লর্ড লিটন* (Rovert Bulwer-Lytton)। কিন্তু ভাইসরয় লর্ড রিপন ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে আইনটি প্রত্যাহার করে নেন। লর্ড রিপনের এই পদক্ষেপ ভারতবাসীর মধ্যে তাঁর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা বোধের জন্ম দেয়।

আশির দশকের প্রথম দিকের চাঞ্চল্যের মধ্যেই রাজনৈতিক কার্যকলাপ চালানোর জন্য একটি জাতীয় তহবিল গড়ে তোলার ধারণা বিকাশ লাভ করে। ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দের ১৭ জুলাই একটি জনসভায় এ ব্যাপারে এক বক্তব্য পেশ করেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিকে ভারত-সভা'র কলকাতা শাখার

উদ্যোগে প্রবীণ ডিরোজীওপন্থি রামতনু লাহিড়ীর সভাপতিত্বে ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় একটি 'সর্বভারতীয় জাতীয় সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়।[১৩২] বঙ্গদেশ, বোম্বাই, মাদ্রাজ, আহমেদাবাদ, নাগপুর, কটক, মীরাট, লাহোর, যুক্ত প্রদেশ প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চলের প্রায় শতাধিক প্রতিনিধি এ সম্মেলনে প্রতিনিধিগণ যোগদান করেছিলেন। সভাপতির ভাষণে তিনি এ সম্মেলনকে 'ভারতের জাতীয় পার্লামেন্ট' আখ্যা দান করেছিলেন।[১৩৩] সম্মেলনটিতে প্রযুক্তিগত শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন, বৃহত্তর কর্মসংস্থান, বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ, প্রতিনিধিত্বশীল সরকার গঠন, অস্ত্রআইন বাতিল করা, সিভিল সার্ভিসের বিধিবিধান সংস্কার, প্রভৃতি প্রস্তাব গ্রহীত হয়।[১৩৪] জাতীয় আন্দোলন পরিচালনার জন্য একটি তহবিল গঠিত হয়। জাতীয় সম্মেলনে এইসব লক্ষ্য ও আদর্শ গভীর উৎসাহের সঞ্চার করেছিল। প্রকৃতপ্রস্তাবে এ সম্মেলনটির মাধ্যমে ইলবার্ট বিল সংক্রান্ত ইউরোপীয়দের আন্দোলনের বিপরীতে এ বিলে শিক্ষিত ভারতবাসীর সমর্থন অনুমিত হয়। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একই উদ্দেশ্যে ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে বিভিন্ন প্রদেশ সফর করেন। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় জাতীয় সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন বসে। এ অধিবেশনে দ্বারভাঙ্গার মহারাজ, নেপালের রাজদূত, মহারাজ নরেন্দ্র কৃষ্ণদেব প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেছিলেন। সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় ছিল, প্রশাসনিক সংস্কার, সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার সংস্কার সাধন, বিচার ও শাসন বিভাগের পৃথকীকরণ ইত্যাদি। এ সম্মেলনটি ২৭ ডিসেম্বর শেষ হয়।

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পূর্বে ভারতীয় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির একটি নিজস্ব জাতীয় রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠায় বহুদূর অগ্রসর হয়েছিলেন এবং তাদের সে প্রচেষ্টা সাফল্যের নিকটবর্তী হয়েছিল। বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির নেতৃত্বে একটি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দল গঠনের সাফল্য যখন আসন্ন হয়ে উঠে তখনই ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধি *অ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম* (Allan Octavian Hume) ভারতীয়দের সে জাতীয় প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রয়াসকে ইংরেজ শাসনের স্বার্থে চালিত ও অনুকূলে রাখবার কৌশল অবলম্বন করেন। সে কৌশলের মারফৎ ভারতীয়দের জাতীয় প্রতিষ্ঠান গঠনের উদ্যোগকে সাময়িকভাবে সরকারি প্রভাবে আনয়ন করে হিউম নিজ উদ্যোগে বোম্বে শহরে[১৩৫] ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন আহ্বান করতে সক্ষম হন।[১৩৬] অর্থাৎ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন ভারত-সভার উদ্যোগে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের ২৭ ডিসেম্বর কলকাতায় সর্বভারতীয় জাতীয় সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন শেষ হয়। এ জাতীয় সম্মেলন শেষ হওয়ার পরদিন অর্থাৎ ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের ২৮ ডিসেম্বর *অ্যালান অক্টোভিয়ান হিউমের* উদ্যোগে এবং বাঙালি ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে বোম্বাই নগরীতে সর্বভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়। হিউমের কূটকৌশল মোতাবেক বোম্বের অধিবেশনে আমন্ত্রণ না জানিয়ে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর

নেতৃত্বাধীন ভারত-সভাকে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা প্রক্রিয়ার বাইরে রাখা হয়। কংগ্রেস গঠনে হিউমের এ প্রচেষ্টায় *লর্ড ডাফরিনের* (Lord Dufferin) সমর্থন ছিল। মোদ্দাকথা, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তথা বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির জাতীয়তাবাদী ও বৈপ্লবিক নেতৃত্ববিহীন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর যে পূর্বপরিকল্পিত উদ্দেশ্য ছিল তা অপূর্ণ থাকেনি। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের অধিবেশনে কংগ্রেসের যে মূলনীতি ঘোষণা করা হয় তা হলো- 'ব্রিটিশ শাসনের প্রতি অবিচল আনুগত্যই হবে জাতীয় কংগ্রেসের মূলনীতি'।[১৩৭] আরও বলা হয়, সরকারের সমালোচনায় কংগ্রেস নরমপন্থা অবলম্বন করবে। প্রভুশ্রেণির প্রতি এরকম আনুগত্য মধ্যবিত্ত শ্রেণির চিরাচরিত জাতীয় স্বার্থকে পদদলিত করার ধারাবাহিকতার ইশারামাত্র। বড়োলাট লর্ড ডাফরিন পূর্ব থেকেই কংগ্রেসকে আর্শীবাদ জানিয়েছিলেন। প্রথম থেকেই তিনি বিপ্লবপন্থিদের পরিবর্তে নরমপন্থিদের দুর্গরূপে কংগ্রেসকে গড়ে তোলার জন্য সচেষ্ট হন। মূলত, কংগ্রেসের জন্ম হয় ব্রিটিশ সরকারের শত্রু হিসেবে নয়; বরং মিত্র হিসেবে। ব্রিটিশ সরকারের প্রধান লক্ষ্য ছিল ভারতের মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে আন্দোলনের পথ থেকে সরিয়ে ব্রিটিশ শাসনের অনুকূলে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলা।[১৩৮] সর্বোপরি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে ভারতের জাতীয় ও রাজনৈতিক জীবনে এক গতিবেগ সঞ্চার করে।

হিউমের কৌশল সত্ত্বেও বাংলার সুবিখ্যাত নেতাদের কংগ্রেসের বাইরে রাখা সম্ভব হয়নি। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে পুরনো সর্বভারতীয় জাতীয় সম্মেলন এবং ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে বোম্বে শহরে গঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যকার দূরত্ব হ্রাসপায় এবং তাদের মেলবন্ধন ঘটে।[১৩৯] এসময় বাংলার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভূপেন্দ্রনাথ বসু, বোম্বের গোপালকৃষ্ণ গোখেল ও ফিরোজ মেটা, মাদ্রাজের সুব্রহ্মণ্যম আয়ার ও দাদাভাই নৌরজী ও অন্যান্য নেতাগণ কংগ্রেসে যোগদান করেন।[১৪০] এ সম্পর্কিত এক রিপোর্টে বলা হয়–১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের কংগ্রেসের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে,সংগঠনটি ছিল সারা দেশের কংগ্রেস।[১৪১] বিভিন্ন সংগঠনের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা এবং নানান গোষ্ঠী কংগ্রেসের এই দ্বিতীয় অধিবেশনে যোগ দিয়েছিল যা প্রথম অধিবেশনে ঘটেনি। স্থানীয় অভ্যর্থনা কমিটি এ অধিবেশনকে অনন্য বৈশিষ্ট্য মন্ডিত করে তোলে। এ কমিটির প্রধান ছিলেন বর্ষীয়ান পন্ডিত রাজেন্দ্রলাল মিত্র। কংগ্রেসের কার্যপরিধি বেড়ে যাওয়াটা সরকারের তরফে খুব সুখকর ছিল না। ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে এলাহাবাদে কংগ্রেসের চতুর্থ অধিবেশনের সময়ই সরকারের অসন্তোষ এবং বাধাদান প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা ততদিনে সুপ্রতিষ্ঠিত।

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার সময় নেতৃবৃন্দের উদ্দেশ্য ও মনোভাব যাই থাকুক না কেনো, দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় সে সময় কংগ্রেসকেই নিজস্ব জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে গ্রহণ করে। প্রথম অধিবেশনের

আহ্বানে সারা দিয়ে দেশের ছাত্র, শিক্ষক, উকিল, কর্মচারী প্রমূখ শিক্ষিত পেশাজীবী শ্রেণির মধ্যে এক বিপুল সাড়া জেগে উঠে। সে আহ্বানকেই তারা জাতীয় আহ্বান হিসেবে গ্রহণ করে। কংগ্রেসের প্রত্যেক অধিবেশনেই প্রতিনিধি সংখ্যা এরূপভাবে বৃদ্ধিপায় যে, নেতৃবৃন্দ ভীত হয়ে প্রতিনিধি সংখ্যা সীমাবদ্ধ রাখার ব্যবস্থা করেন।[১৪২] অচিরেই ভারতের প্রত্যেক প্রদেশ এবং জেলায় জেলায় কংগ্রেস কমিটি গঠিত হতে থাকে। এপথে কংগ্রেসকে উচ্চসম্ভ্রান্ত বংশীয় প্রতিনিধিদের গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখার সকল প্রয়াস ব্যর্থ হয়। কংগ্রেস শীঘ্রই মধ্যবিত্ত শ্রেণির নেতৃত্বে একটি সর্বভারতীয় জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে মাদ্রাজে কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশনে অগণিত সাধারণ মানুষের অল্প অল্প সাহায্যে ভরে উঠেছিল অভ্যর্থনা কমিটির তহবিল। কারিগরশ্রেণির কয়েকজন প্রতিনিধিও এ অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

কংগ্রেসের প্রথম দিকের কাজকর্মে বাংলা স্বাভাবিকভাবেই একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। বাংলার পূর্ববর্তী প্রজন্মের রাজনৈতিক চেতনার বিকাশই গড়ে দিয়েছিল কংগ্রেস সৃষ্টির পথ। একমাত্র প্রথম অধিবেশন ব্যাতীত বাকি প্রতিটি[১৪৩]অধিবেশনেই সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন বাঙালির প্রতিনিধিরা। যেমন: ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে বিনা বিচারে বন্দি করা সংক্রান্ত ফৌজদারি আইন সংশোধন করার বিরুদ্ধে; ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে ভাইসরয় লর্ড কার্জনের ইউনিভার্সিটি কমিশনের বিরুদ্ধে, ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে দিল্লীর দরবারে সরকারি কর্মকর্তাদের অসংযত আচরণের বিরুদ্ধে বাঙালি প্রতিনিধিরাই প্রতিবাদ প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এছাড়াও ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে গঠিত কংগ্রেসের শিল্পগত ও শিক্ষাগত কমিটিসহ বিভিন্ন কমিটিতেও বাঙালি নেতৃবৃন্দের সক্রিয় ভূমিকা স্মরণযোগ্য।

কংগ্রেসের দু'একজন কেন্দ্রীয় নেতা রচনা করবেন যাবতীয় সিদ্ধান্তের খসড়া–এ নিয়মের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনেই প্রতিবাদ করেছিলেন কয়েকজন বাঙালি প্রতিনিধি। ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দের কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশনের প্রকাশ্য অধিবেশনে যেসব সিদ্ধান্ত পেশ করা হবে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করা ও খসড়া রচনার জন্য একটি সাবজেক্ট কমিটি গঠন করতে সংগঠনকে বাধ্য করেছিলেন দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং সিলেটের ব্রাহ্মযুবক বিপিনচন্দ্র পাল। এ অধিবেশনেই দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় যখন আসামের চা বাগানের মজুরদের প্রশ্নটি উত্থাপন করেন, তখন বিষয়টি আলোচ্য সূচিতে অন্তর্ভুক্ত না করে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ব্যাপারটিকে একটি প্রাদেশিক সমস্যা বলে এড়িয়ে যায়। কিন্তু ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে দ্বাদশ অধিবেশনে বাংলার প্রতিনিধিদের[১৪৪] চাপের মুখে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ বিষয়টিকে কার্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করতে বাধ্য হয়। দ্বারকানাথের প্রচেষ্টায় কংগ্রেসের ১৮৮৯ এবং ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দের অধিবেশনে প্রথম মহিলারা প্রতিনিধি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। তাদের মধ্য থেকে ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে

কংগ্রেস অধিবেশনে প্রথম মহিলা হিসেবে বক্তৃতা দেন কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়[১৪৫] ভারতের স্বাধীনতা যে ভারতীয় নারীদের উচ্চ মর্যাদা দেবে-এ বক্তৃতা দান ছিল তাঁরই প্রতীক স্বরূপ।

কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা নেতৃবৃন্দ সারা দেশের অভিযোগ ও সমস্যাবলি মাঝে মাঝে ব্রিটিশ সরকার বরাবর আনুষ্ঠানিকভাবে পেশ করার পন্থাতেই বিশ্বাস করতেন। তাঁরা বিশ্বাস করতেন জনমতের চাপে সরকার আস্তে আস্তে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হবে। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বাংলার অন্যান্য প্রবীণ নেতৃবৃন্দও একই দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী ছিলেন। তাঁদের ধারণা ছিল নিছক বক্তৃতা দিয়েই শাসকদের বিভ্রান্ত ও কিংকর্তব্যবিমুঢ় করে ফেলা যাবে। এ ধারণার বশবর্তী হয়ে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ইংল্যান্ডে নিজেদের বক্তব্য প্রচারের জন্য বছরের পর বছর বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে থাকে। দলটি মূলত ও সমস্যা সমাধানে দাবি দাওয়া উত্থাপনকেই নীতি হিসেবে গ্রহণ করে। দাবিগুলোর মধ্যে ছিল–(ক) কংগ্রেস প্রথম থেকেই স্বায়ত্বশাসনের বিকাশ ঘটানো; (খ) সামরিক ব্যয় হ্রাস,ইন্ডিয়া কাউন্সিলের অবসান ঘটানো; (গ) বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ, ভারতীয় জনগণকে সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদান প্রভৃতি দাবি ব্রিটিশ সরকারের নিকট উত্থাপন করা। এ ব্যাপারে কংগ্রেসের যে বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় তা হলো–ইংরেজ শাসক ও রাজতন্ত্রের প্রতি অবিচল আস্থা এবং ব্রিটিশ সরকারের উদার নীতি ও ন্যায় বিচারের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস স্থাপনের[১৪৬] মাধ্যমে অধিকার আদায়ে সচেষ্ট থাকা। এসব কিছু নিয়েই গড়ে উঠেছিল কংগ্রেসের নরমপন্থি প্রবণতা। এ প্রবণতাই কংগ্রেসকে নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে।

কংগ্রেসের উপর্যুক্ত নরমপন্থার সুস্পষ্ট বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গীর অস্তিত্বও সংগঠনে ছিল; যা পরবর্তী পর্যায়ে সশস্ত্র বৈপ্লবিক পন্থায় পর্যবসিত হয়। মহারাষ্ট্র আর পাঞ্জাবের পাশাপাশি বাংলাতেও সশস্ত্র বৈপ্লবিক পন্থার উদ্ভবের একটি চমৎকার ক্ষেত্র বিদ্যমান ছিল। শুধুমাত্র সভা সমাবেশের মঞ্চে ভাষণ দেওয়ার পরিবর্তে নিজেদের অভ্যন্তরীণ শক্তি সুসংহত করা, আবেদনপত্র দাখিল করার বদলে স্বনির্ভর হয়ে ওঠা, ধরাবাধা পথে গয়ংগুচ্ছ আন্দোলন-সংগ্রাম পরিহার করে সাধারণ মানুষের গভীরে যাওয়ার প্রচেষ্টা ছিল সশস্ত্রপন্থি মনোভাবের বিশেষ প্রবণতা। বাঙালিদের মধ্যে এই নতুনধারার একেবারে প্রথম দিকের প্রবক্তাদের অন্যতম ছিলেন বরিশালের নেতা অশ্বিনীকুমার দত্ত। ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দেই তিনি কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশনেই প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের দাবি সম্বলিত একটি স্মারক লিপি পেশ করেন। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের কংগ্রেস অধিবেশনকে লক্ষ্য করে 'কংগ্রেস প্রতিবছর নিজেকে শুধুমাত্র তিন দিনের তামাসায় আটকে রাখছে'; এ মন্তব্যের মাধ্যমে তিনি কংগ্রেসের কঠোর সমালোচনা করেন।[১৪৭] অশ্বিনীকুমার দত্ত'র থেকে আরও মুখর এবং আরও উচ্চকিত সমালোচক ছিলেন সিলেটের বিপিনচন্দ্র পাল। বিপিনচন্দ্র পালই ছিলেন সদ্য জায়মান সশস্ত্র বিপ্লবপন্থার কেন্দ্র বিন্দু। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে তিনি নতুন ভারত নামে

একটি মুখপাত্র চালু করেন। আসামের মুজুরদের স্বপক্ষে লেখনির মাধ্যমে নিজের বৈপ্লবিক মনোভাবে প্রমাণ রাখতে প্রয়াস পান।

বাংলায় স্বদেশ চেতনার বিকাশ

বাংলার রাজনৈতিক কার্যকলাপ বেড়েই চলছিল। বাংলার মানুষকে সক্রিয় করে তোলার উদ্দেশ্যে ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে গঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন-এর প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ডা. মহেন্দ্রলাল সরকার।[১৪৮] ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর থেকে দলটির উচ্চপর্যায়ের নেতৃত্ব যাঁদের হাতে ছিল; ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দ অব্দি তাঁদের ওপর বেশ কিছু সম্মানীয় নেতা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন। তাঁরা ঐসব কর্তা ব্যক্তিদের ইংরেজ তোষণ নীতির বিরুদ্ধে সরব হয়ে উঠেন। বিপ্লবপন্থি হিসেবে পরিচিত বালগঙ্গাধর তিলক, লালালাজপত রায় এবং বিপিনচন্দ্র পাল ব্রিটিশ শাসকদের প্রতি এই উচ্চপর্যায়ের মধ্যপন্থি নেতাদের আবেদন-নিবেদন নীতির কঠোর সমালোচনা করে বলেন, এতো ব্রিটিশ শাসনে ধন্য হয়ে বড়ো বড়ো কথার ফুলঝুড়ি মাত্র। শুধু তাই নয়, এতিন নেতার বক্তব্য ছিল কংগ্রেস কর্তৃক ব্রিটিশ রাজের প্রতি এধরণের লজ্জাকর তোষণ-বাণী ভারতের জাতীয় সম্মান বোধের পরিপন্থি। 'লাল-বাল-পাল' নামে সমধিক পরিচিতি বিপ্লবপন্থি এই তিন নেতা ঘোষণা করেন, ব্রিটিশ শাসককে আর তোয়াজ নয়; জাতিকে আত্মশক্তিতে বলিয়ান হয়ে প্রতিরোধ ও গণসংগ্রামের ভিতর দিয়ে স্বরাজ অর্জন করতে হবে।[১৪৯]

এ সকল নেতাদের বক্তৃতা শুনে এবং রচনা পাঠ করে সারা ভারতে তরুণ সমাজের একটি অংশ ভয়হীন, আত্মবিশ্বাস দৃপ্ত এবং স্বাধীনতার লক্ষ্যে অবিরাম এক সংগ্রামী চেতনা অর্জন করেছিলেন। ফলস্বরূপ ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের ২২তম অধিবেশনে মধ্যপন্থি কংগ্রেস নেতা দাদাভাই নৌরজী বলেছিলেন, স্বরাজই আমাদের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিৎ।[১৫০] কংগ্রেসের বিপ্লবপন্থি এই তিন নেতার (লাল-বাল-পাল) স্বার্থকতা এখানেই; তাঁরা বিপ্লবী ছিলেন;তাঁদের সে কর্মধারা ভারতের বৈপ্লবিক কর্মকান্ডে গতিসঞ্চার করেছিল।

সর্বোপরি ১৮৮৫ থেকে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কংগ্রেসের আন্দোলনের প্রধান বিষয় ছিল ভারতীয়দের উচ্চপদে নিয়োগ প্রদান এবং প্রশাসনে ভারতীয়দের দাবি সুপ্রতিষ্ঠিত করা। কিন্তু ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে *বাংলা ভাগের* (Partition of Bengal) সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে কংগ্রেসের বিপ্লবপন্থি নেতাগণ মাথাচারা দিয়ে উঠে। প্রতিক্রিয়া স্বরূপ অরবিন্দকুমার ঘোষ, লালালাজপাত রায়, বালগঙ্গাধর তিলক, প্রমুখ বিপ্লবপন্থি নেতৃবৃন্দ আনুগত্য রাজনীতির পরিবর্তে আন্দোলন, বয়কটসহ বৈপ্লবিক আন্দোলনের উপর গুরুত্ব প্রদান

করেন। তাঁরা ভারতীয় সংস্কৃতি বিশেষ করে হিন্দুধর্মের অতীত গৌরবের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাপোষণ করতেন। ফলে বিপ্লবপন্থি কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের আন্দোলন ভারতীয় মুসলমানদের মনে সন্দেহের সৃষ্টি করে। অবশ্য বাংলা বিভাজনের এই ঘটনা বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটায়। বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিপ্লবপন্থি নেতাদের এই আন্দোলন দ্রুত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। ক্রমে এ আন্দোলন সকল শ্রেণি ও পেশার লোকের মধ্যে সম্প্রসারিত হয়।[১৫১]

এদিকে কলকাতায় ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে দেশপ্রেমিক যুবকদের সংগঠন ডন সোসাইটি গঠিত হয়। যোগেন্দ্রনাথ ঘোষের উদ্যোগে *শিল্পগত ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষার উন্নয়নী সভা* (Association for the Advancement of Industrial and Scientific Education) গঠিত হয়। উচ্চতর কারিগরি শিক্ষার জন্য যেসব শিক্ষার্থী বিদেশে প্রেরণ করা হবে, তাদের নির্বাচন ও প্রশিক্ষণ বাবদ বৃত্তির ব্যবস্থা করা ছিল এসভা গঠনের উদ্দেশ্য।[১৫২] অধিকার অথবা অনুভূতির ওপর কোনো রকম আঘাত ঘটলেই উঠতো প্রতিবাদের ঝড়। ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা কর্পোরেশনে নির্বাচিত প্রতিনিধি কমানোর পূর্বাভাস পেয়ে প্রতিবাদে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে অধিকাংশ নির্বাচিত সদস্য পদত্যাগ করেন। ভাইসরয় *লর্ড কার্জন* (George Nathaniel Curzon) ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন সভায় ভাষণদান কালে বাঙালিদের জাতীয় চরিত্র সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য করে বসেন। সে সমাবর্তন সভা তৎক্ষনাৎ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। কার্জনের অশালীন বক্তব্যের প্রতিবাদে বিশিষ্ট আইনজীবি রাসবিহারী ঘোষের সভাপতিত্বে বিশাল জনসভা হয়। বস্তুতপক্ষে বাংলা তখন সুদৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছিল মহান স্বদেশী আন্দোলনের দিকে। সেই সঙ্গে এটাও তখন অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে, ভারতীয় বাঙালিদের জাতীয় চেতনা অবাঙালিদের তুলনায় অনেক উন্নত এবং যে কোন চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে সামর্থ রাখে।

উনিশ শতকের শেষার্ধে বিভিন্ন ধর্মমতের মধ্যে পারস্পারিক সুসম্পর্ক স্থাপন এবং ভারতে হিন্দু পুনর্জাগরনের ক্ষেত্রে স্বামী বিকোনন্দ (১৮৬৩-১৯০২খ্রি.) ছিলেন অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব। একই সাথে ব্রিটিশ ভারতে তিনি ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ধারণাটি প্রবর্তন করেন। কলকাতার এক উচ্চবিত্ত হিন্দু বাঙালি পরিবারে তাঁর জন্ম। ছেলেবেলা থেকেই আধ্যাত্মিকতার প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল। গুরু রামকৃষ্ণ দেবের নিকট থেকে তিনি শেখেন,সকল জীবই ঈশ্বরের প্রতিভূ; তাই মানুষের সেবা করলেই ঈশ্বরের সেবা করা হয়।[১৫৩] তাঁর সর্বাধিক উদ্ধৃত একটি উক্তি হলো–

"বহুরূপে সম্মুখে তোমায় ছাড়ি,কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?

জীবে প্রেম করে যেইজন,সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে তিনি সদস্য হিসেবে কেশবচন্দ্র সেনের নববিধানে যোগদান করেন। পরবর্তীতে তিনি কেশবচন্দ্র সেনের 'ব্যান্ড অব হোপ' এর সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হয়ে যুবসমাজকে ধুমপান এবং মদ্যপানে নিরুৎসাহিত করার চেষ্টা করেন। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি 'স্বামী বিবেকানন্দ' নাম ধারণ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং পরিব্রাজক হিসেবে যাত্রা শুরু করেন। পাঁচ বছর ধরে তিনি ভারতের সর্বত্র ভ্রমণ করেন এবং ভারতের বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় ও সমাজ ব্যবস্থার সাথে পরিচিত হন। এ সময় থেকেই সাধারণ মানুষের দুঃখ কষ্টের প্রতি তাঁর সহানুভূতি জন্মায় এবং তিনি জাতির উন্নতি কল্পে আত্মনিয়োগ করেন। ইতিহাসবিদ সুপ্রকাশ রায় উল্লেখ করেছেন, স্বামী বিবেকানন্দ মনে করতেন, যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা ব্যতীত সমাজ সংস্কার, জনগণের আধ্যাতিক উন্নতি প্রভৃতি কিছুতেই সম্ভব নয়।[১৫৪] এ উপলব্ধি থেকে তিনি বিপ্লবের উদ্দেশ্যে দল গঠন ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের মানসে সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করেছিলেন বলে জানা যায়। এজন্য জাতিকে হীনম্মন্যতাবোধ ত্যাগ করে তিনি যুবকদের উদ্দেশ্যে বলেন, সবল ও সুস্থ্য শরীর ব্যতীত জাতি কোনদিন উন্নতি লাভ করতে পারেনা। তিনি ভারতবাসীকে জড়তা, অলসতা, হীনম্মন্যতা ত্যাগ করে আত্মশক্তিতে বলিয়ান হতে পরামর্শ দেন। সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়ের ভাষায়, বিবেকানন্দ দেশের শোষিত ও নির্যাতিত মানুষের মুক্তি কামনা করেছিলেন। এজন্য তিনি নিজেকে সমাজবাদীও বলেছেন। তিনি চেয়েছিলেন ভারতের দরিদ্র ও নিপীড়িত মানুষের আত্মজাগরণ ঘটুক; আত্মশক্তির উদ্বোধন হোক।[১৫৫] তাঁর সমাজবাদ সম্পর্কে সুপ্রকাশ রায়ের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য, তথাকথিত সমাজবাদী স্বামীজির মতে,...ধর্মীয় ভাবধারার প্লাবনই ভারতে সাম্যবাদ ও রাজনৈতিক জাগরণের পক্ষে অপরিহার্য। অবশ্য এ ধর্মীয় প্লাবন যে পুনর্গঠিত হিন্দুধর্মের অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপধ্যায় প্রবর্তিত ও রামকৃষ্ণ পরমহংস কর্তৃক পরিবর্ধিত নব হিন্দুত্ত্ববাদেরই প্লাবন তা বলাই বাহুল্য।[১৫৬]

১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের ১১ সেপ্টেম্বর শিকাগোর আর্ট ইনস্টিটিউটে প্রথম বিশ্বধর্ম মহাসভার উদ্বোধন হয়। এদিন স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর প্রথম সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। এখানে তিনি ভারত এবং হিন্দু ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করেন।[১৫৭] ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ০৫ জানুয়ারি প্রাচ্যের কলম্বোয় তিনি তাঁর প্রথম প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন। যেখানে পাশ্চাত্যে তিনি ভারতের মহান আধ্যাতিক ঐতিহ্যের কথা বলেছিলেন, সেখানে ভারতে ফিরে তাঁর 'কলম্বো থেকে আলমোরা' বক্তৃতা ছিল জনগণের জন্য নৈতিক অনুপ্রেরণা, বর্ণাশ্রম দূরীকরণ, বিজ্ঞান শিক্ষায় উৎসাহদান, দেশের শিল্পায়ন, দারিদ্র দূরীকরণ করে স্বদেশবাসীদের স্বনির্ভর হওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। যা ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশনা স্বরূপ। এ বক্তৃতা সমূহকে জাতীয়তাবাদী ঐকান্তিকতা ও আধ্যাত্মিক ভাবাদর্শের বলে বিবেচনা করা হয়। তাঁর

বক্তৃতাসমূহ মহাত্মা গান্ধী, বিপিনচন্দ্র পাল এবং বালগঙ্গাধর তিলক সহ আরও অনেক ভারতীয় নেতৃবৃন্দের ওপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছিল।

রাজা রামমোহন রায় এবং কেশবচন্দ্র সেনের মতো স্বামী বিবেকানন্দও বিদেশিদের চোখে এদেশের মর্যাদা বাড়িয়ে তুলতে সফল হয়েছিলেন। কিন্তু ঐদুজনের মতো ধর্মীয় ক্ষেত্রে তিনি প্রতিবাদী ছিলেন না; ছিলেন নিষ্ঠাবান হিন্দু। সেজন্য তাঁর কর্মকান্ড হিন্দু পুনরুত্থানের মনোভাবকে আরও স্পষ্ট করে তুলেছিল। বিদেশে স্বামী বিবেকানন্দ এক সুপ্রাচীন দেশের সাংস্কৃতিক দূত হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার ফলে ভারতীয়দের আত্মমর্যাবোধেরও পুনর্জাগরণ ঘটে। তিনি বলেছিলেন, যে নিজেদের দুর্দশার জন্য তারা নিজেরাই বহুলাংশে দায়ী এবং তার প্রতিকারও নির্ভর করছে তাদেরই ওপর।[১৫৮] তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'রামকৃষ্ণ মিশন' ছিল শিক্ষামূলক, সাংস্কৃতিক, চিকিৎসা সংক্রান্ত এবং দাতব্য কাজের মধ্য দিয়ে জনগণকে সাহায্য করার এক সামাজিক ধর্মীয় আন্দোলনের প্রারম্ভ। তিনি ভারতে ও ভারতের বাইরে হিন্দু ধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলতে সফল হয়েছিলেন। ব্রিটিশ শাসিত ভারতে জাতীয়তাবাদী ধারণার অভুত্থানের প্রেক্ষাপটে জাতীয়তাবাদী আদর্শটিকে তিনি নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। সমাজ সংস্কারক হিসেবে স্বামী বিবেকানন্দের গভীর দেশাত্মবোধ ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে এক নতুনমাত্রা যোগ করেছিল। ভারতের নবজাগরণে স্বামী বিবেকানন্দ যতোটা অবদান রেখেছিলেন ততোটা অন্য কেউ একক ভাবে রাখতে পারেননি। ভারতের সর্বব্যাপী দারিদ্রের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি বলেছিলেন যে, এই দারিদ্র দূরীকরণের জন্যই ভারতে জাতীয় নবজাগরণের প্রয়োজন আছে। তাঁর দর্শনের সাফল্য এই যে, তাঁর জাতীয়তাবাদী ধারণা ভারতীয় দার্শনিক ও রাজনৈতিক নেতাদের প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছিল।

মুসলিমদের সচেতনতা

এতো কিছু সত্ত্বেও বাঙালি হিন্দুদের যে-কোন ধরনের কাজ কর্মে বাঙালি মুসলামান সম্প্রদায়ের সক্রিয় সমর্থনের অভাব ছিল। কিছু বিশিষ্ট মুসলমান কংগ্রেসের সাধে সংশ্লিষ্ট থাকলেও মুসলমান জনমত ধীরে ধীরে একটি নির্দিষ্ট ও স্বতন্ত্র পথের দিকেই অগ্রসর হতে শুরু করেছিল। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস গড়ে ওঠার পর তার পাল্টা সংগঠন হিসেবে সৈয়দ আহমদ[১৫৯] *দেশপ্রেমিক সমিতি* (Patriotic Assciation) গড়ে তোলেন। ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেস *ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে* (Indian Civil Service) লোক নিয়োগের জন্য সারা ভারতে একই সঙ্গে পরীক্ষা নেওয়ার প্রস্তাব করলে সৈয়দ আহমদ এ প্রস্তাবের বিরোধীতা করেন। তিনি যুক্তিউত্থাপন করে বলেন, এই প্রস্তাব বাস্তবায়িত হলে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরাই সকল পদে নিয়োগ লাভ করবে। ইতোপূর্বে ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদ ইউসুফ বেঙ্গল কাউন্সিলে মুসলমানদের জন্য আসন সংরক্ষণের জন্য দাবি জানিয়েছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসি

জাতীয়তাবাদীরা মুসলমানদের এ সকল দাবি-দাওয়াগুলোকে একবাক্যে প্রতিক্রিয়াশীল হিসেবে নিন্দা করেন। কংগ্রেসের মধ্যেও মুসলমান রয়েছেন; এই ব্যাপাটিই তাঁদের ঐ বিশ্বাসকে আরও জোরদার করে তোলে। মুসলমানদের দাবিগুলোকে ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক দাবি হিসেবে খারিজ করে দেওয়া হতো। কিন্তু একটি ব্যাপার তারা কিছুতেই বোঝার চেষ্টা করতেন না যে, মুসলমান ধর্মীয় নেতারা কংগ্রেসের প্রতি বন্ধু ভাবাপন্ন হলেও মুসলমানদের শ্লোগানগুলো বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির শুধুমাত্র সেই অংশটির স্বার্থকেই প্রতিফলিত করতো; যে অংশটি ছিল পশ্চাতপদ এবং ঘটনাচক্রে তারা ছিল মুসলমান।

সামগ্রিক জনসাধারণ সমন্ধে হিন্দুদের প্রধান যুক্তি ছিল যে, জনসাধারণের মধ্যে ধর্মীয় ব্যাপারে কোনরকম *বিচ্ছিন্নতাবাদী* (separatist) মনোভাব নেই। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেনঃ বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাবের অনুপস্থিতিটা নিতান্তই একটি নেতিবাচক ব্যাপার। এর মধ্যে কোন ইতিবাচক অর্ন্তবস্তু নেই। অর্থাৎ, আমাদের মধ্যেকার প্রকৃত একতার জন্যই যে আমরা আমাদের পার্থক্য সমন্ধে উদাসীন হয়ে পড়েছি, তা আদৌ সঠিক নয়। আসলে আমাদের পৌরুষের অভাবেই এই উদাসীন্য আমাদের গ্রাস করতে সক্ষম হয়েছে।[১৬০]

বঙ্গীয় রেনেসাঁসের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১খ্রি.) ছিলেন একাধারে কবি, সঙ্গীতজ্ঞ, কথা সাহিত্যিক, নাট্যকার, চিত্রশিল্পী, প্রাবন্ধিক, দার্শনিক, শিক্ষাবিদ ও সমাজ সংস্কারক। মূলত কবি হিসেবেই তাঁর প্রতিভা বিশ্বময় স্বীকৃত। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে গীতাঞ্জলি কাব্যের জন্য তাঁকে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। এশিয়া মহাদেশের বিদগ্ধ ও বরেণ্য ব্যক্তিদের মধ্যে তিনিই প্রথম এই পুরস্কার জয়ের গৌরব অর্জন করেন। তিনি কেবল তাঁর কালের কবি নন, তিনি কালজয়ী। বাংলা কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর আবির্ভাব এক নবযুগের সূচনা করে। মানুষের কীর্তি মহীরুহের মতো আকাশে বাতাসে-বাতাসে-শাখা প্রশাখা বিস্তার করে দাঁড়ালেও মাটির সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগটুকু হারাতে পারেনা। সেই মাটির বন্ধন রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে হলো উনিশ শতকের বাংলাদেশে নব-জাগরণের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র।[১৬১]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের ০৭ মে (১২বঙ্গাব্দের ২৫বৈশাখ) কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। উনিশ শতকের বাঙালি নবজাগরণ এবং ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলনে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের ভূমিকা বিশেষ স্মরণযোগ্য। এ যুগের অন্যতম সমাজ সংস্কারক এবং একেশ্বরবাদের প্রবক্তা রাজা রামমোহন রায় ছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। রামমোহন রায়ের নীতি ও আদর্শ

দ্বারকানাথ, তাঁর পুত্র দেবেন্দ্রনাথ এবং দৌহিত্র রবীন্দ্রনাথের ওপর এক অভাবনীয় প্রভাব বিস্তার করে। এ ঠাকুর পরিবার ছিল সে যুগের সাহিত্য, সংস্কৃতি, মুক্তচিন্তা ও প্রগতিশীল ভাবধারার অন্যতম পীঠস্থান। হিন্দুমেলায় পঠিত তাঁর কবিতা *হিন্দুমেলার উপহার* এর ফলশ্রুতিতে রবীন্দ্রনাথ জ্ঞানাঙ্কুর সাহিত্যপত্রে সেকালের বিখ্যাত লেখকদের সঙ্গে স্থান পেয়েছিলেন। যে স্বদেশী চেতনা দেবেন্দ্রনাথে পরিবারে বিকাশ লাভ করেছিল, তারই আনুকূল্যে প্রবর্তিত হয় হিন্দুমেলা। বাঙালির জাতীয় চেতনার উন্মেষ ও বিকাশের ইতিহাসে হিন্দুমেলা বিশেষভাবে স্মরণীয়।[১৬২] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন তাঁর পিতার আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক। ব্রাহ্মসমাজে এসময় নানারকম দ্বিধা ও অনিশ্চয়তা বিরাজমান ছিল। সে যুগের কলকাতার ধর্মান্দোলনের সময় তরুণ রবীন্দ্রনাথ নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেন।

রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে ইংরেজ সরকারের নিকট আবেদন-নিবেদন রেওয়াজটিকে ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেন রবীন্দ্রনাথ।[১৬৩] অতঃপর ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে শাহজাদপুরে জমিদারি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব প্রাপ্তির মাধ্যমে তাঁর জীবনের নতুন আরেকটি অধ্যায় শুরু হয়। এসময়ে তিনি জনজীবনের কাছাকাছি যাওয়ার সুযোগ পান। অত্যন্ত ঘনিষ্টভাবে দরিদ্র মানুষের সাধারণ জীবন পর্যবেক্ষণ করেন। ফলে রচিত হয় বাংলা সাহিত্যের অপূর্বসম্পদ গল্পগুচ্ছের গল্পগুলো।

রবীন্দ্র প্রতিভার পূর্ণদীপ্তির বিচ্ছুরণ ঘটায় সাধনা পত্রিকা[১৬৪] এ পত্রিকায় তিনি ছোটগল্প ও প্রবন্ধ লিখতেন। তাঁর শিক্ষা বিষয়ক মতামত ও রাজনৈতিক আলোচনা সম্বলিত লেখা এ পত্রিকাতেই ছাপা হতো। শিক্ষা ও রাজনৈতিক বিষয়ে কবির দৃষ্টিভঙ্গী ছিল স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ। রবীন্দ্র মানসে রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার যে বৈশিষ্ট্য দেখা যায় তা হলো ইউরোপের জীবন ও রাষ্ট্রকেন্দ্রিক। পক্ষান্তরে ভারতের জনজীবন সমাজকেন্দ্রিক। ইউরোপের ইতিহাস হল রাষ্ট্র, শাসন, আইন ও বিচারের ইতিহাস। ভারতের ইতিহাস হলো সামাজিক জীবন, আচার-আচরণ, সংস্কৃতি ও জীবনচর্যার। এক কথায় লোকায়ত জীবনের ইতিহাস। সাধারণ মানুষের হাসি কান্না, সুখ দুঃখ, ভালো মন্দ এ ইতিহাসের বিষয়। ব্রিটিশ এদেশের রাষ্ট্রের ওপর কর্তৃত্ব করুক ক্ষতি নেই। রাষ্ট্র নেতাদের কাজ হবে সমাজের ভিতরে পরিবর্তন ঘটানো। তাতেই দেশের প্রকৃত উন্নতি। সামাজিক জীবনে ঐক্য ও সমন্বয় প্রতিষ্ঠা ভারতের রাজনৈতিক লক্ষ্য।[১৬৫] রবীন্দ্রনাথ সব সময়ই গঠনমূলক কাজের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। নিজের জাতি সমাজ ও দেশকে উত্তমরূপে জানা, বৃহত্তর মানবিক নীতিবোধ দিয়ে নিজেদের সংশোধন করে চলা এবং বিদেশি শাসকের ভিক্ষার দানে নির্ভরশীল না থেকে আত্মশক্তিতে উজ্জীবিত হয়ে ওঠার উপায় অন্বেষণ করাই ছিল তাঁর প্রবন্ধ মালার মূলবক্তব্য। এ সময়ের প্রবন্ধমালায় একদিকে ফুটে ওঠে বাঙালি সমাজের নানা

দিক নিয়ে তাঁর চিন্তাভাবনা, আর অন্যদিকে ভারতের ঐতিহ্য, তার আধ্যাত্মিক প্রকৃতি এবং ঐক্য সাধনার ধারার স্বরূপ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কখনও সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হননি। তবে সমসাময়িক ঘটনা প্রবাহ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্নও রাখেননি; বরং তিনি ছিলেন স্বাদেশিকতার বরেণ্য পুরুষ। ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে তিনি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলা ভাষা চালুর স্বপক্ষে সরব হয়ে উঠেন।[১৬৬] ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় যে কংগ্রেস সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, 'বন্দে মাতরম্' গান গেয়ে তিনি তার উদ্বোধন করেন। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে মহারাষ্ট্রে বালগঙ্গাধর তিলক শিবাজী উৎসবের প্রবর্তন করেন।[১৬৭] তারই প্রেরণায় কবি রচনা করেন তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'শিবাজী উৎসব'। জাতীয় আন্দোলনের আভ্যন্তরীণ সংহতির আহ্বান জানিয়ে সাধনা, বঙ্গদর্শন ও ভারতী পত্রিকায় রাজনৈতিক প্রবন্ধ লেখনী এবং জনসমূদ্রে ভাষণ দেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি গঠনমূলক জাতীয়তাবাদের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন এবং গ্রামকে প্রাথমিক একক হিসেবে নিয়ে কুটির শিল্প, কৃষকদের সহযোগীতা ও হিন্দু-মুসলমান সৌহার্দ্যকে উৎসাহিত করে স্বনির্ভরতার ভিত্তিতে সমাজ-জীবনের পুনর্গঠনের কথা বলেন। এবং তিনি জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে ক্রমশ বেড়েচলা বৈপ্লবিক পন্থার দিকেই ঝুকে পড়েন। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি শিবাজী উৎসব[১৬৮] উদযাপন করার প্রচেষ্টাকে সমর্থন জানান। এই উৎসব ভারতবর্ষের সবথেকে অগ্রসরমান দুটি জাতিকে[১৬৯] কাছাকাছি নিয়ে আসার সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু এই উদ্দীপনার মধ্যেও জাগ্রত ছিল তাঁর শুভবুদ্ধি। তাই তিনি স্পষ্ট করেই বলতে পেরেছিলেন,শিবাজী উৎসবের অঙ্গ হিসেবে দেবি ভবানীর পুজো শুরু করা হলে তা অহিন্দুদের[১৭০] সুনিশ্চিতভাবেই বিচ্ছিন্ন করে দেবে।[১৭১]

১৯০১ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ শান্তি নিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম নামে একটি স্কুল স্থাপন করেন। পরে স্কুলটির নামকরণ করা হয় শান্তনিকেতন বিদ্যালয়। এখানকার জীবনযাত্রা ছিল প্রাচীন ভারতীয় তপোবনের আদর্শে পরিচালিত। এখানে ছিল গুরুর সাহচর্যে শিষ্যের নিবিড়, সরল ও অনাড়ম্বর জীবন। পরবর্তী সময়ে বিশ্বভারতীর মধ্য দিয়ে তিনি প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন বিশ্বের প্রতি ভারতের আতিথ্য, ভারতের চর্চা, জগতের সংস্কৃতিতে ভারতের ঔৎসুক্য, ভারতের নিষ্ঠা এবং মানব প্রেম। শান্তিনিকেতন পর্বে রচিত চোখের বালি, নৌকাডুবি এবং গোরা উপন্যাসে একদিকে জীবনের বাস্তবতা, মনস্তত্ত্ব এবং অন্যদিকে স্বদেশের নানা সমস্যার চিত্র তিনি তুলে ধরেন। জাতিগত সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে চিরন্তন ভারতবর্ষকে কবি এখানেই আবিষ্কার করেন। ভারতীয় রাজনীতির এক জটিল মেরূকরণ প্রক্রিয়ার[১৭২] সাথে তিনি ব্যাপৃত

হয়ে পড়েন। ভারতবর্ষের জাতীয় প্রকৃতি ও তার ইতিহাসের ধারা তাঁর কাছে হয়ে ওঠে গভীর অর্থবহ। কবির শান্তিনিকেতন বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে বিশ্বভারতীতে রূপান্তরিত হয় ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে।

বাংলা বিভাগ এবং স্বদেশী আন্দোলন

বাংলার ক্রমবর্ধমান জাতীয় চেতনা ব্রিটিশ সরকারকে আতঙ্কিত করে তোলে। সরকার এ আন্দোলনকে দুর্বল করে দেয়ার উদ্যোগ নেয়। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ২০ জুলাই *বৃহৎবাংলা প্রদেশকে বিভক্ত* (Partition of Bengal) করে পূর্ব বাংলা ও আসাম নামে নতুন প্রদেশ সৃষ্টির সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়। বলা হয়, প্রশাসনিক এ আদেশ ১৬ অক্টোবর থেকে কার্যকর হবে। বাংলা বিভক্তি সংক্রান্ত সরকারি এ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে কংগ্রেসের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা আন্দোলন *বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন* (Anti-Partition Movement in Bengal) নামে পরিচিতি পায়। পরবর্তী পর্যায়ে এ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনটি স্বদেশী আন্দোলনে পর্যবেসিত হয়।

নবীনব্রাহ্ম ও অধ্যাপক কৃষ্ণকুমার মিত্র তাঁর সঞ্জীবনী প্রত্রিকায় বাংলা বিভক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের অংশ হিসেবে বিদেশী পণ্যদ্রব্য বর্জন করে শুধুমাত্র স্বদেশী দ্রব্যসম্ভার ব্যবহার করার আহ্বান জানান। তাঁর এ আহ্বানে কলকাতা ও কলকাতার বাইরে দ্রুতই সারা মেলে। বিশাল বিশাল সভা-সমাবেশের মাধ্যমে সংগ্রামী জনতা বিদেশি বস্ত্রের ব্যবহার পরিত্যাগ করার শপথ নেয়।[১৭৩] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর বঙ্গদর্শন কাগজে বাংলার অখন্ডতার ওপর এ আক্রমণের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে রুখে দাঁড়ানোর জন্য বাংলার মানুষের সুদৃঢ় সঙ্কল্পের কথা ঘোষণা করেন। মানুষের নিকট তিনি নিজের অন্তর্নিহিত শক্তির ওপর নির্ভর করার আহ্বান জানান। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ০৭ আগস্ট কলকাতা টাউন হলের জনসমাবেশ জনসমুদ্রে পরিণত হয়। হলের মধ্যে ও চারপাশে বিশাল জনসমাবেশে মানুষের মনোভাব মূর্ত হয়ে ওঠে। স্পষ্টভাবে সংগ্রামের ধ্বনি উচ্চারিত হয়। পূর্ণউদ্যমে সংগ্রাম শুরু হয়। বিলিতি পোষাক এবং বিলাসীপণ্য সামগ্রী পরিত্যক্ত হতে থাকে। স্বেচ্ছাসেবকরা বাড়িতে বাড়িতে ঘুরে মোটা স্বদেশী কাপড় ফেরি করতে শুরু করে। এ সকল কার্যক্রমের মাধ্যমে বাঙালি জাতির মধ্যে এক নবজাগরণ ঘটে। এ বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ বাংলার বাইরেও আছরে পড়ে। এধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়ে পূর্ববাংলা,আসাম ও উড়িষ্যা-সহ যুক্তপ্রদেশ,পাঞ্জাব,বোম্বাই,মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি প্রভৃতি অঞ্চলে দ্রুতই সম্প্রসারিত হয়।

বাঙালি অভিজাত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির আন্দোলনের[১৭৪] সঙ্গে বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট মুসলমান নেতৃবৃন্দও এ সম্পৃক্ত হন। তাঁরা হলেন ব্যারিস্টার আবদুর রসুল, ব্যবসায়ী স্যার আবদুল হালিম গজনবি এবং

জনপ্রিয় নেতা লিয়াকত হোসেন। কলকাতা এবং রাজ্যের অন্যান্য জেলাগুলোতে চরমভাবে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছিল। সংগ্রাম চালিয়ে নেয়ার জন্য মনোরঞ্জনগুহ ঠাকুরতার ব্রতী সমিতি, সুরেশচন্দ্র সমাজপতির বান্দেমাতেরম্ দল, দক্ষিণ কলকাতায় যুবকদের সনাতন সম্প্রদায় ইত্যাদি নানা নামের সংগঠন দিকে দিকে গড়ে উঠেছিল। কিন্তু উল্লেখ্য যে,শ্রমিক কিম্বা কৃষকদের সংগঠিত করা ও তাদেরকে আন্দোলনে সম্পৃক্ত করার কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি।

বাংলা বিভাগ

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ১৬ অক্টোবর লর্ড কার্জন কর্তৃক প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের স্বার্থে এবং মুসলমান অধ্যুষিত অনুন্নত ও অবহেলিত পূর্ব বাংলার উন্নয়নে বাংলা প্রদেশকে বিভক্ত করে (Partition of Bengal) পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশ সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু ভারতীয় কংগ্রেস বাংলা ভাগকে সুনজরে দেখেনি। এই বিভাজনকে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ব্যঙ্গ করে নাম দেয় বঙ্গভঙ্গ। বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির ইশারায় ভারতীয় কংগ্রেস এই বাংলা ভাগের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। কালক্রমে বাংলা ভাগের বিরুদ্ধে কংগ্রেস পরিচালিত আন্দোলন ও সংগ্রাম *বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন* (Anti-Partition Movement in Bengal) নামে পরিচিতি পায়।[১৭৫] এ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা বিভাজনের তীব্র বিরোধিতা করেন। আন্দোলনের অংশহিসেবে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ বাংলা বিভক্তি বাতিলের দাবিতে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ১৬ অক্টোবর দেশব্যাপি ধর্মঘট পালনের সিদ্ধান্ত নেয়।[১৭৬]

এ দিন এক বিচিত্র ও স্মরণীয় প্রতিবাদে ভাস্মর হয়ে ওঠে সারা বাংলা। নেতৃবৃন্দ রাখিবন্ধন উৎসব পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ[১৭৭] করেন। বাংলাবিভক্তি রদ না হওয়া পর্যন্ত প্রতিবছর এই দিবস পালনের সিদ্ধান্ত হয়। রাখীবন্ধন ছিল বাঙালিদের ভ্রাতৃত্বমূলক ঐক্যের প্রতীক,যেঐক্য অচ্ছেদ্য।এই দিনটিকে শোকদিবস হিসেবে পালন করার জন্য প্রতিটি বাড়িতে অরন্ধন উদযাপনের আহ্বান জানানো হয়। এই দিনটিকে স্মরণ করে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত যে গানটি জনতার কণ্ঠে কণ্ঠে রাস্তায় রাস্তায় শোভাযাত্রার মধ্যে ধ্বনিত হয় বিখ্যাত সে গানটি হলো–

বাংলার মাটি,বাংলার জল,বাংলার বায়ু,বাংলার ফল
পূণ্য হউক,পূণ্য হউক, পূণ্য হউক হে ভগবান।[১৭৮]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রজনীকান্ত সেনসহ আরও অনেকের দেশাত্মবোধক গানে, বিপিনচন্দ্র পাল ও কয়েকজন গণপ্রচারকের জ্বালাময়ী বক্তৃতায়, প্রতিটি সংবাদপত্রের বৈপ্লবিক লেখায় আন্দোলিত হয়ে উঠে দেশ। বিকাল বেলা বর্ষীয়ান নেতা আনন্দমোহন বসু অবিভাজ্য বাংলার প্রতীকস্বরূপ *মৈত্রী ভবন* (Federation Hall) উদ্বোধন করেন।[১৭৯] বোদ্ধা মহলের ধারণা ফরাসি বিপ্লবের সময়কার মৈত্রী

উৎসবের কথা স্মরণে রেখেই এরকম নামকরণ করা হয়েছিল। সন্ধ্যাবেলা উত্তর কলকাতায় এক মিছিল বের হয়। এমিছিল থেকে তাঁতশিল্প রক্ষা এবং সেলাই প্রশিক্ষণ বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য নগদ অর্থ সাহায্যের আবেদন জানানো হলে সে দিনই পঞ্চাশ হাজার টাকা চাঁদা সংগৃহীত হয়।

এদিকে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ১৬ অক্টোবর কংগ্রেসের নেতৃতাধীন বাঙালি হিন্দুদের এহেন কর্মসূচির প্রতিবাদে এবং *বাংলা বিভাগ* (Partition of Bengal) বহাল রাখার পক্ষে ২২ অক্টোবর ঢাকার নবাব স্যার সলিমুল্লাহ'র নেতৃত্বে বাঙালি মুসমান নেতৃবৃন্দ নানা কর্মসূচি পালন করেন।[১৮০] এ ধারাবাহিকতায় ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর ঢাকার শাহবাগে নবাব স্যার সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ নামে একটি রাজনৈতিক দলের আত্মপ্রকাশ ঘটে।

'স্বদেশী জিনিস কিনুন' এ আহ্বানের মাধ্যমে স্বদেশী আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী বুর্জোয়ারা দেশীয় শিল্পগড়ে তোলার একটি কার্যকরী পথ খুঁজে পায়। জাতীয় ব্যাংক, বীমা কোম্পানি, বয়নশিল্প, সাবান ও চামড়া কারখানা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। অনেক ক্ষেত্রেই এ শিল্পকারখানা গুলো খুব একটা লাভের মুখ দেখতে পারেনি। বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রতিষ্ঠা করেন তাঁর বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান বেঙ্গল কেমিক্যাল। অসংখ্য স্বদেশী দোকান দেশীয় পণ্যসামগ্রীতে ভরে ওঠে।[১৮১] ছাত্রদের পিকেটিংয়ের সঙ্গে সংঘর্ষ হয় পুলিশের। ছাত্রসমাজকে এ আন্দোলন থেকে দূরে রাখতে সরকার একের পর এক সার্কুলার জারি করে। সরকার *ডিক্রি* (circular) জারি এবং চাবুক মেরে শায়েস্তা শুরু করে। প্রতিবাদে ছাত্ররাও গড়ে তোলে সরকারি *ফতোয়া বিরোধী সমিতি* (Anti-circular Society)। বর্ষীয়ান নেতা শিবনাথ শাস্ত্রী ছাত্রদের সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করার আহ্বান জানান। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ০৯ নভেম্বর এক প্রতিবাদ সভায় সুবোধচন্দ্র মল্লিক জাতীয়শিক্ষা চালু করার জন্য এক লক্ষ টাকা দান করেন। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের ১১ মার্চ *জাতীয় শিক্ষা পরিষদ* (National Council of Education) গঠিত হয়। যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এ আন্দোলনের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে।

১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের ২৭ ফেব্রুয়ারি কলকাতার কলেজ স্কোয়ারে বিলিতি কাপড় পোড়ানো হয়। তার পর নানা জায়গায় কাপড় পোড়ানোর মহোৎসব চলতে থাকে। কলকাতার পাশাপশি বিভিন্ন জেলার মধ্যে বরিশাল অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করেন।[১৮২] ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের ১৪ ও ১৫ এপ্রিল বরিশাল শহরে স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম নেতা ব্যারিস্টার আবদুর রসুলের সভাপতিত্বে প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু ইতোপূর্বেই সরকার কর্তৃক পূর্ব বাংলায় *বন্দেমাতরম্* শ্লোগান দেওয়া বেআইনি ঘোষণা করেছিল।[১৮৩] কিন্তু নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করে উদ্দীপ্ত যুবকেরা সম্মেলনে 'বন্দেমাতরম্' শ্লোগান দেওয়ার

কারণে তাদেরকে পুলিশী লাঠি বর্ষণের শিকার হতে হয়। অবশ্য অধ্যাপক কৃষ্ণকুমার মিত্র সরকারি নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করে সভার কাজ চালিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দেয়া সত্ত্বেও পরের দিন সম্মেলন ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছিল। এ ঘটনায় পুলিশ কর্তৃক কংগ্রেস নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রেফতার ও জরিমানা দিয়ে মুক্তি লাভ সত্ত্বেও স্বদেশীরা দমে যায়নি।[১৮৪]

বরিশালে পুলিশী অনাচারের প্রতিবাদে বাংলার সর্বত্র,বিশেষত কলকাতায় অসংখ্য জনসভার মাধ্যমে বৈপ্লবিক মন্ত্রে উদ্ভুদ্ধ জনতা ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। যুবকরা প্রতিশোধ পরায়ণ ও ক্রোধে ফেটে পড়ে। এ সময় বাঙালি নেতাদের মধ্যে আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী একদল লোকের উদ্ভব হয়। তারা ঘোষণা করেন–'ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ',।[১৮৫] অর্থাৎ,আবেদন নিবেদন বা ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা কোন জাতি স্বাধীনতা লাভ করতে পারেনি,তারাও পারবেন না।

বিপ্লবপন্থা ও সশস্ত্র বৈপ্লবিক কর্মকান্ড

বরিশালের ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্বদেশী আন্দোলনের ছোয়ায় চরমপন্থার নিভ্যন্ত আগুন আবার চতুর্দিকে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে। শিবাজী উৎসবে নিমন্ত্রিত হয়েই ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের ০৪ জুন বালগঙ্গাধর তিলক কলকাতায় আসেন। কলকাতাবাসীরা বালগঙ্গাধর তিলককে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত করে। অতঃপর অপরাহ্নে তিনি মেলার উদ্ভোধন করেন। তিলক মহাশয় মেলাকে *রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত উৎসব* (Political Festival) হিসেবে ব্যাখ্যা করেন।[১৮৬] যৌবনের উৎসব হিসেবে সরলাদেবি আয়োজন করেন *বীরাষ্টমী* উৎসবের।

খুব দ্রুতই বিপ্লবপন্থিদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে উপনীত হন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদের প্রচারক এমানুষটি চুম্বকের মতো করে যুবকদের আকর্ষণ করতেন। তাদের মনে জ্বালিয়ে দিতেন প্রত্যক্ষ সংগ্রামের অগ্নিশিখা। তাঁর মুখপত্র *সন্ধ্যা* দেশের একটি বিশেষ শক্তিতে পরিণত হয়। মন্ত্রমুগ্ধ করে তোলে পাঠকদের। রাজদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত ঋষিতুল্য এই মানুষটি আদালতের কর্তৃত্ব অস্বীকার করে আদালতে কোন কথা বলতে স্বীকৃত হননি। বিচার চলাকালীন সময়েই ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের ২৭ অক্টোবর তিনি মৃত্যুবরণ করেন। অতঃপর ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে যারা আবির্ভূত হন তাঁদের মধ্যে বিশিষ্টতম ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল। ভারতবর্ষ ভারতবাসীর জন্য–এ আদর্শকে সামনে রেখে তিনি ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের ০৬ আগস্ট *বন্দেমাতরম্*[১৮৭] পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করেন। এ পত্রিকারই সম্পাদক হিসেবে বাংলার রাজনীতিতে ঝড়োগতিতে আবির্ভূত হন অরবিন্দ ঘোষ।[১৮৮]

অরবিন্দকুমার ঘোষ ছিলেন স্বদেশপ্রেমিক রাজনারায়ণ বসুর দৌহিত্র। তিনি আশৈশব ইংল্যান্ডে শিক্ষা লাভ করেন। আইসিএস পরীক্ষায় অন্যান্য বিষয়ে কৃতিত্ব দেখালেও তিনি অশ্বারোহনে অপারগ হন। এজন্য স্বদেশে ফিরে এসে গুজরাটের বরোদায় কলেজে উপাধ্যক্ষ পদে নিয়োজিত হন। এ পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালীন সময়ে তাঁর হৃদয়ে স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন উদিত হয়। অনেকাংশে তাঁরই অনুপ্রেরণায় বাংলাদেশে বৈপ্লবিক আন্দোলনের উদ্ভব ঘটে।[১৮৯] তিনি বলেছেনে–জাতীয়তাবাদ হচ্ছে একটি পবিত্র ধর্ম।[১৯০] বিপ্লবপন্থি পত্রিকাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল নবশক্তি ও যুগান্তর। যুগান্তরের সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন সুপন্ডিত এবং প্রগতিশীল চিন্তাবিদ হিসেবে যিনি আজও সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। যুবকদের মধ্যে অনুশীলন সমিতিসহ বিভিন্ন বিপ্লবপন্থি সশস্ত্র বৈপ্লবিক গ্রুপ গড়ে ওঠে ।

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ মনপ্রাণ দিয়ে ঝাপিয়ে পড়েছিলেন স্বদেশী আন্দোলনে। পরিণত হন এ আন্দোলনের প্রধান কবি ও প্রচারকে। দেশপ্রেমে উদ্দীপ্ত তাঁর গান,বক্তৃতা আর প্রবন্ধগুলো পুরো আন্দোলনটিকে দীপ্ত করে তুলেছিল এক চমৎকার আবেশিক সৌন্দর্যে। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনে হিংসারপথ অবলম্বিত হওয়ায় ক্রমাগত তিক্ততা বৃদ্ধিপায়। এহেন প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথের সংবেদনশীল মন কুৎসিত প্রবণতাগুলোর সংশ্রব ত্যাগ করে সরে আসতে বাধ্য হন। তিনি অনুভব করেন এই দেশের মানুষের হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটানো একান্ত দরকার। প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জনের জন্য একটি সামাজিক সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ একান্তই অপরিহার্য। স্বদেশী আন্দোলনের গৃহীত কৌশলের সঙ্গে একমত হতে না পেরে তিনি নিজেকে সরিয়ে নেন তাঁর ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয়ের নির্জনতার চৌহদ্দিতে। সাহিত্য সৃষ্টির মগ্নতা তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলে।[১৯১]

কংগ্রেসের ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের কলকাতা অধিবেশনে স্বরাজের লক্ষ্য গৃহীত হলেও ১৯০৬ এবং ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে গুজরাটের সুরাট অধিবেশন কার্যত পরিণত হয়েছিল নরমপন্থি ও বিপ্লবপন্থিদের রণক্ষেত্রে। গুজরাটের সুরাট অধিবেশনে কংগ্রেসে ভাঙ্গন ধরে। বিপ্লবপন্থিরা দূরে সরে যায়। এভাঙ্গনের পর নরমপন্থিরা দলটিকে আগলে রাখে।[১৯২]

১৯০৭-০৮ খ্রিস্টাব্দ সময়কালে বাংলা বিভাজন বিরোধীদের ওপর পূর্ণমাত্রায় সরকারি অত্যাচার[১৯৩] চালানো শুরু করে। এহেন অত্যাচারে ক্রুদ্ধ বিপ্লবপন্থি তথা প্রতিবাদী এবং বৈপ্লবিক চিন্তা ও চেতনার অধিকারী যুবকেরা হিংসার পথে পা বাড়াতে শুরু করে। লেফটেন্যান্ট গভর্নর *স্যার অ্যান্ড্রু ফ্রেজার* (Sir Andrew Fraser) এর ট্রেন উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের ৩০ এপ্রিল ঘটে বিহারে মুজাফফ্রপুরের ঘটনা। চুপিসারে দু'জন সশস্ত্রবিপ্লবী রাজদ্রোহ মামলার বিচারক *কিংসফোর্ডকে*

(Douglas Kingsford) খতম করতে গিয়ে ভুলবশত দু'জন ইংরেজ মহিলাকে হত্যা করে বসেন। প্রফুল্ল চাকি পুলিশী গ্রেফতার এড়াতে আত্মহত্যা করেন এবং ক্ষুদিরাম বসু পুলিশের হাতে গ্রেফতার হন। বিচারের রায়ে ক্ষুদিরাম ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ বিসর্জন দেন।

পুলিশবাহিনী ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের ০২ মে কলকাতার মানিকতলা অঞ্চলে একটি বোমা তৈরি কারখানার হদিস পায়। একদল বিপ্লবী গ্রেফতার হন,অরবিন্দকুমার ঘোষও গ্রেফতার এড়াতে পারেননি। শুরু হয় আলীপুর বোমার মামলা। এমামলা চলাকালে সশস্ত্র বিপ্লবীদের হাতে একজন রাজসাক্ষী, একজন সরকারি উকিল এবং একজন পুলিশ ইন্সপেক্টর নিহত হয়। এছাড়াও বিপ্লবীরা গভর্নর *স্যার অ্যান্ড্রু ফ্রেজারকে* (Sir Andrew Fraser) দ্বিতীয়বার হত্যা চেষ্টা করে। ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশের[১৯৪] আইনী লড়াইয়ে ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের ২৩ নভেম্বর এ মামলার রায়ে অরবিন্দকুমার ঘোষ বেকসুর খালাস পান। কিন্তু মানিকতলায় গ্রেফতারকৃত অন্য অভিযুক্তদের সাজা হিসেবে দীপান্তর দন্ড হয়। স্মর্তব্য যে, বিহারের 'মুজাফফ্রপুরে বোমা বিস্ফোরনের সাথে সাথেই আলীপুর বোমা মামলা দিয়েও সরকার স্বস্তি পায়নি। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসেই বিনা বিচারে *তিন আইনে* (Regulation III,1818) ইংরেজ সরকার বন্দি করে বাংলার বরেণ্য নয়জন নেতাকে। তাঁরা হলেন–অশ্বিনীকুমার দত্ত, রাজাসুবোধ মল্লিক, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, অধ্যাপক কৃষ্ণকুমার মিত্র, শচীন্দ্রপ্রাসাদ বসু, সতীশচন্দ্র চ্যাটার্জি, মনোরঞ্জনগুহ ঠাকুরতা, পুলিনবিহারী দাশ ও ভুপেন নাগ।[১৯৫] এসকল নেতৃবৃন্দকে নির্বাসনে পাঠানো হয়। তাঁরা সবাই বিপ্লবী ছিলেন না, ছিলেন দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক নেতা।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে[১৯৬] কয়েকজন মুসলমান নেতা যোগদান করেছিলেন একথা সত্য, কিন্তু তারা ছিলেন কয়েকজন জাতীয়তাবাদী ব্যক্তিমাত্র। আন্দোলন চলার সময় বেশিরভাগ মুসলমান নিরপেক্ষতা বজায় রেখেছেন। রাজনৈতিক চেতনার অভাবের দরুণ সেটিই ছিল তাদের পক্ষে স্বাভাবিক। তাদের পিছনে মুসলমানদের গণসমর্থন আদৌ ছিলনা তা সহজেই অনুমেয়। শুধুমাত্র যারা মুসলমান সমাজের নেতা ছিলেন বাংলা বিভক্তির প্রস্তাব তাঁদের উৎসাহিত করেছিল। কারণ বাংলা ভাগ হয়ে গেলে নবগঠিত পূর্ববাংলা ও আসাম প্রদেশে তাঁরা নিজেদের জন্য বেশি সুযোগ-সুবিধা প্রত্যাশা করেছিলেন। ঢাকার নবাব স্যার সলিমুল্লাহ'র নেতৃত্বে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত *শিক্ষা সম্মেলনে* (Education Conference) এ মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। এ সম্মেলনের মাধ্যমে গঠিত মুসীলম লীগ *বাংলা বিভাগকে* (Partition of Bengal) সমর্থন জানায়। ইতোপূর্বে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের ০১ অক্টোবর আগা খানের নেতৃত্বে মুসলমানগণ একটি ডেপুটেশন নিয়ে ভাইসরয় মিন্টোর কাছে যায়। আলোচনায়

আসন্ন সাংবিধানিক সংস্কারের সময় মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনি পদ্ধতি সৃষ্টির প্রস্তাবে ভাইসরয় মিন্টো সম্মত হন।

১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে বিভিন্ন জায়গায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখা দেয়। কিন্তু এতসব সত্ত্বেও মুসলমান জনগণ বাংলা ভাগের ব্যাপারে খুব উৎসাহী ছিল, এমন কথা জোর দিয়ে বলা চলে না। বাংলা ভাগের ব্যাপারে উৎসাহী হয়ে ওঠার মতো সচেতনতাও তাদের ছিল না। অন্যদিকে পূর্ববঙ্গের ব্যাপক সংখ্যক মুসলমান চাষীদের জাগিয়ে তুলতে স্বদেশী আন্দোলন যে ব্যর্থ হয়েছিল, তা অকপটে স্বীকার করেছেন কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে পাবনায় অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতির ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন,এই ব্যর্থতার জন্য দায়ী হিন্দু *ভদ্রলোক* শ্রেণির লোকেরাই;এ ভদ্রশ্রেণির লোকেরা কখনোই নিজেদের দেশের মুসলমানদের সঙ্গে কিংম্বা সাধারণ হিন্দুদের সঙ্গেও এক হয়ে মেশার চেষ্টা করেনি।[১৯৭] তার পরেও স্বদেশী আন্দোলন প্রসূত বিপ্লবীদের সশস্ত্র বৈপ্লবিক কর্মকান্ডের দাপটে অস্থিতিশীল ভারতীয় রাজনীতিকে সামাল দেবার প্রত্যয়ে ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে ১২ ডিসেম্বর দিল্লিতে অভিষেক অনুষ্ঠানের সময় রাজা পঞ্চম জর্জ বাংলা বিভাজন রদের ঘোষণা দেন।[১৯৮] এ ঘোষণার পরও বাঙালি মুসলামানদের তরফ থেকে তেমন কোন প্রতিবাদ ওঠেনি। এ প্রতিবাদহীনতাই বাংলা ভাগের ব্যাপারে তাদের ঔদাসীন্যতারই পরিচায়ক। তবে মুসলমানদের প্রবোধ দেওয়ার জন্য ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের 'মর্লি মিন্টো সংস্কার'-এ তাদের পৃথক প্রতিনিধিত্বের দাবিটি মেনে নেওয়া হয়।

বাংলা বিভাগ রদের পূর্বাপর

১৯১০ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিক থেকে কার্যকরি হয় নতুন সংবিধান কার্যকর হয়। কিন্তু সশস্ত্র বিপ্লবীদের হাতে ১৯১০ খ্রিস্টাব্দের ২৪ জানুয়ারি ডেপুটি-পুলিশ সুপার শামছুল আলম নিহত হওয়ার অজুহাতে সরকার দমনমূলক আইনগুলো নতুন করে চালু করে। নতুন এক সংবাদপত্র আইনের সাহায্যে পরবর্তী দশকে বাজেয়াপ্ত করাহয় বেশ কয়েকশ' ছাপাখানা, সংবাদপত্র ও বই। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে নির্বাসিত নেতৃবৃন্দ এসময় মুক্তি পেলেও অনুশীলন সমিতির প্রধান পুলিনবিহারী দাশকে এক নতুন অভিযোগে সাত বছরের জন্য আন্দামানে পাঠছানো হয়। সশস্ত্র বৈপ্লবিক কর্মকান্ড চলতেই থাকে। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে সশস্ত্র বৈপ্লবিক গোষ্ঠী এবং সরকারি নির্যাতনের মাধ্যমে যে ভয়ঙ্কর লড়াই শুরু হয়েছিল;সে লড়াইয়ের পরিবেশ এমনকি ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে বাংলা বিভক্তি রদ করেও সরকার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে পারেনি।[১৯৯] কলকাতা থেকে রাজধানী সরিয়ে নেয়া হয় দিল্লিতে এবং বাংলাকে রাজ্যপাল শাসিত প্রদেশের স্তরে অবনমনের ব্যাপারটিও বাঙালিদের ভাবপ্রবণ মানসিকতায় আঘাত করেছিল।

বিপ্লব পন্থিদের বৈপ্লবিক কর্মকান্ডে ভারতবর্ষে রাজনৈতিক অস্থিরতা অব্যাহত ছিল। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের ২৩ ডিসেম্বর ভারতের ভাইসরয় *লর্ড হার্ডিঞ্জ* (Lord Charles Hardinge) সশস্ত্রবিপ্লবীদের বোমার আঘাত থেকে অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষাপান । ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে সরকার ফৌজদারি আইন সংশোধন করে। অতঃপর ষড়যন্ত্রকে বিশেষ অপরাধ হিসেবে গণ্য করে। এই ঘটনায় অভিযুক্তদের মধ্যে প্রখ্যাত বিপ্লবী রাসবিহারী বসুও ছিলেন। বিচারে দুজনের ফাঁসি ও দু'জনের সাত বছরের সশ্রম কারাদন্ড হয়। সরকার রাসবিহারী বসুকে পাঞ্জাবে বিপ্লবের নায়ক বলে উল্লেখ করে। কিন্তু কেউই তাঁকে ধরতে পারলো না। ছদ্মবেশে নানান স্থানে ঘুরে ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি জাপান চলে যান। প্রবাসে জীবনেও দেশের স্বাধীনতার জন্য বৈপ্লবিক কর্ম অব্যাহত রাখেন।[২০০] ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জর ওপর বোমা নিক্ষেপের ঘটনা থেকেই বাংলার সশস্ত্র বৈপ্লবিক কর্মকান্ড কিভাবে ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও ছড়িয়ে পড়েছিল তা সহজেই অনুমেয়। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে কোমাগাতামারু জাহাজের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাময়িক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। অতঃপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। কংগ্রেসের মধ্যে প্রাধান্যকারী নরমপন্থিরা বিশ্বস্তভাবে ইংরেজ সরকারকে সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করে। বালগঙ্গাধর তিলকের নেতৃত্বাধীন বিপ্লবপন্থিরা এ সময় কংগ্রেসের ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠেন। এই বিশ্বযুদ্ধের আশুঅবসান ঘটার সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায় কংগ্রেসের পুনঃমিলন একান্ত আবশ্যক হয়ে উঠেছিল। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেসের লক্ষ্মৌ অধিবেশনে কাঙ্ক্ষিত সে পুনর্মিলন সম্পন্ন হয়।

এদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধকাল পর্বে সশস্ত্রবিপ্লবীরা কিন্তু তাদের নিজস্ব বৈপ্লবিক কর্মপন্থায় অটল থাকে। এ সময় তাঁরা বিদেশ থেকে অস্ত্র আমদানির চেষ্টা করেন। এ ঘটনায় ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের ০৯ সেপ্টেম্বর উড়িষ্যার বালাশোরে বুড়িবালাম নদীর তীরে পাঁচজন বীর বিপ্লবীর[২০১] *পুলিশ কর্মকর্তা চার্লস টেগার্টের* (Charles Tegart) নেতৃত্বাধীন পুলিশের একটি দলের সাথে এক অসম যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এতে বিপ্লবী চিত্তপ্রিয়রায় চৌধুরী সম্মুখযুদ্ধে প্রাণ হারান। এতে মারাত্মক যখম অবস্থায় গ্রেফতার হয়ে পরদিন ১০ সেপ্টেম্বর বালেশ্বর হাসপাতালে জ্যোকিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ওরফে *বাঘা জ্যোতিন* মৃত্যুবরণ করেন।[২০২] ইত্যবসরে মুসলিম লীগ ততোদিনে কংগ্রেস গৃহীত স্বায়ত্ত্বশানের দাবিকে ইতিবাচক পদক্ষেপ গণ্য মনে করে দলটির অনেকটা কাছাকাছি চলে আসে। ১৯১২খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেস অধিবেশনে গৃহীত স্বায়ত্বশাসনের দাবিটি মুসলিম লীগ তাদের লক্ষ্মৌ অধিবেশনে গ্রহণ করে নেয়। এহেন পরিস্থিতিতে ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।[২০৩] এ চুক্তিটি ঐতিহাসিক 'লক্ষ্মৌ প্যাক্ট' নামে পরিচিতি পায়।

এদিকে ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে মুসলমানদের মধ্যে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব পরিলক্ষিত হয়; যা মুসলমানদের চিন্তা-চেতনা ও রাজনৈতিক জাগরনের ইঙ্গিতবাহী। মাওলানা মুহাম্মদ আলী কর্তৃক ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত সাপ্তাহিক *কমরেড* পত্রিকাটি বৈপ্লবিক মনোভাব ও গণবিক্ষোভের মূর্ত প্রতীক হয়ে ওঠে। নিকট প্রাচ্যে ব্রিটেনের সন্দেহজনক নীতিতে বিরক্ত ভারতীয় মুসলমানরা তুরস্ক-ইতালি যুদ্ধে তুরস্কের দুর্দশার প্রতি এবং বলকান যুদ্ধের প্রতি সহানুভুতিশীল হয়ে ওঠে। তুরস্কের সাহায্যার্থে ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে এক মেডিক্যাল মিশন নিয়ে তুরস্কে যান ভারতীয় মুসলিম প্রতিনিধি ডা. মুখতার আহমেদ আনসারী। দুর্দশাগ্রস্ত তুর্কিদের সাহায্যের জন্য *রেড ক্রিসেন্ট* চাঁদা উঠায়। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ব্রিটেন এবং তুরস্ক পরস্পরের প্রতিপক্ষ শিবিরে যোগদেয়। এহেন পরিস্থিতি ভারতীয় মুসলমানদের উভয় সঙ্কটে ফেলে দেয়। তাদের ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব আরও বৃদ্ধি পায়। দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিবেচনায় মুসলমানদের মধ্যে ধীরে ধীরে জন্মনেয়া সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মনোভাব তীব্র আকার ধারণ করে।এ মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটে প্রথমবিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী[২০৪] খেলাফত আন্দোলনে।

বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতি

প্রথমবিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার আগেই ভারত সচিব *এডউন মন্টেগু* (Edwin of Montagu) ও ভারতের তৎকালীন বড়োলাট বা ভাইসরয় *লর্ড চেমসফোর্ড* (Lord Chelmsford) এক অনুসন্ধান মারফৎ সাংবিধানিক সংস্কারের সুপারিশ করেন ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের জুলাইতে। ঐ সংস্কারে যে নগণ্য ছাড়ের কথা বলা হয়েছিল তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ মুখর হয়েছিলেন কংগ্রেসের বিপ্লবপন্থিরা। 'এ সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিপ্লবপন্থিদের পক্ষ নেন।'[২০৫] ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে কলকাতা কংগ্রেসে নরমপন্থিদের সঙ্গে দলের ভাঙ্গন এড়ানো গেলেও শেষপর্যন্ত বাঙালি জাতীয়তাবাদীরা বিপ্লবপন্থিদের পতাকাতলেই সমবেত হন। নেতৃত্বের আসনে বরিত হন মধ্যবিত্ত শ্রেণির নন্দিত নায়ক ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশ। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়সহ প্রবীণ রাজনীতিবিদগণ ক্রমে জনতার হৃদয় সিংহাসন থেকে ছিটকে পড়েন। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাকালীন ধারাবাহিক নেতৃত্বের অবসান ঘটে। অবশেষে ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে বোম্বাই শহরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে দীর্ঘদিন ঝুলে থাকা ভাঙ্গনটি আর রোধ করা যায়নি। দলের সংখ্যালঘু নরমপন্থিরা কংগ্রেস থেকে আলাদা হয়ে *উদারপন্থি সংঘ* (Liberal League) গঠনপূর্বক কর্মতৎপরতা চালায়। তারা ব্রিটিশ সরকারকে সমর্থন[২০৬] জানায়।

এ সময় কংগ্রেস পুরোপুরি বিপ্লবপন্থিদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। ইতোমধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে উদ্দীপ্ত ভারতীয় শ্রমিকরা ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তুলতে থাকে। যুদ্ধকালিন নিপীড়নমূলক আইনগুলোকে টিকিয়ে রাখার জন্য ব্রিটিশ সরকার ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ১০ মার্চ *রাউলাট অ্যাক্ট* বিধিবদ্ধ করে। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের

১৩ এপ্রিল জেনারেল ডায়ারের নির্দেশে পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে পুলিশ গুলি চালিয়ে নিরীহ ও অসহায় নাগরিকদের হত্যাকান্ডের পর অন্য কোনো নেতা কিছু বলার আগেই বড়োলাটের নিকট চিঠি লিখে এর প্রতিবাদ জানান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে প্রদানকৃত নাইটহুট উপাধীও তিনি বর্জনের ঘোষণা দেন।

সর্বোপরি বাঙালি জাতির রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো লর্ড কার্জন কর্তৃক বাংলা বিভাগোত্তর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ মনপ্রাণ দিয়ে ঝাপিয়ে পড়েছিলেন স্বদেশী আন্দোলনে। পরিণত হন এ আন্দোলনের প্রধান কবি ও প্রচারকে। দেশপ্রেমে উদ্দীপ্ত তাঁর গান, বক্তৃতা আর প্রবন্ধ গুলো পুরো আন্দোলনটিকে দীপ্ত করে তুলেছিল এক চমৎকার আবেশিক সৌন্দর্যে। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনে হিংসারপথ অবলম্বিত হওয়ায় ক্রমাগত তিক্ততা বৃদ্ধিপায়। এহেন প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথের সংবেদনশীল মন কুৎসিত প্রবণতা গুলোর সংশ্রব ত্যাগকরে সরে আসতে বাধ্য হন। তিনি অনুভব করেন এদেশের মানুষের হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটানো একান্ত দরকার। প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জনের জন্য একটি সামাজিক সংস্কার কর্মসূচিগ্রহণ একান্তই অপরিহার্য। স্বদেশী আন্দোলনের গৃহীত কৌশলের সঙ্গে একমত হতে না পেরে তিনি নিজেকে সরিয়ে নেন তাঁর ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয়ের নির্জনতার চৌহদ্দিতে। সাহিত্য সৃষ্টির মগ্নতা তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলে।[২০৭]

ধীরে ধীরে রবীন্দ্রনাধ চলমান বিশ্বের বুদ্ধিবৃত্তিক বৈজ্ঞানিক ও রাজনৈতিক রূপান্তরের প্রক্রিয়ার সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন। তাঁর সাহিত্য সৃষ্টি নতুন দিকে মোর নেয়। এসময় তাঁর প্রধান অবলম্বন হয় প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬খ্রি.) সম্পাদিত সবুজপত্র পত্রিকা। সেযুগে পত্রিকাটি প্রগতিশীলতার বাহনরূপে স্বীকৃত।[২০৮]

আমেরিকা ভ্রমণের পরবর্তীকালে কবির শান্তিনিকেতনের ব্রাহ্মচর্যাশ্রমের ধারণায় কিছু পরিবর্তন ঘটে। বিশ্বভারতীর সত্যিকার রূপটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। জীবনের এ পর্বে তিনি বিশ্বভারতীর বিদ্যাচর্চাকে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের বালকপাঠ্য শিক্ষাস্তর থেকে উচ্চতর স্বাধীন চর্চায় উন্নীত করেন। ভারতীয় দর্শন ও শিক্ষার সুসমন্বয়ে একটি পরিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনই ছিল তাঁর লক্ষ্য। শান্তিনিকেতন আশ্রমে প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় ও এবং বিশ্বভারতী সম্মিলিত ভাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূল শিক্ষাচিন্তার প্রকাশ। তিনি চেয়েছিলেন শিক্ষা ও প্রতিদিনের জীবনকে এক করতে। তৎকালীন ভারতে ব্রিটিশদের চাপানো শিক্ষাব্যবস্থা ছিল জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন। এই অসামঞ্জস্যতা দূর করে শিক্ষাকে জীবনের অঙ্গীভূত করা তাঁর লক্ষ্য ছিল। এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাব্যবস্থার আদর্শ তাঁর মানবমুখী ঐক্যমূলক জীবন তত্ত্বেরই

বহিঃপ্রকাশ। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণকালে যেসব বক্তব্য দিয়েছিলেন; 'Creativity Unity' হলো তার সংকলন। এতে ধ্বনিত হয়েছে বিশ্ববোধ ও মানব ঐক্যের বাণী। মহাযুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞ থেকে মানব সভ্যতার পরিত্রাণের কথা ভেবে তিনি বিভিন্ন দেশে বক্তৃতা করেছিলেন। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে তিনি যখন দেশে ফিরে আসেন তখন জাতীয়তাবাদী আন্দোলন নতুন মোড় নিয়েছিল। আন্দোলন সমর্থন করলেও তিনি উগ্র জাতীয়তাবাদ কিংম্বা সশস্ত্র বৈপ্লবিক কর্মকান্ডও সমর্থন করেননি। রবীন্দ্রনাথ উনিশ শতকের মানুষ হলেও তাঁর স্থান বিশ শতকেই; কারণ তাঁর প্রতিভার ও মনীষার যে দৃঢ় অভিব্যক্তি এবং কাব্যসাধনার বাইরেও নব নব ভাবচিন্তার নায়করূপে তাঁর যে আত্মপ্রকাশ–তা এই বিশ শতকেই ঘটেছে এবং তাঁর ব্যক্তিত্বের যা কিছু প্রভাব; তাও এই কালের শিক্ষিত সমাজের ওপর পড়েছে।[২০৯] তিনি ছিলেন অনন্ত জীবন, চিরজীবী মানবাত্মা ও প্রকৃতির চিরন্তন সৌন্দর্যের কবি। মৃত্যুকে তিনি দেখেছেন মহাজীবনের যতি হিসেবে। জীবন-মৃত্যু ও জগৎ, সংসার তাঁর নিকট প্রতিভাত হয় এক অখন্ড রূপে। তাই তো তাঁর গানে মহাজীবনের সুর ধ্বনিত হয়েছে এভাবে–

'আছে দুঃখ আছে মৃত্যু বিরহ দহন লাগে
তবু শান্তি তবু আনন্দ তবু অনন্ত জাগে।[২১০]

পরিশেষ বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির চিন্তা ও চেতনার স্বরূপ আলোচনা এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কর্মকান্ডের মূল্যায়নে একথা বলা যায় যে, এদেশে বাঙালি মধ্যবিত্তের আবির্ভাব ও বিকাশ এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করে। বাঙালির আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে এক জাগরণের ঘটে। রাজা রামমোহন রায় থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত মনীষী ও চিন্তানায়কদের অফুরন্ত উদ্যম ও কর্মপ্রয়াসের মাধ্যমে বাঙালি তাঁর অত্মস্বত্ত্বা আবিষ্কারে সক্ষম হয়। এক নতুন মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হয়। এক্ষেত্রে আধুনিক শিক্ষা কার্যকর ভূমিকা পালন করে। দ্বিতীয় দিক হলো মানবিক চেতনার বিকাশ। তৃতীয়ত, বিজ্ঞান মনস্কতা ও যুক্তি নির্ভরতা এবং চতুর্থত ধর্ম ও জাতি সম্পর্কে উদার দৃষ্টিভঙ্গীর বিকাশ ছাড়াও ব্যক্তি স্বাতন্ত্রতার চর্চা বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল।

বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণি যথার্থই অনুধাবন করে অর্থনৈতিক মুক্তি তথা স্বাচ্ছন্দ অর্জিত না হলে সব অর্জনই পন্ড। এজন্য প্রথম পর্যায়ে তাঁরা শিক্ষা ও ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্রিটিশের সাথে সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সাথে এ সহযোগিতা ও আপসের নীতি বঙ্গদেশ তথা ভারতবর্ষের নবচিন্তা ও চেতনা তথা রেনেসাঁস আন্দোলনেরই অন্যতম অবদান। এ নীতিই উনিশ শতকে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির জাতীয়তাবাদের নায়কগণকে বৈদেশিক ইংরেজ শাসনের মহিমাকীর্তন করতে বাধ্য করেছিল। এ নীতিই বিশ শতকের জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিকাশ লাভ করে

জাতীয় নেতৃত্বকে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন-সংগ্রাম ত্যাগ করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের সাথে আপোষ করতে বাধ্য করেছে। কৃষক-সম্প্রদায় ও শ্রমিকশ্রেণির বৈপ্লবিক সংগ্রামের আতঙ্কই জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্বের এই আপসনীতির উৎস।

বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণি ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহে বা ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধে'র বিরোধীতা করেছিল তারও মূল কারণ তাদের এই সহজাত আপোষপন্থি নীতির মধ্যেই নিহিত ছিল। ব্যতিক্রমী ছিলেন একমাত্র কালিপ্রসন্ন সিংহ। সিপাহী বিদ্রোহের স্বপক্ষে একমাত্র তিনিই দাঁড়িয়েছিলেন। এতদসত্ত্বেও বিশ শতকের জাতীয় আন্দোলনের মূল উৎস উনিশ শতকের রেনেসাঁসের মধ্যে নিহিত ছিল। রাজা রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, নবগোপাল মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্বামী বিকোনন্দ প্রমূখ বঙ্গীয় রেনেসাঁসের নায়কবৃন্দ জাতীয়তাবাদের যে বৈপ্লবিক আদর্শ স্থাপন করেছিলেন, সে আদর্শই পরবর্তীকালে বিকাশ লাভ করে বিশ শতকের জাতীয় আন্দোলনে পর্যবেশিত হয়েছে। সুতরাং উনিশ শতকের কৃষক-সংগ্রামের সাথে রেনেসাঁসের জাতীয়তাবাদের তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণে এই জাতীয়তাবাদের স্বরূপ উদঘাটিত হবে।

উনিশ শতকের কৃষক বিদ্রোহের নায়কেরা কখনো রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ন্যায় বৈদেশিক শাসনকে কখনো ভগবানের আর্শীবাদ হিসেবে গ্রহণ করেন নাই। বরং ব্রিটিশ শাসনকে ভগবানের অভিশাপ স্বরূপ মনে করে এই শাসনের উচ্ছেদ সাধনের জন্য প্রাণপণ সংগ্রামের মধ্যদিয়ে বৈপ্লবিক ঐতিহ্যের-বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি করে গিয়েছেন। পরাধীন ভারতবর্ষের মৃতদেহে প্রাণসঞ্চার করেছেন। কৃষকের এই বৈপ্লবিক সংগ্রাম এমনকি বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির নায়কগণকেও জাতীয়তাবাদের শিক্ষা এবং তাঁদেরকেও জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় অনুপ্রাণিত করেছিল। এ প্রসঙ্গে ১৮৬০-৬১ খ্রিস্টাব্দে নীল বিদ্রোহ সমর্থনকারী শিশিরকুমার ঘোষের মন্তব্য প্রণিধাণযোগ্য। তিনি বলেছেন, এ নীল বিদ্রোহই সর্বপ্রথম দেশের মানুষকে রাজনৈতিক আন্দোলন ও সংঘবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা শিখিয়েছে। বস্তুত ব্রিটিশ রাজত্বকালে নীল বিদ্রোহই ছিল বাংলার প্রথম বিপ্লব। তাছাড়া ১৮৩০-৭০ খ্রিস্টাব্দের ওয়াহাবী বিদ্রোহ যে প্রেরণা যুগিয়েছিল, বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির অন্যতম শ্রেষ্ঠনায়ক বিপিনচন্দ্র পাল অকুণ্ঠচিত্তে তা স্বীকার করেছেন।

উনিশ শতকে রেনেসাঁসের নায়কেরা বিভিন্ন সভা-সমিতির মাধ্যমে নিজেদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া আদায়ে সচেষ্ট হয়। ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দের *বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা*, ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দের *জমিদার সমিতি*, ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দের *বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি*, ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দের *ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন*,

১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দের *ইন্ডিয়া লীগ*, ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের *ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন* প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নিজেদের শ্রেণিস্বার্থ আদায়ে তৎপরতা চালায়। বিভিন্ন জনপ্রিয় দাবি-দাওয়া নিয়েও তাঁরা জনগণের সামনে হাজির হয়। জনগণের সঙ্গে সখ্যতা তৈরি, ভাব বিনিময় হয়; তৎপরিপ্রেক্ষিতে ভূমিকা অভিনয় করে। জনগণ তাদেরকে কোন এক মুহূর্তে বিশ্বাস করে;তারা ক্ষমতায় গেলে জনগণের ভাগ্যের পরিবর্তন এবং জাতীয় মুক্তি অর্জিত হবে। তাছাড়া জনগণকে সাথে নিয়ে প্রথমে বিভিন্ন নিয়মতান্ত্রিক রীতিনীতি মেনে সংগঠন এবং আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা চালায়। ব্রিটিশ বাংলার ইতিহাসে এ পর্যায়ে একটি পালাবদল লক্ষ্য করা যায়। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সরকার এবং রাজনৈতিক সংগঠনের মধ্যে একটি মিথস্ক্রিয়া সৃষ্টির চেষ্টা চালানো হয়। কংগ্রেসের মধ্যদিয়ে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির শুরু হওয়া পথচলা; কিন্তু কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার প্রায় পনের বছর পর বাকবদল ঘটে। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে বরিশালের অশ্বিনীকুমার দত্ত কংগ্রেসের বাৎসরিক আধিবেশনকে তিন দিনের তামাশা বলে সমালোচনা করেন। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে *নতুন ভারত* (New India) নামক মুখপাত্রের মাধ্যমে আরও অধিক বৈপ্লবিক মতামত প্রকাশের মাধ্যমে সিলেটের বিপিনচন্দ্র পাল নবোত্থিত বিপ্লবপন্থার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসেন। প্রকৃতপক্ষে এ সময় থেকেই কংগ্রেস পন্থিরা নিজেদের মধ্যে একতা ধরে রাখতে পারেন নি। একশ্রেণির কংগ্রেসপন্থি মনে করেন, নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় এদেশের স্বাধীনতা, মানুষের মুক্তি,অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা; এটি ব্রিটিশ সরকারের দ্বারা সম্ভব নয়। উপরন্তু তারা ব্রিটিশ সরকারের নানারূপ কর্মকান্ড-*ভাগকর ও শাসন কর* (Divide and Rule) নীতির বিরুদ্ধে অতিমাত্রায় সোচ্ছার হয়ে দেশের স্বাধীনতার বাণী প্রচারে এবং জনগণকে দেশ স্বাধীনের যে প্রত্যয়; তা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য নিজেদেরকে উৎসর্গ করে বিভিন্ন কর্মপন্থা নির্ধারণ করে এবং জনগণকে সাথে নিয়ে তাদের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে চায়: তারাই কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসা বিপ্লবী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। এ বিপ্লবীদেরকে ব্রিটিশ সরকার কালো তালিকাভুক্ত করে হেয় প্রতিপন্ন এবং জনগণের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করার প্রচেষ্টা হিসেবে তাদেরকে *সন্ত্রাসবাদী* (Terrorist) বলে প্রচারণা চালায়। প্রকৃতপক্ষে এ সশস্ত্র বিপ্লবীরা ব্রিটিশ শাসন থেকে ভারত মাতাকে মুক্ত করতে ব্রিটিশ প্রশাসনে কর্মকর্তাদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মাঠপর্যায়ে কর্মকর্তাদের হত্যার কৌশল গ্রহণের মাধ্যমে ব্রিটিশকে হটিয়ে দেবার মরণপণ লড়াইয়ে নামে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এক পর্যায়ে বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বাধীন আজাদ হিন্দ সরকার ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের সশস্ত্র কর্মকান্ড এবং দাপটে ব্রিটিশ সরকার নড়েচরে বসে।

এ সকল দিক ছাড়াও বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির চিন্তা ও চেতনার অন্য একটি দিকও আছে। সেটি হলো তাদের কর্মকান্ডের প্রভাব কেবলমাত্র ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দের পরে কৃষক বিদ্রোহের এক বিরাট যুগের

অবসানে, ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দের *বঙ্গীয় ভূমি সংক্রান্ত আইন*, ১৮৮০-৮১ খ্রিস্টাব্দের *দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিটির রিপোর্ট* এবং ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের *বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ত্ব আইন* আবির্ভূত হবার পরেই কতিপয় গ্রাম ও শহর *রেনেসাঁসের* দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয় মর্মে রেনেসাঁসের সীমাবদ্ধতার অভিযোগ ওঠে। কিন্তু রেনেসাঁসের আলোকেই সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অগ্রগতি তথা পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকে ভারতবর্ষ আধুনিক যুগে প্রবেশ করে। এক্ষেত্রে রাজা রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন থেকে শুরু করে রাজনারায়ণ বসুর রচনা ও কার্যাবলি: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'আনন্দমঠ' এর চেতনা এবং স্বামী বিবেকানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতার প্রচেষ্টা তথা রেনেসাঁস বিধৌত জাগরণ; বাংলার যুবসমাজকে সশস্ত্র বৈপ্লবিক কার্যক্রমের মাধ্যমে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন উচ্ছেদ করে ভারতবাসীকে স্বাধীনতার স্বপ্নদেখায়। কাজেই বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির এহেন রেনেসাঁস বিধৌত বৈপ্লবিক চিন্তা ও জাগরণ আমাদের জন্য বাতিঘর স্বরূপ।

টিকা ও তথ্যনির্দেশ

১. সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়,*বাঙালি মধ্যবিত্ত ও তার মানসলোক*,প্রোগ্রেসিভ পাবলিসার্স,কলকাতা,১৯৯৮,পৃ.০৪

২. A.K.Nazmul Karim, *The Dynamics of Bangladesh,*Nawroze Kitabistan,Dacca,1980, p.180.

৩. সুধি প্রধান,সুভাষচন্দ্র বসু একটি সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন,দিব্যজ্যোতি মজুমদার (সম্পা.), *পশ্চিমবঙ্গ (নেতাজি সংখ্যা)*,*বর্ষ ৩০ সংখ্যা*, ২২-২৭, তথ্য ও সংস্কৃতিবিভাগ,পশ্চিমবঙ্গ সরকার,১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ,পৃ.১০৬

৪. সুধি প্রধান, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১০৬

৫. সুপ্রকাশ রায়,*ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম*,র‍্যাডিক্যাল ইমপ্রেশন,কলকাতা,২০১৮,পৃ.১০

৬. সুপ্রকাশ রায়,*ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস*,ডিএনবি ব্রাদার্স,কলকাতা, ১৯৭০,পৃ.৭

৭. সুপ্রকাশ রায়,ভারতের বৈপ্লবিক, *প্রাগুক্ত*,পৃ.১১

৮. সুপ্রকাশ রায়,ভারতের কৃষক বিদ্রোহ,*প্রাগুক্ত*,২০১৮,পৃ.১৭৫

৯. সুধি প্রধান,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১০৬

১০. উনিশ শতকের শেষার্ধে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের একমাত্র প্রগতিশীল কাজ হলো–'১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের বিবাহের সম্মতি দানের বয়স সমন্ধীয় আইন' পাস। এই আইনে পূর্বেকার (Age of Concent Act of 1801) আইনের কন্যার বিবাহের সম্মতি দানের বয়স ১০ বৎসর হতে বর্ধিত করে ১২ বৎসর করা হয়।

১১. "*It indicates the endeavour of men to reconstitute himeself as a free being, not as the thrall of theological despotism."Encyclopeadia Britanica,Vol.*XX111,p.83. (উদ্ধৃত: ওয়াকিল আহমদ, *উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা*,বাংলা একাডেমী, ঢাকা,১৯৯৭,পৃ.২২)

১২. ওয়াকিল আহমদ,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২২

১৩. ওয়াকিল আহমদ,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২২

১৪. ওয়াকিল আহমদ,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২৩

১৫. ওয়াকিল আহমদ,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২৪

১৬. 'Notes on Early Commerce in Bengal',*Calcutta Review,*Vol.LXXIL,1881,p.116.(উদ্ধৃত: ওয়াকিল আহমেদ,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২৪)

১৭. বিনয় ঘোষ,*বাংলার বিদ্বৎসমাজ*,প্রকাশ ভবন,কলকাতা,২০১৬,পৃ.৫৯

১৮. এ প্রসঙ্গে নবকৃষ্ণ(হেস্টিংসের মুন্সী),কান্তবাবু (মি.সাইকসের বেনিয়ান),লক্ষ্মীকান্ত(ক্লাইভের বেনিয়ান), দর্পনারায়ণ (মি.হুইলারের দেওয়ান),শান্তিরাম সিংহ (টমাস রামবোল্ডের দেওয়ান),রামদুলাল দে(ফেয়ারলী কোম্পানির দেওয়ান), গোকুলচন্দ্র ঘোষাল (ভেরেলস্টের দেওয়ান) প্রমুখের নাম স্মরণ করা যায় যাঁরা প্রভূত অর্থের মালিক হয়েছিলেন।শেখ ইতিসামুদ্দীন তাঁর ইউরোপ-ভ্রমণবৃত্তান্ত 'শিগুর্ফ নামা-ই-বেলায়েত'(১৭৮০) গ্রন্থে নিজের নামসহ

মোট আটজনমুনসীর নাম উল্লেখ করেছেন যাঁরা কলিকাতায় কোম্পানির অধীনে চাকুরি করতেন। তাঁরা হলেন, ১.মুনশী আমানুল্লাহ, ২.মুনশী ফকরুদ্দীন(তাজউদ্দীনের পুত্র),৩.মুনশী মোহাম্মদ আসলাব,৪.মুনশী আবদুল বারী, ৫.মুনশী মোহাম্মদ ফয়েজ (কর্নেলের অধীনস্ত),৬.মুনশী মীর সদরুদ্দীন (কর্নেল কুটের অধীনস্ত),৭.মুনশী সলিমুল্লাহ গভর্নর হেনরী ভেন্সিটার্টের অধীনস্ত) ও মুনশী শেখ ইতিসামুদ্দীন।এরা কেউ বিত্তের মালিক হননি।এসময় গোলাম হোসেন নামে একজন মুসলমানের নাম পাওয়া যায় যিনি কোম্পানির দালালী করে ৯০ লক্ষ টাকা উপার্জন করেছিলেন।(উদ্ধৃত: Syed Aulad Hussain, The Vilayetnama',*The Dacca Review,*Feb.-Mar.1917,p.328.(উদ্ধৃত: ওয়াকিল আহমদ,*প্রাগুক্ত,* পৃ.২৫); আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ,*সমাজ সংস্কৃতি ও ইতিহাস*,বাংলা একাডেমী,ঢাকা,১৯৭৪,পৃ.১৩৬)

১৯. Khandker Fuzli Rubbee, *The Origin of the Muslims of Bengal,*Calcutta,1895, p.107.(উদ্ধৃত:ওয়াকিল আহমদ,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২৬)

২০. বিনয় ঘোষ,*বাংলার বিদ্বৎসমাজ*,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২২

২১. মিহির আচার্য,*বাঙালী বুদ্ধিজীবী মানস ও সমাজ ভাবনা*,লেখক সমাবেশ,কলকাতা,১৯৩৫,পৃ.২২

২২. আবদুল বাছির,*বাংলার কৃষক বিদ্রোহ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণি (১৭৫৭-১৮৫৭)*,বাংলা একাডেমী,২০১২,পৃ.১৯০

২৩. অমলেশ ত্রিপাঠী, *ইতালীর র‍্যানেসাঁস,বাঙালির সংস্কৃতি,* আনন্দ পাবলিশার্স,কলকাতা,১৯৯৬,পৃ.১৩

২৪. মুসা আনসারী,*ইতিহাস সমাজ ও সংস্কৃতি ভাবনা*,বাংলা একাডেমী,ঢাকা,২০০৮,পৃ.১৪১

২৫. প্রভাতাংশু মাইতি,*ভারত ইতিহাস পরিক্রমা*,শ্রীধর প্রকাশনী,কলকাতা,২০১২,পৃ.৪৪১

২৬. সুপ্রকাশ রায়,ভারতের কৃষক বিদ্রোহ,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৮৩-৮৪

২৭. মুসা আনসারী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৫

২৮. মুসা আনসারী, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৫১

২৯. সালাহ্উদ্দীন আহমদ,আমাদের রেনেসাঁস ভাবনা,*বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ*,ঢাকা,৩ জুন,২০০১,পৃ.৩

৩০. সালাহ্উদ্দীন আহমদ,আমাদের রেনেসাঁস ভাবনা,*প্রাগুক্ত*, পৃ.৩

৩১. মুসা আনসারী,*ইতিহাস,প্রাগুক্ত*,পৃ.১৭৪

৩২. David Kopf, *British Orientalism and the Bengal Renaissance*, Firma K.L.Mukhopadhayay, Calcutta, India,1969, p.03.

৩৩. মুসা আনসারী, *প্রাগুপ্ত*,পৃ.১৪০

৩৪. বিনয় ঘোষ,*বাংলার নবজাগৃতি*,হাওলাদার প্রকাশনী,ঢাকা,২০১৬,পৃ.৫৭

৩৫. Jadunath Sarker, *The History of Bengal*,Vol-ii, Muslim Period (1200-1757),The University of Dacca,1948,p.498.

৩৬. Susobhan Sarker, *On the Bengal Renaissance*,Papyrus,Calcutta,July 1979, p.13.

৩৭. Susobhan Sarker,*opcit.,*p.13.

৩৮. মুসা আনসারী,*প্রাগুপ্ত*,পৃ.১৫১

৩৯. Census Report;1951,Vol.vi.Part IA,p.437.(উদ্ধৃত:সুপ্রকাশ রায়,*প্রাগুপ্ত*,পৃ.১৮৫)

৪০. R.C.Majumdar (ed.), *British Paramouncy and Indian Renaissance,*Part-II,Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay,1965,p.68.

৪১. মুসা আনসারী,*প্রাগুপ্ত*,পৃ.১৭৯

৪২. বিনয় ঘোষ,বাংলার বিদ্বৎসমাজ,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৫২

৪৩. R.P.Dutt,*India Today and Tomorrow,*People Publishing House,Delhi,1955,p.109.

৪৪. Susobhan Sarker,*opcit.,*p.69.

৪৫. Susobhan Sarker,*opcit.,*p.75.

৪৬. David Kopf, *opcit.*, p.175.

৪৭. এ গ্রন্থটির বাংলা অর্থ দাঁড়ায় 'একেশ্বরবাদীদের প্রতি উপহার'। এ রচনায় তিনি প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে,সমস্ত ধর্মেরই স্বাভাবিক প্রবণতা হচ্ছে একেশ্বরবাদের দিকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত মানুষ চিরদিনই তাদের নিজের নিজের বিশেষ ধর্মীয় মতবাদ,উপাসনা পদ্ধতি এবং আচার অনুষ্ঠানের ওপর জোর দিয়ে এসেছে। তার ফলস্বরূপ এক ধর্ম থেকে অন্য ধর্ম পৃথকই থেকে গেছে। (উদ্ধৃত: সুশোভন সরকার, *বাংলার রেনেসাঁস*, দীপায়ন, কলকাতা,কার্তিক

১৩৯৭, পৃ.১৩)

৪৮. B.N.Dasgupta,*The Life & Times of Rajah Rammohun Roy, Ambika Publications.*,New Delhi,1980,p.98.

৪৯. A.Mukherjee, *Reform and Regeneration in Bengal 1774-1823,*Calcutta:Rabindra Bharati University,1968,p.144.

৫০. সুশোভন সরকার,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৩;হোসেনউদ্দীন হোসেন,*বাঙলার বিদ্রোহ প্রথম খন্ড (৬০০-১৯৪৭)*,বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৬, পৃ.১৭১

৫১. যোগেশচন্দ্র বাগল,*মুক্তির সন্ধানে ভারত*,বিবেকানন্দ বুক সেন্টার,কলকাতা,২০১৩,পৃ.১৩

৫২. যোগেশচন্দ্র বাগল,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২০-২১

৫৩. B.B.Misra,*The Indian Middle Classes:Their Growth in Mordern Times,*Oxford University Press,Delhi, 1960,p.197.

৫৪. আ.ফ.সালাহউদ্দীন আহমদ,"উনিশ শতকে বাংলার রাজনৈতিক চিন্তা ও কর্মকান্ড",সিরাজুল ইসলাম(সম্পা.), *বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১)*,১ম খন্ড (রাজনৈতিক ইতিহাস),এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩, পৃ.২৭৪

৫৫. সুশোভন সরকার, *প্রাগুক্ত*,পৃ.২০

৫৬. হোসেনউদ্দীন হোসেন,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৭০

৫৭. আবদুল মওদুদ,*মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ সংস্কৃতির রূপান্তর*,মাওলা ব্রাদার্স,ঢাকা:২০১১,পৃ.৭০

৫৮. সুশোভন সরকার,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৯

৫৯. সুশোভন সরকার,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৯

৬০. অমলেন্দু দে,*বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ*,জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ,ঢাকা,২০১৭,পৃ.৫;Susobhan Chandra Sarkar(ed).*Rammohun Roy on Indian Economy,*Calcutta.1965, p.VII-XIV.

৬১. উনবিংশ শতাব্দীর পথিক,পৃ.১৪-১৫; Advanced History of India, p.187.(উদ্ধৃতঃ আবদুল মওদুদ,*প্রাগুক্ত*, পৃ.৮৬)

৬২. অমলেন্দু দে,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৬

৬৩. অমলেন্দু দে,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৮-৯

৬৪. *Asiatic Journal*,June 1830.(উদ্ধৃত:আবদুল মওদুদ,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৪০)

৬৫. Susobhan Chandra Sarkar(ed.), *opcit.*, p.84-89.(উদ্ধৃত,অমলেন্দু দে,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৬)

৬৬. Susobhan Chandra Sarkar (ed.), *opcit.*, p.74-79. (উদ্ধৃতঃঅমলেন্দু দে,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১২)

৬৭. Robert Lekachman, *A History of Economic Ideas,*New York,1959,Chapters.4-7.(উদ্ধৃতঃ অমলেন্দু দে, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৭)

৬৮. অমলেন্দু দে, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৭

৬৯. অমলেন্দু দে, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৯-১০

৭০. Susobhan Chandra Sarkar(ed.), *opcit.*, p.70. (উদ্ধৃতঃঅমলেন্দু দে,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১০)

৭১. Susobhan Chandra Sarkar(ed.), *opcit.*, p.70-71.(উদ্ধৃতঃঅমলেন্দু দে,প্রাগুক্ত,পৃ.১১)

৭২. Susobhan Chandra Sarkar(ed.), *opcit.*, p.62-65.(উদ্ধৃতঃঅমলেন্দুদে,পৃ.১২-১৩)

৭৩. Susobhan Chandra Sarkar(ed.), *opcit.*, p.66.(উদ্ধৃতঃ অমলেন্দুদে, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৪)

৭৪. Karl Marx,*The British Rule in India,The future Results of the British Rule in India,* (Articles), vide Marx-Engels, OnBritain, Moscow,1953, pp.377-392. (উদ্ধৃতঃ অমলেন্দুদে, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৪)

৭৫. বিনয় ঘোষ,*বিদ্রোহী ডিরোজিও*,অয়ন,কলকাতা,সেপ্টেম্বর ১৯৫৭,পৃ.১৮

৭৬. সুশোভন সরকার,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২৬

৭৭. Arabinda Poddar,*Renaissance in Bengal Quests and Confrontations 1800-1860*, Indian Institute of Advance Study,Simla,1960,p.114.

৭৮. স্বাধীনতার প্রতীক হিসেবে তারা গোমাংস ভোজন এবং মদ্যপান আরম্ভ করে।

৭৯. সুশোভন সরকার,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২৬।

৮০. Arabinda Poddar, *opcit.*,p.117.

৮১. David Kopf, *opcit.*,p.289.

৮২. সুশোভন সরকার, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৩০

৮৩. সুশোভন সরকার,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৩৪

৮৪. যোগেশচন্দ্র বাগল,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৪৮

৮৫. ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখী বর্মণ,*ব্রিটিশ ভারতে রাজনৈতিক উন্নয়ন*,আজিজিয়া বুক ডিপো,ঢাকা,২০০৬, পৃ.১২১

৮৬. যোগেশচন্দ্র বাগল,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৪৮-৪৯

৮৭. সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৭৮

৮৮. সুশোভন সরকার, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৩৮

৮৯. R.C.Majumdar(ed.), *British*, *opcit.*, p.278.

৯০. সুশোভন সরকার, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৩৯-৪০

৯১. Humayun Azad, "Bangla Literature in Nineteenth Century", Sirajul Islam (ed.), *History of Bangladesh (1707-1971)*,Vol-III (Social and Cultural History),Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka,1997,p.299.

৯২. যোগেশচন্দ্র বাগল,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৭২

৯৩. হায়দার আকবর খান রনো,*পলাশী থেকে মুক্তিযুদ্ধ প্রথম খন্ড* (মধ্যযুগ থেকে ১৯৪৭পর্যন্ত),ছায়াবীথি,ঢাকা,২০১৮, পৃ.৮৪

৯৪. হোসেনউদ্দীন হোসেন,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৯৯

৯৫. অসীমকুমার চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.),*বাংলার রেনেসাঁস প্রসঙ্গে*,দীপায়ন,কলকাতা,কার্তিক ১৩৬০,পৃ.১৫৭

৯৬. বিমান বসু ও অনুনয় চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.),*বঙ্গীয় নবজাগরণের অগ্রপথিক*,দিব্য প্রকাশ,ঢাকা,২০০১,পৃ.২৫৬

৯৭. ব্লায়ার বি.ক্লিং,"নীল বিদ্রোহ",সিরাজুল ইসলাম(সম্পা.),*বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১)*, ১মখন্ড (রাজনৈতিক ইতিহাস), এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩,পৃ.২৬০

৯৮. মোহিতলাল মজুমদার,*বাংলার নবযুগ*,বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড,কলকাতা,পৌষ ১৩৫২,পৃ.৪৯

৯৯. সুপ্রকাশ রায়,ভারতের কৃষক বিদ্রোহ,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২০৭-৯

১০০. সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৬৪-৬৫

১০১. সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.),*বাংলা পিডিয়া(খন্ড-৯)*,বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি,ঢাকা,২০০৩,পৃ.১৪৭

১০২. আবদুল মওদুদ,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১০৪

১০৩. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ছিল ব্রাহ্মসমাজের তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপাত্র। ব্রাহ্মধর্মের প্রচার এবং তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যদের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষার উদ্দেশ্যে ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দের ১৬ আগস্ট(১ ভাদ্র,১৭৬৫ শক) অক্ষয়কুমার দত্তের সম্পাদনায় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়।এ পত্রিকাটির সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১০৪. হায়দার আকবর খান রনো,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৮৫

১০৫. হোসেনউদ্দীন হোসেন,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৮২

১০৬. হোসেনউদ্দীন হোসেন,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৮২

১০৭. R.C.Majumdar(ed.),*opcit.*,p.104.

১০৮. আমূল রাজনৈতিক পরিবর্তনে বিশ্বাসী দল।

১০৯. ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখী বর্মণ,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১২৩

১১০. যোগেশচন্দ্র বাগল, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৮১

১১১. সুশোভন সরকার, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৫১

১১২. হায়দার আকবর খান রনো,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৮৬

১১৩. ঊনবিংশ শতাব্দীর পথিক,পৃ.৭৫-৭৬।(উদ্ধৃতঃ আবদুল মওদুদ, *প্রাগুক্ত*,পৃ.১০৪)

১১৪. আবদুল মওদুদ,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১০৪।

১১৫. ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখী বর্মণ,পৃ.১২৪

১১৬. হায়দার আকবর খান রনো,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৮৬

১১৭. সুশোভন সরকার, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৫২

১১৮. হায়দার আকবর খান রনো,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৮৬

১১৯. সুশোভন সরকার, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৫৩

১২০. Anabaptism) এর "Ana" শব্দটির অর্থ গ্রীক ভাষায়"পুনরায়" বা "again" এবং "Baptism" হল "দীক্ষা" অর্থাৎ অ্যানাব্যাপটিস্টরা বা এই গোষ্ঠীর অনুগামীরা পুর্নদীক্ষায় বিশ্বাস করত। এরা মনে করত,ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টান্ট উভয় ধর্মমত খ্রিস্টের মূল আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়েছে।তাই তারা ধর্ম বিশ্বাসী এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী যারা তাদের সকলকে প্রকৃত খ্রিস্টধর্মানুরাগী করে তোলার জন্য পুর্নদীক্ষার প্রয়োজন বলে মনে করত। ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধে সুইজারল্যান্ডের জুরিখ শহরে অ্যানাব্যাপটিস্ট আন্দোলন গড়ে উঠে।সাধারণভাবে সুইজারল্যান্ডের জুইংলির অনুগামীদের মধ্য থেকেই এই চরমপন্থি সংস্কারবাদী আন্দোলনের উদ্ভব হয়। এই আন্দোলনের নেতারা হলেন কনরাড গ্রেবেল,টমাস মুনজের,বালথাসার হবিমেয়ার,মানজ ও ব্লরক। (উদ্ধৃত:www.alivehistories.com)

১২১. ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখী বর্মণ,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৪৬

১২২. সুশোভন সরকার, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৫৪।

১২৩. সুশোভন সরকার, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৫৪;ওয়াকিল আহমদ,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৫২১

১২৪. সুশোভন সরকার, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৫৪

১২৫. রাজনারায়ণ বসু, নবগোপল মিত্র এবং ঠাকুর বংশের তরুণ সদস্যদের উদ্যোগে এ হিন্দু মেলার সূচনা হয়।

১২৬. বিমান বসু ও অনুনয় চট্টোপাধ্যায়(সম্পাদিত),*প্রাগুক্ত*,পৃ.৩১৩

১২৭. সুশোভন সরকার, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৫৬

১২৮. বিমান বসু ও অনুনয় চট্টোপাধ্যায়(সম্পাদিত),*প্রাগুক্ত*,পৃ.৩১৪

১২৯. বিমান বসু ও অনুনয় চট্টোপাধ্যায়(সম্পাদিত),*প্রাগুক্ত*,পৃ.৩১৫

১৩০. বিমান বসু ও অনুনয় চট্টোপাধ্যায়(সম্পাদিত),*প্রাগুক্ত*,পৃ.৩১৫

১৩১. ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে রাজনীতিতে যোগদান করেন।নবীন ব্রাহ্মদের সঙ্গে তার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা ছিল। নবীন ব্রাহ্মদের অন্যতম আনন্দমোহন বসু একটি ছাত্রসভা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।এ ছাত্রসভার উদ্যোগেই জনসভায় বক্তৃতা দেওয়ার কাজ শুরু করেছিলেন সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী।শিখ শক্তির অভ্যুদয় এবং ম্যাজিনি প্রসঙ্গে তার স্মরণীয় বক্তৃতা জনমানসে আলোড়ন সৃষ্টি করে।যুবকদের আদর্শে পরিণত হন সুরেন্দ্রনাথ।তাদের সামনে তিনি শুধু ভারতবর্ষের স্বাধীনতার কথাই তুলে ধরতেন না;সেই সঙ্গে তুলে ধরতেন পাশ্চাত্যের মুক্তি আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলির কথা।তার বক্তৃতা শুনতে শুনতে শ্রোতারা একাত্ম হয়ে যেত ইতালির রিসর্জিমেন্টোর(পুনরুত্থান বা নবজাগরণ,এজাগরণের মধ্য দিয়ে ইতালিবাসী তাদের অতীত ঐতিহ্য,সংস্কৃতি ও বীরগাথার সঙ্গে বিশেষ অবগত হয়।) সঙ্গে অথবা হোমরুল আন্দোলনের আয়ারল্যান্ডের সঙ্গে। (উদ্ধৃত: সুশোভন সরকার, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৫৭)

১৩২. সুশোভন সরকার, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৫৮

১৩৩. সুপ্রকাশ রায়,ভারতের বৈপ্লবিক,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৩২

১৩৪. সুশোভন সরকার,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৫৮-৫৯

১৩৫. বোম্বে শহরকে বেছে নেওয়ার কারণ হলো,ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও বিশেষত বোম্বাইয়ে,জেগে উঠেছিল মানুষের রাজনৈতিক চেতনা।কিন্তু এসকল অঞ্চলের নেতারা ছিলেন সাধারণত একটু বেশি নরমপন্থি ও কম সরব। (উদ্ধৃত: সুশোভন সরকার,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৬০)

১৩৬. সুপ্রকাশ রায়,ভারতের বৈপ্লবিক,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৩২

১৩৭. Ambika Charan Mazumder, *Indian National Evolution:a brief survey of the Origin and progress of the Indian National Congress and the growth of Indian Natonalism*, G.A.Natesan & Co., Madras,1917, p.274.

১৩৮. নরহরি কবিরাজ,*স্বাধীনতার সংগ্রামে বাংলা*,বাণী প্রকাশ,ঢাকা,১৯৮২,পৃ.১৯৪

১৩৯. সুশোভন সরকার, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৬১

১৪০. নরহরি কবিরাজ, *প্রাগুক্ত*,পৃ.১৯৪

১৪১. সুশোভন সরকার, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৬১

১৪২. সুপ্রকাশ রায়,ভারতের বৈপ্লবিক,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৩৬

১৪৩. কংগ্রেসের প্রথম একুশটি বার্ষিক অধিবেশনের মধ্যে সাতবারই সভাপতিত্ব করেছিলেন বাঙালিরা–উমেশচন্দ্র ব্যানার্জি (১৮৮৫,৯২খ্রি.),সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৫,১৯০২খ্রি.),আনন্দমোহন (১৮৯৮ খ্রি.),রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৯৯খ্রি.) এবং লালমোহন ঘোষ (১৯০৩খ্রি.)। (উদ্ধৃত:সুশোভন সরকার, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৬১)

১৪৪. আসামের কুলিদের স্বপক্ষে প্রথম প্রচার শুরু করেছিলেন অধম্য দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। অজ্ঞাত এক ব্রাহ্মধর্ম প্রচারকের মাধ্যমে আসামের চা বাগানের কুলিদের দুর্দশার কথা শুনে ভারত-সভার পক্ষ থেকে তথ্যসংগ্রহের জন্য ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি আসাম যান। জীবনের ঝুঁকি সত্ত্বেও চা বাগানগুলো ঘুরে বেড়িয়েছেন।তথ্য সংগ্রহ ও অনুসন্ধানের ফলাফল লিপিবদ্ধ করেন "স্লেভ ট্রেড ইন আসাম" শীর্ষক প্রবন্ধ মালায়। প্রবন্ধগুলো প্রকাশিত হয় ইংরেজি পত্রিকা বেঙ্গলিতে এবং তরুণব্রাহ্ম কৃষ্ণকুমার মিত্র সম্পাদিত "সঞ্জীবনী"তে।কংগ্রেস এই প্রশ্নটিকে প্রাদেশিক সমস্যা বলে চিহ্নিত করার পর ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মলেন' (Bengal Provicial Conference) বিষয়টি হাতে নেয়।এর প্রধান বক্তা ছিলেন বিপিন চন্দ্র পাল।বিভিন্ন প্রদেশ থেকে অজ্ঞ ও অশিক্ষিত মুজুরদের প্রলোভন দেখিয়ে চা বাগানে এনে তাদেরকে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিয়ে বহুবছরের দাসে পরিণত করা হত; যদিও এধরণের চুক্তি ছিল একেবারেই বে-আইনি। চাবাগানগুলোর অবস্থা ছিল মর্মান্তিক। অবাধ্য কুলিদের প্রায়শই চাবুক মেরে হত্যা করা হত।চা বাগানে সাধারণ আইন বা বিচার বলতে কিছু ছিল না।বাগানের মালিকরাই ছিল সর্বেসর্বা।চা বাগান মালিকদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে যে প্রচার আন্দোলন শুরু হয়েছিল;তা ছিল অনেকটা নীল চাষ বিরোধী প্রচার আন্দোলনের মত।অবশেষে ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে আসামের কুলিদের সমস্যাটি নিয়ে কংগ্রেস কাজ করতে সম্মত হয়। ঐসময়ে আসামের চীফ কমিশনার স্যার হেনরি জেমস্ বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করেন এবং কুলিদের ওপর চালানো চরমতম নির্যাতন বন্ধ হয়।(উদ্ধৃত:সুশোভন সরকার, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৬৩-৬৪)

১৪৫. দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্ত্রী এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মহিলা স্নাতক।

১৪৬. Majumdar,Chowdhury & Dutta., *An Advance History of India.,*Macmillan and Co., Limited., London,1950,p.889.

১৪৭. সুশোভন সরকার, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৬৩

১৪৮. এ বাংলার নেতৃত্বেই ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেসের অধিবেশনের অনুষঙ্গ হিসেবে সংগঠিত হয় প্রথম শিল্পপ্রদর্শনী (Industrial Exhibition);সুরেন্দ্রনাথের ভাষায় যার মধ্যে ঘোষিত হয়েছিল,শিল্পগত বিপ্লবের বার্তা;যা কিছুদিনের মধ্যেই মূর্ত হয়ে স্বদেশী আন্দোলনের রূপ ধারণ করে। তাছাড়া এক প্রজন্ম পূর্বে হিন্দু মেলায় যে অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা শুরু হয়,এসময় তা পরিপূর্ণতার ভিত খুঁজে পায়।এক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন ঠাকুরবংশের সাথে সংশ্লিষ্ট পুরুষ ও নারীরা। শিল্প প্রদর্শনীর আর্থিক ভার বহন করেন জে.চৌধুরী এবং বিশ শতকের গোড়ার দিকে দেশি পণ্যকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য লক্ষীর ভান্ডার উদ্বোধন করেন সরলা দেবি।(উদ্ধৃত: সুশোভন সরকার, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৬৪)

১৪৯. India's Struggle for Independent,p.34.(উদ্ধৃত:বিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায়,*ভারতের সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রাম*, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন,কলকাতা,২০১৪,পৃ.৪৫)

১৫০. India's Struggle for Infependent),p.34.(উদ্ধৃত:বিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৪৫)

১৫১. A.R.Desai, *Social Background of Indian Nationalism,*Popular Book Depot,Bombay.1948, p.237.

১৫২. সুশোভন সরকার, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৬৪

১৫৩. R.C.Majumdar, *Bengal in the Nineteenth Century,*Calcutta,December 1960,p,77.

১৫৪. সুপ্রকাশ রায়,ভারতের কৃষক বিদ্রোহ,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২১৭

১৫৫. সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৬৫

১৫৬. সুপ্রকাশ রায়, ভারতের কৃষক বিদ্রোহ,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২১৭

১৫৭. সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৬৬

১৫৮. সুশোভন সরকার, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৬৫

১৫৯. ১৮৫৭খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় বিদ্রোহ পরবর্তীকালে উর্দ্দু ভাষায় যে বইটি লেখেন সৈয়দ আহমদ তাতে তাঁর গভীর দেশপ্রেমের সাক্ষ্য বহন করে। জাতীয় অবমাননা ও জাতিগত বৈষম্যের ব্যাপারটিও গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন তিনি। কিন্তু ক্রমে তিনি এই দৃষ্টিভঙ্গীর দিকেই ঝুঁকে পড়েন যে,রাজনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে যদি দূর্বলতর সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ রক্ষাকবচের ব্যবস্থা না করা হয়,তাহলে হিন্দুআধিপত্যের দরুণ হিন্দু-মুসলমান দুই

সম্প্রদায়েরই বিকাশধারা হবে অসম।(উদ্ধৃত:সুশোভন সরকার, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৬৬)

১৬০. সুশোভন সরকার, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৬৬-৬৭

১৬১. অসীমকুমার চট্টোপাধ্যায়(সম্পাদিত),বাংলার রেনেসাঁস প্রসঙ্গে,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৩৮

১৬২. R.C.Majumdar,*Bengal in the Nineteenth Century, opcit.*, p,75.

১৬৩. সুশোভন সরকার, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৬৭

১৬৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজেই প্রথম শ্রেণির এ মাসিক পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন।তাছাড়া ১৯০১খ্রিস্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত সুবিখ্যাত 'বঙ্গ দর্শন পত্রিকাটি তিনি চালু করেন।(উদ্ধৃত:সুশোভন সরকার, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৬৮)

১৬৫. সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৬৫

১৬৬. সুশোভন সরকার, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৬৮

১৬৭. মো.মকসুদুর রহমান,*বঙ্গভঙ্গ ও বাঙালির ঐক্য*,প্রতীক প্রকাশ,ঢাকা,২০০৬,পৃ.৫৪

১৬৮. শিবাজী উৎসবের প্রেরণায় তিনি তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'শিবাজী উৎসব' কবিতা লিখে একে তাৎপর্যমন্ডিত করেন। যাতে তিনি বলেছিলেন,'এক ধর্মরাজ্য হবে ভারতে এ মহাবচন করিব সম্বল' অর্থাৎ শিবাজী উৎসবের আলোকে অর্জিত জাতীয়তাবাদী শক্তির মন্থনে রবীন্দ্রনাথ ভারতে এক ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। (উদ্ধৃত: মেজর জেনারেল এম এ মতিন, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম*,দি ইউনিভার্সেল একাডেমি,ঢাকা,২০১৭,পৃ.১২৮)

১৬৯. বাঙালি এবং মারাঠা জাতি।

১৭০. মুসলমানদের।

১৭১. সুশোভন সরকার, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৬৮

১৭২. ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে লর্ড কার্জন কর্তৃক বাংলা বিভাগ বিরোধী বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ।

১৭৩. সুশোভন সরকার, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৬৯

১৭৪. ইংরেজি ঘেষা ভদ্রলোকেরা তাঁদের মূল্যবান বিলিতি পোষাক পরিত্যাগ করেন,অন্তপুরের মহিলারা তাদের আবেষ্টনী ভেদ করে মিছিলে যোগদান করে।ছাত্ররা মিছিল ও পিকেটিংয়ের মাধ্যমে আন্দোলনে সমাপৃক্ত হয়।বাড়ি বাড়ি পরিত্যক্ত হতে থাকে বিলিতি বিলাস সামগ্রী।অনেক বড় বড় জমিদার,নামি দামি ব্যবসায়ী এবং বিভিন্ন পেশার নামকরা লোকেরা এ গণ আন্দোলনে যোগ দেন। (উদ্ধৃত: *প্রাগুক্ত*,পৃ.৭০)

১৭৫. শরিফুল ইসলাম ভূঁইয়া,ঐতিহ্যের খেরোপাতা,*দৈনিক লোককথা।* তারিখ ০১.১১.২০২১ খ্রিস্টাব্দ, পৃ.২

১৭৬. ইউসুব আলী,"মাওলানা ভাসানীর জীবন ও দর্শন",মাহমুদ কামাল (সম্পাদিত), *টাঙ্গাইলের স্মরণীয় বারো মনীষী*, সাধারণ গ্রন্থাগার, টাঙ্গাইল,২০০৩,পৃ.৯৬

১৭৭. রাখী পূর্ণিমায় প্রত্যেক বন্ধুর হাতে রাখী বন্ধনের প্রথাটিকে এদিনটিকে নেতৃবৃন্দ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নেন। (উদ্ধৃত: সুশোভন সরকার,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৭০)

১৭৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,*গীতবিতান(অখন্ড)*,স্বদেশ পর্ব(কবিতা নং-২০),বিশ্বভারতী গ্রন্থবিতান,কলিকাতা,বৈশাখ ১৪০০ (অখন্ড সূচিসহ একত্র প্রকাশ),পৃ.২৫৫

১৭৯. সুশোভন সরকার, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৭০

১৮০. ইউসুব আলী,"মাওলানা ভাসানীর জীবন ও দর্শন",মাহমুদ কামাল(সম্পাদিত),*প্রাগুক্ত*,পৃ.৯৬

১৮১. সুশোভন সরকার, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৭১

১৮২. সুশোভন সরকার, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৭১-৭২

১৮৩. যোগেশচন্দ্র বাগল, *প্রাগুক্ত*,পৃ.২২৭

১৮৪. সুশোভন সরকার, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৭২

১৮৫. যোগেশচন্দ্র বাগল, *প্রাগুক্ত*,পৃ.২৩১

১৮৬. যোগেশচন্দ্র বাগল, *প্রাগুক্ত*,পৃ.২৩২

১৮৭. বন্দেমাতরম্-পত্রিকার সম্পাদক মন্ডলিতে ছিলেন,বিপিনচন্দ্র পাল,অরবিন্দ ঘোষ,শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী,হেমেন্দ্র প্রাসাদ ঘোষ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

১৮৮. সুশোভন সরকার, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৭২

১৮৯. যোগেশচন্দ্র বাগল, *প্রাগুক্ত*,পৃ.২৩৩

১৯০. সুশোভন সরকার, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৭২

১৯১. সুশোভন সরকার, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৭৮

১৯২. ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে দুইগোষ্ঠির পুনর্মিলন ঘটে। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেসের নরমপন্থিরা সংগঠন থেকে বের হয়ে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কংগ্রেসের ক্ষমতা নরমপন্থিদের হাতেই ছিল। (উদ্ধৃত:সুশোভন সরকার, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৭৩)

১৯৩. স্বাধীনতাকামী বিপ্লবপন্থিদেরকেই সরকারি এ অত্যাচারের মূল লক্ষ্য স্থির করা হয়। চরমপন্থি তথা বৈপ্লবিক চিন্তাচেতনার ধারক-বাহক পত্রিকাগুলোর সম্পাদকদের ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। কারাদন্ড হয় ভূপেন্দ্রনাথ দত্তর,বিচার চলাকালিন মারা যান ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়।বেকসুর খালাস পান অরবিন্দ ঘোষ। আদালত অবমাননার দায়ে কারারুদ্ধ হন বিপিনচন্দ্র পাল।রাজদ্রোহমূলক সমাবেশের কণ্ঠরোধ করার জন্য একটি ফতোয়া জারি করা হয়।অপর আরেকটি ফতোয়ার মাধ্যমে কণ্ঠরোধ করা হয় সংবাদপত্রের।বন্ধ করে দেয়া হয় বৈপ্লবিক পত্রিকাগুলো। স্বদেশী ঘাটিগুলোয় মানুষের কাছ থেকে জরিমানা আদায় করতে থাকে পিটুনি পুলিশ বাহিনী। বিভিন্ন জেলায় কয়েকজন নেতাকেও সরকার কারারুদ্ধ করে।(উদ্ধৃত: সুশোভন সরকার, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৭৩)

১৯৪. বিনা ফিতে এ মামলায় আসামীদের পক্ষে আইনী সহায়তা ও মাশলা পরিচালনা করেন ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশ।এ মামলা পরিচালনা করার মাধ্যমে তার প্রজ্ঞা ও দেশপ্রেম সম্পর্কে মানুষ জানতে পারে। এবং তিনি বিখ্যাত হয়ে ওঠেন।

১৯৫. ভুপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়,*ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব*,র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেসন,কলকাতা,২০১৬,পৃ.৬১

১৯৬. আমরা মনে করি,বাংলা বিভাগ(The partition of Bengal) প্রতিরোধ কল্পে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে যে আন্দোলন ও সংগ্রাম গড়ে ওঠে তা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন নামে পরিচিতি পায়।

১৯৭. সুশোভন সরকার, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৭৫

১৯৮. পশ্চিম ও পূর্ববাংলার বাংলাভাষী অংশ সমূহকে একবাংলা ভুক্ত করার আদেশ দিলেন।ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তরের কথাও ঐ ঘোষণায় উল্লিখিত হয়। (উদ্ধৃত: যোগেশচন্দ্র বাগল,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২৬৩)

১৯৯. সুশোভন সরকার,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৭৫

২০০. যোগেশচন্দ্র বাগল,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২৬৫

২০১. তাঁরা হলেন-চিত্তপ্রিয় রায় চৌধুরী,মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত,নীরেন দাশগুপ্ত, জ্যোতিষ পাল ও জ্যোতিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ওরফে 'বাঘাজ্যোতিন'।

২০২. ভুপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১১১

২০৩. সুশোভন সরকার, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৭৬

২০৪. এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে,প্রথম বিশ্বযুদ্ধর সময় মাওলানা মুহাম্মদ আলি এবং তাঁর সহকর্মীরা কারাগারে বন্দি ছিলেন। (উদ্ধৃত: সুশোভন সরকার, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৭৬)

২০৫. সুশোভন সরকার, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৭৮

২০৬. ব্রিটিশ সরকারের সংস্কার সংক্রান্ত কর্মসূচিকে সমর্থন জানায়। (উদ্ধৃত:সুশোভন সরকার, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৭৭)

২০৭. সুশোভন সরকার, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৭৮।

২০৮. শ্রীচন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতী, *বঙ্গের কৃতি সন্তান*,প্রথম ভাগ,ডায়মন্ড বুক স্টল,কলকাতা,মাঘ ১৩৫২,পৃ.৯২

২০৯. মোহিতলাল মজুমদার,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৯১

২১০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান* (অখন্ড),পূজা পর্ব (কবিতা নং-২৪৮),পৃ,১০৮

তৃতীয় অধ্যায়

বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির ব্রিটিশ বিরোধিতার স্বরূপ সন্ধান

ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাসে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে ব্রিটিশ বিরোধিতার সূত্রপাত এক যুগান্তকারী ঘটনা। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহ তথা প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের পর হতে এই ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয় আন্দোলনের সূচনা হয়। আন্দোলনের সে পথ-পরিক্রমায় ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা ইংরেজ শাসনের অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক শোষণ-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে ভারতের নবজাত ধনিকশ্রেণি ও উন্নত পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াসেরই অনিবার্য পরিণতি। ইংরেজ-রাজ ভারতবর্ষে যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিল তার ভিতর হতেই এই শ্রেণি দু'টির জন্ম। কিন্তু জন্মের পর হতেই বিদেশি ইংরেজ রাজের কায়েমি স্বার্থের সাথে তাদের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠে।[১] তাছাড়া হিন্দু-মুসলমান ঐক্যই ছিল মহাবিদ্রোহের সকল শক্তির মূল উৎস। ইংরেজ শাসকগণ এবার ভারতীয় জনসাধারণের সংগ্রাম শক্তির এই মূল উৎসটিকে চিরতরে রুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত করে। এসময় হতেই ভারতীয় সমাজে হিন্দু-মুসলমান বিরোধের বীজ বপনের আয়োজন চলে। ১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত একশত বৎসর সময়কালে মুসলিম সম্প্রদায় ইংরেজ শাসক শক্তির সাথে বিরোধিতার পথ অবলম্বন করেছিল; ওয়াহাবি-ফরায়েজিসহ বহু গণ-বিদ্রোহে মুসলিম সম্প্রদায়ই বৈদেশিক শাসক শক্তির উচ্ছেদ ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে প্রধান শক্তিরূপে অবতীর্ণ হয়েছিল। অপরদিকে ইংরেজ শাসনের আরম্ভকাল হতে হিন্দু সম্প্রদায় ছিল ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর প্রধান সহযোগী এবং ভারতে ইংরেজ শক্তিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার প্রধান অবলম্বন। কিন্তু মহাবিদ্রোহের পর হতে এই অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটতে থাকে। হিন্দু ধনিকশ্রেণির আবির্ভাব ও তাদের নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উন্মেষে আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে শাসকগণ ক্রমশ হিন্দু বিরোধী নীতিগ্রহণ করতে থাকে; অপরদিকে চির-বিদ্রোহী মুসলমান সম্প্রদায়কে শিক্ষা ,সরকারি চাকরি প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দান করে তাদেরকে নবজারণোন্মুখ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন হতে বিচ্ছিন্ন করার প্রয়াস পায়।[২]

মুসলমানদের নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধা দান করায় ব্যবসায় ও চাকুরিসহ নানা ক্ষেত্রে হিন্দুরা সমূহ ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে পড়ে। এহেন পরিস্থিতিতে হিন্দুরা ইংরেজদের হটিয়ে ভারতীয় শাসন ক্ষমতায় আসীন হওয়ার প্রত্যয়ে ব্রিটিশ বিরোধিতায় অগ্রণী হতে থাকে। তদুপরি ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের বিকাশ এবং শিল্পটি গড়ে উঠেছিল সম্পুর্ণরূপে ভারতীয় মূলধন দ্বারা এবং এর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাও সম্পূর্ণরূপে ভারতীয়দের হাতে ছিল। এই বৈশিষ্ট্যের কারণে এই শিল্প প্রথম থেকেই ব্রিটিশ বস্ত্রশিল্পের প্রতিদ্বন্দ্বি রূপে আবির্ভূত হওয়ায় ইহাকে ব্রিটিশ সরকার ও ব্রিটিশ বস্ত্রশিল্পের মালিকগণের প্রবল বিরোধিতার

সম্মুখীন হতে হয়েছিল। প্রথম থেকেই ব্রিটিশ বস্ত্রশিল্পের মালিকগণ ও ব্রিটিশ সরকার ভারতের এই নতুন বস্ত্র শিল্পটিকে সমূলে বিনষ্ট করার জন্য সচেষ্ট হয়েছিল। ভারতের নতুন শিল্পপতি শ্রেণি ও ব্রিটিশ শিল্পপতি শ্রেণির মধ্যে এই মৌলিক অর্থনৈতিক সংঘাত ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তীব্র আকার ধারণ করে। ভারতে ব্রিটিশ বস্ত্রের ওপর যে আমদানি-শুল্ক বসানো ছিল; ব্রিটিশ বস্ত্রশিল্পের মালিকগণের দাবি অনুযায়ী ঐবৎসর সে শুল্ক ভারত সরকার তুলে দেয়। এর ফলে ভারতের বস্ত্রশিল্পকে বহুগুণ উন্নত ব্রিটিশ বস্ত্রশিল্পের সাথে অসম প্রতিযোগীতার মধ্যে পড়ে প্রভুত ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়।[৩]

ব্রিটিশ শাসনে দেশিয় শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি প্রভৃতি চরম বিপর্যয়ের মুখে এসে দাড়ায়। ইংরেজরা ভারতকে শোষণ করত এবং সব কিছু লুণ্ঠন করে নিয়ে যেতো নিজের দেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে সুদৃঢ় করার জন্য। এ লুণ্ঠিত সম্পদই গ্রেট ব্রিটেনে শিল্প-বিপ্লবের পথ সুগম করে দিয়েছিল। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার হলো-ইংরেজরা নিজেদের দেশে শিল্পায়নের কাজে বিশেষ মনোযোগী হলেও ভারতে বিপরীত নীতি অনুসরণ করতো। ফলে কৃষির ওপর যেমন উত্তরোত্তর অস্বাভাবিক চাপ বৃদ্ধি পেতে লাগলো, তেমনি সর্বক্ষেত্রে অসহনীয় বেকারত্ব ভারতবাসীর মনে ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে গভীর অসন্তোষের সৃষ্টি করে। দাদাভাই নওরোজি ভারতীয়দের চরম দারিদ্রের কারণ হিসেবে ইংরেজদের বল্গাহীন অর্থনৈতিক লুণ্ঠনকে দায়ি করেন।[৪] গোপালকৃষ্ণ গোখলে প্রচার করেন যে, ব্রিটিশ শাসন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতীয়দের *উদ্যোগ* (initiative) বিনষ্ট করছে এবং দেশের অর্থনৈতিক প্রগতির পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে।[৫] সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেন, তারা ভারতীয়দের *ভূমিদাস* (helots of the land), *কাঠুরে* (Hewers of wood) এবং *জলবহনকারী* (drawers of water)-হিসেবে বিবেচনা করছে।[৬] অনুরূপভাবে অ্যানি বেসান্ত দেশের চারুকলার ও শিল্পব্যবস্থার ধ্বংসকারি, সেচ ও স্বাস্থ্যব্যবস্থার উপেক্ষাকারী হিসেবে ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠীকে চিহ্নিত করেন। সাথেসাথে তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে জাতীয়সম্পদ লুণ্ঠনের অভিযোগ উত্থাপন করেন।[৭]

উপর্যুক্ত নেতৃবৃন্দের অভিযোগের ফলে ভারতীয় জনসাধারণের সম্মুখে ব্রিটিশ শাসনের স্বরূপ উদঘাটিত হতে থাকে এবং ধীরে ধীরে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির নেতৃত্বে, কৃষক, শ্রমিক, কারিগর ও শিল্পপতি শ্রেণি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম পরিচালনা করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে থাকে।[৮] তাছাড়া ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহের পর সরকার সামরিক বাহিনীতে নীতির আমূল পরিবর্তন সাধন করা হয়। সামরিক বাহিনীতে ভারতীয়দের সংখ্যাহ্রাস এবং ইউরোপীয় সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। অযোধ্যায় অবস্থিত *বেঙ্গল আর্মির* পরিবর্তে ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক জাতিগোষ্ঠী থেকে সিপাহি নিয়োগ নীতি গৃহীত হয়। ইংরেজ সিপাহীদের হাতে উন্নত সামরিক মারণাস্ত্র; পক্ষান্তরে ভারতীয়

সিপাহীদের নিম্নমানের অস্ত্র ব্যবহার করতে দেয়া হয়। সামরিক ক্ষেত্রে শুধুমাত্র বিভেদমূলক নীতিই গৃহীত হয়নি; বরং বৈষম্যমূলক আচরণও প্রকট হয়ে উঠে। সামরিক বাহিনীর উচ্চতর পদে কোনো ভারতীয়কে নিয়োগ না করার নীতি গৃহীত হয়। সরকারের এনীতির ফলে ভারতীয়দের মধ্যে প্রচন্ড ক্ষোভের উদ্রেক করে।[৯]

উপর্যুক্ত ঘটনাবলির প্রেক্ষাপটে ব্রিটিশ বিরোধী ক্ষোভ জাগ্রত করার পশ্চাতে সবচেয়ে কার্যকরি অনুঘটক হিসেবে সামনে আসে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর প্রান্তরে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার পরাজয় পরবর্তী ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি শাসনের অর্ধশতক অতিবাহিত হওয়ার পরে ঊনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে সংঘটিত ভারতে ইংরেজি শিক্ষা প্রচলনের যুগান্তকারি ঘটনা। রাজা রামমোহন রায়, *হেনরি ভিভিয়ান ডিরোজিও* (Henry Louise Vivian Derozio), *ডেভিড হেয়ার* (David Hare), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর,*ডিঙ্কওয়াটার বেথুন* (Jhon Eliot Drinkwater Bethune) প্রমুখ ভারতীয় ও ইংরেজ মনীষীগণ এদেশে ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। ইংরেজি শিক্ষার সুবাদে ভারতীয়রা পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিতি লাভ করে। ফলশ্রুতিতে ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব ঘটে। পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের ফলে কলকাতা কেন্দ্রিক যে নবজাগরণের সূচনা হয়েছিল তার অবশ্যম্ভাবী অভিঘাতে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণি ইউরোপীয় সমাজ,রাজনীতি ও জাতীয়তাবাদী ধ্যানধারণার সঙ্গে পরিচিত হন এবং নিজেরাও জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেন।[১০]

ইংরেজি শিক্ষার সূত্রে ভারতীয়রা *মিল* (Jhon Stuart Mill), *রুশো* (Jean-Jacques Rousseau), *বেন্থাম* (Jeremy Bentham), *ভলতেয়ার* (Voltaire), স্টুয়ার্ট (Stuart), *ম্যাৎসিনি* (Giusseppe Mazzini), *গ্যারিবল্ডি* (Giusseppe Garibaldi), *কার্ল মার্কস* (Karl Marx) প্রমুখ পাশ্চাত্য দার্শনিক ও চিন্তাবিদদের প্রগতিশীল চিন্তাধারার সংস্পর্শে এসে তাঁদের উদারনৈতিক ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হন। ফরাসি বিপ্লব, আমেরিকার স্বাধীনতা লাভ, ইটালি ও জার্মানির ঐক্য আন্দোলন, ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে আফ্রিকার জাতীয়তাবাদীদের সাফল্য প্রভৃতি সমসাময়িক ঘটনাবলি বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।[১১] তাঁদের মধ্যে ক্রমশ ইংরেজদের অর্থনৈতিক শোষণ, বর্ণবিদ্বেষ ও বৈষম্যমূলক আচরণ, দেশীয় সংবাদপত্র আইন, দেশীয় নাট্যাভিনয় আইন, *ইলবার্ট বিল* (Ilbert Bill), আন্দোলনসহ নানাবিধ অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। তাছাড়া ভারতীয়দের প্রতি ব্রিটিশ শাসকদের ঘৃণা-অসম্মান ও নানা ধরণের বৈষম্যমূলক আচরণ ভারতবাসীকে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। প্রথম থেকেই জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের অহংকারে ইংরেজরা ভারতীয়দের প্রচন্ডভাবে অবজ্ঞা

করতে থাকে। প্রশাসনিক ও সামরিক ক্ষেত্র থেকে শুরু করে দৈনন্দিন জীবন যাত্রাতেও ভারতীয়দের প্রতি তাদের তীব্র ঘৃণা-বিদ্বেষ ও অবজ্ঞার বহিঃপ্রকাশ ঘটে।[১২]

অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জনসমাগম স্থল তথা রেলপথ, স্টিমার, হোটেল-রেস্তোরা, খেলার মাঠ, ক্লাব এমনকি রাজপথে ইউরোপীয়দের জন্য আলাদা আসন সংরক্ষিত থাকত। বিচার ব্যবস্থাতেও শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ বৈষম্য প্রকট আকার ধারণ করে। স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল প্রভৃতি স্থানে ভারতীয়দের নিত্য নৈমিত্তিক প্রকাশ্য লাঞ্চনা ও অপমান ছিল সাধারণ ব্যাপার। এহেন বিমাতাসুলভ আচরণে ভারতীয়রা ইংরেজ শাসনের স্বরূপ উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়।[১৩] তাছাড়া, উনিশ শতকের প্রথম দশক থেকেই আধুনিক রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা, জাতীয় চেতনার বিকাশ এবং মানবতার অবক্ষয় সম্পর্কে বেশ কিছু শিক্ষিত মানুষ সচেতন হয়ে ওঠেন। অনেক ধরণের প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে।[১৪] উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ভারতে যেমন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি দৃঢ় হয়; তেমনি রাজনৈতিক চেতনা বিকাশের ফলে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির ব্রিটিশ বিরোধীতা ক্রমে সাংগঠনিক রূপ লাভ করতে থাকে। বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির ব্রিটিশ বিরোধী চেতনার মূলকারণ হলো ভারতীয় ও ব্রিটিশ স্বার্থের সংঘাত। এই সংঘাতের মূলে ইংরেজরা যে সর্বনাশা শোষণ শুরু করেছিল তার ফলে সর্বস্তরের মানুষের মধ্যেই অসন্তোষ দানা বেঁধে ওঠে। বাঙালির জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটে। জাতীয় মুক্তি তথা ব্রিটিশ বিরোধী নানা আন্দোলন-সংগ্রামে তারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে। বলাবাহুল্য সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক ও প্রশাসনিক কারণেই বাঙালি মধ্যবিত্তেশ্রেণির মধ্যে ব্রিটিশ বিরোধিতার পটভূমি তৈরি হয়।[১৫]

মূলত; শিক্ষক, অধ্যাপক, আইনজীবী, চিকিৎসক, লেখক, সাংবাদিকসহ বিভিন্ন চাকরিজীবীশ্রেণি ও প্রযুক্তি নির্ভর পেশাধারীরাই ছিলেন মধ্যবিত্ত শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয় আন্দোলন গড়ে তুলতে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এই মধ্যবিত্ত শ্রেণি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে মধ্যবিত্ত শ্রেণি ক্রমে মোহমুক্ত হয়। উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও সরকারি চাকরি থেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে বঞ্চিত করা হয়।[১৬] *ওয়ারেন হেস্টিংস* (Waren Hasting), *লর্ড কর্ণওয়ালিশ* (Lord Cornwallis) প্রমুখ গভর্নর জেনারেলরা ভারতীয়দের উচ্চপদে নিয়োগের বিরোধী ছিলেন। তদুপরি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি প্রত্যাশা করেছিল যে, ইংরেজরা ভারতবর্ষকে স্বায়ত্ত্বশাসনের উপযোগী করে ভারতীয়দের হাতে তুলে দেবে। কিন্তু ক্রমেই তাদের সে প্রত্যাশা ধুলিস্যাৎ হতে থাকে।[১৭] সর্বোপরি ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলন বা সিপাহী বিদ্রোহের পর থেকে যেসব প্রশাসনিক পরিবর্তন করা হয়েছিল, তাতে ভারতবাসী সন্তুষ্ট হতে পারেনি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যিক স্বার্থে ভারতীয় অর্থনীতিকে

পরিচালিত করার অভিসন্ধি শিক্ষিত ভারতীয়দেরকে ইংরেজদের প্রতি বিতৃষ্ণ করে তোলে। স্বাভাবিক কারণেই এ ক্রমপুঞ্জিভূত অসন্তোষ বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে বিক্ষুব্ধ ও ব্রিটিশ বিরোধী করে তুলেছিল।[১৮]

এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির দ্বার উন্মোচনের সঙ্গে সঙ্গে সূচনা হয় বৈপ্লবিক ভাবধারারও। সব কিছুর মধ্যে এমনকি ধর্মেও নব সংস্কারক দলের আবির্ভূত ঘটে। সঙ্কটাপন্ন সমুদ্রে দেখা দেয় নব প্রাণের জোয়ার। এজোয়ার আসতে থাকে দুকুল ছাপিয়ে। এতদসঙ্গে যুক্ত হয় ফরাসি বিপ্লব প্রসূত উন্মাদনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে ব্রিটিশ বিরোধী মানসিকতার উন্মেষ ঘটে।[১৯] মধ্যবিত্ত শ্রেণির এ ব্রিটিশ বিরোধী মানসিকতার উন্মেষে ১৮২৪ থেকে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক সমিতিগুলো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। সেজন্য ড. অনিল শীল উনিশ শতককে *সমিতিরি যুগ* (Age of Associations) বলে চিহ্নিত করেছেন।[২০]

১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দের ১৯ মার্চ রাধাকান্তদেবের সভাপতিত্বে জমিদার সমিতি গঠিত হয়। জমিদাররাই সাধারণত এ সমিতির সদস্য হতেন। এই সমিতির প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল জমিদারদের স্বার্থ রক্ষা করা। এ জমিদার সমিতিকেই ভারতের প্রথম রাজনৈতিক সমিতি হিসেবে ধারণা করা হয়।[২১] ইংরেজ শাসনের ছত্রছায়ায় এবং জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য যে সমিতি রামমোহন রায়ের শিষ্য দ্বারকানাথ ঠাকুরের উদ্যোগে, রাজা রাধাকান্তদেবের সভাপতিত্বে এবং প্রসন্নকুমার ঠাকুরের সম্পাদনায় ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দের ১২ নভেম্বর জমিদার সমিতির নাম পরিবর্তন করে জমিদার সভা (Landholders Society) করা হয়।[২২] এর প্রাণ পুরুষ ছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর। সেখানে জমিদার এবং অভিজাতদের সুযোগ সুবিধা নিয়েই মূলত আলোচনা হতো।[২৩]

জমিদারসভা ছাড়াও *ইয়ংবেঙ্গল* (Young Bengal) গোষ্ঠী'র নেতৃত্বে ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গীয় ইঙ্গ-ভারত সমিতি তথা *বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি* (Bengal British India Society) প্রতিষ্ঠিত হয়।[২৪] সর্বস্তরের মানুষের কল্যাণ এবং ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করা ছিল এসমিতির লক্ষ্য। ভারতীয় জনগণের অবস্থা ইংল্যান্ডে প্রচারের ক্ষেত্রে এসমিতি ভূমিকা রেখেছিল। সরকারি চাকরিতে বেশি সংখ্যক ভারতীয়দের নিয়োগ, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, বিচার বিভাগে জুরি ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং প্রতিনিধিত্ব মূলক সরকার ব্যবস্থা গঠনের জোর দাবি জানায়। এসমিতির দাবির মুখেই ইংরেজ সরকার ভারতীয়দের মধ্য থেকে *ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট* (Deputy Magistrates) পদে নিয়োগ দান শুরু করেন।[২৫] এই সংগঠটির দাবি-দাওয়ার মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রেণির স্বার্থের প্রতি বেশি গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছিল অনুমতি হয়। উপর্যুক্ত সংগঠন দুটি যথাক্রমে *জমিদার সভা* (Landholders Society) এবং

বঙ্গীয় ইঙ্গ-ভারত সমিতি (Bengal British Indian Society) পরবর্তীকালে কলকাতায় একত্রিত হয় এবং *ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন* (British Indian Association) নামে বিঘোষিত হয়ে ভারতের শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের প্রশ্নে সরকারের নিকট বিভিন্ন দাবি-দাওয়া উত্থাপন করতে থাকে। অপরদিকে মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার জন্য ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় *মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন* (Muhammadan Association) গঠিত হয়।[২৬]

তাছাড়া সেসময় দেশের রাজনীতি চর্চার প্রধানকেন্দ্র ছিল সংবাদপত্র গুলো। ভারতে সাংবাদিকতার সূত্রপাত ঘটে *জেমস অগাস্টাস হিকি'র* (James Agustus Hicky) সম্পাদনায় প্রথম সংবাদপত্র দি বেঙ্গল গেজেট (১৭৮০),[২৭] পরবর্তীতে *জন ক্লার্ক মার্শম্যান'র* (Jhon Clark Marshman) প্রথম বাংলা সাময়িকপত্র দিকদর্শন (১৮১৮),[২৮] সাপ্তাহিক পত্রিকা বাঙ্গাল গেজেট (১৮১৮) এর মালিক ও সম্পাদক ছিলেন হরচন্দ্র রায়।[২৯] বাঙালি কর্তৃক প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্রই শুধু নয় বরং পত্রিকাটি ভারতীয়দের সম্পাদনা ও প্রকাশনায় প্রথম সংবাদপত্র এবং রাজা রামমোহন রায় পত্রিকাটির প্রধান পৃষ্ঠপোষক এবং উৎসাহদাতা ছিলেন বলে জানা যায়। এছাড়াও রাজা রামমোহন রায়ের যথাক্রমে ব্রাহ্মণ সেবধি (The Brahmanical Magazine)(১৮২১),[৩০] সংস্বাদ কৌমুদী (১৮২১), মীরাৎ-উল-আখবার (১৮২২),[৩১] ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাচার চন্দ্রিকা (১৮২২), নীলমণি হালদারের বঙ্গদূত (১৮২৯), শেখ আলীমুল্লাহ'র সমাচার সভারাজেন্দ্র (১৮৩১), দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের জ্ঞানান্বেষণ (১৮৩১), ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সংবাদ প্রভাকর (১৮৩১) ও সংবাদ রত্নাবলী (১৮৩২),অক্ষয়কুমার দত্তের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (১৮৪৩),গুরুচরণ রায়ের রংপুর বার্তাবহ (১৮৪৭), রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বিবিধার্থ সংগ্রহ (১৮৫১), হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের হিন্দু পেট্রিয়ট (১৮৫৩), দ্বারকানাথ বিদ্যাভুষণের সোমপ্রকাশ (১৮৫৮), কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের ঢাকা প্রকাশ (১৮৬১),কাঙাল হরিনাথ মজুমদারের গ্রামবার্তা প্রকাশিকা (১৮৬৩), নরেন্দ্রনাথ সেনের ইন্ডিয়ান মিরর (১৮৯৭), শিশিরকুমার ঘোষ ও বসন্তকুমার ঘোষের অমৃতবাজার পত্রিকা (১৮৬৮), কালিপ্রসন্ন ঘোষের শুভ সাধিনী (১৮৭০),অক্ষয় সরকারের সাধারণী (১৮৭৩) প্রভৃতি। এসকল পত্রিকার প্রায় সবগুলোই ছিল বাঙালি হিন্দুদের। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যুগান্তকারী যেসব হিন্দু লেখকের আবির্ভাব ঘটে;তাদের সাহিত্য প্রতিভা বিকাশের পেছনে এ পত্রিকা গুলো মূখ্য ভূমিকা পালন করেছে। এ সম্পর্কে দিনেশচন্দ্র সেনের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সংবাদ প্রভাকর সম্পর্কে তিনি লিখেছেন-

> "এই পত্রিকাটি বাংলায় সর্বোচ্চ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ঈশ্বরচন্দ্রের প্রতিভা গদ্য, পদ্যও ব্যঙ্গাত্মক লেখার মাধ্যমে বছরের পর বছর ধরে অব্যাহত ধারায় মানুষের তৃষ্ণামোচন করেছে। বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধু মিত্রের মত বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য প্রতিভার বেশ কয়েকজন এ পত্রিকায় শিশু কলামে

লিখার মাধ্যমে তাদের সাহিত্য জীবন শুরু করেন। সাহিত্য প্রতিভার সন্ধানে এবং তরুণ লেখকদের উৎসাহ দানে ঈশ্বরগুপ্ত নিরলস ছিলেন।"[৩২]

ইংরেজ সরকার ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে রাষ্ট্রভাষা ফারসি বাদ দিয়ে ইংরেজি চালু করলে মুসলমান সমাজ অহমিকা ও অভিমান বশত: ইংরেজি শিক্ষা থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখার ফলে মুসলমানদের একে একে সবদিক থেকে পতন ঘটতে থাকে। পক্ষান্তরে ইউরোপীয় *রেনেসাঁর* (Renaissance) প্রভাবে ভারতীয় হিন্দুরা নিজেদের নতুনভাবে উদ্ভাসিত করার জোর প্রয়াস চালায়। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মুসলমানদের যখন বোধোদয় ঘটতে থাকে ততক্ষণে হিন্দুসম্প্রদায় তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভিত অনেকটা দৃঢ়তর করে নিয়েছে।[৩৩] ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে যুক্তিবাদ, জাতীয়তাবোধ এবং স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির মনে প্রবলভাবে সঞ্চারিত হতে থাকে। এভাবে ভারতের দুই বৃহৎসম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলমানদের হাতে শুরু হয় সমাজ-সংস্কার ও রাজনৈতিক আন্দোলন। এই বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির রাজনৈতিক ও সমাজ সংস্কারকদের হাতে ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে হিন্দুমেলা, ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে *ইন্ডিয়া লীগ* (India League), ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে *ভারতসভা* (Indian Association), ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে *ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস* (Indian National Congress) প্রতিষ্ঠিত হয়। এদিকে মুসলমান সংস্কারক ও নেতৃবৃন্দের মাধ্যমে ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত হলো *মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি* (Mohammedan Literary Society), ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টাব্দে *সেন্ট্রাল মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন* (Central Mohammedan Association), ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে *অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ* (All India Muslim League) প্রভৃতি রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা পায়।

এই প্রতিষ্ঠান গুলো প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায় নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তিবর্গ হলেন, রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-১৮৯৯), শিশিরকুমার ঘোষ (১৮৪০-১৯১১), সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৫৮-১৯২৫), আনন্দমোহন বসু (১৮৪৭-১৯০৬), বিপিনচন্দ্র পাল (১৮৫৮-১৯৩২), স্যার সৈয়দ আহমদ (১৮১৭-১৮৯৮), মাওলানা মোহাম্মদ আলী (১৮৭৮-১৯৩১), মাওলানা শওকত আলী (১৮৭৩-১৯৩৮),নবাব স্যার সলিমুল্লাহ (১৮৭১-১৯১৫), নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী (১৮৬৩-১৯২৯) প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ ছিলেন ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত ও আধুনিক ভাবধারায় প্রভাবিত বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির নেতা। তারা ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতেন। কিন্তু সে স্বপ্নকে বাস্তবায়নের জন্য যে দৃঢ়তা এবং একাগ্র মনোবলের প্রয়োজন ছিল তা তাদের কার্যক্রমের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়নি।কিন্তু রাজা রামমোহন রায় থেকে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পর্যন্ত সময়কালে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী ভাবাদর্শের প্রচারে প্রায় ষাট বছর অতিক্রান্ত হলেও ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলনে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণি যোগদান করেনি এবং সমর্থনও জানায়নি। তাছাড়া বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণি চারিত্রিকভাবে ইংরেজ শাসনের প্রতি অনুরক্ত ছিল। এদেশে

ইংরেজ শাসনকে তর্কাতীতভাবেই তারা সমর্থন জানায়। এদেশ হতে ইংরেজ শাসনের উচ্ছেদ তারা কখনো ভাবেনি। কারণ তাদের দৃষ্টিতে এদেশে ব্রিটিশ শাসন ছিল সমাজ-প্রগতির বাহন। ইংরেজি শিক্ষা ও সংস্কৃতির ওপর এই মধ্যবিত্ত শ্রেণির গভীর আস্থা ছিল। ফলে তারা এদেশে ব্রিটিশ শাসন স্থায়ী হোক এ কামনাই করতো। অন্যদিকে ইংরেজ ও জমিদারদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে যে কৃষক বিদ্রোহ গুলো সংগঠিত হয়েছিল সে সম্পর্কে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণি ছিল অত্যন্ত বিরূপ। এ বিষয়ে অধ্যাপক আবদুল বাছিরের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহের প্রতিও তারা বিশেষ কোনো সমর্থন জানায়নি। বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির এই আপসকামী মনোভাব তাদের সামাজিক দায়িত্ববোধ ও রাজনৈতিক ইতিহাসকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে রেখেছে।[৩৪]

উর্পযুক্ত ক্ষেত্রে কালিপ্রসন্ন সিংহ ও হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির মান রক্ষা করেন। অধিকাংশধনী ও অভিজাত বাঙালি বিপক্ষে থাকা সত্ত্বেও বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি হিসেবে একমাত্র কালিপ্রসন্ন সিংহ ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের পক্ষে ছিলেন মর্মে তথ্য পাওয়া যায়।[৩৫] অন্যদিকে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নীল-বিদ্রোহীদেও (১৮৫৮-৬০) পক্ষ সমর্থন ও জনমত গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অগ্রণী হলে কালিপ্রসন্ন সিংহও এক্ষেত্রে তাঁকে সহযোগীতা করে।[৩৬] গৌরবময় ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হন। হিন্দু পেট্রিয়ট তখন এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। কালিপ্রসন্ন কৃষকদের নিয়ে পূর্ব থেকেই চিন্তাভাবনা করতেন। ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দের ০১ জুন *ডেভিড হেয়ারের* (David Hare) স্মরণসভায় পঠিত প্রবন্ধে তিনি অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই বাংলার কৃষকদের দূরাবস্থা এবং তা থেকে পরিত্রানের উপায় নির্দেশ করেন। অন্যান্য প্রবন্ধেও তিনি দেশীয় সমাজ, সাহিত্য, রাষ্ট্র, অর্থনীতি এসবকিছু নিয়েই আলোচনা করেছেন। তবে তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল জাতীয় ভাবধারা, মর্যাদা ও চরিত্রের উন্নতি সাধন। এ জাতীয়তাবোধ থেকেই তিনি সিপাহী বিদ্রোহের খবর সংগ্রহ করতেন। নীলকরদের অত্যাচারে কৃষকদের দূর্দশায় তিনি বেদনাহত হয়ে নানাভাবে তাদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। নীল দর্পণ রচনার কারণে দীনবন্ধুর বিরুদ্ধে মামলা হলে তার সব খরচের অঙ্গীকার করেন। নীল দর্পণ ইংরেজিতে অনুবাদের অপরাধে পাদ্রী *রেভারেন্ড লঙ্* (Reverend James Long) সাহেবের জরিমানার একহাজার টাকা তৎক্ষণাৎ পরিশোধ করে দেশপ্রেম তথা জাতীয় সম্মান অর্জনে অনুপম আদর্শের স্বাক্ষর রাখেন।

অধিকাংশ ধনী অভিজাত বাঙালির বিরোধিতা সত্ত্বেও ব্রিটিশ বিরোধী সিপাহী বিদ্রোহ (১৮৫৭-১৮৫৮), নীল-বিদ্রোহ (১৮৫৮-৬০), ওয়াহাবি আন্দোলন (১৮২২-১৮৩১), ফরায়েজি আন্দোলন (১৮২০-১৮৭০) এবং জমিদারদের নানাবিধ নিপীড়নের বিরুদ্ধে পরিচালিত কৃষকদের আন্দোলন-

সংগ্রামগুলো পরবর্তীতে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন-সংগ্রামের প্রেরণা যোগায়। এ সম্পর্কে বিপিনচন্দ্র পালের মন্তব্যটি খুবই প্রাসঙ্গিক। তিনি বলেন, ওয়াহাবি আন্দোলনের দায়ে ওয়াহাবি নেতা আমির খাঁকে ব্রিটিশ সরকার ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের তিন আইন অনুসারে ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে নির্বাসন দেয়। তার প্রকাশ্য বিচারের জন্য কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি *জন পেন্টন নরম্যানের* (Jhon Paxton Norman) এজলাসে আবেদন করা হয়। এই উদ্দেশ্যে ওয়াহাবিরা বোম্বাই হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ *ব্যারিস্টার থমাস অ্যানেস্টি* (Barisster Thomas chisholm Anesty) কে কৌশুলি নিয়োগ করেছিলেন। তিনি *লর্ড মেয়োর* (Lord Mayo) শাসনকালের (১৮৬৮-৭২) অনাচার ও অবিচারের কথা আদালতে সওয়াল-জবাবের মাধ্যমে তুলে ধরে বিশেষভাবে উল্লেখ করেন যে, ওয়াহাবি বিদ্রোহ কোন সাম্প্রদায়িক ঘটনা নয়। এই বিদ্রোহ ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদ সাধন করে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠাকল্পে কোটি কোটি ভারতীয়ের বিদ্রোহ। *ব্যারিস্টার থমাস অ্যানেস্টির* এই বক্তৃতার মাধ্যমে ওয়াহাবি বিদ্রোহের যে সকল রাজনৈতিক তথ্য প্রকাশিত হয়; ওয়াহাবিরা সে সকল তথ্যসহ মোকদ্দমার পূর্ণবিবরণী সম্বলিত পুস্তিকা ছেঁপে করে চতুর্দিকে বিলি করে। ঐ পুস্তিকায় প্রকাশিত ওয়াহাবি বিদ্রোহের কলাকৌশল সংক্রান্ত তথ্যাবলি ভারতের প্রথম স্বদেশী যুগের শতশত কর্মীকে অনুপ্রাণিত করেছিল; বিষয়টি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির অন্যতম নেতা বিপিনচন্দ্র পাল বলেন, যৌবনে পুস্তিকাটি পাঠ করে আমরা একেবারে মেতে উঠেছিলাম।[৩৭]

ওয়াহাবি নেতা আমির খাঁর বিচার সম্পন্ন হওয়ার বৎসরই অর্থাৎ ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দের ২০ সেপ্টেম্বর কলকাতা টাউন হলের সিড়ি দিয়ে উঠবার সময়ে আবদুল্লাহ নামক জনৈক আততায়ীর ছোড়ার আঘাতে বিচারপতি *নরম্যান* (Jhon Paxton Norman) *নিহত হন*। এই ঘটনার অব্যবহিত পরে ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের ০৮ ফেব্রুয়ারি আন্দামান কারাগার পরিদর্শনকালে শের আলী নামক এক কয়েদির আচমকা আক্রমণে বড়লাট *লর্ড মেয়ো* (Lord Mayo) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। উর্ধ্বতন এই দুই কর্মকর্তা হত্যাকান্ডের দায় ওয়াহাবিদের কাজ বলে ব্রিটিশ সরকার ধরে নেয়; এবং অত্যন্ত নির্মমভাবে ওয়াহাবিদের দমন করে।[৩৮] এহেন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হত্যাকান্ডের ঘটনার মাধ্যমে ব্রিটিশ প্রশাসনের মধ্যে ত্রাস সঞ্চারের কৌশল থেকেও পরবর্তীকালে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির সশস্ত্র বিপ্লবীরা উদ্দীপ্ত হয়ে থাকবেন; বিপিনচন্দ্র পালের উপর্যুক্ত মন্তব্যে তা অনুমিত হয়।

১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে *লর্ড কর্নওয়ালিশ* (Lord Cornwallis) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে যে জমিদারশ্রেণি সৃষ্টি করেছিলেন; সে জমিদারশ্রেণি তাদের সহকারী হিসেবে এ মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে গড়ে তোলে। কলকাতাকে কেন্দ্র করেই এমধ্যবিত্ত শ্রেণি বিকশিত হয়। এদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সুপ্রকাশ রায়

উল্লেখ করেছেন, নতুন জমিদার গোষ্ঠী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণি ভূসম্পত্তির একচ্ছত্র অধিকার বলে ব্রিটিশ শাসনের রক্ষণাবেক্ষণে থেকে সমাজের শীর্ষস্থানে আরোহন এবং সামাজিক নেতৃত্ব লাভের জন্য উন্মুখ হয়ে উঠে। উন্নত ইউরোপীয় শিক্ষা ও সভ্যতা তাদেরকে সামাজিক নেতৃত্বলাভের সংগ্রামে বিশেষভাবে সহায়তা করে।এই সামাজিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ইউরোপীয় শিক্ষা ও সভ্যতার প্রেরণায় তারা একত্রে ইউরোপীয় *রিনাসান্স'র* (Renaissance) অনুকরণে উনিশ শতকের গোড়ার দিকে প্রথমে বাংলায় এবং পরে সমগ্র ভারতে *রিনাসান্স* বা নবজাগরণ আন্দোলন আরম্ভ করে। এ আন্দোলন কেবলমাত্র জমিদার এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণির নিজ স্বার্থে পরিচালিত হয়েছিল বলে আন্দোলন চলাকালীন শোষিত কৃষক-সম্প্রদায়কে প্রথম থেকেই তারা বর্জন করে চলে। এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে এ আন্দোলনকারীরা কৃষক-সংগ্রামের বিরোধীতা করতেও কুণ্ঠিত হয় নাই।[৩৯]

ব্রিটিশ শাসকগণ ভারতে যে শাসন ও শোষণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে প্রথমভাগে তার সর্বাধিক শিকার হয়েছিল মুসলমান চাষী। ব্রিটিশ শক্তি প্রধানত মুসলমান শাসকদের নিকট হতে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে এদেশের শাসন-ক্ষমতা করায়ত্ব করেছিল। কাজেই ব্রিটিশ শক্তি প্রথম থেকেই মুসলমানদের শত্রুজ্ঞান করে। অন্যদিকে মুসলমানগণও একই কারণে ইংরেজ শাসনের আরম্ভ থেকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত এই বিদেশি শাসক গোষ্ঠীর সাথে অসহযোগীতা ও বিরোধীতা করেছিল। অন্যদিকে হিন্দুরা প্রথম থেকেই কোম্পানি শাসকদেরকে সহযোগিতা করে। সেজন্য ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে যখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হয়: তখন প্রধানত প্রায় সকল জমিদারিই হিন্দুদের অধিকারে চলে যায়। সেজন্য বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার প্রায় সকল জমিদারই হিন্দু; আর তাদের অধিনস্ত চাষীদের অধিকাংশই মুসলমান। এই অবস্থার সুযোগগ্রহণ করে প্রথম থেকে শেষাবধি ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠী,জমিদার-মহাজন ও অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীলগণ বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার সকল কৃষক বিদ্রোহকে সাম্প্রদায়িক আখ্যায়িত করে উক্ত বিদ্রোহকে হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক বিরোধে পরিণত করার প্রয়াস পায়। ফলশ্রুতিতে বহু কৃষক-বিদ্রোহ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।[৪০] তাছাড়া ধনসম্পদ ও উন্নত শিক্ষালাভের ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণির অধিকাংশই জমির প্রত্যক্ষ সম্পর্ক হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তারা ভাগচাষী, আধিয়ার, কৃষিশ্রমিক প্রমূখের ওপর কৃষি কার্যের ভার অর্পণ করে 'ভদ্রলোক' হন। এভাবে বাংলা এবং সমগ্র ভারতের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি ভূমি-সম্পৃক্ততা হতে নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন করে ভদ্রলোক বা বাবুশ্রেণিতে পরিণত হয়। জমিদার গোষ্ঠীর ন্যায় এদের একটি অংশ কৃষিক্ষেত্র হতে বহু দূরে অবস্থান করে কৃষক শোষণের দ্বারা জীবিকা নির্বাহের পন্থা অবলম্বন করে। কিন্তু অপর অংশটি গ্রামাঞ্চলে থেকেই কৃষক শোষণের কার্য চালাতে থাকে।

মধ্যবিত্ত শ্রেণির এই ভূমিকা ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলন তথা মহাবিদ্রোহ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। মহাবিদ্রোহের সময় শাসকগোষ্ঠী উপলব্ধি করেছিল,ভারতের গণশক্তির ক্রমবর্ধমান বৈপ্লবিক সংগ্রাম সামরিক শক্তির দ্বারা সাময়িকভাবে পরাজিত করা সম্ভব হলেও এই শক্তিকে চিরতরে পদানত করে রাখা একাকী বৈদেশিক শাসকগোষ্ঠীর সাধ্যাতীত। এজন্য ভারতের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলোর সর্বাঙ্গীন সহযোগিতা অপরিহার্য। সুতরাং মহাবিদ্রোহের পরেই ব্রিটিশ শাসকবর্গ সামন্ত রাজন্যবর্গ ও জমিদারগোষ্ঠীর সাথে বন্ধুত্ব ও ঐক্য গড়ে তোলার প্রয়াস পায়। একই সাথে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ নিজেদের প্রয়োজনে যে সামান্য সংস্কার কার্য আরম্ভ করেছিল এ সময় তা পরিত্যাগ করে তৎপরিবর্তে সকল প্রকারের সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কার সুরক্ষা নীতিগ্রহণ করে।[৪১] মহারানী ভিক্টোরিয়ার ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের ঘোষণায় 'ভারতীয়দের ধর্ম বিশ্বাস ও ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকার দৃঢ় সংকল্প ঘোষিত হয়। এবং ভারতীয় সমাজের রক্ষণশীল সম্প্রদায়গুলোকে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় যে, ভারতবর্ষের প্রাচীন ঐতিহ্য, প্রাচীন প্রথা ও অধিকার সর্বপ্রযত্নে সুরক্ষিত করা হবে। কিন্তু পরবর্তীতে ক্রমবর্ধমান কৃষি-সঙ্কট, ব্রিটিশ শোষণের মাত্রা বৃদ্ধি এবং শিক্ষিত বেকার সংখ্যার ক্রমবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মধ্যবিত্ত শ্রেণির ভূমিকাও ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হতে থাকে। ইংরেজ শাসনের সর্বব্যাপী শোষণ গভীরতর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বল্পবেতনের কেরানিকুলের দুর্দশাও ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। তদুপরি প্রতিবৎসর শত শত ছাত্র স্কুল-কলেজ থেকে বের হয়ে শিক্ষিত বেকারের দল ভারী করে তোলে। শিক্ষিত যুবকের সংখ্যা এরূপ বৃদ্ধি পায় যে, তাদের সকলের চাকরি লাভের সম্ভাবনা লোপ পেলেও বেকারের সংখ্যা দিনকে দিন বেড়েই চলে। উপর্যুক্ত বিষয়ে একটি চমৎকার ব্যাখায় *লেস্টার হাসিনসন* (Lester Hutchinson) বলেছেন, শাসন বিভাগের লাভজনক উচ্চ পদগুলো ইংল্যান্ড হতে আমদানি করা ইংরেজদের জন্য একচেটিয়া করা হয়েছিল। এছাড়া অন্য চাকরির দরজাও তাদের নিকট বন্ধ ছিল।তাদের বৃহৎ একটি অংশ আইন (Law) বিষয়ে ডিগ্রি লাভ করে। কিন্তু খুব দ্রুতই যুবক উকিলের সংখ্যা মোট মামলা মোকদ্দমার সংখ্যা ছাড়িয়ে যায় এবং বেকার উকিলে আদালত পূর্ণ হয়ে উঠে। শুধুমাত্র ব্রিটিশ ও ভারতীয় ব্যবসায়ীদের মাল-গুদাম ও সরকারি অফিসের চাকরি আর কেরানি গিরি তাদের জন্য উম্মুক্ত ছিল। কিন্তু এখানেও কেরানির চাহিদা অপেক্ষা সরবরাহ অনেক বেশি এবং বেতনের হার ছিল অবিশ্বাস্য রকমের কম। সুতরাং দীর্ঘকাল যাবৎ বহু অর্থব্যয়ে শিক্ষা শেষ করার পর ভারতীয় ছাত্রগণকে অনিবার্যরূপে বেকার জীবনের মুখোমুখি দাড়াতে হয়। অন্যথায় তারা কোন অফিসে জীবিকার মান অপেক্ষাও অল্পবেতনের চাকরিগ্রহণ করতে বাধ্য হয়। এটাই ছিল তাদের বিধিলিপি।[৪২]

ভারতবর্ষে বিশেষত বাংলায় বহু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলেও সেগুলোর শিক্ষকের পদও ক্রমশ পূর্ণ হয়ে যায় এবং প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষকের সরবরাহ প্রায় দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়ায়। এছাড়াও ভারতীয়

শিক্ষকদের বেতনের হার ছিল অত্যন্ত কম। ফলশ্রুতিতে শিক্ষকদের মধ্যে দ্রুতই চরম আর্থিক দুর্দশা দেখা দেয়। শাসক গোষ্ঠীর মুখপাত্র *ভেরিনি লোভেট* (Verney Lovett) বলেন, সাধারণ স্তরের স্কুল শিক্ষকদের সংখ্যা অত্যধিক।তাদের বেতনও সামান্য। জীবনধারণের শেষ উপায় হিসেবেই তারা এই চাকরি গ্রহণ করেন। কিন্তু তাদের মধ্যেও বিক্ষোভের অন্ত নাই।[৪৩] উনিশ শতকের শেষ দিকে এই বেকার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দুর্দশা চরম আকার ধারণ করে। বৃটেনের আর্থিক সঙ্কট হতে উত্তরণের জন্য ইংরেজদের ভারত শোষণও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। শাসকগোষ্ঠী তাদের আর্থিক সঙ্কটের সকল বোঝা ভারতীয় জনগণের ওপর চাপিয়ে দিয়ে তাদের জীবণ ধারণের সকল ব্যবস্থা বিপর্যস্ত করে দেয়। ফলশ্রুতিতে কৃষক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির সম্মুখে ধ্বংসের ছবি ফুটে উঠে। কিন্তু এ মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্য থেকে বিদেশি শাসকের সর্বগ্রাসী শোষণ হতে আত্মরক্ষা ও জাতীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এক নতুন চেতনা ও নতুন ইংরেজ বিরোধী ধ্বনি উত্থিত হয়। বিভিন্ন দিক হতে আরও একটি সংগ্রামের ধ্বনি ভারতবর্ষকে প্রকম্পিত করে তোলে।

শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির অর্থনৈতিক শোচনীয় অবস্থা তাদের মধ্যে একটি ব্যাপক বিক্ষোভ জাগিয়ে তোলে। তাদের এহেন অর্থনৈতিক দৈন্যতা চরম জাতীয়তাবাদের মধ্যদিয়ে রাজনৈতিক রূপ পরিগ্রহ করে। তারা স্পষ্ট দেখতে পায়, বিদেশি ইংরেজ শাসনই তাদের দুঃখ-দুর্দশা ও জাতীয় অধঃপতনের একমাত্র কারণ। এই বিদেশি শাসনের প্রতি তীব্র ঘৃণা তাদের মধ্যে বিদ্রোহের আগুণ ধুমায়িত করে তোলে। ভারতের বিশেষ করে বাংলার স্কুল-কলেজগুলো হয়ে উঠে সে বিদ্রোহের কেন্দ্রস্থল; এ সকল কেন্দ্রের পরিচালক এবং নতুন বৈপ্লবিক মন্ত্রের প্রচারক রূপে আবির্ভূত হন সেই সকল প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণ। এভাবে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে ধীরে ধীরে বৈপ্লবিক আন্দোলনের বীজ উপ্ত হয় এবং তা দ্রুতই বৃদ্ধি পায়। চরম অর্থনৈতিক দুর্দশাই যে মধ্যবিত্ত শ্রেণির বৈপ্লবিক আন্দোলনের প্রধান উৎস তা শাসক গোষ্ঠীর মুখপাত্রগণও স্বীকার করেছেন।এবিষয়ে ব্রিটিশ আমলা ও লেখক *ভেরিনি লোভেটের* (Verney Lovett) বক্তব্যটি খুবই প্রাসঙ্গিক–

> এতে কোন সন্দেহ নাই যে,বাংলার স্কুল-কলেজগুলোতে বৈপ্লবিক চিন্তা ও চেতনার এরূপ বিস্তার লাভের আংশিক কারণ হলো এসকল প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষকদের সামান্য বেতন। ভয়াবহ দারিদ্র ও জ্বালাময়ী ভাষায় লিখিত সাহিত্য দ্বারাই তাঁদের মনোভাব গড়ে উঠে।অনেক সময় তারা বিপ্লবের স্বার্থে সাংবাদিকতা-বৃত্তি গ্রহণ করেন। সাংবাদিকতার ছদ্মাবরণে তাঁরা এই বৈপ্লবিক চিন্তাধারা প্রচার এবং সামান্য জীবিকা নির্বাহ করেন।[৪৪]

এহেন পথপরিক্রমায় দেশের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের সংগ্রাম নতুনমোড় নেয়। শহরে আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী ভারতীয় ধনতন্ত্রীরা তাদের শিল্প বিকাশের জন্য সাম্রাজ্যবাদের বৈরী নীতি সত্ত্বেও অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সুবিধা আদায়ের সংকল্প নিয়ে অগ্রসর হয়। নবজাত শিল্পসমূহের মধ্য হতে

শ্রমিকশ্রেণি বের হয়ে শহরের সাথে গ্রামাঞ্চলের সংযোগ সাধন করে। এপথেই ইংরেজি ও সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির ভিতর অর্থনৈতিক বিক্ষোভ উত্তাল আকার ধারণ করে।[৪৫] ইতোমধ্যে জাতীয়তাবাদের নিম্নোক্ত তিনটি প্রধান উপাদান সমাজে দৃশ্যমান হয়ে উঠে: (ক) বিপুল অর্থনৈতিক স্বার্থের প্রতিনিধি হিসেবে এবং ভারতের নিজস্ব শিল্প-বিকাশের ঘোরতর বিরোধী একটি স্বেচ্ছাচারি ও উৎপীড়ক বিদেশী সরকার; (খ) ভারতের ক্রমবর্ধমান ধনিকশ্রেণি; এবং (গ) উন্নত ইংরেজি শিক্ষায় সুশিক্ষিত ও অর্থনৈতিক কারণে বিশেষ বিক্ষুব্ধ ভারতীয় বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়।[৪৬] এতিনটি উপাদানের সমন্বয়ে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ভিত্তি গড়ে উঠে। এসময় উৎপীড়নকারি বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে ভারতের জাতীয় বিদ্রোহের অগ্রদূতরূপে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের বিক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ রূপে নতুন কয়েকটি সংবাদপত্র প্রকাশ পায়। এ সংবাদপত্র গুলো তীব্র ভাষায় লেখনি ও তীক্ষ্ণ সমালোচনার কষাঘাতে ব্রিটিশ সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে।তাদের সমালোচনায় ব্রিটিশ শাসনের উৎপীড়ন ও শোষণের বর্বরতম রূপ উদঘাটিত করে জনগণের চোখ খুলে দিতে থাকে।শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ আরম্ভ হয়।[৪৭] দেশের ক্রমবর্ধমান এহেন সংঙ্কট থেকে উত্তরণে শিক্ষিত বঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণি এসময় ঐক্যবদ্ধভাবে ও অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে পরিস্থিতি মোকাবিলায় সাংগঠনিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এসময় তারা উপলদ্ধি করেন একক উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় আন্দোলন-সংগ্রাম পরিচালনা করা সম্ভব নয়। সাংগঠনিকভাবে অগ্রসর হওয়ার চিন্তা ভাবনা শুরু করেন।

এভাবে বাংলায় মধ্যবিত্ত শ্রেণি ক্রমশ রাজনৈতিকভাবে সচেতন হয়ে উঠলে তাদের জন্যে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা অত্যাবশ্যক হয়ে ওঠে। এদিকে কোম্পানি সনদের মেয়াদ শেষ হয়ে এলে,কোম্পানিকে নতুন সনদ প্রদানের প্রাক্কালে ভারতের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কাছে ভারতবাসীর দাবিদাওয়া উত্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। মূলত ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দের কোম্পানি সনদ আইনকে কেন্দ্র করে ভারতবাসীর রাজনৈতিক আন্দোলন ও আশা-আকাঙ্ক্ষা সক্রিয় হয়ে ওঠে। নতুন সনদ প্রাপ্তিকে সামনে রেখে ভারতবাসীর অভাব অভিযোগ গুলোর প্রতি ইংল্যান্ড কর্তপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ ও আশু ফল লাভের উদ্দেশ্যে তৎকালীর নেতৃবৃন্দ ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দের ২৯ অক্টোবর *ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন* (British Indian Association) প্রতিষ্ঠা করেন।[৪৮] অ্যাসোসিয়েশনটিতে সদস্য হিসেবে ইউরোপীয়দের রাখা হয়নি। এর প্রথম সভাপতি ছিলেন জমিদার রাধাকান্ত দেব এবং প্রথম সম্পাদক ছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের নেতৃবৃন্দ এসমিতিতে যোগদেন। জমিদার ছাড়াও বড় বড় ব্যবসায়ী এবং রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মতো বুদ্ধজীবী সম্প্রদায়ের লোকেরাও এ সমিতির সদ্য

হয়েছিলেন। ভারতবাসীর মুখপাত্র হিসেবে ভারতীয় সদস্যদের নিয়ে গঠিত এই প্রতিষ্ঠানটি ভারতের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রাজস্ব, পুলিশ,আইনকানন ও প্রশাসন সংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে ওপর সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বি.বি.মিশ্রের মতে,"জমিদারদের স্বার্থরক্ষার লক্ষ্যে এই পতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠিত হয়।"[৪৯] তবে জাতীয় সমস্যা সম্পর্কেও এই সমিতি প্রস্তাব নিতো বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে ড.অমলেশ ত্রিপাঠীর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, এই সমিতির সদস্যরা যদি দেখতেন যে, জাতীয় দাবি সমর্থন করলে তাঁদের শ্রেণিস্বার্থ অর্থাৎ জমিদারির বা ব্যবসায় স্বার্থ ক্ষুন্ন হবে তাহলে তারা পিছু হটতেন।[৫০]

১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা টাউন হলে ভাইসরয় *নর্থব্রুকের* (Lord North Brook) সভাপতিত্বে ব্রিটিশ *ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের* একটিসভা অনুষ্ঠিত হয়। সে সভায় ভাইসরয়ের উপস্থিতিতে তারই বিরুদ্ধে নিন্দাসূচক একটি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করতে চেয়েছিলেন শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং তার নয়জন সহযোগী। কিন্তু তাদের সে প্রস্তাব উত্থাপন করতে দেয়া হয়নি।[৫১] শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং তার নয়জন সহযোগীর এই ভূমিকা পরবর্তী ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন-সংগ্রামে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির নেতৃত্বকে উজ্জীবিত করে। সরকার মাঝে মাঝে এই সমিতির সাথে আলাপ-আলোচনা করতেন এবং কোন আইন পাস করার পূর্বে এই সমিতির মতামত নিতেন। এই সমিতির সদস্যরা মাঝে মাঝে বড়লাটের আইন পরিষদের সদস্য মনোনীত হতেন। এক পর্যায়ে এ সমিতি কিছুসংখ্যক জমিদার যেমন শোভাবাজারের দেব, জোড়াসাঁকোর ঠাকুর, উত্তর পাড়ার মুখার্জী পরিবারের হাতে কুক্ষিগত হয়ে পড়ে এবং শুধুমাত্র জমিদার ও ধনিকশ্রেণির মুখপাত্রে পরিণত হয়। ফলে দেশের ক্রমবর্ধমান বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির সমর্থন লাভ এবং প্রতিভাধর ছাত্রসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে না পারায় এবং মফস্বলেও প্রভাব না থাকায় ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের কার্যক্রম ক্ষীণ হয়ে পড়ে।

ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের কর্ণধারেরা ধনী ব্যবসায়ী ও জমিদারশ্রেণি থেকে এসেছিলেন। তারা ব্রিটিশ প্রশাসনকে তোয়াজে রেখে নিজেদের স্বার্থরক্ষা করে চলতেন। মাঝে মাঝে নিজেদের স্বাধীন চিন্তা'র বিকাশ দেখিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকারের দাবি তুলতেন-তবে বেশির ভাগই তা মিহি সুরে। অবশ্য সকল সদস্যই যে ব্রিটিশ প্রশাসনের চোখে নিরীহ ছিলেন তা নয়। তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ সজোরে রাজকীয় নিষ্ঠুরতা বা জাতিগত দ্বন্দ্ব সৃষ্টির প্রতিবাদও করতেন। কিন্তু তাতে খুব একটা কাজ হতো না।[৫২] তবুও ইংরেজি শিক্ষিত জমিদারগণ নিজস্ব সংগঠনের নেতৃত্বে এবং সংগঠনভুক্ত সদস্যগণই তাদের রাজনৈতিক মতামত তাদেরই সংগঠনের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারলেও;বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির নিজস্ব রাজনৈতিক সংগঠন না থাকায় নিজেদের মতামত

প্রকাশের সুযোগ ছিলনা। উদ্ভুত পরিস্থিতির অবসান এবং রাষ্ট্রীয় চেতনার উন্মেষ সাধনে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হতে থাকে। এইরূপ অবস্থার অবসানকল্পে শিশিরকুমার ঘোষ এবং শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে *ইন্ডিয়া লীগ* (India League) প্রতিষ্ঠিত হয়।[৫৩] আনন্দমোহন বসু এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই সংগঠনটিতে যোগদান করে এর কার্যক্রমকে গতিশীল করতে ভূমিকা রাখেন। ভারতীয়দেরকে রাজনৈতিক শিক্ষায় উৎসাহ দেয়া এবং জাতীয়তাবোধ সৃষ্টি করাই ছিল *ইন্ডিয়া লীগের* একমাত্র উদ্দেশ্য।[৫৪] ইন্ডিয়া লীগের উদ্দেশ্য গুলো ছিল তাৎপর্য মন্ডিত–(ক) সর্বসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা বিশেষতঃ এক জাতিত্ববোধের উন্মেষ সাধন; (খ) বিভিন্ন সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার উপায় নির্ধারণ; (গ)দেশের অর্থোৎপাদিকা শক্তি যাতে সম্যক বিকাশ লাভ করতে পারে, তার উপায় অবলম্বন করা।[৫৫]

ইন্ডিয়া লীগ (India League) শুধু মধ্যবিত্তই নয়;সাধারণ মানুষকেও আকর্ষণ করতে চেয়েছিল অনুমিত হয়।ইন্ডিয়া লীগের কর্মকর্তাদের মধ্যে ৬৮% মধবিত্তশ্রেণির হলেও ৩২% ছিলেন নিম্নমধ্যবিত্ত ও সাধারণশ্রেণির অন্তর্ভূক্ত। সদস্যদের বেশিরভাগ সদস্যই ছিলেন পূর্ববাংলার অধিবাসী। ইংরেজি সংবাদপত্র "The Englishman' এই সমিতির উচ্চসিত প্রশংসা করে বলেছিল-"The First marked sign of awakning of the people of this side of India to practical life."[৫৬] পূর্ববর্তী সংগঠনগুলো যেখানে ধর্মের মাধ্যমে ঐক্য স্থাপনের চেষ্ট করতো, ইন্ডিয়া লীগ সেখানে ধর্মনিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে জাতীয় রাজনৈতিক ঐক্যের আদর্শ তুলে ধরে। অমৃতবাজার পত্রিকার মাধ্যমে ইন্ডিয়া লীগের প্রচার কাজ চালানো হতো। অনিল শীলের মতে, শিক্ষক, সাংবাদিক ও আইনজীবীদের সহায়তায় ইন্ডিয়া লীগ ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পথ দেখায়।[৫৭] কালক্রমে শিশিরকুমার ঘোষের সাথে মতান্তর ঘটার ফলে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দমোহন বসু ইন্ডিয়া লীগ থেকে পদত্যাগ করেন এবং ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে ইন্ডিয়া লীগেরই আদর্শের প্রতিচ্ছবি স্বরূপ *ভারতসভা* (Indian Association)প্রতিষ্ঠা করেন।[৫৮] সর্বোপরি একথা বলা যায় যে, ইন্ডিয়া লীগ এবং *ভারতসভার* কার্যক্রম প্রায় অভিন্ন ছিল। ইন্ডিয়া লীগের সদস্যদের মধ্যে যদি মতানৈক্য না হতো তা হলে বোধহয় ভারতসভার সৃষ্টি হতো না।

ইন্ডিয়া লীগের অধিকাংশ সদস্যই ভারতসভায় যোগদানের ফলে *ইন্ডিয়া লীগ* (India League) উঠে যায় এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণির রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান *ভারতসভা* (Indian Association) শক্তিশালী হয়। প্রতিষ্ঠাকালে ভারতসভার উদ্দেশ্য হিসেবে যা উল্লেখ করা হয় তা হলো: (ক) বলিষ্ঠ জনমত গঠন; (খ) সাধারণ রাজনৈতিক স্বার্থ ও আশা আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে ভারতের বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন মতাবলম্বি

লোকের একত্রীকরণ; (গ) হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য গঠন; এবং (ঘ) বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামে গণসংযোগ প্রতিষ্ঠা।[৫৯]

প্রতিষ্ঠালগ্নে আরও বলা হয় ভারতসভা জনশিক্ষা বিস্তার এবং জনসাধারণের রাজনৈতিক চেতনা বিকাশের জন্য কাজ করবে। মধ্যবিত্ত শ্রেণির আলোড়ন বাংলায় আরম্ভ হলেও পর্যায়ক্রমে তা সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। কালক্রমে এ ভারতসভা (Indian Association) বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রকৃত মুখপাত্ররূপে গড়ে উঠে।[৬০] প্রকৃতপক্ষে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির রাজনৈতিক আন্দোলন সর্বপ্রথম বাংলাদেশেই আরম্ভ হয়। ক্রমান্বয়ে এই আন্দোলন ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৭৭খ্রিস্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ভারতসভার পক্ষ থেকে কয়েকটি প্রদেশ ভ্রমণ করেছিলেন। তাছাড়া সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আনন্দমোহন বসু মধ্যত্তিশ্রেণির নেতৃত্বে ব্রিটিশবিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলন সর্বব্যাপী এবং গতিশীল করার জন্য ছাত্রদেরকে আন্দোলনে টেনে আনার প্রয়াসে *স্টুডেন্টস্ অ্যাসোসিয়েশন* (Students Association) গঠন করেন।[৬১] সুরেন্দ্রনাথের প্রভাবে ছাত্ররা দলে দলে *স্টুডেন্টস্ অ্যাসোসিয়েশনে* যোগদানের মাধ্যমে ভারতসভার পতাকাতলে শামিল হয়। অনিল শীলের মতে, *ভারতসভা* (Indian Association) ছিল গ্রাজুয়েট ও চাকুরে শ্রেণির প্রভাব বিস্তারের কেন্দ্র, যারা নিজেদের মধ্যবিত্ত বলে দাবি করতেন।[৬২] ১৮৭৬-৮৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মফস্বল শহরগুলোতে এসমিতির ১২৪ টির মত শাখা খোলা হয়। মফস্বলের ছাত্ররাও শহরের ছাত্রদের মতই সুরেন্দ্রনাথের প্রভাবে ভারতসভার স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে পরিণত হয়। গণতান্ত্রিক গঠনতন্ত্র ছিল থাকার কারণে যুবকশ্রেণির কর্মীরা সহজেই এই ভারতসভার সাথে সম্পৃক্ত হতে পারতো। *ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের* (British Indian Association) মতো অর্থবল না থাকা সত্ত্বেও *ভারতসভার* (Indian Association) নেতৃত্বাধীন আন্দোলন-সংগ্রামে গণসম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া ভারতসভার উদ্যোগে বিভিন্ন পেশাজীবীদেরকে অ্যাসোসিয়েশন গড়ে তোলার জন্য জোর তাগিদ দেয়া হয়। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আনন্দমোহন বসু আইনজীবীদেরকে বাংলার মধ্যত্তিশ্রেণির রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের অগ্রদূত বলে মনে করতেন। একদা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আইনজীবীদের উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন,আইন পেশায় নিয়োজিত উকিল-ব্যারিস্টারদের সরকারি কৃপারপ্রতি তাকিয়ে থাকার যুক্তিসঙ্গত কোনো কারণ নেই। তাঁদের নিজেদের অধিকারের বলে নিজেদের দাঁড়াবার শক্তি ও সামর্থ রয়েছে। সকল দেশের আইনজীবীরা সবরকম আন্দোলন-সংগ্রামে সদাসর্বদা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে।[৬৩] সুরেন্দ্রনাথ এসম্পর্কে আরও বলেছিলেন,কৃষক ও দোকানদাররাও তাদের স্ব স্ব দাবি আদায়ের স্বার্থে সমিতি গড়ে তুলতে পারেন। দোকানীরা তো কারও ওপর নির্ভরশীল নয়; তাদের কাজ সম্পূর্ণ স্বাধীন। তারা কেনো দোকান সমিতি গড়তে পারবেন না? কৃষকদেরই বা

কেনো কৃষক সমিতি থাকবেনা? এভাবে ভারতসভা সমাজের সকল শ্রেণি ও পেশার লোকজনের মধ্যে সংগঠন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে উৎসাহ যোগায় এবং তাদেরকে নিজ নিজ শ্রেণিগত স্বার্থে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন-সংগ্রামের আহ্বান জানায়।

ভারতসভা জেলায় জেলায় বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে থাকে এবং বিভিন্ন বিষয়ে আবেদন প্রচার ও আন্দোলন-সংগ্রাম সংগঠিত করতে থাকে। ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দের রেন্ট অ্যাক্ট ও পাবনা কৃষক বিদ্রোহ উপলক্ষ্যে ভারতসভা কৃষকদের পক্ষ নিয়ে আন্দোলন করে। ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার প্রণীত প্রজাস্বত্ত্ব আইনের খসড়ার প্রতিবাদ জানায়। এবিষয়ে শ্রীরজতকান্ত রায়ের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, ব্রিটিশের অর্থনৈতিক শোষণ ও একাধিপত্যের বিরুদ্ধে *ভারতসভা* (Indian Association) সচেতন প্রতিবাদ জানাতে থাকে।[৬৪] এসময় *ভারতসভার* উদ্যোগে স্থানে স্থানে *রায়ত সভা*[৬৫] প্রতিষ্ঠিত হয়। এ *রায়ত সভা* সম্পর্কে সাপ্তাহিক সঞ্জীবনী পত্রিকার সম্পাদক ও নবীনব্রাহ্ম অধ্যাপক কৃষ্ণকুমার মিত্র তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন, ভারত সভার সম্পাদক দ্বারকানাথ গাঙুলি আমাকে সঙ্গে নিয়ে নদীয়া, হুগলী ও হাওড়া জেলার নানাস্থানে গমন করে প্রজাসভার আয়োজন করতেন। আনন্দমোহন বসু ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় কোন কোন সভায় গমন করে জমিদার ভয়ে ভীত প্রজাগণের মনে সাহস-সঞ্চার করে দিতেন। নদীয়া জেলার কৃষ্ণগঞ্জের সভায় প্রায় বিশহাজার প্রজা সমবেত হয়েছিল। কোন কোন প্রজা জমিদারের ভীষণ অত্যাচার-কাহিনী সভাস্থলে বর্ণনা করে সমাগত লোকদিগকে উত্তেজিত করে তোলেন। পোড়াদহের সভায় প্রায় দশ হাজার লোক,কুষ্টিয়ার সভায় প্রায় পনের হাজার লোক যোগদান করেছিল। তারকেশ্বেরে এক বিশাল-সভা হয়েছিল। সে সভায় আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, শোভাবাজারের রাজকুমার নীলকৃষ্ণ, বিনয়কৃষ্ণ প্রমুখ কলকাতার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ যোগদান করে জমিদারের অত্যাচার কাহিনী প্রজার মুখ থেকে প্রত্যক্ষভাবে শ্রবণ করেছিলেন। এই সকল আন্দোলনের ফলে ব্রিটিশ সরকার ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের প্রজাস্বত্ত্ব আইনের পান্ডুলিপি প্রস্তুত করে।[৬৬] ভারতসভার উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত রায়তসভার আন্দোলনে প্রজাস্বত্ত্ব আইনপাসের এ সাফল্য বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির নেতৃবৃন্দকে নবতর আন্দোলন-সংগ্রামে নামার অনুপ্রেরণা যোগায় এবং অধিকার আদায়ে তারা আশাবাদী হয়ে উঠেন।

তৎকালে ভূবনমোহন দাস সম্পাদিত *ব্রাহ্মপাবলিক ওপিনিয়ন* নামক একটি পত্রিকায় রায়তসভাকে বলা হয়েছিল 'Rent union'। এ 'Rent union'-গুলোর উদ্দেশ্য ছিল কৃষকদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করা। জমিদারের সঙ্গে প্রজার ভাজনার বিষয়টি অর্থাৎ বিভিন্ন খাতে বেআইনি করধার্য, এগুলো নিয়ে আলোচনা হতো। তবে এ সংক্রান্ত বিষয়ে যে সব প্রশ্নের উদ্ভব হয়েছিল সে সম্পর্কে অহেতুক গুরুত্ব

দেওয়া হতো না। বরং প্রজার ওপর জমিদারের অত্যাচারের খবর পেলে রায়তসভা আইন সঙ্গত ও ন্যায়-সঙ্গত ভাবে তা নিরসন করার চেষ্টা করতো।[৬৭] এছাড়া রায়তসভার পক্ষ থেকে দ্বারকানাথ চা বাগানোর কুলিদের দুর্দশার খবর সরেজমিনে জানার জন্য আসামে গিয়েছিলেন। সেখানকার কুলিদের ওপর সংঘটিত অত্যাচারের বিবরণ তিনিই প্রথম জনসম্মুখে তুলে ধরেন। বিপিনচন্দ্র পাল ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় অনুষ্ঠিত রায়তসভার বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে আসামের কুলিদের সম্পর্কে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন বলে তথ্য পাওয়া যায়।

তাছাড়া ঊনিশ শতকের সপ্তম দশকটি ছিল ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের কাল। এসময় দুর্ভিক্ষের কবলে লক্ষ লক্ষ[৬৮] ভারতবাসী মৃত্যুমুখে পতিত হতে থাকে। ইত্যবসরে *১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের রাজকীয় অধিকার আইন* (The Royal Titles Act of 1876) দ্বারা ইংল্যান্ডের মহারানীকে *ভারত সম্রাজ্ঞী* ঘোষণা এবং খেতাব গ্রহণ উপলক্ষে দিল্লীতে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে এক দরবার বসে। এসময়েই ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের জিঘাংসা নিবৃত্তির জন্য বহু টাকা ব্যয়ে কাবুল আক্রমণ করে। তারা উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের উপজাতীয় অধিবাসীদের দমনের জন্য সামরিক অভিযান পরিচালনায় লক্ষ লক্ষ টাকা বিনষ্ট করে। এছাড়া ইংলন্ডের বস্ত্রশিল্পের মালিক গোষ্ঠীর স্বার্থে ইংলন্ডের তুলাজাত দ্রব্যের ওপর থেকে আমদানি শুল্ক হ্রাস করে ভারতের নতুন বস্ত্রশিল্পের অস্তিত্ব বিপন্ন করে তোলে। এই সকল উৎপীড়নের বিরুদ্ধে দেশীয় সংবাদপত্র গুলোয় তীব্র প্রতিবাদ ও জ্বালাময়ী লেখা প্রকাশিত হতে থাকে।[৬৯] শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে এভাবে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটতে থাকে;একপর্যায়ে জনসাধারণের বিক্ষোভ স্বতঃস্ফুর্ত রূপে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার সকল সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করার উদ্দেশ্যে ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে *দেশীয় প্রেস আইন* (Vernacular Press Act of 1878) নামে নিপীড়ন মূলক এক আইন পাস করে। এতে দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্র গুলোর স্বাধীনতা বহুলাংশে খর্ব হয়। কিন্তু ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্র গুলো নির্ভীক ভাবে ব্রিটিশ শাসনের স্বরূপ উদঘাটন করে দিতে থাকে।

এ সকল সংবাদপত্রের প্রভাবে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত হয় এবং ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দ থেকে এ বিষয়ে চিন্তাভাবনা শুরু হয়। ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার কলকাতায় একটি আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর আয়োজন করায় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিনিধিরা কলকাতায় সমবেত হয়। বাংলার *দি বেঙ্গলি* (The Bengalee) পত্রিকার সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ইতোপূর্বে প্রতিষ্ঠিত *ভারতসভা* (Indian Association) ব্রিটিশ সরকার আয়োজিত এ সমাবেশের সুযোগ নিয়ে ভারতব্যাপী একটি আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দ্যেশেই ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দের ২৮, ২৯ এবং ৩০ ডিসেম্বর কলকাতায় এক *জাতীয় সম্মেলনের* (National Conference) অধিবেশন আহ্বান করে।

আনন্দমোহন বসু আশা প্রকাশ করে বলেন, এ জাতীয় সম্মেলন,জাতীয় পার্লামেন্টের প্রথম সোপান হিসেবে কাজ করবে। এ সম্মেলনের মাধ্যমে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির নেতৃবৃন্দ ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকে আগত প্রতিনিধিবর্গের সাথে ভাববিনিময় এবং ভারতের জাতীয় সমস্যাবলি নিয়ে আলোচনার সুয়োগ পায়। এ সম্মেলনে কতিপয় প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং সে প্রস্তাবগুলো পরবর্তীতে কংগ্রেসও গ্রহণ করে। প্রস্তাবগুলোর মধ্যে ছিল-(ক) সরকারি চাকরির ভারতীয়করণ; (খ) প্রতিনিধিত্বমূলক আইনসভা গঠন; (গ) ইংল্যান্ডে ও ভারতে একই সাথে আইসিএস পরীক্ষাগ্রহণ; (ঘ) অস্ত্রআইন রদ করা; (ঙ) সামাজিক খাতে ব্যায় হ্রাস করা; এবং (চ) আই-সি-এস পরীক্ষায় অংশগ্রহণের বয়স ২২ বছরে উন্নীত করা। এ সম্মেলন জাতীয় স্বার্থে সবাইকে সম্মিলিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানায়। *জাতীয় সম্মেলনের* (National Conference) এ প্রথম অধিবেশনের পর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পুরো বছর উত্তর ভারত সফর করেন। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় *জাতীয় সম্মেলনের* (National Conference) দ্বিতীয় অধিবেশন আহ্বান করা হয়। কলকাতায় যখন এজাতীয় সম্মেলনের অধিবেশন চলছিল; সেই একই সময়ে ভারতের শিল্পনগরী বোম্বাই শহরে এক অধিবেশনের মাধ্যমে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়।[৭০] অনিল শীলের মতে, কংগ্রেসের উদ্যোক্তা *মি.হিউম* (Allan Octavian Hume) সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের এবিষয়ে ইচ্ছাপূর্বক অবহিত করেন নি।[৭১] জাতীয় সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রশাসনিক সংস্কার, *আই-সি-এস* (ICS=Indian Civil Service) পরীক্ষা ইংল্যান্ডে ও ভারতে একযোগে গ্রহণ প্রভৃতি দাবি উত্থাপন করা হয়। প্রকৃতপক্ষে জাতীয় সম্মেলন ও জাতীয় কংগ্রেস একই আদর্শ নিয়ে পরিচালিত হতে থাকে। উভয় সম্মেলনে একই ধরণের প্রস্তাব গৃহীত হয়। সুতরাং এ দুই সমিতির মিলন হতে দেরি হয়নি। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন আহ্বান করা হলে সেই অধিবেশনে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন *জাতীয় সম্মেলন* (National Conference) ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সাথে মিলিত হয়। তবে প্রশ্নাতীতভাবে একথা বলা যায় যে, ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করার বিষয়ে কংগ্রেসপূর্ব সময়কালে ভারতসভার তৎপরতাই সবচেয়ে বেশি দৃশ্যমান ছিল। এ সংগঠনটিতে হিন্দু-মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যোগদান করেন। এর ফলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ জাগরণের পথ সুগম হয়। এজন্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের অগ্রদূত ও আদিগুরু বলা হয়।[৭২] এই সংগঠনটি সরকারের নিকট সর্বপ্রথম ভারতীয়দের সমান অধিকারের দাবি জানায় এবং ভারতব্যাপি আন্দোলন শুরু করে। ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভারত সভা মূলতঃ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় বৈষম্যমূলক নীতির বিরুদ্ধে জনমত গঠনের চেষ্টা করে। ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দের পরে ভারতসভা স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠার দাবি তাদের কর্মসূচির

অন্তর্ভূক্ত করে। পরবর্তীতে বাংলার বাইরে ভারতের কতিপয় শহরে আরও বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক সমিতি আত্মপ্রকাশ করে। এসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-বোম্বাই প্রদেশে *বোম্বে অ্যাসোসিয়েশন* (১৮৮৫), পুনায় *সার্বজনীন সভা* (১৮৭০), মাদ্রাজে *ন্যাটিভ অ্যাসোসিয়েশন* (১৮৮৪),গঠিত হয়। দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণি তৎকালে এসকল প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসন ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে জাতীয় জাগরনের সঠিক পথের সন্ধান এবং জাতীয় প্রতিরোধের প্রয়োজনীয়তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছিল। বিদেশী শাসন, শোষণ ও উৎপীড়ন প্রতিদিন বিভৎস রূপে আত্মপ্রকাশ করায় দেশের মধ্যে ব্যাপক গণবিক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছিল। এজন্য একটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হতে থাকে। এমতাবস্থায় ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে আনন্দমোহন বসু *স্টুডেন্টস্ অ্যাসোসিয়েশন* (Students Association) প্রতিষ্ঠা করেন।

বাংলায় মধ্যবিত্ত শ্রেণির নেতৃত্বে বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলন যখন তুঙ্গে; তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা *স্টুডেন্টস্ অ্যাসোসিয়েশনের* মাধ্যমে আন্দোলনকে সক্রিয় সমর্থন দিয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণির আন্দোলনকে আরও গতিশীল করে তোলে। *লর্ড লিটন* (Robert Bulwer-Lytton) রাজনৈতিক আন্দোলনে শিক্ষার্থীদের এ সমর্থনকে ভালো চোখে দেখেননি। এদিকে তারই শাসনামলে আইন সচিব *ইলবার্ট* (Courtenay Ilbert) ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে পার্লমেন্টে একটি বিল পেশ করেন। বিলটিতে দেশীয় বিচারকদের শ্বেতাঙ্গ আসামীদের বিচারিক ক্ষমতা প্রদানের প্রস্তাব ছিল। কিন্তু ভারতে বসবাসরত শ্বেতাঙ্গ ইংরেজরা ইলবার্ট বিলের বিপক্ষে আন্দোলন শুরু করে। অপরদিকে ভারতসভা এই বিলের সমর্থনে দেশব্যাপি আন্দোলন শুরু করে দেয়।[৭৩] আইন সচিব ইলবার্ট উত্থাপিত এ বিলটি দেশব্যাপি ইলবার্ট বিল নামে পরিচিতি পায়। কিন্তু ক্রমে ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দের ইলবার্ট বিল উপলক্ষে গণবিক্ষোভ দেশব্যাপি এক আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। ব্রিটিশ শাসকশ্রেণির ঔদ্ধত্য ও উৎপীড়নে মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে জাতীয় অপমানবোধ জাগ্রত এবং ধুমায়িত বিক্ষোভ দাবাগ্নিতে পরিণত হয়। পরিস্থিতি পর্যলোচনা করে সরকারি মুখপাত্র *মি.বাকল্যান্ড* (C.E.Buckland) উল্লেখ করেছেন, কলকাতার একদল শ্বেতাঙ্গ স্থির করে যে, সরকার যদি তাদের প্রস্তাবিত আইন পাস করে, তবে তারা বড়লাটের বাড়ির পাহাড়াদার, সিপাহীদের হামলা করে বড়লাট লর্ড রিপন (Robert Bulwer-Lytton) কে চাঁদপাল ঘাঁট হতে স্টিমারে তুলে দিয়ে উত্তমাশা অন্তরীপের পথে ইংল্যান্ডে পাঠিয়ে দিবে। এ ষড়যন্ত্রের কথা বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নরের অজ্ঞাত ছিল না।[৭৪] শেষপর্যন্ত ইংরেজপক্ষের প্রচন্ড চাপের কারণে বিলটি আইনে পরিণত হয়নি। *ইলবার্ট বিল* উপলক্ষ্যে শ্বেতাঙ্গগোষ্ঠীর ব্রিটিশপ্রশাসন বিরোধী ভয়ঙ্কররূপ ও তীব্র বিরোধিতার মুখে সরকার নমনীয় হয়ে বিলটি তুলে নেয়। ফলে *ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের* (Indian Association) নেতৃত্ত্বাধীন বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে ইংরেজ বিরোধি

একটি গণজাগরণ মাথাচারা দিয়ে উঠে। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই আন্দোলনের অবিংসবাদী নেতা। কাজেই আন্দোলনের দায়ে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে রাজদ্রোহী হিসেবে গণ্য করে এবং কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি *নরিস* (Justice Norris) কে অবমাননা করার অজুহাতে তাঁকে কারাদন্ড দেয়। বস্তুতপক্ষে *ইলবার্ট বিল* আন্দোলন উপলক্ষে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী চেতনা তীব্র আকার ধারণ করে।

এই বিলের পরাজয়ের ফলে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির মন জাতীয় অপমানের গ্লানিতে ভরে যায়। বিজয়ী শাসক জাতির দম্ভ ও অহঙ্কার তাদের নিকট অসহ্য হয়ে উঠে। সরকারি মুখপাত্র *বাকল্যান্ড*ও (C.E.Buckland) উল্লেখ করেছেন–ইলবার্ট বিলেরশিক্ষা কোনো ভারতবাসী কোন দিন ভুলতে পারেন নি।[৭৫] তারা আরও উপলব্ধি করে যে,ভারতীয়রা যতোদিন নিজেদের শক্তিদ্বারা তাদের দাবি পূর্ণ করতে না পারবে, তারা যতোদিন শাসকদের সদাশয়তার ওপর নির্ভর করবে,ততোদিন তাদের পরাধীনতার গ্লানি ও দুঃখ দুর্দশার অবসান তো দূরের কথা; বরং তা প্রতিদিন বেড়েই চলবে। জাতীয় এ অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তাদের মধ্যে দ্রুতই এক দুর্জেয় বিদ্রোহাত্মক মনোভাব জাগ্রত হতে থাকে।

ঔপনিবেশিক সরকারের নানান অন্যায় ও বৈষম্যের প্রতিবাদে দেশের প্রত্যেকটি শ্রেণির মধ্যে বিশেষত কৃষক ও জনসাধারণের মধ্যে বিক্ষোভ ও সংগ্রামের লক্ষণ স্পষ্টতর হতে থাকে। এসকল অসংগঠিত ও বিচ্ছিন্ন সংগ্রামী গোষ্ঠীগুলোকে সংঘবদ্ধ করে তারা মাঠে নামার তোড়জোড় চালায়। বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর *রিচার্ড টেম্পল* (Sir Richard Temple) ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে বড়লাট *লর্ড নর্থব্রুক* (Lord Northbrook) কে প্রেরিত এক রিপোর্টে বলেন–পূর্ব বাংলার অধিকাংশ এলাকায় রায়তদের মধ্যে লীগ ও ইউনিয়ন গঠনের মনোভাব জেগে উঠেছে। এ সকল সংগঠনের উদ্দেশ্য বহু প্রকারের হতে পারে। এই পদ্ধতিতে তারা যদি কিছুমাত্র সফলতা লাভ করতে পারে তবে সব সময়েই একটা আশঙ্কা থাকবে;হয়ত চাষীরা পরে খাজনা বন্ধের জন্য সংঘবদ্ধ হবে। উদ্ভুত পরিস্থিতিতে জমিদারগণও বলপ্রয়োগের মাধ্যমে খাজনা আদায় করতে পারে। এমতাবস্থায় বর্তমান বাংলায় এই উদ্দেশ্যে সংগঠন সৃষ্টি ভয়াবহ পরিণাম ঢেকে আনবে। এ অবস্থা উদ্ভবের সম্ভাবনার বিরুদ্ধে আমাদের বিশেষ সতর্ক থাকতে হবে।[৭৬]

শুধু বাংলাতেই নয় ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে[৭৭] কৃষক-জনতার মধ্যে এ নতুন বিপ্লবী মনোভাব দেখা দেয়। ঠিক এই সময়ে ভারতের নবজাত শিল্পের মধ্য হতে শ্রমিকশ্রেণি[৭৮] এক নতুন সংগ্রামী শক্তিরূপে দেখা দেয়। এদিকে ইংল্যান্ডের শিল্পপতিদের বিশেষ করে ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্রশিল্পের মালিকগোষ্ঠীর স্বার্থে ভারত সরকারের দ্বারা ক্রমাগত ভাবে ভারতের নবজাত বস্ত্রশিল্পের বিকাশে বাধা দানের ফলে দেশীয়

মালিকদের মধ্যে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব তীব্র হয়ে উঠে। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডের তুলাজাত দ্রব্যের ওপর হতে সকল প্রকার আমদানি শুল্ক তুলে দেয়ার ফলে ইংল্যান্ডের বস্ত্রের সাথে প্রতিযোগিতার মুখে দেশীয় বস্ত্রশিল্পের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে। নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই এবার ভারতীয় মালিকদের নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার স্বার্থে ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। এতদসঙ্গে মধ্যবিত্ত শ্রেণির আর্থিক দুর্দশা ও জাতীয় অপমানের গ্লানিও তাদের সংগ্রামের পথে ঠেলে দেয়। কিন্তু *ইলবার্ট বিলের* ব্যর্থতার সাথে সাথে *ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের* ব্যর্থতাও প্রকট হয়ে উঠে। অথচ এই বিলের ব্যর্থতা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির মনকে ক্ষতবিক্ষত করে। ফলশ্রুতিতে আরও শক্তিশালী রাজনৈতিক আন্দোলন এবং *ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন* (Indian Association) অপেক্ষা শক্তিশালী একটি জাতীয় সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে অনুভূত হতে থাকে। একপর্যায়ে অবসরপ্রাপ্ত ব্রিটিশ সিভিলিয়ান *মি. হিউমের* (Allan Octavian Hume) সহায়তায় ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে বোম্বাই শহরে এক সম্মেলনের মাধ্যমে মধ্যবিত্ত শ্রেণির অন্যতম নেতা ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়।[৭৯]

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পূর্বে ভারতীয় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির একটি নিজস্ব জাতীয় রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠায় বহুদূর অগ্রসর [৮০] হয়ে সাফল্যের কাছাকাছি পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল। তাদের এ সাফল্য যখন আসন্ন হয়ে উঠে তখনই ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধি *মি. হিউম* (Allan Octavian Hume) ভারতীয়দের সেই জাতীয় প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রয়াসকে ইংরেজ শাসনের স্বার্থে কাজে লাগানোর প্রচেষ্টা করেন। তিনি ভারতের বড় লাট *মি. ডাফরিনের* (Lord Dufferin) সাথে সিমলায় বসে ব্রিটিশ অনুগত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান *সর্ব ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস* (Indian National Congress) প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

মি.হিউম (Allan Octavian Hume) তার কার্যের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে লিখেছেন–সে সময়, এমনকি এখনও আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই যে, সেসময় আমরা একটা ভয়ঙ্কর গণবিপ্লবের বিপদাশঙ্কার মধ্যে ছিলাম। বিভিন্ন তথ্য হতে আমি নিশ্চিত হয়েছিলাম যে,আমরা একটা ভয়ঙ্কর গণঅভ্যুত্থানের মুখে এসে দাঁড়িয়েছি। বিভিন্ন অঞ্চলের রিপোর্ট ও সংবাদের সাতটি বড় বড় ফাইল আমাকে দেখানো হয়েছিল। ত্রিশ সহস্রাধিক সংবাদদাতার নিকট হতে রিপোর্ট ও সংবাদগুলো বিভিন্ন জেলা,মহকুমা,নগর,শহর ও গ্রাম হতে প্রেরিত হয়েছিল। বহু রিপোর্টে নিম্নশ্রেণির লোকজনের মধ্যকার আলোচনার সংবাদ ছিল। এসকল আলোচনা হতে দেখা যায়, এই দরিদ্র জনসাধারণ (শ্রমিক,কৃষক ও নিম্ন মধ্যশ্রেণির লোক) দেশের বর্তমান অবস্থার ফলে একটা হতাশার মনোভাবে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। তারা নিশ্চিতরূপে ধরে

নিয়েছে, তাদের অনাহারে মৃত্যু অনিবার্য; মৃত্যুর পূর্বে একটাকিছু করার জন্য তারা মরিয়া হয়ে উঠেছে। একটাকিছু করার জন্যই তারা প্রস্তুতি ও দলবদ্ধ হইতেছে। এই একটা কিছুর অর্থ হিংসাত্মক কার্যকলাপ। বহুপুলিশ বিবরণীতে পুরাতন তরবারি,বল্লম ও গাদাবন্দুক লুকিয়ে রাখার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রয়োজন মাফিক এসকল অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করা হবে। ইহা কেউই ভাবে নাই যে, এর ফলে প্রথম স্তরে আমাদের সরকারের বিরুদ্ধে একটা ব্যাপক বিদ্রোহ দেখা দিবে। আশঙ্কা করা হয়েছিল, আকস্মিকভাবে চতুর্দিকে ইতস্তত হিংসাত্মক অপরাধ, দোষী ব্যক্তিদের হত্যা, ব্যাংক ডাকাতি, বাজার লুট প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হবে। দেশের নিম্নস্তরের অর্ধাহারি শ্রেণিসমূহ যে অবস্থায় রয়েছে,তাতে ইহাই আশঙ্কা করা হয়েছিল যে, পাতার উপর অসংখ্য জলবিন্দুর মত দেশের সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত ছোট ছোট দলসমূহ ঐক্যবদ্ধ হয়ে কতগুলো বৃহৎ দলে পরিণত হবে। দেশের সকল দুষ্টলোক একত্রিত হবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুন্ডা দলগুলো একত্রিত হবার পর,সরকারের বিরুদ্ধে গভীর অসন্তোষের ফলে ক্ষিপ্ত হয়ে সকলে ঐ দলগুলোতে যোগদান করবে। অতঃপর তারা বিভিন্ন স্থানে নেতৃত্বগ্রহণ করে খন্ড খন্ড সংঘর্ষগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করবে এবং এই ঐক্যবদ্ধ শক্তিকে একটা জাতীয় অভ্যুত্থান আকারে পরিচালিত করবে।[৮১]

এসকল সমূহ বিদ্রোহের প্রস্তুতি মূলক সংবাদ প্রাপ্তির পর ব্রিটিশ সরকার একদিকে প্রচন্ড দমননীতি অবলম্বন করে এবং অপরদিকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা আটতে থাকে। দমননীতি প্রয়োগের পর সরকার যখন নিশ্চিতরূপে বুঝতে পারে যে জনসাধারণের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের সম্ভাবনা নস্যাৎ করা গেছে, তখনই জনসাধারণের গণবিক্ষোভকে শান্তিপূর্ণ ও বৈধপথে চালনা করার জন্য ব্রিটিশ অনুগত ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সহায়তায় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার জন্য *মি.হিউম* (Allan Octavian Hume) বড়লাট *মি.ডাফরিনের* (Lord Dufferin) অনুমতি প্রাপ্ত হন। মোদ্দাকথা এই যে, কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর এই উদ্দেশ্য অপূর্ণ থাকেনি। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেসের অধিবেশনে যে মূলনীতি ঘোষণা করা হয় তা হলো-'ব্রিটিশ শাসনের প্রতি অবিচল আনুগত্যই হবে জাতীয় কংগ্রেসের মূলনীতি।'[৮২]

বড়লাট মি. *ডাফরিন* (Lord Dufferin) পূর্ব থেকেই কংগ্রেসকে আর্শীবাদ জানিয়েছিলেন। প্রথম থেকেই তিনি চরমপন্থি বিপ্লবীদের পরিবর্তে নরমপন্থিদের দুর্গলরূপে কংগ্রেসকে গড়ে তোলার জন্য সচেষ্ট হন। বাংলার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভূপেন্দ্রনাথ বসু, বোম্বের গোপালকৃষ্ণ গোখেল ও ফিরোজ মেটা, মাদ্রাজের সুব্রহ্মণ্যম আয়ার ও দাদাভাই নৌরজী ও অন্যান্য নেতাগণ কংগ্রেসে যোগদান করেন। এর ফলে ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনে ভারতীয় ব্রিটিশ অনুগত শিক্ষিত শ্রেণির আশা আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্ররূপে ইংরেজ সরকারের আর্শীবাদপুষ্ট ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হয়। বলা হয়ে

থাকে কংগ্রেসের জন্ম হয় ব্রিটিশ সরকারের শত্রু হিসেবে নয়;বরং মিত্র হিসেবে। ব্রিটিশ সরকারের মূল লক্ষ্য ছিল ভারতের মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে আন্দোলনের পথ থেকে সরিয়ে ব্রিটিশ শাসনের অনুকূলে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলা।[৮৩] ১৮৮৫খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠালগ্নে বলা হয়,সরকারের সমালোচনায় কংগ্রেস নরমপন্থা অবলম্বন করবে। প্রভুশ্রেণির প্রতি এরকম আনুগত্য মধ্যবিত্ত শ্রেণির চিরাচরিত জাতীয় স্বার্থকে পদদলিত করার ধারাবাহিকতার ইঙ্গিতবাহী অনুমিত হয়।

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার সময় নেতৃবৃন্দের উদ্দেশ্য ও মনোভাব যাই থাকুক না কেন, দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় সে সময় কংগ্রেসকেই নিজস্ব জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে গ্রহণ করে। প্রথম অধিবেশনের আহ্বানে সারা দিয়ে দেশের ছাত্র, শিক্ষক, উকিল, কর্মচারী প্রমূখ শিক্ষিত পেশাজীবী শ্রেণির মধ্যে এক বিপুল সাড়া জেগে উঠে। সে আহ্বানকেই তারা জাতীয় আহ্বান হিসেবে গ্রহণ করে। কংগ্রেসের প্রত্যেক অধিবেশনেই প্রতিনিধি সংখ্যা এরূপভাবে বৃদ্ধি পায় যে, নেতৃবৃন্দ ভীত হয়ে প্রতিনিধি সংখ্যা সীমাবদ্ধ রাখার ব্যবস্থা করেন।[৮৪] অচিরেই ভারতের প্রত্যেক প্রদেশ এবং জেলায় জেলায় কংগ্রেসের কমিটি গঠিত হতে থাকে। এই পথে কংগ্রেসকে উচ্চসম্ভ্রান্ত বংশীয় প্রতিনিধিদের গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখার সকলপ্রয়াস ব্যর্থ হয়। কংগ্রেস শীঘ্রই মধ্যবিত্ত শ্রেণির নেতৃত্বে একটি সর্বভারতীয় জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।

বাংলা ভাগ এবং ব্রিটিশ বিরোধীতা

কংগ্রেস প্রথম থেকেই স্বায়ত্বশাসনের বিকাশ ঘটানো,সামরিক ব্যয় হ্রাস, ইন্ডিয়া কাউন্সিলের অবসান ঘটানো, বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ, ভারতীয় জনগণকে সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদান প্রভৃতি দাবি ব্রিটিশ সরকারের নিকট উত্থাপন করতে থাকে। এ ব্যাপারে কংগ্রেসের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল, এটি ইংরেজ শাসক ও রাজতন্ত্রের প্রতি অবিচল আস্থা এবং ব্রিটিশ সরকারের উদার নীতি ও ন্যায় বিচারের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস স্থাপন করা।[৮৫] ১৮৮৫ থেকে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কংগ্রেসের আন্দোলনের প্রধান বিষয় ছিল ভারতীয়দের উচ্চপদে নিয়োগ প্রদান এবং প্রশাসনে ভারতীয়দের দাবি সুপ্রতিষ্ঠিত করা। কিন্তু ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে *বাংলা ভাগের* (Partition of Bengal) সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে চরমপন্থি কংগ্রেস নেতাগণ মাথাচারা দিয়ে উঠে। প্রতিক্রিয়াস্বরূপ অরবিন্দকুমার ঘোষ, লালা লাজপাত রায়, বালগঙ্গাধর তিলক প্রমুখ চরমপন্থি নেতৃবৃন্দ আনুগত্য রাজনীতির পরিবর্তে আন্দোলন, বয়কটসহ বৈপ্লবিক আন্দোলনের ওপর গুরুত্ব প্রদান করেন। তাঁরা ভারতীয় সংস্কৃতি বিশেষ করে হিন্দুধর্মের অতীত গৌরবের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাপোষণ করতেন। ফলে চরমপন্থি কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের আন্দোলন ভারতীয় মুসলমানদের মনে সন্দেহের সৃষ্টি করে। অবশ্য বাংলা বিভাজনের এই ঘটনা হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের অবনতি ঘটায়।

চরমপন্থি নেতাদের এই আন্দোলন দ্রুত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে এবং এটি সকলশ্রেণির লোকের মধ্যে সম্প্রসারিত হয়।[৮৬] বাংলা,বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে গঠিত *বাংলা প্রদেশের* (Bengal Presidency) রাজধানী ছিল কলকাতা। পূর্ববাংলা ও আসামের অবহেলিত জনগণের উন্নয়ন, বৃহৎবাংলা প্রদেশের প্রশাসনিক কার্যের অসুবিধা নিরসন তথা প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের স্বার্থে *লর্ড কার্জন* (George Nathaniel Curzon) এই বৃহৎ প্রদেশটিকে বিভক্ত করে ঢাকাকে রাজধানী করে পূর্ববঙ্গ ও আসাম নামে একটি নতুন প্রদেশ গঠন করেন। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ১৬ অক্টোবর থেকে এ নতুন প্রদেশটি কার্যকর হয়। কিন্তু এ বাংলা বিভক্তিকে কেন্দ্র করে আন্দোলন-সংগ্রামে উত্তাল হয়ে উঠে কলকাতাসহ সমগ্র বাংলা। বাংলা বিভক্তির প্রতিবাদে বাঙালির এ অগ্রণী অবস্থান গ্রহণের পেছনে আবহমানকাল থেকেই বাংলার বিশেষ ভৌগলিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব বিশেষ বিবেচনার দাবি রাখে।

প্রাচীন যুগ থেকেই বাংলা একটি আলাদা ভৌগলিক পরিমন্ডলে গড়ে উঠেছিল। মধ্যযুগে বাংলার স্বাধীন সুলতানি শাসন দিল্লীর কর্তৃত্বকে অস্বীকার করে গড়ে ওঠে। বাংলা দীর্ঘকাল স্বায়ত্বশাসন ও স্ব-শাসন ভোগহ করে প্রবল আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে। মুঘল কর্তৃত্ব প্রত্যাখ্যান করা সত্ত্বেও শেষাবধি মুঘল শাসনের অন্তর্ভুক্ত হলেও বাংলা ছিল মুঘল শাসনের প্রধানকেন্দ্র এবং ঢাকা ছিল সুবেদারের আবাসস্থল। গৌড়, মুর্শিদাবাদ এবং ঢাকা মুঘল যুগে যথেষ্ট গুরুত্বপায়। প্রাকব্রিটিশ আমল থেকেই বাংলা তার ঐক্য এবং স্বাধীনতা সম্পর্কে সচেতন ছিল। বাংলার হিন্দু,বৈদ্ধ ও মুসলিম সাংস্কৃতিক সমন্বয়ে বাঙালি সংস্কৃতি চেতনা গড়ে ওঠে। বাংলার লোকসংস্কৃতি জাতিগত ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করে।সর্বোপরি বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সমগ্রবাংলায় ঐক্যবোধ জাগ্রত করে। বাংলা ভাষা, সাহিত্য, লোক সংস্কৃতি, ধর্ম এবং ঐতিহ্যবোধ বাঙালি জাতিকে একতা দান করে। *লর্ড কার্জনের* (George Nathaniel Curzon) বাংলা বিভক্তি বাঙালির এহেন ঐক্যবোধ বিনষ্টের উদ্দেশ্যে কুঠারাঘাতের শামিল অনুমিত হয়। ব্রিটিশ শাসনের যুগে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার বাঙালি ভদ্রলোকদের মধ্যে বিশেষত; বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে জাতীয় ঐক্য দৃঢ়তা পায়। উনিশ শতকে কলকাতাকে কেন্দ্রকরে বাংলার নবজাগরণ, সমাজ সংস্কার ও ধর্ম আন্দোলন গড়ে ওঠে এবং বাংলা সাহিত্যের বিকাশ বাঙালি জাতিকে নবভাবে এবং নতুন ঐক্যবোধে বলিয়ান করে। কলকাতা মহানগরীকে কেন্দ্র করেই বাঙালির সকল প্রগতিশীল কর্মকান্ড আবর্তিত হতে থাকে। কিন্তু বাংলা বিভক্তির কারণে বাঙালি সমাজের মধ্যে পারস্পরিক সংহতিবোধ দেখা দেয়। তাছাড়া বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির নিকট বাংলা বিভক্তি ছিল জাতীয় অপমানস্বরূপ। সেকারণে বাংলাকে ভাগের সিদ্ধান্তে কলকাতাকেন্দ্রিক বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। এ বিষয়ে কামাক্ষানাথ সেন উল্লেখ করেছেন, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এ বাংলা বিভাগকে ব্যঙ্গ করে নাম দেয় বঙ্গভঙ্গ।[৮৭] কালক্রমে

এ *বাংলা বিভাজনের* (Partition of Bengal) বিরুদ্ধে কংগ্রেসের নেতৃত্বে যে তীব্র গণআন্দোলন গড়ে ওঠে তা *বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন* (Anti-Partition movement of Bengal) নামে পরিচিতি পায়।

১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে যখন এই পরিকল্পনা প্রথম প্রকাশিত হয় তখন অনেকেই এর বিরোধিতা করেন। বাংলা বিভাগের মূল বিরোধিতাকারী ছিল কলকাতাকেন্দ্রিক শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণি। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর *দি বেঙ্গলি* (The Bengalee) পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে তীব্র প্রতিবাদ করেন। তিনি জনগণকে এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের আহ্বান জানান।[৮৮] এ পর্যায়ে বাংলা বিভাগের বিরুদ্ধে কংগ্রেস নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সহ দাদাভাই নৌরজী,ফিরোজশাহ মেহতা, কেটি তেলাঙ্গ, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বদরুদ্দীন তৈয়বজী, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপালকৃষ্ণ গোখলে, রাসবিহারী ঘোষ প্রমূখ নেতৃবৃন্দ যে প্রতিবাদী আন্দোলন গড়ে তোলেন তা নরমপন্থি আন্দোলন নামে পরিচিতি পায়। তিনি কলকাতার সাথে গ্রাম বাংলার সংযোগ স্থাপনসহ বেঙ্গলি, হিতবাদী,সঞ্জীবনী প্রভৃতি পত্রিকার মাধ্যমে বাংলা বিভাগের বিরুদ্ধে প্রচারণা জোরদার করেন। সুরেন্দ্রনাথের সহকর্মীদের মধ্যে ছিলেন ভুপেন্দ্রনাথ বসু, পৃথ্বীশচন্দ্র রায়, কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রমুখ বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির নেতৃবৃন্দ। কংগ্রেসের নরমপন্থি নেতৃবৃন্দের মধ্যে দক্ষিণপন্থি নেতা নরেন্দ্রনাথ সেন ও নববিধান ব্রাহ্ম নেতৃবৃন্দ *বাংলা বিভাগ* (Partition of Bengal) বিরোধী *বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে* (Anti-Partition movement of Bengal) হিন্দু জাগরণের নিন্দা করেন। তাদের মুখপাত্র ছিল ইন্ডিয়ান মিরর ও বঙ্গবাসী পত্রিকা।[৮৯]

কংগ্রেসের নরমপন্থি নেতৃবৃন্দের আন্দোলনের কৌশল ছিল সভা-সমিতি দ্বারা বাংলা বিভাজনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন,সংবাদপত্রের মাধ্যমে আন্দোলন,বাংলা বিভাগের বিরুদ্ধে যুক্তিপূর্ণ আবেদনপত্র সরকারের নিকট প্রেরণ,পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ করে *বাংলা ভাগের* (Partition of Bengal) স্বপক্ষে প্রশাসনিক যুক্তি খন্ডন প্রভৃতি। ১৯০৩ থেকে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা বিভাজনের বিরুদ্ধে প্রথম পর্যায়ের আন্দোলনে কলকাতা ছাড়াও ঢাকা,ময়মনসিংহ সহ অন্যান্য জেলায় অসংখ্য প্রতিবাদী সভা-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দের মার্চ এবং ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারিতে কলকাতা টাউন হলে দুটি প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।বাংলার জমিদারদের অনেক রাজা,মহারাজা,খেতাবধারী তাদের রাজভক্তি ত্যাগ করে আন্দোলনকে সমর্থন জানান। মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ প্রতিবাদ সভায় যোগ দেন। *বাংলা ভাগের* বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে অন্তত পাঁচটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। এগুলোর মধ্যে বিখ্যাত হলো লর্ড কার্জনের নিকট খোলা চিঠি, ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় এবং বাকি চারটি কলকাতা থেকে প্রকাশ পায় বলে জানা যায়।[৯০]

সরকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে নিয়মতান্ত্রিক পথে আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার পর দ্বিতীয় পর্যায়ে আন্দোলনের নেতৃত্বগ্রহণ করে কংগ্রেসের বিপ্লবপন্থি গ্রুপ। বয়কট এবং স্বদেশী নামে দু'টি কর্মসূচি এ সময় অনুসৃত হয়। প্রকৃতপক্ষে বয়কট এবং স্বদেশি কর্মসূচি ছিল একটি অপরটির পরিপূরক তথা একই ভাবধারায় দুটি প্রকাশ। একদিকে বয়কট অন্দোলন যেমন নেতিবাচক ছিল; তেমনি স্বদেশি আন্দোলন ছিল ইতিবাচক। এ দু'টি কর্মপন্থা নিয়ে যে আন্দোলন গড়ে ওঠে সামগ্রিকভাবে সেটা স্বদেশি আন্দোলন নামে পরিচিতি পায়।[৯১] শীঘ্রই এ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ১৩ জুলাই নবীনব্রাহ্ম ও অধ্যাপক কৃষ্ণকুমার মিত্র তার সম্পাদিত কলকাতার বিখ্যাত সাপ্তাহিক সঞ্জীবনী পত্রিকায় সর্বপ্রথম ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বয়কট বা বর্জন আন্দোলনের আহ্বান জানান।[৯২] ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ১৭ জুলাই খুলনার বাগেরহাটে বিশাল এক জনসভায় ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বয়কট প্রস্তাব ঘোষণা করা হয়। ঘোষণায় বলা হয়, যতোদিন বাংলা বিভক্তি রদ না হবে ততোদিন পর্যন্ত ব্রিটিশ পণ্যসামগ্রী বর্জন করা হবে।[৯৩] ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ২০ জুলাই দিনাজপুরের মহারাজার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবগ্রহণ করা হয় বলে জানা যায়। সে প্রস্তাবগুলো হলো–(ক) সকল অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেটরা পদত্যাগ করবেন; (খ) জেলা বোর্ড, পৌরসভা ও পঞ্চায়েতের সকল সদস্য পদত্যাগ করবেন এবং (গ) আগামী এক বছরকাল ব্যাপী শোক পালন করা হবে।[৯৪]

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ১৭ ও ১৮ জুলাই কলকাতা রিপন কলেজে (অধুনা সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) এক ছাত্র সমাবেশে *বয়কট* আদর্শকে পবিত্র শপথ হিসেবে গ্রহণ করা হয়। ৩১ জুলাই কলকাতার সকল কলেজের ছাত্রসমাজের উপস্থিতিতে এক বিশাল ছাত্রসমাবেশে বাংলা বিভাগের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হয়। এ সমাবেশে ছাত্রদের সমন্বয়ে একটি কেন্দ্রীয় সংগ্রাম সমিতি গঠন করা হয়।[৯৫] ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ০৭ আগস্ট কলকাতার টাউন হলে প্রস্তাবিত বাংলা বিভাজনের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত এক বিশাল প্রতিনিধিত্বমূলক জনসভায় আনুষ্ঠানিক ভাবে ব্রিটিশপণ্য বর্জনের বিখ্যাত বয়কট প্রস্তাব গৃহীত[৯৬] এবং স্বদেশী আন্দোলনের ঘোষণা দেয়া হয়। বয়কট প্রস্তাব সমগ্রদেশে ছড়িয়ে পড়ে। এ সভায় সভাপতিত্ব করেন কাশিম বাজারের মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী। কলকাতার ছাত্রসমাজ যারা ইতোপূর্বে বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনের শপথ গ্রহণ করেছিল তারা এসমাবেশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এদিন ছাত্রদের মুখে ছিল *সংযুক্ত বাংলা* ও *বন্দেমাতরম্* ধ্বনি। এদিন শিক্ষকদের পরিচালনায় ৫০০০ শিক্ষার্থী প্রথমে কলেজ স্কোয়ারে জমায়েত হয়ে শোভাযাত্রা করে টাউন হলে হাজির হয়। ব্রিটিশ বিরোধী এ বয়কট আন্দোলন এক নতুন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের রূপধারণ করে। ছাত্রসমাজ দেশের বিভিন্ন স্থানে সভা-সমিতির মাধ্যমে এ আন্দোলন জনপ্রিয় করে তোলে।

এ বয়কট শুধু ব্রিটিশ পণ্যসামগ্রী বর্জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি-মিউনিসিপ্যালিটি, জেলা বোর্ড, গ্রামপঞ্চায়েত থেকে ভারতীয়দের পদত্যাগ প্রভৃতি বয়কট আন্দোলনের অঙ্গীভূত হয়। এমনকি বিদেশি প্রশাসন,আইন ও শিক্ষা বর্জনের প্রশ্নও উত্থাপিত হতে থাকে।[৯৭] খুব অল্প সময়ের মধ্যে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করে। ছাত্রসমাজ দোকানে-বাজারে এবং লোকালয়ে পিকেটিং শুরু করে। এ সময় ক্রেতাদের ব্রিটিশ পণ্যসামগ্রি ক্রয় না করতে অনুরোধ করে এবং ব্রিটিশপণ্য বিশেষত; বস্ত্র, লবণ, চিনি, সিগারেট ইত্যাদি পোড়াতে থাকে। শিক্ষার্থীরা এসময় ইংরেজ প্রতিষ্ঠিত স্কুল-কলেজ বয়কট করে। শ্রমিকরাও কলকারখানায় ধর্মঘট আরম্ভ করে কাজ বর্জন করে।[৯৮] বিদেশি পণ্য বর্জনের পাশাপাশি স্বদেশী আন্দোলনের অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে দেশজ শিল্প প্রতিষ্ঠার এক নতুন জোয়ার আসে। স্বদেশী তাঁত, বস্ত্র, সাবান, লবণ, চিনি, চামড়াজাত দ্রব্য উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন জায়গায় অসংখ্য ছোট্ট-বড় কলকারখানা স্থাপিত হয়। বিভিন্ন স্থানে স্বদেশী দোকান গড়ে ওঠে। দিয়াশলাই ও সিগারেটের ক্ষেত্রেও দেশীয় কারখানা প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে।[৯৯] স্বদেশী তাঁতে তৈরি কাপড়, হাতে তৈরি শিল্পদ্রব্যের ব্যবহার, গ্রামীণ পঞ্চায়েতে বিচার, মাতৃভাষার মাধ্যমে স্বদেশী বিদ্যালয়ে শিক্ষা,সমবায় ব্যাংক, কৃষি খামার স্থাপন প্রভৃতি ছিল আত্মশক্তি আন্দোলন। আত্মশক্তি আন্দোলন হলো গঠনমূলক স্বদেশি আন্দোলন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার *স্বদেশী সমাজ* প্রবন্ধে আত্মশক্তি আন্দোলনের ইঙ্গিত দেন।[১০০] এ আন্দোলনের আরেকটি দিক ছিল সকল প্রকার আবেদন-নিবেদন নীতি ত্যাগ করে নিজের জোরে স্বরাজ দাবি অর্জন। সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় *ডন সোসাইটি* (The Dawn Society) স্থাপন করে জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তনের পথ দেখান। অশ্বিনীকুমার দত্ত বরিশালে বিখ্যাত ব্রজমোহন বিদ্যালয় স্থাপন করেন। সতীশচন্দ্র *ডন পত্রিকা* প্রকাশ করেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বদেশী আন্দোলনের আগেই বোলপুরে *ব্রহ্মচর্য আশ্রম বিদ্যালয়* (১৯০১) স্থাপন করেন; পরে যেটা *শান্তি নিকেতনে* পরিণত হয়। স্বদেশী আন্দোলন একদিকে যেমন ব্রিটিশ স্বার্থে আঘাত হানে; অপরদিকে দেশের অর্থনীতি পুনরুজ্জীবনের পথ উন্মুক্ত করে।[১০১]

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ১৬ অক্টোবর বাংলা বিভাগ কার্যকরের দিন সারা বাংলায় হরতাল,সভা-সমাবেশ, অরন্ধন[১০২] কর্মসূচি ও শোক দিবস পালন করা হয়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ কর্মসূচিতে শামিল হয়ে রাখিবন্ধন কর্মসূচি পালন করেন। দ্বিখন্ডিত বাংলার ঐক্যের প্রতীক হিসেবে হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টান ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে একে অপরের হাতে রাঁখি বাঁধেন।[১০৩] ওই দিন আনন্দমোহন বসু ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতায় প্রায় ৫০ হাজারের অধিক লোকের জনারণ্যে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় ভাষণ দেন।[১০৪]

এদিকে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ২৩ সেপ্টেম্বর কলকাতার রাজাবাজারে ব্যারিস্টার আবদুর রসুলের সভাপতিত্বে মুসলমানদের এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় যে তিনটি প্রস্তাব গৃহীত হয় তা হলো–(ক) বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনের প্রতি মুসলমান সম্প্রদায়ের উদাসীনতার যে বিবরণ প্রচারিত হয়েছে;এ সভা তার প্রতিবাদ জানায় এবং দেশের মঙ্গলের জন্য বাঙালি হিন্দুরা যে আদর্শ ও নীতি গ্রহণ করেছে তার প্রতি মুসলমান সম্প্রদায়ের পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করা হয়; (খ) বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ছাড়াও বাঙালি হিন্দুদের অন্যান্য আন্দোলনেও মুসলিম জনগণের যোগদানের কথা ঘোষণা করা হয় এবং (গ) স্বদেশী পণ্যসামগ্রির প্রতি পূর্ণ সমর্থন ঘোষণা করা হয়।[১০৫] সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিপিনচন্দ্র পাল তাঁদের জ্বালাময়ী বক্তৃতার দ্বারা ছাত্র ও যুবক সম্প্রদায়কে উত্তেজিত করতে থাকেন। বয়কট ও স্বদেশি আন্দোলন শুধুমাত্র রাজনীতির গন্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইলো না। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এর বিকাশ ঘটে। অচিরেই দেশের কবি, সাহিত্যিক ও নাট্যকার সকলেই জাতীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে জাতীয় কাব্য, সঙ্গীত ও নাটক রচনা করে জাতীয় আন্দোলনের আদর্শ প্রচার করতে থাকেন। এক্ষেত্রে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও রজনীকান্তের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁদের দেশাত্মবোধক সঙ্গীত ও রচনা জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। বাংলার আকাশে বাতাসে তাঁদের সঙ্গীত ধ্বণিত হতে থাকে।[১০৬] বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির নেতৃত্বে পরিচালিত ব্রিটিশ বিরোধী এ স্বদেশী আন্দোলন কেবলমাত্র বাংলাদেশেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। অচিরেই এ আন্দোলন ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সম্প্রসারিত হয়। অচিরেই বালগঙ্গাধর তিলক বোম্বাই প্রদেশে স্বদেশি আন্দোলনকে এক শক্তিশালী ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে পরিণত করেন। অজিত সিং ও লালা লাজপাত রায় স্বদেশি বার্তা পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশে, সৈয়দ হায়দার রাজা দিল্লিতে এবং চিদাম্বরম পিল্লাই মাদ্রাজে এ আন্দোলন গড়ে তোলেন। ধীরে ধীরে এ বঙ্গবিভাগ প্রতিরোধ আন্দোলন ব্রিটিশ বিরোধী এক সর্বভারতীয় আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে।[১০৭]

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর প্রথম দুই দশক ব্রিটিশ সরকারের নিকট আবেদন নিবেদনের মাধ্যমে রাজনৈতিক সংস্কার ও দাবি আদায়ের প্রচেষ্টাকে কংগ্রেস নীতি হিসেবে গ্রহণ করে। পরবর্তীতে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে একদিকে উদার, অনুগত ও নিয়মতান্ত্রিক সংস্কারপন্থি নরমপন্থি ধারা এবং অন্যদিকে ছিলেন আমূল পরিবর্তন ও সশস্ত্র বিপ্লবপন্থি ধারা মাথাচারা দিয়ে উঠে।তাছাড়া কংগ্রেস নিজেকে অসাম্প্রদায়কি সংগঠন হিসেবে দাবি করলেও তার মধ্যে হিন্দুত্ববাদী জাতীয়তাবাদের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। *বাংলা বিভাগ* (Partition of Bengal) জনিত আন্দোলন-সংগ্রাম অর্থাৎ বাংলা বিভাগ বিরোধী বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের মাধ্যমে কংগ্রেস ভারতীয় রাজনীতিতে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। রাজনৈতিক পরিস্থিতি উত্তাল আকার ধারণ করে। স্বরাজ,স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন জনগণের মধ্যে ব্যাপক প্রচার ও তাদের সমর্থন লাভ করে। এ বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলন সমন্ধে টি.এম.নায়ার এক মন্তব্যে বলেন,"It was a

weapon of a weak nation against a strong nation."[১০৮] রাজনৈতিক উত্তাল মুহূর্তে তাদের সে সমর্থনকে দেশের স্বার্থে কাজে লাগানোর প্রত্যয়ে বাংলায় মধ্যবিত্ত শ্রেণির নেতৃত্বে কলকাতায় ১৯০২ খ্রিস্টাব্দের ২৪ মার্চ অনুশীলন ও ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে যুগান্তর সমিতি নামে গোপন বিপ্লবী আন্দোলন জন্ম লাভ করে। উল্লেখ্য ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা অনুশীলনের শাখা হিসেবে ঢাকা অনুশীলন গঠন করা হয়। ভারতের অন্যত্রও এ আন্দোলনের প্রভাব পড়ে। কংগ্রেসের নরমপন্থি নেতৃবৃন্দও এ আন্দোলনে শামিল হয়। সর্বোপরি অচিরেই কংগ্রেসের বাংলা বিভাগ বিরোধী এ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন প্রথম গণভিত্তি সম্পন্ন আন্দোলনের মর্যাদা লাভ করে।[১০৯] ইতোমধ্যে স্বদেশি ও বয়কট আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। ১৯০৬খ্রিস্টাব্দের কলকাতা কংগ্রেস অধিবেশনে কংগ্রেসের নরমপন্থি ও বিপ্লবপন্থি সদস্যদের মধ্যে স্বদেশী আন্দোলন প্রশ্নে তীব্র মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়। নরমপন্থিরা বয়কটের প্রস্তাব গ্রহণ করতে অসম্মত হলেও বিপ্লবপন্থিরা এআন্দোলনকে ন্যায়সঙ্গত বলে ঘোষণা করে। এঅধিবেশনে সভাপতি দাদাভাই নওরোজী কংগ্রেসের এ বিবদমান উভয় গোষ্ঠীকে একতাবদ্ধ ও তুষ্ট করতে উদ্যোগ নেন এবং ঘোষণা করেন,কংগ্রেসর লক্ষ্য হলো স্বরাজ লাভ। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে গুজরাটের সুরাট অধিবেশনে কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে উভয় গ্রুপের সদস্যদের মধ্যে তীব্র মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতি হিসেবে রাসবিহারী ঘোষের নাম প্রস্তাব করলে গন্ডগোল ও হাতাহাতি শুরু হয়। কংগ্রেস অধিবেশন রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। এ ঘটনার পর বিপ্লবপন্থিরা কংগ্রেস ত্যাগ করায় কংগ্রেসে নরমপন্থি নেতৃত্ব অক্ষুণ্ন থাকে। এভাবে সুরাটের ২৩ তম কংগ্রেস অধিবেশনে কংগ্রেস বিভক্ত হয়ে পড়ে।[১১০]

বাংলার উদীয়মান বুর্জোয়াশ্রেণি, বিক্ষুব্ধ জমিদার ও তালুকদার গোষ্ঠী এবং তাদের মুখপাত্র হিসেবে শহুরে শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণি স্বদেশি আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। বাংলা ভাগের ফলে দেশীয় শিল্পবিকাশের পথসংকুচিত হওয়ার সম্ভাবনায় উদীয়মান ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণি বিক্ষুব্ধ জমিদার গোষ্ঠীর সাথে যোগদান করে ব্রিটিশ পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। সেজন্য তাদের মুখপাত্র হিসেবে শিক্ষিত ও শহুরে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণি বাংলা বিভক্তির বিরুদ্ধাচারণ করে স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। এবাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণিই তাদের ব্রিটিশবিরোধী মনোভাবের জন্য বিপ্লবপন্থি বলে পরিচিতি লাভ করেন। এদের মধ্যে বাংলার বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দকুমার ঘোষ বিশেষ কৃতিত্বের দাবিদার। মহারাষ্ট্রের বালগঙ্গাধর তিলক ও পাঞ্জাবের লালালাজপাত রায় এস্বদেশী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এসকল বিপ্লবপন্থি নেতৃবৃন্দের উদ্যোগে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ২৫তম অধিবেশনে ব্রিটিশ পণ্য বর্জনকে স্বদেশি আন্দোলনের প্রধান কর্মপন্থা হিসেবে ঘোষিত হয়।[১১১] সুতরাং বলা যায়, দেশীয় ভূস্বামী গোষ্ঠী, বুর্জোয়াশ্রেণি, ব্যবসায়জীবী ও উকিল ব্যারিস্টার এবং

বুর্জোয়াপন্থি বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর প্রতিভূ হিসেবে চিহ্নিত বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণি স্বদেশী আন্দোলনের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধভাবে একচেটিয়া ব্রিটিশ মূলধনের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ পণ্য বর্জনরূপ যে অর্থনৈতিক অস্ত্র প্রয়োগ করেছেন; ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তা অতুলনীয়। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক *উইল ডুরান্ট'র* (Will Durant) মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ থেকেই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের সূত্রপাত হয়েছে।[১১২] অর্থাৎ,স্বদেশী আন্দোলনকে তিনি ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথমধাপ হিসেবে অভিহিত করতে চেয়েছেন বলে অনুমতি হয়।

কংগ্রেসের সশস্ত্র বিপ্লবপন্থি ধারার অনুসারীরা হিন্দু ধর্মের পুনরুজ্জীবনবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। নরমপন্থিদের প্রশাসনিক সংস্কার কর্মসূচির বিকল্প কর্মসূচি হিসেবে তাঁরা ভারতীয়দের জন্য দেশ শাসনের অধিকার প্রতিষ্ঠা তথা স্বরাজ তাঁদের লক্ষ্য,বয়কট তাঁদের অস্ত্র এবং স্বদেশী আন্দোলনের তত্ত্ব পেশ করে কর্মক্ষত্রে নেমে পড়ে।[১১৩] এক পর্যায়ে কংগ্রেসের মধ্যে এ দু'ধারার সহঅবস্থান অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। অন্যদিকে ব্রিটিশ বিরোধী কর্মকান্ডের অভিযোগে বিপ্লবপন্থি নেতাদের ওপর সরকারের গ্রেফতার, নির্বাসন ও অন্যান্য দৈহিক শাস্তিমূলক দমন-পীড়ন বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ বিষয়ে আতাউর রহমান উল্লেখ করেছেন, ব্রিটিশ সরকার রাজনৈতিক সংস্থা, রাজনৈতিক কর্মী এবং রাজনৈতিক পত্রপত্রিকার ওপর নিপীড়ন মূলক আইন প্রয়োগ করতে থাকে। প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তরুণ রাজনৈতিক গোষ্ঠী সশস্ত্র বিপ্লবের পথে পা বাড়ায়। বালগঙ্গাধর তিলক, অরবিন্দ ঘোষ ও বিপিনচন্দ্র পালের নেতৃত্বে কংগ্রেসের একাংশ আবেদন নিবেদনের নীতিকে উপেক্ষা করতে আগ্রহী হয়ে উঠেন। বলতে গেলে এই গোষ্ঠী ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে একটা সংগ্রাম ঘোষণা করে। *বাংলা বিভাগ* (Partition of Bengal) বিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যারা রাজনীতিতে প্রবেশ করেন; জাতীয়তাবাদ হয়ে উঠে তাদের বেদবাক্য,তাদের ধর্ম।স্বরাজ ও স্বায়ত্বশাসন তথা বিদেশি শাসন মুক্ত স্বাধীনতাই হয়ে উঠলো তাঁদের লক্ষ্য। জাতীয়তাবাদীর কাছে সবার উপরে স্থান লাভ করলো জাতির সম্মান,গৌরব ও স্বাধীনতা।[১১৪] এ আন্দোলনের সাফল্য ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ভারতের জাতীয় রাজনীতিতে প্রভাব ফেলে।

উপর্যুক্ত *বাংলা ভাগ* (Partition of Bengal) কার্যকর এবং নতুন প্রদেশ সৃষ্টি বাংলার মৃতপ্রায় মুসলিম সমাজে নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনার উদ্রেক করে। উন্নয়নের ছোঁয়া লাগতে শুরু করে নতুন রাজধানী ঢাকায়। তাছাড়া বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রভাব মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক সংগঠনের অনুভূতি এবং প্রয়োজনীয়তা জাগ্রত করে।[১১৫] এদিকে *বাংলা ভাগ* পরবর্তীকালে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ আনুগত্য রাজনীতির পরিবর্তে বয়কটসহ ব্রিটিশ বিরোধী বৈপ্লবিক আন্দোলনের ঝড়

বইয়ে দেন। এরকম এক রাজনৈতিক দুর্যোগময় মুহূর্তে মুসলিম নেতৃবৃন্দ মুসলিম স্বার্থ রক্ষায় গুরুত্বারোপ করেন এবং ঢাকার শাহবাগে এক সম্মেলনের মাধ্যমে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর সর্ব ভারতীয় মুসলিম লীগ গঠন করেন। ঢাকার নবাব স্যার সলিমুল্লাহ হন এর সভাপতি। পূর্ব বাংলা এবং আসামের অধিবাসীদের জন্য হিতকর বিবেচনা করে নবগঠিত মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ *বাংলা বিভাজনে* (Partition of Bengal) সমর্থন দেয়। লক্ষ্যণীয় এধারায় মুসলিম লীগও তাদের সম্প্রদায়ের স্বার্থ বিবেচনায় ব্রিটিশ সরকারের নীতির প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে;বিভিন্ন দাবি দাওয়া আদায়ে সচেষ্ট হয়।

জাতীয় কংগ্রেসের উপর ব্রিটিশ সরকারের দমননীতি বৃদ্ধি পেলে ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন দানা বেধে উঠে। বাংলায় আন্দোলনের এ ধারা ক্রমে বৈপ্লবিক রূপ পরিগ্রহ করে। বৈপ্লবিক সংস্থা অনুশীলন ও যুগান্তর দলের আত্মপ্রকাশ ঘটে। অরবিন্দ ঘোষ,বারীন ঘোষ ও ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ এআন্দোলনের নায়ক হিসেবে আবির্ভূত হন। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে বিহারের মুজাফ্ফরপুর চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট *কিংস্ফোর্ডকে* (Douglas Kingsford) হত্যা পরিচালনায় প্রফুল্ল চাকী আত্মহত্যা করে ও ক্ষুদিরাম বসুর ফাঁসি হয়। কিন্তু এ দু'জন ভারতীয় জনগণের নিকট বৈপ্লবিক আন্দোলনের মহানায়কে পরিণত হয়। তাছাড়া স্বদেশি আন্দোলনকে হিন্দুধর্মের আচার আচরণের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল। আন্দোলনকারীরা কালীঘাটে জড়ো হয়ে পুজো করতো। সশস্ত্র বিপ্লবপন্থিদের কালীমূর্তির সামনে শপথ নিতে হতো। স্বাভাবিকভাবেই কোন ধর্মপ্রাণ মুসলমান এআন্দোলনের সাথে একাত্ম হওয়া সঙ্গত মনে করেনি। তাই সে সময় দাঙ্গা-হাঙ্গামা ছড়িয়ে পড়েছিল।

স্বদেশী ও বৈপ্লবিক এদ্বিমুখী আন্দোলনের চাপে নতুন *বড়লাট হার্ডিঞ্জ* (Lord Hardinge) অনুধাবন করলেন যে, সাম্রাজ্যে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতে হলে *বাংলা বিভাজন* (Partition of Bengal) বিরোধী বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন শান্ত করা প্রয়োজন। সেজন্য প্রদেশ পুনর্গঠনের পরিকল্পনা করে তা অনুমোদনের জন্য ভারত সচিব *ক্রু-র* (Robert Crewe-Milnes) নিকট প্রেরণ করেন। ব্রিটিশ সরকার ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের ১২ ডিসেম্বর বড়লাট *লর্ড হার্ডিঞ্জের* (Lord Hardinge) শাসনামলে দিল্লীর দরবারের সম্রাট পঞ্চম জর্জ স্বয়ং রাজ্যাভিষেক উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক রাজকীয় ঘোষণায় বাংলা বিভাগ রদ ঘোষণা[১১৬] করেন।[১১৭] এ ঘোষণার মাধ্যমে হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিজয় সূচিত হয়। দুই বাংলা আবার একত্রিত হয়। আসামকে পূর্ব বাংলা হতে বিচ্ছিন্ন করে পূর্বের মতো চীফ কমিশনারের শাসনাধীনে ন্যাস্ত করা হয়; একই সাথে বিহার উড়িষ্যা ও ছোট নাগপুরকে নিয়ে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন করা হয়। বাংলা বিভাগ রদের সাথে সাথে ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে স্থায়ীভাবে দিল্লীতে চলে যাওয়ায় দিল্লীর গুরুত্ব

বেড়ে যায় এবং কলকাতার গুরুত্ব হ্রাস পায়। কলকাতা থেকে রাজধানী পরিবর্তনের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকার কলকাতাকেন্দ্রিক বাঙালির আন্দোলন-সংগ্রাম থেকে নিরাপদ থাকতে চেয়েছে অনুমিত হয়।

রাজধানী পরিবর্তনের ফলে বাঙালির অপূরণীয় ক্ষতি সত্ত্বেও বঙ্গভঙ্গ রদের আনন্দে বাঙালি বিজয়ী ও উল্লসিত হয়। এ সম্পর্কে নজরুল ইসলাম বলেন, প্রকৃতপক্ষে *বাংলা বিভাগ* (Partition of Bengal) রদের কারণে মুসলিম লীগ এবং পূর্ব বাংলার অধিকাংশ মুসলমান ক্ষুব্ধ হয়। এ সময় হতে ব্রিটিশ রাজভক্ত অভিজাত ও জমিদারশ্রেণি তথা ঢাকার নবাব স্যার সলিমুল্লাহ প্রমূখ নেতৃত্বের প্রতি মুসলিম লীগের মোহভঙ্গ ঘটে; এবং একে ফজলুল হকের মতো স্বাধীনচেতা বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির মুসলিম নেতৃবৃন্দের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে লক্ষ্ণৌর বাষিক অধিবেশনে মুসলিম লীগ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে স্বায়ত্ত্বশাসনের প্রস্তাব গ্রহণ করে।বাংলা বিভাজন রদে হিন্দু নেতারা উল্লসিত হয়েছিল ঠিকই; কিন্তু তারা বুঝতেই পারেনি কলকাতা থেকে রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত হওয়ার ফলে সর্বভারতীয় রাজনীতিতে বাংলার প্রাধান্য বিনষ্টের বীজ বপন করা হয়।[১১৮] সর্বোপরি বাংলা বিভাজন রদ আন্দোলনের সাফল্যে কলকাতা কেন্দ্রিক বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির চেতনাকে শাণিত করে। এদিকে পূর্ববাংলার বাঙালি মুসলিম নেতৃবৃন্দ অত্যন্ত হতাশ ও মর্মাহত হন। হতাশা ও বিক্ষুব্ধ মনে সরকারি সিদ্ধান্ত মেনে নেয়া সত্ত্বেও তাদের উদ্যোগে সভা-সমাবেশে তাঁদের ব্রিটিশ বিরোধী ক্ষোভ প্রকাশিত হতে থাকে।[১১৯] প্রকৃতপক্ষে বাংলা বিভাগ রদ সংক্রান্ত ঘোষণায় মুসলমান সম্প্রদায়ের মোহমুক্তি ঘটে এবং প্রয়োজনবোধে হিন্দু সম্প্রদায়ের সাথে ঐক্যবদ্ধ অবস্থান গ্রহণের নীতি অনুসরণের চিন্তাভাবনা শুরু হয়। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের ০৪ এপ্রিল বঙ্গীয় আইন সভায় বক্তৃতাদানকালে এ ব্যাপারে শেরে বাংলা একে ফজলুল হক উল্লেখ করেন–

> To me it seems that Governtment has arrived at a parting of the ways...in spite of their aversions to agitation.Muhammedans are drifting,owing to sheer force of circumstances, into the arena of political warfare.We feel that we have got move with the times or eles we are doomed.Let not the officials that the feelings of the entire community can be soothed simply by the bestowal of titles and decorations on our leaders...We require something more than a mere concession to our sentiment..."[১২০]

রাজনৈতিক অস্থিরতা প্রশমনে ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে বাংলা বিভাগ রদ ঘোষণা করা সত্ত্বেও বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির সশস্ত্র ব্রিটিশ বিরোধী বৈপ্লবিক তৎপরতা নিশ্চিহ্ন হয়নি। এসময় ব্রিটিশ ভারতের নতুন রাজধানী দিল্লীতে শোভাযাত্রা নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রবেশের আয়োজন হয়। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের ২৩ ডিসেম্বর শোভাযাত্রাটি দিল্লী রাজপথের চাঁদনি চকে পৌছলে বাঙালি বিপ্লবী রাসবিহারী বসু ও শচীন স্যানালের নির্দেশনায় বসন্ত বিশ্বাস গভর্নর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জকে লক্ষ্য করে বোমা নিক্ষেপ করেন। এতে

হার্ডিজের প্রাণ রক্ষা পেলেও লেডি হার্ডিজের আঘাত গুরুতর আহত হওয়ায় পরবর্তীতে তার মৃত্যু ঘটে বলে তথ্য পাওয়া যায়।[১২১] এছাড়া *রোল কমিটির* (Role Committee) তথ্য মতে, ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে ১৪টি রাজনৈতিক ডাকাতি,একটি হত্যা, ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে ১৬টি, ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে ১৭ টি ডাকাতির ঘটনা ঘটে। ইতোমধ্যে কলকাতার আপার সার্কুলার রোডের ২৬০/১নং বাড়িতে বিপ্লবীদের এক বোমার কারখানা আবিষ্কৃত হয়। এখানে প্রস্তুতকৃত বোমা প্রথমে মেদিনীপুরের এক রাজ সাক্ষীর বাড়িতে নিক্ষেপ করা হয়। এখানে তৈরি নিক্ষিপ্ত এক বোমায় সিলেটের মৌলভী বাজারে এক ব্যক্তি নিহত হয়। ময়মনসিংহে ও রাজাবাজারে তৈরি বোমা পাওয়া যায়।[১২২]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও বাঙালির ব্রিটিশ বিরোধিতা

ব্রিটিশ বিরোধী তৎপরতায় সশস্ত্র বৈপ্লবিক সংগঠন অনুশীল সমিতিগুলো বিপুল সাংগঠনিক শক্তির নজীর রাখে। বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির সশস্ত্র বৈপ্লবিক নেতা *বিপ্লব জ্যোতিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়* (বাঘা জ্যোতিন) ও রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে বৈপ্লবিক কর্মপন্থা স্থির হয় যে, '১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের বিশ্বযুদ্ধের ডামাডোলে ভারতবর্ষে সামরিক অভ্যুত্থানের ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পরিকল্পনা করা হয়। রাসবিহারী বসু উত্তর ভারত ও পাঞ্জাবে বিপ্লব সংগঠনের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে ব্রিটিশ বাহিনীর এদেশীয় সৈন্যদের মাধ্যম এঅভ্যুত্থান সংঘঠনের ভার নেন।[১২৩] একই বৈঠকে জার্মানদের সহায়তায় শ্যাম ও অন্যান্য স্থানের বিপ্লবীদের সঙ্গে বাংলার বিপ্লবীদের সমন্বয় সাধন ও তা রক্ষার ভার পড়ে *বিপ্লবী জ্যোতিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের* (বাঘা জ্যোতিন) ওপর।[১২৪] রাস বিহারী বসুর পরিকল্পনা অনুসারে ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি পাঞ্জাবের লাহোরসহ উত্তর ভারতের পাঁচটি সেনানিবাসসহ পূর্ববাংলার সীমান্ত হতে পঞ্চনদ এবং বিদেশস্থ বিপ্লবী শাখা সমূহে একযোগে সেনা অভুত্থানের পরিকল্পনা করা হয়। সিঙ্গাপুর এবং ব্রহ্মদেশস্থ সৈন্যরাও এপরিকলাপনায় শামিল হয়। কিন্তু ব্রিটিশ গোয়েন্দা তৎপরতার জালে '*কৃপাল সিং* নামক এক সৈনিকের বিশ্বাসঘাতকতার[১২৫] কারণে শেষপর্যন্ত পরিকল্পনাটি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।[১২৬] ব্রিটিশ সরকার এ সেনা অভ্যুত্থানে জড়িতদের বন্দি করে মীরাটে গুলি করে হত্যা করে। এ অভ্যুত্থানের পরিকল্পনায় বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর সংশ্লিষ্টতার কথা পুলিশ জেনে যায়। শেষপর্যন্ত রাসবিহারী বসু ছদ্মবেশ ধারণ করে জাপান চলে যান। সেখান থেকেই ব্রিটিশ বিরোধী তৎপরতা অব্যাহত রাখেন।

পাঞ্জাবের অভুত্থানর পরিকল্পনা ব্যর্থতার পর ব্রিটিশ বিরোধী কর্মকান্ডে *বিপ্লবী জ্যোতিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের* (বাঘাজ্যোতিন) অসম সাহসের পরিচয় দিয়ে সকলের বিস্ময় উৎপাদন করে। জার্মানদের সহায়তায় ব্রিটিশ শাসন অবসানের চিন্তা প্রথম তিনিই করেন। ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের ৯ সেপ্টেম্বর তিনি ব্রিটিশ পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে উড়িষ্যার বালাসোরে বুড়িবালামের তীরে এক সশস্ত্র সম্মুখযুদ্ধে আহত

হয়ে পরদিন বালাসোর হাসপাতালে প্রাণত্যাগ করেন।[১২৭] ব্রিটিশ বিরোধী তৎপরতায় নিজের প্রাণত্যাগের মাধ্যমে *বিপ্লবী জ্যোতিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়* (বাঘাজ্যোতিন) পরবর্তী প্রজন্মের নিকট দেশপ্রেমের উদাহরণস্বরূপ এক অনন্য নজীর রেখে যান। এ ধারায় বাঙালি মধবিত্তশ্রেণির ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র বৈপ্লবিক তৎপরতায় '১৯০৮ থেকে ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মোট ১৮৬ জন বিপ্লবী নিহত বা দন্ডিত হয়েছেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়।[১২৮] ব্রিটিশ সরকারের দমননীতির ফলে ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই অধিকাংশ বিপ্লবী নেতা ও কর্মী কারারুদ্ধ হয়। গ্রেফতার এড়িয়ে থাকা নেতাকর্মীরা আত্মগোপনে চলে যায়। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিকে মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড সংস্কার জারি হওয়ার সাথে সাথে রাজনৈতিক বন্দিরা মুক্তি লাভ করতে থাকে। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বিপ্লবীরা কারামুক্ত হয়ে দেখেন খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাবে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বদলে গেছে।বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির জনপ্রিয় নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনদাশ এসময় বিপ্লবীদের চলমান আন্দোলনে শামিল হওয়ার আহ্বান জানান। অসহযোগ আন্দোলনের সাথে পুরোপুরি একাত্ম না হলেও এ আন্দোলনের স্বাদেশিকতায় তারা আকৃষ্ট হন; এবং ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের নাগপুর কংগ্রেস অধিবেশনের পর অহিংসাকে আন্দোলনের কৌশল হিসেবে গ্রহণ করে চলমান আন্দোলনে শামিল হয়। অসহযোগ আন্দোলনের গতি বৃদ্ধি পায়।

অন্যদিকে দিকে বলকান যুদ্ধে (১৯১২-১৩)[১২৯] ব্রিটেন খলিফা শাসিত তুরস্কের বিপক্ষ জোটশক্তিকে সমর্থন দিলে বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। তারা সভা-সমাবেশের মাধ্যমে জনমত ব্রিটিশ বিরোধী জনমত সৃষ্টিসহ ব্রিটিশপণ্য বর্জন, ব্রিটিশ বিরোধী প্রচারপত্র বিতরণ প্রভৃতি কর্মকান্ডের মাধ্যমে ব্রিটিশ নীতির প্রতিবাদ জানায়।[১৩০] এযুদ্ধে বিপর্যস্ত ও অসহায় তুর্কী সরকার ও জনগণের সাহায্যার্থে অর্থসংগ্রহের জন্য প্রচারপত্র [১৩১] বিতরণ-সহ নানা উদ্যোগ গ্রহণ করে। খলিফা ও তুরস্কের জনগণের দূরাবস্থায় ব্যথিত হয়ে পূর্ববাংলা ও আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সহসভাপতি জমিদার ওয়াজেদ আলী খান পন্নী স্বীয় জমিদার সূলভ অহমিকা পরিত্যাগ করে তুর্কীদের সাহায্যের জন্য অর্থসংগ্রহে নেমে পড়েন [১৩২] এবং জনসাধারণকে ব্রিটিশ বিরোধী নানা কর্মকান্ডে উদ্বুদ্ধ করতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান। এদিকে মুসলিম লীগের সম্পাদক ওয়াজির হাসান ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের মার্চে মুসলিম লীগের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে সাংবিধানিক উপায়ে ঔপনিবেশিক স্বশাসনের একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং তা অনুমোদিত হয়।[১৩৩] এ প্রস্তাব অনুমোদনের মাধ্যমে মুসলিম লীগ সাংবিধানিক উপায়ে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসন অর্জনের লক্ষ্য ঘোষণা করে।

ইতোমধ্যে ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ হলে ভারত ভূখন্ড থেকে ইংরেজ সৈন্যের একটা বড় অংশ ব্রিটিশ রাজকে সরিয়ে নিতে হয়। এ সুযোগে ভারতে মধ্যবিত্ত শ্রেণির ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র বৈপ্লবিক তৎপরতা শুরু হয়। বাংলা এবং পাঞ্জাবে বিপ্লবীদের উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। বৈদেশিক অঙ্গনেও ভারতীয় বিপ্লবীদের তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়। জার্মান বৈদেশিক দফতরের সহযোগীতায় ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় স্বাধীনতা সমিতি স্থাপিত হয়। একই বছরের ডিসেম্বরে আফগান বাদশাহজাদা আমানুল্লাহ'র সমর্থনে কাবুলে রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ সিং, অধ্যাপক মাওলানা বরকতুল্লাহ ও মাওলানা ওবাইদুল্লাই সিন্ধির নেতৃত্বে স্বাধীন ভারতের অন্তবর্তী সরকার গঠিত হয়।বাংলা ও পাঞ্জাব থেকে পরিচালিত এসকল কর্মকান্ডের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক ঐক্য পরিলক্ষিত হয়।[১৩৪] হিন্দু-মুসলিম সহযোগীতা এগিয়ে চলে।

এই পর্যায়ে মুসলিম লীগের উদীয়মান নেতা হিসেবে শেরে বাংলা একে ফজলুল হকের ভাবমুর্তি গড়ে উঠে এবং তিনি ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলা মুসলিম লীগের সম্পাদক নির্বাচিত হন। এ সময় শেরে বাংলা একে ফজলুল হক এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যথাক্রমে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের শীষ নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেন যাতে করে উভয় সংগঠন মিলে যৌথ রাজনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারে। শেষপর্যন্ত মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস যৌথভাবে একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করে এবং দল দু'টির ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে গৃহীত হয়। মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ'র সভাপতিত্বে মুসলিম লীগের এ অধিবেশনে বাংলার নেতা ব্যারিস্টার আবদুর রসুলের উত্থাপিত প্রস্তাবটি বাংলার অপর নেতা শেরে বাংলা একে ফজলুল হক সমর্থন করেন বলে জানা যায়।[১৩৫] প্রস্তাবটি লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট নামে পরিচিতি পায়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮) শুরু হলে তুরস্ক নানা কারণে ব্রিটিশ সরকার ও তার মিত্র ফ্রান্স, রাশিয়া ও আমেরিকা,ইতালি ও তাদের মিত্র রাষ্ট্র সমূহের সমন্বয়ে গঠিত মিত্র শক্তির বিপক্ষে অবস্থান নেয়। অন্যদিকে জার্মানি, অস্ট্রো-হাঙ্গেরী, তুরস্ক এবং তাদের বন্ধু রাষ্ট্র সমূহের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা জোট অক্ষশক্তি নামে পরিচিতি পায়। উত্তর আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্য তখন তুর্কী খিলাফতের অধীনে এবং ভারতবর্ষ ইংরেজদের অধীনে ছিল। ভারতবর্ষ হতে যুদ্ধের জন্য ব্রিটেন সৈন্য সংগ্রহ করতো;কিন্তু তুর্কীরা উত্তর আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্য হতে সৈন্য সংগ্রহ করতে পারতো না। কারণ ব্রিটেন সুদূরপ্রসারী কুটনৈতিক কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে তুর্কীদের বিরুদ্ধে আরবদের বিদ্রোহী করে তোলে। ভারত থেকে এ সময় প্রতিবাদের ঝড় উঠে এদেশ থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা চলবে না।[১৩৬] উদ্ভুত পরিস্থিতিতে যুদ্ধের ময়দানে সাফল্য লাভে ভারতবাসীর সাহায্য ও সহযোগিতা লাভ ব্রিটিশ সরকারের জন্য অনিবার্য হয়ে উঠে। কিন্তু কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ যৌথভাবে ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে লক্ষ্ণৌ চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে ভারতে স্বায়ত্বশাসনের দাবি তোলে। যুদ্ধের প্রয়োজনে ব্রিটিশ সরকার এ দাবির পরিপ্রেক্ষিতে

ভারতীয় নেতৃবৃন্দকে প্রতিশ্রুতি প্রদান করে এবং ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ঘোষণা করে যে,পর্যায়ক্রমে স্বায়ত্ত্বশাসন সহ দায়িত্বশীল সরকার গঠনের অঙ্গীকার এবং তুরস্ক সাম্রাজ্যের কোন ক্ষতি না করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করে।[১৩৭] কারণ তুরস্ক সাম্রাজ্যের সুলতান ইসলামি বিশ্বের খলিফা হিসেবে মুসলমানদের নিকট এক বিশেষ মর্যাদার আসনে সমাসীন ছিলেন। ব্রিটিশ সরকারের এ ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দু-মুসলমান সকলেই সম্পদ ও সামর্থ নিয়ে ব্রিটিশের পাশে দাঁড়ায়। কিন্তু ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে যুদ্ধে জার্মানির পরাজয়ের পর ব্রিটিশ, ফরাসি ও রাশিয়ার মিলিত শক্তি তুরস্ক সাম্রাজ্য ভাগ-বাটোয়ারা এবং তুরস্কের খিলাফতের মর্যাদা বিনষ্ট করার উদ্যোগ গ্রহণ করে।[১৩৮]

খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন এবং ব্রিটিশ বিরোধীতা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে তুরস্কের পরিস্থিতিতে উদ্বিগ্ন হয়ে ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের ৩০ ডিসেম্বর শেরে বাংলা একে ফজলুল হকের সভাপতিত্বে দিল্লিতে মুসলিম লীগের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মাওলানা আবদুল বারী, মাওলানা আজাদ সোবহানী, মাওলানা ইবরাহীম শিয়ালকোটি, মাওলানা সানাউল্লাহ অমৃতসারী, মাওলানা আহমেদ সাঈদ, মাওলানা কিফায়েতুল্লাহ, মাওলানা আবদুল লতিফ প্রমুখ আলেমগণ এ সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন। তাদের অনেকেই কংগ্রেসপন্থি এবং মুসলিম লীগের সাথে দূরত্ব বজায় রেখে চলছিলেন। খিলাফতের স্বার্থেই তাঁরা মুসলিম লীগের এসম্মেলনে যোগদান করেছিলেন। তবে খেলাফত আন্দোলনের জন্য কর্মসূচির প্রস্তাব করলেও এ বিষয়ে মুসলিম লীগকে বেশিদূর এগুতে হলো না। খিলাফত পরিচালনার জন্য আলাদা কমিটি গঠিত হলো। কংগ্রেসভুক্ত মুসলিম নেতৃবৃন্দই এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।[১৩৯]এ সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে শেরে বাংলা একে ফজলুল হক, পরাজিত ওসমানীয় সাম্রাজ্যের ভূখন্ড ভাগ-ভাটোয়ারা করার জন্য ব্রিটেন ও তার মিত্র শক্তিগুলো যে মনোভাব গ্রহণ করেছে তাতে উদ্বেগ প্রকাশ করেন।[১৪০] ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে লক্ষ্ণৌতে এক সম্মেলনের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারের এই নীতির প্রতিবাদে জাতীয় কংগ্রেসের মুসলিম নেতা মাওলানা শওকত আলী,মাওলানা মোহাম্মদ আলী,মাওল৪না আবুল কালাম আজাদ, ডা.আনসারী,হাকিম আজমল খান ও হযরত মোহানীর নেতৃত্বে গঠিত *সর্বভারতীয় খিলাফত কমিটি'র নেতৃত্বে* ভারতব্যাপী খিলাফত আন্দোলন গড়ে উঠে।[১৪১] তবে মাওলানা শওকত আলি ও মাওলানা মোহাম্মদ আলি ভ্রাতৃদ্বয় খিলাফত আন্দোলনের মূল সংগঠক ও প্রচারক হিসেবে দেশব্যাপি ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেন। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ১৭ অক্টোবর বিশেষ উদ্দীপনাসহ প্রথম খিলাফত দিবস পালনের সময় কলকাতার অধিকাংশ ভারতীয় মালিকানাধীন দোকান পাট বন্ধ থাকে। বিভিন্ন মসজিদে প্রার্থনা করা হয় এবং সমগ্র বাংলায় জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ২৩-২৪ নভেম্বর দিল্লিতে একে ফজলুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় খিলাফত কমিটির প্রথম বৈঠকে তুরস্কের

অখন্ডতা ও খলিফার মর্যাদা রক্ষার দাবি করা হয়। এ অধিবেশনে মোহনদাস করমচাদ গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮) ওরফে মহাত্মা গান্ধীসহ কংগ্রেসের কয়েকজন বিশিষ্ট নেতা যোগদান করেন। গান্ধী মুসলিম নেতৃবৃন্দকে খিলাফত প্রশ্নে মুসলিম নেতৃবৃন্দকে পূর্ণসহযোগিতার আশ্বাস দেন।[১৪২] এ সম্মেলনে খিলাফত সমস্যাকে ঝুলিয়ে রাখায় প্রস্তাবিত শান্তি সম্মেলনে অংশগ্রহণ না করা, ব্রিটিশ পণ্য বর্জন এবং সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতার নীতি গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। দুইদিন ব্যাপি অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে একে ফজলুল হক এবং দ্বিতীয় দিন মহাত্মাগান্ধী সভাপতিত্ব করার ঘটনা ভারতবর্ষে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। সভাপতি হিসেবে প্রদত্ত ভাষণে গান্ধী তাঁর ভাষণে, মুসলমানদের অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য বয়কট নয়;প্রয়োজন অসযোগিতার আহ্বান জানান।[১৪৩] খিলাফত আন্দোলনের সাথে গান্ধীর এই সম্পৃক্ততা খিলাফতের গুণগত পরিবর্তন তথা খিলাফত রক্ষা সংক্রান্ত দাবি ও তা বাস্তবায়নকে পাশ কাটিয়ে আন্দোলনটি অধিকতর রাজনৈতিক চরিত্র পায়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কালে সশস্ত্র বৈপ্লবিক কার্যকলাপ দমনের অজুহাতে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের নাগরিক অধিকার খর্ব করার জন্য[১৪৪] ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের মার্চে রাওলাট অ্যাক্ট (Rowlatt act 1919) জারি করে। এবং পরবর্তী মাসেই অর্থাৎ ১৩ এপ্রিল সংগঠিত পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ডের ঘটনায় মোহনদাশ করমচাঁদ গান্ধী ক্ষুব্ধ এবং ব্যথিত হন। সরকারি নির্যাতনের প্রতিবাদে তিনি অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করেন। এ আন্দোলনে মুসলমানদের সমর্থন নিশ্চিত করার জন্য গান্ধী খিলাফত আন্দোলনকে সমর্থন করেন এবং কেন্দ্রীয় খিলাফত কমিটির সদস্য হন। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ভারতীয় কংগ্রেসের নাগপুর সম্মেলনে স্বরাজ কর্মসূচিকে খিলাফত আন্দোলনের সাথে যুক্ত করেন এবং উভয় লক্ষ্য অর্জনে অসহযোগ আন্দোলনের পরিকল্পনা করেন।[১৪৫]

মহাত্মাগান্ধী এসময় একবছরের মধ্যে স্বরাজ আসবে বলে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।[১৪৬] খিলাফত নেতৃবৃন্দ উপলব্ধি করেন যে, হিন্দু সম্প্রদায়ের সহযোগীতা ছাড়া খিলাফত আন্দোলন সফল করা যাবে না।[১৪৭] ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে *সেভার্স চুক্তি* (Treaty of Severs) স্বাক্ষরের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকার সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, আরব ও তুরস্ক সাম্রাজ্যের অন্তর্গত এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলের ওপর তুরস্কের অধিকার অগ্রাহ্য করায় ভারতীয় মুসলমানগণ ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। কংগ্রেস নেতা মোহনদাশ করমচাঁদ গান্ধী সেভার্স চুক্তিকে ভারতীয় মুসলমানদের ওপর নির্মম আঘাত স্বরূপ বলে মন্তব্য করেন বলে জানা যায়।

১৯২০ খ্রিস্টাব্দে মহাত্মাগান্ধী ভারতবর্ষে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। উল্লেখ্য যে, সর্ব প্রথম খিলাফত কমিটি ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ০২ জুন ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং একটি ইশতেহার ঘোষণা করে। গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ০১ আগস্ট ভারতবর্ষ ব্যাপী সর্বাত্বক হরতাল পালিত হয়। এদিন গান্ধী আনুষ্ঠানিকভবে ব্রিটিশ সরকার প্রদত্ত পদক ফেরৎ দিয়ে অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা করেন। নাগপুর কংগ্রেসে সর্বসম্মতি ক্রমে অসহযোগ আন্দোলন গৃহীত হয় এবং কংগ্রেস তথা ভারত বর্ষের রাজনীতিতে গান্ধী যুগের সূত্রপাত হয়।[১৪৮] ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ২২ জুন ভাইসরয়কে চিঠি দিয়ে জানান, কুশাসন চালান,এমন শাসকের সাথে সহযোগীতা না অধিকার স্মরণাতীত কাল থেকেই স্বীকৃত।[১৪৯] এই চিঠির মেয়াদ শেষ হলেই আনুষ্ঠানিকভাবে আন্দোলন শুরু করা হয়।

১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে অসহযোগ সম্পর্কিত মূল প্রস্তাবটি পেশ করেন চিত্তরঞ্জন দাশ। অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচিতে সরকারি খেতাব ও সম্মান ত্যাগ, সরকার অনুমোদিত স্কুল ও কলেজ, আদালত, বিদেশি কাপড় বয়কট। প্রয়োজনে সরকারি চাকরি থেকে ইস্তফা দান এবং কর না দেওয়া সমেত ব্যাপকভাবে আইন অমান্যের রূপরেখা দেন। জাতীয় স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা, বিরোধ মীমাংসায় পঞ্চায়েত গঠন, চরকায় সুতো কাটতে এবং তাঁত বুনতে জনগণকে উৎসাহিত করা হবে। হিন্দু-মুসলমান ঐক্য বজায় রাখা এবং অস্পৃশ্যতা দূর করা ও অহিংসার নীতি কঠোরভাবে মেনে চলার জন্য জনগণের কাছে আহ্বান জানানো হলো।[১৫০] বাংলার অনেক সশস্ত্র বৈপ্লবিক গোষ্ঠী উত্থাবিত এ কর্মসূচির সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে বলে জানা যায়। এ অধিবেশনে কর্মসূচি পুরোপুরি পালন করার আহ্বান জানিয়ে মহাত্মা গান্ধী আগামী এক বছরের মধ্যে স্বরাজ আসবে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।[১৫১]

প্রকৃতপক্ষে গোটা ভারতে পূর্ণ দিবস হরতাল পালনের মাধ্যমে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ০১ আগস্ট থেকেই খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। যদিও মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ অসহযোগ কর্মসূচির সাথে একমত ছিলেন না।[১৫২] ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ১৪ সেপ্টেম্বর মাওলানা মোহাম্মদ আলী গ্রেফতার হলে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্ব হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নিকট সমাদৃত হয় এবং তাঁর একক ইশারায় উভয় আন্দোলন পরিচালিত হতে থাকে। মাওলানা মোহাম্মদ আলী গ্রেফতার খিলাফত আন্দোলনকে আরও তীব্র ও গতিশীল করে তোলে। ভারতবর্ষের বহুলোক ব্রিটিশপ্রদত্ত উপাধি বা খেতাব বর্জন করেন। আইনজীবীরা আদালত ও আইনপেশা, শিক্ষার্থীরা স্কুল কলেজ এবং অনেক সরকারি কর্মচারী চাকুরি ত্যাগ করে রাস্তায় নেমে পড়ে।ব্রিটিশ পণ্য বর্জন এবং অনেকাংশে সেগুলো বিনষ্ট বা পুড়িয়ে

ফেলা হতে থাকে।[১৫৩] এ ধারায় ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি খিলাফত আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধীর সমর্থনের বিনিময়ে খিলাফত নেতৃবৃন্দ গান্ধীর আসহযোগ আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে। এভাবে ভারতে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায় একটি ঐক্যবদ্ধ ব্রিটিশ বিরোধী প্লাটফর্ম গড়ে উঠে। সারাদেশের হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের বান ডেকে যায়। অসহযোগ আন্দোলনের প্লাবনে অচিরেই গোটা দেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠে। ফলে অতি দ্রুত খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন সম্মিলিত আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে এ আন্দোলন ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে দেশব্যাপী গণজাগরণ তীব্র ব্রিটিশ বিরোধী গণআন্দোলনে পরিণত হয়।

খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন এবং বাঙালির ব্রিটিশ বিরোধিতা

বাংলায় এ আন্দোলনটিকে গতিশীল ও সুসংগঠিতভাবে পরিচালনার স্বার্থে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে মাওলানা আবদুর রউফকে সভাপতি, মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীকে সহসভাপতি, মাওলানা আকরম খাঁ'কে সাধারণ সম্পাদক এবং মজিবর রহমান ও মজিদ বখশকে যুগ্মসম্পাদক করে বঙ্গীয় প্রাদেশিক প্রাদেশিক খিলাফত কমিটি গঠিত হয়। কলকাতার কলুটোলা স্ট্রিটের হিরণবাড়ি লেনে এর কার্যালয় স্থাপিত হয়।[১৫৪] বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণিভুক্ত হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকজন খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে (১৯১৮-১৯২৪) মিলিতভাবে অংশগ্রহণ করায় আন্দোলনটি বাংলায় গণআন্দোলনের রূপ লাভ করে। উল্লেখ্য '১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ২৮-২৯ ফেব্রুয়ারি কলকাতা টাউন হলে প্রথম বঙ্গীয় প্রাদেশিক খিলাফত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। খিলাফত কমিটির কয়েকজন কেন্দ্রীয় নেতা এতে যোগদেন। সভায় একে ফজলুল হক, আবুল কাশেম, মজিবর রহমান ও অন্যান্য উপস্থিত নেতৃবৃন্দ খিলাফত সমস্যা সম্পর্কিত দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত অসহযোগ ও বয়কট কর্মসূচি অব্যাহত রাখার ঘোষণা দেন। এ সম্মেলনে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ১৯ মার্চ দ্বিতীয় খিলাফত দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে খিলাফত প্রশ্নে আলোচনার জন্য মাওলানা মুহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে বাংলার একে ফজলুল হকসহ একটি খিলাফত প্রতিনিধি দল ইংল্যান্ড গমন করেন।

১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ১৯ মার্চ দ্বিতীয় খিলাফত দিবসে কলকাতার জনজীবন অচল হয়ে পড়ে এবং ঢাকায় হরতাল পালিত হয়। চাঁদপুরে আন্দোলনকারীদের ওপর সরকার পুলিশ নির্যাতন চালায়।[১৫৫] এছাড়া ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং ময়মনসিংহে অসংখ্য জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সবচেয়ে বড়ো সভাটি হয় বর্তমান টাঙ্গাইল জেলার পার্ক ময়দানে। প্রায় ৫০ হাজার লোকের জমায়েতর এসভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন দেলদুয়ারের উদারপন্থি জাতীয়তাবাদী মুসলিম জমিদার আবদুল হালীম গজনবী। সভায় মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, মাওলানা লিয়াকত হোসেন, গমজানীর বাগ্মী মৌলভী আবদুল

বছিরসহ বেশ কয়েকজন অনলবর্ষী বক্তা গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা দেন। এসভায় লে.সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন চৌধুরী ও করটিয়া এস্টেটের তৎকালীন ম্যানেজার মৌলভী আবদুল খালেক অ্যাডভোকেট সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন মর্মে তথ্য পাওয়া যায়।[১৫৬] এ সভায় মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী খিলাফত আন্দোলনের প্রতীক হিসেবে সত্যাগ্রহ অনুশীলনের জন্য জনসাধারণের প্রতি উদাত্তআহ্বান জানান। কংগ্রেস কমিটিগুলোর পাশাপাশি বাংলার অধিকাংশ জেলায় অসংখ্য খিলাফত কমিটি গড়ে উঠে। ব্রিটিশ বিরোধী এ আন্দোলনের বিশেষত্ব যেখানে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায় সমান উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে অংশগ্রহণ করে। হিন্দু-মুসলিম সম্পাদিত সংবাদপত্র গুলোর মধ্যে *মুহাম্মদী*, *আল-ইসলাম* ও *দি মুসলমান* এ আন্দোলনে গণসমর্থন লাভের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।[১৫৭]

মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, মাওলানা আকরম খাঁ, মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, বিপিনচন্দ্র পাল ও চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে খিলাফত আন্দোলন সারা বাংলায় মুসলিম রাজনৈতিক চেতনাকে বিকশিত করে। খিলাফত ধর্মীয় চেতনাগত আন্দোলন হলেও হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও সমঝোতার ফলে মুসলমানদের মধ্যে উদার মনোভাবের সৃষ্টি করে। কলকাতার কর্মসূচির অনুসরণে বিদেশি পণ্য বর্জন, আদালত ও সরকারি অফিস বয়কট কার্যক্রম জোরদার করার উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণ দানের জন্য গ্রাম বাংলায় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গড়ে তোলা হয়। এসব স্বেচ্ছাসেবকদের চরকায় সূতাকাটা, দেশীয় দ্রব্যাদি জনপ্রিয় করে তোলা এবং খিলাফত আন্দোলনের অনুদান সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত করা হয়।[১৫৮]

এদিকে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন উপলক্ষে পার্ক ময়দানের অপর একটি জনসভায় অংশগ্রহণের জন্য ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ টাঙ্গাইল আসেন। কিন্তু তাঁর ওপর ১৪৪ ধারা জারি হয়। ফলে তিনি জনসভায় বক্তব্য রাখতে পারেননি। তবুও জনসভার কাজ স্থগিত থাকেনি। দেশবন্ধুর সুযোগ্যা স্ত্রী শ্রীমতি বাসন্তি দেবী সভায় সভাপত্বি করেছিলেন।সভায় লক্ষাধিক লোকের সমাবেশ হয়েছিল বলে জানা যায়।[১৫৯] পার্ক ময়দানের উক্ত জনসভায় বক্তব্য প্রদান করতে না পেরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ বিশ্রাম নিচ্ছিলেন প্রখ্যাত কংগ্রেসনেতা অমর ঘোষের বাসায়।[১৬০] এ ঘটনা পূর্বাপর অবহিত হয়ে বাংলাদেশের খেলাফত আন্দোলনের অন্যতম নেতা জমিদার ওয়াজেদ আলী খান পন্নী চিত্তরঞ্জন দাশের কাছে লোক পাঠালেন করটিয়ায় জনসভা করার প্রস্তাব দিয়ে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এ প্রস্তাব পেয়ে সানন্দে রাজী হয়ে করটিয়া আগমন করেন। পরদিন হাফেজ মাহমুদ আলী ইনস্টিটিউশন ময়দানে জনসভার আয়োজন করা হলো। এতো অল্পসময়ের মধ্যেও প্রায় ৫০/৬০হাজার লোক সভায় হাজির হলো। কিন্তু এখানেও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ বক্তব্য দেওয়ার সুযোগ পেলেন না।

পার্কের ময়দানের মতো এখানেও তাঁর ওপর ১৪৪ ধারা জারি হলো। এসভাতেও সভাপতিত্ব করলেন শ্রীমতি বাসন্তি দেবী। বিপুল উদ্দীপনার ভিতর দিয়েই সভাটি অনুষ্ঠিত হয় বলে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়।[১৬১]

এহেন সঙ্কটময় সময়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও আইন পরিষদ বর্জন প্রশ্নে খিলাফত ও অসহযোগ নেতৃবৃন্দের মধ্যে মতভেদের সৃষ্টি করে। বাংলার কোন কোন মুসলিম নেতা এধরনের বর্জনকে মুসলামানদের জন্য আত্মঘাতী বলে মনে করেন। তারা ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ইন্ডিয়া অ্যাক্টের ভারতের স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠানের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ওই আইনের অধীনে নির্বাচনে অংশগ্রহণের পক্ষপাতি ছিলেন। এধারায় হিন্দু নেতৃবৃন্দের মধ্যে চিত্তরঞ্জন দাশ, বিপিনচন্দ্র পাল, মতিলাল নেহেরু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আশুতোষ চৌধুরী, আশুতোষ মুখার্জি ও শরৎচন্দ্র বসু। একই মতাদর্শী মুসলিম নেতাদের মধ্যে ছিলেন শেরে বাংলা একে ফজলুল হক, আবুল কাশেম, খাজা মুহম্মদ আজম, খাজা আফজাল, নওয়াব খাজা হাবিবুল্লাহ, হাকিম হাবিবুর রহমান, নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী, স্যার সৈয়দ শামসুল হুদা, স্যার আবদুল্লাহ সোহরাওয়ার্দী,ফুরফুরার পীর মাওলানা আবুবকর সিদ্দিকী, শাহ্ আহসানউল্লাহ, কাজেম আলি ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী।[১৬২] কিন্তু আইন পরিষদে যোগদানের প্রশ্নে ভারতীয় কংগ্রেস এবং মুসলিম জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের তীব্র বিরোধীতা পরিলক্ষিত হয়। সর্বোপরি খিলাফত আন্দোলনের সমর্থক হিসেবে বিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কামিনী কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ড.রায় কুমার চক্রবর্তী, পিসি ঘোষ, বসন্তকুমার মজুমদার, অশ্বিনীকুমার দত্ত, পিয়ারী লাল রায়, গুরুচরণ আইচ, শরৎকুমার গুপ্ত, কবি মুকুন্দ দাশ, হরনাথ ঘোষ, নগেন্দ্র ভট্টাচার্য, সতীন্দ্র সেন, ড.তারিনীগুপ্ত, সরণকুমার দত্ত, নিশিকান্ত গাঙ্গুলি, মনোরঞ্জন গুপ্ত, শরৎকুমার ঘোষ, নগেন্দ্র বিজয় ভট্টাচার্য, নলিনী দাস, শৈলেন্দ্রনাথ দাশ, ক্ষিতিশচন্দ্র রায় চৌধুরী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

ব্রিটিশ সরকার খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনকে পন্ড করে দেয়ার জন্য প্রচন্ড দমন নীতির আশ্রয় নেয়।বহুলোক কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের ০৫ নভেম্বর কংগ্রেস আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করলে মহাত্মাগান্ধীর নেতৃত্বাধীন অহিংস অসহযোগ দ্রুত সহিংসরূপ ধারণ করে। কোন কোন স্থানে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গাও শুরু হয়।[১৬৩] এদিকে ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের ১৭ নভেম্বর ব্রিটিশ রাজ সিংহাসনের পরবর্তী উত্তরাধীকারী প্রিন্স অব ওয়েলস্ ভারত সফরে আসেন। প্রিন্সের আগমন উপলক্ষে সরকার ব্যাপক সংবর্ধনার আয়োজন করে। অন্যদিকে খিলাফত ও কংগ্রেস কমিটি জনসাধারণকে প্রিন্সের সফরের যাবতীয় কর্মসূচি বর্জন করে উল্লিখিত দিনে হরতালের ডাক দেয়। এ হরতাল অত্যন্ত কঠোরভাবে পালিত হয়।[১৬৪] এ হরতাল কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ ও নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালনের দায়ে পূর্ব

বাংলার একমাত্র মুসলিম জমিদার ওয়াজেদ আলি খান পন্নীকে ব্রিটিশ সরকার ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের ১৭ ডিসেম্বর গ্রেফতার করে। এক বছর তিন মাসের কারাদন্ডাদেশ দিয়ে কলকাতা আলীপুর কারাগারে বন্দি রাখে। কারাগারে তাঁর সাথে পরিচয় ঘটে একই অন্দোলনে গ্রেফতারকৃত চির বিদ্রোহী ও বিপ্লবী মাওলানা আবদুল হামিদ খান[১৬৫] ভাসানীর সাথে।[১৬৬] কারাগারে তিনি ভীষণভাবে অসুস্থ হলে ছয়মাস পরে ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ০২ জুন তাঁকে জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। কারামুক্তির পরও জমিদার মৌলভী ওয়াজেদ আলি খান পন্নী ব্রিটিশ বিরোধী রাজনীতি ত্যাগ করেননি বলে জানা যায়।

ইত্যবসরে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন ব্রিটিশ বিরোধী গণআন্দোলনে রূপ নেয়। প্রিন্সের আগমনের দিনে হরতাল কর্মসূচির জনপ্রিয়তায় কারণে ব্রিটিশ ভারতীয় সরকার লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ হয়।আন্দোলনে ভীত হয়ে বাংলা সরকার ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের ১৯ নভেম্বর এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সরকারি কর্মকর্তারা খিলাফত অফিসে হানা দিয়ে দলিল-দস্তাবেজ বাজেয়াপ্ত করে। খিলাফত ও কংগ্রেস সেচ্ছাসেবকদের কার্যক্রম অবৈধ ঘোষণাসহ সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ করাসহ বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ ও স্বেচ্ছাসেবীদেরকে গণহারে গ্রেফতার করে। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের ১০ ডিসেম্বর কলকাতায় মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, চিত্তরঞ্জন দাশ, মাওলানা আকরম খাঁ ও অম্বিকা প্রসাদ বাজপেয়ীসহ প্রায় দেড়শো নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করা হয়।[১৬৭] এ আন্দোলনের এক উত্তাল অগ্নিদিনে অর্থাৎ ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ০৫ ফেব্রুয়ারি উত্তর প্রদেশের গোরখপুরের নিকটবর্তী চৌরিচৌরা নামক স্থানে এক পুলিশ ফাঁড়িতে আন্দোলনকারীরা অগ্নিসংযোগ করলে একজন দারোগাসহ ২২ জন পুলিশ অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মহাত্মাগান্ধী ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের এহেন সহিংসরূপ দেখে মর্মাহত ও কিংকর্তব্য বিমুঢ় হয়ে আকস্মিক এবং একক ভাবে ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ১১ ফেব্রুয়ারি আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেন।[১৬৮] কিন্তু মুসলিম সম্প্রদায় এবং কারাগারের অভ্যন্তর থেকে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির অন্যতম প্রভাবশালী নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এবং কংগ্রেস নেতা পন্ডিত মতিলাল নেহেরু এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করা সত্ত্বেও কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটিতে তাঁর প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।[১৬৯] ব্রিটিশ সরকার আন্দোলন প্রত্যাহারের এ সুযোগ গ্রহণ করে ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ১৩ মার্চ মহাত্মাগান্ধীকে গ্রেফতার[১৭০] করে ০৬ মাসের কারাদন্ড দিলেও কোন প্রতিবাদ উত্থিত হয়নি বলে জানা যায়।

মহাত্মাগান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারের এই ঘটনাকে খিলাফত নেতৃবৃন্দ বিশ্বাসঘাতকতার শামিল বলে মনে করেন। আলী ভ্রাতৃদ্বয়সহ অধিকাংশ খিলাফত নেতা তখনও কারাগারে অন্তরীণ থাকায় খিলাফত আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী নেতৃবৃন্দও অত্যন্ত ক্ষুব্ধ, মর্মাহত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন; কংগ্রেস ও হিন্দু নেতৃবৃন্দের সাথে সম্পর্কের অবনতি ঘটে।[১৭১] অন্যদিকে তুর্কী ও আরবদের

জাতীয়তাবাদী মনোভাব এবং বিপ্লবী নেতা মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক কর্তৃক ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের ১৭ নভেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে খিলাফতকে বাতিল ঘোষণা করে তুরস্কে ধর্মনিরপেক্ষ সরকার প্রতিষ্ঠিত করায় ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী খিলাফত আন্দোলনের চেতনা বিনষ্ট হয়;এবং ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে ক্রমেই তা গতিপথ হারিয়ে ফেলে।

এইভাবে আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেয়ার ফলে সারা দেশের লোকের মন হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে এবং আন্দোলনের দূর্বলতা সামনে চলে আসে। খিলাফত আন্দোলন ছিল মূলত একটি ধর্মীয় আন্দোলন। এ আন্দোলনের সাথে অসহযোগ কর্মসূচি যুক্তকরে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলে মহাত্মাগান্ধী ধর্মকে ব্যবহার করেন; যা ভারতীয় জাতীয় অন্দোলনের চরম দূর্বলতা হিসেবে প্রকাশ পায়। আন্দোলন ও জাতীয় ঐক্যে আস্থা হারিয়ে লালা লাজ পাত রায় কংগ্রেস ছেড়ে হিন্দু মহাসভায় যোগদেন এবং অসহযোগ আন্দোলনের উজ্জ্বল নক্ষত্র ড.সাইফুদ্দিন কিচলু তাঞ্জিম ও তাবলিগের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন বলে জানা যায়।[১৭২] মহাত্মাগান্ধীর একক সিদ্ধান্তে অসহযোগ আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটলেও এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য ছিল অপরিসীম।[১৭৩] এই আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালি মুসলমানদের রাজনৈতিক সচেতনতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধিপায় এবং তারা ক্রমশ আন্দোলনের দিকে ধাবিত হয়। বাংলা থেকে খিলাফত আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী নেতৃবৃন্দের মধ্যে প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁ, মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, জমিদার আবদুল হালীম গজনবী, জমিদার ওয়াজেদ আলী খান পন্নী, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মাওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ, আশরাফ উদ্দীন আহমেদ চৌধুরী, কাজেম আলী মিয়া, তমিজ উদ্দীন খান, পীর বাদশা মিয়া, খান বাহাদুর হেমায়েত উদ্দীন আহমেদ, কবি মোজাম্মেল হক, সুলতান আহমেদ চৌধুরী, খানসাহেব হাতেম আলী জমাদার, মৌলভী মুহাম্মদ ইবরাহীম, নাসির আহমেদ ভূঁইয়া, সুরেনচন্দ্র দাশগুপ্ত, কবিরাজ শেখ আবদুল আজিজ, মাওলানা মনিরউদ্দীন আনওয়ারী, সোমেম্বর প্রাসাদ চৌধুরী, শাহ্ আবদুল হামিদ, আফসার উদ্দীন আহমেদ, সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মৌলভী শামসুদ্দীন আহমেদ, সৈয়দ মজিদবখশ এবং মাওলানা আহমদ আলী প্রমুখ খিলাফত আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন বলে জানা যায়।

স্বরাজপার্টি ও বাঙালির ব্রিটিশ বিরোধিতা

প্রকৃতপক্ষে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন একটি ব্যাপক ভিত্তিক গণআন্দোলন।এআন্দোলনের ব্যর্থতা জনমনে অসন্তোষ ও হতাশার এবং হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক সম্পর্কে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের সৃষ্টিকরে।[১৭৪] এদিকে অসযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারের ফলে কংগ্রেসের কর্মপন্থা নিয়ে তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হয় এবং কংগ্রেস বিভক্ত হয়ে পড়ে। মহাত্মাগান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ কাউন্সিলে

প্রবেশ করার বিপক্ষে পূর্বের অবস্থানে অনঢ় থাকেন। পক্ষান্তরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, মতিলাল নেহেরু প্রমুখ নেতৃবৃন্দ যারা কাউন্সিলে নির্বাচিত হয়ে ভেতর থেকে বাধাদানের মাধ্যমে সরকারকে অচল করে দেয়ার পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হন।[১৭৫] এ প্রেক্ষাপটে ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ কংগ্রেসের গয়া অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে আইন সভায় প্রবেশের পক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখেন। কিন্তু তাঁর এ অভিমত প্রত্যাখ্যাত হলে তিনি সভাপতি পদে ইস্তফা দেন এবং নিজের কর্মসূচিকে বাস্তবায়িত করার জন্য ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর গয়ার কংগ্রেস অধিবেশনে মতিলাল নেহেরু, হাকিম আজমল খান, মাওলানা শওকত আলী, মাওলানা মুহাম্মদ আলী ও অন্যান্যদের সহযোগিতায় *'কংগ্রেস খিলাফত স্বরাজ দল'* গঠন করেন। দলটি সংক্ষেপে *স্বরাজ দল* (The Swaraj Party) নামে পরিচিতি পায়।[১৭৬] নবগঠিত এদলটির সভাপতি পদে চিত্তরঞ্জন দাশ এবং মতিলাল নেহেরু সম্পাদক নির্বাচিত হন। স্বরাজপার্টি নির্বাচিত হয়ে কাউন্সিলে এক প্রস্তাব উত্থাপন করে মহাত্মাগান্ধীকে কারামুক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় ইংরেজ সরকার ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের ০৫ ফেব্রুয়ারি মহাত্মাগান্ধীকে মুক্তি দেয়।[১৭৭] কারামুক্ত হয়ে তিনি চিত্তরঞ্জন দাশের সাথে আলোচনাক্রমে কংগ্রেসের সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় কাজ চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়।

১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে কলকাতা কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে চিত্তরঞ্জন দাশ বলেন, স্বরাজ অর্জনের জন্য আমি কাউন্সিলকে একটি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চাই; পরিপূর্ণ স্বরাজ আদায়ের ক্ষমতা আজ তোমাদের হাতের মুঠোয়।[১৭৮] মহাত্মাগান্ধীর কাউন্সিল বর্জন নীতির পরিবর্তে কাউন্সিলে প্রবেশ করত; আইনী কাঠামোর সাহায্যেই ব্রিটিশ সরকারকে ঘায়েল করা স্বরাজ দলের লক্ষ্য ছিল বলে অনুমিত হয়। লক্ষ্য অর্জনে চিত্তরঞ্জন দাশ বলেন, কাউন্সিলে যোগদান দ্বারা ভারতবাসীকে স্বায়ত্বশাসনের পরীক্ষা দিতে হবে। কাউন্সিলে প্রবেশ করতে পারলে ব্রিটিশ আমলাতন্ত্র দূর্বল হয়ে পড়বে।[১৭৯] তিনি আরও ঘোষণা করেন, ডোমিনিয়ন স্টেটাস আদায় করাই হলো স্বরাজ দলের লক্ষ্য।[১৮০] ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে অংশগ্রহণ ও প্রচারাভিযানের স্বার্থে দলটির ১৪ অক্টোবর ঘোষিত ইস্তাহারে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব প্রকাশ করে বলা হয়, ভারত শাসনের পিছনে ব্রিটিশদের আসল উদ্দেশ্য হলো তাদের নিজ দেশের সঙ্কীর্ণ স্বার্থ সংরক্ষণ করা এবং যে সব তথাকথিত সংস্কার কার্যকর করা হচ্ছে সেগুলো ভারতে দায়িত্বশীল সরকার মেনে নেওয়ার নামে ঐস্বার্থ চরিতার্থ করার একটা আবরণ মাত্র।ভারতীয়দের চিরকাল ব্রিটেনের অধীনে রেখে এদেশের অপরিসীম সম্পদ ও শোষণ অব্যাহত রাখাই তাদের আসল উদ্দেশ্য।[১৮১] স্বরাজপার্টির নেতৃবৃন্দ আইনের মাধ্যমে এসকল ধোঁকাবাজি বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। চিত্তরঞ্জন দাশের প্রত্যাশা ছিল, সরকার ডোমিনিয়ন স্টেটাস দানে রাজি হবেন। এ দাবি আদায়ের লক্ষ্যে তিনি করপোরেশন ও মিউনিসিপ্যালিটির মাধ্যমে জনহিতকর কাজ করে স্বরাজ

দলের প্রভাব বৃদ্ধির প্রত্যয়ে কলকাতা করপোরেশনের সামনে নয় দফা কর্মসূচি দেন। তাঁর পরিকল্পনা ছিল আইনসভায় সরকারি বাজেট বরাদ্ধ নাকচ এবং সরকারি আইনের প্রস্তাবে ঘন ঘন সংশোধনী জুরে সরকারকে এমন বিব্রত করা;যাতে করে সরকার ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস দিতে বাধ্য হয়।

উদীয়মান বাঙালি হিন্দু নেতৃবৃন্দের পাশাপশি বাংলার প্রখ্যাত মুসলিম নেতৃবৃন্দও স্বরাজ পার্টিতে যোগদান করেন।[১৮২]বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির হিন্দু-মুসলিম নেতৃবৃন্দের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অচিরেই স্বরাজপার্টি বাংলায় বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে।[১৮৩] ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে কেন্দ্রে ১০১টি আসনের মধ্যে ৪২টি আসন লাভ করে এবং বাংলায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে সমর্থ হয়।[১৮৪] এ বিজয়ে উৎসাহী হয়ে বাঙালি হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের এই ঐক্যকে সুসংহত,জোরদার এবং বাস্তব ভিত্তিক রূপদানের লক্ষ্যে দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ও বাস্তববাদী নেতা চিত্তরঞ্জন দাশ শিক্ষা ও চাকরিসহ পশ্চাৎপদ মুসলিম সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক সমস্যা সমূহের সমাধানের উদ্যোগ নেন। এক্ষেত্রে মুসলিম সম্প্রদায়ের একে ফজলুল হক এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী চিত্তরঞ্জন দাশের সাথে সহযোগীতায় সম্মত হন। অত:পর এদুই মুসলিম নেতার সাথে চিত্তরঞ্জন দাশ ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের ০৯ ডিসেম্বর একটি রাজনৈতিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। ১৬ ডিসেম্বর স্বরাজ কাউন্সিল পার্টির একসভায় *বেঙ্গল প্যাক্ট* আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হয়। এই চুক্তিই বাংলার ইতিহাসে বিখ্যাত *বেঙ্গল প্যাক্ট* (Bengal Pact) নামে পরিচিতি পায়।[১৮৫]

চিত্তরঞ্জন যথার্থই উপলব্ধি করেছিলেন ধর্ম ও কৃষ্টিতে বিপুল পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এক জায়গায় অর্থাৎ ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের বিরোধীতায় উভয় সম্প্রদায়ের মিল রয়েছে।তিনি বলেছিলেন,হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত শক্তিছাড়া ব্রিটিশ আমলাতন্ত্র (Bureaucracy)[১৮৬] কে বাধা প্রদান করা অসম্ভব।[১৮৭] দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের স্বপ্ন ছিল সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ভিত্তিতে এক সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠন।তিনি বলেছিলেন,হিন্দু-মুসলমানের মিলন ভিন্ন স্বরাজের স্বপ্ন শুধু স্বপ্নই থেকে যাবে। এজন্য তিনি *বেঙ্গল প্যাক্ট* (Bengal Pact) স্বাক্ষর করেন।[১৮৮] বেঙ্গল প্যাক্টের শর্তানুসারে[১৮৯] কাউন্সিল ও স্থানীয় পরিষদে পৃথক নির্বাচন, সরকারি চাকুরিতে নিয়োগে জনসংখ্যার অনুপাত অনুযায়ী সামঞ্জস্যতা বিধানের লক্ষ্যে মুসলমানদের জন্য আসন সংরক্ষণ এবং ধর্মীয় বিষয়াদিসহ অন্যান্য বিষয়ে সমঝোতা হওয়ায় বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির মুসলিম সম্প্রদায় নব আশার আলো দেখতে পায়।

বেঙ্গল প্যাক্ট (Bengal Pact) বাংলার সমসাময়িক রাজনীতিতে ব্যাপকভাবে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে।হিন্দু-মুসলিম নেতৃবৃন্দের অনেকেই প্যাক্টের পক্ষে এবং বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেন।[১৯০]

কিন্তু বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণি এবং জমিদার শ্রেণির হিন্দুরা এই চুক্তির বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। সবচেয়ে বেশি ক্ষুব্ধ ও বিরোধিতায় নামে সশস্ত্র বিপ্লবপন্থি দল;যাদের হাতে চিত্তরঞ্জন দাশ কংগ্রেস পরিচালনার ভার অর্পণ করে নিশ্চিত হয়েছিলেন।[১৯১] এরূপ বিরোধিতা সত্ত্বেও চিত্তরঞ্জন দাশ ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের জুনে সিরাজগঞ্জের প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মেলনে বেঙ্গল প্যাক্ট অনুমোদন করিয়ে নিতে সক্ষম হন। কিন্তু ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের ১৬ জুন চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুর পর কংগ্রেস তথা হিন্দুদের প্রচন্ড মুসলিম বিদ্বেষী মনোভাব এবং কংগ্রেস পরিচালনার দায়িত্বে থাকা সশস্ত্র বিপ্লবপন্থি দলের অতিউৎসাহ ও কর্মতৎপরতায় কারণে ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের ২২ মে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসর কৃষ্ণনগর সম্মেলনে বেঙ্গল প্যাক্ট বাতিল ঘোষণার[১৯২] মাধ্যমে চাহিত অমিত হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সম্ভাবনা বিনষ্ট হয়।

বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির নেতা চিত্তরঞ্জন দাশের অকাল মৃত্যু সত্ত্বেও সাংবিধানিক কাঠামোর আওতায় ব্রিটিশ বিরোধীতার সাফল্য লক্ষ্যণীয়: (ক) বেঙ্গল প্যাক্টের ফলেই স্বরাজপার্টি ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের কাউন্সিল নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়লাভ করতে সমর্থ হয়। বাংলার গভর্নর লর্ড লিটন স্বরাজ নেতা চিত্তরঞ্জন দাশকে মন্ত্রিসভা গঠনের আহ্বান জানালে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু শেরে বাংলা একে ফজলুল হক, আবদুল করিম গজনবী ও সুরেন্দ্রনাধ মল্লিক মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করে নির্বাহী পরিষদের উপদেষ্টাদের সাথে যোগ দিয়ে কাউন্সিলে সংখ্যাগরিষ্টতা অর্জনের প্রয়াস পান। গভর্নরের অন্যতম উপদেষ্টা স্যার আবদুর রহিম তাঁদেরকে সর্বতোভাবে সহযোগীতা করা সত্ত্বেও তাঁরা মন্ত্রীদের বেতন বিল পাস করাতে অসমর্থ হন। কাউন্সিলে পরাজিত হয়ে শেরে বাংলা একে ফজলুল হক ও অন্যান্য মন্ত্রীগণ পদত্যাগে বাধ্য হয়। ফলে চিত্তরঞ্জন দাশের ব্রিটিশ বিরোধীতার নীতি সফল হয়। (খ) ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচনেও স্বরাজ পার্টি ৩/৪ (তিন-চতুর্থাংশ) আসন লাভ করতে সমর্থ হওয়ায় এপ্রিল মাসে চিত্তরঞ্জন দাশ কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত হন।[১৯৩] সুভাষচন্দ্র বসু চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার পদে নিয়োগ লাভ করেন। কর্পোরেশনে জয়লাভ করায় স্বরাজ পার্টির সুবিধা হয়। *বেঙ্গল প্যাক্টের* শর্তানুসারে কর্পোরেশনে ২৫ জন মুসলমান চাকরিতে নিয়োগ লাভ করে।

এছাড়াও (ক) স্বরাজ পার্টির বিরোধিতার ফলে সরকারের *অর্থ বিল* (Money Bill) সম্পূর্ণভাবে অনুমোদিত হয়নি। (খ) কারাগারে আটক বৈপ্লবিক রাজবন্দীদের মুক্তির অনুকূলে একটি আইন পাস হয়। (গ) স্বরাজপার্টি ভারতের জন্য নতুন সংবিধান প্রণয়ণের লক্ষ্যে একটি গোল টেবিল বৈঠক আহ্বান করে। (ঘ) ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় আইনসভায় স্বরাজ পার্টি ভারতে পূর্ণ দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে একটি প্রস্তাব অনুমোদন করতে সমর্থ হয়। (ঙ) ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে সরকারি

নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ 'ওয়াক আউট' কৌশল স্বরাজপার্টি স্থাপন করে। (চ) প্রাদেশিক কাউন্সিলে বাজেটের ওপর বহুপ্রস্তাব স্বরাজপার্টির বিরোধিতায় নাকচ হয়ে যায়। (ছ) স্বরাজপার্টির ক্রমাগত অসহযোগীতার ফলে *দ্বৈত শাসনব্যবস্থা* (Dyarchy) ব্যর্থ হয়ে যায়।[১৯৪] সবোপরি স্বরাজ পার্টির সদস্যগণ কাউন্সিলে নতুন নতুন প্রস্তাব পেশ করে কাউন্সিলকে প্রায় অচল করতে সমর্থ হন। এক্ষেত্রে চিত্তরঞ্জন দাশ কাউন্সিলের বেশ কয়েকজন স্বতন্ত্র সদস্যের সমর্থন লাভ করে মোর্চা গঠন করেন। মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ সহ কয়েকজন স্বতন্ত্র সদস্য তাঁর কার্যক্রমে সমর্থন দেয়ার ফলে চিত্তরঞ্জন দাশ কাউন্সিলের কার্যক্রমে সরকারকে বাঁধা প্রদানের কার্যকরি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেন। প্রকৃতপক্ষে গণআন্দোলনের নেতৃত্ব ও স্বরাজ লাভের কর্মকৌশল নিয়ে আপোষকামী মহাত্মাগান্ধীর সাথে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির নেতা চিত্তরঞ্জন দাশের দ্বন্দ্বের ফলে কংগ্রেসের মধ্যে দুটি উপদলের সৃষ্টি হয়। উপদল দুটির মধ্যেই কখনো আপস,আবার কখনো সংগ্রামের প্রবণতা লক্ষ্যণীয়। মধ্যবিত্ত শ্রেণির এই সুবিধাবাদী চরিত্রের বহি:প্রকাশ স্বরূপ ১৯২৮ থেকে ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের সারা ভারতে আরেকটি গণজাগরণ দেখা দেয়।

সশস্ত্র বিপ্লবপন্থিরা বেঙ্গল প্যাক্ট বাতিল করার ক্ষেত্রে অগণী ভূমিকা পালন করা সত্ত্বেও চিত্তরঞ্জন দাশের স্বরাজবাদী কাজকর্মের সঙ্গে তারা সহযোগিতা করেছিল। কিন্তু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুর পরে বাংলার কংগ্রেস নেতৃত্ব সুভাষচন্দ্র বসু ও জে.এম.সেনগুপ্তের মধ্যে দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এসময় সশস্ত্র বিপ্লবপন্থি যুগান্তর গোষ্ঠী সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে এবং অনুশীলন দল জে.এম.সেনগুপ্তের সঙ্গে হাত মেলায়। পুনর্গঠিত সশস্ত্র বিপ্লবপন্থিদের উল্লেখযোগ্য ব্রিটিশ বিরোধীতার মধ্যে ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের ০৮ জানুয়ারি বিপ্লবী গোপীমোহন সাহা[১৯৫] কর্তৃক কলকাতার ঘৃণ্য পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্ট হত্যাচেষ্টায় ভূলক্রমে মি.ডে নামক এক এক ইংরেজ নিহত হয়। এতে জনগণের ওপর নিপীড়নের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। ব্রিটিশ সরকার সন্দেহভাজন সশস্ত্র বিপ্লবপন্থি এবং তাদের সমর্থক সন্দেহে বহু কংগ্রেসীসহ সুভাষচন্দ্র বসুকে গ্রেফতার করে।[১৯৬] গণপ্রতিবাদ সত্ত্বেও সরকার গোপীমোহন সাহাকে ফাঁসি দেয়। ব্রিটিশ বিরোধি বৈপ্লবিক কর্মকান্ড প্রচন্ড বাধাপ্রাপ্ত হয়।

এদিকে ১৯২৫ থেকে ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারের নিপীড়নমূলক ভয়ঙ্কর চেহারা অত্যন্ত নগ্নরূপে প্রকাশ পায়। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের ৩ ফেব্রুয়ারি সাইমন কমিশন ভারতে আসে। প্রতিবাদে কমিশনকে বর্জনের ঘোষণা দিয়ে জাতীয় কংগ্রেস সর্বত্র হরতালের ডাক দেয়।এতে মাদ্রাজ হাইকোর্ট ঘেড়াওসহ কলকাতা পুলিশের সঙ্গে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির ছাত্র জনতার হাতাহাতি ও সংঘর্ষ হয় বলে জানা যায়।[১৯৭] ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে নেহেরু রিপোর্টে ভারতের মেহনতি মানুষের স্বার্থ

উপেক্ষিত হওয়ায় কংগ্রেসের বামপন্থিরা প্রতিবাদে *ইনডিপেন্ডেন্ট লীগ* গড়ে তোলে। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে কংগ্রেস নেতা জওহরলাল নেহেরু এবং বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির নেতা সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে *নিখিল ভারত ইনডিপেন্ডেন্ট লীগের* একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। মহাত্মাগান্ধীর অহিংস আন্দোলন শুরু হওয়ার পূর্বেই তাঁর অনিচ্ছা সত্ত্বেও কংগ্রেসের মঞ্চে বামপন্থিদের পক্ষ থেকে সুভাসচন্দ্র বসু পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতার কর্মসূচিসহ পাল্টা সরকার গঠনের দাবি জানানো সত্ত্বেও কংগ্রেস এই দাবি গ্রহণ করেনি বলে তথ্য পাওয়া যায়।[১৯৮]

মহাত্মাগান্ধীর আইন অমান্য আন্দোলন ও বাঙালির ব্রিটিশ বিরোধিতা

এদিকে মহাত্মাগান্ধী ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ১২ মার্চ গুজরাটে লবণ আইনকে উপলক্ষ করে সত্যাগ্রহীদের নিয়ে ডান্ডির দিকে যাত্রা করেন।[১৯৯]এসময় বাংলায় একদল সত্যাগ্রহী আসামের শ্রীহট্ট থেকে গোটাপথ পায়ে হেটে বাংলার নোয়াখালীর সমুদ্র উপকূল পর্যন্ত পৌছানোয় নতুন উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়।[২০০] ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ০৫ এপ্রিল সদলবলে ডান্ডি পৌঁছার পরদিন ০৬ এপ্রিল মহাত্মাগান্ধী ডান্ডির সমুদ্র উপকূলে এক মুঠো লবণ হাতে নিয়ে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করেন। এই আন্দোলনে গোটা দেশের জনগণ ব্যাপকভাবে যোগ দেয় যার তুলনা বাঙালির ব্রিটিশ বিরোধীতার ইতিহাসে বিরল।[২০১] এদিন আইন অমান্য আন্দোলনকে কেন্দ্র করে কলকাতাসহ ভারতের অন্যান্য শহরে[২০২] ব্রিটিশ বিরোধী বড় বড় গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় বলে জানা যায়।[২০৩]

কংগ্রেসের সাথে রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকায় কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহসহ মুসলিম নেতৃবৃন্দ এই আন্দোলনের বিরোধিতা করেন এবং একে মুসলিম স্বার্থের পরিপন্থি বলে ঘোষণা করেন। মাওলানা মোহাম্মদ আলী কংগ্রেসের আন্দোলন সম্পর্কে সতর্ক করে বলেন, গান্ধী উগ্র সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান হিন্দু মহাসভার পক্ষে কাজ করছেন। তাঁর যাবতীয় কার্যের লক্ষ্য হলো হিন্দু রাজত্ব স্থাপন করা এবং মুসলমানদের পদানত করে রাখা।[২০৪] এসকল সতর্কবাতা সত্ত্বেও এ অসহযোগ আন্দোলনে পূর্ব বাংলার শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা, গাইবান্ধা, বগুড়াও নোয়াখালীতেও মধ্যবিত্ত শ্রেণির বাঙালি মুসলমানের অংশগ্রহণ ছিল স্বতস্ফুর্ত। ঢাকায় মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তশ্রেণির মুসলিম মহিলাসহ মুসলমান ছাত্র, দোকানদার এবং নিম্নবিত্তশ্রেণির লোকেরাও এই আন্দোলনে সমর্থন দেয়।[২০৫] ব্রিটিশ বিরোধিতা মোকাবিলার প্রত্যয়ে সরকার প্রথমে অসহযোগ আন্দোলন ও পরে কংগ্রেস সহ অন্যান্য জাতীয় সংগঠনকে বেআইনী ঘোষণা করে।

ব্রিটিশ বিরোধিতায় বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির নেতা মাস্টারদা সুর্যসেনের নেতৃত্বে স্বশস্ত্র বিপ্লবপন্থিরা ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ১৮ এপ্রিল একযোগে চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার, পুলিশ ব্যারাক ও রেলস্টেশন আক্রমণ করে। একাজে সূর্য সেনের সহযোগী ছিলেন অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ এবং লোকনাথ বলসহ মোট ৬৫ জন নিবেদিতপ্রাণ সশস্ত্র বিপ্লবপন্থি যুবক। তারা *ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মির* (Indian Republican Army) নামে বন্দে মাতরাম' ও 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' ধ্বনির মধ্যে স্বাধীনতা ঘোষণা করে অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়। ০৫ দিন পর্যন্ত শহরটি নিজেদের অধিকারে রেখে ব্রিটিশ বিরোধীতায় এক অনন্য নজীর স্থাপনে সক্ষম হয়।[২০৬] ব্রিটিশরা চট্টগ্রাম বন্দরে তাদের সৈন্য সমাবেশ করার পর কলকাতায় যোগাযোগ করে সৈন্য সাহায্য চেয়ে পাঠায়।সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে শহরের মধ্যে প্রতিরোধ চালানো বিপ্লবীদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তারা সরে জালালাবাদ পাহাড়ে আশ্রয়গ্রহণ করে। ২২ এপ্রিল কয়েক হাজার সৈন্য জালালাবাদ পাহাড়ে তাদের ঘিরে ফেলে। সংঘঠিত সশস্ত্র সংঘর্ষে ৮০ জনের বেশি ব্রিটিশ সৈন্য এবং ১২ জন সশস্ত্র বিপ্লবপন্থি মারা যাওয়ায় সূর্যসেন আশেপাশের গ্রামে[২০৭] আশ্রয়গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন।সেখান থেকে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে ব্রিটিশ সরকারের কর্মচারী ও সম্পত্তির ওপর আক্রমণ চালাতে লাগলেন।সরকারের প্রচন্ড দমনপীড়ন ও বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের সম্মিলিত অভিযান সত্ত্বেও গ্রামবাসীদের আশ্রয় ও খাদ্যগ্রহণ করে টানা তিন বছর জেলের বাইরে থেকে ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের ১৬ ফেব্রুয়ারি সূর্যসেন গ্রেফতার হন।[২০৮]

ভারতীয় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ চট্টগ্রামের এই ঘটনার বিরোধিতা ও নিন্দা প্রকাশ করেন বলে তথ্য পাওয়া যায়।[২০৯] তবে চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার সংক্রান্ত বৈপ্লবিক এঘটনা বাংলায় গভীর প্রভাব বিস্তার করে।সরকারি এক মন্তব্যে বলা হয়, এই ঘটনা বিপ্লবী মনোভাবাপন্ন যুবকদের কল্পনাকে উজ্জীবিত করেছিল এবং তারা বিভিন্ন সশস্ত্রপন্থি গোষ্ঠীতে কর্মী হিসেবে যোগ দিতে থাকে।[২১০] ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ০৮ ডিসেম্বর বিনয়, বাদল ও দিনেশ একযোগে কলকাতা রাইটার্স বিল্ডিংয়ে সশস্ত্র হামলা চালিয়ে ব্রিটিশ প্রশাসনকে অস্থির করে তোলার মাধ্যমে সরকারি ভাষ্যের যথার্থতা প্রতীয়মান হয়।[২১১] ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের এসকল বৈপ্লবিক তৎপরতায় বড় ধরণের পুনরুজ্জীবন ঘটে এবং সেই গতি ১৯৩১ ও ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দেও বজায় ছিল। মৃত্যুকে উপেক্ষা করে ব্রিটিশ বিরোধিতার অসংখ্য ঘটনা ঘটেছে। শুধু মেদিনীপুর জেলাতেই দু'জন গভর্নরের জীবন নাশের চেষ্টা হয়; তিনজন ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট এবং পুলিশের দু'জন *ইন্সপেক্টর জেনারেল* (Inspector Genral of Police) হত্যাকান্ডের শিকার হন। ব্রিটিশ বিরোধিতায় এই তিন বছরে ২২ জন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা ও ২০ জন বেসরকারি ব্যক্তি হত্যাকান্ডের শিকার হন মর্মে তথ্য পাওয়া যায়। উপর্যুক্ত বৈপ্লবিক হত্যাকান্ডের ঘটনায় প্রশাসনে কর্মরত অফিসারদের মধ্যে আতঙ্কের উদ্রেক করে অনুমিত হয়।

বাংলায় ব্রিটিশ বিরোধী কর্মকান্ডে স্বাধীনতাপন্থি আন্দোলনের এই নতুন বৈপ্লবিক পর্যায়ে একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো তরুণীদের ব্যাপক অংশগ্রহণ। সূর্যকুমার সেনের নেতৃত্বে তাঁরা বিপ্লবীদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা,সংবাদ বাহক ও অস্ত্ররক্ষক হিসেবে এবং সরাসরি সশস্ত্রকর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করেছেন তাঁদের মধ্যে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার এবং কল্পনা দত্তের (যোশী) নাম স্মরণযোগ্য। এদিকে ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বেরে স্কুল পড়ুয়া ছাত্রী শান্তি ও সুনীতি ঘোষের গুলির আঘাতে কুমিল্লার জেলা প্রশাসক *স্টিভেন্স* (CGB Stevens) হত্যাকান্ড এবং ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ০৬ ফেব্রুয়ারি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বীণাদাস বাংলার গভর্নর *জন অ্যান্ডারসন* (Jhon Anderson) কে সরাসরি গুলি করলে সর্বমহলে এক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।[২১২] এদিকে ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের ২১ আগস্টে সংঘটিত টাঙ্গাইলে ঢাকা বিভাগীয় কমিশনারের ওপর আক্রমণের ঘটনা গোটা ভারতে আলোড়ন সৃষ্টি করে। ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার *ক্যাসেলস্* (Alexander Cassels) লঞ্চযোগে টাঙ্গাইল আসেন। তিনি টমটমে না উঠে পায়ে হেঁটে টাঙ্গাইল মহকুমা প্রশাসক এম.এইচ.এম.ফারুক, পৌরসভা চেয়ারম্যান যোগেন্দ্রনাথ মজুমদার এবং নিরাপত্তা রক্ষী সমবিহারে টাঙ্গাইল শহরস্থ *কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক* (Central Cooperative Bank) পরিদর্শনের জন্য মন্থরগতিতে এগিয়ে চলেন। এদিকে ঢাকা বিভাগীয় কমিশনারের টাঙ্গাইল আগমনের সংবাদ টাঙ্গাইল অনুশীলন দলের সদস্যদের কাছে আগে-ভাগেই পৌঁছে যায়। গোপন বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার *ক্যাসেলস্* (Alexander Cassels) সমবায় ব্যাঙ্কের কাছাকাছি মসজিদ রোডে আসতেই গর্জে ওঠে পরেশ স্যানালের রিভলভার; কিন্তু বুলেট সামান্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে উরু (Thigh) বিদ্ধ করে চলে যাওয়ায় তাঁর প্রাণ রক্ষা পায়। চোখের পলকে আততায়ী গাঢাকা দেয়। গুলিবর্ষণের সঙ্গে সঙ্গেই নিরাপত্তারক্ষীরা গণগ্রেফতার শুরু করে এবং মামলা রুজু করে। একই বছরের ১৭ ডিসেম্বর মামলার রায়ে হত্যা প্রচেষ্টা ও অস্ত্রআইন ভঙ্গের দায়ে আসামী পরেশ স্যানালের ১০ বছর এবং তাঁর সহযোগি ললিতচন্দ্র রাহার পাঁচ বছর সশ্রম কারাদন্ডের আদেশ হয়।[২১৩]

মহাত্মাগান্ধী সূচিত ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের আইন অমান্য আন্দোলনে বাংলার মেদিনীপুর জেলা উত্তাল হয়ে ওঠে। এসময় সরকারি দমন নীতিও অগ্নির্মূর্তি ধারণ করে। কাঁথি মহকুমায় লবণ প্রস্তুতের সময় উপস্থিত দর্শকদের ওপর পুলিশ গুলি চালায়। তমলুকে সত্যাগ্রহী ও তাদের সমর্থকদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া হয়। গোপীনাথপুরে কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবীরা অমানুষিক অত্যাচারের শিকার হয়। গ্রামবাসী উত্তেজিত হয়ে স্থানীয় থানা আক্রমণ করে পুলিশদের বন্দি করে একটি কক্ষে তাদের আটক করে সে কক্ষে আগুণ লাগিয়ে দেয়। কিন্তু কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবীরা নিজেদের জীবন বিপন্ন করে উপর্যুক্ত পুলিশদের উদ্ধার করে। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে শোভাযাত্রা বের হলে তিনি পুলিশ কর্তৃক নির্মমভাবে প্রহৃত হন।[২১৪]

১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ০৫ মে ব্রিটিশ সরকার মহাত্মাগান্ধীকে গ্রেফতার করলে আন্দোলন আরও তীব্র আকার ধারণ করে। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসের মধ্যভাগে কংগ্রেসের প্রতিনিধি ছাড়াই লন্ডনে গোলটেবিল বৈঠক আরম্ভ হয়। ২৬ জানুয়ারি মহাত্মাগান্ধী ও কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির নেতৃবৃন্দ মুক্তিলাভ করেন। মুক্তিলাভ করেই *গান্ধী-বড়লাট লর্ড অরউইন'র* সাথে আপস আলোচনা শুরু হয়। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের ০৪ মার্চ গান্ধী-অরউইন চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে ঐতিহাসিক জাতীয় সংগ্রাম স্থগিত ঘোষিত হয়।[২১৫] ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে আইন অমান্য আন্দোলন চলাকালে হাজার হাজার নেতাকর্মীর সাথে গ্রেফতারকৃত এবং নিষিদ্ধ ঘোষিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির সেক্রেটারি হেমচন্দ্র ঘোষ গান্ধী-অরউইন চুক্তি বলে আড়াই বছরের সাজা পূর্ণ হইবার পূর্বেই মুক্তিলাভ করেন।[২১৬] কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করে আবার তিনি ব্রিটিশ বিরোধী কর্মকান্ডে আত্মনিয়োগ করেন। কংগ্রেসের মধ্যে বিলীন হলেও এসব বিপ্লবীর বৈপ্লবিক কর্মকান্ডের প্রতি গণসমর্থন সম্পর্কে বাংলা পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল *লোম্যানের* (Lowman) বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন 'এরকম অজ্ঞ ও অশিক্ষিত লোকদের কাছ থেকে ভারতীয় কংগ্রেস এতো সহানুভূতি ও সমর্থন কিভাবে পায় তা আমার মাথায় ঢুকছে না।[২১৭] ১৯৩০ থেকে ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মহাত্মাগান্ধীর ব্রিটিশ বিরোধী সত্যাগ্রহরূপী অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতায় কংগ্রেসের বুর্জোয়া নেতৃবৃন্দের মধ্যে নেতৃত্ব হারানোর শঙ্কা জেগে ওঠে; তাঁরা ব্রিটিশ সরকারের সাথে আপস আলোচনায় গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করলেও বৈঠক ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। কিন্তু বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির সশস্ত্র বিপ্লবপন্থিদের ব্রিটিশ বিরোধী কর্মকান্ডে সাম্রাজ্যবাদীদের নীতিনির্ধারণী মহলে মধ্যে ভীতির উদ্রেক করে। এভীতি নিরসন এবং বারংবার গোলটেবিল বৈঠকের ব্যর্থতা সত্ত্বেও ভারতীয় জনমত এবং উদ্ভুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার কৌশল হিসেবে ব্রিটিশ সরকার ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইন প্রণয়ন করে। এ আইন বলেই সরকার ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির নেতা শেরে বাংলা একে ফজলুল হক বাংলার প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন এবং সরকার গঠন করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভারতকে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য করা হলে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। প্রতিবাদে ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে ঔপনিবেশিক সরকারের বিরুদ্ধে সমগ্র দেশের মধ্যে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভে জনপথ মুখরিত হয়ে উঠে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং বাঙালির ব্রিটিশ বিরোধীতা

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে অনন্য এক বৈপ্লবিক চরিত্রের অধিকারী ছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। স্বাধীনতাকামী ও সশস্ত্র বিপ্লবপন্থি জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে তাঁর গভীর সম্পর্ক ছিল। সুভাষচন্দ্র বসুর মধ্যে ভারতের স্বাধীনতা লাভের বৈপ্লবিক আকাঙ্খা ও আন্তরিকতা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা

চলেনা।[২১৮] তিনি ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের ত্রিপুরী কংগ্রেস অধিবেশনেও যুগপৎ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ভূমিকার প্রত্যয়ে পদে পুনরায় তিনি সভাপতি প্রার্থী হয়ে জয়লাভ করেন। এসময় তিনি চলমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ভারতকে স্বাধীন করার পরিকল্পনা করেন। সভাপতির ভাষণে তিনি ব্রিটিশ সরকারের উদ্দেশ্যে আগামী ছয় মাসের মধ্যে স্বাধীনতার দাবি উত্থাপন করেন।সরকার যদি স্বাধীনতা দানে রাজী না হয়;সেক্ষেত্রে তিনি ব্রিটিশ বিরোধী ব্যাপক আন্দোলন শুরুর জন্য কংগ্রেসের প্রতি আহ্বান জানান। কিন্তু তাঁর এ প্রস্তাবে মহাত্মাগান্ধীর সমর্থন মেলেনি। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের ০৮ থেকে ১২ মার্চ ত্রিপুরী কংগ্রেসের পর কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির সদস্য নির্বাচন সম্পর্কে মহাত্মাগান্ধী ও কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসুর সাথে আপোষ আলোচনা চলে। কিন্তু সমঝোতা না হওয়ায় অবশেষে বাধ্য হয়ে সুভাষচন্দ্র বসু সভাপতি পদে ইস্তফা দেন। কংগ্রেসে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন 'রাজেন্দ্র প্রাসাদ।[২১৯] পরবর্তী মে মাসে সুভাষচন্দ্র বসু তাঁর সমর্থক কংগ্রেস সদস্য এবং কংগ্রেসের সশস্ত্র বিপ্লবপন্থি ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধীদের নিয়ে ইতোপূর্বে গঠিত চিত্তরঞ্জন দাশের স্বরাজ পার্টির আদলে কংগ্রেসের আওতার মধ্যে একটি নতুন পার্টি *ফরোয়ার্ড ব্লক* গঠন করেন। এই *ফরোয়ার্ড ব্লক* কংগ্রেস নেতৃত্বের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করে স্বাধীনতা লাভের জন্য সাম্রাজ্যবাদী যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা'র[২২০] বিরুদ্ধে অবিলম্বে সংগ্রাম শুরুর আবেদন জানানো হয়। এতদসঙ্গে *ফরোয়ার্ড ব্লক* এবং অন্যান্য বামপন্থিরা একত্রিত হয়ে সমন্বিত ভাবে সংগ্রাম পরিচালনার উদ্দেশ্যে *বামপন্থি ঐক্য কমিটি* (Left Consolidation Committee) গঠন করেন।[২২১]

উপর্যুক্ত ঘটনার ফলে কংগ্রেস ও জাতীয় আন্দোলনে গভীর সঙ্কট দেখা দেয়। *ফরোয়ার্ড ব্লক* এবং অন্যান্য বামপন্থিদের সংগ্রামের আহ্বানে শঙ্কিত হয়ে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব[২২২] পাস করে শ্রমিক-কৃষক ও জনসাধারণের দৈনন্দিন সংগ্রাম বন্ধ করাই ছিল এই সকল প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। এ সকল অগণতান্ত্রিক প্রস্তাবের বিরুদ্ধে দেশের শ্রমিক,কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। *বামপন্থি ঐক্য কমিটি*র আহ্বানে ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের ০৯ জুলাই তারিখে কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সুভাষচন্দ্র বসু সর্বভারতীয় প্রতিবাদের আহ্বান জানান। এ বিষয়টি আপাত কংগ্রেসের নীতির পরিপন্থি হওয়ায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি তাঁর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগ করে; ব্যবস্থা হিসেবে তাঁকে বাংলা প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতির পদ থেকে অপসারণ করে। এবং আগামী তিন বছরের মধ্যে সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেসের কোনো প্রকার পদের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারবেন না মর্মে সিদ্ধান্ত নেয়।[২২৩]

১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের ০১ সেপ্টেম্বর নাৎসি জার্মানি পোল্যান্ড আক্রমণের মাধ্যমে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত ঘটে। ইতোপূর্বে ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে জার্মানি আগ্রাসন চালিয়ে অস্ট্রিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়া দখল করে নেয়। সেসময় ব্রিটেন ও ফ্রান্স হিটলারকে সমর্থন দিলেও ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের ০৩ সেপ্টেম্বর তারা পোল্যান্ডের পাশে দাড়ায় এবং জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।[২২৪] উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ভারতীয় প্রতিনিধিদের সাথে কোন প্রকার আলোচনা ছাড়াই কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে বড়লাট *লর্ড লিনলিথগোর* (Lord Linlithgow) পক্ষ থেকে ভারত সরকার জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এ সময় ব্রিটিশ পার্লামেন্টে সংশোধিত ভারত শাসন আইন নামে একটি জরুরি আইন পাস করে নেয়। ভারতের সকল গণতান্ত্রিক অধিকার বাতিল ও বড় লাটের হাতে সকল ক্ষমতা ন্যাস্ত করা হয়। নতুন ভারতরক্ষা অর্ডিন্যান্স দ্বারা ভারত সরকার ভারতের নিরাপত্তা রক্ষা এবং যুদ্ধ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা এবং আভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষার জন্য যে কোন অর্ডিন্যান্স জারির ক্ষমতা লাভ করেন। যুদ্ধের অজুহাতে ভারতের ওপর ব্রিটিশের স্বেচ্ছাচারী শাসন চেপে বসে। ভারতে এ যুদ্ধের মারাত্মক প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের ১৪ সেপ্টেম্বর কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির এক প্রস্তাবে বলা হয়, যে যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়, যে যুদ্ধের একমাত্র উদ্দেশ্য ভারতবর্ষে ও অন্যত্র সাম্রাজ্যবাদের শক্তি সংহত করা; কংগ্রেস সে যুদ্ধর সাথে জড়িত হতে অথবা কোনো প্রকার সাহায্য দিতে পারেনা।

কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির উপর্যুক্ত প্রস্তাবে ভারতের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি পূণর্ব্যক্ত করে। কিন্তু এতে ব্রিটিশ সরকার নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখায় এবং কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিরুদ্ধে মুসলিম লীগ ও রাজা-মহারাজাদের কাজে লাগাতে প্রয়াস পায়। এর অংশ হিসেবে ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের ১৭ অক্টোবর কংগ্রেসের এই দাবির প্রেক্ষিতে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত্বশাসনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বড়লাটকে সাহায্য করার জন্য একটি পরামর্শসভা গঠনের প্রস্তাব দেয়।[২২৫] ব্রিটিশ সরকারের এই সিদ্ধান্তে ভারতের মধ্যবিত্ত শ্রেণি ক্ষুব্ধ হয়। এ ব্যাপারে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ বড়লাট *লর্ড লিনলিথগোর* (Lord Linlithgow) সাথেও আলোচনা চালায়। কিন্তু তাদের দাবি অগ্রাহ্য হলে ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের ২৩ অক্টোবর কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির সভায় বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেস মন্ত্রীসভাগুলোকে পদত্যাগের আহ্বান জানানো হলে তারা পদত্যাগ করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির এ সভার প্রস্তাবে তারাহুড়ো করে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করতে কংগ্রেসিদের সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল মর্মে উল্লেখ পাওয়া যায়।

১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের মার্চে কংগ্রেসের রামগড়ের অধিবেশনের প্রস্তাবে গ্রেটব্রিটেনের যুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বলে ঘোষণা করে। এ যুদ্ধে কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকারকে কোনো প্রকার সহযোগিতা না করার সিদ্ধান্ত নেয়।[২২৬] বাংলা কংগ্রেসের সংখ্যাধিক্য অংশ সুভাষচন্দ্র বসুর সমর্থক থাকায় তাদের নেতার বিরুদ্ধে

শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিবাদে রামগড়ের এসম্মেলনে বাংলা প্রাদেশিক কংগ্রেসের কোন প্রতিনিধি যোগ দেয়নি।[২২৭] বলে জানা যায়। কিন্তু কংগ্রেসের রামগড় অধিবেশনের পাশে সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে আপস বিরোধী সম্মেলন বসে। কিন্তু মহাত্মাগান্ধী যুদ্ধের সময়ে কংগ্রেস আপস রফার পথে রাষ্ট্রীয় অধিকার অর্জন করতে পারবে, যুদ্ধে আক্রান্ত ও বিপন্ন ব্রিটিশকে এই সময় বিব্রত করা সত্যাগ্রহের নীতিসম্মত নয় বলে উল্লেখ করেন। মীমাংসার পথেই স্বাধীনতা আসবে-এবিশ্বাসও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের ছিল বলে জানা যায়।[২২৮] পক্ষান্তরে স্বাধীনতার দাবি আদায়ে সংগ্রামের এখনই মাহেন্দ্রক্ষণ বলে সুভাষচন্দ্র বসু দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করেন।[২২৯]

সুভাষচন্দ্র বসু ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ডাক দিতে আহ্বান এবং বাঙালির কলঙ্ক *হলওয়েল মনুমেন্ট* (Holwell Monument) অপসারণের দাবিতে আন্দোলন শুরু করায় ব্রিটিশ সরকার ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের ০২ জুলাই তাঁকে ভারত রক্ষা আইনে গ্রেফতার করে আলীপুর সেন্ট্রাল কারাগারে প্রেরণ করে। এই আন্দোলনে কলকাতায় অধ্যয়নরত *লেডি ব্রাব্রোন* (Lady Brabourne) এবং ইসলামিয়া কলেজের (মাওলানা আজাদ কলেজ) শিক্ষার্থী যথাক্রমে টাঙ্গাইলের সোফিয়া খান (৫২'র ভাষা সৈনিক) এবং টুঙ্গিপাড়ার শেখ মুজিবুর রহমান অংশগ্রহণ করেন[২৩০] বলে জানা যায়। এ আন্দোলনে নেতৃত্বদান ও ব্রিটিশ বিরোধীতার কারণে ব্রিটিশ সরকার ঔপনিবেশিক সরকার ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের ০২ জুলাই সুভাষচন্দ্র বসুকে ভারতরক্ষা আইনে গ্রেফতার করে আলীপুর সেন্ট্রাল কারাগারে প্রেরণ করে। কারাগারের অভ্যন্তরে ২৯ নভেম্বর থেকে আমৃত্যু অনশন শুরু করায় সুভাষচন্দ্র বসুর স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে। ০৫ ডিসেম্বর তাঁকে জেল থেকে মুক্তি দিয়ে কলকাতা এলগিন রোডের বাড়িতে গৃহবিন্ধ রাখা হয়।[২৩১] এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঔপনিবেশিক সরকার সুভাষচন্দ্র বসুকে ব্রিটিশ বিরোধী কর্মকান্ড হতে বিরত রাখার প্রয়াস পায়। এতদসত্ত্বেও 'নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ছদ্মবেশ ধারণ করে বিপুল সংখ্যক গোয়েন্দা পুলিশের নজর এড়িয়ে মাওলানা মুহাম্মদ জিয়াউদ্দীন নাম নিয়ে ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের ১৭ জানুয়ারি মধ্যরাতে অত্যন্ত চুপিসারে এলগিন রোডের বাসা থেকে গাঢাকা দেন। অতঃপর আফগানিস্তানের কাবুল থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের মস্কো হয়ে ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের ০৩ এপ্রিল বার্লিনে পৌঁছেন।[২৩২] এ প্রসংঙ্গে সুপ্রকাশ রায় উল্লেখ করেছেন, ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার প্রশ্নে মাওলানা মুহাম্মদ জিয়াউদ্দীন নাম ধারণ করে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ভারত ত্যাগের পশ্চাতে ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের ০১ ডিসেম্বরে আফগানিস্থানের কাবুলে শপথ নেওয়া রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ সিংয়ের নেত্বাধীন বিপ্লবী সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধীর প্রভাব রয়েছে।[২৩৩]

এদিকে জাপান, সিঙ্গাপুর, জাভা ও মালয়ে পূর্ব থেকেই বাংলার কতিপয় বিপ্লবী ভারতীয় স্বাধীনতার পক্ষে কর্মরত ছিলেন।[২৩৪] তন্মধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বাংলার শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী রাসবিহারী বসু ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের ১২ মে ছদ্মবেশে *পি.এন. ঠাকুর* (P.N.Tagor) নাম ধারণ করে জাপানের উদ্দেশ্যে ভারত ত্যাগ করেন। জাপানে অবস্থানকালে ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি ত্রিশজন ভারতীয়কে নিয়ে *ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগ* (Indian Independence League) প্রতিষ্ঠা করেন। এবং পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের সংঘবদ্ধ করে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে জোর তৎপরতা শুরু করেন।[২৩৫] এসময় জাপান সরকারের সাথে রাসবিহারী বসুর একটি চমৎকার আস্থার সম্পর্ক গড়ে উঠে বলে জানা যায়।

১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের ০৮ ডিসেম্বর ইঙ্গ-আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এসময় জাপান ব্রিটিশের নিকট থেকে সিঙ্গাপুর,রেঙ্গুন ও মালয় অধিকার করে। বহু ভারতীয় সৈন্য জাপানিদের হাতে বন্দি হয়।[২৩৬] এ সময় জাপানে অবস্থানরত রাসবিহারী বসু *ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগের* তরফে কুটনৈতিক প্রচেষ্টা জোরদার করেন। জাপান সরকারে সাথে ভারতের স্বাধীনতার অনুকূলে একটি সমঝোতায় পৌঁছেন। এর ফলে এসময় জাপান সরকার তাদের নিকটে থাকা বন্দি ভারতীয় সৈন্যদের মুক্ত করে দেয়। রাসবিহারী বসু এসকল সৈনিকদের নিয়ে জাপানের সহায়তায় ভারতীয়দের প্রধানশত্রু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন স্থির হয়। সাথে সাথে জাপান অধিকৃত ব্রিটিশ এলাকা তত্ত্বধানের আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সিদ্ধান্তক্রমে ০৮ডিসেম্বর ১১-ই,১/১৪ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের মোহন সিংকে প্রধান করে ভারতের জাতীয় বাহিনী (INA=Indian National Army) গঠিত হয়। সিদ্ধান্ত হয় এই বাহিনী *ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগের* সাথে একযোগে কাজ করবে।[২৩৭]

১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের ১৫ ফেব্রুয়ারি সিঙ্গাপুরের পতনের পর জাপানের প্রধানমন্ত্রী ভারতের স্বাধীনতার দাবিকে প্রকাশ্যে সমর্থন জ্ঞাপন করেন। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের মার্চের শেষে পূর্ব এশিয়ায় অবস্থানরত ও যুদ্ধে জাপানীদের হাতে বন্দি ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে এক সভা হয়। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনায় ভারতীয়দের দ্বারা সৈন্যবাহিনী গঠিত হবে। সিদ্ধান্ত হয় প্রয়োজনে জাপান সরকারের প্রতিশ্রুত সাহায্য গ্রহণ করা হবে।*ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগ*'র পরিচালক সমিতি (Council of Action) সর্বময় কর্তৃত্ব গ্রহণ করবে।

১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের ১৫ জুন ব্যাঙ্ককে অনুষ্ঠিত কনফারেন্সে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ একপ্রস্তাবে সুভাষচন্দ্র বসুকে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় চলে আসার অনুরোধ করা হয়।[২৩৮] রাসবিহারী বসুর আহ্বানে সুভাষচন্দ্র বসু জার্মান ও জাপান প্রদত্ত সাবমেরিন সহযোগে ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের ০২ জুন সিঙ্গাপুরের অদূরবর্তী সুমাত্রা

পৌঁছেন। ১৩ জুন আকাশ পথে টোকিও হাজির হয়ে জাপানি মন্ত্রিসভা ও সমর দপ্তরের সাথে আলোচনায় বসেন।[২৩৯] জাপান রেডিও থেকে ২১ জুন বক্তৃতার মাধ্যমে কর্মসমুদ্রে ডুবে যান।[২৪০] জাপানের প্রধানমন্ত্রী *তেজো* (Hideki Tojo) ঘোষণা করেন ভারত দখলের কোন ইচ্ছা জাপানের নেই।[২৪১] এসময় অনুশীলন সমিতির যে সকল সদস্য যারা মালয়,ব্রহ্মদেশ ও অন্যান্য স্থানে পূর্ব হতেই ছিলেন তারা সকলেই নেতাজির নেতৃত্বে ভারতের মুক্তি সংগ্রামে যোগদেয়।[২৪২]

১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের জুনে রাসবিহারী বসু সিঙ্গাপুর থেকে টোকিও প্রত্যাবর্তন করে সুভাষচন্দ্র বসুর সাথে আলোচনায় বসেন। এ আলোচনায় নেতাজি সভাষচন্দ্র বসু ভারতের বাইরে অতিসত্ত্বর স্বাধীন ভারত সরকার গঠনের প্রস্তাবে রাসবিহারী বসু সম্মত হন।[২৪৩] সকল শ্রেণির কর্মী ও অধিবাসীদের প্রতিনিধি নিয়ে ০৪ জুলাই রাসবিহারী বসু ও সুভাষচন্দ্র বসুর উপস্থিতিতে বিরাট কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। সর্বসমক্ষে রাসবিহারী বসু যুদ্ধ পরিচালনার ক্ষমতা অর্পণপূর্বক সুভাষচন্দ্র বসুর ওপর ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগ[২৪৪] ও I.N.A.'র সকল দায়িত্ব অর্পণপূর্বক এক আবেগময়ী বক্তৃতায় তাঁর অবসর গ্রহণের ঘোষণা দেন। সভায় সর্বাধিনায়কত্ব স্বীকার করে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এক দীর্ঘ বক্তব্য রাখেন। যার মর্মার্থ হলো "দিল্লী চলো, দিল্লী চলো।"[২৪৫] রাসবিহারী বসুকে প্রধান পরামর্শদাতা নিযুক্ত করা হয়।

রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে গঠিত ভারতের জাতীয় বাহিনী (I.N.A.) দলাদলির ফলে তা প্রায় বিলুপ্ত হওয়ার উপক্রম হয়। ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে ভারতের অভ্যন্তরীণ সংগ্রামকে চাঙ্গা করার অভিপ্রায়ে সুভাষচন্দ্র বসু ভারতের জাতীয় বাহিনী (INA=Indian National Army) পুনর্গঠন করে ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের ০৫ জুলাই আজাদ হিন্দ ফৌজ (Azad Hind Fauj) গঠন করা হয়।[২৪৬] ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের ০১ আগস্ট বার্মার স্বাধীনতা ঘোষিত হলে আজাদ হিন্দ ফৌজের[২৪৭] সর্বস্তরে শৃঙ্খলা স্থাপনের উদ্দেশ্যে ২৫ আগস্ট তিনি এ বাহিনীর সর্বাধিনায়কের পদগ্রহণ করেন।[২৪৮] নেতাজি রেঙ্গুন ও সিঙ্গাপুরে দু'টি সদর দপ্তর স্থাপন করে আজাদ হিন্দ ফৌজের পুনর্গঠনে হাত দেন। বেসামরিক নাগরিকদের মধ্য থেকে শুরু হয় সৈন্য ও অর্থ সংগ্রহ শুরু করেন। ঝাঁসির রাণী বাহিনী নামে একটি নারী বাহিনীও গঠন করা হয়।[২৪৯]

সিঙ্গাপুরে নেতাজির সর্বাধিনায়কত্ব লাভ পরবর্তী ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের ২১ অক্টোবর প্রবাসে বিপ্লবী ও *স্বাধীন ভারত সরকার* (Azad Hind Government) গঠিত হয়। ২৩ অক্টোবর থেকে ১৯ নভেম্বরের মধ্যে অক্ষশক্তি তথা জাপান,জার্মানি প্রভৃতি আটটি রাষ্ট্র এ সরকারকে স্বীকৃতি দেয়। ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের ২৪ অক্টোবর ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির বিরুদ্ধে নবগঠিত এই সরকার যুদ্ধঘোষণা করে। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের

জাপানি কর্তৃত্ব নভেম্বরে আজাদ হিন্দ সরকারে হাতে অর্পিত হয় এবং ২৯ নভেম্বর নেতাজি আন্দামান দ্বীপ পরিদর্শন[২৫০] করেন এবং সেখানে ব্রিটিশ চিফ কমিশনার ভবনে ত্রিবর্ণরঞ্জিত স্বাধীন ভারতের পতাকা উত্তোলন করেন।[২৫১] আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপকে যথাক্রমে শহীদ ও স্বরাজ নামকরণ করা হয়। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দের ১৪ ফেব্রুয়ারি আজাদ হিন্দ সরকার এই দ্বীপ দু'টির শাসনভার গ্রহণ করে।[২৫২] শাহ নেওয়াজের নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজের একটি ব্যাটালিয়নকে জাপানি বাহিনীর সঙ্গে ভারত ও ব্রহ্মদেশ সীমান্তে যাওয়ার ও ইম্ফল অভিযানে অংশ নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়।[২৫৩] ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দের ৩১ মার্চ আজাদ হিন্দ ফৌজ দক্ষিণ মণিপুরে প্রবেশ করে। এ এলাকা বিপ্লবী আজাদ হিন্দ সরকারের শাসনাধীন হয়।[২৫৪]

১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দের ১৭ এপ্রিল আসামের নাগা জেলার প্রধান শহর কোহিমা আজাদ হিন্দ ফৌজের অধিকারে আসে।[২৫৫] মণিপুর ও নাগা পাহাড়ের ভূমিতে স্বাধীন ভারতের ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা উত্তোলনের সাথে সাথে বিপ্লবী মনে নব উদ্যম জেগে উঠে। কিন্তু ইম্ফল আক্রমণের সকল আয়োজন সম্পন্ন হলেও প্রবলবর্ষণ আরম্ভ হওয়ায় রণ কৌশলগত কারণে[২৫৬] আক্রমণ স্থগিত রেখে ২৫ জুন কোহিমা-ইম্ফলের পথ থেকে পশ্চাৎপসরণ করতে হয়।[২৫৭]

১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের ১৫ আগস্ট ব্রিটিশদের নিকট জাপান সরকার আত্মসমর্পণ করায় নেতাজির স্বাধীনতার স্বপ্ন আরাধ্যই থেকে যায়।[২৫৮] এদিকে ১৭ আগস্ট নেতাজি আজাদ হিন্দ ফৌজের বিমানে অজ্ঞাত স্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তবে সে সম্পর্কে সঠিক কিছু জানা যায়না।[২৫৯] জাপানের পরাজয়ের মাধ্যমে আজাদ হিন্দ ফৌজের স্বাধীন ভারত ভূমির স্বপ্ন নস্যাৎ হলেও নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর বিপ্লবী কার্যক্রম থেকে ভারতীয় জনতা প্রতিবাদের শিক্ষা আয়ত্ব করে। এপথেই ব্রিটিশ ভারত ছাড়তে বাধ্য হয় ।

এদিকে ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের ২৯ অক্টোবর থেকে নভেম্বর মাসের মধ্যে কংগ্রেস মন্ত্রিসভাগুলো মন্ত্রীত্ব ছেড়ে দিলে ১২ ডিসেম্বর মুসলিম লীগ ভারতে *মুক্তি দিবস* পালন করে। তারা অভিযোগ করে কংগ্রেস শুধু মুসলমান বিরোধী সংস্থা তাই নয়; তার রাজনৈতিক নীতিও পৌরুষহীন। স্বাধীনতা সম্পর্কে মহাত্মাগান্ধীর দ্বিমুখী নীতির জন্যই বিরক্ত হয়ে কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ, হযরত মাওলানা হাসরত মোহানী প্রমূখ মুসলিম নেতৃবৃন্দ কংগ্রেস ছাড়তে বাধ্য হন। তারা অভিযোগ করেন, ব্রিটেনের সাথে রাজনৈতিক সমঝোতার মাধ্যমে মুসলমানদের দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ করাই কংগ্রেসের অভিপ্রায়।

এহেন প্রচার মুসলিম তরুণ ও ক্ষুদে বুর্জোয়াদের মনে প্রভাব ফেলে;তদুপরি যুদ্ধসম্পর্কে কংগ্রেসের কর্মকান্ড দেখে মুসলিম লীগে যোগ দিতে থাকে।[২৬০]

১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত হলে ভারত উপমহাদেশ সহ সমগ্র বিশ্বপরিস্থিতি ব্রিটিশ সরকারকে নাজুক অবস্থায় ফেলে। উপর্যুক্ত পরিবেশে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের উদ্যোগে ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের ২৩ মার্চ লাহোর সম্মেলনে কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর সভাপতিত্বে বাংলার প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলা একে ফজলুল হক সর্বভারতীয় মুসলমানদের স্বার্থে ব্রিটিশ সরকারের উদ্দেশ্যে এক রাজনৈতিক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। মুসলিম লীগের এ সম্মেলনে উক্ত প্রস্তাবটি লাহোর প্রস্তাব নামে গৃহীত হয়।[২৬১] মুসলিম লীগের তিন দশকের রাজনীতিতে যা ছিল প্রথম বলিষ্ঠ ও ইতিবাচক পদক্ষেপ।[২৬২] মুসলিম লীগের এ লাহোর প্রস্তাব পরবর্তীতে পাকিস্তান আন্দোলনের পথ সুগমকরে এবং ভারতীয় মুসলমানদের নিকট জনপ্রিয়তা লাভ করে। লাহোর প্রস্তাবের মূল বিষয় ছিল কোন শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা এদেশে কার্যকরি হবেনা;যদি তা নিম্নের মূলনীতি অনুসারে রচিত না হয়। যেসব এলাকা একান্তভাবেই মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ যেমন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এলাকা এবং ভারতের পূর্বাঞ্চল প্রয়োজন অনুসারে সীমানায় রদবদল করে ঐসকল এলাকাকে ভৌগলিক দিক দিয়ে এরূপভাবে পুনর্গঠিত করা হোক, যাতে সেগুলো স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্রসমূহের রূপ পরিগ্রহ করে এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিটদ্বয় সম্পূর্ণ স্বায়ত্বশাসিত ও সার্বভৌমত্বের মর্যাদা লাভ করতে পারে।[২৬৩] সভাপতির অভিভাষণে কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ মুসলিম লীগের লক্ষ্য ভারতের স্বাধীনতা, কিন্তু হিন্দু এবং মুসলমান দুই পৃথক জাতি; মেনে এবং তথাদর্শে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে।

লাহোর প্রস্তাব বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রভাব ফেলে। যদিও উভয় সম্প্রদায়ের প্রতিক্রিয়া ছিল ভিন্ন। বাংলার মুসলমান সমাজ বিশেষ করে যুবসমাজ লাহোর প্রস্তাবকে স্বাগত জানায় এবং এর মাধ্যমেই তারা স্বাধীনতার স্বপ্ন বুনতে থাকে।[২৬৪] একই সাথে হিন্দুরা লাহোর প্রস্তাবের ব্যাখ্যা করে এইভাবে যে, এর দ্বারা ভারতের অবশিষ্টাংশে মুসলমানরা স্বাধীন ও স্বতন্ত্র আবাসভূমি প্রতিষ্ঠা করবে। যে কারণে তারা অত্যন্ত বেপরোয়া হয়ে মুসলিম লীগ ও এর নেতাদের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন শুরু করে।[২৬৫] ইতোমধ্যে বাংলার রাজনীতিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

অক্ষশক্তি জার্মানি ইতোমধ্যে পোলান্ড, বেলজিয়াম, হল্যান্ড, নরওয়ে, ফ্রান্স এবং পূর্ব ইউরোপের অধিকাংশ অঞ্চল অধিকারে নেয়। এমতাবস্থায় অনাক্রমণ চুক্তি বিদ্যমান থাকাসত্ত্বেও জার্মানি ১৯৪১

খ্রিস্টাব্দের ২২ জুন সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করে বসে। এদিকে ০৭ ডিসেম্বর জাপান হঠাৎ করে পার্লহারবারে মার্কিন নৌবহরে আক্রমণ চালায়। জাপান দ্রুতই ফিলিপাইন, ইন্দোচীন, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও বার্মা পদানত করে ভারতের উপকণ্ঠে চলে আসে। এই অবস্থায় ভাইসরয় *লর্ড লিনলিথগো* (Lord Linlithgow) ভারতীয়দেরকে মিত্রশক্তির পক্ষে কাজ করানোর প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে একটি প্রতিরক্ষা পরিষদ গঠন করেন।[২৬৬] কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ এই পরিষদে যোগদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে।[২৬৭] কিন্তু মুসলিম লীগের দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে বাংলার প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলা একে ফজলুল হক এই পরিষদে যোগদান করেন। যে কারণে কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র সাথে সম্পর্কের অবনতি ঘটায় একে ফজলুল হক প্রতিরক্ষা পরিষদ এবং মুসলিম লীগ থেকে একযোগে পদত্যাগ করেন।[২৬৮] তবে কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র সাথে শেরে বাংলা একে ফজলুল হকের সম্পর্কের অবনতির মূল কারণ হলো মি. জিন্নাহ্ নিজেকে সমগ্র ভারতের মুসলমানদের প্রতিভূ হিসেবে থাকতে চান। কিন্তু শেরে বাংলা একে ফজলুল হক বাংলার মুসলমানদের স্বার্থের দিকেই অধিক মনোযোগী ছিলেন।[২৬৯] এই দ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে দ্রুত লীগ-প্রজা মন্ত্রিসভা ও দ্বিতীয় হক মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। মুসলিম লীগের খাজা নাজিমউদ্দীনের নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়।[২৭০] বাংলায় ক্ষমতা পালাবদলের এই টালমাটাল সময়ে ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে ব্রিটিশ সরকার *স্যার ক্র্যাফোর্ড ক্রিপস্‌কে* (Sir Richard Stafford Cripps) ভারতে প্রেরণ করে। তিনি ভারতে এসে চলমান যুদ্ধশেষে যুক্ত ভারতকে পূর্ণডোমিনিয়নের মর্যাদা দেওয়া হবে মর্মে প্রস্তাব করেন। কিন্তু *ক্রিপসের* প্রস্তাবটি কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয় দলের নিকট থেকেই প্রত্যাখ্যাত হলে[২৭১] ক্রিপস্ ব্যর্থ হয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। কংগ্রেস মহাত্মাগান্ধীর নেতৃত্বে ভারত ছাড় আন্দোলন শুরু করে। একই সময়ে মুসলিম লীগও জোরেশোরে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯-৪৫) শুরুতে যুদ্ধরত ব্রিটিশ শক্তি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ফলে যাতে কোনো প্রকার অসুবিধায় না পড়ে; সেকথা মহাত্মাগান্ধী বেশ কয়েকবার ব্যক্ত করেন।[২৭২] কংগ্রেস নেতারা যুদ্ধকালে প্রথমে সংগ্রামের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু ব্রিটিশের আপসহীন মনোভাবের ফলে কংগ্রেস সংগ্রামের পথ ধরে।[২৭৩] ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের ০৮ আগস্ট বোম্বাই শহর অধিবেশনে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি দেশকে মুক্ত করতে অহিংস পথে আন্দোলনের সিদ্ধান্ত করে।[২৭৪] শুরু হয় মহাত্মাগান্ধীর নেতৃত্বে *ভারত ছাড়* (Quit India) আন্দোলন। তিনি মানুষকে উৎসাহ দিয়ে বলেন, হয় স্বাধীনতা লাভ কর, না হয় মৃত্যুবরণ কর। পরাধীন হয়ে আর প্রাণধারণ করে থেকো না।[২৭৫] ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের ০৯ আগস্ট সকাল থেকে দেশ জুরে ধরপাকড় শুরু হয়। বোম্বাই শহরে মহাত্মাগান্ধী, পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু ও মাওলানা আবুল কালাম আজাদকে গ্রেফতার এবং কংগ্রেসকে বেআইনি ঘোষণা করা হয়।[২৭৬]

কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের ধড়পাকড় এবং ষড়যন্ত্রমূলক মামলার বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলন ও গণবিক্ষোভ দেখা দেয়। বামপন্থি কংগ্রেস কর্মীদের নেতৃত্বে হাজার হাজার যুবক শতশত রেলস্টেশন,পোস্ট অফিস ও থানা আক্রমণ করে। ব্রিজ-কালভার্ট উড়িয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বংস করে দেয়।[২৭৭]

এই আন্দোলন ক্রমে বিপ্লবে পরিণত হয়। বিপ্লবী জনতাই তখন সংগ্রামের নেতৃত্বগ্রহণ করে। বাংলার মেদিনীপুরে এই আন্দোলন তুঙ্গে উঠে। এই আন্দোলনে মাতঙ্গিনী হাজরা নামে এক স্বাধীনতাকামী পুলিশের গুলিতে শহীদ হন।[২৭৮] মেদিনীপুর জেলার কাথি ও তমলুকে এই আন্দোলন ব্যাপকতা লাভ করে। মহিষাদল থানা কংগ্রেস কর্মী ও জনতা আক্রমণ করলেও পুলিশ এবং স্থানীয় জমিদার মহিষাদল রাজের রক্ষীবাহিনীর আক্রমণে বহু লোক নিহত হলেও থানা দখল করা যায়নি। মহিষাদল রাজের দেশদ্রোহিতায় বিক্ষুব্ধ জনতা রাজ সরকারের কাছারি বাড়িগুলো, ধানেরগোলা ধ্বংস ও লুট করে খাজনা বয়কট করে। সুতাহাটা নন্দীগ্রাম ও পটাশপুর থানা বিপ্লবী জনতা দখল করে নেয়। তমলুক ও কাথীতে বেশ কিছুদিন ব্রিটিশ সরকারের অস্তিত্ব ছিলনা।[২৭৯] যতদূর জানা যায় ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের ১৭ ডিসেম্বর তমলুকে জাতীয় সরকার গঠিত হয়ে ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত তা টিকে ছিল।[২৮০] কিন্তু শেষপর্যন্ত কংগ্রেস নেতা মহাত্মাগান্ধীর নির্দেশে বিপ্লবী জনতাকে পিছু হটতে হয়। ভেঙ্গে দেওয়া হয় জাতীয় সরকার।[২৮১] এই *ভারত ছাড়* আন্দোলনে বাংলাসহ উড়িষ্যা,কর্ণাটক ও মহারাষ্ট্রে জাতীয় বৈপ্লবিক সরকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিপ্লবী জনতা ব্রিটিশ ঔপরিবেশিক শাসন প্রত্যাখ্যান করে অনুমিত হয়। স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে এই গণআন্দোলন ছিল অভূতপূর্ব।

গণআন্দোলনের তীব্রতায় সরকার ভীত হয়ে দমন-পীড়ন চালায় এবং একপর্যায়ে ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দের ০৬ মে মহাত্মাগান্ধিকে তাঁর ভগ্নস্বাহ্যের জন্য বিনাশর্তে মুক্তি দিলেও সরকার কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির অন্যান্য সদস্যদের মুক্তিদানে অস্বীকৃত হয়।[২৮২] তাঁর মুক্তির পর ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের সাহায্যে কোহিমা থেকে আজাদ হিন্দ ফৌজকে হটিয়ে দেয়। বার্মায় বর্মীদের সাহায্যে জাপানিদের হটিয়ে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ নেয়। এ সময় মহাত্মাগান্ধী প্রচার করেন, আগস্ট বিপ্লব আমার বা কংগ্রেসের কাজ নয়; সরকারি নির্যাতনেই বিপ্লব তুঙ্গে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে তার সৃহৃদ জয়প্রকাশ নারায়ণ প্রচার করেন,এখন দেশ আর বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত নয়।[২৮৩] সুতরাং মহাত্মাগান্ধীকে বিনাশর্তে মুক্তির পিছনে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের নূন্যতম সম্ভাব্যতাকেও অকার্যকর করার জন্য বিপ্লব বিরোধী শক্তিকে কাজে লাগানোর পরিকল্পনা ছিল বলে অনুমিত হয়।

ইতোমধ্যে ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে ফিল্ডমার্শাল ওয়াভেল ভাইসরয় হয়ে ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল করার উদ্যোগ নিলেও তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।[২৮৪] ইত্যবসরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তিতে ভারত বিষয়ে ব্রিটিশ সরকারের ওপর আন্তর্জাতিক চাপ বৃদ্ধি পায়। এছাড়া ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে জাপানের পরাজয়ে ব্রিটেনে নতুন পরিবেশের সৃষ্টি হয়। এ বছরের জুলাই মাসের সাধারণ নির্বাচনে রক্ষণশীর দলের পরাজয়ে শ্রমিক দলের নেতা মি. *ক্লেমেন্ট অ্যাটলি* (Clement Richard Attlee) ও *স্যার পথিক লরেন্স* (Sir Pathick Lawrence) যথাক্রমে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ও ভারত সচিব নিযুক্তির সাথে সাথে ব্রিটিশ সরকার ভারতের শাসনতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য নতুনভাবে চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের ০৪ ডিসেম্বর ব্রিটিশ লর্ড সভায় ভারত সচিবের ঘোষণা অনুযায়ী ভারতে একটি পার্লামেন্টারি দল প্রেরণ করে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সাপেক্ষে ভারতকে স্বাধীনতা প্রদান করাই এর উদ্দেশ্য ছিল বলা হয়। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারিতে দলটি ভারতে আগমন করে কিন্তু উদ্যোগটি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।[২৮৫]

১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের ১৫আগস্ট জাপানের আত্মসমর্পনের পর পূর্বরণাঙ্গনে ব্রিটিশের হাতে বন্দি আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসার ও সৈনিকরা।[২৮৬] ভারতীয় জনমানসে মহান দেশপ্রেমিক হিসেবে আভিনন্দিত হয়।[২৮৭] তবে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের আগস্টে ব্রিটিশ সরকার রাজদ্রোহের অপরাধে তাদের বিচারের ঘোষণা দেয়ায় জনতা ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানায়।[২৮৮] জনগণের মনোভাব বুঝে কংগ্রেসও বিচারের নিন্দা করে। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের ২১ থেকে ২৩ সেপ্টেম্বর বোম্বাইয়ের ওয়াকিং কমিটির বৈঠকে প্রস্তাবগ্রহণ করে ফায়দা হাসিলের প্রয়াস পায়। লালকেল্লার ঐতিহাসিক বিচারে তাদের হয়ে মামলা লড়েন ভুলাভাই দেশাই, তেজবাহাদুর সাপ্রু, কৈলাশনাথ কাটজু, জওহরলাল নেহেরু ও আসফ আলি। মুসলিম লীগও এই বিচারের প্রতিবাদ জানায়। কংগ্রেস অহিংস এবং মুসলিম লীগ নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের কথা বলে। কিন্তু জনগণের মনোভাব ছিল অন্যরকম। তারা ব্রিটিশ শাসকদের কোনো বিধি-নিষেধ মানতে রাজী ছিলোনা।[২৮৯] সরকারি ভূমিকার সমালোচনায় সংবাদপত্রে সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশিত হতে থাকে। আজাদ হিন্দ ফৌজের খবরে আন্তর্জাতিক খবর ম্লান হয়ে যায়।অসংখ্য পুস্তিকা প্রকাশিত হতে থাকে। দেশপ্রেমিকরা বিশ্বাসঘাতক নয়;পুস্তিকাটি জনপ্রিয়তা পায়।

১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনাদের মুক্তির দাবিতে প্রথম বিস্ফোরণ ঘটে। পরবর্তীতে অসংখ্য গণ-বিস্ফোরণে ভারতে ইংরেজ শাসনের ভিত ধ্বসে পড়তে থাকে। এবং শেষ আঘাতে দুইশত বছরের পুরাতন ব্রিটিশ শাসনের পতন অবশ্যম্ভাবী করে তোলে।[২৯০] ২২ নভেম্বর বিচারের প্রতিবাদ জানিয়ে ব্রিটিশ বন্দি-শিবিরে আবদ্ধ আজাদহিন্দ ফৌজের মুক্তির দাবিতে এক বিশাল

মিছিল কলকাতা শহর প্রদক্ষিণ করে। ছাত্র,শ্রমিক,নিম্নমধ্যবিত্ত ও অফিস কর্মচারীরা এতে যোগদেয়। কলকাতা পৌরসভার শ্রমিকরা ধর্মঘট করায় কয়েকদিন পানি সরবরাহ,বিদ্যুৎকেন্দ্র ও ট্রাম-বাস বন্দ থাকে। বাংলার গভর্নর সেনাবাহিনী তলব করে পরিস্থিতি সামাল দিতে সচেষ্ট হয়।[২৯১] কিন্তু এ সংগ্রাম সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলে। ব্রিটিশ সরকার এই নতুন বৈপ্লবিক গণ-অভ্যুত্থানের রূপদেখে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ০৪ জানুয়ারি আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দিদের মুক্তিদেয়। এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ভারতে ব্রিটিশ শাসন অবসানের সূচনা হয়।[২৯২]

১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনা অফিসার ক্যাপ্টেন রশিদ আলীকে সাত বৎসরের কারাদন্ড দেয়ার প্রতিবাদে জনগণ অধৈর্য হয়ে পড়ে। ১১থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কলকাতায় চলা আন্দোলন গণপ্রতিরোধের রূপ পায়। হিন্দু-মুসলমান ঐক্যবদ্ধভাবে এ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। উত্তেজিত জনতা কলকাতাগামী ট্রেনে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের পতাকা লাগায়। কলকাতা শহরের বিভিন্ন অংশে পুলিশ ও সেনাসদস্যরা গুলি চালায়। প্রতিবাদে বিক্ষুব্ধ জনতা পুলিশ ও সেনাবাহিনীর গাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে।[২৯৩] অগ্নিসংযোগের এই ঘটনা ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনকে এক অনন্য উচ্চতায় উন্নীত করে। বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির নেতৃত্বে পরিচালিত এ আন্দোলন ব্রিটিশ সরকারের ভীত নড়বড়ে হয়ে উঠে।

বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণির এই বৈপ্লবিক সংগ্রামে ভারতীয় বিমান, নৌ ও সশস্ত্রবাহিনী চঞ্চল হয়ে ওঠে এবং নানা প্রকার দাবি আদায়ে এই মহাসংগ্রামে শামিল হয়। সশস্ত্র বাহিনীর এই যোগদান বৈপ্লবিক সংগ্রামের শেষস্তরের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য মনে করা হয়। ০৭ ফেব্রুয়ারি বোম্বাই শহরে অবস্থিত ভারতীয় বৈমানিকগণ ইংরেজ অফিসারদের বৈষম্যমূলক আচরণের প্রতিবাদে অনশন শুরু করে।[২৯৪] ভারতীয় বিমান বাহিনীর বোম্বাই ঘাটিতে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে প্রথম এইরকম ঘটনা ঘটে। বিমান বাহিনীর ভারতীয় অফিসাররা ধর্মঘটে শামিল হয়। একজন ব্রিটিশ অফিসার কর্তৃক এক ভারতীয় পাইলটকে অপমান করার প্রতিবাদে এই ধর্মঘট হয়।[২৯৫]

সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এই বিক্ষোভ বিমান বাহিনী থেকে নৌবাহিনীতে সম্প্রসারিত হয়। নানা ধরণের আর্থিক দাবি-দাওয়াসহ নিম্নমানের খাবার পরিবেশনা বিক্ষোভের একটি কারণ ছিল। পাশাপাশি ব্রিটিশ অফিসারদের জাতি বিদ্বেষমূলক আচরণও নৌসেনাদের বিক্ষুব্ধ করে তোলে। ১৮ ফেব্রুয়ারি বোম্বাইয়ে তলোয়ার জাহাজে ঐতিহাসিক নৌবিদ্রোহ শুরু হয়। পরদিন সমুদ্রে থাকা দুটি জাহাজের নাবিকরা যোগ দেয়ায় বিদ্রোহীদের সংখ্যা কুড়ি হাজারে পৌঁছায়।[২৯৬]

অহিংস পথে ধর্মঘটের সূচনা হলেও ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ধর্মঘটিদের সেনাব্যারাকের ওপর আক্রমণ চালানোয় ধর্মঘট বিদ্রোহের রূপপরিগ্রহ করে। ২১ ফেব্রুয়ারির মধ্যে এই বিদ্রোহ কলকাতা, করাচি, দিল্লি, বিশাখাপত্তম ও মাদ্রাজ নৌবাহিনীর ভারতীয় সদস্যরা যোগদান করে।[২৯৭] করাচিতে হিন্দুস্থান জাহাজের ধর্মঘটি নৌসেনাদের ওপর ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ গুলি চালালে ২৫ মিনিটের মধ্যে তারা পরাজিত হয়। বিদ্রোহের সমর্থনে করাচিতে হরতাল চলাকালে পুলিশ-জনতা সংঘর্ষ হয় বলে জানা যায়। ধর্মঘঠ পরিচালনা কমিটি[২৯৮] উত্থাপিত দাবি পরিপূর্ণ রাজনৈতিক ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধি উপাদানে ঠাসা প্রতিভাত হয়। এ সময় ইন্দোরেশিয়া থেকে সকল ভারতীয় সেনা প্রত্যাহারের দাবি করে।[২৯৯] নৌ বিদ্রোহীরা ব্রিটিশ রাজকীয় পতাকা জাহাজ থেকে নামিয়ে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও কমিউনিস্ট পার্টির পতাকা উড়িয়ে এ সকল পার্টির নিকট সাহায্যের আবেদন জানাতে থাকে।[৩০০]

উদ্ভুত পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মি. *ক্লিমেন্ট অ্যাটলি* (Clement Richard Attlee) কমন্স সভায় ঘোষণা করেন, রয়াল নেভির জাহাজগুলো যাত্রা করেছে বোম্বাইয়ের দিকে। *আর.আই.এন.'র* (Royal Indian Navy) *অ্যাডমিরাল গডফ্রে* (Jhon Henry Godfrey) নৌসেনাদের উদ্দেশ্যে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করার পর জাহাজগুলোকে সৈন্যরা ঘিরে ফেলে।আকাশে বোমারুবিমান চক্কর দিতে থাকে।[৩০১] এহেন যুদ্ধাবস্থায় নৌবিদ্রোহীদের সমর্থনে বোম্বাইয়ের তিনলক্ষ শ্রমিক ধর্মঘট শুরু করে।[৩০২] অমৃতবাজার পত্রিকার মতে, বোম্বাই শহরকে ঘিরে কার্যত ইস্পাতের বলয় গড়ে তোলা হয়। শহরে ব্রিটিশ মিলিটারি ও পুলিশ গুলি চালায়। এতে ২২৮ জন ব্যক্তি নিহত ও ১০৪৬ জন আহত হয়।[৩০৩]

কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের কেউই নৌবিদ্রোহীদের সমর্থনে এগিয়ে আসেনি।[৩০৪] মহাত্মাগান্ধী, পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু, সরদার বল্লভভাই প্যাটেল সকলেই বিদ্রোহের সমালোচনা করে। 'শেষপর্যন্ত অবস্থা বিবেচনায় মহাত্মাগান্ধী,সরদার বল্লভভাই প্যাটেল ও কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর চাপে এবং এই আশ্বাসে যে তাদের বিরুদ্ধে কোনো প্রকার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবেনা।[৩০৫] তখনো নৌসেনাদের মনোবল এতোটা অটুট ছিল যে তাদের দাবি তারা ব্রিটিশ শাসকদের কাছে নয়; মুসলিম লীগ-কংগ্রেসের কাছে আত্মসমর্পণ করবেন।[৩০৬] অতঃপর জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যস্থতায় ২৪ ফেব্রুয়ারি নৌবিদ্রোহীরা ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। কিন্তু 'নৌবিদ্রোহীরা আত্মসমর্পণ করার সময় বলে, আমরা ব্রিটিশের নিকট আত্মসমর্পণ করছিনা, আমরা আত্মসমর্পণ করছি ভারতবাসীদের নিকট।[৩০৭] পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু এই নৌবিদ্রোহকে এই যুগের একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করেন।[৩০৮] আপাত:মহান নৌবিদ্রোহের অবসান ঘটলেও ভারতীয় সেনাবাহিনীর আনুগত্যের সঙ্কট;ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অশনিসংকেত মনে করা হয়। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম এগিয়ে

যায়। বৈশ্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সাথে আপস মীমাংসায় দ্রুত ভারত ত্যাগের সিদ্ধান্ত করে। আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচার কেন্দ্রিক এই অভ্যুত্থান ও নৌবাহিনীর বিদ্রোহ নিয়ামক ভূমিকা পালন করে অনুমিত হয়।

পরবর্তীতে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারি বোম্বাইতে নৌবিদ্রোহ শুরু হলে গুরুত্ব অনুধাবনপূর্বক ১৯ ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী মি. *ক্লিমেন্ট অ্যাটলি* কমন্সসভায় ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধান রচনার ব্যাপারে আলাপ-আলোচনার জন্য তিনজন ব্রিটিশ মন্ত্রীকে ভারতে পাঠানোর কথা ঘোষণা করেন।[৩০৯] গুরুত্ব অনুধাবনপূর্বক ব্রিটিশ সরকার পরদিনই ভারতীয় সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে একটি ক্যাবিনেট মিশন প্রেরণ সিদ্ধান্ত করে।[৩১০] গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে ক্যাবিনেট মিশন সদস্য ভারত সচিব *প্যাথিক লরেন্স* (Sir Pathick Lawrence), বোর্ড অব ট্রেডের সভাপতি *স্টাফোর্ড ক্রিপস্* (Sir Richard Cripps) এবং ফাস্ট লর্ড অব অ্যাডমিরালটি *এ.ভি.আলেকজান্ডার* (A.V.Alexander) ২৪ মার্চ দিল্লি পৌঁছায়।[৩১১]

১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে ক্যাবিনেট মিশন ভারতে পৌঁছানোর পর কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ দিল্লীতে একটি কনভেনশন আহ্বান করেন। উক্ত কনভেনশনে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ০৯ এপ্রিল লাহোর প্রস্তাব সংশোধন করে পাকিস্তান রাষ্ট্রের দাবির পক্ষে প্রস্তাব উত্থাপন করেন।[৩১২] তাঁর এ প্রস্তাবে উত্তর-পূর্বে বাংলা ও আসাম, উত্তর পশ্চিম ভারতের পাঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানের মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ট অঞ্চল নিয়ে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দাবি করা হয়।[৩১৩] কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্র এই প্রস্তাব উত্থাপনের পর বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশিম খুব দৃঢ়ভাবে প্রস্তাবটির বিরোধীতা করেন। তিনি বলেন, মুসলিম লীগের নির্বাচিত বিধায়কদের সম্মেলনে লাহোর প্রস্তাবে উল্লিখিত বিষয়ের মৌলিক সংশোধনীর কোন এখতিয়ার নেই।[৩১৪] তাঁর এই বক্তব্য জোড়ালোভাবে সমর্থিত হয়নি সত্য;কিন্তু তিনি পূর্ব বাংলার একটি প্রভাবশালী অংশের প্রতিনিধিত্ব করছিলেন, যাদের নির্বাচনি ও রাজপথের শক্তি ছিল। হাসান জহিরের মতে, মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ জনাব আবুল হাশিমকে এই বলে আশ্বস্থ করেন যে, পাকিস্তান প্রস্তাব উত্থাপনের মাধ্যমে লাহোর প্রস্তাব সংশোধন করা হয়নি; বরং হিন্দুস্থান থেকে একটি পৃথক গণপরিষদ গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে, যার এক বা একাধিক সংবিধান প্রস্তুত করার চূড়ান্ত ক্ষমতা থাকবে।[৩১৫] বিষয় কমিটির সভাপতিরূপে কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ আরও মন্তব্য করেন যে, লাহোর প্রস্তাবে 'States' শব্দটির সাথে যে 'S' অক্ষরটি রয়েছে তা টাইপের ভুল। কিন্তু যখন মুসলিম লীগের ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ থেকে পরবর্তী বৎসর গুলোর প্রস্তাব ও কাগজপত্র পরীক্ষা করা হয় তখন দেখা যায় যে, সর্বত্রই 'States'

লেখা রয়েছে এবং যে 'S' অক্ষরটি রয়েছে তা টাইপের ভুলে নয়; বরং সেটাই সঠিক।[৩১৬] কিন্তু তারপরেও কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র প্রভাবে প্রস্তাবটি পাস হয়ে গেল।

ক্যাবিনেট মিশন (Cabinet Mission) ভারতের রাজনৈতিক নেতা,প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী,সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নেতা ও দেশীয় রাজ্যের রাজাদের সাথে মত বিনিময় হয়। ০৩ এপ্রিল কংগ্রেস সভাপতি মাওলানা আবুল কালাম আজাদ *ক্যাবিনেট মিশনে* প্রদত্ত বক্তব্যে সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র ও যানবাহন কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে রেখে অন্যান্য দপ্তরের দায়িত্ব প্রাদেশিক সরকারকে দেয়ার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন। এছাড়াও তিনি অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রিসভায় প্রদেশগুলোর এবং সংখ্যালঘু শ্রেণির প্রতিনিধিত্বের ওপর জোর দেন। মহাত্মাগান্ধী *ক্যাবিনেট মিশনে* উপস্থাপিত তাঁর বক্তব্যে ভারতীয় শাসনতন্ত্রে হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান সি.আর.দাশ ফর্মুলার ভিত্তিতে হতে পারে মর্মে মত প্রকাশ করেন[৩১৭] এবং দ্বিজাতি তত্ত্বের বিরোধিতা করেন[৩১৮] বলে জানা যায়।

এসময় মুসলিম লীগ সভাপতি কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌ ০৪ এপ্রিল *ক্যাবিনেট মিশনের* সাথে বৈঠকে মিলিত হয়ে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র দাবি করেন এবং বক্তব্যের স্বপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করেন। ১৬ এপ্রিল *ক্যাবিনেট মিশন* আবার কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র সাথে আলোচনায় বসে। তাঁকে একটি ক্ষুদ্র সার্বভৌম পাকিস্তান ও অসার্বভৌম বৃহৎপাকিস্তানের মধ্য থেকে যে কোন একটি পছন্দ করতে বলেন। ক্যাবিনেট মিশন জানায়, যদি মুসলিম লীগ একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র দাবি করে; তবে অমুসলিম এলাকাগুলোর দাবি গ্রাহ্য হবেনা। মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌ বলেন, নীতিগত ভাবে পাকিস্তান দাবি স্বীকৃত হলে এলাকা সমন্ধে পরে আলোচনা হতে পারে।[৩১৯]

উপর্যুক্ত প্রেক্ষাপটে ভীমরাও রামজি আম্বেদকার সংবিধান রচনাকারি সংস্থা গঠনের তীব্র বিরোধীতা করেন। তাঁর মতে সংবিধান রচনাকারি যে কোন ধরনের সংস্থা গঠিত হোক না কেন, তাতে বর্ণ হিন্দুদের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবে এবং এর ফলে সংখ্যা লঘুশ্রেণির স্বার্থ ক্ষুন্ন হবে। শিখনেতা কর্তার সিং পৃথক শিখিস্তানের দাবি তোলেন[৩২০] বলে জানা যায়। *ক্যাবিনেট মিশন* পরবর্তীতে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের সাথে পৃথকভাবে আলোচনায় বসে। কিন্তু একটি আপসমূলক পরিকল্পনা গ্রহণে উভয় দলকে সম্মত করানোর চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। অতঃপর দ্রুত সংবিধান প্রতিষ্ঠাকল্পে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ১৬ মে তাঁরা নিজস্ব পরিকল্পনা ঘোষণা করে; যা *মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা* (Cabinet Mission Plan) নামে খ্যাত।[৩২১]

ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনায় পাকিস্তান দাবি অগ্রাহ্য হয়;বলা হয় এতে সংখ্যালঘু সমস্যার সমাধান হবেনা। পরিকল্পনায় প্রদেশকে ভিত্তি ধরে এবং প্রদেশগুলোকে তিনটি গ্রুপে বিভক্ত করা হয়। যেমন:

'ক' গ্রুপ; হিন্দুপ্রধান ০৬টি প্রদেশ:মাদ্রাজ,বোম্বাই,বিহার,উড়িষ্যা,মধ্যপ্রদেশ ও যুক্ত প্রদেশ।
'খ' গ্রুপ; উত্তরপশ্চিম ভারতের মুসলিম প্রধান ০৩ প্রদেশ: পাঞ্জাব,উত্তর পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ ও সিন্ধু প্রদেশ এবং
'গ' গ্রুপ; পূর্ব ভারতের মুসলিম প্রধান ০২টি প্রদেশ: বাংলা ও আসাম।[৩২২]

প্রস্তাবটিতে বলা হয় প্রত্যেকটি গ্রুপ তাদের পছন্দমতো স্বতন্ত্র সংবিধান রচনা করবে এবং প্রত্যেকটি গ্রুপ কেন্দ্রীয় সরকারের শাসন সংক্রান্ত বিষয়গুলো ছাড়া পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন ভোগ করতে পারবে।[৩২৩] গ্রুপগুলোর সদস্যরা একটি সংবিধান পরিষদে মিলিত হয়ে ভারতের জন্য সংবিধান রচনা করবে। প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র ও যোগাযোগ ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকবে। ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যগুলোকে নিয়ে একটি স্বায়ত্বশাসিত ভারতীয় ইউনিয়ন গঠন করা হবে।[৩২৪]

কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয় দলই প্রথমে মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনা মেনে নেয়। কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ ধারণা করেছিলেন ভারতীয় কংগ্রেস সম্ভবত দেশবিভাগ এড়ানোর জন্য মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলোকে যে কোনো ধরণের ছাড় দিতে প্রস্তুত। তিনি ক্যাবিনেট মিশন প্রস্তাব মেনে নেয়ায় ঐ বৎসর অর্থাৎ ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ০৬ জুনে মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটিতে এই প্রস্তাব পাস হয়।[৩২৫] যদিও এই পরিকল্পনায় পাকিস্তান দাবি সরাসরি প্রত্যাখ্যাত হয় তথাপি 'খ' ও 'গ' গ্রুপের মধ্যে পাকিস্তানের ভিত্তি নিহিত থাকায় মুসলিম লীগ প্রস্তাবটি গ্রহণ করে। পরিকল্পনার মধ্যে বাধ্যতামূলক গ্রুপিং ব্যবস্থা, প্রদেশগুলোর নিজস্ব সংবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা এবং স্বয়ত্বশাসন প্রদান; ১০ বৎসর পর শাসনতন্ত্র পুনর্বিবেচনার অধিকারের ফলে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলোকে ভারত ইউনিয়ন হতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার যে অধিকার পরিকল্পনায় দেয়া হয়েছে তা শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে।[৩২৬]

অপরদিকে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনাকে আংশিকভাবে গ্রহণ করে। কংগ্রেস গ্রুপিং ব্যবস্থাকে মেনে নিতে অস্বীকৃত হয়। এ ব্যবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো দুর্বল হয়ে পড়বে উল্লেখ করে। তাছাড়া এই ব্যবস্থার ফলে কোন কোন প্রদেশের প্রতি এবং কোন কোন সংখ্যালঘু শ্রেণির প্রতি অবিচার করা হবে। এজন্য কংগ্রেস দাবি করে কোন প্রদেশ কোন নিদিষ্ট গ্রুপে যোগ দেবে কি না সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার স্বাধীনতা প্রদেশকেই প্রথমে দিতে হবে। কিন্তু ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে ক্যাবিনেট মিশন এক বিবৃতিতে পরিস্কারভাবে জানায় যে, গ্রুপ তাদের পরিকল্পনার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং কেবলমাত্র দলগুলোর সম্মতির মাধ্যমেই এ ব্যবস্থা সংশোধন করা যেতে পারে। অবশেষে

স্বাধীন অখন্ড ও গণতান্ত্রিক ভারতের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য ভারতীয় কংগ্রেস প্রস্তাবিত গণপরিষদে যোগদানের সিদ্ধান্ত নেয়।[৩২৭]

১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ১৬ জুন বড়লাট ১৪জন সদস্য নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হবে ঘোষণা করেন। ০১ জন তফসিলি সদস্যসহ কংগ্রেসের ০৬ জন, মুসলিম লীগের ০৫ জন এবং শিখ, খ্রিস্টান ও পার্শী প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ০১ জন করে সদস্য থাকবেন। কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকারে কংগ্রেস ০১ জন মুসলমান সদস্যকে মনোনয়ন দিতে পারবে কি না তা নিয়ে মতানৈক্য শুরু হয়। মুসলিম লীগ দাবি করে যে, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে তারাই সকল মুসলিম সদস্যকে মনোনীত করার একমাত্র অধিকারী। এই দাবি বড়লাট মেনে নিলে কংগ্রেস অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগদান করতে অস্বীকৃত হয়। এমতাবস্থায় মুসলিম লীগ বড়লাট *ওয়াভেলের* (Archibald Percival Wavell) কাছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সরকার গঠনের দাবি জানায়। কারণ ক্যাবিনেট মিশন পূর্বেই ঘোষণা করেছিল যে, যে কোন বৃহৎ রাজনৈতিক দল অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের ইচ্ছা প্রকাশ করলে তাদের নিয়ে সরকার গঠন করা হবে। কিন্তু বড়লাট তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন নাই।[৩২৮]

এদিকে চলমান ঘটনার প্রেক্ষাপটে জনৈক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে কংগ্রেসের নব নির্বাচিত সভাপতি পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু ১০ জুলাই এক বিবৃতিতে বলেন, কংগ্রেস বোঝাপড়ার কোন বাঁধন না মেনে এবং সব সময় অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা গ্রহণের স্বাধীন মনোভাব নিয়ে গণপরিষদে যোগদান করবে। তবে সেখানে তেমন বুঝলে কংগ্রেস অবাধে ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনার রদ-বদল করতে পারে।[৩২৯] অর্থাৎ গণপরিষদে যোগদিয়ে কংগ্রেস প্রয়োজন অনুসারে ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা পরিবর্তন এবং গ্রুপিং পদ্ধতি উঠিয়ে দেয়ার আভাস দেন। নেহেরুর এই বিবৃতিকে কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি মাওলানা আজাদ একটি মারাত্মক ভুল বলে বর্ণনা করেন। তাঁর মতে এই বিবৃতি ইতিহাসের গতিপথ বদলে দেয়। ২৯ জুলাই *পথিক লরেন্স* (Sir Pathick Lawrence) ও *ক্রিপস্* (Sir Richard Cripps) ব্রিটিশ পার্লামেন্টে বলেন, নেহেরুর বিবৃতিতে ক্যাবিনেট পরিকল্পনার ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কিন্তু কংগ্রেসকে নিজের ইচ্ছেমতো শাসনতন্ত্র রচনা করতে দেয়া হবেনা; মুসলিম লীগকে এরূপ আশ্বাস তারা প্রদান করেনি।[৩৩০]

পন্ডিত জওহরলাল নেহেরুর এই বিবৃতির মাধ্যমে মুসলিম লীগ মহলে কংগ্রেসের অভিসন্ধি সম্পর্কে সন্দেহের উদ্রেক করে। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ২৭-২৯ জুলাই বোম্বে শহরে অনুষ্ঠিত কাউন্সিল সভা গণপরিষদে যোগদান করা বিপদজনক মনে করে এবং ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা গ্রহণ করার পূর্ব

সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার ঘোষণা করে।[৩৩১] সম্মেলনে কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ ১৬ আগস্ট তারিখে *ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে* (Direct Action Day) ঘোষণা করেন। যদিও তিনি শান্তিপূর্ণভাবে এ দিবস পালনের আহ্বান জানান। ব্রিটিশ সরকার ও ক্যাবিনেট মিশনকে তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন যে, ভারতবর্ষের ১০ কোটি মুসলমান পাকিস্তান দাবি আদায় করতে বদ্ধ পরিকর। তবে কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার নেতারা এই ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে তাদের বিরুদ্ধে ঘোষণা করা হয়েছে বলে বিবৃতি দিতে শুরু করে।[৩৩২]

১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ১৬ আগস্ট মুসলমানগণ ভারতের সর্বত্র হরতাল ও জনসভার আয়োজন করে ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা অগ্রাহ্য করার কারণ বিশ্লেষণ ও মুসলমানদের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের বিরূপ মনোভাবের নিন্দা করেন; মসলমানদের ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানায়।[৩৩৩] সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্তে ভারতব্যাপী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিকল্পনা প্রস্তুত হয়েই ছিল। মুসলিম লীগের ১৬ আগস্টের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস সে সুযোগ এনে দেয়।[৩৩৪] হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা ১৬ আগস্ট সরকারি ছুটির দিন হিসেবে ঘোষণা করে। কলকাতা গড়ের মাঠে এদিন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সভাপতিত্বে এক বিরাট জনসভা আয়োজন হয়। কিন্তু সভার প্রাক্কালে কলকাতার স্থানে স্থানে দাঙ্গা শুরু হয়।[৩৩৫] প্রকৃতপক্ষে কলকাতার জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ ছিল মুসলমান। স্বভাবতই এই দাঙ্গায় তারাই অধিক হত্যাযজ্ঞের শিকার হন। এ দাঙ্গার ফলাফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী; যা একদিকে দেশবিভাগকে ত্বরান্বিত করে অন্যদিকে বাংলা তথা ভারতীয় রাজনীতিতে দক্ষিণপন্থিদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়।[৩৩৬] এ বিষয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উল্লেখ করেছেন, প্রথম দিন ১৬ আগস্ট মুসলমানরা ভীষণভাবে মার খায়। পরের দিন মুসলমানরা হিন্দুদের ভীষণভাবে মারে।[৩৩৭] এজন্য হিন্দুদের পূর্বপ্রস্তুতি ছিল অনুমিত হয়। এই দাঙ্গা ক্রমে বিহার,নোয়াখালী ও পাঞ্জাবে ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে। পূর্ব ভারতের ব্রিটিশ সেনাপতি বুচার দেয় প্রকাশ্য স্বীকারোক্তির মাধ্যমে বুঝতে পারা যায়, ভয়াবহ এ দাঙ্গা ব্রিটিশ শাসকদেরই পরিকল্পনার ফল।[৩৩৮] কিন্তু হিন্দু নেতৃবৃন্দ দাঙ্গার জন্য হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও মুসলিম লীগকে অভিযুক্ত করে।[৩৩৯] এভাবে ভারতবর্ষের রাজনীতি হত্যা, লুটপাট,অগ্নিসংযোগ ও নৃশংসতায় পর্যবসিত হয়।

এদিকে বড়লাট *লর্ড ওয়াভেলের* (Archibald Percival Wavell) আহ্বানে ০২ সেপ্টেম্বর পন্ডিত জওহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে শুধুমাত্র কংগ্রেসিদের নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হলে কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ এক বিবৃতিতে ব্রিটিশ সরকারের উদ্দেশ্যে বলেন, কংগ্রেসের কাছে আত্মসমর্পণ করে মুসলমানদের রক্তঝড়াতে বাধ্য করবেন না। ইতোমধ্যে ১৬ আগস্টের দাঙ্গা এবং তৎপরবর্তী

ঘটনায় বিচলিত বড়লাট লর্ড ওয়াভেলের আহ্বানে ২৬ অক্টোবর মুসলিম লীগ অন্তর্বর্তী সরকারে শামিল হয়।[৩৪০] কিন্তু কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার মধ্যে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মন্ত্রীদের মধ্যকার মতবিরোধের ফলে এক ভয়ঙ্কর রাজনৈতিক অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার আহ্বানে বড়লাট, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের মধ্যে ত্রিপক্ষীয় লন্ডন সম্মেলনও ব্যর্থ হলে ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা বাতিল করে সরকার নতুন পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হয়।[৩৪১]

একদিকে ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনার ব্যর্থতা এবং অন্যদিকে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের চরম অবনতি; এহেন সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ২০ ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী মি. অ্যাটলি (Clement Richard Attlee) ব্রিটিশ পার্লামেন্টে এক ঘোষণায় নতুন এক পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ৩০ জুনের মধ্যে ভারতকে স্বাধীনতা দানে বড়লাট *লর্ড ওয়াভেলের* (Archibald Percival Wavell) স্থলে *লর্ড মাউন্টব্যাটেন* (Louis Francis Albert Victor Nicholas Mountbatten) কে ভারতে বড়লাট নিয়োগের বিষয়টি জানান।[৩৪২] ২২ মার্চ লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন তার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। কংগ্রেস ও মুলিম লীগ নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনার উদ্যোগ নেন।[৩৪৩] ২৩ মার্চ মুসলিম লীগ পাকিস্তান দিবস পালন করে। সমগ্র দেশে সাম্প্রদায়িক হানাহানি অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে। দেশ ক্রমশ গৃহযুদ্ধের দারপ্রান্তে উপনীত হয়। এ অবস্থায় লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারতের সার্বিক পরিস্থিতি মূল্যায়ন করে ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্ভব নয়; ভারত বিভাগ সিদ্ধান্ত করেন। তিনি লক্ষ্য করেন, কংগ্রেস নেতা পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু ও সরদার বল্লভভাই প্যাটেলও বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে একথা স্বীকার করতে বাধ্য হন যে, দেশ বিভাগ ছাড়া তাদের সামনে কোনো বিকল্প রাস্তা নেই। তবে মহাত্মাগান্ধী এই ভয়াবহ সময়েও দেশ বিভাগের বিরোধীতা করেন।[৩৪৪] ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ৩১ মার্চ তিনি বলেন, If the Congress wishess to accept partition, it would be over my deadbody.[৩৪৫] তবে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি অবনতির ভয়াবহতা লক্ষ্য করে শেষ পর্যন্ত তিনি দেশ বিভাগে সম্মতি জ্ঞাপন করেন[৩৪৬] বলে জানা যায়। দেশ বিভাগ মেনে নেওয়া ছাড়া এসময় তাঁর অন্য কোনো উপায়ও ছিল না। কারণ ভারতীয় রাজনীতিতে ইতোমধ্যে মহাত্মাগান্ধীর রাজনৈতিক আধিপত্যের স্থলে নেহেরু-প্যাটেল গোষ্ঠীর জামানা চালু হয়ে যায়।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ২২ মার্চ দায়িত্ব গ্রহণ করে *লর্ড মাউন্টব্যাটেন* (Louis Francis Albert Victor Nicholas Mountbatten) তাঁর উপদেষ্টাদের সাথে পরামর্শক্রমে মে মাসে একটি শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। এ পরিকল্পনায় প্রদেশগুলোর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রস্তাব করা হয়। প্রস্তাবটিতে বলা হয়, ইচ্ছা করলে প্রদেশগুলো *উপ-যুক্তরাষ্ট্র* (Confedaration) গঠন করতে পারবে।

বাংলা ও পাঞ্জাব বিভাজনের প্রস্তাব করা হয়।[৩৪৭] জনগণের মতামত জানার জন্য উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে নতুন করে নির্বাচন করতে হবে।[৩৪৮] এই পরিকল্পনা ১৫ও ১৬ এপ্রিল গভর্নরদের বৈঠকে অনুমোদিত হয়।[৩৪৯] ০২ মে এ পরিকল্পনা লন্ডনে প্রেরণ করলে লেবার পার্টির সরকার কিছুটা সংশোধন করে অনুমোদন দেয়। বড়লাট লর্ড মাউন্টব্যাটেন সিমলায় অবস্থানকালে ১০ মে বিলটি তার হাতে পৌঁছায়। লর্ড মাউন্টব্যাটেন তার সঙ্গে থাকা পন্ডিত জওহরলাল নেহেরুকে পরিকল্পনাটি দেখতে দেন। নেহেরু পরিকল্পনাটির ব্যাপারে তীব্র আপত্তি করে বলেন, এর ফলে বলকান অঞ্চলের মতো ভারতে বহুরাষ্ট্রের সৃষ্টি হবে। পরিকল্পনাটি বাতিল হয়ে যায়। নতুন পরিকল্পনার উদ্যোগ হয়। মাউন্টব্যাটেন এ পরিকল্পনা প্রণয়নের ভার তার শাসনতান্ত্রিক উপদেষ্টা ভি.পি.মেননের ওপর ন্যাস্ত করেন। নতুন পরিকল্পনা রচিত হয় এবং ১১ মে পরিকল্পনাটি পন্ডিত জওহরলাল নেহেরুকে দেখতে দেয়া হয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু এতে সম্মতি জানায়। মাউন্টব্যাটেন নিজে ১৮ মে পরিকল্পনাটি নিয়ে লন্ডন যান এবং পরিকল্পনাটি ব্রিটিশ সরকারের অনুমোদনের পর ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। ০২ জুন বড়লাট পরিকল্পনাটি নিয়ে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও শিখ নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা করেন। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ০৩ জুন বড়লাট তার পরিকল্পনাটি ভারতীয় জনগণের কাছে প্রকাশ করেন।[৩৫০] পরিকল্পনাটি মাউন্টব্যাটেন ০৩ জুন পরিকল্পনা নামে পরিচিত।

লর্ড মাউন্টব্যাটেন ০৩ জুনের শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনায় ভারতবর্ষকে *ডোমিনিয়ন স্টাটাসের* (Dominions Status) ভিত্তিতে বিভক্ত করে ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রকে পূর্ব ঘোষিত সময়ের পূর্বেই ক্ষমতা হস্তান্তরের রূপরেখা হয়।[৩৫১] রাষ্ট্র দু'টি ইচ্ছা করলে ব্রিটেনের সাথে সম্পর্ক ছেদ করতে পারবে। ভারতের অভ্যন্তরীণ অবস্থা তখন এমন বিস্ফোরণোন্মুখ হয় যে, শাসন-ক্ষমতা হস্তান্তর ব্যতীত ব্রিটিশ শাসকদের সম্মুখে আর কোনো পথ খোলা ছিল না। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়েই এই পরিকল্পনা গ্রহণ করে।[৩৫২]

এসময় *ডোমিনিয়ন স্টাটাস* (Dominions Status) ভারতীয় নতুন প্রশাসনকে এসকল ঝামেলা থেকে মুক্তি দেবে মনে করা হয়। কেননা *ব্রিটিশ সিভিল সার্ভিসের* (British Civil Service) অফিসাররা আরও কিছুদিন ভারতে অবস্থান করে ভারতীয়দের প্রশাসন পরিচালনায় সাহায্য করবেন। এ ব্যবস্থা ভারতকে সাময়িকভাবে হলেও *কমনওয়েলথে* (Commonwealth) রাখার সুযোগ করে দেয়, যা ব্রিটেন হারাতে চায়নি। অপরদিকে কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ পাকিস্তানকে কমনওয়েলথে অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব দিলেও ভারতের অর্থনৈতিক শক্তি ও প্রতিরক্ষা সামর্থ্যের নির্ভরযোগ্যতা; তাছাড়া ভারতে

ব্রিটেনের বাণিজ্য ও লগ্নির পরিমানও অনেক বেশি থাকায় কমনওয়েলথে ভারতের সদস্যপদ ব্রিটেনের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়।[৩৫৩]

লর্ড মাউন্টব্যাটেনের ০৩ জুন পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্রিটিশ সরকার নিশ্চিত হয় যে, ভারত উপমহাদেশ স্বাধীন হবে দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৮ জুলাই ভারত স্বাধীন আইন পাস করে।[৩৫৪] এই আইন পাসের সাথে সাথে ভারতবর্ষের ওপর থেকে প্রায় দীর্ঘ দুইশত বৎসরের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের আইনগত অবসানের আনুষ্ঠানিকতার প্রহর শুরু হয়। এই আইন অনুযায়ী ভারত বিভাগের সিদ্ধান্ত হলে বাংলা বিভাগও ঘনিয়ে আসে। এসময় বাংলা ভাগের পক্ষে সংগ্রামে অবতীর্ণ হন হিন্দুমহাসভার সভাপতি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।[৩৫৫] ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ০৮ মার্চ কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির সভায় পাঞ্জাব ও বাংলা ভাগের প্রস্তাব পাস হয়।[৩৫৬]

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ২৬ এপ্রিল বাংলা প্রাদেশিক কংগ্রেসের নেতা কিরণশঙ্কর রায়, ডা.বিধানচন্দ্র রায় ও শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় দিল্লিতে কংগ্রেসনেতা পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু, সরদার বল্লভভাই প্যাটেল, আচার্য কৃপানালী ও মাওলানা আবুল কালাম আজাদের সাথে সাক্ষাৎকরে বাংলা ভাগের অনুকূলে ভূমিকা পালনের অনুরোধ জানান। ২৯ এপ্রিল বাংলা প্রাদেশিক কংগ্রেস বাংলাভাগের দাবি সম্বলিত একটি স্মারকলিপি বড়লাট লর্ড মাউন্টব্যাটেন এবং কংগ্রেসনেতা পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু ও সরদার বল্লভভাই প্যাটেলের কাছে পাঠায়। তাদের ধারণা বাংলা খন্ডিত না হলে একসময় সমগ্রবাংলা পাকিস্তানের সাথে যোগদিবে। সেকারণে তারা আলাদা প্রদেশ গঠন করে অন্য অমুসলিমদের সাথে শান্তিতে বসবাস করতে পারবেন।[৩৫৭] এদিকে মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, নূরুল আমিন প্রমুখ মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ বাংলা প্রদেশের বিভক্তিকে সমর্থন করেন। কিন্তু এইধারার বিপরীতে মুসলিম লীগ নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম প্রমুখ নেতৃবৃন্দ অবিভক্ত ও স্বাধীন বাংলা গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম এবং শরৎচন্দ্র বসু সহ কয়েকজন কংগ্রেসনেতা ও বুদ্ধিজীবী গর্ভনর জেনারেলের সাথে সাক্ষাৎকরে অখন্ড স্বাধীনবাংলা প্রতিষ্ঠার যোক্তিকতা উত্থাপন করেন।[৩৫৮] অবিভক্ত বাংলার শেষ প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ২৭ এপ্রিল দিল্লিতে কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র সাথে মিলিত হয়ে এ বিষয়ে আলোচনা করেন। আলোচনার ফলাফল ইতিবাচক না হলেও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী স্বাধীন বাংলার পরিকল্পনা ঘোষণা করেন।[৩৫৯] ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহে তারা শরৎচন্দ্র বসু সহ তিনজন কংগ্রেস নেতার সাথে ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার বিষয়ে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। কিন্তু মহাত্মাগান্ধী, পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু ও সরদার বল্লভভাই প্যাটল প্রমুখ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ সহ মুসলিম লীগের

রক্ষণশীল নেতৃবৃন্দের বিরোধীতার কারণে চুক্তিটি বাস্তবায়িত হতে পারেনি।[৩৬০] ইতোমধ্যে পরিকল্পনা অনুসারে আসামের সিলেট জেলা ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে গণভোটের মাধ্যমে জনতা পাকিস্তানের পক্ষে রায় দেয়। বাংলা ও পাঞ্জাব বিভক্ত হয়ে পশ্চিম পাঞ্জাব এবং পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের সাথে যুক্ত হয়।[৩৬১]বাংলা ও পাঞ্জাবের সীমানা নির্ধারণে দায়িত্বপ্রাপ্ত *র‍্যাডক্লিফ কমিশন* (Radcliffe Commission) বিভক্তসূচক সীমান্ত রেখা চিহ্নিত করে দেয়।[৩৬২]

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ আগস্ট *লর্ড মাউন্টব্যাটেন* (Louis Francis Albert Victor Nicholas Mountbatten)পাকিস্তান গণপরিষদে ভাষণদান করত; ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। অতঃপর কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল হিসেবে অভিষিক্ত হন। অনুরূপভাবে ১৫আগস্ট লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারতীয় গণপরিষদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। পন্ডিত জওহরলাল নেহেরুর প্রস্তাবে লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারতের গভর্নর জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।[৩৬৩] এভাবে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ আগস্ট ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যেই পাকিস্তান-ডোমিনিয়ন ও ভারত-ডোমিনিয়ন এর অভ্যুদয় ঘটে।[৩৬৪] বস্তুতপক্ষে এভাবে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির বৈপ্লবিক সংগ্রামের অভিঘাতে দিশেহারা হয়ে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশরাজ তাদের এদেশীয় এজেন্ট জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের অনুকূলে ক্ষমতা ত্যাগ করে তাদের স্বার্থ সমুন্নত রাখতে প্রয়াস পায়।

এভাবে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গবিভাগ বিরোধী বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন সঞ্জাত স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাবে যে সশস্ত্রবৈপ্লবিক আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে,পরবর্তীতে তা স্বাধীনতার দাবিতে উন্নীত হয়।[৩৬৫]জেল-জুলুম, দীপান্তর, ফাঁসিকাষ্ঠে জীবনাহুতির মাধ্যমে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিপ্লবীরা স্বাধীনতার দাবি আদায়ে দৃঢ়ীমনোভাব ও ত্যাগের প্রমাণ দেয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন দেশব্যাপি সেনাঅভ্যুত্থান প্রচেষ্টার (১৯১৫ খ্রি. ২১ ফেব্রু.) দায়ে বিপ্লবী রাসবিহারী বসু ব্রিটিশ পুলিশের নজর এড়িয়ে ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে জাপানে পৌঁছাতে সক্ষম হন।[৩৬৬] অন্যদিকে সশস্ত্র বৈপ্লবিক কর্মের মাধ্যমে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন অবসান কল্পে জার্মান অস্ত্রের চালান সংগ্রহের উদ্দেশে অপেক্ষমান বিপ্লবী বাঘাজ্যোতিন কয়েকজন সঙ্গীসহ উড়িষ্যার বুড়িবালাম নদীর তীরে কাপ্তিপোদা নামক স্থানে ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের ০৯ সেপ্টেম্বর ব্রিটিশ পুলিশ বাহিনীর সাথে সংঘর্ষে সঙ্গীসহ আহত হন এবং পরের দিন তিনি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন।[৩৬৭] এসবের মাধ্যমে ক্রমে ব্রিটিশ বিরোধি মনোভাব জাগরিত হতে থাকে। তাছাড়া ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ১৩ এপ্রিল পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ডের মাধ্যমে দেশের গণরাজনৈতিক ধারা আবেদন নিবেদনের পথ থেকে সরে আসে।[৩৬৮] মহাত্মাগান্ধী সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ গণসংগ্রামের নেতৃত্বদানে এগিয়ে আসলে এক বৈপ্লবিক জাগরণের পরিবেশ তৈরি হয়। অন্যদিকে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব নিয়ে

তুরস্কের খেলাফত রক্ষা এবং ভারতীয় স্বরাজের দাবি আদায়ে উত্তাল জনতা খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে নেমে পড়ে। কংগ্রেস নেতৃত্ব আপসকামী হলেও বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির সশস্ত্র বৈপ্লবিক সংগ্রাম কাঙ্ক্ষিত বিজয় অর্জন না হওয়া অবধি কখনো প্রকাশ্যে কখনো বা চুপিসারে এগিয়ে যেতে থাকে।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে মহাত্মাগান্ধী ও নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর অবদান অবিস্মরণীয়। তবে উভয় নেতার মত ও পথের মধ্যে আকাশ পাতাল ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। মহাত্মাগান্ধী ছিলেন অহিংসবাদী, পক্ষান্তরে সুভাষচন্দ্র বসু এপথে ছিলেন আস্থাহীন। মহাত্মাগান্ধী নরমপন্থি রাজনৈতিক কিন্তু সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন চরমপন্থি ও বিপ্লবী নেতা। এটি মনে করিনা যে শুধুমাত্র মহাত্মাগান্ধী পরিচালিত নিরস্ত্র বিপ্লব, অহিংস অসহযোগ,অনশন ও আত্মশুদ্ধির আন্দোলনেই ভারতবর্ষ স্বাধীনতা অর্জন করেছে। বিশ্বাস করি মহাত্মাগান্ধীর অহিংসা ও আইন অমান্য আন্দোলনের সাথে সাথে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির সশস্ত্র সংগ্রামীদের বৈপ্লবিক কার্যাবলি ও নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর বিদেশ গমন, জার্মানিতে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন, ইউরোপ থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আগমন,আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠা ও সে সরকারকে বেশ কয়েকটি প্রভাবশালী দেশের স্বীকৃতিদান, ইঙ্গমার্কিন মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা, ভারতবর্ষের পূর্বসিমান্তে আক্রমণ, নাগাপাহাড় ও মনিপুরের অধিকাংশ অঞ্চল অধিকার করে স্বাধীন পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে সাফল্যের প্রান্তসীমায় পৌঁছেন। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তির জয়লাভ এবং নেতাজির মৃত্যু পরিস্থিতি বদলে দেয়। পরবর্তীতে দিল্লির লালকেল্লায় আজাদহিন্দ ফৌজের সেনাপতি ক্যাপ্টেন শাহনেওয়াজ, ক্যাপ্টেন ধীলন ও ক্যাপ্টেন সাইগলের বিচারকালে ভারতীয় জনগণ তাদের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন ব্যক্ত ও বিচারের প্রতিবাদ জানায়। সর্বোপরি ভারতীয় সৈন্যদলের ভেতর বিদ্রোহের ভাব প্রকাশের ঘটনায় ব্রিটিশ সরকার ভারত ত্যাগের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয় বলে অনুমিত হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনান্তে একথা বলা যায় যে, ব্রিটিশ বেনিয়াদের সহযোগিতায় ও সাহচার্যে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ ও পরিপুষ্টি সাধিত হয়। কালক্রমে আধুনিক শিক্ষার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে তাদের মধ্যে পাশ্চাত্য জ্ঞান অর্জন, আত্মসচেতনতা বৃদ্ধি এবং দেশাত্মবোধ জাগ্রত হয়। তারা বিভিন্ন বিষয়ে তাদের অধিকার আদায়ে তৎপরতা শুরু করে। বিভিন্ন সংগঠনের উৎপত্তি ঘটে। এ ধারাবাহিকতায় ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা পরবর্তী অল্পকাল পর থেকেই দলটি বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির নেতৃত্বে পরিচালিত হতে থাকে। বিভিন্ন দাবি-দাওয়া আদায়ে নেতৃবৃন্দ শুধুমাত্র আবেদন-নিবেদনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে ভারত সরকার প্রশাসনিক প্রয়োজনে বাংলা বিভাগ কার্যকর করলে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণি তথা কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের আবেদন-নিবেদনের এ

নরমপন্থি ধারার বিরোধীতা করে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির একটি অংশ প্রতিবাদে গর্জে উঠে। কংগ্রেসের মধ্যেই বিপ্লবপন্থি উপদলের সৃষ্টি হয়। অনুশীলন ও যুগান্তর দলের মাধ্যমে তাঁরা তাদের সশস্ত্র বৈপ্লবিক তৎপরতা অব্যাহত রাখে। আন্দোলনের প্রচন্ডতায় ব্রিটিশ সরকার ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের ১২ ডিসেম্বর এক ঘোষণায় বাংলা বিভাগ রদ ঘোষণা করে।

এদিকে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলা বিভাগের সমর্থনে ঢাকায় মুসলিম লীগ গঠিত হয়; কিন্তু বাংলা বিভাগ বাতিল করায় মুসলিম লীগও ব্রিটিশ বিরোধীতায় অগ্রনি হয়। কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ লক্ষ্ণৌ চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যকার সম্পর্কোন্নয়নের প্রচেষ্টা চালায়। ইতোমধ্যে ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকারকে সমর্থন দেয়। কিন্তু কংগ্রেসের এই আপসপন্থি নীতির বিরোধীতা করে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিপ্লবপন্থিধারা বিশ্বযুদ্ধের এই গোলমেলে পরিবেশকে কাজে লাগিয়ে সশস্ত্র তৎপরতার মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনে জোরেশোরে প্রচেষ্টা চালায়।

১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে মোহনদাশ করমচাঁদ গান্ধী ভারতে আগমন করে কংগ্রেসের রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত হন। তিনি ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্রবৈপ্লবিক সংগ্রামের বিরুদ্ধশক্তি রূপে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রধান ভূমিকা নির্ধারণ করেন যা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর নিজস্ব অবদান নয়। কংগ্রেসের এই বিপ্লব বিরোধী ভূমিকা প্রথম হতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দ্বারাই নির্ধারিত হয়েছিল। মহাত্মাগান্ধী কেবলমাত্র ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর সেই নীতি কার্যে পরিণত করেছিলেন মাত্র। তবে অন্যকোন গণসংগঠন না থাকায় দীর্ঘকাল পর্যন্ত ভারতের জনসাধারণ কংগ্রেসকেই নিজস্ব সংগঠনরূপে বরণ করে এবং এ সংগঠনেই যোগদান করে। শ্রমিক, কৃষক এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণির জনসাধারণ শোষণ ও উৎপীড়ন হতে নিজ নিজ শ্রেণির মুক্তিলাভের জন্য এবং জাতীয় স্বাধীনতা ও সংগঠনরূপে কংগ্রেসকে সংগঠিত ও পরিচালনার প্রয়াস পায়। কিন্তু ব্রিটিশ শাসকগণ এহেন কার্যক্রমকে 'রাজদ্রোহের কেন্দ্র' মনে করে প্রতিষ্ঠানটির ওপর আক্রমণ আরম্ভ করে।[৩৬৯]

এদিকে কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্বও শ্রমিক-কৃষক ও জনসাধারণের বৈপ্লবিক কার্যক্রমে সর্বশক্তি দিয়ে বাধাদান করেছে। মহাত্মা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত কংগ্রেস হিংসা–অহিংসার প্রশ্ন উত্থাপন করে; শ্রমিক-কৃষক ও জনসাধারণকে প্রত্যেকটি সংগ্রামে যোগদানে বাধা দিয়ে এবং শ্রমিক-কৃষকের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ভয়ে বারংবার সংগ্রাম প্রত্যাহার করে শাসক ও বুর্জোয়া জমিদার গোষ্ঠীর শ্রেণিস্বার্থ অক্ষুন্ন রাখার প্রয়াস পায়। প্রতিষ্ঠার প্রথম হতে শেষাবধি শ্রমিক-কৃষকশ্রেণি প্রমূখ তথা দেশের ৮০% জনসাধারণের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে কেবলমাত্র পুজিপতি ও জমিদারগোষ্ঠীর

সুবিধা আদায়ের প্রচেষ্টা চালানোই কংগ্রেস নেতৃত্বের মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য পরবর্তীকালে কংগ্রেস নেতৃত্বকে দ্বৈত ভূমিকা অবলম্বন করতে হয়। এক্ষেত্রে কংগ্রেসের চাতুর্যপূর্ণ ভূমিকা লক্ষ্যণীয়। প্রথমত উঠতি ধনিক ও জমিদারগোষ্ঠীর জন্য সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠীর নিকট হতে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুবিধা আদায়ের লক্ষ্যে কংগ্রেস জাতির প্রতিনিধিরূপে কয়েকবার জাতীয় সংগ্রাম আরম্ভ করে। দ্বিতীয়ত-জাতীয় ক্ষেত্রে কংগ্রেসের আরম্ভকৃত সংগ্রামে শ্রমিক-কৃষক জনসাধারণের ব্যাপক অংশগ্রহণে যখন বৈপ্লবিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা পায়, তখন সে নেতৃত্ব ও জাতীয় সংগ্রাম পরিচালনা পদ্ধতিকে বানচাল করার উদ্দেশ্যেই কংগ্রেস বারংবার ক্রমবর্ধমান গণসংগ্রামের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠীর প্রতি সহযোগিতার নীতি নেয়। ব্রিটিশকে সমর্থনের অংশ হিসেবে কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্বকে বারংবার অর্ধপথে জাতীয় সংগ্রাম প্রত্যাহার করতে হয়।[৩৭০] কার্যত: শাসকগোষ্ঠীকে ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে জাতীয় সংগ্রামের আরম্ভ; চূড়ান্ত পর্যায়ে আপসপন্থার মাধ্যমে অর্ধপধে তা প্রত্যাহার এবং সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী হিসেবে আবির্ভূত হয়। যা ছিল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্বের চিরাচরিত নীতি ও পদ্ধতি। অন্যদিকে মুসলিম লীগ ব্রিটিশ সরকারের সাথে আপস ও সমঝোতার মাধ্যমে সাংবিধানিক রাজনীতির পথঅনুসরণ করতে থাকে।[৩৭১]

তাছাড়া ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সকল পথ-প্রদর্শক ও পরবর্তী সকল নেতৃবৃন্দই সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্য থেকেই এসেছিলেন।[৩৭২] এই শ্রেণির পুরোধা ব্যক্তিত্ব রাজা রামমোহন রায় এদেশে ইংরেজ বিজয়কে বিধাতার আর্শীবাদ জ্ঞান করতেন।[৩৭৩] তদুপরি ইংরেজি শিক্ষা নিঃসন্দেহে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের জন্য জন্য সহায়ক বলে প্রমাণিত হয়। এদেশে ব্রিটিশ শাসন পরিচালনা ও সম্পদ আহরণে এ শিক্ষিতশ্রেণিই হয়ে উঠে তাদের সহায়ক গোষ্ঠী। এই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির নেতৃত্বে পরিচালিত কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের কার্যক্রমের মাধ্যমে তা সমর্থিত হয়। এবিষয়ে মিহির আচার্যের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, রাজা রামমোহন রায় এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পুষ্ট *নব্য জমিদারশ্রেণি*, *মধ্যস্বত্বভোগী* এবং তার আশ্রয় ও লালিত্যে গড়ে উঠে *মধ্যবিত্ত শ্রেণি*,যারা দীর্ঘকাল এবং আজকে পর্যন্ত শ্রেণি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে তাবৎ ভারতবর্ষের মানুষের স্বনির্বাচিত মুখপাত্র। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণিই ইংরেজ আমল থেকে আজ পর্যন্ত তাদেরই স্বার্থে তৈরি ইতিহাসের শবাধারটিকে ভারতবর্ষের বৃহত্তর মানুষের কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত আছেন।[৩৭৪] ভারতবর্ষের মানুষের স্বনির্বাচিত মুখপাত্র পরিচিতির অন্তরালে ব্রিটিশের সাথে কংগ্রেসের এই আপসকামিতার বিরুদ্ধাচারণ করে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির বৈপ্লবিকধারা ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের বাংলা ভাগের সময় থেকে সশস্ত্রপন্থায় আন্দোলনে নেমে পড়ে এবং ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে কিংসফোর্ডকে হত্যা প্রচেষ্টা চালায় কিন্তু ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলেও এই ঘটনার প্রভাব জনমনে আশার সঞ্চার করে। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে দিল্লিতে গভর্নরের বহরে হামলা; প্রথম

বিশ্বযুদ্ধের সুযোগে রাসবিহারী বসুর দেশব্যাপি বিপ্লব আয়োজন এবং ব্যর্থতার দায় ও নিরাপত্তাহীনতায় ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের জুনে দেশত্যাগ করে জাপান গমন করেন। প্রায় একই সময় জার্মান থেকে অস্ত্র আমদানির চালান গ্রহণ কল্পে ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের ০৯ সেপ্টেম্বর উড়িষ্যার বালেশ্বরের বুড়িবালাম নদীর তীরে কাপ্তিপোদায় ব্রিটিশ পুলিশ অফিসার মি.টেগার্টের নেতৃতাবাধীন পুলিশ দলের সাথে সশস্ত্র খন্ডযুদ্ধে কয়েকজন সঙ্গীসহ বিপ্লবী জ্যোতিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের (বাঘাজ্যোতিন) আত্মাহুতি দেন। এছাড়াও বিপ্লবীদের বিভিন্ন সংগ্রাম ও বিচ্ছিন্নতাবাদী সশস্ত্র আন্দোলন শেষাবধি ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের দিকে স্তিমিত হয়ে যায়।

এদিকে ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুহলে যুদ্ধ পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে বিপ্লবীরা ভারতের স্বাধীনতার জন্য পুনরায় তৎপরতা শুরু করে। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে ছদ্মবেশ ধারণ করে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু চুপিসারে ভারত ত্যাগ করে জার্মানি চলে যান। পরর্বতীতে যেখান থেকে জাপানে গমন করেন। ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের ১৪ জুলাই বিশিষ্ট বাঙালি বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর ইচ্ছানুসারে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আজাদ হিন্দ ফৌজের নেতৃত্বগ্রহণ করেন। প্রবাসী বিপ্লবী *আজাদ হিন্দ সরকার* গঠন করেন। নবগঠিত এই সরকার ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের ২৪ অক্টোবর ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে ব্রিটিশ বিরোধি বৈপ্লবিক সংগ্রামে এক অনন্য নজীর স্থাপন করেন।

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দের ১৪ জানুয়ারি বার্মার রাজধানী রেঙ্গুনে প্রধান সামরিক ঘাটি স্থাপন করেন। সেখান থেকে সশস্ত্র অভিযানের মাধ্যমে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের কোহিমায় উপনীত হয়ে স্বাধীন ভারতের ত্রিবর্ণ পতাকা উত্তোলন করেন। অপর এক বাহিনী মণিপুরের রাজধানী ইম্ফলের অদূরে মৈরাং-এ জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। কোহিমা এবং মৈরাংসহ ভারতীয় এলাকার ১৫০ মাইল ব্রিটিশ শাসনমুক্ত করে মণিপুরের রাজধানী ইম্ফল অধিকারের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হন। কিন্তু পথিমধ্যে প্রবলবর্ষণ শুরু হলে আজাদহিন্দ বাহনীর ভারত অভিযান ব্যাহত হয়। কিন্তু ইতোমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অক্ষশক্তির পরাজয় এবং ১৯৪৫ খ্রিসাটাব্দের ১৮ আগস্ট নেতাজির মৃত্যু; পরিস্থিতি বদলে দেয়। কিন্তু উপর্যুক্ত বৈপ্লবিক কর্মকান্ডের অভিঘাত এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বৃটেনের অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতি মিটিয়ে বৃটেনের পক্ষে ভারতশাসন করা অসম্ভবপর হয়ে উঠে। তারা ভারত ত্যাগের সিদ্ধান্ত করে। বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিপ্লবপন্থি গোষ্ঠীর সশস্ত্র তৎপরতা তথা ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের ফলেই সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকার ভারত ত্যাগের এই সিদ্ধান্তগ্রহণ করতে বাধ্য হয়। বস্তুতপক্ষে ক্রমশ ব্যাপক ও তীব্র হয়ে ওঠা ব্রিটিশ বিরোধী সকল আন্দোলন-সংগ্রামের নেতৃবৃন্দ সকলেই ছিলেন বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ:

১. সুপ্রকাশ রায়,*ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম(১৮৯৩-১৯৪৭)*,র‍্যাডিক্যাল ইমপ্রেশন, কলকাতা, ২০১৩, পৃ.২৩

২. সুপ্রকাশ রায়,*ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম*,র‍্যাডিক্যাল ইমপ্রেশন,কলকাতা,২০১৮,পৃ.৩৭১

৩. সুপ্রকাশ রায়,*ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম*, র‍্যাডিক্যাল ইমপ্রেশন,কলকাতা,২০১৮,পৃ.৩৭৩

৪. ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখী বর্মণ,*ব্রিটিশ ভারতে রাজনৈতিক উন্নয়ন*,আজিজিয়া বুক ডিপো,ঢাকা,২০০৬,ঢাকা,পৃ.৮

৫. ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখী বর্মণ,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৮

৬. ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখী বর্মণ,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৮

৭. ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখী বর্মণ,*প্রাগুক্ত*, পৃ.৮

৮. ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখী বর্মণ,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৮-৯

৯. ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখী বর্মণ,*প্রাগুক্ত*, পৃ.১১

১০. (উদ্ধৃত:https:// BengalStudents.com >accessed on 10 january 2022)

১১. (উদ্ধৃত:https:// BengalStudents.com >accessed on 10 january 2022)

১২.(উদ্ধৃত:https://BengalStudents.com >accessed on 10 january 2022)

১৩.(উদ্ধৃত:https://BengalStudents.com >accessed on 10 january 2022)

১৪.বিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায়,*ভারতের সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রাম*,র‍্যাডিক্যাল ইম্পেশন,কলকাতা,২০১৪,পৃ.৩১

১৫.(উদ্ধৃত:https:// BengalStudents.com >accessed on 08 january 2022)

১৬.(উদ্ধৃত:https://BengalStudents.com>accessed on 09 january 2022)

১৭.(উদ্ধৃত:https:// BengalStudents.com >accessed on 09 january 2022)

১৮.(উদ্ধৃত:https:// BengalStudents.com >accessed on 09 january 2022)

১৯.পারভীন আক্তার জেমী,*নজরুল সাহিত্যে বিপ্লবী চেতনা*,অনন্যা,ঢাকা,২০২০,পৃ.১৪।

২০.ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখী বর্মন, *প্রাগুক্ত*,পৃ.১৫

২১.ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখী বর্মন,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৭২

২২. জমিদার সভা:(https://itihasten.blogspot.com> tika...), accessed on 10 january 2022)

২৩.সাধারণ জনগণের ভাগ্য নিয়ে তারা বিশেষ মাথা ঘামাতো না।যদিও সংগঠনটি প্রতিষ্ঠাকালে ঘোষণা করা হয়েছিল,জাতি,বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্যেই জমিদার সভা গঠন করা হয়েছে।একে চাইনা,ওকে নেওয়া হবেনা জাতীয় সকল প্রকার বর্ণবৈষম্য পরিহার করে সম্পুর্ণ উদার নীতির ওপর এই সভা প্রতিষ্ঠিত।এদেশের মাটির সঙ্গে নিজের স্বার্থ জড়িত থাকাই সভ্যপদ লাভের একমাত্র যোগ্যতা। (উদ্ধৃত: হোসেনউদ্দীন হোসেন,বাঙলার বিদ্রোহ,প্রথম খন্ড(৬০০-১৯৪৭), বিদ্যাপ্রকাশ,ঢাকা, ২০১৬,পৃ.২৫৪)

২৪. হোসেনউদ্দীন হোসেন, *প্রাগুক্ত*,পৃ.২৫৪

২৫. ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখী বর্মন, *প্রাগুক্ত*,পৃ.১৭৩

২৬. ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখী বর্মন,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৬

২৭. পারভীন আক্তার জেমী,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৫৭

২৮. বাংলা পিডিয়া,খন্ড নং ০৯,পৃ.৪৭১

২৯. বাংলা পিডিয়া,খন্ড নং ০৯,পৃ.৪৭১

৩০. ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখি বর্মণ,পৃ.১১৮

৩১. বাংলা পিডিয়া, খন্ড নং ০৯,পৃ. ৭৪

৩২. Dr.Dinesh Chandra Sen,Bengali Language and Literature,p.762 (উদ্ধৃত : মে.জে.এমএ মতিন, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম: সতেরো'শ সাতান্ন থেকে উনিশ'শ সাতচল্লিশ*,দি ইউনিভার্সেল একাডেমি,ঢাকা,২০১৭, পৃ.১২০

৩৩. পারভীন আক্তার জেমী,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৫

৩৪. আবদুল বাছির,*বাংলার কৃষক বিদ্রোহ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণি*,বাংলা একাডেমী,ঢাকা,২০১২,পৃ.২১৭-১৮

৩৫. দর্শনানন্দ চৌধুরী,'কালীপ্রসন্ন সিংহ,'বিমানবসু ও অনুনয় চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.),*বঙ্গীয় নবজাগরণের অগ্রপথিক*,দিব্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০২১, পৃ.২৯৭

৩৬. দর্শনানন্দ চৌধুরী,'কালীপ্রসন্ন সিংহ,'বিমানবসু ও অনুনয় চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.),*প্রাগুক্ত*, পৃ.৩১১

৩৭. যোগেশচন্দ্র বাগল,মুক্তির সন্ধানে ভারত,বিবেকানন্দ বুক সেন্টার,কলকাতা, ২০১৩, পৃ.৯৯

৩৮. যোগেশচন্দ্র বাগল,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৯৯

৩৯. সুপ্রকাশ রায়,*ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম*, র‍্যাডিক্যাল ইমপ্রেশন,কলকাতা,২০১৮,পৃ.১৭৫

৪০. সুপ্রকাশ রায়,ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামেরইতিহাস,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৪৪

৪১. উনিশ শতকের শেষার্ধে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের একমাত্র প্রগতিশীল কাজ হলো–'১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের বিবাহের সম্মতি দানের বয়স সমন্ধীয় আইন' পাশ।এই আইনে পূর্বেকার (Age of Concent Act of 1801) আইনের কন্যার বিবাহের সম্মতি দানের বয়স ১০ বৎসর হতে বর্ধিত করে ১২ বৎসর করা হয়

৪২. Lester Hutchinson,*The Empire of the Nobos:A Short History of British India*,George Allen and Unwine Ltd., London,1937, p.189.

৪৩. Verney Lovett, *A History of the Indian Nationalist Movement*,Leopold Classic Library, London, 1920,p.232.

৪৪. Verney Lovett, *op.cit.*,p.233.

৪৫. Lester Hutchinson, *op.cit.*,p.183.

৪৬. সুপ্রকাশ রায়,*ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস*,ডিএনবি ব্রাদার্স,কলকাতা,১৯৭০,পৃ.২৫

৪৭. সুপ্রকাশ রায়,ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস,*প্রাগুক্ত*,১৯৭০,পৃ.২৫)

৪৮. ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন:(www.bn.m.wikipedia.org;ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখী বর্মন,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৭৩

৪৯. ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন: (https://digiexam guide.com>...)

৫০. ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখী বর্মন, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৭৩

৫১. হোসেনউদ্দীন হোসেন,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২৫৫

৫২. বিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায়,ভারতের সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রাম,র‍্যাডিক্যাল ইম্পেশন,কলকাতা,২০১৪,পৃ.৩১

৫৩. হোসেনউদ্দীন হোসেন, *প্রাগুক্ত*,পৃ.২৫৪

৫৪. ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখী বর্মন,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৬

৫৫. কমল আইচ,শিশিরকুমার ঘোষ,বিমান বসু ও অনুনয় চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.),*বঙ্গীয় নবজাগরণের অগ্রপথিক*,দিব্য প্রকাশ,ঢাকা,২০২১,পৃ.৩১৫

৫৬. ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখী বর্মন, *প্রাগুক্ত*,পৃ.১৭৪

৫৭. ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখী বর্মন,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৭৪

৫৮. কমল আইচ,শিশিরকুমার ঘোষ,বিমান বসু ও অনুনয় চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.), *বঙ্গীয় নবজাগরণের অগ্রপথিক*, দিব্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০২১,পৃ.৩১৫

৫৯. পারভীন আক্তার জেমী,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৬

৬০. পারভীন আক্তার জেমী,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৬

৬১. হোসেনউদ্দীন হোসেন,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২৫৫;পারভীন আক্তার জেমী,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৬

৬২. ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখী বর্মন,*প্রাগুক্ত*, পৃ.১৭৫

৬৩. প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়,*ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের খসড়া*, পৃ.৭৪ (উদ্ধৃত:হোসেনউদ্দীন হোসেন,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২৫৪)

৬৪. ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখী বর্মন,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৭৫

৬৫. মুঘল ও ব্রিটিশ আমলে প্রথাগত ও আইন সম্মতভাবে বাংলার কৃষককুলকে বোঝানোর জন্য 'রায়ত' শব্দটি ব্যবহৃত হতো। কিন্তু ব্যাপক অর্থে এটি রাষ্ট্রের প্রজাসাধারণ ও শাসকশ্রেণির অধীনস্তদের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হতো।রায়ত শব্দটির উৎপত্তি আরবি রঈয়ৎ(রা'আ) থেকে। বুৎপত্তিগত দিক থেকে এর অর্থ চারণভূমির পশুপাল এবং সমষ্টিগত অর্থে প্রজা।মুঘল রাজস্ব ব্যবস্থায় রায়ত ছিল এরকজন চাষী,একজন রাজস্ব ইজারাদার।এটা অবশ্যই লক্ষ্যণীয় যে,চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিধিবিধানের আওতায় রায়তদের আইনত প্রজা হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হলেও ভূমিতে অধিকারহীন প্রজা হওয়ার ধারণার সাথে তারা কখনোই আপোশ করেনি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শুরু থেকে কৃষক সম্প্রদায়ের সচেতন অংশ যুক্তি দিয়ে আসছিল যে,প্রথা ও রীতিনীতি অনুযায়ী জমির ওপর তাদের অধিকার আছে।

এবং নিজস্ব খেয়াল খুশি মতো তাদের উৎপাদন কার্যক্রমকে নিয়ন্ত্র করার কোন অধিকার জমিদারদের নেই। জমির ওপর নিজেদের অধিকার প্রমাণের জন্য রায়তরা প্রায়শই জমিদারদের মালিকানা দাবির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলত। ঊনিশ শতকের সত্তরের দশক ও আশির দশকের শুরুতে কয়েক দফা কৃষক অভ্যুত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার জমিরওপর সকল পক্ষের অধিকার ও দায়িত্ব নিরূপণ করে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন,১৮৮৫ প্রণয়ন করতে সম্মত হয়।রায়ত ও প্রজার মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে।রায়তের ন্যায় প্রজাও একজন কৃষি উৎপাদক।ইতিহাসে দেখা যায় যে,প্রাচীন যুগে একজন প্রজা কখনো রাজার 'ভাড়াটে' ছিল না।প্রজা ছিল সরাসরি রাজার অধীনে এবং এবং জমির ওপর তার সুনিদিষ্ট অধিকার ছিল।রাজারা সর্বদা এ অধিকারকে মর্যাদা দিতেন।কিন্তু মুঘল আমলে প্রজা শব্দটির মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়।কেননা এসময় একজন প্রজা জমিদারের নিজ জোতে বা খাস জমিতে একজন পুরুষানুক্রমিক শ্রমিক।চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরে জমিদারগণ রায়তদের সবসময় প্রজা বলতেন। পক্ষান্তরে প্রজারা তাদেরকে রায়ত নামে অভিহিত করার দাবি জানাত।কারণ প্রজা ও রায়তের সামিাজিক অবস্থান এক নয়। জমির ওপর অধিকারের বেলাও এক নয়।প্রজা অধীনস্ত যা রায়ত নয়।অবশ্য বিশ শতকের গোড়ার দিকে প্রজা শব্দটি ব্যাপক ব্যবহারে চলে আসে। এবং রায়তের পরিবর্তে কৃষক সংগঠনগুলোর নামকরণ করা হয়।যেমন নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি, কৃষক প্রজাপার্টি প্রভৃতি। (উদ্ধৃত: রায়ত:https://bn.banglapedia.org , accessed on 25 january, 2022)

৬৬. কৃষ্ণকুমার মিত্র,*আত্মচরিত*,পৃ.১১৭-১৮।(উদ্ধৃত:পারভীন আক্তার জেমী,*প্রাগুপ্ত*,পৃ.১৬)

৬৭. প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়,*ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের খসড়া*,পৃ.৭৪।(উদ্ধৃত:হোসেনউদ্দীন হোসেন,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২৫৬)

৬৮. কেবলমাত্র ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের দুর্ভিক্ষেই পঞ্চাশ থেকে ষাট লক্ষ ভারতবাসী প্রাণ দেয়।উদ্ধৃত,সুপ্রকাশ রায়,*ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস, প্রাগুক্ত*,পৃ.২৩

৬৯. সুপ্রকাশ রায়, ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২৬

৭০. সুপ্রকাশ রায়,ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২৫; পারভীন আক্তার জেমী,*প্রাগুপ্ত*,পৃ.১৭;ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখী বর্মন,*প্রাগুক্ত*, পৃ.১৭৭

৭১. ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখী বর্মন,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৭৭

৭২. মো.শহীদুল্লাহ,*বাংলাদেশ বিষয়াবলি*,গ্রন্থকুটির,ঢাকা,২০১৬,পৃ.৫০

৭৩. হোসেনউদ্দীন হোসেন,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২৫৬

৭৪. C.E.Buckland,*Bengal Under The Lieutenant-governors,Vol.,II,* S.K.Lahiri & Co.,Calcutta, 1901,p.787.

৭৫. C.E.Buckland, *op.cit.*, p.789.

৭৬. C.E.Buckland, *op.cit.*,p.544.

৭৭. মালাবার উপকূলে মেপলা চাষীদের বিদ্রোহ,বোম্বাই প্রদেশের মারাঠা চাষীদের সংগ্রাম,দাক্ষিণাত্যের চাষীরা বিদ্রোহ করে মহাজনী আইন পাশ করতে বাধ্য করে,উত্তর বঙ্গের চাষীদের বিদ্রোহের ফলে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে বেঙ্গল টেনান্সি অ্যাক্ট' পাশ করতে হয়।এছাড়াও এ সময় অযোধ্যা ও পাঞ্জাব প্রদেশেও কৃষক বিদ্রোহের ফলে শাসকগণকে পূরাতন কৃষি আইনের সংস্কার সাধনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হয়।(উদ্ধৃত,সুপ্রকাশ রায়,*ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস, প্রাগুক্ত*,পৃ.৩০)

৭৮. ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে নাগপুরের শিল্পকেন্দ্রে ভারতের প্রথম শ্রমিক ধর্মঘট হয়। ১৮৮২ হতে ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বোম্বাই ও মাদ্রাজে কয়েকটি বড় বড় ধর্মঘট করে শ্রমিকরা তাদের দাবি আদায় করতে সক্ষম হয়।এতে উৎসাহিত হয়ে ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে বোম্বাই শহরে 'মিলস্ অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েশন' নামে ভারতে প্রথম কোন শ্রমিক সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ঘটে।উদ্ধৃত,সুপ্রকাশ রায়,*ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস,প্রাগুক্ত*,পৃ.৩০-৩১।

৭৯. সুপ্রকাশ রায়,ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৩১।

৮০. প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতীয়দের হাতে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে ব্রাহ্ম সমাজ, ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান সোসাইটি'১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠিত হয়ে ব্রিটিশ সরকারে নিকট স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দাবি-দাওয়া জানাতে থাকে।এপথ পরিক্রমাতেই শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্তশ্রেণি ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব পোষণ করতে থাকে।১৮৭৩-৭৪ খ্রিস্টাব্দে ভারতে স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠার দাবি জানানো হয়।এরই প্রেক্ষিতে ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে শিশির কুমার ঘোষের নেতৃত্বে-India League প্রতিষ্ঠিত হয়।অপরদিকে ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ও আনন্দ মোহন বসুর উদ্যোগে-Indian Association প্রতিষ্ঠা লাভ করে।এসংগঠনটিতে হিন্দু,মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যোগদান করেন।এসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত-Indian Association'ই ছিল ভারতের শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান।এই প্রতিষ্ঠানের শাখা-প্রশাখা ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।১৮৮৩খ্রিস্টাব্দে-Indian Association'র কলকাতা শাখা

সর্বপ্রথম একটি সর্ব ভারতীয় সম্মলেন আহ্বান করে।আনন্দমোহন বসুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সম্মলেনে বাংলা, মাদ্রাজ, বোম্বাই ও যুক্তপ্রদেশের প্রতিনিধিগণ যোগদান করেছিলেন।১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত এ জাতীয় সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে আনন্দমোহন বসু সম্মেলনটিকে 'ভারতের জাতীয় পার্লামেন্ট' আখ্যাদান করেন। (উদ্ধৃত: মো. শহীদুল্লাহ, *প্রাগুক্ত,* পৃ.৫০; সুপ্রকাশ রায়,ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস, *প্রাগুক্ত,*পৃ.৩১-৩২)

৮১. W.Wedderburn, *Allan Octavian Hume,Father of the Indian National Congress,1829 to 1912,*T.Fisher Unwin, London,1913,p.80-81.

৮২. Ambika Charan Mazumder, *Indian National Evolution:a brief survey of the Origin and progress of the Indian National Congress and the growth of Indian Natonalism*, G.A. Natesan & Co., Madras,1917, p.274.

৮৩. নরহরি কবিরাজ,*স্বাধীনতার সংগ্রামে বাংলা,*বাণী প্রকাশ,ঢাকা,১৯৮২,পৃ.১৯৪

৮৪. সুপ্রকাশ রায়,ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস,*প্রাগুক্ত,*পৃ.৩৬

৮৫. Majumdar, Chowdhury & Dutta.,*An Advance History of India.,*Macmillan and Co., Limited., London, 1950,p.889.

৮৬. A.R.Desai,*Social Background of Indian Nationalism*,Popular Book Depot,Bombay,1948, p.237.

৮৭. কামাক্ষানাথ সেন,'ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন ও টাঙ্গাইল',মুহাম্মদ বাকের (সম্পা.), *টাঙ্গাইল জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, টাঙ্গাইল জেলা পরিষদ, ১৯৯৭,পৃ.৩৪৮

৮৮. *The Bengalee,*13th December,1903.

৮৯. শেখ ফজলুল করিম সেলিম,ভারত বর্ষের স্বাধীনতা, ত্রয়ী প্রকাশন,ঢাকা,২০১৯,পৃ.১৯৯

৯০. শেখ ফজলুল করিম সেলিম,ভারত বর্ষের স্বাধীনতা, ত্রয়ী প্রকাশন,ঢাকা,২০১৯,পৃ.১৯৯

৯১. শেখ ফজলুল করিম সেলিম, *প্রাগুক্ত,*পৃ.১৯৯

৯২. মুহম্মদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য,*বাংলাদেশের ইতিহাস,*নওরোজ কিতাবিস্তান,ঢাকা,১৯৯৫,পৃ.৪৬৬

৯৩. ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখি বর্মন,*প্রাগুক্ত,*পৃ.২০

৯৪. ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখি বর্মন,*প্রাগুক্ত,*পৃ.২০

৯৫. ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখি বর্মন,*প্রাগুক্ত,*পৃ.২০

৯৬. এম আর আখতার মুকুল,*কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী*, অনন্যা,ঢাকা,২০১৪,পৃ.২২৯

৯৭. শেখ ফজলুল করিম সেলিম, *প্রাগুক্ত,*পৃ.২০০

৯৮. শেখ ফজলুল করিম সেলিম, *প্রাগুক্ত,*পৃ.২০০

৯৯. শেখ ফজলুল করিম সেলিম, *প্রাগুক্ত,*পৃ.২০০

১০০. শেখ ফজলুল করিম সেলিম, *প্রাগুক্ত,*পৃ.২০০

১০১. শেখ ফজলুল করিম সেলিম, *প্রাগুক্ত,*পৃ.২০০

১০২. অর্থাৎ কোন গৃহের রন্ধনশালার চুল্লিতে আগুন না জালানোর সিদ্ধান্ত হয়। এ কর্মসূচির প্রস্তাবক ছিলেন প্রখ্যাত প্রবন্ধকার আচার্য্য রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী

১০৩. এম আর আখতার মুকুল,*কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী*,অনন্যা,ঢাকা,২০১৪,পৃ.২৩১

১০৪. শেখ ফজলুল করিম সেলিম,ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ঘটনাবহুল ইতিহাস,ত্রয়ী প্রকাশন,ঢাকা,২০১৯,পৃ.২০০

১০৫. ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখি বর্মন,*প্রাগুক্ত,*পৃ.২১

১০৬. ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখি বর্মন,*প্রাগুক্ত,*পৃ.২১

১০৭. শেখ ফজলুল করিম সেলিম,ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ঘটনাবহুল ইতিহাস,ত্রয়ী প্রকাশন, ঢাকা,২০১৯,পৃ.২০০

১০৮. ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখি বর্মন, *প্রাগুক্ত,* পৃ.২৩

১০৯. পারভীন আক্তার জেমী, *প্রাগুপ্ত*, পৃ.২০

১১০. শেখ ফজলুল করিম সেলিম, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ঘটনাবহুল ইতিহাস, ত্রয়ী প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৯, পৃ.২০০

১১১. ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখি বর্মন,*প্রাগুক্ত,*পৃ.২৩

১১২. ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখি বর্মন,*প্রাগুক্ত,*পৃ.২৩

১১৩. পারভীন আক্তার জেমী,*প্রাগুপ্ত*,পৃ.১৮

১১৪. আতাউর রহমান, *নজরুল ঔপনিবেশিক সমাজে সংগ্রামী কবি*,নজরুল ইন্সটিটিউট,ঢাকা,১৯৯৩,পৃ.৩৫। (উদ্ধৃত: পারভীন আক্তার জেমী, *প্রাগুপ্ত*,পৃ.১৯)

১১৫. পারভীন আক্তার জেমী,*প্রাগুপ্ত*,পৃ.২২

১১৬. এ ঘোষণাটিকে ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের ২৫ জুন ব্রিটিশ পার্লামেন্ট আইনে পরিণত করে

১১৭. আমিনুল ইসলাম,*বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও জাতীয়তাবাদ*,দিব্য প্রকাশ,ঢাকা,২০১৫,পৃ.১৪০

১১৮. নজরুল ইসলাম,*বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক*,মিত্র ও ঘোষ,কলকাতা,১৪০১,পৃ.২১৭।(উদ্ধৃত: আমিনুল ইসলাম, *বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও জাতীয়তাবাদ*, দিব্য প্রকাশ,ঢাকা,২০১৫,পৃ.১৪০

১১৯. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ,*নওয়াব সলীমুল্লাহ*,পৃ.৭৩-৭৮।(উদ্ধৃত:সুলায়মান কবীর,বাংলায় মুসলিম জাগরণে ওয়াজেদ আলী খান পন্নী,সুবর্ণ,ঢাকা,২০২০, পৃ.১১১

১২০. J.H.Broomfield,*The Forgotten Majority;The Bengal Muslim and September,1918*; D.A.B. Low (ed.), *Sounding in Mordern South Asian History*, London,1968, p.203.(উদ্ধৃত; পারভীন আক্তার জেমী, *প্রাগুপ্ত*,পৃ.২২)

১২১. বিপানচন্দ্র ও অন্যান্য,*ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ১৮৫৭-১৯৪৭*,(অনুবাদ, সুনীল মুখোপাধ্যায়),কেপি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী,কলকাতা,২০১৪,পৃ.১০৮;মেজর জেনারেল এম এ মতিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৫৮৭-৮৮

১২২. পারভীন আক্তার জেমী,*প্রাগুপ্ত*,পৃ.৪১-৪২

১২৩. ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়,*ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব*,র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন,কলকাতা, ২০১৬, পৃ.১০৫

১২৪. "To organise and put the whole scheme of rasing a rebellion with the help of Germansupon a proper footing,establishing cooperation between revolutionaries in Siam and other places with Bengal." quoted from 'sedition Committee Report'1918,p.82. (উদ্ধৃত: ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়, *প্রাগুক্ত*,পৃ.১০৫)

১২৫. ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১০৭

১২৬. হোসেনউদ্দীন হোসেন,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২৮৪; নলিনীকিশোর গুহ,বাংলায় বিপ্লববাদ,র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন,কলকাতা, ২০১৭, পৃ.১২২

১২৭. শেখ ফজলুল করিম সেলিম,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২০৭

১২৮. বিপানচন্দ্র ও অন্যান্য,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১০৮

১২৯. তুর্কী ভাষায়'বলকান' শব্দের অর্থ পর্বত।দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের পর্বতময় অঞ্চল (*The Balkans*) বা বলকান উপদ্বীপ (*The Balkans Peninsula*) নামে পরিচিত। দীর্ঘকাল তুর্কী শাসনাধীনে থাকা এঅঞ্চলের গ্রীস, সার্বিয়া, রুমানিয়া, মন্টিনেগ্রো প্রভৃতি দেশ ক্রমান্বয়ে স্বাধীন হয়ে পড়ে। উল্লিখিত দেশগুলো ইউরোপের অবশিষ্ট তুর্কী শাসনাধীন অঞ্চল নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেয়ার উদ্দেশ্যে ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে তুর্কীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। ইতিহাসে এটি প্রথম বলকান যুদ্ধ নামে পরিচিতি পায়।এতে পরাজিত হয়ে তুর্কীরা রাজধানী কন্টস্ট্যান্টিনোপল বা ইস্তাম্বুল ব্যতীত প্রায় সকল ইউরোপীয় অঞ্চল হারায়।তবে অধিকৃত অঞ্চলের দখল নিয়ে বিজয়ী দেশগুলোর মধ্যে পরের ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে আবার যুদ্ধ শুরু হয়। ইতিহাসে এটি দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধ হিসেবে অভিহিত হয়েছে।এযুদ্ধে তুর্কীরাও যোগদান করে এবং ইউরোপে তাদের হারানো অঞ্চলের সামান্য অংশ পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়। উভয় বলকান যুদ্ধে ব্রিটেন-সহ ইউরোপীয় বৃহৎশক্তিবর্গ (জার্মানী ব্যতীত) তুর্কীদের বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে। (উদ্ধৃত; সুলায়মান কবীর, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১২৯)

১৩০. Md. Enamul Haq Khan, 'Some Aspects of Indian Muslim Respons to Balkan War', *Clio,* Vol.2, June 1984, p.19-29.

১৩১. প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সেক্রেটারি নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী স্বাক্ষরিত,২১ নভেম্বর ১৯১২ কলকাতা থেকে প্রকাশিত এবং পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রাদেশিক মুসলিম শিক্ষা সমিতির রংপুর অধিবেশনের(১৯১১) কার্য বিবরণীর শেষ অংশে সংযোজিত এরূপ একটি প্রচারপত্রের আংশিক নমুনা নিম্নরূপ:"জনাব হারময়েন শরিফয়নের রক্ষক ও ইসলাম ধর্মের পৃষ্ঠপোষক, অতীত ইসলাম গৌরবের একমাত্র স্মৃতিচিহ্ন সেই ওসমানীয় শক্তি নগণ্য বল্কান শক্তিসমূহের সহিত অন্যায় যুদ্ধে পরাজিত,অপমানিত ও লাঞ্ছিত। এখনও তুর্কী বীরগণ স্বদেশ ও স্বজাতির গৌরব রক্ষার্থে জীবন উৎসর্গ করিতেছে।" এতে আরও উল্লেখ করা হয়,"বহু তুর্কী পরিবার নিরাশ্রয় হইয়া পড়িয়াছে।রমণীগণ বিধবা,সন্তান-সন্ততিগণ পিতৃহীন ও এতিম হইতেছে।তাহারা সর্বস্বান্ত হইয়া অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। আহতগণের চিকিৎসার বন্দোবস্ত হইতেছেনা।এই কঠিন সময়ে কলেরা ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ

করিয়াছে।" এতে আরও বলা হয়,"ধনী হইতে পথের ভিখারী পর্যন্ত এই অর্থ সাহায্য দান করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিতেছেন। এই অবস্থায় যদি আমরা চুপ করিয়া থাকি তবে আর আমাদের মুখ দেখাইবার স্থান কোথায়?" (উদ্ধৃত:সুলায়মান কবীর,প্রাগুক্ত,পৃ.১৩০)

১৩২. সুলায়মান কবীর, প্রাগুক্ত, পৃ.১১১

১৩৩. আহমদ রফিক, *দেশ বিভাগ ফিরে দেখা* ,অনিন্দ্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৫ ,পৃ.২১২

১৩৪. আহমদ রফিক, *প্রাগুক্ত,* পৃ.২১২

১৩৫. আহমদ রফিক, *প্রাগুক্ত,* পৃ.২১২

১৩৬. মেজর জেনারেল এম এ মতিন, *প্রাগুক্ত,*পৃ.১৭৮

১৩৭. ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখি বর্মন,*প্রাগুক্ত,*পৃ.৯৬

১৩৮. শরিফুল ইসলাম ভূঁইয়া, *জাতীয় রাজনীতি ও টাঙ্গাইল জেলার নেতৃবৃন্দ (১৯৪৭-১৯৭১),* মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০২২, পৃ.৩৬

১৩৯. মেজর জেনারেল এম এ মতিন, *প্রাগুক্ত,* পৃ.১৭৮-৭৯

১৪০. বাংলা পিডিয়া, খন্ড নং ০৩ ,পৃ.৮৪

১৪১. বাংলা পিডিয়া, খন্ড নং ০৩ ,পৃ.৮৪

১৪২. ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখি বর্মন,*প্রাগুক্ত,*পৃ.৯৯; শরিফুল ইসলাম ভূঁইয়া, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৬; বাংলা পিডিয়া, খন্ড নং ০৩ ,পৃ.৮৫

১৪৩. মেজর জেনারেল এম এ মতিন,*প্রাগুক্ত,*পৃ.১৭৯

১৪৪. বিপানচন্দ্র ও অন্যান্য,*প্রাগুক্ত,*পৃ.১৪২

১৪৫. বাংলা পিডিয়া, খন্ড নং ০৩ ,পৃ.৮৪

১৪৬. বিপানচন্দ্র ও অন্যান্য,*প্রাগুক্ত,*পৃ.১৪২

১৪৭. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান,*পলাশী থেকে ঢাকা* ,সাহিত্যমালা, ঢাকা,২০১০ ,পৃ.৪৫

১৪৮. ইয়াসমিন আহমেদ, উপমহাদেশের রাজনীতি ও স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব, আজিজিয়া বুক ডিপো,ঢাকা,১৯৯৪,পৃ.১৬৫

১৪৯. বিপানচন্দ্র ও অন্যান্য,*প্রাগুক্ত,*পৃ.১৪২

১৫০. বিপানচন্দ্র ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত,* পৃ.১৪২

১৫১. বিপানচন্দ্র ও অন্যান্য,*প্রাগুক্ত,* পৃ.১৪২

১৫২. তিনি সরকার সমন্ধে বিরক্তি প্রকাশ করে বলেন,এসরকারকে আর বরদাস্ত করা যায়না। একটি দায়িত্বশীল সরকার প্রয়োজন।(উদ্ধৃত: মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম,পাকিস্তান:দেশ ও কৃষ্টি,পৃ.১৪১:মেজর জেনারেল এম এ মতিন,*প্রাগুক্ত,* পৃ.১৮২

১৫৩. ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখি বর্মন,*প্রাগুক্ত,*পৃ.১০১

১৫৪. বাংলা পিডিয়া, খন্ড নং ০৩ ,পৃ.৮৫

১৫৫. মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান,*পলাশী থেকে ঢাকা,*আর্শীবাদ প্রকাশনী,ঢাকা,২০১০ ,পৃ.৪৬

১৫৬. খন্দকার আবদুর রহীম, *প্রাগুপ্ত* ,পৃ.২৩১ ।(উদ্ধৃত: শরিফুল ইসলাম ভূঁইয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩৬; বাংলা পিডিয়া, খন্ড নং ০৩ ,পৃ.৮৫

১৫৭. বাংলা পিডিয়া, খন্ড নং ০৩ ,পৃ.৮৫

১৫৮. বাংলা পিডিয়া, খন্ড নং ০৩ ,পৃ.৮৫

১৫৯. খন্দকার আবদুর রহীম,*প্রাগুপ্ত* ,পৃ.২৩১ (উদ্ধৃত; শরিফুল ইসলাম ভূঁইয়া,*প্রাগুক্ত,*পৃ.৩৭)

১৬০. খন্দকার আবদুর রহীম, *প্রাগুপ্ত*, পৃ.২৩২ (উদ্ধৃত; শরিফুল ইসলাম ভূঁইয়া,*প্রাগুক্ত,*পৃ.৩৭)

১৬১. খন্দকার আবদুর রহিম রচিত টাঙ্গাইলের ইতিহাসে বর্ণিত তথ্য মতে,এর কিছু দিন পরে বেড়াডোমা গ্রামে অপর একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।এসভা আয়োজন করেছিলেন মৌলভী নিজাম উদ্দিন আহমেদ মোক্তার। সভাপতিত্ব করেছিলেন মাওলানা দরবেশ আহমদ এবং বক্তৃতা দান করেছিলেন মাওলানা বেল্লাল,শাহ আলাউদ্দিন সিদ্দিকী এবং মৌলভী নিজাম উদ্দিন আহমদ মোক্তার প্রমুখ।এসভাতেও অনেক জনসমাগম হয়েছিল বলে জানা যায়।(উদ্ধৃত:খন্দকার আবদুর রহীম,*প্রাগুপ্ত* ,পৃ.২৩৩;শরিফুল ইসলাম ভূঁইয়া,*প্রাগুক্ত,*পৃ.৩৭-৩৮)

১৬২. বাংলা পিডিয়া, খন্ড নং ০৩ ,পৃ.৮৫-৮৬

১৬৩. ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখি বর্মন,*প্রাগুক্ত,*পৃ. ১০১

১৬৪. B.M.Taunk, *Non-cooperation Movement in Indian Politics (1919-1924),* Sundeep Prokashan, Delhi,1978,p.78-82.

১৬৫. পরবর্তীতে তিনি আসামের ভাসান চরে নির্যাতিত কৃষকদের নিয়ে তাদের অধিকার আদায়ে এক সম্মেলন আয়োজন করেন। ভাসান চরে নির্যাতিত কৃষকদের এসম্মেলন আয়োজন পরবর্তী সময় থেকে তিনি ভাসান চরের মাওলানা বা মজলুম জননেতা মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী নামে পরিচিতি লাভ করেন।

১৬৬. শরিফুল ইসলাম ভূঁইয়া,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৩৯

১৬৭. বাংলা পিডিয়া, খন্ড নং ০৩,পৃ.৮৫

১৬৮. ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখি বর্মন,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১০১। তবে অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার বিষয়ে মহাত্মাগান্ধীর নিকট দেশের স্বাধীনতার চেয়ে অহিংস নীতিই বেশি প্রাধান্য পায় অনুমিত হয়।

১৬৯. বদিউর রহমান(সম্পা.), *সত্যেন সেন রচনাবলি (অষ্টম খন্ড)*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৬, পৃ.৩৩৮

১৭০. বিপানচন্দ্র ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৮১

১৭১. ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখি বর্মন, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১০১

১৭২. বদিউর রহমান(সম্পা.), *সত্যেন সেন রচনাবলি (অষ্টম খন্ড)*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৬, পৃ.৩৩৮

১৭৩. গান্ধী অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করলেও নানা কারণে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ছিল অপরিসীম। কেননা(ক)এটি ছিল ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী প্রথম গণভিত্তিক আন্দোলন;(খ)প্রথমবার ব্রিটিশের বিরুদ্ধে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়কে এআন্দোলনের মাধ্যমেই ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব হয়;(গ)মহাত্মাগান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে দেশে প্রত্যাবর্তনের পর তার অহিংস অসহযোগ আন্দোলন নীতি প্রয়োগের সর্বপ্রথম সুযোগ লাভ করেন; (ঘ) ভারতের রাজনীতিতে গান্ধী যুগের সূত্রপাত এবং সাংগঠনিকভাবে কংগ্রেসের গণসম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পায়; (ঙ) এআন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণি তথা ভারতবাসীর মনে স্বদেশ প্রেম ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা স্থায়ী ভিত্তি পায়,যা পরবর্তী আন্দোলন-সংগ্রামকে প্রভাবিত করে;(চ)মুসলমান নেতৃবৃন্দ আন্দোলন সংগঠিত করার অভিজ্ঞতা লাভ করে এবং তাদের রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটে। (উদ্ধৃত: পারভীন আক্তার জেমী, *প্রাগুপ্ত*, পৃ.২৫)

১৭৪. B.M.Taunk,*opcit*,p.118-21;সুলায়মান কবীর,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৩০।

১৭৫. Gordon,Leonard A, Bengal:*The Nationalist Movement 1876-1940,* New Delhi, 1979. p.189-91. (উদ্ধৃত: সুলায়মান কবীর,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১২২-২৩।)

১৭৬. ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখি বর্মন, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৩৫; মেজর জেনারেল এম এ মতিন, *প্রাগুক্ত*,পৃ. ১৯৬

১৭৭. ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখি বর্মন, *প্রাগুক্ত*,পৃ.১৪১; বিপানচন্দ্র ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৮৩

১৭৮. পারভীন আক্তার জেমী,*প্রাগুপ্ত*,পৃ.২৫

১৭৯. ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখি বর্মন, *প্রাগুক্ত*,পৃ.১৩৬

১৮০. ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখি বর্মন, *প্রাগুক্ত*,পৃ.১৩৬

১৮১. বিপানচন্দ্র ও অন্যান্য,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৮৫

১৮২. স্বরাজ পার্টিতে যোগদানকারী বাংলার উল্লেখযোগ্য হিন্দু-মুসলামান নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু, জে.এম.সেনগুপ্ত,ডা.বিধানচন্দ্র রায়,বি.এন.শাসমল,কিরণশঙ্কর রায়,শরৎচন্দ্র বসু,মাওলানা আকরাম খাঁ,মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী,স্যার আবদুর রহিম,মৌলভী মুজিবুর রহমান, মৌলভী আবদুল করিম প্রমুখ। (উদ্ধৃত:সুলায়মান কবীর,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৩৪)

১৮৩. Gautam Chattopadhyay, *Bengal Electoral Politics and Freedom Struggle 1862-1947*,Indian Council of Historical Research, New Delhi, january 1984, p.76.); মো. ছিদ্দিকুর রহমান খান, বেঙ্গল প্যাক্ট: বাঙালী মুসলমানদের প্রতিক্রিয়া, *ইতিহাস* (বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা), একচল্লিশ বর্ষ, বৈশাখ-চৈত্র ১৪১৪, পৃ. ৩২

১৮৪. বিপানচন্দ্র ও অন্যান্য,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৮৫

১৮৫. মো.ছিদ্দিকুর রহমান খান,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৭৬;এম.এ.রহিম,*বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*,আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ১৮৫

১৮৬. আমলাতন্ত্র (Bureaucracy) এমন এক শাসন ব্যবস্থা যাতে স্থায়ী সরকারি কর্মকর্তারা দায়িত্ব বিভাজনের মাধ্যমে সরকারের সকল কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকে।আমলারা জনপ্রতিনিধি বা ভেটের মাধ্যমে নির্বাচিত নন। ফলে রাজনৈতিক সরকার পরিবর্তিত হলেও আমলারা পদ হারায়না।

১৮৭. হেনা চৌধুরী,দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের জীবনবেদ,কলকাতা,১৯৭১,পৃ.১৭৪।(উদ্ধৃত: আমিনুল ইসলাম, বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও জাতীয়তাবাদ, দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা,২০১৫, পৃ. ৩৪২

১৮৮. ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে শিক্ষাবিদ আবদুল করিম,হিন্দু মুসলমান সমঝোতার জন্য যে খসড়া চিত্তরঞ্জন দাশের নিকট পেশ করেন(১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের ৯ ডিসেম্বর) আবুল কালাম আজাদ,নাজিম আলী,ওয়াহিদ হোসেন ও স্যার আবদুর রহিমের সাথে আলোচনার পর তিনি চিত্তরঞ্জন দাশের উদ্যোগে সিরাজগঞ্জ প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মিলনীতে ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের ১৮ ডিসেম্বর এই চুক্তির প্রস্তাব পাশ হয়। (উদ্ধৃত: আমিনুল ইসলাম,বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও জাতীয়তাবাদ, দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৫,পৃ.৩৪০)

১৮৯. বেঙ্গল প্যাক্টের ধারা সমূহ:(ক) বঙ্গীয় আইনসভায় হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে প্রতিনিধি নির্বাচিত হবে জনসংখ্যার ভিত্তিতে।(খ) ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের আইনে প্রবর্তিত পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে।অর্থাৎ আইনসভায় প্রতিনিধিত্ব নির্ধারিত হবে স্বতন্ত্র নির্বাচনি প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে।(গ) স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোতে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের শতকরা ৬০ভাগ এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শতকরা ৪০ ভাগ প্রতিনিধিত্ব থাকবে।(ঘ)সরকারি পদ সমূহে (চাকুরিতে) শতকরা ৫৫ ভাগ পূরণ করবে মুসলমান সম্প্রদায়।তবে শর্ত থাকে যে, যতদিন পর্যন্ত ঐ সংখ্যায় না পৌঁছুবে,ততদিন পর্যন্ত শতকরা ৮০ ভাগ চাকরি মুসলমানদের জন্য নির্ধারিত থাকবে।(ঙ) চাকরির ক্ষেত্রে কাঙ্খিত সমতা অর্জনের পর থেকে মুসলমানগণ পাবে চাকরির শতকরা ৫৫ভাগ এবং অমুসলমানগণ পাবে শতকরা ৪৫ভাগ। তবে লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত (অন্তর্বতীকালীন সময়ে) হিন্দু জনগণ শতকরা ২০ ভাগ চাকরি পাবেন।(চ)ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানতে পারে,এমন কোন আইন সংসদে পাস করা যাবে না।ধর্মসংক্রান্ত আইন পাস করতে হলে আইনসভায় নির্বাচিত তিনচতুর্থাংশ(৩/৪)সদস্যের সমর্থন থাকতে হবে।(ছ)কোন মসজিদ অতিক্রম করার সময়ে কোন শোভযাত্রায় সঙ্গীত বা বাদ্যযন্ত্র বাজানো নিষিদ্ধ।মুসলমানদের কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে গো-হত্যা নিষেধ করা যাবেনা;তবে তা উন্মুক্ত স্থানে না হওয়াই ভালো।(Quoted from:Lal Bahadur, *Indian Freedom Movement and Thought*,p.382.)(উদ্ধৃত: ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখি বর্মন,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৫১-৫২)

১৯০. যে সকল হিন্দু-মুসলিম নেতৃবৃন্দ বেঙ্গল প্যাক্টের বিরোধিতা করেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন,বিপিনচন্দ্র পাল,সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়,শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী,লালালাজপত রায়,পন্ডিত মদনমোহন মালব্য,লিয়াকত হোসেন খান,নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী,খাজা নাজিমউদ্দীন ও নওয়াব মুশাররফ হোসেন প্রমুখ। এছাড়া ইতোপূর্বে স্বরাজদলের সমর্থক থাকলেও সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী পরবর্তীতে সিরাজগঞ্জে কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনদাশ বিরোধী কংগ্রেস ও আঞ্জুমান (মুসলিম সমিতি) নেতৃবৃন্দের প্রভাবে বেঙ্গল প্যাক্টের বিরোধীতা করেন। (উদ্ধৃত:মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান খান,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৩৪-৩৯।)তবে নবাব মুশাররফ হোসেন বেঙ্গল প্যাক্টের বিরোধিতা করেছেন মর্মে তথ্যের সত্যতা মেলে না। (উদ্ধৃত: হোসেন,নওয়াব মুশাররফ: https://bn.banglapedia.org>)

১৯১. আমিনুল ইসলাম,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৩৪২

১৯২. আমিনুল ইসলাম,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৩৪৭

১৯৩. ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখি বর্মন,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৫৩

১৯৪. ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখি বর্মন,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৫৩-৫৪

১৯৫. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস, চতুর্থ খন্ড (১৯০৫-১৯৪৭) (মুক্তিসংগ্রাম)*, দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা,২০২১, পৃ.২৬৪

১৯৬. বিপানচন্দ্র ও অন্যান্য,*ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ১৮৫৭-১৯৪৭*,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৯৩

১৯৭. Sitaramyya,*The History of the Congress*,p.542-44.(উদ্ধৃত:হোসেন উদ্দীন হোসেন,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৩১৫)

১৯৮. Rajni Palm Datta, *India Today*, p.296. (উদ্ধৃত: হোসেন উদ্দীন হোসেন, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৩১৬)

১৯৯. Sitaramyya,*The History of the Congress*,p.640-41.(উদ্ধৃত: হোসেন উদ্দীন হোসেন,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৩১৬-৭)

২০০. বিপানচন্দ্র ও অন্যান্য,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২১২

২০১. পিানচন্দ্র ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত*,পৃ.২১১

২০২. করাচি,পেশোয়ার, শোলাপুর,পাটনা ও মাদ্রাজ।

২০৩. হোসেন উদ্দীন হোসেন,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৩১৭

২০৪. মেজর জেনারেল এম এ মতিন, *প্রাগুক্ত*,পৃ.২২৮;হায়দার আকবর খান রনো,পলাশী থেকে মুক্তিযুদ্ধ,প্রথম খন্ড (মধ্যযুগ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত), পৃ.২৬২

২০৫. বিপানচন্দ্র ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত*,পৃ.২২০

২০৬. সুপ্রকাশ রায়,ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২৯৮-৩০২;হায়দার আকবর খান রনো, প্রাগুক্ত,পৃ. ১১৬

২০৭. গ্রামবাসীদের অধিকাংশই ছিলেন মুসলমান।

২০৮. বিচারের পর ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের ১২ জানুয়ারি তাঁর ফাসি হয়। তাঁর সহযোদ্ধারাও গ্রেফতার হন এবং তাদের দীর্ঘ মেয়াদী কারাদন্ড হয় বলে জানা যায়।(উদ্ধৃত: সুপ্রকাশ রায়, ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৯৪-৫)

২০৯. হোসেন উদ্দীন হোসেন, *প্রাগুক্ত,* পৃ.৩১৮

২১০. বিপানচন্দ্র ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত,*পৃ.১৯৫

২১১. ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখি বর্মন,*প্রাগুক্ত,* পৃ.১৫৮-৬০

২১২. বিপানচন্দ্র ও অন্যান্য,*প্রাগুক্ত,* পৃ.১৯৫; সুপ্রকাশ রায়,ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম, *প্রাগুক্ত,* পৃ.৩১৫।

২১৩. কালীচরণ ঘোষ,*জাগরণ ও বিস্ফোরণ (১৯০৮-১৯৪৭)*, দ্বিতীয় খন্ড, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেসন, কলকাতা, ২০১৭,পৃ.২৩৪-৫; শরিফুল ইসলাম ভূঁইয়া,*প্রাগুপ্ত,*পৃ.৪৩;খান মাহবুব, *টাঙ্গাইলের অজানা ইতিহাস*, রোদেলা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৩,পৃ.৪১৭-৯

২১৪. ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখি বর্মন,*প্রাগুক্ত,*পৃ.১৫৭-৮

২১৫. সুপ্রকাশ রায়,ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম,*প্রাগুক্ত,*পৃ. ২৮৪

২১৬. কিন্তু ব্রিটিশ বিরোধী কর্মকান্ডের অভিযোগে সরকার হেমচন্দ্রকে ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের ২৯ সেপ্টেম্বর পুণরায় বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স'র আওতায় গ্রেফতার করে। কলকাতা, প্রেসিডেন্সি জেল, বক্সাদূর্গ, দেউলী বন্দি শিবির ইত্যাদি স্থানে আটক রাখে। দীর্ঘ ০৭ বছর পরে ১৯৩৮খ্রিস্টাব্দের ৩০সেপ্টেম্বর মুক্তি লাভ করেন।(উদ্ধৃত:ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়, *ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব*,র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন,কলকাতা,২০১৬,পৃ.২৪৪-৫

২১৭. বিপানচন্দ্র ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত,*পৃ.২২০।

২১৮. তবে কখনো কখনো তিনি সমাজতন্ত্রের কথা বললেও স্বাধীনতা লাভের পূর্বে জমিদার ও কৃষকের সংঘর্ষ তথা আভ্যন্তরীণ শ্রেণি সংগ্রামকে তিনি ক্ষতিকর বলে মনে করতেন। (উদ্ধৃত: হায়দার আকবর খান রনো, *প্রাগুক্ত,*পৃ.১৩৬) ২১৯. বিপানচন্দ্র ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত,*পৃ.৩৫৮

২২০. ইংরেজ সরকার কেন্দ্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করলে এর বিরুদ্ধে সমগ্র দেশের মধ্যে এক ব্যাপক আন্দোলন দেখা দেয়।কমিউনিস্ট,সমাজতন্ত্রী ও অন্যান্য বামপন্থিদের নেতৃত্বে শ্রমিক কৃষকগণ এই শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে পূর্বেই আন্দোলন আরম্ভ করেছিল;যা ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠছিল। এমতাবস্থায় ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে হরিপুরায় কংগ্রেসের অধিবেশনে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র সরাসরি নাকচ করে ইহাকে বাধা দিবার জন্য সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হয়।এই প্রস্তাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা সম্পর্কে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সাথে আপস-মীমাংসার কোন সুযোগ না থাকিলেও এর বিরুদ্ধে কোন কোন কর্মপন্থা স্থির হয়নি। প্রস্তাবের এই দূর্বলতা লক্ষ্য করেই ব্রিটিশ শাসকগণ ধরে নেয় যে,এটি কংগ্রেসের একটি কৌশল মাত্র;এবং কংগ্রেস প্রাদেশিক শাসনতন্ত্রের ক্ষেত্রে যেমন বিরোধিতা করেও শেষ তা গ্রহণ করে নেয়,তদ্রুপ যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনাটিও কংগ্রেস শেষপর্যন্ত গ্রহণ করবে। ব্রিটিশ শাসকদের ধারণা একেবারেই ভিত্তিহীন ছিল না। কংগ্রেসের আপোষপন্থি অংশ ইতোমধ্যে সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠীর সাথে আলাপ-আলোচনা শুরু করেছেন মর্মে চাদিকে জোরগুজব উঠে। (উদ্ধৃত: সুপ্রকাশ রায়, ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম (১৮৯৩-১৯৪৭), *প্রাগুক্ত,* পৃ.৩৬৭-৮)

২২১. সুপ্রকাশ রায়,ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম (১৮৯৩-১৯৪৭), *প্রাগুক্ত,*পৃ.৩৭০

২২২. (ক) কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রে কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলার প্রবর্তন;(খ)কংগ্রেস মন্ত্রীদের সম্পর্কে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অধিকার বিশেষভাবে খর্ব করা হয়;(গ) এবং কংগ্রেসের উচ্চ নেতৃত্বের সম্মতি ব্যতীত কংগ্রেস কর্মীদের শ্রমিক-কৃষকের আন্দোলন,নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ প্রভৃতি সংগ্রামে যোগদান নিষিদ্ধ করা হয়।

২২৩. সুপ্রকাশ রায়, ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম (১৮৯৩-১৯৪৭), *প্রাগুক্ত,* পৃ.৩৭০

২২৪. বিপানচন্দ্র ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত,* পৃ.৩৫৮

২২৫. বিপানচন্দ্র ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত,* পৃ.৩৫৯-৬০

২২৬. সুপ্রকাশ রায়, ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম (১৮৯৩-১৯৪৭), *প্রাগুক্ত,*পৃ.৩৭১-৭২

২২৭. হোসেন উদ্দীন হোসেন, *প্রাগুক্ত,* পৃ.৪২১

২২৮. নলিনী কিশোর গুহ, বাংলায় বিপ্লববাদ,*প্রাগুক্ত,* পৃ.২৭০

২২৯. নলিনী কিশোর গুহ, বাংলায় বিপ্লববাদ,প্রাগুক্ত, পৃ.২৭০

২৩০. সাক্ষাৎকার: বুলবুল খান মাহবুব, ভাষা সৈনিক, মুক্তিযোদ্ধা ও কবি, তারিখ;১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ।

২৩১. বিশ্বনাধ গঙ্গোপাধ্যায়, *প্রাগুপ্ত,* পৃ.৮৬; কামাক্ষানাথ সেন,ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন ও টাঙ্গাইল, মুহম্মদ বাকের (সম্পা.), *প্রাগুপ্ত,* পৃ.৩৬০; নলিনীকিশোর গুহ, *প্রাগুক্ত,* পৃ.২৭৬

২৩২. মোহাম্মদ মতিওর রহমান,বাংলা একাডেমী ঐতিহাসিক অভিধান,ঢাকা,১৯৮৬,পৃ.৩০৭

২৩৩. নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে স্বাধীনতার জন্য দেশ ত্যাগের পরামর্শ এবং মাওলানা মুহাম্মদ জিয়াউদ্দীন নামটি মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধি দিয়েছিলেন। বিপ্লবী মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধিকে যখন ভারত থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল তখন তিনি জার্মানি,জাপান,ফ্রঠহু,কাবুল প্রভৃতি স্থানে এমনভাবে সংগঠন প্রতিষ্ঠা এবং কুটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে এসছিলেন যাতে পরবর্তীকালে প্রতিনিধি হিসেবে অন্যের যাওয়া সহজ হয়। তিনি সেই সকল দেশে শিষ্য ও বন্ধু সৃষ্টি করে এসেছিলেন। সেখানে যাদের সাথে আলাপ ও প্রতিশ্রুতি আদায় করেছিলেন তাঁরা বেশিরভাগই ছিলেন সেই সকল দেশের রাজনৈতিক নেতা ও প্রশাসনিক কর্মী। (উদ্ধৃত: এম. গোলাম মোস্তফা ভূঁইয়া, *নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু: বীর বিপ্লবী* ,আগামী নিউজ,ঢাকা,৩১জানুয়ারি,২০২৩;ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত রায়, ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব, র‍্যাডিক্যাল ইমপ্রেশন, কলকাতা,২০১৩,পৃ.১৩০; মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ,মওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধীঃ জীবন ও কর্ম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৯২,পৃ.২৫

২৩৪. নলিনীকিশোর গুহ,*প্রাগুক্ত*, পৃ.২৭০-৭১

২৩৫. কালীচরণ ঘোষ, জাগরণ ও বিস্ফোরণ (১৯০৮-১৯৪৭), দ্বিতীয় খন্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩৫০

২৩৬. কালীচরণ ঘোষ, জাগরণ ও বিস্ফোরণ (১৯০৮-১৯৪৭), দ্বিতীয় খন্ড,*প্রাগুপ্ত*, পৃ.৩৫১;ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখী বর্মণ, *প্রাগুপ্ত*, পৃ.২৬৮; নলিনীকিশোর গুহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৭১

২৩৭. কালীচরণ ঘোষ, জাগরণ ও বিস্ফোরণ (১৯০৮-১৯৪৭), দ্বিতীয় খন্ড, পৃ.৩৫১; হায়দার আকবর খান রনো, পলাশী থেকে মুক্তিযুদ্ধ, প্রথম খন্ড (মধ্য যুগ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত), পৃ.১১৯

২৩৮. এ কনফারেন্সে বার্মা,থাইল্যান্ড,মালয়,জাভা,বোনিয়া মাঞ্চুকুয়ো,হংকং ও জাপানে অবস্থানরত ভারতীয়দের শতাধিক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সেখানে বলা হয় এশিয়া পর্যন্ত ব্রিটিশের রণক্ষেত্র বিস্তারলাভ করায় ভারতের স্বাধীনতা লাভের পথ সুগম হয়েছে। ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগ অবিলম্বে নিজ সেনা দল গঠন করবে। এবং সংগ্রামে মিত্র শক্তি জাপানের পাশে যুদ্ধ করবে। রাসবিহারী বসুকে *কর্মনির্দেশ সমিতির* (Council of Action) প্রধান করা হয়। এ বিভাগ যেন সম্পূর্ণরূপে ভারতীয়দের দ্বারা পরিচালিত হয় আলোনায় তা গুরুত্ব পায়। ব্রিটিশ থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত সমগ্র এলাকা ও ভারতীয়দের পরিত্যক্ত সম্পত্তি কর্মনির্দেশ সমিতি'র নিয়ন্ত্রণে আনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।এবং জাপান সরকারকে সকল ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করা হয়। (উদ্ধৃত: কালীচরণ ঘোষ,জাগরণ ও বিস্ফোরণ (১৯০৮-১৯৪৭), দ্বিতীয় খন্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩৫১-৫২)

২৩৯. কালীচরণ ঘোষ,জাগরণ ও বিস্ফোরণ(১৯০৮-১৯৪৭),দ্বিতীয় খন্ড,পৃ.৩৫২-৫৩;বিজনবিহারী বসু, কর্মবীর রাসবিহারী, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৫৬

২৪০. কালীচরণ ঘোষ,জাগরণ ও বিস্ফোরণ(১৯০৮-১৯৪৭),দ্বিতীয় খন্ড,পৃ.৩৫২-৫৩

২৪১. বিপান চন্দ্র ও অন্যান্য,ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ১৮৫৭-১৯৪৭,পৃ.৩৭৭

২৪২. নেতাজি এদের মধ্য হতে ডা.পবিত্র রায়কে ভারতে পাঠালে কয়েকজন বিপ্লবীসহ ধৃতহয়ে প্রাণদন্ডে দন্ডিত হন। ডা.পবিত্র রায় আলিপুর সেন্ট্রাল জেল থেকে অনুশীলন নেতা প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলির নিকট পত্র যোগাযোগ করেছিলেন বলে উল্লেখ রয়েছে। (উদ্ধৃত: ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, জেলে ত্রিশ বছর ও পাকভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৫০-৫১)

২৪৩. রাসবিহারী বসু সিঙ্গাপুরে ফিরে ২ জুলাই নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর আগমনবার্তা ঘোষণা করেন।(উদ্ধৃত: বিজনবিহারী বসু,কর্মবীর রাসবিহারী,পৃ.১৫৮)

২৪৪. কালীচরণ ঘোষ, জাগরণ ও বিস্ফোরণ (১৯০৮-১৯৪৭),দ্বিতীয় খন্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩৫২

২৪৫. বিজনবিহারী বসু,কর্মবীর রাসবিহারী, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৫৮

২৪৬. এম.জি.মুলকর, আজাদী সৈনিকের ডায়েরি, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৭

২৪৭. এটি রাসবিহারী প্রতিষ্ঠিত ভারতের জাতীয় বাহিনীর (Indian National Army) হিন্দি নাম। এ সম্পর্কে জানা যায় পূর্ববর্তী *ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর* (INA=Indian National Army) দ্বিতীয় পর্যায়ে সুভাষচন্দ্র বসু কর্তৃক সংস্কার ও সমন্বয় সাধন করলে এ বাহিনী আজাদ হিন্দ ফৌজ নামে পরিচিতি লাভ করে। অর্থাৎ পুনর্গঠিত ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর নাম হিন্দিতে *আজাদ হিন্দ ফৌজ* (Azad Hind Fauj) হলেও ইংরেজিতে তার পূর্বনাম *আইএনএ* (INA=Indian National Army) বহাল থাকে।

২৪৮. কালীচরণ ঘোষ, জাগরণ ও বিস্ফোরণ (১৯০৮-১৯৪৭), দ্বিতীয় খন্ড,পৃ.৩৫৩

২৪৯. বিপান চন্দ্র ও অন্যান্য,ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ১৮৫৭-১৯৪৭,পৃ.৩৭৭

২৫০. কালীচরণ ঘোষ, জাগরণ ও বিস্ফোরণ(১৯০৮-১৯৪৭),দ্বিতীয় খন্ড,পৃ.৩৫৩

২৫১. বিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায়,ভারতের সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রাম,পৃ.৮৭

২৫২. কালীচরণ ঘোষ, জাগরণ ও বিস্ফোরণ(১৯০৮-১৯৪৭), দ্বিতীয় খন্ড,পৃ.৩৫৩

২৫৩. বিপান চন্দ্র ও অন্যান্য, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ১৮৫৭-১৯৪৭,পৃ.৩৭৭

২৫৪. এম.জি.মুলকর,আজাদী সৈনিকের ডায়েরি,পৃ.৫৬-৫৭

২৫৫. এম.জি.মুলকর,আজাদী সৈনিকের ডায়েরি,পৃ.৬২-৬৩

২৫৬. এম.জি.মুলকর,আজাদী সৈনিকের ডায়েরি,পৃ.৫৬-৫৭

২৫৭. এম.জি.মুলকর,আজাদী সৈনিকের ডায়েরি,পৃ.৬২-৬৩

২৫৮. উল্লেখ্য ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের ৬ ও ৯ আগস্ট জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে আমেরিকা এটম বোমা ফেলে। (উদ্ধৃত: হায়দার আকবর খান রনো,পলাশী থেকে মুক্তিযুদ্ধ, প্রথম খন্ড (মধ্য যুগ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত),পৃ.১২০-২১

২৫৯. হায়দার আকবর খান রনো,পলাশী থেকে মুক্তিযুদ্ধ,প্রথম খন্ড(মধ্য যুগ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত),পৃ.১২০-২১

২৬০. নারায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়,বিপ্লবের সন্ধ্যানে,পৃ.৩৩৬-৩৭

২৬১. শরিফুল ইসলাম ভূঁইয়া,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৪৭-৮

২৬২. কংকর সিংহ,*সাম্প্রদায়িকতা ও সংখ্যালঘু সঙ্কট*,অনন্যা প্রকাশনী,ঢাকা,১৯৯৭,পৃ.২৯

২৬৩. S.S pirzada, The Foundation of Pakistan, Vols II,1924-1947, National Publishing House Ltd., karachi,1970. p.341; Muin-Uddin Ahmed Khan, Muslims Struggle for freedom in Bengal, Islamic Foundation, Bangladesh, 1960, pp.124-25.

২৬৪. কামরুদ্দিন আহমদ,*বাংলার মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশ*,স্টুডেন্ট পাবলিকেশন্স,ঢাকা,১৩৮২ (বাং), পৃ.৪৮

২৬৫. Mohammad Seraj Mannan, *The Muslim Political Parties in Bengal(1936-1947),*Islamic Foundation,Bangladesh,1987,p.36.

২৬৬. বিপান চন্দ্র ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৩৬৩

২৬৭. Mohammad Seraj Mannan, *op.cit.,*p.37.

২৬৮. মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক,*ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন*,বাংলা একাডেমী, ১৯৬৩,পৃ.২৩২-৩৩

২৬৯. Shila Sen, *Muslim Politics in Bengal,1937-194),*Impex, India,1976,pp.133-34.

২৭০. আবুল মুনসুর আহমেদ,*আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*,নওরোজ কিতাবিস্তান,ঢাকা,১৯৭৫,পৃ.২৩২-৩৩

২৭১. কিরণচন্দ্র চৌধুরী,*ভারতের ইতিহাস কথা*,*২য় খন্ড*,মর্ডান বুক এজেন্সি প্রাইভেট লি.,কলকাতা,১৯৭৯, পৃ.৩৫৫; মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২৪৭

২৭২. লন্ডনের রাজ প্রাসাদের ওপর বোমা পড়বে, একথা ভাবতেও আমার কষ্ট হচ্ছে।';'আমার সেবার ফলে ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থেকে সমান মর্যাদা লাভ করবে। (উদ্ধৃত: বিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ভারতের সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৬)

২৭৩. ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, জেলে ত্রিশ বছর ও পাকভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৩৮

২৭৪. বিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায়,ভারতের সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রাম, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৭৬

২৭৫. ইয়াসমীন আহমেদ,উপমহাদেশের রাজনীতি ও স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব,*প্রাগুপ্ত*,পৃ.১৭১

২৭৬. বিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায়,ভারতের সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রাম, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৭৬

২৭৭. হোসেন উদ্দীন হোসেন,*প্রাগুক্ত*, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৪২৫-৬

২৭৮. হোসেন উদ্দীন হোসেন,*প্রাগুক্ত*, পৃ.৪২৬

২৭৯. শেখ ফজলুল করিম সেলিম,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৩৯৯

২৮০. বিপানচন্দ্র ও অন্যান্য,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৩৭৩

২৮১. আহমদ রফিক,দেশ বিভাগ ফিরে দেখা,*প্রাগুক্ত*, পৃ.১৪৯

২৮২. সুপ্রকাশ রায়,ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম (১৮৯৩-১৯৪৭), প্রাগুক্ত,পৃ.৪০৯

২৮৩. নারায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়,বিপ্লবের সন্ধ্যানে,পৃ.৩৬৫;জীতেশচন্দ্র লাহিড়ী, নমামী, পৃ.১৫৩

২৮৪. মো.আনোয়ার হোসেন, *বৃহত্তর যশোর জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, গতিধারা, ঢাকা,২০১০,পৃ.৭১

২৮৫. ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখী বর্মণ, *প্রাগুপ্ত*, পৃ.২৮৭

২৮৬. বিপান চন্দ্র ও অন্যান্য,ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ১৮৫৭-১৯৪৭,পৃ.৩৮১;হায়দার আকবর খান রনো,পলাশী থেকে মুক্তিযুদ্ধ, প্রথম খন্ড (মধ্য যুগ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত),পৃ.১২০

২৮৭. হায়দার আকবর খান রনো,পলাশী থেকে মুক্তিযুদ্ধ,প্রথম খন্ড(মধ্য যুগ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত),পৃ.১২১

২৮৮. বিপান চন্দ্র ও অন্যান্য,ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ১৮৫৭-১৯৪৭,পৃ.৩৮১

২৮৯. হায়দার আকবর খান রনো,পলাশী থেকে মুক্তিযুদ্ধ,প্রথম খন্ড (মধ্য যুগ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত), *প্রাগুক্ত*, পৃ.১২১;

বিপান চন্দ্র ও অন্যান্য,ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ১৮৫৭-১৯৪৭, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৩৮১

২৯০. সুপ্রকাশ রায়,ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম(১৮৯৩-১৯৪৭),প্রাগুক্ত,পৃ.৪১০

২৯১. হায়দার আকবর খান রনো, পলাশী থেকে মুক্তিযুদ্ধ, প্রথম খন্ড(মধ্য যুগ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত), *প্রাগুক্ত,পৃ.১২১*

২৯২. সুপ্রকাশ রায়,ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম(১৮৯৩-১৯৪৭),প্রাগুক্ত,পৃ.৪১০

২৯৩. দিল্লী, লাহোর,বোম্বাই,এলাহাবাদ ও মাদ্রাজেও আন্দোলন হয়। ৪৬ জনের প্রাণহানি ঘটে।(উদ্ধৃত: হায়দার আকবর খান রনো,*প্রাগুক্ত,* পৃ.১২২)

২৯৪. সুপ্রকাশ রায়,ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম (১৮৯৩-১৯৪৭), *প্রাগুক্ত,*পৃ.৪১০

২৯৫. হায়দার আকবর খান রনো, *প্রাগুক্ত,* পৃ.১২২

২৯৬. হায়দার আকবর খান রনো, *প্রাগুক্ত,* পৃ.১২২-২৩

২৯৭. হায়দার আকবর খান রনো,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১২৩;সুপ্রকাশ রায়,ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম(১৮৯৩-১৯৪৭), *প্রাগুক্ত*,পৃ.৪১০

২৯৮. শৃঙ্খলিতভাবে এ বিদ্রোহ পরিচালনার জন্য নেতৃস্থানীয়দের সমন্বয়ে একটি কমিটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল।

২৯৯. প্রকাশ থাকে যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ফরাসি কলোনী ইন্দোচীন (ভিয়েতনাম,লাওস ও কম্বোডিয়া),ডাচ (ওলন্দাজ) ও ইন্দোনেশিয়া জাপানের দখলে চলে যায়। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে জাপান পরাজিত হলে এই দেশগুলো স্বাধীনতা ঘোষণা করে। কিন্তু ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা স্বাধীনতা অস্বীকার করে কলোনী বজায় রাখার প্রত্যয়ে এ অঞ্চলে সৈন্য সমাবেশ করে। এজন্য সাম্রাজ্যবাদ বিরোধি ভারতীয় জনতা তীব্র প্রতিবাদ জানায়। ইন্দোনেশিয়াতে সৈন্যদের জন্য অস্ত্রশস্ত্র ও খাদ্যবোজাই জাহাজ পাঠানো হচ্ছিল কিন্তু কলকাতার ডকশ্রমিকরা তাতে মাল তুলতে অস্বীকৃত হয়। ধর্মঘটি নাবিকদের অন্যান্য দাবির মধ্যে ছিল: ১.ধর্মঘটিদের গ্রেফতার ও দন্ডাদেশ দেওয়া চলবে না; (২) ব্রিটিশ সেনাদের সমান ভাতা ও খাদ্য ভারতীয় সেনাদের দিতে হবে; (৩) ইন্দোনেশিয়া থেকে সকল ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার করতে হবে; (৪) আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচার বন্ধ করতে হবে; ৫.তলোয়ার জাহাজে যে ব্রিটিশ কর্মকর্তা ভারতীয়দের অপমান করেছিল তাকে বরখাস্ত করতে হবে। (উদ্ধৃত: হায়দার আকবর খান রনো,*প্রাগুক্ত*,পৃ. ১২৩-২৪)

৩০০. হায়দার আকবর খান রনো,*প্রাগুক্ত,* পৃ.১২৪

৩০১. বিপান চন্দ্র ও অন্যান্য,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৩৮৮

৩০২. সুপ্রকাশ রায়,ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম(১৮৯৩-১৯৪৭), *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৪১০-১১

৩০৩. বিপান চন্দ্র ও অন্যান্য,প্রাগুক্ত,পৃ.৩৮৮; হায়দার আকবর খান রনো,*প্রাগুক্ত,* পৃ.১২৪

৩০৪. বিপান চট্টোপাধ্যায়,ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ,পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা,১৯৮৫.পৃ.৪৭২

৩০৫. আহমদ রফিক,দেশ বিভাগ ফিরে দেখা,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৩০০-০১; কৃষ্ণধর,*ভারতের মুক্তি সংগ্রামে বাংলা*,তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ,পশ্চিমবঙ্গ সরকার,কলকাতা,১৯৭৭,পৃ.১০০।

৩০৬. আহমদ রফিক,দেশ বিভাগ ফিরে দেখা,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৩০১।

৩০৭. বিপান চন্দ্র ও অন্যান্য,প্রাগুক্ত,পৃ.৩৮৯;সুপ্রকাশ রায়,ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম (১৮৯৩-১৯৪৭),*প্রাগুক্ত*,পৃ.৪১১

৩০৮. সুপ্রকাশ রায়,ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম(১৮৯৩-১৯৪৭),*প্রাগুক্ত*,পৃ.৪১১

৩০৯. Rajani Palme Dutta, *India Today,* Bombay,1959,p.542.

৩১০. সুপ্রকাশ রায়,ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম(১৮৯৩-১৯৪৭),*প্রাগুক্ত*,পৃ.৪১০

৩১১. ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখী বর্মণ,*প্রাগুপ্ত*,পৃ.২৮৮

৩১২. Kazi Anwarul Haqe,*Inquest of Freedom,*The University Press Limited,Dhaka,1991,p.67; Mohammad Seraj Mannan, *op.cit.,*p.42;*Liakat Ali khan,Resulation of all India Muslim Leauge 1944-1946,*pp.45-46.

৩১৩. Sarat Chandra Bose, *Commemoration Volume,* Sarat Bose Academy, Calcutta, 1992,pp.60-61.

৩১৪. Shila Sen,*Op.cit.,*p.207.

৩১৫. Hasan Zaheer, *The Separation of East Pakistan,*The University Press Limited, Dhaka,1994, pp.9-10.

৩১৬. Kamruddin Ahmed, *A Socio political History of Bengal and the Birth of Bangladesh,* Inside Library, Dhaka, 1975, p.68.

৩১৭. এম.এ. রহিম,*বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (১৭৫৭-১৯৪৭)*,আহমদ পাবলিশিং হাউস,ঢাকা,২০১৭,পৃ.২৩৬।

৩১৮. ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখী বর্মণ,*প্রাগুপ্ত*,পৃ.২৮৮

৩১৯. এম.এ.রহিম,*প্রাগুক্ত*, পৃ.২৩৬;ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখী বর্মণ,*প্রাগুপ্ত*,পৃ.২৮৮

৩২০. ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখী বর্মণ,*প্রাগুপ্ত*,পৃ.২৮৮

৩২১. ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখী বর্মণ,*প্রাগুপ্ত*,পৃ.২৮৮

৩২২. এম.এ.রহিম,*প্রাগুক্ত*, পৃ.২৩৬

৩২৩. ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখী বর্মণ,*প্রাগুপ্ত*,পৃ.২৮৯

৩২৪. হায়দার আকবর খান রনো,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২৬৮

৩২৫. হায়দার আকবর খান রনো,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২৬৮;হারুন অর রশিদ,*বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০*, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০১, পৃ.১৩০-৩১

৩২৬. ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখী বর্মণ,*প্রাগুপ্ত*,পৃ.২৯২

৩২৭. ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখী বর্মণ,*প্রাগুপ্ত*, পৃ.২৯৩

৩২৮. ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখী বর্মণ,*প্রাগুপ্ত*,পৃ.২৯৩; এম.এ.রহিম,*প্রাগুক্ত*, পৃ.২৩৮-৩৯

৩২৯. মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, *ভারত স্বাধীন হল(অনুবাদ,সুভাষ মুখোপাধ্যায়)*,ওরিয়েন্ট লং ম্যান প্রা.লি., কলকাতা, ২০১৫, পৃ.১১৬

৩৩০. এম.এ.রহিম,*প্রাগুক্ত*, পৃ.২৩৯

৩৩১. কালীচরণ ঘোষ, জাগরণ ও বিস্ফোরণ (১৯০৮-১৯৪৭), দ্বিতীয় খন্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩৬১-৬২

৩৩২. শেখ মুজিবুর রহমান,*অসমাপ্ত আত্মজীবনী*,দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড,ঢাকা,২০১২,পৃ.৬৩

৩৩৩. এম.এ.রহিম, *প্রাগুক্ত*,পৃ.২৪০

৩৩৪. সুপ্রকাশ রায়,ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম (১৮৯৩-১৯৪৭), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১২

৩৩৫. কে.এম.রাইছউদ্দীন খান,*বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা(প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগ)*, খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানী, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ.৬৩৪

৩৩৬. মুহাম্মদ আবদুর রহীম ও অন্যান্য,*বাংলাদেশের ইতিহাস*,নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ.৫০৪

৩৩৭. শেখ মুজিবুর রহমান,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৬৬

৩৩৮. সুপ্রকাশ রায়,ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম (১৮৯৩-১৯৪৭), *প্রাগুক্ত*,পৃ. ৪১২

৩৩৯. এম.এ.রহিম,*প্রাগুক্ত*,পৃ. ২৪১

৩৪০. বিপানচন্দ্র ও অন্যান্য,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৩৯৭-৯৮

৩৪১. সুপ্রকাশ রায়, ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম (১৮৯৩-১৯৪৭), *প্রাগুক্ত*, পৃ.৪১৩

৩৪২. বিপানচন্দ্র ও অন্যান্য,*প্রাগুক্ত*, পৃ.৩৯৮

৩৪৩. এম.এ.রহিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৪৪

৩৪৪. ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখী বর্মণ,*প্রাগুপ্ত*, পৃ. ২৯৮

৩৪৫. কালীচরণ ঘোষ, জাগরণ ও বিস্ফোরণ (১৯০৮-১৯৪৭), দ্বিতীয় খন্ড, পৃ.৩৬৩

৩৪৬. ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখী বর্মণ,*প্রাগুপ্ত*, পৃ.২৯৮

৩৪৭. এম.এ.রহিম,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২৪৫

৩৪৮. ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখী বর্মণ, *প্রাগুপ্ত*, পৃ.২৯৮

৩৪৯. এম.এ.রহিম,*প্রাগুক্ত*, পৃ.২৪৫

৩৫০. ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখী বর্মণ, *প্রাগুপ্ত*, পৃ.২৯৮-৯৯

৩৫১. বিপানচন্দ্র ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৪০১

৩৫২. সুপ্রকাশ রায়,ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম (১৮৯৩-১৯৪৭), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১৩

৩৫৩. বিপানচন্দ্র ও অন্যান্য,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৪০১

৩৫৪. ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখী বর্মণ,*প্রাগুপ্ত*,পৃ.৩০০

৩৫৫. আহসানুল্লাহ, *অখন্ড বাংলার স্বপ্ন*, লায়ন পাবলিকেশান্স, ঢাকা,১৯৮৫, পৃ.১১৭

৩৫৬. মেজর জেনারেল এমএ মতিন,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৩৬১।

৩৫৭. Chitta Ranjan Misra, Bengal Schedul Caste Hindus on the Issue of the Partition of the Province(1947),Bangladesh Historical Studies,Vol.17,1996-98,pp.60-62.

৩৫৮. Hasan Zaheer, *op .cit.,* pp.11-12.

৩৫৯. *সিরাজুল ইসলাম(সম্পা.), বাংলাদেশের ইতিহাস,১ম খন্ড (১৭০৪-১৯৭১),* এশিয়াটিক সোসাইটি,ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৪০৯; মোঃ মাহবুবুর রহমান,*বাংলাদেশের ইতিহাস,১ম খন্ড(১৭০৪-১৯৭১),* সময় প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৯,পৃ.১৫

৩৬০. Hasan Zaheer,*op.cit*.,pp.11-12.

৩৬১. হায়দার আকবর খান রনো,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২৭২

৩৬২. ইয়াসমিন আহমেদ ও *রাখী বর্মণ, প্রাগুক্ত*, পৃ.৩০১

৩৬৩. হাসান আলী চৌধুরী,*ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস (মধ্য ও আধুনিক যুগ),* আইডিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা:১৯৯৩, পৃ.৬৭৫;*এম.এ.রহিম, প্রাগুক্ত*,পৃ.২৪৭।

৩৬৪. *সুপ্রকাশ রায়*,ভারতের জাতীয়তাবাদী জ্বপ্লবিক সংগ্রাম(১৮৯৩-১৯৪৭*), প্রাগুক্ত,* পৃ.৪১৩

৩৬৫. এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক উইল *ডুরান্ট'র* (Will Durant) মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ থেকেই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সূত্রপাত হয়েছে। (উদ্ধৃত: ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখি বর্মন, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৯)

৩৬৬. অমিত দেবনাথ,বাঘাজ্যোতিন,পৃ.৭৯;চিন্মোহন সেহানবিশ ও অন্যান্য, মুক্তির সংগ্রামে ভারত, পৃ.০৯

৩৬৭. অমিত দেবনাথ,বাঘাজ্যোতিন,পৃ.৭৯

৩৬৮. বিপানচন্দ্র ও অন্যান্য,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৪০;ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখি বর্মন,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৯৪

৩৬৯. সুপ্রকাশ রায়,ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৩৭

৩৭০. সুপ্রকাশ রায়,ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৩৮

৩৭১. A.R.Desai,Social Background of Indian Nationalism, *op.cit.*,p.144.

৩৭২.. A.R.Desai,Social Background of Indian Nationalism, *op.cit.*, p.144.

৩৭৩. আবদুল বাছির,*বাংলার কৃষক বিদ্রোহ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণি,* বাংলা একাডেমী,ঢাকা,২০১২,পৃ.১৯৬

৩৭৪. মিহির আচার্য,*বাঙালী বুদ্ধিজীবী মানস ও সমাজ ভাবনা*,লেখক সমাবেশ, কলকাতা, ১৯৩৫,পৃ.১০

চতুর্থ অধ্যায়

বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণি ও বিপ্লব প্রচেষ্টার ক্রমধারা

সাধারণত সমাজের শিক্ষিত ও মননশীল ব্যক্তিবর্গ যেমন শিক্ষক, সাংবাদিক, চাকরিজীবী, আইনজীবী, প্রকৌশলী, চিকিৎসক প্রমুখ পেশাজীবী, বুদ্ধিজীবী ও শিল্পীগোষ্ঠীর সমন্বিত রূপই মধ্যবিত্ত শ্রেণির পরিচায়ক। তবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যিক প্রতিনিধি *লর্ড কর্নওয়ালিশ* (Lord Cornwallis) ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে যে জমিদারশ্রেণি সৃষ্টি করেছিলেন; সে জমিদারশ্রেণি তাদের সহকারী হিসেবে এ মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে গড়ে তোলে। কলকাতাকে কেন্দ্র করেই এই মধ্যবিত্ত শ্রেণি বিকশিত হয়। এদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সুপ্রকাশ রায় উল্লেখ করেছেন, নতুন জমিদার গোষ্ঠী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণি ভূসম্পত্তির একচ্ছত্র অধিকার বলে ব্রিটিশ শাসনের রক্ষণাবেক্ষণে থেকে সমাজের শীর্ষস্থানে আরোহন এবং সামাজিক নেতৃত্বলাভের জন্য উন্মুখ হয়ে উঠে। উন্নত ইউরোপীয় শিক্ষা ও সভ্যতা তাদেরকে সামাজিক নেতৃত্বলাভের সংগ্রামে বিশেষভাবে সহায়তা করে। এই সামাজিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ইউরোপীয় শিক্ষা ও সভ্যতার প্রেরণায় একত্রে ইউরোপীয় *রিনাসান্স'র* (Renaissance) অনুকরণে তাঁরা উনিশ শতকের গোড়ার দিকে প্রথমে বাংলায় এবং পরে সমগ্রভারতে *রিনাসান্স* বা নবজাগরণ আন্দোলন আরম্ভ করে। এই আন্দোলন কেবলমাত্র জমিদার এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণির নিজ স্বার্থে পরিচালিত হয়েছিল বলে আন্দোলন চলাকালীন শোষিত কৃষক-সম্প্রদায়কে প্রথম থেকেই তারা বর্জন করে চলে। এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে এই আন্দোলনকারীরা কৃষক-সংগ্রামের বিরোধীতা করতেও কুণ্ঠিত হয় নাই।[১] নবজাগরণের এই পুরোধা ব্যক্তিবর্গ ভারতে ইংরেজ শাসনকে বিধাতার আর্শীবাদ জ্ঞান করেন এবং সর্বাবস্থায় তাদের সহায়ক শক্তি হিসেবে নিজেদের ভাগ্য গড়বার প্রচেষ্টা চালান। নবজাগরণের প্রভাবে তাদের মধ্যে নানান অধিকার এবং অধিক সচেতনতাবোধ জাগরিত হয়। ক্রমে তারা অধিকার আদায়ে তৎপরতা চালায় এবং বিভিন্ন সংগঠন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জনমত সংগঠিত করতে থাকে। এই ধারাবাহিকতায় মধ্যবিত্ত শ্রেণির নেতৃত্বে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কংগ্রেস আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে বিভিন্ন দাবি-দাওয়া আদায়ের প্রচেষ্টা চালায়।

ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাসে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে ব্রিটিশ বিরোধিতার সূত্রপাত এক যুগান্তকারী ঘটনা। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহ তথা প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের পর হতে এই ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয় আন্দোলনের সূচনা হয়। আন্দোলনের সে পথ-পরিক্রমায় ১৮৮৫খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা ইংরেজ শাসনের অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক শোষণ-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে ভারতের নবজাত ধনিকশ্রেণি ও উন্নত পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াসেরই

অনিবার্য পরিণতি। ইংরেজ-রাজ ভারতবর্ষে যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিল তার ভিতর হতেই এই শ্রেণি দু'টির জন্ম। কিন্তু জন্মের পর হতেই বিদেশি ইংরেজ রাজের কায়েমি স্বার্থের সাথে তাদের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠে।[২]

সর্বোপরি ১৮৮৫ থেকে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কংগ্রেসের আন্দোলনের প্রধান বিষয় ছিল ভারতীয়দের উচ্চপদে নিয়োগ প্রদান এবং প্রশাসনে ভারতীয়দের দাবি সুপ্রতিষ্ঠিত করা। কিন্তু ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে *বাংলা ভাগের* (Partition of Bengal) সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে কংগ্রেসের বিপ্লবপন্থি নেতাগণ মাথাচারা দিয়ে উঠে। প্রতিক্রিয়া স্বরূপ অরবিন্দ ঘোষ,লালালাজপাত রায়, বালগঙ্গাধর তিলক, প্রমুখ বিপ্লবপন্থি নেতৃবৃন্দ আনুগত্য রাজনীতির পরিবর্তে আন্দোলন, বয়কটসহ বৈপ্লবিক আন্দোলনের উপর গুরুত্ব প্রদান করেন। তাঁরা ভারতীয় সংস্কৃতি বিশেষ করে হিন্দুধর্মের অতীত গৌরবের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। ফলে বিপ্লবপন্থি কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের আন্দোলন ভারতীয় মুসলমানদের মনে সন্দেহের সৃষ্টি করে। অবশ্য বাংলা বিভাজনের এই ঘটনা বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটায়। বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিপ্লবপন্থি হিন্দু নেতাদের এই আন্দোলন দ্রুত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। ক্রমে এই আন্দোলন সকল শ্রেণি ও পেশার লোকের মধ্যে সম্প্রসারিত হয়।[৩]

১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হলে শীঘ্রই মধ্যবিত্ত শ্রেণি দলটিতে যোগদান করে আবেদন নিবেদনের মাধ্যমে তাদের দাবি দাওয়া আদায়ের প্রচেষ্টা চালায়। ক্রমে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের বাংলা বিভাগকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে শুরু করে;পরবর্তীতে যা স্বদেশি আন্দোলনে পর্যবসিত হয়।[৪] এই আন্দোলনের কৌশল নিয়ে কংগ্রেসে নরমপন্থি ও বিপ্লবপন্থি দুটি উপদলের সৃষ্টি হয়। নরমপন্থি নেতৃবৃন্দ আবেদন নিবেদনের মাধ্যমেই দাবি দাওয়া আদায়কেই শ্রেয় মনে করেন। কিন্তু এই আবেদন নিবেদনে আস্থাহীন বিপ্লবপন্থিগণ সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের দাবি করে।[৫] কংগ্রেসের এ বিপ্লবপন্থি অংশ ইতোপূর্বে প্রতিষ্ঠিত অনুশীলন সমিতির মাধ্যমে সংগঠিত হতে থাকে। ক্রমে কংগ্রেসের বিপ্লবপন্থি অংশ অনুশীলন সমিতির সাথে মিশে যায়। তাঁরা স্বাধীনতার দাবিতে সশস্ত্র বৈপ্লবিক তৎপরতা শুরুকরে। একপর্যায়ে যুগান্তর গোষ্ঠীর আত্মপ্রকাশ ঘটে। বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত এই অনুশীলন ও যুগান্তর গোষ্ঠী স্বাধীনতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে সশস্ত্র বৈপ্লবিক পন্থায় সমগ্র ভারতকে স্বাধীন করার ব্রত নিয়ে তাঁরা মাঠে নেমে পড়ে।

বিপ্লব-ধারণা

বিপ্লবের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Revolution' শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ *'Revolutio'* থেকে। শব্দটির ইংরেজি অর্থ– 'a turnd around' বলতে বুঝায়,রাজনৈতিক ক্ষমতা বা প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে একটি মৌলিক সামাজিক পরিবর্তন যা তুলনামূলকভাবে সংক্ষিপ্ত সময়ে ঘটে; জনগণ যখন চলমান কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে জেগে উঠে।[৬] এসম্পর্কে বিপ্লবী হেমচন্দ্র কানুনগো তাঁর বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, ইংরেজি 'Revolution' শব্দটির মাধ্যমে বাংলায় বিপ্লব বা বৈপ্লবিক কার্যক্রমকে চিহ্নিত করা হয়। ইতিহাসে 'Revolution' শব্দটি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। কোনো দেশের শাসন-প্রণালী যদি হঠাৎ কোন *ভীষণ* (Voilent) উপায়ে আমূল পরিবর্তিত হয়, যদি সেই পরিবর্তন সে দেশের জনসাধারণের সাহায্যে বা চেষ্টায় সাধিত হয়। যদি পরিবর্তিত শাসন কার্যে সে দেশের জনসাধারণের সম্যক অধিকার লাভ হয়; তবে সেই পরিবর্তনকে *বিপ্লব* (Revolution) বলা হয়ে থাকে। কিন্তু বিপ্লবের চেষ্টা জনিত সংঘর্ষের পরিণামে যদি ওই প্রকার পরিবর্তন সাধিত না হয়, তবে কেবল পরিবর্তন আনবার চেষ্টাকে *বিপ্লব* (Revolution) বলা যায় না। আর এই চেষ্টার ফলে শাসন প্রণালীর কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন সাধিত না হয়ে যদি কেবলমাত্র শাসনকর্তার পরিবর্তন ঘটে; তবে সে অবস্থাকেও *বিপ্লব* (Revolution) নামে অভিহিত করা যাবেনা।[৭]

পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো পরাধীন জাতির মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস প্রত্যক্ষ করলে এটা লক্ষ্য করা যায় যে, কোথাও শুধুমাত্র বৈধ ও নিয়মতান্ত্রিকতার সরলপথ ধরে অগ্রসর হওয়ার ইতিহাস বিরল। ঘটনার অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে নব-নব চিন্তাধারা আবির্ভূত হলে তদানুযায়ী কর্মপন্থাও গৃহীত হয়ে থাকে। সাধারণত অহিংস বা নিয়মতান্ত্রিক পথ ধরে মুক্তিসংগ্রাম শুরু হলেও সময়ের যাত্রাপথে সংগ্রামের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবে সশস্ত্র বৈপ্লবিক র্কমনীতি গ্রহণ করতে দেখা যায়।[৮] একই নিয়ম অনুসরণ করে পৃথিবীর সকল বিপ্লব সংগঠিত হয়নি। সাধারণত কোন দেশে বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার পূর্বে সর্বপ্রথম সে দেশের স্থান, কাল ও প্রয়োজন উপযোগী বিপ্লবী দর্শনের বিকাশ ঘটে। সর্বাগ্রে মনীষী ও বিপ্লবীদের মানসিক বিপ্লব ঘটে। তারা বিভিন্ন দেশের বৈপ্লবিক ইতিহাসের নতুন নতুন চিন্তাধারা বয়ে আনেন এবং পরাধীনতার বন্ধন ছিন্ন করতে দেশের জনসাধারণ ও বিপ্লবীদেরকে উদ্বুদ্ধ করণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।[৯]

আমাদের জানামতে,১৬৮৮ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডের বিপ্লব স্বৈরতন্ত্রের ধ্বংসস্তুপের ওপর সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। ১৭৫৭ থেকে ১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মার্কিনবাসী এই দীর্ঘ স্বাধীনতা যুদ্ধের পর আমেরিকার সাধারণতন্ত্রী সরকার প্রতিষ্ঠা করে।[১০] ইংল্যান্ড ও আমেরিকার সফল বিপ্লবের দৃষ্টান্তই ফরাসিদের

সবচাইতে বেশি অনুপ্রাণিত করেছিল। ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে তারা স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রকে সশস্ত্র রক্তক্ষরা বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের প্রবল বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে যায়। ফরাসি বিপ্লব কেবল স্বৈরাচারী রাজার একাধিপত্যের বিরুদ্ধেই সংঘটিত হয়নি। বরং অভিজাতবর্গ ও পাদ্রিবর্গের অধিকাংশ যারা অতি দরিদ্র কৃষকদের কাছ থেকে প্রচুর কর আদায় করতো; তাদের বিরুদ্ধেও সংঘটিত হয়েছিল।[১১] কৃষকরা রাজাকে তো কর দিচ্ছিলই, তার ওপর এদের কর আদায়ের ফলে তারা একেবারে নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছিল। এই দরিদ্র কৃষকদের সঙ্গে শহরের কিছু সংখ্যক *শিল্পপতি* (Industrialist) শ্রেণির মানুষও, যদিও তাঁদের আর্থিক অবস্থা কৃষকদের মতো অতখানি খারাপ ছিল না; তবু সরকারের বিরুদ্ধেও তাদের বিক্ষোভ পুঞ্জিভূত হচ্ছিল বিধায় তারাও এ বিদ্রোহে শামিল হয়েছিল। কারণ তাদের ব্যবসা বাণিজ্যের অবাধ প্রসার স্বৈরতন্ত্রী রাজতন্ত্র নানাভাবে প্রতিহত, নিয়ন্ত্রণ ও খর্ব করে আসছিল। যার ফলে তারাও নানাভাবে শোষিত হচ্ছিল।[১২]

ফরাসি বিপ্লবের ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি, যদিও ফরাসি কৃষকদের অর্থনৈতিক অবস্থা জার্মানি, রুশ বা ইংল্যান্ডের কৃষকদের তুলনায় তখনও কিছুটা ভালো ছিল বলা চলে, তবুও তারাই বিপ্লবের আগুন প্রজ্জ্বলিত করেছিল। যাদের হাতে রাষ্ট্র ক্ষমতা ছিল–সেই তিন লক্ষ সুবিধাভোগী পাদ্রি ও অভিজাত বর্গের অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে দু'কোটি দুঃস্থ দরিদ্র মানুষ বিপ্লব সংগঠিত করে।[১৩] বিশ্বে এক অনন্য নজীর সৃষ্টি করে। সর্বোপরি বিপ্লব বলতে বুঝায়, স্বাভাবিক পন্থায় যেসকল অধিকার স্বীকৃত নয়, পূর্বে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ছিল কিন্তু কৌশলে তা কেড়ে নেয়া হয়েছে; মৌল মানবাধিকার ঔপনিবেশিক শৃঙ্খলে বন্দী। সকল অধিকার অর্জন তথা হৃত স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার কল্পে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনকে সশস্ত্র বৈপ্লবিক সংগ্রামের মাধ্যমে এই দেশত্যাগে বাধ্য করত; মধ্যবিত্ত শ্রেণির নেতৃত্বে বাঙালির স্বাধিকার তথা ভারতীয় স্বাধীনতা অর্জনের রক্তাক্ত পথ-পরিক্রমাই আলোচ্য অভিসন্দর্ভে বিপ্লব নামে অভিহিত হবে।

বাংলাদেশ তথা ভারতের মধ্যবিত্ত শ্রেণি ব্রিটিশ সৃষ্ট সামন্তপ্রথামূলক ভূমিব্যবস্থার মধ্য হতে সৃষ্ট হয়ে বিশ শতকের আর্থিক সঙ্কটের চাপে তার এক অংশ কৃষি ভূমির সংস্পর্শ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এবং হতাশাচ্ছন্ন হয়ে আর্থিক সঙ্কট হতে পরিত্রাণ ও দেশের স্বাধীনতা লাভের জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। কংগ্রেসের নিষ্ক্রিয়তা ও আপসমূলক মনোভাবের ফলে বুর্জোয়া নেতৃত্বের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে তারা নিজস্ব পন্থায় এক বিশেষ প্রকারের সশস্ত্র বৈপ্লবিক সংগ্রামের পথ অবলম্বন করে। মধ্যশ্রেণিসুলভ ভূম্যধিকারীর মনোবৃত্তির বশে তারা শ্রমিক-কৃষককে বৈপ্লবিক শক্তি হিসেবে স্বীকার করতে ব্যর্থ হয়। এই ব্যর্থতার ফলেই তারা তাদের সংগ্রামের প্রধান উপায় হিসেবে সন্ত্রাসবাদ

অবলম্বন করতে বাধ্য হয়।[১৪] কারণ যে চরমপন্থা বা সশস্ত্র সংগ্রাম জনসাধারণ হতে সম্পুর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে চলে, শ্রমিক কৃষককে এড়িয়ে যায়; সে সংগ্রামে সন্ত্রাসবাদ অবলম্বন করা ব্যতীত অন্য কোন উপায় থাকে না। এই সন্ত্রাসবাদীদের সশস্ত্র অভূত্থানের দূর পরিকল্পনা থাকলেও প্রধানত অর্থ সংগ্রহের জন্য ডাকাতি এবং গুপ্তহত্যার মধ্যেই তাদের বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপ সীমাবদ্ধ থাকে।তারা রাজনৈতিক ডাকাতিকে গেরিলা যুদ্ধের এক বিশেষরূপ হিসেবে এবং গুপ্তহত্যাকে জনসাধারণকে জাগ্রত করা এবং গণঅভুত্থান ঘটানোর উপায় হিসেবে গ্রহণ করে।[১৫] বাংলাদেশে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার যে বীজ রোপিত হয়, বিশ শতকের শুরুতে তা পল্লবিত ও বিকশিত হয়ে যে উত্তাল তরঙ্গমালার রূপলাভ করে; বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষের হাতধরে ক্রমান্বয়ে বিপ্লবী পুলিনবিহারী দাশ, জ্যোতিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ওরফে বাঘা জ্যোতিন, রাসবিহারী বসু, হেমচন্দ্র ঘোষ, সুর্যকুমার সেন, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু সহ জানা-অজানা অসংখ্য নায়কের বৈপ্লবিক সংগ্রামের অভিঘাতে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় স্বাধীনতা অর্জনের মাধ্যমে তার পরিসমাপ্তি ঘটে।

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জুন পলাশীর আম্রকাননে বাংলার শেষ নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার পরাজয়ের মাধ্যমে এদেশে ইংরেজ শাসনের সূত্রপাত হলেও বাঙালি কিন্তু একদিনেই যথাসর্বস্ব তাদের হাতে তুলে দেয়নি। ধীরে ধীরে এদেশের শাসক হয়ে উঠার জন্য তারা শুধুমাত্র অস্ত্রনয় বরং অপপ্রচার, ঘুষ এবং প্রতারণার নানান কৌশল গ্রহণ করে।[১৬] ক্লাইভ (Rovert Clive) মাত্র ৫৩ লক্ষ টাকার বিনিময়ে বাংলা, বিহারও উড়িষ্যার পুতুল নবাব নাজিমুদ্দৌলাকে তার সমস্ত ক্ষমতা ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে তুলে দিতে প্ররোচিত করেন। পরে বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা বৃত্তির বিনিময়ে ঐ তিনটি জেলার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কোম্পানির অনুকূলে কব্জা করে নেন।[১৭] অথচ এই ঘৃণ্য উৎকোচ গ্রহণের রীতি আজও প্রশাসনের মধ্যে বিদ্যমান থাকায় জনদুর্ভোগ বেড়েই চলছে। ওই পরিস্থিতিতে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও ভাবধারার অনুকরণে বাঙালি নিজেদের গড়ে তোলার প্রয়াস পায়। এইশ্রেণি ইংরেজের সহানুভূতি, সহযোগিতা লাভ করে জমিদারের সেরেস্তায় ও ইংরেজের অফিসে চাকুরি করে অর্থ উপার্জনের সুযোগ করে নেয়। অপরদিকে একশ্রেণির দেশবাসি ইংরেজ শাসনকে কখনো সুনজরে দেখেননি। বাঙালি জাতি দমিবার নয়। তারা পলাশী বিপর্যয় সত্ত্বেও ব্রিটিশ বিরোধী কর্মকান্ড অব্যাহত রাখে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলায় সংগঠিত হয়েছে নানা আন্দোলন-সংগ্রাম। সেগুলোর মধ্যে ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ (১৭৬৩-১৮০০), ওয়াহাবি আন্দোলন (১৮৩১), ফরায়েজি আন্দোলন (১৮৩৮), সিপাহি বিদ্রোহ (১৮৫৭-১৮৫৮), নীলবিদ্রোহ (১৮৫৯) প্রভৃতি উল্লখযোগ্য।

এই সকল আন্দোলন ও সংগ্রামের মধ্যে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের সিপাহি বিদ্রোহের রূপ ছিল প্রচন্ডতম। বিদ্রোহের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির অভিপ্রায়ে প্রথম পর্যায়ে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রবল প্রচার চলে। সাধু, সন্ন্যাসী, ফকির, পাগল সকলেই দিকে দিকে ঘোষণা করতে থাকেন; পলাশীর যুদ্ধের একশত বৎসর পর এদেশে ব্রিটিশ শাসনের অবসান হবে।বিদ্রোহের কর্মপদ্ধতি,বিদ্রোহের দিন সবই ঠিক ছিল। কিন্তু বেঙ্গল আর্মির সিপাহিরা বিপ্লবের জন্য অস্থির হয়ে পড়ে। বিপ্লব ঘোষণার দিন স্থির হয়েছিল ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জুন। সেটি কিন্তু কলকাতার অদূরে ব্যারাকপুর কেন্দ্রে ২৯ মার্চের সন্ধ্যায় শুরু হয়। এ বিদ্রোহের প্রকৃতি সমন্ধে বর্তমানে কোনো কোনো ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতদ্বৈততা রয়েছে। তবে রাসবিহারী বসু প্রমুখ বিপ্লবী মহানায়কেরা এটিকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের মর্যাদা দিয়েছেন। তিনি ব্যাঙ্কক সম্মেলনে সভাপতির ভাষণের একপর্যায়ে বলেন, 'During and since 1857 When we first revolt against British Imperialism in India'.[১৮] বলেছেন। বিপ্লবী ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত উল্লেখ করেছেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী লেখকেরা ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের স্বাধীনতা প্রচেষ্টাকে যে আকারেই জগতের সম্মুখে উপস্থাপন করুক, বিদেশি ঐতিহাসিকেরা এটিকে ভারতের স্বাধীনতা প্রচেষ্টা বলেছেন। ভারতীয় বিপ্লবি সাভারকার এপ্রচেষ্টার যে ইতিহাস লিখেছেন তাতে এ বিদ্রোহকে তিনি ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের মর্যাদা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন- 'The first War of Indian Independence'.[১৯] আবার ড.রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতো প্রখ্যাত ঐতিহাসিক সিপাহী বিদ্রোহকে স্বাধীনতা যুদ্ধের মর্যাদা দানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন[২০] করলেও এবিদ্রোহের তাৎপর্য উপলব্ধি করে বলেছেন, ভারতবর্ষের জনগণকে ব্রিটিশ সরকারের শাসনব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত করার অভিপ্রায়ে এবং তাদেরকে উত্তমরূপে শাসন করার লক্ষ্যে ব্রিটিশ সরকার ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে 'The Indian Council Act of 1861.'[২১] পাস করে। তবে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতানৈক্য সত্ত্বেও একথা বেশ জোরদিয়েই বলা যায়, এ বিদ্রোহ ছিলো তৎকালীন ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে একটি জাতীয় অভ্যুত্থান;যা স্বাধীনতা যুদ্ধেরই নামান্তর।

এই বিদ্রোহে পরাজিত হওয়া সত্ত্বেও একজন বিদ্রোহী নেতা তাঁতিয়া টোপী পালিয়ে থাকাবস্থায়ও বিদ্রোহের আগুন প্রজ্জ্বলিত করতে থাকেন। কিন্তু এক বিশ্বাসঘাতকের কারণে ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দের ০৭ এপ্রিল ব্রিটিশ সরকার তাঁকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়। অবশেষে ১৮ এপ্রিল তারিখে ফাঁসির মঞ্চে তাতিয়া টোপির জীবন প্রদীপ নিভে যায়। এ বিদ্রোহের আরেক বীর নানা সাহেব কানপুরে আত্মগোপন থাকা অবস্থায় নিখোঁজ হন। অপরনেতা আজিমুল্লাহ খান পলাতক থাকাকালে ফল বিক্রেতার ছদ্মবেশে লক্ষ্ণৌদুর্গে ধরা পড়েন। ইংরেজদের হাতে জীবন যায়। শেষ মোঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ ব্রহ্মদেশে নির্বাসিত হয়ে অল্পকয়েক বছর বন্দি থাকা অবস্থায় মুত্যুমুখে পতিত হন। বিপ্লবোত্তর এসকল ঘটনাবলি বর্তমানে নানাভাবে আলোচিত হয়ে থাকে।[২২]

পূর্বোল্লিখিত বিদ্রোহগুলো ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল সত্য, তবে ঐসকল গোলমেলে পরিবেশের মধ্যেই বিপ্লবের উপযোগী মন যে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণি ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হয়ে বিকশিত হতে থাকে তার পরিচয় মেলে বিশ শতকের ভারতবর্ষ ও তার বিপ্লবের ইতিহাসে। এর সমর্থনে ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায়[২৩] গদর পার্টির কার্তার সিং বিচারকের সামনে বলেন, আমি ও আমার বন্ধুরা ভারতের দুঃখকষ্টের খবর সকলকে জানানোর জন্য একটি সংবাদপত্র প্রকাশের উদ্যোগ নেই। সে জন্য আমরা বাংলাদেশের কোনো বাঙালির সহযোগিতার প্রয়োজন অনুভব করি। এক্ষত্রে আমরা সতীশচন্দ্র (সতীন্দ্র চন্দ্র) নামের এক বাঙালির সহযোগিতা লাভ করি। তিনি অমৃতসর এবং লাহোরে আমাদের সঙ্গেই থাকতেন।[২৪]

প্রকৃতপক্ষে বাংলার বিপ্লব প্রচেষ্টা স্বল্পসংখ্যক অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত যুবকদের হুজুগের বিষয় ছিল না। স্বাধীনতাকাঙ্খী এ বিপ্লব প্রচেষ্টার ঘটনাবলি বাংলার ইতিহাস হতে বাদ দেওয়ার অবকাশ নেই। এটি বাংলার জাতীয় ইতিহাসের ক্রমবিকাশের একটি স্তরমাত্র।[২৫] সর্বোপরি ভারতের পরাধীন অবস্থা এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণির বৈপ্লবিক চিন্তা ও চেতনা বিকাশের দু'টি মূল উৎস[২৬] বিবেচিত হয়। উনিশ শতকের শুরুতে পাশ্চাত্যেরে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংস্পর্শে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির মনে সামাজিক ন্যায়বিচার ও রাজনৈতিক অধিকার সমন্ধে নতুন ধ্যান-ধারণার উদ্ভব ঘটে, যা বঙ্গীয় নবজাগরণ নামে অভিহিত।[২৭] রামগোপাল ঘোষের সময় হতে ইয়ংবেঙ্গলের অভ্যুদয়। তৎপরে ব্রাহ্মসমাজের আবির্ভাব ও বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের চিন্তার ওপর তার প্রভাব। রাজনারায়ণ বসুর বৈপ্লবিক মত ও নবগোপাল মিত্রের জাতীয় বা হিন্দু মহামেলা।[২৮] নেশনাল পেপারের সংস্থাপনা; নেশনাল থিয়েটারে স্বদেশ প্রেমমূলক নাটক সমূহের অভিনয়; তৎপরে হিন্দুধর্ম পুনরুত্থানকারীদের অভ্যুদয়; বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেব মূখোপধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ প্রভৃতির বৈপ্লবিক চেষ্টা ও তদনুসারে হুগলির চারিদিকে লাঠিখেলার আখড়া স্থাপন; শিবনাথ শাস্ত্রীর দেশসেবার উদ্যম, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপধ্যায়, আনন্দমোহন বসুর বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা[২৯] ও ষ্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা এবং পরিশেষে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ও কংগ্রেসের কার্য; শিশিরকুমার ঘোষের বৈপ্লবিক পরিকল্পনা; তৎপরে স্বামী বিবেকানন্দের *আক্রমণশীল হিন্দুধর্মের* (Aggressive Hinduism) মতবাদ এবং শেষে বিপ্লববাদীদের দল প্রতিষ্ঠা ও কর্ম–এগুলো বাংলার জাতীয় জীবনের ধারাবাহিক ক্রমবিকাশের সোপান। এদের একটি ব্যতীত অপরটিতে পৌঁছানো যায় না।[৩০]

স্বভাবতই দু'টি সভ্যতা ও চর্চা পরস্পর সন্নিকটে চলে আসার ফলশ্রুতিতে একটি নতুন চর্চা ও ভাব প্রণালীর অভ্যুত্থান ঘটে থাকে। বাংলার ক্ষেত্রে এর যথার্থতা প্রতিভাত হয়। ইংরেজি প্রভাব বিস্তৃত হলে

ভারতীয় শিক্ষা ও পাশ্চাত্য শিক্ষার সংঘর্ষের ফলে বাংলায় এক নতুন চিন্তাস্রোতের ধারা পরিলক্ষিত হয়। রাজা রামমোহন রায় হতেই এর সূচনা হয়। তিনি ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে এসে ফরাসি বিপ্লব ও তার অগ্রগামী দূত *এনসাইক্লোপিডিস্টদের*(encyclopedist)[৩১] ভক্ত হন।[৩২]

রাজা রামমোহন রায় তার সময়ে দিল্লীর নামমাত্র বাদশাহকে কেন্দ্র করে বিদেশি ইংরেজ শাসন উচ্ছেদের জন্য একটি সর্বভারতীয় বৈপ্লবিক পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছিলেন[৩৩] বলে জানা যায়। কিন্তু তিনি সেই বৈপ্লবিক মতবাদ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রচার করেন নাই;কারণ বাংলায় তখন রাজনীতির চর্চা ছিল না। তিনি তা ধর্ম ও সামাজিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। এই বিপ্লববাদের প্রতিধ্বনি ব্রাহ্মসমাজে পৌঁছায় ও তার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ব্রাহ্মসমাজ পরে এতো চরমপন্থি হয় যে, তার ফলে তারা সনাতন সমাজ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পরে।[৩৪] অনেকে আশ্চর্যান্বিত হবেন যে, ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব বাংলার বৈপ্লবিক সমিতির প্রথম সভ্যদলের অনেকের ওপর বিশেষভাবে ছিল। তৎকালে নামকরা বিপ্লবীদের মধ্যকার অনেকেই ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিলেন বলে জানা যায়। বর্তমান ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণ করলে এটি পরিলক্ষিত হয় যে, যে সকল প্রদেশে ব্রাহ্মসমাজ, প্রার্থনাসমাজ বা আর্যসমাজ একটি নতুন চিন্তা-স্রোত এনেছিল, সেইসব জায়গায় আজ জাতীয় আন্দোলন ও স্বাধীনতা স্পৃহা বিশেষ প্রবল ভাব ধারণ করেছে।[৩৫]

বাঙালির বিপ্লব লক্ষণ বা স্বরূপসমন্ধে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বলেছেন,গুপ্তসমিতির রাজনৈতিক ডাকাতি, ব্যায়ামাগার সংস্থাপন, গুপ্তভাবে বিপ্লবের বাণী প্রচার, রাজনৈতিক হত্যা, গণসঙ্গ হতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নতা, কেবল *ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীশ্রেণির* (Intellectual) দ্বারা আন্দোলনের পুষ্টিসাধন,কোন নিদিষ্ট *রাজনৈতিক প্রণালীর* (Party Programme) অভাব। বিপ্লবীদের কেবলমাত্র রাজনৈতিক বিপ্লব চেষ্টার পর্যবসান, চিন্তাক্ষেত্রে *জড়তার* (Static) অবস্থা,সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপ্লবসাধন প্রক্রিয়া থেকে দূরে থাকা। বিপ্লবের *সামাজিক ও অর্থনৈতিক* (Socio-Economic) প্রোগ্রামের অভাব ইত্যাদি। যদিও ব্রাহ্মসমাজ ও তৎপূর্ব আন্দোলনাদি বাংলায় নতুন আলো এনেছিল। মৌখিকভাবে গান গেয়ে বেশিরভাগ বাঙালি রাজনীতিবিদগণই বিপ্লবীদের অনুপ্রাণীত করতেন। তাছাড়া সহচরকে সাহস দেবার জন্য বিপ্লবীরা যেরূপ **'ক্লৈব্যং-মাস্ম-গমঃ-পার্থ'**[৩৬] উপদেশদান করতেন,তদ্রুপ আত্মোৎসর্গ করার জন্য **'ন-হন্যতে-হন্যমানে-শরীরে'**[৩৭] তত্ত্বজ্ঞানে তাদের নৈতিক তেজ আনয়ন করতো।[৩৮]

পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলশ্রুতিতে বাংলায় বিশেষভাবে স্বাধীনতার স্পৃহা জাগরিত হয়। পূর্বতন বাংলা সাহিত্যের খবর নিলে এ সত্যতা দৃশ্যমান হবে। বাংলায় ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে অনেকবারই বৈপ্লবিক

গুপ্তসমিতি স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু স্বাধীনতার স্পৃহা সর্বজনীন না হওয়ায় ও অন্যান্য কারণে এসব সমিতি বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। কোন শিক্ষিত বাঙালি তৎকালে স্বাধীনতা মতবাদের আন্দোলন না করতো? ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর বন্ধুদের এমতানুযায়ী কাজ করতে উৎসাহিত করতেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। এভাবে বাংলায় ব্যক্তিগতভাবে বা ক্ষুদ্র সমষ্টিগতভাবে ধারাবাহিকরূপে বিপ্লববাদ বিদ্যমান ছিল তা দৃশ্যমান হয়।তবে দিন কতক কংগ্রেসের হুজুগে তা স্থগিত ছিল বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় বৈপ্লবিক সমিতি পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয়।এবং ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে এ সমিতি দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হয়।[৩৯]

বাংলা তথা ভারতের নবজাগরণের অগ্রদূত স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার শিকাগো শহরে বিশ্বধর্ম সম্মেলন থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি নিবীর্য দেশবাসীকে জেগে ওঠার আহ্বান জানান-

> "হে বীর, সাহস অবলম্বন করো,সদর্পে বলো-আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই; বলো, মুর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, চন্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই;তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হয়ে, সদর্পে ডেকে বলো- ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ,ভারতের দেবদেবি আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন,আমার বার্ধক্যের বারাণসী, বলো ভাই, ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ। তোমরা দিবানিশি বলো-'হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মানুষ্যত্ব দাও;মা, আমার দূর্বলতা, কাপুরুষতা দূর করো।"[৪০]

অপরদিকে মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উপন্যাস আকারে 'আনন্দ মঠ' লিখে বঙ্গজননীর শৃঙ্খল মোচনে ভবিষ্যৎ বিপ্লব আয়োজনের সঙ্কেত দানের সাথে সাথে দেশমাতৃকার আরাধনায় 'বন্দে মাতরম্' বীজমন্ত্রে বাঙালি জাতির মধ্যে তেজ ও শক্তি সঞ্চারের এক আবাহন তৈরি করেন।[৪১] বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের এ আবাহন এবং স্বামী বিবেকানন্দ জগৎমাতার নিকট বাঙালি জাতিকে মানুষ করবার জন্য যে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন, বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিশিষ্ট জন সতীশচন্দ্র বসু সে কর্মভার গ্রহণ করেন।[৪২] একাজের মাধ্যমেই তাঁর প্রতিভার পূর্ণবিকাশের স্বীকৃতি মেলে। 'ন্যায়মাত্মা বলহীনের লভ্য' এই উক্তির সারমর্ম সম্যক উপলব্ধি করে এই মন্ত্রসাধনের জন্য জীবন উৎসর্গ করেন। বাঙালি জাতিকে শৌর্য ও বীর্যে সর্বাঙ্গ সুন্দর করতে হবে, বাঙালি জাতি সকল বিষয়ে শীর্ষস্থান অধিকার করবে-এই পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপাদানের ব্রত নিয়ে তিনি মাঠে নামেন। শরীরচর্চার বীজবপনের মাধ্যমে তিনি কাজ শুরু করেন। এ পথই একপর্যায়ে বিশাল মহীরুহের আকারধারণ করে অনুশীলন সমিতি নাম ধারণ করে দিকে দিকে বিস্তার লাভ করে।

১৯০০ খ্রিস্টাব্দেরও বেশ কিছুকাল পূর্ব থেকেই বাঙালি জাতিকে 'ভীরু-কাপুরুষ' বলে সকলেই হেয়জ্ঞান করতো। এইকলঙ্ক মোচনের জন্য কয়েকজনবিশিষ্ট ব্যক্তি কলকাতার বিভিন্নস্থানে আখড়া স্থাপন করেন। এসকল আখড়ায় ডন, বৈঠক, মুগুড়, কুস্তি প্রভৃতি ব্যায়ামশিক্ষা দেয়া হতো। কলকাতা বিডন

স্ট্রীটের ছাতুবাবু, দর্জিপাড়ার অম্বুগুহ এবং তাঁরপুত্র ক্ষেতুগুহ কুস্তিতে বিখ্যাত ছিলেন। তখনও বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণি এইসকল আখড়াকে হেয় জ্ঞান করতেন। কিন্তু হার্মস্টোন সার্কাস প্রভৃতি দুঃসাহসিক বীরত্ব-ব্যঞ্জক ক্রীড়া-কৌশল দেখে বাঙালি যুব সম্প্রদায় শরীর চর্চায় মনোনিবেশ করে। পাড়ায় পাড়ায় জিম্‌নাস্টিকের দল গঠনকরে গৌরহরি মুখার্জী ও নারায়ণ বসাক অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। এক্ষেত্রে রাধিকামোহন রায় ও তাঁর *ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস ক্লাবের* (United Friends Club) কার্যক্রমও স্মরণযোগ্য।[৪৩] এই শক্তিচর্চার অংশহিসেবে বাঘমারার শ্যামাকান্ত (সোহংস্বামী), প্রফেসর বোস, কৃষ্ণবসাক (Hipdrome Circus) প্রমূখ বাঙালিদের দ্বারা পরিচালিত সার্কাস পর্টিগুলো দেশ-বিদেশে নানারূপ ক্রীড়াশৈলী দেখিয়ে যথেষ্ট খ্যাতি ও সুনাম অর্জন করে বলে জানা যায়।

সতীশচন্দ্র বসু হেদুয়া পুষ্করিনীর পূর্বদিকে অবস্থিত কলকাতার বিখ্যাত *জেনারেল অ্যাসেম্বলিজ ইনস্টিটিউশনের*(General Assembly's Institution) শিক্ষার্থী ছিলেন। অ্যাসেম্বলিজ ইনস্টিটিউশনটি বর্তমান *স্কটিশ করেজ* (Scottish Charge College) নামে শিক্ষার দ্যুতি ছড়িয়ে যাচ্ছে। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে সতীশচন্দ্র বসু ঐকলেজ প্রাঙ্গনে একটি ব্যায়ামাগার চালু করে নানা ধরণের শক্তিমত্তা প্রদর্শন ও ক্রীড়া শিক্ষার বন্দোবস্ত করেন। সে সময় গৌরহরি মুখার্জীর অধীনে বহু কলেজে এই ধরণের ব্যায়াম চর্চার ব্যবস্থা করা হয়। গৌরহরি মুখার্জীর ব্যায়াম শিষ্য ছিলেন সতীশচন্দ্র বসু। একথা অনস্বীকার্য যে, বাঙালির জাতীয় জীবনে খ্রিস্টান মিশন ও কলেজের প্রভাব সুবিবিদত। বাংলাদেশের সকল জনহিতকর কাজে তারা উৎসাহ যোগাতেন। সতীশচন্দ্র বসুর জাতিগঠনমূলক কার্যেও ইনস্টিটিউশন কর্তৃপক্ষের যথেষ্ট সাহায্য ও সহযোগিতা লক্ষ্যণীয়। বিশেষতঃ এই কাজের জন্য সতীশচন্দ্র বসু *প্রিন্সিপাল অয়েন* (Mr. Wann) সাহেবের দ্বারা প্রশংসিত হন; ছাত্র মহলেও তার প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই ব্যায়াগারটি পরে অনুশীলন সমিতি নামে পরিচিতি লাভ করে।[৪৪]

বাংলার বিপ্লব প্রচেষ্টার মূলে *ভগিনী নিবেদিতা* (Margaret Elizabeth Noble) ও *ওকাকুরা* (Kakuzo Okakura) নামক দুইজন বিদেশি উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। ভগিনী নিবেদিতা ভারতবর্ষে এসে কিছুদিনের মধ্যেই বাংলার বৈপ্লবিক প্রচেষ্টায় জড়িয়ে পড়েন। বাংলায় বৈপ্লবিক কর্ম পরিচালনার জন্য ১৯০০-'০১ খ্রিস্টাব্দে গঠিত পাঁচ সদস্য[৪৫] বিশিষ্ট একটি *জাতীয় পরিষদের* (National Council) অন্যতম সদস্য নির্বাচিত হন। নিবেদিতার সঙ্গে বাঙালির যোগাযোগ তো সুবিদিত। তাঁর উদ্যোগেই ১৯০২ খ্রিস্টাব্দের শুরুতে জাপানি শিল্পী *কাকুজো ওকাকুরা* (Kakuzo Okakura) ভারতবর্ষে আসেন। নিবেদিতার মারফতই বাংলাদেশের তৎকালীন বিপ্লবী সংগঠকদের সঙ্গে ওকাকুরার যোগাযোগ হয়। যাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান সংগঠক ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। বেলুর মঠে থেকে

আইডিয়াল অফ দি ইস্ট (Ideals of the East) নামক একটি পুস্তক রচনার মাধ্যমে অন্যান্য দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী প্রচার করেন। এভাবে তিনি বাংলাদেশের যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে বৈপ্লবিক চেতনা জাগিয়ে তোলার প্রয়াস পান। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন, বাংলার গুণি মহলে মেলামেশা করার বিষয়ে আমার দাদা সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর ওকাকুরাকে খুব সাহায্য করেছিলেন। ওকাকুরার সঙ্গে নিবেদিতা, জগদীশচন্দ্র বসু ও আমার দাদা গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরেরও বিশেষ ঘনিষ্টতা হয়। ওকাকুরার কথাবার্তা ও চিন্তাধারায় আকৃষ্ট হয়ে যুবকেরা ক্রমশ দলে দলে তাঁর কাছে ভীড়তে থাকে। কয়েক মাসের মধ্যে তাঁদের মনে এমনকিছু আদর্শের বীজ তিনি বুনে দেন;যা অঙ্কুরিত হবার পরে বাংলাদেশে বিপ্লবের জোয়ার বইয়ে যায়।[৪৬]

বিশ শতকের প্রারম্ভে যে ক'জন বাঙালি ভদ্রলোক বাংলায় মধ্যশ্রেণির বৈপ্লবিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগগ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে ব্যারিস্টার প্রমথনাথ মিত্র (পি.মিত্র) (১৮৫৩-১৯১০) সর্বাগ্রণ্য এবং স্মরণীয়। অরবিন্দকুমার ঘোষ (১৮৭২-১৯৫০) ছিলেন বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিপ্লববাদের আচার্য। সে বিপ্লববাদের সাংগঠনিক আয়োজনের ভার গ্রহণ করেন বারীন্দ্রকুমার ঘোষ (১৮৮০-১৯৫৯), প্রমথনাথ মিত্র (১৮৫৩-১৯১০)[৪৭] যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৩০) ও সরলাদেবি চৌধুরাণী (১৮৭২-১৯৪৫)। ব্যারিস্টার পি.মিত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি হলো ঢাকা অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠা। ঢাকা অনুশীলন সমিতির বিখ্যাত নায়ক পুলিনবিহারী দাশ (১৮৭৭-১৯৪৯) পি.মিত্রের দ্বারাই বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষিত হন।

বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ ও বারীন্দ্রকুমার ঘোষ মহারাষ্ট্র হতে বাংলাদেশে পৌঁছার পূর্বেই (১৯০০–০২) পি.মিত্র পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের উপায় হিসেবে বাঙালির শক্তিচর্চার আবশ্যকতা অনুভব করছিলেন। সরলাদেবি চৌধুরাণীও এই উদ্দেশ্যে বীরাষ্টমী ব্রতপ্রবর্তন করেছিলেন। তিনি স্বয়ং বীরাঙ্গনার বেশে ক্রীড়াশৈলী প্রদর্শনকরে দর্শকদিগকে মোহিত করতেন। ব্যারিস্টার প্রমথনাথ মিত্র (পি.মিত্র) বিদেশ থেকে প্রত্যাবর্তন করে স্বজাতিকে পাশ্চাত্য জাতিসমূহের সমকক্ষ পর্যায়ে উন্নীতকরার প্রচেষ্টায় ব্রতী হন।এক্ষণে সোদপুরের শশীভূষণ রায়চৌধুরী ১৯০২-৩ খ্রিস্টাব্দে ব্যারিস্টার প্রমথনাথ মিত্র (পি.মিত্র) সাহেবকে সতীশচন্দ্র বসুর সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। ব্যারিস্টার প্রমথনাথ মিত্র (পি.মিত্র) অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সতীশচন্দ্র বসুর অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় ও তাঁর নানারূপ সদগুণে মুগ্ধ হয়ে অনুশীলন সমিতির সাথে যোগায়োগ স্থাপন করেন; এবং পরে অনুশীলন সমিতির ডিরেক্টর বা পরিচালক হন। প্রথমদিকে সদস্যদের শরীর গঠনের মধ্যেই অনুশীলন সমিতির কার্য সীমাবদ্ধ থাকে। পরে কলিকাতা সমিতির কার্যভার তাঁর সহকর্মী সতীশচন্দ্র বসুর উপর ন্যস্ত করে তিনি অনুশীলন সমিতির শাখাবিস্তারের কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। অরবিন্দকুমার ঘোষের নির্দেশে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলাদেশে আগমন করে প্রথমে ব্যারিস্টার প্রমথনাথ মিত্র (পি.মিত্র) ও সরলাদেবী চৌধুরাণীর সাথে সংযোগ স্থাপন করেন। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে *লর্ড কার্জন* (George Nathaniel Curzon) ঘোষিত *বাংলা বিভাগ* (The Partition of Bengal) বিরোধী বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন[৪৮] পরবর্তীতে স্বদেশী আন্দোলনে পর্যবসিত হয়। এ সকল আন্দোল-সংগ্রামেও ব্যারিস্টার প্রমথনাথ মিত্র (পি.মিত্র) সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। ব্যারিস্টার প্রমথনাথ মিত্র (পি.মিত্র) ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে বিপিনচন্দ্র পালের (১৮৫৮-১৯৩২) সঙ্গে পূর্ববঙ্গের ঢাকায় আসেন। এবং পুলিনবিহারী দাশকে অন্তর্ভূক্ত করে ঢাকায় অনুশীলন সমিতির শাখা প্রতিষ্ঠা করেন। পুলিনবিহারী দাশের ওপর এই শাখা পরিচালনার ভার ন্যস্ত করে তিনি কলকাতায় ফিরে যান। অনুশীলন সমিতির শাখাবিস্তারে বারীন্দ্রকুমার ঘোষের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা জানা যায়। প্রথমদিকে তিনি ও তাঁর সংগঠন বারীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রমুখের সাথে একযোগে কাজ করলেও পরবর্তী পর্যায়ে তাঁদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে।[৪৯] অরবিন্দকুমার ঘোষ, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রমুখ যুগান্তর সমিতি প্রতিষ্ঠা করে পৃথকভাবে বৈপ্লবিক কাজ শুরু করেন মর্মে তথ্য পাওয়া যায়।

উপরোল্লিখিত দলগুলির পিছনে একটি বৈপ্লবিক উদ্দেশ্য থাকলেও এই দলগুলোকে প্রকৃত বৈপ্লবিক সমিতি বলা চলেনা। **প্রথমতঃ** উহাদের পিছনের বৈপ্লবিক উদ্দেশ্য ছিল খুবই অস্পষ্ট; **দ্বিতীয়তঃ** উহাদের কোন কর্মপন্থা ছিলনা; **তৃতীয়তঃ** এই দলগুলো এতোই গোপন ও সংকীর্ণ গন্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো যে,সামাজিক জীবনের সাথে উহাদের কার্যত কোন সম্পর্ক ছিলনা। এই দলগুলো ছিলো তৎকালীন সমাজের কতিপয় উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিরমধ্যে সীমাবদ্ধ। ইহা বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থায় এর চেয়েবেশি কিছুকরা তাঁদের পক্ষে সম্ভবও ছিলনা। কিন্তু এই দল গঠন–প্রচেষ্টার প্রভাব যে পরবর্তীকালের শিক্ষিত যুব–সম্প্রদায়কে বৈপ্লবিক প্রেরণা যোগায় তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার এ ঐতিহ্য নিয়েই বিশ শতকের প্রারম্ভে (১৯০১–০২) বাংলাদেশে নতুন বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা দেখা দেয়। পরিণতিস্বরূপ বাংলাদেশব্যাপী গুপ্ত–সমিতি স্থায়িভাবে গড়ে উঠতে থাকে।

বিশ শতকের প্রথমভাগে মহারাষ্ট্র হতে নতুন করে সশস্ত্র সংগ্রামের আদর্শ ও বৈপ্লবিক চিন্তাধারা অরবিন্দকুমার ঘোষ ও যতীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের মাধ্যমে বাংলাদেশে বিস্তারলাভ করে। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে অরবিন্দকুমার ঘোষ ছিলেন গুজরাটের বরোদা রাজ্যের সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ[৫০] এবং যতীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ছিলেন বরোদার মহারাজের দেহরক্ষী। অরবিন্দকুমার ঘোষের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ইতিহাস ও রাজনৈতিক সাহিত্য অধ্যয়ন কল্পে অরবিন্দকুমার ঘোষের সঙ্গেই বরোদায় থাকতেন। যতীন্দ্রনাথ ইতোপূর্বে মহারাষ্ট্র–নেতা বালগঙ্গাধর তিলকের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হন। অরবিন্দকুমার ঘোষও তিলকের শিষ্য পুনার বিপ্লবীনেতা ঠাকুর সাহেবের নিকট বৈপ্লবিক স্বাধীনতা

সংগ্রামে দীক্ষালাভ করে ঠাকুর সাহেবের গুপ্ত–সমিতির সদস্য হন। একই সাথে তিনি ছিলেন *গণতন্ত্রী ভারত* নামক বৈপ্লবিক সমিতির গুজরাট শাখার সভাপতি।

বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত অরবিন্দকুমার ঘোষ ও যতীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় বালার যুব সম্প্রদায়কেও সশস্ত্র বৈপ্লবিক অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করে বাংলায় এই নতুন স্বাধীনতা সংগ্রাম আরম্ভ করার জন্য চঞ্চল হয়ে উঠেন। দীর্ঘ আলোচনান্তে তাঁরা স্থির করেন; প্রথমে যতীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় মহারাজের চাকরি ছেড়ে বাংলায় বৈপ্লবিক গুপ্তসমিতি গঠনের কাজ আরম্ভ করবেন। শীঘ্রই অরবিন্দকুমার ঘোষও বরোদা ত্যাগ করে বাংলায় তাঁর সাথে মিলিত হবেন। সিদ্ধান্ত অনুসারে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় চাকরি ত্যাগপূর্বক অরবিন্দকুমারের নিকট হতে একটি পরিচয়পত্র সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় এসে উপস্থিত হন।

এদিকে বাংলাদেশেও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের আপোষ নীতিতে বিরক্ত হয়ে ইতোপূর্বে একদল নেতা মহারাষ্ট্রের বৈপ্লবিক স্বাধীনতা সংগ্রামের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলাদেশে বৈপ্লবিকপথ অবলম্বন করার প্রত্যয়ে পারস্পারিক সলা পরামর্শ আরম্ভ করেছিলেন। এদের মধ্যে ব্যারিস্টার ব্যারিস্টার প্রমথনাথ মিত্র (পি.মিত্র), চিত্তরঞ্জন দাশ, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ বসু প্রমূখ উল্লেখযোগ্য। এইপ্রকার একটি আলোচনা সভায় সর্বসম্মতি ক্রমে ব্যারিস্টার প্রমথনাথ মিত্রের (পি.মিত্র) ওপর একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠার ভার অর্পণ করা হয়। এ মাহেন্দ্রক্ষণে গুজরাটের বরোদা হতে যতীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় কলকাতায় হাজির হন এবং ব্যারিস্টার প্রমথনাথ মিত্র (পি.মিত্র) সাথে যোগদান করেন। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে পি.মিত্র ও যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যুক্তপ্রষ্টোয় বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতির আত্মপ্রকাশ ঘটে।এটিই বাংলাদেশে প্রথম কোন বৈপ্লবিক সংগ্রামের স্থায়ি সংগঠন। সর্ব সম্মতি ক্রমে পি.মিত্রই হন এই সংগঠনের সভাপতি। অরবিন্দ ঘোষ ও চিত্তরঞ্জন দাশ সংগঠনটির সহ-সভাপতির পদ অলংকৃত করেন। এইসংগঠনের অধীনে সভ্যদের শারীরিক ব্যায়াম, লাঠি–খেলা, ছোড়া ও তরবারি–খেলা, ঘোড়ায় চড়া ও সামরিক শিক্ষার জন্য একটি ক্লাব বা আখড়া প্রতিষ্ঠিত হয়। এই আখড়া পরিচালনার ভার পড়ে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর।[৫১] কলকাতায় যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসা সংলগ্ন ভূমিতে আখড়াটি স্থাপন করা হয়।বিভিন্ন শারীরিক ব্যায়ামের কসরৎ শিক্ষা দেয়া ছিল এখানকার বাইরের আবরণ মাত্র। এতদসঙ্গে বিশ্বস্ত ছেলেদের গ্যারিবল্ডি, ম্যাজিনির জীবনী ও অন্যান্য বৈপ্লবিক আন্দোলন কিভাবে পরিচালিত হয়েছিল; সে সকল বিষয়ে নিয়মিত পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হতো। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্যারিস্টার প্রমথনাথ মিত্র (পি.মিত্র),অধ্যাপক সখারামগণেশ দেউস্কর প্রমূখ মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ এই পাঠচক্রে নিয়মিত বক্তৃতা দিতেন। পাঠচক্রের মাধ্যমে বৈপ্লবিক আদর্শ ও প্রয়োজনীয়তা এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার সবকিছু বুঝিয়ে দেয়া হতো। বৈপ্লবিক কর্মের জন্য ব্যারিস্টার

প্রমথনাথ মিত্র (পি.মিত্র) ও চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমূখ প্রথম *অর্থ* (Fund) চাঁদা হিসেবে দেন। অরবিন্দকুমার ঘোষ প্রথম থেকেই মোটা টাকা দিতেন। সমিতির অর্থ আদায়ের দায়িত্বে ছিলেন অবিনাশ ভট্টাচার্য।[৫২]

১৯০২ খ্রিস্টাব্দে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলায় পৌঁছার ছয়মাস পরেই অরবিন্দ ঘোষ তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমার ঘোষকে বাংলায় পাঠিয়ে দেন।তিনি কলকাতায় পৌঁছেই সদ্য প্রতিষ্ঠিত অনুশীলন সমিতির অন্যতম কর্ণধার-রূপে সমিতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য আত্মনিয়োগ করেন। বিভিন্ন জেলায় ঘুড়ে বেড়ান, কিন্তু সর্বত্র যুবসম্প্রদায়ের মধ্য হতে আশাব্যঞ্জক সাড়া না পেয়ে কিছুটা হতাশ হয়ে পড়েন। বারীন্দ্রকুমার ঘোষ যে রঙিনস্বপ্ন নিয়ে বাংলায় এসেছিলেন শীঘ্রই সে স্বপ্ন ধুলিসাৎ হয়ে যায়। ভগ্নহৃদয়ে তিনি ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে গুজরাটের বরোদায় ফিরে যান। এক বৎসর তিনি সেখানে অবস্থান করে ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে আবার বাংলায় ফিরে আসেন।[৫৩]

গুজরাটের বরোদায় একবৎসর অবস্থান শেষে রাজনৈতিক প্রচারক রূপে বাংলায় স্বাধীনতার মন্ত্রপ্রচার করাই ছিল বারীন্দ্রকুমার ঘোষের এই প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্য। জেলায় জেলায় ঘুরেফিরে বহু শরীরচর্চার আখড়া স্থাপন করেন। সে সকল আখড়ায় শরীরচর্চা ও রাজনীতি অধ্যয়নের জন্য যুবকদের ভর্তি করা হতো। প্রায় দু'বৎসর স্বাধীনতার বাণী প্রচার করার পর ক্রমশ এই কাজে অবসাদ দেখা দেয়। বরোদায় ফিরে যান এবং এক বৎসর নানা বিষয় অধ্যয়ন করেন। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দের শেষাবধি আবার এই ধারণা নিয়ে বাংলায় প্রত্যাবর্তন করেন; এই দেশে কেবলমাত্র রাজনৈতিক প্রচারের দ্বারা কোনো কাজ হবে না। জনসাধারণকে এমনভাবে আধ্যাত্মিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে যাতে তারা নির্ভয়ে বিপদের সম্মুখীন হতে পারে।[৫৪] ইতোমধ্যে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে অরবিন্দ ঘোষ বরোদা রাজ–কলেজের অধ্যক্ষ পদের চাকরি ত্যাগ করে বাংলায় তথা কলকাতায় চলে আসেন। তিনি অনুশীলন সমিতিকে একটি আদর্শ ও শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের ১৮ মার্চ থেকে ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের সম্পাদনায় যুগান্তর পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে। প্রত্যেক পংক্তিমালায় বিপ্লবের আগুন ছড়িয়ে যাত্রা শুরু করে সাপ্তাহিক যুগান্তর।

কংগ্রেসের বিপ্লবপন্থি নেতৃবৃন্দ পি.মিত্রের অনুশীলন সমিতে যোগ দেন। হেমচন্দ্র কানুনগো ইউরোপে গমনকরে সেখানে নির্বাসিত রুশবিপ্লবীদের নিকট থেকে বোমা তৈরীর কলাকৌশল আয়ত্ত্ব করে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। উল্লাসকর দত্তসহ হেমচন্দ্র কানুনগো অনুশীলন সমিতির সদস্য হন। কলকাতার মানিকতলার এক বাগানবাড়িতে বোমা তৈরীর সাথে সাথে বিপ্লবীদের অস্ত্রেরমহড়া আরম্ভ হয়। একই সাথে নিয়মিত গীতাপাঠ, রুশ, আইরিশ ও ইতালীয় বিপ্লবীদের বীরত্বগাথা, বিশেষত;

বিপ্লবী গ্যারিবল্ডি ও মাৎসিনির কর্মধারার চর্চা আরম্ভ হয়।[৫৫] একপর্যায়ে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে বারীন্দ্রকুমার ঘোষের মতানৈক্য হওয়ায় বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ও অবিনাশ ভট্টাচার্য পৃথক হয়ে মদনমিত্র লেনের একটি বাসায় উঠেন। আখড়া ভেঙ্গে যায়। যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ বাড়ি ছেড়ে ঝুমাপুকুর লেনে মেসবাসা ভাড়া নেন। কিছুদিন পরে অরবিন্দকুমার ঘোষ দ্বিতীয়বার কলকাতায় আসেন এবং বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ও অবিনাশ ভট্টাচার্যকে সাথে নিয়ে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসায় যান। তাঁদের মধ্যকার মতানৈক্য মিটিয়ে দেন। আলাদা থাকাবস্থায়ও অরবিন্দকুমার ঘোষ নিয়মিত এদের অর্থের যোগান দিয়েছেন। পরবর্তীতে সিমলাস্ট্রীটে নেয়া বাসায় অরবিন্দকুমার ঘোষ, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ও অবিনাশ ভট্টাচার্য এবং গ্রেস্ট্রীটের বাসায় অরবিন্দকুমার ঘোষ, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অবিনাশ ভট্টাচার্য একত্রে থাকা আরম্ভ করেন। নিখিল ভৌমিক (ভবানন্দ স্বামী) এবং কুলকর্ণী ও যোশী নামক দু'জন মহারাষ্ট্রীয় যুবকও তথায় থাকতেন। এখান থেকেই 'No Compromise' নামক 'Pamphlet' প্রথম বের করা হয়। অরবিন্দকুমার ঘোষই ঐ পুস্তিকার লেখক ছিলেন বলে জানা যায়।[৫৬]

১৯০২ খ্রিস্টাব্দের ২৪মার্চ (১৩০৮সাল, ১০চৈত্র) রোজ সোমবার দোল পূর্ণিমার দিন কলকাতায় প্রথম অনুশীলন সমিতি স্থাপিত হয়। হেদুয়ার নিকটবর্তী ২১নং (অধুনা ২৪নং) মদনমিত্র লেনের ব্যায়াম ক্ষেত্রের সন্নিকটে ছোটো বাড়িতে এ সমিতির কার্যালয় ছিল। পরে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে ঐ অফিস (Oxford Mission-এর উত্তরে)-৪৯নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে স্থানান্তরিত হয়। সংক্ষেপে সকলে উহাকে Forty-nine বলতো। সভ্যদের কেন্দ্রে একত্রিত হওয়ার এটিই ছিল এক সঙ্কেত বিশেষ। স্মরণযোগ্য যে, বাঙালি জাতীয় জীবনের এক যুগসন্ধিক্ষণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এ অনুশীলন সমিতির উদ্ভব ও আত্মপ্রকাশ ঘটে। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন[৫৭] তত্ত্বে শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সমন্বিত আদর্শ মানব গঠনের যে নির্দেশ আছে তাই হল অনুশীলন সমিতির ভিত্তি। বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ত্বের শেষ উপদেশ, সকল ধর্মের ওপর স্বদেশপ্রীতি, ইহা বিস্মৃত হ'য়ো না; সমিতির মূল প্রেরণা যুগিয়েছিল। যতদূর জানা যায়, নিউ ইন্ডিয়ান স্কুলের প্রধান শিক্ষক নরেন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় এ সমিতির নামকরণ করেন ভারত অনুশীলন সমিতি। পরে ব্যারিস্টার প্রমথনাথ মিত্র (পি.মিত্র) নামটির সংক্ষিপ্তরূপ *অনুশীলন সমিতি* নাম গ্রহণ করেন।[৫৮] মিত্র মহাশয় এভাবে বাংলায় সর্বপ্রথম বৈপ্লবিক স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল, এই সংগঠনের মাধ্যমে এমন একটি তরুণ দল সৃষ্টি করা;যারা দৈহিক ও আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে ভিন দেশিয়দের কবল হতে দেশমাতৃকার মুক্তিসাধনে সক্ষম হবে।

সমিতির সভ্যদের নানাবিধ শারীরিক কসরৎ চর্চার সঙ্গে সঙ্গে সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তাদের সমন্বয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিকদল গঠনের পরিকল্পনাও সমিতির কর্মপন্থাভূক্ত ছিল। সামরিক শিক্ষালাভের জন্য যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বরোদা রাজ্যে প্রেরণ করা হয়। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে তিনি বাংলায় ফিরে আসেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে নেতৃবৃন্দের সাথে মতান্তর ঘটায় তিনি অনুশীলন সমিতির সাথে সকল সম্পৃক্ততা ছিন্ন করেন। পরবর্তীতে সন্ন্যাসগ্রহণ করে তিনি নিরালম্বস্বামী নাম গ্রহণ করেন।

অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠার কিছুদিনের মধ্যেই বিভিন্ন স্থানে শাখা প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে এবং সে সকল শাখার সভ্য সংখ্যাও প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পেতে থাকে। তারা প্রত্যেহ আখড়ায় নিয়মিতভাবে শরীরচর্চা, লাঠি, ছোড়া ও তরবারি খেলার কৌশল আয়ত্ব করতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে কর্মপদ্ধতি নিয়ে সমিতির মধ্যে মতদ্বৈধতা তীব্রআকার ধারণ করে। বৈপ্লবিক সমিতির পরিচালকরূপে ব্যারিস্টার প্রমথনাথ মিত্রের (পি.মিত্র) দক্ষতায় কারো সন্দেহ ছিল না। তিনি ছিলেন তৎকালীন বিপ্লবী কর্মীদের বরেণ্য। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি ছিলেন কিছুটা সেকেলে ভাবাপন্ন। দৃঢ় নিয়ম-শৃঙ্খলাযুক্ত একটি গুপ্ত সমিতি, সুগঠিত শরীর সম্পন্ন এমন একদল নিষ্ঠাবান তরুণ কর্মীদল যারা নিজ নিজ উদ্দেশ্য ও আদর্শ মনের অন্তঃস্থলে সংগোপনে রেখে বিনাবাক্য ব্যয়ে নেতার হুকুম শিরোধার্য করবে। নেতার অঙ্গুলি হেলনে হাসিমুখে প্রাণবিসর্জন দিতেও দ্বিধা করবে না; এরকম চিন্তাধারার গন্ডির বাইরে তিনি অন্যকিছু ভাবতেই পারতেন না। আখড়ার শরীর চর্চা ও লাঠি ছুরি তরবারি খেলার কসরৎ আয়ত্ব করাকেই মিত্র মহাশয় প্রাথমিক ও মৌলিক কর্তব্য হিসেবে গণ্য করতেন। কিন্তু সমিতির তরুণ নেতৃবৃন্দের একটি বৃহৎঅংশ *এই নীরব শরীর চর্চার নীতি* নীরবে মেনে নিতে পারলেন না। ব্যারিস্টার প্রমথনাথ মিত্রের (পি.মিত্র) মতে সর্বাগ্রে শরীর গঠন; কিন্তু তরুণ নেতৃবৃন্দের মতে বৈপ্লবিক স্বাধীনতা সংগ্রামের বাণী প্রচারই হল প্রথম ও মূল কর্তব্য। এই তরুণ দলের নেতৃত্বগ্রহণ করেন অরবিন্দকুমার ঘোষ,বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ও ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮০-১৯৬১) প্রমূখ নেতৃবৃন্দ। এ মতপার্থক্যের কারণে কার্যত একই গুপ্তসমিতির কর্মপদ্ধতি দ্বিবিধ ধারায় প্রবাহিত হতে থাকে।[৫৯]

বিপ্লবী তরুণ দলের অন্যতম ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত উল্লেখ করেছেন, পি.মিত্র মহাশয়ের মত ছিল যে,লাঠি, ফুটবল খেলা, বক্সিং ও কুস্তি করা বাঙালি যুবকদের অবশ্য কর্তব্য এবং আমরাও তা মেনে চলতাম। কিন্তু এগুলো নিয়েই কেন আমাদের চিরকাল পড়ে থাকতে হবে? তা আমরা বুঝতে পারতাম না। আমাদের মধ্যে কয়েকজন প্রচারধর্মী কাজের উপর বিশেষ জোর দিতেন। ফলশ্রুতিতে কলকাতায় দু'টি দলের উদ্ভব হয়; যদিও ব্যারিস্টার প্রমথনাথ মিত্র (পি.মিত্র) মহাশয় পূর্বের মতোই আমাদের উভয় দলের সভাপতি রইলেন।[৬০] প্রকৃতপক্ষে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রমূখ যারা রাজনৈতিক

প্রচারকেই প্রাথমিক কাজ মনে করতেন তারা পূর্বের আত্মোন্নতি সমিতিকে কেন্দ্র করে নিজেদের শক্তি ও দল সুসংহত করতে থাকেন। প্রমথনাথ মিত্র (পি.মিত্র) পরিচালিত একই গুপ্তসমিতি (অনুশীলন সমিতি) এভাবে দু'টি পৃথক দলে বিভক্ত হওয়ার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়। অর্থ বন্টনসহ অন্যান্য বিষয়ে ক্রমশ উভয় দলের মধ্যে তিক্ততার সৃষ্টি হওয়ায় দল দু'টি কার্যত পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে থাকে। অত:পর ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লব প্রচেষ্টায় এ দু'টি দল ক্রমশঃ অনুশীলন এবং যুগান্তর দল নামে সমপুর্ণ পৃথকভাবে তাদের কর্মকান্ড পরিচালনা করতে থাকে।

বাংলার প্রায় প্রতিটি জেলায় এদের সংগঠন ছিল। অসংখ্য স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষী তরুণেরা এসকল সংগঠনের সাথে যুক্ত ছিল। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে অনুশীলন সমিতির শুধু ঢাকা কেন্দ্রের অধীনে ৫০০টি শাখা ছিল। যুগান্তর নামে একটি পত্রিকায় অগ্নিবাণী প্রচারিত হতো এবং ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দেই এর প্রচার সংখ্যা সাত হাজার ছাড়িয়ে যায়। সশস্ত্র সংগ্রামের মুখপাত্র রূপে যুগান্তর ও সন্ধ্যা পত্রিকা দু'টির ভূমিকা ছিল অসাধারণ। স্বাধীনতাকামী এই তরুণগোষ্ঠীকে ইংরেজ শাসকেরা বলতেন সন্ত্রাসবাদী। তাঁদের কাজের ধরণ যদিও ছিল ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদ তবু এঅভিধায় আপত্তি থেকেই যায়। সেজন্য ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা কমরেড মুজফফর আহমদ তাঁদেরকে সশস্ত্রজাতীয়তাবাদী হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[৬১] আমরা তাঁদেরকে সশস্ত্রবিপ্লবপন্থি হিসেবে উল্লেখ করতে চাই।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে কংগ্রেসের ভূমিকাই মুখ্য বলে কংগ্রেস নেতৃত্ব দাবি করেন। যদিও তদানীন্তন *লর্ড ডাফরিনের* (Lord Dufferin) নির্দেশে ব্রিটিশ অব.কর্মকর্তা *হিউমের* (Allan Octavian Hume) উদ্যোগে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে বোম্বে শহরে বাঙালি ব্যারিষ্টার উমেশ চন্দ্র ব্যানার্জীর সভাপতিত্বে এ কংগ্রেসের জন্ম হয়। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলন অর্থাৎ সিপাহী বিদ্রোহের পর থেকে ইংরেজ শাসকরা পুনরায় সশস্ত্রঅভুত্থান আশঙ্কায় সতর্ক হয়ে ওঠে। অবস্থা মোকাবিলায় ভারতীয় ধনী ব্যবসায়ী ও বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে এমনসংস্থা ও কর্মপন্থা তৈরি করে যারা ব্রিটিশ রাজের সাথে আপস করে চলবে। কার্যত আবেদন নিবেদনের মধ্যেই কংগ্রেস তাদের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ রাখে। ব্রিটিশরাজের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে জমিদার,পুঁজিপতি ও চাকরিজীবিদের জন্য কিছু সুবিধা আদায়ের জন্য প্রস্তাবগ্রহণ পর্যন্তই ছিল কংগ্রেসের কাজ। কিন্তু দেশের পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছিল যে, নবীনরা এইধরণের নিষ্ফল প্রস্তাব পাস ও প্রার্থনার মধ্যে আটকে থাকতে চায়নি। তারা সংগ্রাম করতে চেয়েছিলেন। যদিও পূর্ণস্বাধীনতার দাবিটি এসেছিল আরও পরে। এই সংগ্রামী নবীনদের বলা হতো চরমপন্থি। তাঁদের নেতৃত্বে ছিলেন মহারাষ্ট্রের বালগঙ্গাধর তিলক, পাঞ্জাবের লালালাজপত রায়, বাংলার

বিপিনচন্দ্র পাল ও অরবিন্দকুমার ঘোষ। অরবিন্দকুমার ঘোষই ছিলেন বাংলায় সশস্ত্র জাতীয়তাবাদী বিপ্লবের প্রথমসংগঠক। ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেসের এই বিপ্লবী নেতৃবৃন্দের উপর আক্রমণ চালিয়েছিল।[৬২]

সে সময় স্বদেশী কথাটি বেশ চালু হয়েছিল। স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম অস্ত্র ছিল বিদেশি কাপড় বর্জন। মহারাষ্ট্রের বালগঙ্গাধর তিলকই প্রথম ইংল্যান্ডের বস্ত্র বর্জনের ডাক দেন। আবার ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে মহারাষ্ট্র থেকেই সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন শুরু হয়। ২২জুন পুনাতে অত্যাচারী প্লেগ কমিশনার মি. র‍্যান্ড (W.C Rand) এবং তার দেহরক্ষী *আয়ার্স্ট* (Lieutenant Ayerst) নামে একজন ইংরেজ রাজকর্মচারীকে হত্যাকরে প্রতিশোধ নিয়েছিলেন মহারাষ্ট্রের সন্তান বিপ্লবী দামোদর হরি চাপেকার ও বালকৃষ্ণ হরি চাপেকার ভ্রাতৃদয়। উল্লেখ্য বিপ্লবীদের উদ্দেশ্য ছিল শুধুমাত্র প্লেগকমিশনার মি. র‍্যান্ড সাহেবকে হত্যা করা। পুলিশ জ্যেষ্ঠভ্রাতা দামোদর হরি চাপেকারকে এ হত্যাকান্ডের অভিযোগে গ্রেফতার করে। বিচারে তাঁর ফাঁসি হয়। দামোদর হরি চাপেকার হলেন এই নতুন বৈপ্লবিক যুগের প্রথম শহীদ। বালগঙ্গাধর তিলক তাদের প্রশংসা করে প্রবন্ধ রচনার অভিযোগে কারাদন্ড ভোগ করেন। জনগণ তাঁকে লোকমান্য উপাধিতে ভূষিত করেছিল। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে তিলক গ্রেফতার হলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর মামলা পরিচালনার জন্য জনসাধারণের কাছে অর্থসাহায্যের আবেদন জানান। বালগঙ্গাধর তিলকের গ্রেফতার এবং সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ 'কণ্ঠরোধ' নামে যে প্রবন্ধটি লেখেন। এটি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক দৃষ্টিকোন থেকে লেখা বাংলা সাহিত্যের প্রথম প্রবন্ধ বলা যেতে পারে। যেখানে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার পক্ষে যুক্তি হাজির করা হয়েছিল।[৬৩]

বিশ শতকের শুরুতে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ক্রমশ শক্তিশালী হওয়ায় বাংলার রাজনীতি নতুন ধারায় আবর্তিত হয়। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ভারতের গভর্নর জেনারেল *লর্ড কার্জন* (Lord Goerge Nathaniel Curzon) পূর্ববঙ্গ অঞ্চল পরিদর্শনে এসে ঢাকার নবাব স্যার সলিমুল্লাহর আতিথেয়তা গ্রহণ করেন। এ সময় লর্ড কার্জনের কাছে ঢাকার নবাব স্যার সলিমুল্লাহ পূর্ববঙ্গ ও আসামের মুসলমানদের জন্য একটি পৃথক প্রদেশ দাবি করেন। বড়োলাট লর্ড কার্জন এ সময় বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর *এনড্রো ফ্রেজারের* (Andrew Henderson Leith Frazer) পরিকল্পনা ও পূর্ববঙ্গ অঞ্চল সফরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে উপলব্ধি করেন যে, *সুবৃহৎ বাংলা প্রদেশের* (The Bengal Presidency) প্রশাসনিক সমস্যা দূর করার জন্য বাংলাকে ভাগকরে পূর্ববাংলা ও আসাম নিয়ে একটি নতুন প্রদেশ গঠন করা উচিৎ। লর্ড কার্জন ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ১০ জুলাই বাংলা ভাগের এ পরিকল্পনা প্রকাশ করেন।[৬৪] এ পরিকল্পনার বিরুদ্ধে টাঙ্গাইল জেলার কৃতিসন্তান,নবীনব্রাহ্ম,কলকাতার বিখ্যাত

সাপ্তাহিক সঞ্জিবনী'র সম্পাদক অধ্যাপক কৃষ্ণকুমার মিত্র ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ১৩জুলাই সর্বপ্রথম বয়কট আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন।[৬৫]

ব্রিটিশ সরকার একটি বিষয় অত্যন্ত সচেতন ভাবেই লক্ষ্য করেছিল বাংলা হলো সকল প্রকার বিদ্রোহ এবং বিপ্লবের কেন্দ্রভূমি। এসকল কর্মকান্ডে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিল পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বিকাশমান মধ্যবিত্ত শ্রেণি। এ শ্রেণি রাজভক্তি ত্যাগপূর্বক এদেশ মাতৃকাকে অচলায়তন থেকে উদ্ধারে প্রয়াসী হয়।[৬৬] ব্রিটিশ রাজের আতঙ্কের কারণও ছিল এই মধ্যবিত্ত শ্রেণির কর্মকান্ড নিয়ে। কারণ লক্ষ্য করলে দেখা যাবে বেশির ভাগ আন্দোলন ও সংগ্রাম প্রধানত বাঙলাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হতো। এই সকল আন্দোলন-সংগ্রামের নেতৃত্বে থাকতো বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির নেতৃবৃন্দ। কাজেই ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় জাতীয়তাবাদের স্নায়ুকেন্দ্র *বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি* (The Bengal Presidency) কে ভাগ করে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে দুর্বল করার সিদ্ধান্ত নেয়। ভাইসরয় লর্ড কার্জনের ভাষায়, সমগ্র বাংলায় এবং বাস্তবিক অর্থে সমগ্র ভারতে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ এবং সকল ষড়যন্ত্রের কেন্দ্র হিসেবে কলকাতার যে আসন রয়েছে; তা থেকে কংগ্রেস পার্টিকে অপসারণ করাই এর উদ্দেশ্য ছিল।[৬৭] ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দের ০৬ ডিসেম্বর তৎকালীন স্বরাষ্ট্র সচিব আরো স্পষ্ট করে বলেন, বাংলা ভাগ হলে ঐক্যবদ্ধ বাংলার শক্তি নানাদিকে ছড়িয়ে পড়বে। এটিই কংগ্রেস নেতৃবৃন্দেরও উদ্বেগের বিষয়। তাঁদের এই উদ্বেগ একেবারেই সঠিক আর এটিই বাংলা ভাগ পরিকল্পনার প্রধান কারণ। এই পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ব্রিটিশ শাসন বিরোধীদের শক্তিশালী সংগঠনকে বিভক্ত ও দুর্বল করে দেয়া।[৬৮]

বাংলা ভাগের এ প্রস্তাব দেয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। লর্ড কার্জন ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দের ১৭ জানুয়ারি লেখা এ সম্পর্কিত এক চিঠিতে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে ভারতের সেক্রেটারি অব স্টেটকে জানান, বাঙালিরা মনে করে তারা একটি জাতি এবং স্বপ্ন দেখে যে ইংরেজদিগকে তাড়িয়ে একজন বাঙালি বাবু বড়লাট হয়ে কলকাতা রাজভবনে বাস করবেন। বাংলা ভাগ হলে তাদের রাজনৈতিক প্রাধান্য নষ্ট হবে এবং এই স্বপ্ন ভেঙ্গে যাবে। এজন্যই এর বিরুদ্ধে এতো প্রবল আন্দোলন চালাইতেছে। আজ যদি তাদের চিৎকারে বাংলা ভাগ রহিত করি, তবে আর কোনো দিন বাংলার শক্তিকে খর্ব করা যাবেনা।[৬৯] অবশেষে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ১৬ অক্টোবর লর্ড কার্জনের সিদ্ধান্তে বাংলা ভাগ সম্পুর্ণ হলে। ঢাকা ও কলকাতা যথাক্রমে পূর্ববাংলা এবং পশ্চিমবাংলার রাজধানী হয়। এভাবে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকার বাঙালির জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দাবিয়ে রাখার প্রয়াস পায়।

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলা বিভাগ আইন পাস হওয়ার পর ভারতীয় রাজনীতিতে ঝড়ো হাওয়া বইতে শুরু করে। কলকাতা কেন্দ্রিক বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির হিন্দু সম্প্রদায় বাংলাকে *দ্বিখন্ডিত করা যাবে না*-এ দাবি তুলে বাংলা বিভাগ রদের জন্য বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন শুরু করে। আর যুগযুগ ধরে অবহেলিত ও বঞ্চিত পূর্ববাংলা ও আসামের মানুষ চায় এ বাংলা বিভাগ বহাল থাকুক। ঢাকার নবাব স্যার সলিমুল্লাহ তখন পূর্ব বাংলার মানুষের বিশেষ করে মুসলমানদের নেতা। এই সময় নবাব স্যার সলিমুল্লাহ'র সকল জনকল্যাণকর কর্মকান্ডে উদ্বুদ্ধ হয়ে টাঙ্গাইলের নবাব সৈয়দ নওয়াব আলি চৌধুরী তাঁর বিরল সাংগঠনিক প্রতিভা নিয়ে তাঁকে সমর্থন ও অব্যাহত সহযোগিতা দান করেন।[৭০]

এই বাংলা বিভাগ কার্যকরের ফলে রাজনৈতিক দল হিসেবে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এবং বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির হিন্দুরা এর তীব্র বিরোধিতা করতে থাকে। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সুবিধার্থে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে লর্ড কার্জন কর্তৃক বাংলা বিভাগের ফলে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির হিন্দুরা বাংলা বিভাগ বিরোধী তীব্র আন্দোলনে গড়ে তোলে। এ আন্দোলন পরবর্তীতে *বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন* নামে পরিচিতি লাভ করে।[৭১] ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি গোখলেও এ আন্দোলনকে সমর্থন করেন।[৭২] কর্মসূচির অংশ হিসেবে বঙ্গবিভাগ রদ করার দাবিতে কংগ্রেস ১৬ অক্টোবর,২০০৫ খ্রিস্টাব্দেই দেশব্যাপী ধর্মঘট পালন করে। অপরদিকে বঙ্গবিভাগের পক্ষে এবং স্থায়িত্বের জন্য ২২ অক্টোবর,ঢাকার নবাব স্যার সলিমুল্লাহ'র নেতৃত্বে টাঙ্গাইলের ধনবাড়ির জমিদার নবাব সৈয়দ নওয়াব আলি চৌধুরী ও করটিয়ার জমিদার ওয়াজেদ আলি খান পন্নি (চাঁদ মিয়া) বহুমুখী কর্মসূচি পালন করেন।[৭৩] এ ধারাবাহিকতায় ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের ২৭ ডিসেম্বর বৃহস্প্রতিবার সকাল ১০ ঘটিকায় ঢাকায় নবাব সলিমুল্লাহ'র শাহবাগ নামক সুরম্য বাগিচায় নিখিল ভারত মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী অংশগ্রহণ করে পূর্ববঙ্গ ও আসামের শিক্ষা ও উন্নয়ন বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। শিক্ষা সম্মেলন শেষ হলে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের ৩০ ডিসেম্বর রাজনৈতিক অধিবেশন শুরু হয়। অতঃপর ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ' বা 'সর্ব ভারতীয় মুসলিম লীগ' নামক একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের জন্ম লাভ করে।[৭৪] নব গঠিত এ মুসলিম লীগ বাংলা ভাগের সমর্থন প্রয়াসে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করতে থাকে।

সুতরাং যে বাংলা ভাগের প্রস্তাবকে প্রস্তাব রূপেই ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে বাঙালি হিন্দু-মুসলমান নিন্দা করে এসেছে; সে প্রস্তাব ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে কার্যকর হতেই বিদ্রোহ-বহ্নি দ্রুতই ছড়িয়ে পড়ে। ভয়ঙ্কর এই আঘাতে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণি আবেদন নিবেদন বা হাহুতাশ না করে ক্রোধে গর্জে ওঠে। সেদিন সমগ্র ভারতবর্ষ এই বিপদে বাংলার পাশে দাঁড়ায়। বাংলার নেতৃবৃন্দ পরামর্শক্রমে বিদেশি দ্রব্য বয়কটের

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।[৭৫] কলকাতা টাউন হলে আয়োজিত এক বিরাট জনসভায় সভাপতিত্ব করেন কাশিম বাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী। জনতার হাতে-হাতে কালো পতাকায় লেখা সংযুক্তবঙ্গ, একতাই শক্তি, বঙ্গভঙ্গ চাইনা–এসব প্লেকার্ড ও ফেস্টুন হাতে টাউন হলের দিকে অগ্রসর হয়। এমন বিশাল সংহতিপূর্ণ শ্রেণিবদ্ধ শোকযাত্রা ইতোপূর্বে কখনো দেখা যায়নি। টাউন হলেও অভূতপূর্ব ও অপরূপ দৃশ্য! সভায় ছাত্র, শিক্ষক, রাজা, জমিদার ও অগণিত লোকের এতো ভিড় হলো যে; টাউন হলের ভিতরে সকলের স্থানসঙ্কুলান হয়নি। টাউন হলের বাইরের প্রাঙ্গণে অতিরিক্ত সভার ব্যবস্থা করতে হয়। সে সভায় যে চারটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় তা হলো-

(ক) প্রথম প্রস্তাবে বাংলা বিভাগের প্রতিবাদ করে বলা হলো; ইহা অন্যায়, অনাবশ্যক ও স্বেচ্ছাচারিতার পরিচায়ক এবং ইহা বাঙালির সামাজিক, নৈতিক ও আর্থিক অগ্রগতির পরিপন্থি।

(খ) দ্বিতীয় প্রস্তাবে যে পদ্ধতিতে বাংলা বিভাগ প্রস্তাব বাস্তবায়ন করা হবে তার তীব্র নিন্দা করা হয়।

(গ) তৃতীয় এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন শ্রী নরেন্দ্রনাথ সেন। বাংলার সর্বত্র অসংখ্য সভায় বাংলা বিভাগের প্রতিবাদস্বরূপ বিলাতী দ্রব্য বর্জনের যে সকল প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে, এইসভা তা সম্পূর্ণ অনুমোদন করছে এবং যতোদিন বাংলা বিভাগ রদ না হয় ততোদিন বিলাতের লোকের ভারতবর্ষ সম্পর্কে ঔদাসীন্যের প্রতিবাদ স্বরূপ এই বর্জন নীতির প্রতি সম্পূর্ণ সহানুভূতি ও সমর্থন জানাইতেছে।

(ঘ) চতুর্থ প্রস্তাবে বলা হয় যে বাংলা বিভাগ রদ না হওয়া পর্যন্ত এর বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে।[৭৬]

এভাবে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ০৭ আগস্ট কলকাতার টাউন হলে এক বিশাল জনসমাবেশে স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই আন্দোলন দিনে দিনে ব্যাপক ও গভীর হয়ে উঠতে লাগলো। বিদেশি দ্রব্য বয়কট, বিদেশি পরিচালিত স্কুল-কলেজ প্রত্যাহার, বিদেশি চিন্তা বর্জন, ব্যাপক পিকেটিং ইত্যাদি প্রচন্ড আবেগে শুরু হলো। পরিবর্তে স্বদেশী জিনিষ ক্রয়,স্বদেশী পণ্য উৎপাদন, স্বদেশী ভাবাপন্ন হবার শিক্ষাগ্রহণের সংকল্পে বাঙালি এগিয়ে চললো। স্বদেশী আন্দোলন বাংলাদেশের যুব শক্তিকে স্বদেশ প্রেমের নতুন মন্ত্রে দীক্ষিত করলো। সাম্রাজ্যাদীর এহেন সিদ্ধান্তে বিপ্লবী বাংলার জন্ম হলো। বস্তুত স্বদেশী আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিলো ব্রিটিশ বণিকদের কিম্বা ব্রিটিশ আমলাদের দেশ শাসন করতে সাহায্য করতে পারে; এমন কোনো কাজ করতে সংগঠিত ভাবে অস্বীকার করে সেই পরিস্থিতিতে প্রশাসনকে অচল করে দেয়ার মাধ্যমে দেশকে শোষণ মুক্তকরা।[৭৭] এ পদ্ধতি জাতিকে সঞ্জীবনী সুধা যোগায়। জাতির প্রাণে এক নবজাগরণ সূচিত হয়। দেশের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত এক অপরূপ ভাবের প্রবল বন্যায় প্লাবিত হয়। এই বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ শুধুমাত্র বাংলার মধ্যেই

সীমাবদ্ধ থাকেনি; স্বদেশী আন্দোলনের এই ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি পূর্ববাংলা, আসাম ও উড়িষ্যা ছাড়াও যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি প্রভৃতি অঞ্চলে দ্রুত সম্প্রসারিত হয়।

এদিকে নবগঠিত মুসলিম লীগের বাংলা বিভাগ স্থায়িত্বের জন্য নানা কর্মসূচিগ্রহণ এবং ভেদনীতি প্রয়োগ করে ব্রিটিশ সরকার বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির মুসলমানদেরকে এ স্বদেশী আন্দোলন হতে দূরে সরিয়ে রাখার প্রচেষ্টা চালায়। এতদসত্ত্বেও ব্যারিস্টার আবদুর রসুল, লিয়াকত হুসেন, স্যার আবদুল হালিম গজনবি, মুহম্মদ ইসমাইল চৌধুরী প্রমূখ মুসলিম নেতৃবৃন্দ বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। মুসলমান সমম্প্রদায়ের ওপর এর প্রভাব পড়ে। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ২৩ সেপ্টেম্বর কলকাতার রাজাবাজারে ব্যারিস্টার আবদুর রসুলের সভাপতিত্বে মুসলমানদের এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় যে তিনটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় তা হলো;

(ক) বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনের প্রতি মুসলমান সম্প্রদায়ের অসহানুভূতির যে বিবরণ প্রচারিত হয়েছে, এসভা তার প্রতিবাদ করে। এবং দেশের মঙ্গলের জন্য বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির হিন্দুরা যে আদর্শ ও নীতিগ্রহণ করেছে; এর প্রতি মুসলমান সম্প্রদায়ের পূর্ণসমর্থন জ্ঞাপন করা হয়।

(খ) বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ছাড়াও বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির নেতৃত্বাধীন অন্যান্য আন্দোলনে মুসলিম সম্প্রদায়ের যোগদানের কথা ঘোষণা করা হয়; এবং

(গ) স্বদেশী পণ্য সামগ্রীর প্রতি পূর্ণসমর্থন জ্ঞাপন করা হয়।[৭৮]

স্যার আবদুল হালীম গজনবী অন্যান্য কংগ্রেসী নেতার মতো ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলা বিভাগের বিরুদ্ধে অবস্থানগ্রহণ করেন; এবং কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের বাংলা বিভাগ বিরোধী বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন তথা স্বদেশী আন্দোলনে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করেন। এই প্রেক্ষিতে পূর্ববাংলা ও আসাম প্রদেশের প্রথম লেফটেন্যান্ট গভর্নর ব্যামফিল্ড ফুলার তাঁর সম্পর্কে যে মন্তব্য করেন তা উল্লেখযোগ্য। তিনি স্যার আবদুল হালীম গজনবীকে *পথভ্রষ্ট গজনবি* (Wrong Gaznabi) বলে আখ্যায়িত করেন।[৭৯] কেননা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বাংলা বিভাগ বিরোধী আন্দোলন পরিচালনার জন্য গঠিত 'ANTI PARTISION COMMITTEE' এর সক্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন টাঙ্গাইলের স্যার আবদুল হালীম গজনবি ও কৃষ্ণকুমার মিত্র (১৮৫২-১৯৩৭ খ্রি.)।[৮০]

অনুশীলন সমিতির খিদিরপুর শাখা প্রধান শিক্ষাব্রতি আশুতোষ ঘোষ ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি প্রতাপাদিত্য উৎসব উপলক্ষ্যে সর্বপ্রথম *বন্দে মাতরম্* ধ্বনি প্রচার করেন। সমগ্রজাতি *বন্দে মাতরম্* মন্ত্রে দীক্ষিত হলো। প্রত্যেক সভাতেই এ *বন্দে মাতরম্* ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। *বন্দে মাতরম্* সঙ্গীত

এক অভূতপূর্ব উম্মাদনার সঞ্চার করে। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতিনিধি লর্ড কার্জন ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ১৬ অক্টোবর (৩০আশ্বিন,১৩১১) বাংলা বিভাগ কার্যকর করেন। সেই শোকাবহ আশ্বিনের সকালে রবীন্দ্রনাথকে পুরোভাগে রেখে বহুবিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ও বিপুল জনতা শোভাযাত্রা করে গঙ্গাতীরে সমবেত হয়ে পরস্পরের হাতে রাখি বাধে এবং সমস্বরে বলে ওঠে ভাই ভাই এক ঠাঁই। জাতীয় একতা বৃদ্ধির জন্য রাখী বন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। রবীন্দ্র হৃদয়ের গভীর থেকে উৎসারিত সঙ্গীত মুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র বাংলায়-

বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু,বাংলার ফল
পুণ্য হউক,পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান।
... ...
বাঙালির প্রাণ,বাঙালির মন,বাঙালির ঘরে যত ভাই-বোন–
এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান।[৮১]

সারা বাংলা উত্তাল হয়ে উঠলো। ১৬ অক্টোবর ধর্মঘট পালিত হলো। সেদিন ঘরে ঘরে অরন্ধন ও উপবাস পালন করে নগ্নপদে মহামিছিলে শামিল হলো লক্ষ লক্ষ জনতা। স্বদেশী গানে আকাশ বাতাস ভরিয়ে দিয়ে বাংলার মানুষ নিজের সত্তাকে গভীরভাবে ভালোবাসতে শিখে। রবীন্দ্রনাথ নিজের হাতে হিন্দু-মুসলিম তথা আপামর বাঙালির ঐক্য প্রতীক রাখি বেধে দিলেন নাখোদা মসজিদের ইমাম সাহেবের মণিবন্ধে। বাংলা বিভাজনের বিরুদ্ধে সগর্জনে প্রতিবাদ জানালো সমাজের সর্বস্তরের মানুষ। বাঙালি অনুভব করলো *জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী*।[৮২] কালক্রমে বাংলার উম্মাদনা ভারতবর্ষের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এবং স্বাধীনতার পথ সুগম হয়। স্বদেশী যুগে প্রচলিত কয়েকটি সঙ্গীত উল্লেখিত হলো।

বন্দে মাতরম্
সুজলা সুফলাং মলয়জ শীতলাং
শস্য শ্যামলাং
বহুবলধারিনীং নমামী তারিণীং
রিপুদল বারিনিং মাতরম।[৮৩]

উপরোল্লিখিত সঙ্গীতে মূলত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টপাদ্যায় দেশ জননীর খন্ডিত রূপ দেখতে চান নাই। দেশভক্তির সংকীর্ণতা কাটিয়ে উঠবার জন্য চাই পরিপূর্ণরূপ। নতুবা দেশসেবার দর্শন মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়। *বন্দে মাতরম্* মন্ত্র দেশভক্তের, দেশসন্তানের রক্ষাকবচ। এই কবচ তার সন্তানকে দেশ সেবার প্রেরণাই শুধু দিবে না, দেশজননী যে বিশ্বজননীরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ–এ সত্যও উপলব্ধ হবে। পরবর্তীকালে একথাই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখনীতে মূর্ত হয়ে ওঠে;

‘ও আমার দেশের মাটি
তোমার পরে ঠেকাই মাথা,

তোমাতে বিশ্বময়ীর, তোমাতে বিশ্ব মায়ের

আঁচল পাতা।'[৮৪]

বাঙলার মধ্যবিত্ত শ্রেণি ও ছাত্র সমাজ যে উম্মাদ হয়ে ওঠে। পরাধীনতার ঘৃণ্যরূপ প্রত্যাখ্যান করে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার হৃদয়মথিত প্রতিজ্ঞার প্রতিচ্ছবির কাব্যিক চিত্রায়ন কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলমে এভাবে মূর্ত হয়ে ওঠে;

স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে
কে বাঁচিতে চায় ।
দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় রে
কে পরিবে পায় ? [৮৫]

কবি হেমচন্দ্র তুর্য্য নিনাদ রবে গেয়ে উঠেন;

বাজরে শিঙ্গা বাজ এই রবে–

সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে

সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে

ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।[৮৬]

কবি রজনীকান্ত সেন স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারে উৎসাহ দিয়ে বলেন;

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই,
মা যে মোদের দীন দুঃখিনী তার বেশী আর সাধ্য নাই।[৮৭]

ইউরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ১৯০৪-০৫ খ্রিস্টাব্দের বিশাল রুশ-জাপান যুদ্ধে ক্ষুদ্র ও অখ্যাত জাপানের নিকট পরাজিত হওয়ায় বিপ্লবী বাংলার যুব শক্তি ভরসা খুঁজে পায়। সামান্য শক্তি নিয়ে জাপান যদি রাশিয়ার মতো একটি বিশাল ও পরাক্রমশালী শক্তিকে পরাজিত করতে পারে, তবে অফুরন্ত ধন-সম্পদের অধিকারী বিশাল ভারতবর্ষের ৩০কোটি মানুষ কেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে পরাজিত করতে সক্ষম হবেনা? বাংলার যুবশক্তি নতুন আশায় বুক বেধে এক নতুন বৈপ্লবিক সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হয়।[৮৮] ক্রমে বাংলার বৃহত্তর একটি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন নিরস্ত্র যুদ্ধের টেকনিকে গড়ে উঠে। বয়কট, পিকেটিং এবং কর্মক্ষেত্রে হাসিমুখে ব্রিটিশের নির্যাতন উপেক্ষা করে বাঙালি দীপ্তপদে এগিয়ে যাবার শপথগ্রহণ করে। আবাল, বৃদ্ধ, বণিতা এ যুদ্ধে কেউ পিছিয়ে থাকেনি। দেশবরেণ্য নেতা আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, বিপিনচন্দ্র পাল, কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিত্তরঞ্জন দাশ, আবদুর রসুল, লিয়াকৎ হোসেন, সরলাদেবি, ভগ্নি নিবেদিতা, সখাগণেশ দেউস্কর, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়,অশ্বিনী কুমার দত্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র থেকে শুরু করে শিশু-বৃদ্ধ, সাধারণ নরনারী পর্যন্ত, প্রত্যেক বঙ্গবাসী এই স্বদেশী আন্দোলনকে বাংলার একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত অবধি বিপুল ব্যাপকতায় জীবন্ত করে তোলেন।

বেতমেরে, আগুনে দগ্ধ করে, কারাগারে নিক্ষেপ করে, হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা বাধিয়ে, সংবাদপত্র দাবিয়ে, পাইকারী অর্থদন্ডের আঘাত দিয়ে এই আন্দোলন ব্রিটিশ থামাতে পারল না। বাঙালির একাত্মবোধ, স্বাজাত্য-গরিমা এবং স্বদেশপ্রেম সমগ্র ভারতবর্ষকে অনুপ্রাণিত করে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *বন্দেমাতরম্ ধ্বনি* অক্ষয়কবচ হয়ে সকলকে মনে-প্রাণে অসামান্য সাহস যোগাল। এই যৌবন জলতরঙ্গ লক্ষ্য করে ইংরেজ আমলা *স্যার হেনরি কটন* (Henry Cotton) পর্যন্ত বলেন: Babus from Bengal, streneous and able,who rule and controle public opinion from Peshwar to Chittagong.[৮৯] অর্থাৎ, বাঙালিরা চট্টগ্রাম থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষের জনমত বাংলা বিভাগ বিরোধী আন্দোলনের স্বপক্ষে আনতে সক্ষম হয়েছে। এদিকে অরবিন্দকুমার ঘোষ বলেন: Tyrants have tried but have they ever succeeded in repressing the natural love of Freedom in man? Repressed it has grown in strength;crushed under the heel of the tyrant, it has assumed a myriad forms.[৯০] অর্থাৎ, অত্যাচারী শাসক কোনো কালে কি মানুষের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা শাসনের আঘাতে দমাতে পেরেছে ? অত্যাচারে স্বাধীনতার প্রতি এই ভালবাসা অধিক শক্তি লাভ করে আর শাসকের পদতলে পিষ্ঠ হয়ে এররূপ আরো শতদলে বিকশিত হয়। আর তাই অরবিন্দকুমার ঘোষ এ বাংলা বিভাজনকে পরম আনন্দেগ্রহণ করেন: He (Arobindo) regarded the partition of Bengal as the greatest blessing that had ever happened in India.No other measure could have stirred national feeling so deeply or roused it so suddenly from lethergy of previouse year.[৯১] অর্থাৎ,অরবিন্দকুমার ঘোষ বাংলা বিভাগকে ভারতীয়দের জন্য সর্বোত্তম আশীর্বাদ মনে করেন। অন্য কোনো ঘটনাই এতো কালের জড়তা এতো সহজে দূর করে জাতির জীবনে জাতীয়তাবোধের এ গভীর ও তীব্র অনুরাগ জাগ্রত করতে পারতো না।

বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির নেতৃত্বাধীন বঙ্গবঙ্গ আন্দোলন তাই বাংলার জীবনে নিষ্পত্তিকৃত বিষয় (settle facts) কে অস্থির (unsettled) করে তোলার পূর্বপর্যন্ত দুরন্তবেগে বৃহৎ ও ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয়ে চলেছিল। কখনো একটু থামেনি। দীর্ঘ আটবছরের (১৯০৩-১৯১১) অবিরাম সংগ্রামে কখনো মানুষের মনে ক্লান্তি আসেনি। ১৯০৩ খিস্টাব্দের ০৩ডিসেম্বর বাংলাকে ভাগ করার প্রস্তাব করেন লর্ড কার্জন। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের ১২ ডিসেম্বর বাংলা বিভাগ রদ (বাতিল) ঘোষণা করে দুই বাংলাকে আবার যুক্ত করেন স্বয়ংসম্রাট পঞ্চম জর্জ।[৯২] অন্তর্বর্তী এই ০৮ বছর ১০ দিন ধরে বাঙালির অবিরাম সংগ্রামে বিস্মিত ভারতবর্ষকে সন্দেহাতীত ভাবে আত্মপ্রত্যয়ী করেছে। বাঙালির এই কীর্তি বিপ্লবীদেরই কীর্তি। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন একপর্যায়ে স্বরাজ দাবিতে পর্যবসিত হয়। স্বাধীকার চেতনা বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে শুরু থেকেই ফল্গুধারার ন্যায় বহমান ছিল। নানা বৈপ্লবিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে এই চেতনা ভারতীয়দের

শাণিত করে স্বাধীনতা দাবিতে উন্নীত হয়। ব্রিটিশ সরকারকে ভারত থেকে উৎখাতের আশাবাদ জাগ্রত হয়।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের এ সাফল্যের আড়ালে ব্রিটিশ চাতুর্য লক্ষ্যণীয়। দাবি পূরণ হলো বটে; তবে নতুন রকমের অঙ্গচ্ছেদে;পূর্বের অঙ্গে ফিরে এলোনা। আসাম পূর্বের মতো চীফ কমিশনারের প্রদেশ হলো; গোয়ালপাড়া ও কাছাড় সাথে নিয়ে গেল। কর্তিত পূর্ববঙ্গ পূর্বের ন্যায় পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে মিলে গেল। পশ্চিমবঙ্গ থেকে পৃথক হয়ে বিহার ও উড়িষ্যা স্বতন্ত্র প্রদেশ হলো; বিহারে মানভূম, ধলভূম, সাওতাল পরগণা ও পূর্ণিয়া জুড়ে দেয়া হলো। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়; ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে চলে গেল দিল্লিতে।[৯৩] এর মাধ্যমে কলকাতাকে রাজনৈতিক মোড়লীপনা থেকে কার্যত সরিয়ে দেয়ার কৌশল প্রতিভাত হয়।

বাংলা বিভাগ রদ করার পর স্বাভাবিক ভাবেই বয়কট ও পিকেটিং থেমে যায়। প্রকাশ্য আন্দোলন প্রত্যাহৃত হয়। কিন্তু গোপন পথে বৈপ্লবিক অভিযাত্রা থামেনি।[৯৪] বাংলাদেশে বঙ্গ বিভাগ না হলেও এ বৈপ্লবিক সংগ্রাম দেখা দিতো। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ইন্ধন যোগায় মাত্র। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, বৈপ্লবিক চরিত্র নিয়ে ব্রিটিশ বিরোধী যে সংগ্রাম আরম্ভ হয় তার পক্ষে বঙ্গ বিভাজন ছিল একটি উপলক্ষ মাত্র, কারণ নয়।[৯৫] এ দুর্জয় গতি অরবিন্দ ঘোষের নেতৃত্ব থেকে ক্রমান্বয়ে জ্যোতিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘাজ্যোতিন)-রাসবিহারী বসু-সূর্যসেন-নেতাজি সুভাসচন্দ্র বসু প্রমুখ বহু জানা-অজানা নায়কের নেতৃত্বে দীর্ঘ পঞ্চাশবছরের বন্ধুর পথে পরিচালিত হয়ে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের ১৮ আগস্ট নেতাজির মৃত্যুজনিত কারণে থেমে যায়।

এদিকে বাংলা বিভাগ বিরোধী বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন চলাকালে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের শেষ দিকে বারাণসীতে গোপালকৃষ্ণ গোখলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের অধিবেশনেও আপস নীতির কারণে বিক্ষুব্ধ কর্মীদের নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়নি। একপর্যায়ে বিপ্লবপন্থিরা অধিবেশন ত্যাগ করে চলে যায়। কিন্তু একপর্যায়ে আপসপন্থিরা শর্তাধীনভাবে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের অনুকুলে ব্রিটিশ-পণ্য বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য হন।[৯৬] ইতোমধ্যে স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের কলকাতা অধিবেশনে কংগ্রেসের নরমপন্থি ও বিপ্লবপন্থিদের মধ্যে বিরোধ তীব্রতর হয়ে ওঠে। নরমপন্থিরা বয়কটের সমর্থনে প্রস্তাব গ্রহণ করতে অসম্মত হন। কিন্তু অবস্থা বেগতিক দেখে অধিবেশন সভাপতি দাদাভাই নওরোজী ঘোষণা করেন যে, ভারতের জনগণের সংগ্রামের লক্ষ্য হলো স্বরাজ লাভ।

১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে সুরাটের ২৩ তম অধিবেশনে সভাপতি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে উভয় গ্রুপের মধ্যে বিরোধ চরম আকার ধারণ করে। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি সভাপতি হিসেবে রাসবিহারী ঘোষের নাম সমর্থন করলে হাতাহাতির মাধ্যমে গোলমাল শুরু হয়ে সভামঞ্চ রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। এই ঘটনার পর চরমপন্থিরা অরবিন্দকুমার ঘোষের নেতৃত্বে দলত্যাগ করায় কংগ্রেসে নরমপন্থি নেতৃত্ব অক্ষুণ্ন থাকে। এভাবে কংগ্রেস দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। কংগ্রেস সম্পূর্ণরূপে আপস পন্থিদের অধিকারে চলে যায়। আপস পন্থিরা দেশের রাজনীতি সচেতন ভারতীয় বিশেষত; যুবসম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা ও সমর্থন হারিয়ে ছোট একটি গোষ্ঠীতে পরিণত হয়। কিন্তু দেশের স্বাধীনতাকামী যুবশক্তি চরমপন্থিদের নেতৃত্বই মেনে নেয়ায় বৈপ্লবিক সংগ্রাম প্রধান্য লাভ করে।[৯৭] তারা স্বাধীনতা অর্জনের প্রচেষ্টায় মরণ নেশায় উন্মুখ হয়ে পড়ে। বিপ্লবী যুবসম্প্রদায় স্বীয় জীবনবাজি রেখে নানান কর্মসূচি বাস্তবায়নে ঝাপিয়ে পড়ে। তারা আইরিশ জাতীয়তাবাদী, রুশ নিহিলিস্ট ও পপুলিস্টদের পদ্ধতি অনুকরণ করার সিদ্ধান্ত নেয়।[৯৮]

১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর *এন্ড্রু ফ্রেজার* (Andrew Henderson Leith Frazer) হত্যা প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়া সত্ত্বেও বৈপ্লবিক কর্মকান্ড থেমে থাকেনি। যুগান্তরের পরিচালকগণ কলকাতার অত্যাচারী চীফপ্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট *কিংসফোর্ড* (Douglas Kingsford) কে হত্যার সিদ্ধান্ত নেয়। তিনি এক বালককে বেত্রদন্ডের আদেশ দেন এবং কলকাতার প্রকাশ্য আদালতে বালকটির ওপর নিষ্ঠুরভাবে বেত্রদন্ড প্রয়োগ করা হলে তার বিরুদ্ধে ক্ষোভের সৃষ্টিহয়। বারীন্দ্রকুমার ঘোষ এইকর্ম সম্পাদনের জন্য ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকীকে ভার দেন। ইতোমধ্যে কিংসফোর্ড বিহারের মুজাফফ্রপুর বদলি হওয়ায় অর্পিত দায়িত্বপালনে তাঁরা মুজাফফ্রপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের ৩০ এপ্রিল ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী বিচারপতি *কিংসফোর্ডকে* হত্যার উদ্দেশ্যে বোমাহামলা চালায়। কিন্তু ভূলক্রমে কিংসফোর্ডের গাড়ীভেবে অপর একটি গাড়ীতে বোমামারা হয়। ঐগাড়ীতে থাকা ব্যারিস্টার কেনেডির স্ত্রী ও কন্যা হত্যাকান্ডের শিকার হয়। প্রফুল্ল চাকী পুলিশে ধরাপড়ার ভয়ে আত্মহত্যা করলেও ক্ষুদিরাম বসু পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। বিচারে ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের ১১ আগস্ট ক্ষুদিরাম বসুর ফাঁসি কার্যকর করে। ক্ষুদিরাম বসুর মৃত্যুতে হাজার হাজার নরনারী চোখের জল ফেলে। অচিরেই তাঁরা জাতীয় বীরে পরিণত হয়। এই ধরনের বৈপ্লবিক সংগ্রামে আগ্রহী যুবকদের সংখ্যা দিনকে দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। বাঙালি প্রবেশ করে বৈপ্লবিক যুগে। অচিরেই সারা দেশে গড়ে উঠতে থাকে নানান গুপ্তসমিতি। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ও দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল অনুশীলন সমিতি ও যুগান্তর দল। তারা দু'ধরনের বৈপ্লবিক কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করেছিল; (ক) অত্যাচারী অফিসার এবং নিজেদের দলের মধ্যকার গুপ্তচর ও বিশ্বাসঘাতকদের হত্যার কর্মসূচি গ্রহণ; এবং (খ)দ্বিতীয়ত অস্ত্রশস্ত্র ক্রয়ের জন্য অর্থসংগ্রহে উদ্দেশ্যে ডাকাতি করা আরম্ভ করে।[৯৯]

ব্রিটিশ সরকার এই সকল বৈপ্লবিক কর্মকান্ড কঠোরহাতে নিয়ন্ত্রণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দ হতে সরকার উম্মত্তের মত দমননীতি প্রয়োগ করতে আরম্ভ করে।একমাত্র বাংলাদেশেই ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দ হতে ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কমপক্ষে ৫৫০টি রাজনৈতিক মামলা দায়ের করা হয়। চরমপন্থি ও বৈপ্লবিক নেতৃবৃন্দকে বিনা বিচারে আটক করার অভিপ্রায়ে ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে কুখ্যাত '১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের ৩নং আইন পুনঃপ্রবর্তিত এবং রাজদ্রোহমূলক জনসভা আইন হয়। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে বিস্ফোরক দ্রব্য-আইন ও প্রেস আইন ভারতবর্ষকে প্লাবিত করে। কিন্তু এত উৎপীড়ন ও দমনমূলক ব্যবস্থা সত্ত্বেও ভারতে ব্রিটিশ-বিরোধী সংগ্রাম ও বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা কিছুমাত্র হ্রাস প্রাপ্ত না হয়ে তা ক্রমশ দেশের সর্বত্র বিস্তার লাভ করে। বৈদেশিক শাসনকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়। কলকাতার যুগান্তর, সন্ধ্যা ও বন্দেমাতরম পত্রিকার প্রচার-সংখ্যা দ্রুত বেড়ে যায়। কার্জনের বঙ্গবিভাগ বিরোধী বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন মথিত অগ্নিস্ফুলিংগ বাংলা ও ভারতবর্ষের অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশকে রঞ্জিত করে তোলে। বাঙালি জাতির নেতৃত্বে পরাধীন ভারতে সে বিপ্লব প্রচেষ্টার মধ্যদিয়ে সর্বপ্রথম তাঁর শ্রেষ্ঠতম ঐতিহাসিক অবদান স্বরূপ পূর্ণস্বাধীনতার রণধ্বণি ঘোষণা করে। এভাবে ভারতবর্ষ পরবর্তীতে বৈপ্লবিক স্বাধীনতা সংগ্রাম প্রচেষ্টার মঞ্চে অবতীর্ণ হয়।

প্রচলিত বিশ্বাস এই যে স্বদেশী আন্দোলনের ফলে বাংলায় গুপ্তসমিতির আবির্ভাব ঘটে। কিন্তু প্রকৃত সত্য হলো স্বদেশী আন্দোলনের বহুপূর্বে বাঙলায় বৈপ্লবিক গুপ্তসমিতির আত্মপ্রকাশ ঘটে।এবং তাদের বৈপ্লবিক কর্মপ্রয়াস শুরু হয়। বঙ্গবিভাগের দরুণ আক্ষেপের ফলে আবির্ভূত হয় নাই। এটি বাঙালির শিক্ষা ও রাজনৈতিক জীবনোভিজ্ঞতার ফল।[১০০] তবে বঙ্গবিভাগ বিরোধী বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন মথিত স্বদেশী আন্দোলনের মাধ্যমে এ গুপ্তসমিতি গুলোর বৈপ্লবিক কর্মকান্ড গতিপায়। অরবিন্দকুমার ঘোষ প্রথমেই বলেছিলেন, নিপীড়িত জনসংখ্যার এক বড়অংশ অশান্ত না হলে বিপ্লব কখনোই ভিত গড়তে পারবে না।[১০১] বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা কোন ব্যক্তি বিশেষকে আশ্রয় করে সাময়িক প্রয়োজনে গড়ে উঠে নাই। জাতির স্বতঃস্ফুর্ত দেশাত্মবোধ নানা ভাবসংঘাতে রূপান্তরিত হয়ে বিপ্লব আকারে আত্মপ্রকাশ করে। যদি কোন ব্যক্তিবিশেষকে কেন্দ্র করে বাংলার ওই জাগরণ সূচিত হতো, তবে নেতাদের অবর্তমানে তাতে স্বভাবতই যবনিকাপাত ঘটতো। কিন্ত কতগুলো সমর্পিতপ্রাণ-কর্মী সর্বনিরপেক্ষ হয়ে উক্তপ্রেরণা স্বীয় মানসলোক হতে লাভ করেছিল। সহায় সম্বলহীন এ আদর্শ বিপ্লববাদীরা নিজেদের ভাবকে নিজেরাই সৃষ্টি করেছে; পাথেয় নিজেরাই পুষ্ট করেছে। বাংলার বিপ্লবীরা এই আন্দোলনকে ব্যক্তি বিশেষের নেতৃত্বের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখে নাই। সমবেত প্রচেষ্টার মাধ্যমে চলার পথের ভূলভ্রান্তি

ও সত্যমিথ্যা পরীক্ষা করে নিয়েছে। নেতার আদেশে তারা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছে বটে; কিন্তু নেতার আসন কোনোদিনই দেশমাতৃকার ওপর স্থান লাভ করতে পারে নাই।[১০২]

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের স্বদেশী আন্দোলনের সদ্ব্যবহার করে অরবিন্দকুমার ঘোষ বাংলায় বৈপ্লবিক সংস্থার পত্তন করেন এবং বৈপ্লবিক আন্দোলনকে তুঙ্গে তোলেন।[১০৩] তাঁর পাশে ছিলেন লোকমাতা নিবেদিতা, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, যতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘাজ্যোতিন), উল্লাসকর দত্ত, দেবব্রত বসু প্রমুখ তরুণ যুবশক্তির সহায়ক সমাবেশ।[১০৪] প্রমথনাথ মিত্রের (পি.মিত্র) সঙ্গে অরবিন্দকুমার ঘোষের সাংগঠনিক যোগাযোগ সত্ত্বেও সশস্ত্র-বিপ্লবের চিন্তা তাঁর কর্মকান্ডে ছিল না। তিনি অনুশীলন সমিতিকে একটি ব্যায়াম ও শরীর চর্চা ও চরিত্র গঠনমুলক প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছিলেন।[১০৫] সারা বাংলায় অনুশীলন সমিতির প্রসার ও কার্যক্রম বৃদ্ধির লক্ষ্যে এর প্রতিষ্ঠাতা ও সর্বাধিনায়ক প্রমথনাথ মিত্রের (পি.মিত্র) অভিপ্রায়ে পশ্চিমবঙ্গ অনুশীলন সমিতির সম্পাদকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন সতীশচন্দ্র বসু এবং ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে পুর্ববঙ্গে অনুশীলন সমিতির শাখা প্রতিষ্ঠা করে পুলিনবিহারী দাশের ওপর সম্পাদকের ভার ন্যস্ত করেন।[১০৬] পুলিনবিহারী দাশ তাঁর অতুলনীয় দক্ষতাবলে অনুশীলন সমিতিকে অতি সঙ্গোপনে দেশব্যাপী বিপ্লবী সমিতিতে রূপান্তরিত করেন। এই বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠানের সর্বাধিনায়ক ছিলেন পুলিনবিহারী দাশ কিন্তু প্রমথনাথ মিত্রের (পি.মিত্র) সাথে উক্ত প্রতিষ্ঠানের কোনো সম্পর্ক ছিল না বলে জানা যায়।[১০৭] 'বন্দেমাতরম্'[১০৮] কে বিপ্লবের মন্ত্র হিসেবে গ্রহণ করে তারা বৈপ্লবিক কর্মে নেমে পড়ে। তাদের এহেন কর্মের পক্ষে বিপ্লবীরা যে যুক্তি উত্থাপন করেন তা হলো; যে দেশে রাজশক্তি পশুবলকে সহায় করে প্রজাকে উৎপীড়ন করে, সে দেশে নৈতিক বলের সাহায্যে বিপ্লব বা রাজ পরিবর্তন আনয়ন করা অসম্ভব। সেখানে প্রজাকেও পশুবলকে সহায়ক শক্তি হিসেবে গ্রহণ করতে হয়।[১০৯]

প্রকৃতপক্ষে 'ভাইসরয় লর্ড কার্জন ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলা ভাগ কার্যকর করলে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণি প্রতিবাদে গর্জে উঠে এবং বাংলা বিভাজন বিরোধী বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন গড়ে তোলে।[১১০] এই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের মাধ্যমে বৈপ্লবিক তথা সশস্ত্র আন্দোলনের ধারা উত্তরোত্তর শক্তিশালী হয়ে উঠে।[১১১] বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিপ্লব প্রচেষ্টাকে আমরা চারটি স্তরে ভাগ করতে পারি;

(ক) প্রথম স্তর ১৯০৫[১১২] থেকে ১৯১৪ খ্রি. বা রাষ্ট্র-প্রতীক বা ব্যক্তি বিশেষ নিধন পর্ব ।

(খ) দ্বিতীয় স্তর ১৯১৪ থেকে ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাধ্যতামূলক সম্মুখ সংঘর্ষ এবং নতুনতর প্রস্তুতি পর্ব।

(গ) তৃতীয় স্তর ১৯৩০ থেকে ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ বা খন্ড অভ্যুত্থান পর্ব[১১৩] এবং

(ঘ)চতুর্থ স্তর ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দ বা বিপ্লব বা শেষ পর্ব।[১১৪]

বাঙালির প্রথম পর্বের বৈপ্লবিক কার্যক্রমে দুঃসাহসী যুবকেরা প্রয়োজনে ব্রিটিশ কর্মকর্তা ও তাদের স্বজন এবং তাঁবেদার তথা ভারতের শত্রুদের একটির পর একটি করে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজকে ভীত করা, দেশবাসীকে ভয়হীন করে তোলা; ইংরেজ শাসন না মানা। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলার লেফটোন্যান্ট গভর্নর এন্ড্রু হিন্ডারসন ফ্রেজার হত্যার প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়া সত্ত্বেও একই উদ্দেশ্যে ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্লচাকী মুজাফফরপুরের ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যার চেষ্টা করে;কিন্তু ভুলক্রমে মিসেস কেনেডি ও তার কন্যা মিস কেনেডি হত্যাকান্ডের শিকার হয়। এ হত্যাকান্ড থেকে শুরু করে ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের ২৩ ডিসেম্বর দিল্লিতে বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জের ওপর বোমাবর্ষণের ঘটনা পর্যন্ত সকল বৈপ্লবিক কার্যক্রম প্রথম পর্বের আওতাভুক্ত হবে। বিপ্লব প্রচেষ্টার প্রথম পর্যায়ে বাংলায় ডাকাতি ও গুপ্তহত্যার প্রচলন হয়। কিন্তু ডাকাতি বা গুপ্ত হত্যা বীরত্বের লক্ষণ নয়। এ পদ্ধতি অবলম্বন না করে কোনো বীরজাতি সম্মুখযুদ্ধ করাই শ্রেয় মনে করে।[১১৫] এই রীতি জানা সত্ত্বেও নেতৃবৃন্দকে এ ধরণের বিপজ্জনক পথে অগ্রসর হতে হয়। বৈপ্লবিক সমিতি প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে অর্থের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। সমিতিরি শাখা প্রশাখা ও সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য অধিক অর্থের যোগান অপরিহার্য হয়ে পরে। কিন্তু মধ্যবিত্ত শ্রেণির যুবকদের হাতে অর্থ-সম্পদ না থাকায় শুধুমাত্র স্বাধীনতার বুকভরা স্বপ্ন নিয়ে ব্রিটিশ বিতাড়নের পথে অগ্রসর হয়।[১১৬]

প্রকৃতপক্ষে অনুশীলন সমিতির মধ্যে একত্রে কাজ করলেও বারীন্দ্রকুমার ঘোষের অনুগামীদের সাথে প্রমথনাথ মিত্রের (পি.মিত্র) অনুসারীদের দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য ছিল। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে অরবিন্দকুমার ঘোষ কলকাতায় আসার পর তাঁর মদদে রাজনৈতিক ডাকাতি শুরু হয়। ডাকাতি করে অর্থ সংগ্রহের বিষয়টি নিয়ে অনুশীলন সমিতির মধ্যে বিতর্ক দেখা দেয়; এই প্রক্রিয়ায় নৈতিক অধঃপতন ঘটবে বলে অনেকে মনে করে। অন্যদিকে বিপ্লবাত্মক প্রস্তুতির জন্য অর্থাৎ অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ প্রভৃতির জন্য যে ব্যাপক পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, দু'চারজন দেশ হিতৈশী ব্যারিস্টারদের নিকট থেকে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য পাওয়া যায়; কিন্তু প্রয়োজনীয়তা লাঘব হয় নাই। কার্যত দেশের লোক টাকা দেয় নাই। রাসবিহারী ঘোষ বা চিত্তরঞ্জন দাশের মতো সঙ্গতি সম্পন্ন ব্যক্তিদের কাছে ডাকাতির সমর্থকরা পরিষ্কার ভাবেই বলেছিলেন, তাঁরা যদি অর্থের প্রয়োজনীয় সংস্থান করে দিতে পারেন; তবে রাজনৈতিক ডাকাতি থেকে নিবৃত্ত থাকা সম্ভব হবে। কিন্তু প্রয়োজনীয় অর্থের আশ্বাস না পাওয়ায় ডাকাতির সিদ্ধান্তই বহাল থাকে। বলাবাহুল্য ডাকাতির মাধ্যমে অর্থসংগ্রহের পক্ষে সমর্থন জোরদার হওয়ায় অনুশীলন দলের মধ্যে সঙ্কট দেখা দেয়। প্রমথনাথ মিত্র (পি.মিত্র), চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখ ডাকাতির বিরোধিতা করে। প্রকৃতপক্ষে অর্থ

সংগ্রহের এই প্রক্রিয়ার আড়ালে প্রমথনাথ মিত্র (পি.মিত্র) পন্থি এবং অরবিন্দকুমার ঘোষপন্থিদের লড়াই প্রথম পর্যায় থেকেই শুরু হয়। অবিনাশ ভট্টাচার্য, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, প্রমুখ অরবিন্দকুমার ঘোষের পক্ষে সুদৃঢ় অবস্থান নেয়।[১১৭] অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছায়; প্রয়োজনীয় অর্থসংগ্রহ করা না গেলে বৈপ্লবিক কর্মকান্ড বন্দের উপক্রম হওয়ায় শেষাবধি ডাকাতির সিদ্ধান্তই বহাল থাকে।[১১৮] তবে গুপ্তবৈপ্লবিক সমিতি গুলোতে অর্থসংগ্রহের একৌশল প্রথম থেকেই অনুসৃত হয়[১১৯] বলে ধরে নেয়া যায়।

যতদূর জানা যায় ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের বিপ্লবীদের প্রথম ডাকাতির চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। যুগান্তর দলের কয়েকজন অল্পবয়স্ক সদস্যদের দ্বারা কলকাতার উপকণ্ঠ, কড়েয়া ও তারকেশ্বরে ছোটখাট ঘটনা সংগঠিত হয়; তবে তা বিপ্লবাত্মক নয়, রাহাজানি পর্যায়ে পড়ে। তারকেশ্বরের জনৈক ব্যক্তির গৃহে যথেষ্ট টাকা আছে মর্মে খবর পেয়ে তারা সেখানে যায়। কিন্তু নির্দিষ্ট গৃহে কেবলমাত্র কয়লার বড়ো বড়ো স্তুপ দেখতে পেয়ে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে আসে। এর কয়েকদিন পর অনুশীলন সমিতিরি সদস্যরা নারায়ণগঞ্জে এক গৃহস্তের বাড়ি ডাকাতি করে একহাজার রৌপ্য-মুদ্রাপূর্ণ থলে হস্তগত করে। কিন্তু ডাকাতি করে ফেরার পথে বেখেয়ালে থলের ফুঁটো দিয়ে মাত্র আঁশি টাকা ব্যতীত বাকী অর্থের সবই পথে পড়ে যায়।

১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে রংপুরে মাহিপুর গ্রামে এক বিধবার গৃহে ডাকাতির উদ্দেশ্যে রাত্রি বেলায় উপস্থিত হয়। কিন্তু তথায় দারোগার উপস্থিতির সংবাদে ভয়ে দ্রুত এলাকা ত্যাগ করে। একই বৎসর সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে ঢাকার শেখনগর নামকস্থানে ডাকাতি করতে যেয়ে এক লোহার সিন্ধুক পায়। চাবি না পেয়ে সিন্ধুকটি ভাঙ্গতে অসমর্থ হয়ে সেটি নৌকায় তোলা হয়। কিন্তু লোহার সিন্ধুকটির ভারে নৌকা ডুবে যায়। বিপ্লবীরা সামান্য কিছু টাকাসহ হতাশাগ্রস্ত মনে প্রত্যাবর্তন করে। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে নয়-দশ জনের একটি দল ঢাকার আশুলিয়ায় এক পাটগুদামে ডাকাতি করতে যায়। কিন্তু ঐ গুদামে একটি দোনালা বন্দুক আছে জানামাত্র তারা ঐএলাকা ত্যাগ করে। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বিপ্লবী উল্লাসকর দত্ত ও হেমচন্দ্র দাশ বোমা তৈরি করতে সক্ষম হন।[১২০] বিপ্লবীদের প্রাথমিক চেষ্টার ব্যর্থতা সত্ত্বেও বোমা তৈরির সক্ষমতা অর্জন করায় বিপ্লবীদের বৈপ্লবিক আক্রমণের ধারা পাল্টে যায়। তারা আরও দুঃসাহসিক অভিযানের সাফল্য অর্জন করার মাধ্যমে সশস্ত্র বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার এক উচ্চতম স্তরে উন্নীত হয়।

চাঁদার দ্বারা অর্থ সংগ্রহের আশা ১৯০৩/০৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বলবৎ ছিল। তখন অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি, ধনী জমিদারও বিপ্লবের জন্য টাকা দিতে সম্মত ছিলেন। কিন্তু আলীপুর বোমার মামলায় নরেন গোস্বামীর স্বীকারোক্তির পরে তারা চাঁদা দিতে অস্বীকৃতি জানায়। ডাকাতি ছাড়াও বিকল্প হিসেবে জাল

নোট তৈয়ার ও উহার প্রচলন প্রয়াস চলে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে কমপক্ষে চারবার এধরণের প্রচেষ্টা চলে। কিছুটা সাফলতাও ঘটে। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় মাদারীপুর দলের নায়ক পূর্ণ দাশ এই কাজে আত্মনিয়োগ করেন। টাকশাল হতে ছাপ নেয়ার ব্যবস্থাও হয়। কিন্তু যাকে বিশ্বাস করে এই কাজে নামেন সে ব্যক্তিই পুলিশে খবর দিয়ে পূর্ণ দাশকে ধরিয়ে দেয়। এক পর্যায়ে কৃত্রিম সোনা তৈরির প্রক্রিয়ায় অর্থসমস্যা মোকাবেলার চেষ্টা হয়। বাঙালি বিজ্ঞানী অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় এটি সম্ভব মর্মে অভিমত জ্ঞাপন করায় শ্রীমানী মার্কেটের উপরতলার এক গোপনকক্ষে পূর্ব নির্দিষ্ট ব্যবস্থা মতে মোক্ষদা সামাধ্যায়ী তাকে নিয়ে আসেন। বিপ্লবীদের আশ্বস্থ করে অঘোরনাথ বলেন এই পদ্ধতিতে অর্থ সমস্যার সমাধান হতে পারে। কিন্তু এ প্রক্রিয়াটিও আর এগোয়নি।[১২১]

ডাকাতি পরিহারের প্রত্যয়ে অর্থ সমস্যা সমাধানের যেকোনো বিকল্প প্রস্তাব বিপ্লবীরা আগ্রহ সহকারে কার্যে পরিণত করার চেষ্টা করেছে। দেবি চৌধুরাণী ও আনন্দ মঠের নজির তুলেধরে অবিনাশ চক্রবর্তী লুণ্ঠনের প্রস্তাব করেন মর্মে উল্লেখ পাওয়া যায়। যুগান্তর পত্রিকাও ডাকাতি করে অর্থসংগ্রহের পরামর্শ দেয়। যদিও ডাকাতির দ্বারা অর্থ পাওয়া যায় কিন্তু সাধারণ লোকের সহানুভূতি হারাবার সম্ভাবনা তৈরি হয়। এছাড়া মামলা-মোকদ্দমার হাঙ্গামা,অর্থনাশ ও দুশ্চিন্তাসহ সাহসী কর্মীদের দীর্ঘ কারাদন্ডের মূখে অনিচ্ছুক বা সহানুভূতিহীন অভিভাবকদের পক্ষে আন্দোলনের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে সরকারি সাহায্য ও সহযোগিতার আশ্রয় নেয়া অস্বাবিক নয়; ইত্যাদি নানা বিষয় আলোচিত হয়। সুতরাং কতকাংশের মিললেও সমস্ত কাজটায় সকল বিপ্লবীর সমর্থন পাওয়া যায়নি।[১২২] ব্যাপক সরকারি তথ্যানুসন্ধানে বলা হয়: The principle of raising money by dacoity has all along had many hot opponents in persons otherwise in full sympathy with political outrage. Still it was the part of the plan of campaign preached by the Yugantar and had more advocates than opponents in the revolutionary party.[১২৩] অর্থাৎ সরকারি তহবিল লুট করায় কারো আপত্তি ছিল না। উপরন্ত সাহস ও বুদ্ধির পরিচয় দেবার জন্য উৎসাহ দেয়া হয়েছে। এছাড়া বিপক্ষ দলের আপত্তি সত্ত্বেও যুগান্তর সমিতি একটি বৈপ্লবিক দল গঠনের স্বার্থে ডাকাতির পক্ষে জোর অভিমত পোষণ করতো।

বিপ্লবী পুলিনবিহারী দাশের জবানীতে উল্লেখ পাওয়া যায়: একদিন প্রাতে সুবোধ মল্লিকের বাড়িতে কলকাতা ও বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধিগণকে নিয়ে এক গুপ্তআলোচনা সভা হয়। প্রমথনাথ মিত্রের (পি.মিত্র) সভাপতিত্বে এ সভায় ডাকাতির কথা উঠে। কেই গভর্ণমেন্টের টাকা লুট করা সঙ্গত; কেউ বলেন, গভর্নমেন্টের টাকা লুট করতে যে শক্তি ও সম্বলের প্রয়োজন তা দেশের লোকের ওপর ডাকাতি

না করে পাওয়া যাবে না; কোন ধনী ব্যক্তিই এজন্য টাকা দিবে না। পরে বিপ্লবী অরবিন্দকুমার ঘোষ বলেন, স্বাধীনতার জন্য ডাকাতি করাতে যে নীতিগত দোষ কল্পনা করা হয় তা সম্পূর্ণ অমূলক। শেষে রংপুরের প্রতিনিধি বলেন, আমরা ডাকাতি করে যার যতো টাকা আনবো তার একটি সঠিক হিসেব রাখবো এবং স্বাধীনতা লাভ করে তালিকা অনুযায়ী ঐ সমস্ত টাকা ফিরিয়ে দিব। বিপ্লবী অরবিন্দকুমার ঘোষ সমর্থন করায় প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।[১২৪] যদিও প্রমথনাথ মিত্র (পি.মিত্র) বরাবরই ডাকাতি করার বিপক্ষে ছিলেন তবু তিনি বিশেষ প্রয়োজনে একবার ডাকাতি করার অনুমতি দেন বলে জানা যায়।

ডাকাতি করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল অন্য একটি কারণে। ছেলেরা বিদেশি শাসনের বিরুদ্ধে লড়বে বলে জমায়েত হচ্ছে কিন্তু একতরফা স্বদেশী কর্মপদ্ধতিতে তারা সন্তুষ্ট হতে পারছে না। বৈপ্লবিক কাজের মাধ্যমে তারা নিজেদের দক্ষতার প্রমাণ রাখতে উন্মুখ হয়। বাংলার ছোট লাট *উইলিয়াম ডিউক* (William Duke) ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে এক বক্তৃতায় বলেন, They (the dacoities) are important because of the spirit of voilent opposition to all setteled Government whice they display,of the widespread and carefully prepared organisation of whice they give evidence and of the enterprise and success with whice they are carried out.Ordinary dacoits usually make bad shots and risk long terms of imprisonment for the sake of a handful rupees, but the political variety have been wonderfully successful in spotting out likely subjects and have frequently netted large sums indeed.[১২৫] অর্থাৎ রাজনৈতিক ডাকাতি গুলো সরকারের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশসহ সতর্কতার সাথে তাদের সাংগনিক শক্তির জানান দিচ্ছে। পেশাদার ডাকাতরা যেখানে ভুল করে বসে এবং অল্পটাকার জন্য দীর্ঘ কারাবাসকে ভয় করে; সেখানে স্বদেশী ডাকাতরা অদ্ভূতভাবে স্থির লক্ষ্যে বহুটাকা লুণ্ঠন করার মাধ্যমে তাদের বুদ্ধি,দক্ষতা ও সাহসের প্রমাণ রাখতে সক্ষম হচ্ছে।

বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর *অ্যান্ড্রু ফ্রেজার* (Andrew Henderson Leith Fraser) ছিলেন লর্ড কার্জনের বাংলাবিভাগ পরিকল্পনার প্রধান উৎসাহদাতা। বিপ্লবীরা গভর্নর ফ্রেজারকে হত্যা করে অত্যাচারী ইংরেজ শাসকদের মনে ত্রাস সৃষ্টির তৎপরতা চালায়। কলকাতার বিপ্লবীরা প্রথম থেকেই তাকে হত্যার চেষ্টায় থাকে। ইতোপূর্বে তিনবার ফ্রেজার হত্যাচেষ্টা হয়। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের ০৫ ডিসেম্বর মি.ফ্রেজার কটক থেকে ট্রেন যোগে কলকাতা অভিমুখে যাত্রা করে। পথিমধ্যে ০৬ ডিসেম্বর রাত ২-৪৫ মিনিটে ট্রেন যখন মেদিনীপুরের বেণাপুর ও নারায়ণগড়ে পৌঁছায়, তখন গাড়ির নীচে এক বিস্ফোরণ ঘটে; বোমা দ্বারা ফ্রেজারের ট্রেন উড়িয়ে দেবার চেষ্টা হয় কিন্তু লাট সাহেবের প্রাণ রক্ষা পায়। কয়েকটি কামড়া লাইনচ্যুত হলেও ট্রেনটি সময়মত কলকাতা পৌঁছে যায়। ভোরে পরীক্ষায় দেখা গেল লাইনের

তলায় পাঁচফুট চওরা ও পাঁচফুট গভীর একটি গর্ত এবং আশেপাশে ছেড়া অবস্থায় ০৪ ডিসেম্বরের ইংলিশম্যান পত্রিকা পরিদৃষ্ট হয়।

১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩ ডিসেম্বর ঢাকার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট *অ্যালেন* (Mr.B.C.Allen,I.C.S.) ছুটি কাটাতে দেশে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে গোয়ালন্দ রেলওয়ে স্টেশনে ঢাকা অনুশীলন সমিতির আততায়ীর রিভলভারের গুলি তার পৃষ্ঠদেশ বিদ্ধ করে।আঘাত গুরুতর হওয়া সত্ত্বেও সৌভাগ্যক্রমে তার প্রাণরক্ষা হয়। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত ঢাকা ও পূর্ববাংলার অন্তত দুই বা তিনটি বড় বৈপ্লবিক ঘটনা তদন্তের দায়িত্বে থাকায় তিনি আক্রান্ত হন বলে ধারণা করা হয়। ময়মনসিংহ জেলার জামালপুরের হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা অন্যতম। কলকাতা থেকে কতিপয় যুবক এখানে দাঙ্গা করতে এসেছিল বলে জানা যায়। বিপ্লবী ইন্দ্রনাথ নন্দী তাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি পরবর্তীতে আলীপুর ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হন। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের ০৩ এপ্রিল গুপ্তসমিতির সাতজন সভ্য পিস্তল ও ছোড়া নিয়ে শিবপুরের অজ্ঞাত এক গৃহস্তের বাড়ি ডাকাতি করে চারশত টাকা সংগ্রহ করে। অন্যদিকে ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে চন্দননগরের একটি জনসভা বন্দকরে দেয়ার অভিযোগে ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের ১১ এপ্রিল চন্দননগরের মেয়রের বাসগৃহে একটি বৈপ্লবিক বোমা নিক্ষিপ্ত হয়।বোমাটি ফাটলেও কেউ হতাহত হয়নি বলে উল্লেখ আছে।[১২৬]

কলকাতার চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন *কিংসফোর্ড* (Douglas Kingsford)। স্বদেশী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করায় গ্রেফতারকৃতদের ওপর কিংসফোর্ডের নির্দেশে ভয়ঙ্কর নির্যাতন চালানোর অভিযোগ ওঠে। এদিকে কলকাতার চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট এর এজলাসে বন্দেমাতরম্ কাগজের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগে মামলা হয়। পত্রিকায় রাজদ্রোহমূলক প্রবন্ধ গুলোর রচয়িতার নাম উহ্য থাকায় ওগুলোর রচয়িতা হিসেবে পুলিশ অরবিন্দ ঘোষকে সন্দেহ করে। লেখক ও সম্পাদক হিসেবে অরবিন্দ ঘোষের সম্পৃক্ততা খতিয়ে দেখার প্রত্যয়ে চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট ডগলাস কিংসফোর্ড *বন্দেমাতরম্* সম্পাদনা বোর্ড সদস্য বিপিনচন্দ্র পালকে তলব করে। বিপিনচন্দ্র পাল কোর্টে হাজির হয়ে সাক্ষ্য দেয়ার পরিবর্তে বলেন: I have conscientious objection against taking part in a prosecution which I believe to be unjustand injurious to the cause of popular freedom and the interest of public.I have objection to swear in these proceedings. I refuse to answer any question in connection with case.[১২৭] অর্থাৎ এমামলায় অংশগ্রহণে সজ্ঞান আপত্তি আছে। ন্যায় বিচার, গণস্বার্থ ও শান্তি পরিপন্থি। তাই শপথ গ্রহণেও আমার আপত্তি। এবিষয়ে কোর্টের কোন প্রশ্নেরই উত্তর আমি দেবোনা। এ অভিমত জ্ঞাপন করায় আদালত অবমাননার অভিযোগে ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের ২০ আগস্ট বিপিনচন্দ্র পালের ছ'মাসের কারাদন্ড হয়।

দেশবরেণ্য নেতাকে অভিনন্দন জানানোর জন্য কোর্টের বাইরে অপেক্ষমান বিশাল জনসমুদ্র। জনতার কণ্ঠে উচ্ছকিত হচ্ছে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি। কিন্তু এউচ্ছাস, আকুলতায় অসহ্যবোধ করে শ্বেতাঙ্গ সার্জেন্টদল বেটন-হস্তে দস্যুর মতো জনতার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।নিরস্ত্র জনতার মাথা ফেটে যাচ্ছে। তাদের দোষ তারা বন্দনা জানাচ্ছে দেশমাতাকে, শ্রদ্ধা জানাতে এসেছে কারা নির্যাতিত দেশনেতাকে। নির্যাতনের এদৃশ্য সহ্য করতে না পেরে ১৫ বছরের কিশোর সুশীল বীরদর্পে অগ্রসর হয়ে সার্জেন্টকে ঘুষি মারে। ডগলাস কিংসফোর্ডের রায়ে সুশীলের ১৫টি বেত্রাঘাতের আদেশ হয়।[১২৮] কলকাতায় প্রকাশ্য আদালত প্রাঙ্গণে বালকটির ওপর নিষ্ঠুরভাবে বেত্রাঘাত করায় জনতা বিক্ষুব্ধ হয়। কলকাতার বিপ্লবীরা প্রতিশোধের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়। যুগান্তরের পরিচালকগণ পরামর্শক্রমে ডগলাস কিংসফোর্ডকে মৃত্যুদন্ডের সিদ্ধান্ত[১২৯] নেয়। বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ এই দন্ডাজ্ঞা কার্যকর করার জন্য ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী নামক দু'জন যুগান্তর কর্মীকে নির্বাচন করে।[১৩০] ইতোমধ্যে ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের ২৮ মার্চ ডগলাস কিংসফোর্ড কলকাতা থেকে বিহারের মুজাফফ্রপুর বদলি হন।

ইতোপূর্বেও কিংস্ফোর্ডকে কলকাতায় হত্যা প্রচেষ্টা হয়েছিল। মোটা বইয়ের মাঝখানে কেটে গর্ত করে (Book bome) তার মধ্যে বিস্ফেরক ভর্তি করে তার বাসভবনে ডাকযোগে পার্শেল পাঠানো হয়। বইয়ের দড়ির বাঁধন খুললেই বোমা ফাটবে এবং তার মৃত্যু ঘটবে। কিন্তু তিনি ভাবলেন, বইটি হয়তো তার নিকট থেকে পড়তে নিয়েছিল; নানান ব্যস্ততায় অলক্ষ্যে বইটি অন্যান্য বইয়ের স্তুপে পড়ে থাকে। পার্শেল না খোলায় তার প্রাণরক্ষা পায়। এসম্পর্কে রাউলাট কমিশন রিপোর্টে দেখা যায়: Upon search being made, a parcel was found which Mr.kingsford had received but not opened, thinking it contained a book borrowed from him.The percel did not contain a book; but the middle portion of the leaves had been cut away and the volume was thus in effect a spring to cause its explosion if book was opened.[১৩১] কাজেই পূর্ব ব্যবস্থা অনুসারে ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী বিহারের মুজাফফ্রপুর পৌঁছে মোক্ষম সুযোগের প্রতীক্ষায় থাকে।

১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের ৩০ এপ্রিল সন্ধ্যাকালে *কিংসফোর্ড* (Douglas Kingsford) স্থানীয় ইউরোপীয়ান ক্লাবে তাস খেলতে যান। রাত্রি ৮.৩০ মিনিট নাগাদ কিংসফোর্ডের গাড়ির মতো একটি গাড়িতে আরোহন করে ব্যারিস্টার কেনেডি'র স্ত্রী ও কন্যার গাড়ি কিংসফোর্ডের বাসার গেটের সম্মুখে আসতেই ঐ গাড়ীতে ক্ষুদিরাম বোমা নিক্ষেপ করে। আরোহী দু'জনেই নিহত হয়। পরদিন ০১ মে দুপুর বেলা সমস্তিপুর স্টেশনে নন্দলাল ব্যানার্জি নামক একজন পুলিশের নিকট হতে গ্রেফতার এড়াতে প্রফুল্ল চাকী নিজের রিভলভারের গুলিতে আত্মহত্যা করে বিশ শতকের প্রথম শহীদ হবার গৌরবের অধিকারী হয়।

ক্ষুদিরাম বসু ওয়াইলী নামক স্থানে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। হত্যাকান্ডের অভিযোগে বিহারের মুজাফ্ফরপুর আদালতে ক্ষুদিরাম বসুর বিচার আরম্ভ হয়। হত্যাপরাধ স্বীকার করায় বিচারে তার ফাঁসির হুকুম হয়। হাইকোর্টে আপিল করা সত্ত্বেও পূর্বের রায়ই বহাল থাকে। ১১ আগস্ট ইংরেজ সরকারে ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণবিসর্জন দিয়ে বাংলার বীরসন্তান ক্ষুদিরাম বসু বিশ শতকের দ্বিতীয় শহীদ হবার গৌরব অর্জন করে।[১৩২] ক্ষুদিরামের এই অভিযাত্রা সম্পর্কে *দি এম্পায়ার* (The Empire) পত্রিকায় লেখা হয়: 'Khudiram Bose was executed this morning;...it is alleged that he mounted the scaffold with his body erect. He was cheerful and smiling'.[১৩৩]

কিন্তু আদালতে ক্ষুদিরাম বসুর পক্ষ সমর্থনের জন্য মেদিনীপুর, কলকাতা বা পশ্চিম বাংলার কোন আইনজীবী পাওয়া না পাওয়া যায়নি; রংপুর থেকে একজন উকিল গিয়েছিলেন। তবে মুজাফ্ফরপুরের একজন উকিল মশায় ক্ষুদিরাম বসুর পক্ষসমর্থনে বিশেষ সহানুভূতি দেখিয়েছিলেন মর্মে উল্লেখ পাওয়া যায়।[১৩৪] বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকীর এ আত্মত্যাগের পর রাজকর্মকর্তা, পুলিশ ও দেশীয় বিশ্বাসঘাতকদের খুন করে একের পর এক ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ বিসর্জন দেয়া বিপ্লবী তরুণদের স্মরণে নিম্নোক্ত গান লিখে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছেন মোহিনী চৌধুরী এবং গানটিতে সুর দিয়েছেন কৃষ্ণচন্দ্র দে।

মুক্তির মন্দির সোপান তলে
কত প্রাণ হলো বলি
লেখা আছে অশ্রুজলে।...[১৩৫]

সে সময় ক্ষুদিরামের ফাঁসি সারা দেশে ব্রিটিশ বিরোধী তীব্র ক্ষোভ উচ্চমার্গে পৌছায়। পিতম্বর দাশ রচিত নিম্নের গানটি বাংলার ঘরে ঘরে খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল।

একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি
একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি।
হাসি হাসি পরবো ফাঁসি
দেখবে ভারতবাসী।[১৩৬]

বিহারের মুজাফফ্রপুরের বোমা বিস্ফোরণ ও প্রফুল্ল চাকীর আত্মহত্যা এবং ক্ষুদিরাম বসুর গ্রেফতারের সূত্রধরে কলকাতা পুলিশ ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের ০২ মে যুগান্তর সমিতির প্রধান কার্যালয় মানিকতলার বাগানবাড়ি ও বিপ্লীদের অন্যান্য বাসস্থানে খানা তল্লাশী করে। বোমা, ডিনামাইট ও কার্তুজ প্রস্তুত করার যন্ত্রপাতি, বন্দুক, রিভলভার ও বহু চিঠিপত্র পুলিশের হস্তগত হয়। বিভিন্নস্থান হতে বারীনকুমার ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র দাশ, অবিনাশ ভট্টাচার্য, হৃষিকেষ কাঞ্জিলাল, উল্লাসকর দত্ত, শৈলেন্দ্রনাথ বসু, সতেন্দ্রনাথ বসু, কানাইলাল দত্ত প্রমুখ ৩৪জন নেতাকর্মী গ্রেফতার হন। বিখ্যাত

আলীপুর মামলা আরম্ভ হয়। যুগান্তর সমিতির অন্যতম সদস্য নরেন্দ্রেনাথ গোস্বামী[১৩৭] পুলিশের প্ররোচনায় নিজ মুক্তির আশ্বাসে রাজসাক্ষী হয়ে সকল তথ্য ফাঁস করে দেয়।[১৩৮]

রাজসাক্ষী হওয়ার পর নরেন্দ্রনাথ গোস্বামীকে[১৩৯] আলীপুর জেলের হাসপাতালে অপসারিত করা হয়। বারীন্দ্রকুমার ঘোষ এই আলীপুর মামলার সকল অভিযোগ ও ষড়যন্ত্রের দায়-দায়িত্ব তাঁর নিজের এই মর্মে পুলিশের নিকট স্বীকারোক্তি দেয়।সুবোধ মল্লিক[১৪০] ও আরও কয়েকজন গ্রেফতার হয়। বারীন্দ্রকুমার ঘোষের পর উল্লাসকর দত্ত, উপেন্দ্রনাথসহ আরও কয়েকজন স্বীকারোক্তি দেয়। ধৃত বিপ্লবীদের মধ্যে অরবিন্দকুমার ঘোষ ছিলেন অন্যতম। এভাবে গ্রেফতারকৃত মোট ৪০ জন বিপ্লবীর বিরুদ্ধে সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্দ্যম এর অভিযোগে আলীপুর ষড়যন্ত্র মামলার বিচার আরম্ভ হয়।[১৪১]

রাজসাক্ষী হওয়ার অপরাধে নরেন গোস্বামীকে হত্যার ব্যাপারে জেলে বন্দি অরবিন্দকুমার ঘোষ, দেবব্রত প্রভৃতি কয়েকজন ছাড়া প্রায় অধিকাংশই একমত পোষণ করে। তখন বাংলাদেশে যে ক'টি বৈপ্লবিক গুপ্তদল ছিল বারীন্দ্রকুমার ঘোষের প্রস্তাবানুযায়ী প্রায় সকল দলের ওপর নরেন গোস্বামীকে হত্যার ভার দেয়া হলে একাজে তাঁরা অসম্মত হয় এবং নরেন গোস্বামীর ব্যবস্থা জেল বন্দিদেরই করতে হবে মর্মে পরামর্শ দেয়। এদিকে সত্যেন বসু হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিল। নরেন গোস্বামীকে নিকটে পেয়ে তার সঙ্গে পূর্বপরামর্শ মতো আলাপ শুরু করে দেয়। নরেন গোস্বামীকে কেঁদে-কেটে ধরে সত্যেন নিজেকে তার *সমর্থক* (Collaborator) হওয়ার প্রস্তাব রাখে। নরেন গোস্বামী সেকথা পুলিশ অফিসারকে জানালে তিনি সত্যেন বসুকে শিখিয়ে পড়িয়ে নেবার জন্য নরেন গোস্বামীকে উপদেশ দেন। সত্যেন বসু নরেন গোস্বামীর প্রদত্ত খবর যথাস্থানে পাঠাতে থাকে। বাইরে থেকে রিভলভার সংগ্রহের পরিকল্পনা করা হয়। নরেন গোস্বামী প্রায় প্রত্যেক দিনই হাসপাতালে সত্যেন বসুর সঙ্গে দেখা করতো। প্রদত্ত এজাহার ঠিকমতো মনে থাকছেনা বলে ভালো করে কথাগুলি সব উল্টে-পাল্টে নরেন গোস্বামীকে সে শোনাত; আর সেও নিজের এজাহার সত্যেন বসুকে পড়াত। হাসপাতালের ডিসপেন্সারিতে প্রতিদিন এ প্র্যাকটিস চলতো। এ প্রক্রিয়ায় সত্যেন বসু জেনে যায় আগামী ০১ সেপ্টেম্বর রোজ সোমবার নরেন গোস্বামীর জবানবন্দিতে অনেক নতুন নাম প্রকাশ পাবে। অনেকে ধরা পড়বে; বিশেষত ২০ জন গণ্যমান্য ব্যক্তির নাম ছিল। কাজেই সত্যেন বসু উক্ত সোমবার সকালেই নরেন গোস্বামীকে পরলোকে পাঠিয়ে দেয়ার ফন্দি আঁটে। পেটব্যথার ভান করে কানাইলাল দত্ত দুটো রিভলভার নিয়ে চিকিৎসা নিতে হাসপাতালে যায়। পরামর্শে স্থির হয়; আগে সত্যেন চেষ্টা করবে। যদি ফস্কে যায়; কানাই আক্রমণ করবে। পূর্ব পরিকল্পনা মতো পরদিন সত্যেন বসু প্রথমে গুলি করে। কিন্তু গুলি লেগে নরেন গোস্বামী সামান্য আহত হয়ে দৌড় দেয়; অতঃপর কানাইলাল দত্ত'র গুলিতে নরেন গোস্বামীর মৃত্যু হয়।[১৪২]

সত্যেন বসুর বুদ্ধিমত্তার কারণেই কোর্টে অরবিন্দ ঘোষের নাম জড়িয়ে সাক্ষী দেওয়া সত্ত্বেও নরেন গোস্বামীর সাক্ষ্য খারিজ হয়ে যায়। বিপ্লবী অরবিন্দকুমার ঘোষ বেকসুর খালাস পায়। বারীন্দ্রকুমার ঘোষের অজ্ঞাতে কানাইলাল দত্তকে নিয়ে সত্যেন বসু তার নিজস্ব পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কারণে এ সাফল্য অর্জিত হয়। সর্বোপরি নরেন গোস্বামীর বিশ্বস্ততা অর্জন করে কারান্তরালের কঠোর অনুশাসনের মধ্যে এহেন বৈপ্লবিক হত্যাকান্ডের ঘটনা ইতিহাসে বিরল; যা ইতিহাসে বিশেষ মর্যদা লাভের দাবিদার। বৈপ্লবিক ও কৃতিত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক এঘটনার বিপ্লবী নায়ক সত্যেন বসু।[১৪৩]

এই মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত হেমচন্দ্র কানুনগো উল্লেখ করেছেন, ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে অতিরিক্ত দেরি হচ্ছে বলে হাকিম নরেন গোস্বামীকে এজাহারের পর জেরা করতে দেননি। আমাদের পক্ষের উকিল স্বীয় প্রাজ্ঞতায় এই মর্মে একখানি দরখাস্ত মঞ্জুর করে নেন; যেহেতু, সাক্ষীকে জেরা করতে দেয়া হলো না, সেহেতু রাজসাক্ষী প্রদত্ত সাক্ষ্য ততক্ষণ পর্যন্ত বৈধ প্রমাণ বলে গ্রাহ্য হবে না, যতক্ষণ না সে আবার যথারীতি সেশন আদালতে সাক্ষ্য দেয় ও তাকে জেরা করা হয়। এই মঞ্জুরিটি পাস করা না থাকলে নরেন গোস্বামীকে মারা প্রায় বৃথা হতো; বিপ্লবী আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব অরবিন্দকমার ঘোষের মুক্তি লাভও অসম্ভব হতো। কিন্তু যখন কোর্টে আবেদনটি পাস করিয়ে নেয়া হলো, তখন বার্লি সাহেবের কোর্টের কোনো উকিলই এর আবশ্যিকতা বা উদ্দেশ্য উপলব্ধ হননি। বিরোধিতাও করেননি। অভিনব এই পরিকল্পনাটিও সত্যেন বসুর উদ্ভাবিত এবং তাঁরই প্রচেষ্টায় তা কার্যকর করা সম্ভব হয়েছিল[১৪৪] মর্মে প্রকাশ।

নরেন গোস্বামী হত্যাকান্ডের অভিযোগে তাদের দু'জনের পৃথক পৃথক বিচারে ফাঁসির আদেশ হয়। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের ১০নভেম্বর ফাঁসি কার্যকরের মধ্য দিয়ে কানাইলাল দত্ত বিশ শতকের তৃতীয় শহীদ এবং ২১ নভেম্বর ফাঁসি কার্যকরের মধ্য দিয়ে সত্যেন বসু বিশ শতকের চতুর্থ শহীদ ও ফাঁসির সত্যেন রূপে স্মরণীয়।[১৪৫] কানাইলাল দত্ত কর্তৃক আলীপুর জেলের মধ্যে রাজসাক্ষী নরেন গোস্বামীর হত্যাকান্ড উপলক্ষ্যে বিপ্লবীরা স্বাধীন ভারত নামে একটি লাল ইস্তেহার প্রকাশ করেছিল বলে উল্লেখ পাওয়া যায়।[১৪৬] বিপ্লবীদের বন্দেমাতরম পত্রিকায় ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের ১২ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় নরেন গোস্বামী হত্যাকান্ডে কানাইলাল দত্তের উচ্ছসিত প্রশংসা এবং দেশবাসীকে বিশ্বাসঘাতকতার বিরূদ্ধে সজাগ করনার্থে হুশিয়ার প্রদান করে[১৪৭] উল্লেখ করা হয়: বিশ্বাসঘাতকতার চরম শাস্তির কথা কখনও ভুলে যেও না।[১৪৮]

আলীপুর ষড়যন্ত্র মামলা ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের ০৪ মে হতে ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের ১৩ এপ্রিল পর্যন্ত দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পরিচালিত হয়। ২০৯ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণের পর আদালত ০৬ মে রায় দেয়। ঘোষিত সেশন আদালতের রায়ে বিপ্লবী অরবিন্দকুমার ঘোষ মুক্তিলাভ করেন। কিন্তু বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ও উল্লাসকরের ফাঁসির আদেশ হয়। এছাড়া হেমচন্দ্র দাশ, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভুতি সরকার, হৃষিকেষ কাঞ্জিলাল, বীরেন্দ্র সেন, সুধীর সরকার, ইন্দ্রনাথ নন্দী, অবিনাশ ভট্টাচার্য, শৈলেন্দ্রনাথ বসু ও ইন্দ্রভূষণ রায় প্রমুখ আসামী যাবজ্জীবন দীপান্তর দন্ডে দন্ডিত হয়। কিন্তু পরবর্তীতে হাইকোর্টের আদেশে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ও উল্লাসকরের ফাঁসির পরিবর্তে যাবজ্জীবন দীপান্তর দন্ডের আদেশ হয়। হেমচন্দ্র দাশ, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যাবজ্জীবন দীপান্তর দন্ডাদেশ বহাল থাকে। বিভুতি সরকার, হৃষিকেষ কাঞ্জিলাল ও ইন্দু রায়ের ১০ বৎসরের দীপান্তর এবং সুধীর সরকার, পরেশ মৌলিক ও অবিনাশ ভট্টাচার্যের ০৭ বৎসর করে দীপান্তর দন্ড হয়। অরবিন্দকুমার ঘোষসহ ১৭ জন বিপ্লবী মুক্তিলাভ করে। এই মামলায় অভিযুক্ত বিপ্লবীদের পক্ষে কৌশলী ছিলেন ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশ।

ভারতের সশস্ত্র বিপ্লব প্রচেষ্টার ইতিহাসে বিভিন্ন কারণে আলীপুর ষড়যন্ত্র মামলাটি বিখ্যাত হয়ে আছে। **প্রথমতঃ** এটি বিশ শতকের বিপ্লব প্রচেষ্টার ইতিহাসে প্রথম ষড়যন্ত্র মামলা। **দ্বিতীয়তঃ** ভারতে এই প্রথমবার বোমা দ্বারা বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা চলে। এবং এই বিপ্লবীরাই এটি প্রথম ব্যবহার করে। **তৃতীয়তঃ** কানাইলাল দত্ত ও সত্যেন বসুর দ্বারা জেলের অভ্যন্তরে নরেন গোস্বামীর হত্যাকান্ড কেবল ভারতের বিপ্লব প্রচেষ্টার ইতিহাসে নয়; বরং সমগ্র বিশ্বের বিপ্লব প্রচেষ্টার ইতিহাসে এক অতি বিস্ময়কর ঘটনা। নরেন গোস্বামীর মৃত্যু শাস্তিতে ইউরোপীয় বিপ্লবীরা বাহবা দিয়েছিল বলে জানা যায়।[১৪৯]

১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের ০২ মে কলকাতায় বিপ্লবীদের এক বৃহৎ দলকে গ্রেফতার করে ০৪ মে পুলিশ আলীপুর ষড়যন্ত্র মামলা আরম্ভ করে বাংলার পুলিশ স্বস্তি অনুভব করলেও এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় কলকাতার রাস্তাঘাট ঘন-ঘন বোমা বিস্ফোরণে প্রকম্পিত হয়ে উঠে। পূর্ববাংলায় বিপ্লবীদের দুঃসাহসিক ডাকাতি ও গুপ্তহত্যা শাসকগোষ্ঠিকে আতঙ্কিত করে তোলে। বৈপ্লবিক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের এহেন গ্রেফতারের প্রাথমিক ধাক্কা সামলিয়ে প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে যুগান্তর দল আলীপুর মামলার সরকারি আইনজীবি মি.হিউমকে হত্যা প্রচেষ্টায় তৎপর হয়ে উঠে।[১৫০]

এদিকে ভারতীয় সরকার ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে Criminal Law Amendment Act of 1908 আইন বলে বাংলায় অনুশীলন সমিতি নিষিদ্ধ ঘোষণার সাথে সাথে সব শাখা পৃথক হয়ে যায়। একই সাথে কলকাতার আত্মোন্নতি সমিতি, বরিশালের বান্ধব সমিতি, ময়মনসিংয়ের সাধনা সমিতি, সুহৃদ

সমিতি ও ফরিদপুরের ব্রতি সমিতিও নিষিদ্ধ করা হয়। অনুশীলন সমিতি বন্ধ করে দেয়ায় অনেকের মনে ক্ষোভের সঞ্চার হয়। আলীপুর মামলায় অরবিন্দকুমার ঘোষ প্রমুখ শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের গ্রেফতার জনিত শূন্যতা জনিত অবস্থায় যুগান্তর দলের নরেন ভট্টাচার্য (M.N.Roy), জ্ঞান মিত্র, সুধীররায় চৌধুরী, পাবনার অবিনাশ চক্রবর্তী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ চুপচাপ বসে না থেকে জ্যোতিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ওরফে বাঘা জ্যোতিনের (১৮৮০-১৯১৫)[১৫১] সাথে যোগাযোগ ক্রমে সরকারকে একটা উপযুক্ত জবাব দেবার প্রস্তাব দেয়। জ্যোতিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা জ্যোতিন) তাতে সম্মতি দেন[১৫২] মর্মে তথ্য পাওয়া যায়।

প্রমথনাথ মিত্রের (পি.মিত্র) অনুসারীরা অনুশীলন সমিতির নাম পরিবর্তন করে 'Bengal Youngmen's Zamindary Co-Operative Society' নামকরণ করে। ঢাকা অনুশীলন সমিতি বাহ্‌রার ডাকাতির পর পুনরায় ডাকাতি করায় পি.মিত্র এ প্রতিষ্ঠান থেকে পুলিনবিহারী দাশকে বহিস্কার করেন।[১৫৩] প্রকৃতপক্ষে মুরারি পুকুরের গুপ্ত আড্ডায় অস্ত্রসংগ্রহ, বিপ্লবাত্মক কর্মপ্রয়াস বিশেষত; মুজাফফ্‌রপুর অভিযান বারীনকুমার ঘোষের নেতৃত্বেই সংগঠিত হয়। এতে সতীশচন্দ্র বসু বা প্রমথনাথ মিত্রের (পি.মিত্র) প্রত্যক্ষ সম্পর্ক দৃশ্যমান নয়। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দের ২৩ সেপ্টেম্বর প্রমথনাথ মিত্রের (পি.মিত্র) মৃত্যুর সাথে সাথে ক্রমশঃ সংস্থা হিসেবে কলকাতা অনুশীলন স্তিমিত হয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে কলকাতার মূল অনুশীলন সমিতির কর্মপ্রবণতা দেখা যায় না। কিন্তু মূল সমিতির শাখা, ঢাকা অনুশীলন সমিতি সুবিস্তৃত হয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে অনুশীলন সমিতি বলতে ঢাকার অনুশীলন সমিতিকেই বুঝায়। ঢাকা অনুশীলন সমিতিই পূর্ব ও উত্তর বাংলায়, কলকাতায় এবং বাংলার বাইরে বৈপ্লবিক কর্মকান্ড সম্প্রসারণ করে।[১৫৪]

জ্যোতিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের (বাঘাজ্যোতিন) নেতৃত্বে বৈপ্লবিত কর্মকান্ড গতি সঞ্চারিত হয়। তাঁর গতিশীল নেতৃত্বে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানদের সহায়তায় দেশব্যাপী এক বিদ্রোহ আয়োজন হয়। ইতোপূর্বে বাংলাদেশের সকল বিপ্লবী দলগুলোকে এক সংগঠনে শামিল করার চেষ্টা হয়। বাংলাদেশের অন্যান্য দল সে ডাকে সাড়া দিলেও ঢাকা অনুশীলন সমিতি ও কলকাতার বিপিন গাঙ্গুলীর দল এ উদ্যোগের বাইরে থাকলেও পুরোপুরি সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেয়। কার্যক্ষেত্রে সক্রিয় দলগুলো সকলেই এক সংগঠনের মধ্যে এসে যায়। বরিশাল দলের নিজস্ব সংগঠন নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ফরিদপুর, শ্রীহট্ট জেলায়। ময়মনসিংহের মণি চৌধুরী ও ক্ষিতিশ চৌধুরীর আগ্রহে ও চেষ্টায় ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে বরিশাল দলের নরেন ঘোষ চৌধুরী ও সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র ময়মনসিংহে চলে গিয়ে সাধনা সমিতির প্রধান হেমেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরীর সঙ্গে আলোচনা ক্রমে উভয় দল একদলে মিলিত হওয়ার সিদ্ধান্ত করেন। পাবনার অবিনাশ চক্রবর্তীর আগ্রহে উত্তর বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত যতীন রায়ের দলের সঙ্গে বরিশাল দলের প্রায় এক সংস্থায় অন্তর্ভূক্ত হওয়ার মতো ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হয়। এ

ছাড়া ফরিদপুরের পূর্ণচন্দ্র দাশের দল বরিশাল দলের পূর্বে জ্যোতিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের (বাঘা জ্যোতিন) দলের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল বলে জানা যায়। এই মিলিত দলের নেতা রূপে আভির্ভুত হন কার্যত জ্যোতিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা জ্যোতিন)।

যদিও ভোটের মাধ্যমে তিনি নেতা হননি; অপরিমেয় ত্যাগই তাঁকে ঐ পদে বরণ করে নেয়। এই দলগুলি কতকগুলি উপদলের সমষ্টি। তাদের নিজেদের আলাদা ইতিহাস,ঐতিহ্য,নেতৃত্ব ও শাসন-শৃঙ্খলা রয়েছে। কিন্তু দেশমাতৃকার বৃহত্তর প্রয়োজনে একযোগে করার প্রয়াসে একসূত্রে গ্রথিত হয়েছে। এই উপদল গুলো হচ্ছেঃ ১.বরিশাল, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, শ্রীহট্টজেলার শাখা সংগঠন নিয়ে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতি ও নরেনঘোষ চৌধুরীর নেতৃত্বে গঠিত বরিশাল দল; ২. ময়মনসিংহের হেমকিশোর আচার্য চৌধুরী, সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, আনন্দ রায়, মণি রায়, ক্ষিতিশ চৌধুরী, নরেন চৌধুরী প্রভৃতি ব্যক্তি বর্গের দ্বারা পরিচালিত সাধনা সমিতি; ৩.উত্তরবঙ্গের যতীন রায়, যোগেশদে সরকার, কালী বাগচী, বাদলদাশ গুপ্ত প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গের দ্বারা পরিচালিত যতীন রায়ের দল; ৪.ফরিদপুরের পূর্ণচন্দ্র দাশ, চিত্তপ্রিয় রায়, মনোরঞ্জন সেন, নীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গের দ্বারা পরিচালিত পূর্ণচন্দ্র দাশের দল; ৫.ইদিলপুরের নিখিলগুহ রায়ের দল। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ছড়ানো জ্যোতিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা জ্যোতিন), ডা.যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, নরেন ভট্টাচার্য (মানবেন্দ্র রায়), অতুলকৃষ্ণ ঘোষ, হরিকুমার চক্রবর্তী, সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী, সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমূখ ব্যক্তিবর্গের নেতৃত্বাধীন জ্যোতিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের (বাঘাজ্যোতিন) **দল**।আরও অনেক পরে ঢাকার হেমচন্দ্র ঘোষ এবং চট্টগ্রামের সূর্য সেনের দল এ সম্মিলিত স্রোতধারায় শামিল হয় বলে উল্লেখ পাওয়া যায়।[১৫৫]

১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের ১৫মে তারিখে সরকারি আইনজীবি *মি.হিউম* (Mr.Hume) কলকাতার *গ্রে স্ট্রিট* (Grey Street) দিয়ে গাড়িতে যাওয়ার সময় তার উপর বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। কিন্তু বোমাটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে চারজন পথচারী আহত হয়। জুন মাসের প্রথম দিকে রেলভ্রমণের সময় কলকাতার নিকটবর্তী হাওড়া স্টেশনে বিপ্লবীরা আবার তাকে লক্ষ্য করে পরপর চারটি নারকেল বোমা নিক্ষেপ করলেও তার প্রাণরক্ষা পায়। পরবর্তীতে আরও দু'বার ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের ১০ ফেব্রুয়ারি এবং ০৫ এপ্রিল তাকে হত্যা চেষ্টা করা হলেও তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।এরূপ বারংবার ব্যর্থতার ফলে মি.হিউম হত্যাচেষ্টা পরিত্যক্ত হয়।[১৫৬]

১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের ০২ জুন ঢাকা অনুশীলন সমিতির প্রায় পঞ্চাশজন লোক রাইফেল, রিভলভার ও অন্যান্য অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে নৌকাযোগে রাত্রিবেলায় ঢাকা জেলার বাঢ়ড়া গ্রামের এক কুখ্যাত ধনীর গৃহে

উপস্থিত হয়ে ডাকাতি সংগঠিত হয়। গ্রামবাসীদের তীব্র প্রতিরোধ সত্ত্বেও ২৬ হাজার টাকা ও অলঙ্কারাদি সহ গুলিবর্ষণ করতে করতে তারা নৌকায় আরোহন করে। গোলাগুলিতে গ্রামের চৌকিদার সহ কয়েকজন গ্রামবাসী এবং একজন বিপ্লবী নিহত হয়। গ্রামবাসী তাদের ধাওয়া করে এবং ডাকাতির সংবাদ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লে নদীপথের নানাবিপত্তি পেরিয়ে অস্ত্র ও লুণ্ঠিত অর্থসহ ঢাকা শহরে ফিরতে সক্ষম হয়। আদালতে মামলা হলে এদের তিনজন ধরা পড়ে; কিন্তু সাক্ষ্যপ্রমাণের অভাবে খালাশ পায়।

আগস্ট মাসের প্রথমদিকে অনুশীলন সমিতির তিনসদস্য ডাকাতির উদ্দেশ্যে নৌকাযোগে বের হয়। কিন্তু পথিমধ্যে খানাতল্লাশে কয়েকখানা ছোড়াপ্রাপ্ত হওয়ায় পুলিশ গ্রেফতার করে। এমাসের ১৫ তারিখে ময়মনসিংহের বাজিতপুরে একধনীর বাড়িতে বিপ্লবীরা পুলিশের ছদ্মবেশে খানাতল্লাশীর অজুহাতে উপস্থিত হলে গৃহস্বামী গৃহদ্বার খুলে দেয়। এখান থেকে বিপ্লবীরা প্রচুর অর্থপ্রাপ্ত হয় বলে জানা যায়। ১৬ সেপ্টেম্বর হুগলি জেলার বিঘাতি নামক স্থানে একই কৌশলে ডাকাতি করায় পুলিশ সহজেই বুঝতে পারে উভয় স্থানে একই দলভুক্ত বিপ্লবীরা ডাকাতি করেছে। বিঘাতির ঘটনায় চারজন অভিযুক্ত হয়ে দীর্ঘ কারাদন্ডে দন্ডিত হয়।

৩০ অক্টোবর ফরিদপুর জেলার নড়িয়া বাজারে বড় রকমের এক ডাকাতি হয়। ঢাকা অনুশীলন সমিতির বিপ্লবীদের নিকট সংবাদ আসে নড়িয়া বাজারে এক মহাজনের নিকট আঁশি হাজার টাকা ও অন্যান্য দোকানেও বহুটাকা সঞ্চিত আছে। চল্লিশজন বিপ্লবী বন্দুক, রিভলভার ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রসহ নৌকাযোগে উপস্থিত হয়ে নড়িয়া খেয়াঘাটের স্টিমার অফিস ও তিনটি দোকান লুট করে। সম্ভবত পূর্বেই সংবাদ পেয়ে দোকানদারগণ অর্থসরিয়ে ফেলায় প্রত্যাশিত অর্থ না পেয়ে বিপ্লবীরা আশাহত হয়ে ফিরে যায়। পুলিশ বিপ্লবীদের সন্ধ্যানে একহাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করলেও কেউই পুলিশকে সংবাদ দেয় নাই। এই ঘটনায় পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করতে পারিনি এবং কারও শাস্তিও হয় নাই।[১৫৭]

বাংলার ছোটলাট *এন্ড্রু ফ্রেজারকে* (Andrew Henderson Leith Frazer) যতীন্দ্রনাথরায় চৌধুরী নামে এক যুবক ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের ০৭ নভেম্বর কলকাতা কলেজ স্ট্রীটের *ওভারটুন হলে* (Overton Hall) বক্তৃতাকালে হত্যার চেষ্টা করে।দুইবার গুলি করেও সে ফ্রেজারকে হত্যা করতে সমর্থ হয়নি; কিন্তু তৃতীয়বার গুলি করার মুহূর্তে সে ধরা পড়ে। এন্ড্রু ফ্রেজার বেচে যায়। বিচারে বিপ্লবী যুবক যতীন্দ্রনাথরায় চৌধুরীর দশ বৎসরের কারাদন্ডাদেশ হয়। অনুশীলন সমিতির সম্পাদক বিপ্লবী সতিশচন্দ্র বসু থেকে রিভলভারটি পায় মর্মে স্বীকৃত হয়।[১৫৮] এন্ড্রু ফ্রেজারের এই ঘটনার পর অর্থাৎ ১৯০৮

খ্রিস্টাব্দের নভেম্বরের প্রথম দিকে ব্রিটিশ সরকার ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের তিন আইন অনুসারে ভারত সরকার দমনমূলক কার্যক্রম শুরু করে। বৈপ্লবিক কর্মকান্ডের অভিযোগে মনোরঞ্জনগুহ, সাপ্তাহিক সঞ্জীবনী পত্রিকার সম্পাদক ও নবীনব্রাহ্ম অধ্যাপক কৃষ্ণকুমার মিত্র, সুবোধচন্দ্র মল্লিক, শচিন্দ্রপ্রসাদ বসু ও শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীকে বাংলা; এবং পূর্ববাংলা ও আসাম থেকে অশ্বিনীকুমার দত্ত, পুলিনবিহারী দাশ, ভূপেশ নাগ ও সতীশ চট্টোপাধ্যায়কে নির্বাসন দেয়।[১৫৯] এই তালিকার মধ্যে ঢাকা অনুশীলন সমিতির প্রধান, বিপ্লবী পুলিনবিহারী দাশকে ব্রিটিশ সরকার সর্বাপেক্ষা বিপদজনক ব্যক্তিত্ব হিসেবে চিহ্নিত করে। তাঁর অসাধারণ সাংগঠনিক দক্ষতা, কর্মতৎপরতা ও দূরদর্শী নেতৃত্বগুণে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির যুবসমাজ অসংখ্য বৈপ্লবিক শাখা সমিতির মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধভাবে দেশের মুক্তিসংগ্রামে নেমে পড়ে। পূর্ব বাংলায় ধারাবাহিকভাবে বৈপ্লবিক ডাকাতি সংগঠিত হতে থাকে।[১৬০]

১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের ০৯ নভেম্বর সন্ধ্যা ০৭ ঘটিকা, কলকাতার সারপেন্টাইন লেনের আশে-পাশের দেব মন্দিরগুলোতে শঙ্খঘন্টা বাজারসময় বিহারের মুজাফফ্রপুরে প্রফুল্ল চাকীকে গ্রেফতার প্রয়াসী পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনুসরনকারী দুই যুবক; বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষের কলকাতা প্রতিনিধি ঢাকার শ্রীশপাল ওরফে নরেন ও আত্মোন্নতির রণেন গাঙ্গুলী তার বাসগৃহের নিকটে পশ্চিম দিকে একটি শিব মন্দিরের সামনে সশস্ত্র অবস্থায় দাড়িয়ে আরতি দেবার ছলে শিকারের জন্য অপেক্ষমান থাকে। হঠাৎ রণেন গাঙ্গুলী লক্ষ্য করেন, ১০২ নং সারপেন্টাইন লেনের বাড়ি থেকে বের হয়ে সাব-ইন্সপেক্টর নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সে মন্দিরের সামনে দিয়ে ওই পথ ধরে উত্তর দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। রণেন গাঙ্গুলী এবং শ্রীশ পাল তাকে অনুসরণ করতে থাকে। কেরানী বাগানের (মিত্র স্কয়ার) সংযোগে উত্তর-পশ্চিম কোণে নন্দলাল পৌঁছানো মাত্র শ্রীশপাল পরপর দু'টি গুলি করায় শিকার ধরাশায়ী হয়। অতঃপর রণেন গাঙ্গুলী তাঁদের আরাধ্য শিকার পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাথায় পুনরায় রিভলভার দিয়ে আঘাত করে তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত হয়। পরিকল্পিত মিশন সম্পন্ন করে তাঁরা উধাও হয়।[১৬১] পরিকল্পনাটি এতো সংগোপনে করা হয়; তাঁদের পরিচয় সম্পর্কে পুলিশ তো নয়ই; বরং অধিকাংশ বিপ্লবীরাও কিছুই টের পায়নি।

১৯১০ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে মুক্তি পেলেও পুলিনবিহারী দাশকে আবার আগস্ট মাসে ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেফতার করা হয়। এ সময় প্রমথনাথ মিত্রের (পি.মিত্র) মৃত্যুর মাধ্যমে বাংলার একক অনুশীলন সমিতি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। পুলিনবিহারী দাশের পর মাখন সেন অনুশীলন সমিতির নেতা হয়ে ঢাকা অনুশীলনকে স্বামী বিবেকানন্দের পথে চালিত করার প্রচেষ্টা চালায়। বিপ্লবীদের অধিকাংশ মাখন

সেনের নেতৃত্বে আস্থা হারিয়ে নরেন সেনকে নেতা মানে। অতঃপর নরেন সেনের নেতৃত্বে পরিচালিত সংগঠন ঢাকা অনুশীলন নামে খ্যাতি লাভ করে।

কলকাতা কেন্দ্রিক কর্মকৌশল না থাকায় পুলিন বিহারী দাশের নেতৃত্ব নিয়ে পূর্ববঙ্গের কিছু সংখ্যক নেতা-কর্মী ও চিন্তাশীল বিপ্লবীর মনে প্রশ্নের উদ্রেক করে। তারা কলকাতার সাথে সংযোগ রাখায় আগ্রাহ্নিত হয়ে বরিশালের সতীশ মুখোপাধ্যায়ের (স্বামী প্রজ্ঞানন্দ সরস্বতী) দল, ময়মনসিংহের হেমেন্দ্র আচার্য চৌধুরীর দল, মাদারীপুরের পূর্ণদাশের দল, শ্রমজীবি সমবায়ের জ্যোতিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘাজ্যোতিন), অমর চট্টোপাধ্যায়, চন্দন নগরের মতি রায় ও শ্রীষ ঘোষ প্রমূখের মধ্যে কর্মসম্পর্ক স্থাপিত হয়। বিপ্লবী রাসবিহারী বসু এদের বন্ধু ছিলেন বলে উল্লেখ আছে।[১৬২]

১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর ২৯ তারিখে নদীয়া জেলার রায়তায় সংগঠিত ডাকাতির ঘটনা অজ্ঞাত থাকলেও প্রায় একবৎসর পর হলুদবাড়ি ডাকাতি পরবর্তী এক অভিযুক্তের তথ্যের মাধ্যমে ঐ ঘটনা জানাজানি হয়। ডিসেম্বরের ০২ তারিখে হুগলি জেলার মোরেহাল নামক স্থানে ডাকাতি হয়। এ ডাকাতিকালে গ্রামবাসী আহত মন্মথনাথ রায় চৌধুরী ও আরেক সন্দেভাজন যতীন হাজরাকে ধরে ফেলে। স্বীকারোক্তির দিতে অস্বীকৃত হওয়ায় বিচারে মন্মথনাথের সাত বৎসরের জেল হয়। কিন্তু যতীন হাজরা পুলিশকে বিপ্লবী ননীগোপাল সেনগুপ্তের নেতৃত্বে ডাকাতির গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেয়।[১৬৩] এ নভেম্বর মাসেই ঢাকা অনুশীলন দলের সুকুমার চক্রবর্তী, কেশব দে ও অন্নদাপ্রসাদ ঘোষ গ্রেফতার হয়ে পুলিশের নিকট দল সম্পর্কিত গোপনতথ্য প্রকাশ করে মর্মে অভিযোগ ওঠে। মুক্তি পরবর্তীকালে তারা তাদেরই দলের গুপ্তহত্যার শিকার হয় মর্মে গুজব রটে।[১৬৪] এদিকে ডিসেম্বর মাসের শেষদিকে বাকেরগঞ্জের দেহেরগতি নামক স্থানে ডাকাতি করে বিপ্লবীরা প্রচুর অর্থলাভ করে[১৬৫] মর্মে উল্লেখ আছে।

১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের ১১ ডিসেম্বর ব্রিটিশ সরকার বিভিন্ন বৈপ্লবিক সংগঠন দমন করার অভিপ্রায়ে আইন পরিষদে ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের *১৪ নং ফৌজদারী বিধি* (Act XIV of 1908) পাস করে। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে ঢাকা অনুশীলন সমিতি, বাখরগঞ্জের স্বদেশবান্ধব সমিতি, ফরিদপুরের ব্রতী সমিতি এবং ময়মনসিংহের সুহৃদ ও সাধনা সমিতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।[১৬৬] এদিকে ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের ০১ জানুয়ারি ত্রিপুরা জেলার কুমিল্লাস্থ ঢাকার নবাবের মালগুদাম হতে বিপ্লবীরা তিনটি রাইফেল অপহরণ করার ঘটনায় পুলিশ একজন বিপ্লবীকে গ্রেফতার করে।[১৬৭]

অপর সরকারী আইনজীবি আশুতোষ বিশ্বাস অন্যান্যদের সঙ্গে যোগসাজশ করে প্রথমে আলীপুর ষড়যন্ত্র মামলা এবং পরে কানাইলাল দত্ত ও সত্যেন বসুর মামলা দায়ের ও পরিচালনা করে বিপ্লবীদের কোপানলে পড়ে। বিদেশি সরকারকে সহযোগিতার অপরাধে তার মৃত্যুদন্ড স্থির হয়। দায়িত্ব অর্পিত হওয়ায় খুলনা জেলার শোভনা গ্রামের যুগান্তর সদস্য, বিপ্লবী চারুচন্দ্র বসু ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের ১০ ফেব্রুয়ারি কর্তব্য সম্পাদনে বের হয়। পঙ্গু ডানহাতে শক্তকরে বেধে নেন রিভলভার, বামহাতে টানবেন ট্রিগার। যথাসময়ে আলীপুর কোর্টের সম্মুখে গর্জেওঠে চারুর রিভলভার। মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নেয় আশুবিশ্বাস।[১৬৮] ঘটনাস্থলেই চারুচন্দ্র বসু পুলিশের হাতে আটক হয়ে অকথ্য নির্যাতনের মুখে পড়ে। ১৩ ফেব্রুয়ারি ২৪ পরগণার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তদন্ত আরম্ভ হয়। সেখানে চারুচন্দ্র বসু বলেন: No Sessions, Trial, but hang me to-morrow. It was all preordained that Asu Babu shal be shot by me, and I shall be hanged. I killed him as he was an enemy of the Country.[১৬৯] অর্থাৎ বিচারের কোন প্রয়োজন নেই। সবই ভাগ্যের লিখন, আশুবাবু আমার গুলিতে মারা যাবেন এবং পরিণতিতে আমার ফাঁসি হবে। দেশের শত্রুজ্ঞানেই তাকে হত্যা করেছি। কালই আমাকে ফাঁসি দেয়া হোক। ২৩ ফেব্রুয়ারি আদালত প্রদত্ত রায়ে প্রাণদন্ড হয়। আপিল না করায় ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের ১৯ মার্চ আলীপুর জেলে এ মহান বিপ্লবী চারুচন্দ্র বসুর ফাঁসি কার্যকর হয়।[১৭০]

১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের ১০ ফেব্রুয়ারি চব্বিশ পরগনা জেলার আগরপাড়া নামক স্থানে পুলিশের ওপর নিক্ষিপ্ত দু'টি নারকেল বোমা লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় দু'জন পথচারী আহত হয়। ০৩ এপ্রিল ডায়মন্ড হারবার থানার নেত্র নামক গ্রামে বিপ্লবীরা ডাকাতিকালে মুখোশ পড়ে রিভলভার উচিয়ে গৃহস্বামীর নিকট থেকে লোহার চাবি হস্তগত করে ২৪ শত টাকা নেয়। ডাকাতি শেষে গৃহস্বামীকে বলে, ব্রিটিশদের এদেশ হতে উৎখাত কল্পে এ অর্থ তারা ঋণ হিসেবে গ্রহণ করছেন। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের ০৩ জুন অনুশীলন সমিতির সদস্যরা পুলিশের গুপ্তচর অভিযোগে ফরিদপুর জেলার ফতেহপুর গ্রামে গাবেশ চট্টোপাধ্যায়কে হত্যার সময় ভুলক্রমে তার ছোটভাই প্রিয় চট্টোপাধ্যায়কে হত্যা করে। বিচারে এক যুবকের প্রাণদন্ড হয়।[১৭১]

১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের ১৬ আগস্ট কয়েকজন মুখোশধারী যুবক পিস্তল, রিভলভার প্রভৃতি আগ্নেয়াস্ত্রে সজ্জিত হয়ে খুলনা জেলার নাঙ্গলার মথুরানাথ পোদ্দারের বাড়ি উপস্থিত হয়ে সিন্দুকের চাবি নিয়ে দামি অলঙ্কার ও নগদ ১০৭০ টাকা হাতিয়ে নেয়। পুলিশী তদন্তের পর আদালতে মামলা হয়। ৩০ আগস্ট রায়ে দু'জন মুক্তি লাভ করলেও একজনের সাত বৎসরের কারাদন্ড, ছয় জনের সাত বৎসরের জেল, তিন জনের পাঁচ বৎসরের জন্য এবং দুইজন কে তিন বৎসরের জন্য দ্বীপান্তর দন্ডে দন্ডিত করা হয়।[১৭২]

এ কঠোর সাজায় বিপ্লবীদের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। ব্রিটিশ রাজের প্রতি তীব্র ক্ষোভ নির্গত হতে থাকে।

১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের ১১ অক্টোবর ঢাকা জেলার রাজেন্দ্রপুর স্টেশনে বিপ্লবীরা ট্রেন ডাকাতির মাধ্যমে ২৩ হাজার টাকা লুটে নেয়। রাত সাড়ে আটটার দিকে সাতটি থলেতে ভরে সনাতন পালের ২৩ হাজার টাকা নিয়ে তার তিনজন সহকারী নারায়নগঞ্জ থেকে কারৈদ গদিতে যাচ্ছিল। পূর্বহতে সংবাদপ্রাপ্ত গুপ্তসমিতির সাত-আটজন সদস্য ঢাকা হতে সশস্ত্র অবস্থায় ট্রেনে ওঠে। ট্রেনটি রাজেন্দ্রপুর এবং শ্রীপুর স্টেশনের মাঝামাঝি আসামাত্র বিপ্লবীরা রিভলভার ও ছোড়া নিয়ে ঐ তিনজনকে আক্রমণ করে। একজন নিহত ও অপর দু'জন আহত হয়। টাকার থলেগুলি হস্তগত করে ওগুলো ট্রেন হতে ছুড়ে ফেলে নিজেরা লাফিয়ে নেমে পড়ে। পুলিশী অনুসন্ধানে প্রায় ১২ হাজার টাকার ৩টি থলে উদ্ধার এবং ১১ নভেম্বর সুরেশচন্দ্র সেনগুপ্তসহ কয়েকজন গ্রেফতার হয়। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের ১৮ এপ্রিল ঢাকার দায়রা আদালতে মামলা হয়। একজনের যাবজ্জীবন দীপান্তর ও কয়েকজনের বিভিন্ন মেয়াদের কারাদন্ড হয়। অভিযুক্তদের স্বীকারোক্তিতে প্রকাশ পায়; যুগান্তর ও অনুশীলন সমিতি একত্রিত হয়েই এ ডাকাতিতে অংশগ্রহণ করে এবং লুণ্ঠিত অর্থ সমান দু'ভাগে ভাগ করে নেয়।[১৭৩] যুগান্তর ও অনুশীলন সমিতির পারস্পারিক বৈপ্লবিক সহযোগিতার উৎকৃষ্ট প্রমাণ এ ডাকাতি।

১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের ১৬ অক্টোবর অনুশীলন সমিতির সদস্যরা সশস্ত্র অবস্থায় মুখোশ পড়ে ফরিদপুর জেলার দরিয়াপুর গ্রামে মনোমোহন মিত্রের বাড়িতে ডাকাতি করে প্রায় ৩ হাজার টাকা নিয়ে উধাও হয়। সাক্ষ্য প্রমাণের অভাবে পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি। ২৮ অক্টোবর যুগান্তর মাঝরাতে সমিতির সদস্যরা নদীয়া জেলার হলুদবাড়ি গ্রামে ভক্তমল আগরওয়াল আর সীতানাথ সাহার দুটো পাশাপাশি গদিতে ১০/১২জন লোকএকত্রে ডাকাতি করে প্রায় হাজার দেড়েক টাকা পায়। সন্দেহভাজন বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়। হাইকোর্টের স্পেশাল ট্রাইবুনালের বিচারে ১৯১০ খ্রিস্টাব্দের ২৫ এপ্রিল ঘোষিত রায়ে শৈলেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, উপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, গনেশচন্দ্র দাশ ও কিরণচন্দ্র রায় এই পাঁচ জনের আটবৎসর সশ্রম কারাদন্ড হয়। সুশীলকুমার বিশ্বাসকে সাত বৎসর ও শৈলেন্দ্রকুমার দাশকে পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদন্ড দেয়া হয়।[১৭৪]

১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের ১০ নভেম্বর অনুশীলন সমিতির সদস্যরা সশস্ত্র হয়ে রাত ন'টা নাগাদ ঢাকা জেলার রাজনগর গ্রামে এক ধনী সুদখোরের বাড়ি হানাদেয়। নগদে ও অলঙ্কারে প্রায় ২৮ হাজার টাকা পায়। পরদিন (১১নভেম্বর) তাঁরা ২০/২৫ জন লোক সশস্ত্র অবস্থায় নৌকা করে ত্রিপুরা জেলার মোহনপুর

গ্রামের দশআনি বাজারে হানাদেয়। দোকান-পাঠ থেকে প্রায় সাড়ে ষোলো হাজার টাকা লুণ্ঠিত হয়। বহু অনুসন্ধান করেও পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়নি। তবে পুলিশের অনুমান ঢাকা অনুশীলন সমিতির পরিচালকগণ এবং তৎকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সোনারং ন্যাশনাল স্কুলে বসেই এ দু'টি ডাকাতির পরিকল্পনা করা হয়।[১৭৫] পূর্ববাংলার ছোটলাট *মি.হেয়ার* (Mr.Hare) ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বরের শেষ দিকে ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলা যায়। তাঁর গতিবিধির ওপর নজর রাখার জন্য তিনজন যুবক সাধুর ছদ্মবেশে পিছু নেয়।[১৭৬] কিন্তু পুলিশ সন্দেহ ক্রমে হেমচন্দ্র ঘোষ এবং জ্ঞানচন্দ্র রায় ওরফে জ্ঞানা পোদ্দারকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়। জ্ঞানচন্দ্র সঙ্গে সঙ্গেই জামিনে মুক্তি পায়। কিন্তু হেমচন্দ্র ঘোষকে আড়াই মাস হাজত বাসের পর মুক্তি ও আগরতলা থেকে বহিষ্কার করা হয়।[১৭৭]

আলীপুর ষড়যন্ত্র মামলার দায়িত্বে ছিলেন পুলিশের গোয়েন্দা অফিসার শামছুল আলম। সরকারি কৌশলী *মি.নর্টনের* (Mr.Norton) প্রধান সহকারী হিসেবে কর্মদক্ষতার স্বাক্ষর রাখায় সরকারের কাছে তার গুরুত্ব বাড়ে। ইন্সপেক্টর থেকে পদোন্নতি পেয়ে সুপারিন্টেন্ডেন্ট হন।[১৭৮] মিথ্যা মামলা সাজানো, সাক্ষী যোগাড় এবং অভিযুক্তদের মধ্য থেকে প্রলোভনে-ফাঁদে ফেলে রাজসাক্ষী তৈরির পারদর্শিতা তাকে বিপ্লবীদের চক্ষুশূল করে তোলে। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দের ২৪ জানুয়ারি কলকাতা হাইকোর্টে উক্ত মামলার আপীল শুনানীর পর শামছুল আলম যখন হাইকোর্টের সিড়ি বেয়ে নামছিলেন, তখন যুগান্তর সমিতির সদস্য, ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের সন্তান[১৭৯] বিপ্লবী বীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্ত তাকে পিছন থেকে গুলি করায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। বৈপ্লবিক এই আততায়ী উত্তেজনার বশে রাস্তায় গুলি ছুড়তে থাকে। পুলিশ সার্জেন্ট তাঁকে গ্রেফতার করে হাইকোর্টে সোপর্দ করে। ৩১ জানুয়ারি বিচার শুরু হয়।[১৮০] আদালতে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বিপ্লবী বীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্ত প্রদত্ত স্বীকারোক্তি হলো: I was introduced to a gentleman named Jotindranath Mukherjee of 273 Upper Chitpore Road...I asked Jotin to give me work...He told me about shooting Shamsul Alam, Deputy Superintendent of police. Who conducted the Bomb Case and he ordered a boy named Satish Chandra to make arragement of this case.[১৮১] অর্থাৎ বিপ্লবী জ্যোতিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘাজ্যোতিন) এই হত্যাকান্ডের নির্দেশদাতা; তা প্রকাশ হয়ে পড়ে। ঘোষিত রায়ে বিপ্লবী বীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্তের ফাঁসির আদেশ হয়। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি এই বিপ্লবী বীর আলীপুর সেন্ট্রাল জেলের ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণবিসর্জন দেয়।[১৮২]

১৯১০ খ্রিস্টাব্দের মার্চমাসে হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলা[১৮৩] হয়। পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট শামছুল আলম হত্যার পর কলকাতা পুলিশ উম্মাদের মতো চতুর্দিকে খানা তল্লাশ শুরু করে।[১৮৪] আলীপুর ষড়যন্ত্র মামলার পরে অবশিষ্ট বিপ্লবীদের ধরার জন্য *দি এম্‌পারার বনাম ননী গেপাল গুপ্ত এন্ড আদার্স* (The Empire V. Noni Gopal Gupta and Others) শিরোনামে যে অভিযোগ সমূহ উত্থাপিত হয়: ১.অস্ত্র ও বিস্ফোরক সংগ্রহ; ২.পুলিশ অফিসার ও ইনফরমার নিধন; ৩.সৈন্যদের মধ্যে বিপ্লববাদ প্রচার; ৪.অর্থসংগ্রহের জন্য ডাকাতি করা। সরকার হাওড়া জেলার শিবপুর এবং ব্রিটিশ ভারতের অন্যান্য এলাকাকে ষড়যন্ত্রের স্থান হিসেবে চিহ্নিত করে।[১৮৫] ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে ললিত চক্রবর্তী নামে এক ব্যক্তি *স্বীকারোক্তি* (Confess) করে। সে বিপ্লবী দলের ৩২ জনের নাম ফাঁস করে দেয়। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ননীগুপ্ত, জ্যোতিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘাজ্যোতিন), নরেন ভট্টাচার্য, ভূষণ মিত্র, কেশব দে, শরৎ মিত্র, তারানাথ রায় চৌধুরী, রাজশাহীর সতীশ সরকার, পবিত্র দত্ত, হেম সেন, নরেন বসু প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। আনন্দবাজার পত্রিকার সুরেশ মজুমদার এমামলায় আসামী হন। জ্যোতিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘাজ্যোতিন) কে সে তাঁদের *দলের নেতা* (Sectional leader) হিসেবে উল্লেখ করে। জ্যোতিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘাজ্যোতিন) কে গ্রেফতারের সময় তাঁর ঘরে *সরকারি কর্মকর্তাদের গতিবিধির ওপর নজর রাখা সংক্রান্ত ভ্রাম্যমান কমিটি গঠন সম্পর্কিত* (The scheme and formation of Vigilance Committee) একটি কাগজ উদ্ধার করে।[১৮৬] সরকার অভিযুক্ত বিপ্লবীদের বিভিন্ন গ্রুপের সদস্য রূপে উল্লেখ করে। শিবপুর, কুরচি, খিদিরপুর, চিংড়িপোতা, মজিলপুর, হলদিবাড়ি, কৃষ্ণনগর, নাটোর,ঝাউগাছা, যুগান্তর, ছাত্র ভান্ডার ও রাজশাহীর রামপুর বোয়ালিয়া গ্রুপ। জ্যোতিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘাজ্যোতিন) তাঁর অসামান্য সাংগঠনিক তৎপরতা ও ব্যক্তিত্ব গুণে সকলের নেতৃত্ব লাভ করেন অনুমিত হয়।

সরকার ১৯১০ খ্রিস্টাব্দের ২০ জুলাই প্রাথমিক তদন্ত শেষে ০১ ডিসেম্বর ৪৬ জনের বিরুদ্ধে মামলা শুরু হয়। শুনানী ও অন্যান্য কারণে সাতজন অব্যাহতি লাভ করে। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দের ১৯ এপ্রিল প্রদত্ত রায়ে ৩৩ জন মুক্তি পায়। হলুদবাড়ি ডাকাতি মামলায় অভিযুক্ত ০৬ জনের মধ্যে শৈলেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও কিরণচন্দ্র রায় দু'বছর করে এবং শৈলেন্দ্রকুমার দাশ, উপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও গণেশচন্দ্র দাশের এক বছর করে দন্ড বাড়িয়ে দেয়া হয়। রায়ে বলা হয়, পূর্বদন্ড শেষ হলে নতুন দন্ড শুরু হবে।[১৮৭] পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট শামছুল আলম হত্যাকারী বীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্তের স্বীকারোক্তির পর তাঁকে জেরা করার পূর্বেই সরকার তাঁকে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিয়ে দেয়। সাক্ষী আদালত কর্তৃক অগ্রাহ্য হওয়ায় এই মামলার গুরুত্বপূর্ণ আসামী বিপ্লবী জ্যোতিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘাজ্যোতিন) খালাশ পায়।[১৮৮] এভাবে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি *স্যার জেনকিন্স'র* (Sir Lawrence

Hugh jenkings, K.C.I.E) তীক্ষ্ণ বিচারিক দৃষ্টির ফলশ্রুতিতে সরকারি ষড়যন্ত্র নস্যাৎ হয়।[১৮৯] একারণে মামলার বাইরে আত্মগোপনে থাকা বিপ্লবীরা কিঞ্চিত স্বস্তিলাভ করে মনে করা হয়।

ঢাকা ও আশেপাশের ডাকাতির ঘটনায় সরকার খুব বিব্রত হয়ে উঠে। প্রমাণাভাবে কেউ গ্রেফতার হয়নি বটে; তবে ঢাকা অনুশীলন সমিতির কাজ সন্দেহ করা হয়। সরকার এহেন বিব্রতকর পরিস্থিতিতে ১৯১০ খ্রিস্টাব্দের ১২ ডিসেম্বর ভারতীয় সরকার 'সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রচেষ্টা এবং সে সম্পর্কে ষড়যন্ত্র' বা ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলা আয়োজন সম্পুর্ণ করে। সরকারী ভাষ্য মতে, 'a case of wide and gigantic conspiracy to subert the British Government in near future.'[১৯০] এদিকে প্রায় ১৪ মাস নির্বাসন দন্ড ভোগ করে ১৯১০ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে ঢাকা অনুশীলন সমিতির শীর্ষনেতা বিপ্লবী পুলিনবিহারী দাশ মুক্তিলাভ করেন। পুলিশ এই মোক্ষম সুযোগ কাজে লাগায় পায়। জুলাই মাসে খানাতল্লাশী ও ধড়পাকড় শুরু হয়। এই মামলায় পুলিনবিহারী দাশ, আশুতোষ দাশগুপ্ত, ঢাকার উকিল ললিতমোহন রায়, টাঙ্গাইলের উকিল অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ, গুরুদয়াল দাশ, দীনেশ গুহ, অক্ষয়কুমার দত্ত, শান্তি মুখার্জী, যোগেন্দ্রচন্দ্র দাশ, জ্যোতির্ময় রায়, নিশিকান্ত চৌধুরী, শচীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সহ মোট ৪৪ জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে ২২ নভেম্বর আদালতে তোলা হয়। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দের ১২ ডিসেম্বর থেকে ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের ০৬ জানুয়ারি পর্যন্ত মামলা চলে। আদালতে *মূল্যায়নকারীগণ* (assessors) আসামীদের নির্দোষ বললেও ০৭ মে ঘোষিত রায় কঠোর বলে প্রতীয়মান হয়। পনের জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয়। পুলিনবিহারী দাশ সাত বৎরের কারাদন্ড এবং চৌদ্দ জনের দুই থেকে সাত বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদন্ড হয়। অন্য সবাই খালাশ প্রাপ্ত হয়।[১৯১]

১৯১১ খ্রিস্টাব্দে সরকার রাজদ্রোহমূলক জনসভা নিবারক আইন (১৯১১ খ্রিস্টাব্দের ১০নং আইন) প্রবর্তনকরে দমননীতির কৌশল গ্রহণ করে। কিন্তু তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ায় বাংলাকে শান্ত করার অন্যকোন উপায় না পেয়ে বঙ্গবিভাগ রদ সিদ্ধান্ত করে। ১২ ডিসেম্বর সম্রাট পঞ্চম জর্জের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে দিল্লী দরবার ঘোষণা অনুযায়ী দু'বাংলা আবার সংযুক্ত হয়।[১৯২] কিন্তু রাজধানী চলে যায় দিল্লিতে। বঙ্গবিভাগ রদের কারণে সরকারের প্রত্যাশা জন্মেছিল এতে করে সশস্ত্রবৈপ্লবিক কর্মকান্ড হ্রাস পাবে কিন্তু কংগ্রেসের নরমপন্থিরা খুশি হলেও বিপ্লবীরা পূর্ণস্বাধীনতা লাভের বাসনায় আরও জোরদার বৈপ্লবিক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে মাঠে নামে।

বিপ্লবী আন্দোলনে বাংলা ও মহারাষ্ট্রের মতোই গৌরবের অধিকারী ছিল পাঞ্জাব। পাঞ্জাবের অধিবাসী বিশেষত শিখদের মধ্যে সশস্ত্র বৈপ্লবিক আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। তাদের সঙ্গে বাংলার বিপ্লবীদের সংযোগ রক্ষা করতেন রাসবিহারী বসু। কলকাতা থেকে ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী দিল্লিতে সরিয়ে নেওয়ার প্রতিবাদে ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের ২৩ ডিসেম্বর দিল্লিতে রাসবিহারী বসুর ইশারায় বিপ্লবী বসন্তকুমার বিশ্বাস ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জের ওপর বোমাবর্ষণ করলে তিনি আহত হলেও প্রাণে বেচে যান।[১৯৩] এ ঘটনায় দিল্লি ষড়যন্ত্র মামলা আরম্ভ হয় এবং কয়েকজন বিপ্লবীর ফাঁসি হলেও রাসবিহারী বসু আত্মগোপনে থেকেই বৈপ্লবিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে থাকেন।

বৈপ্লবিক সমিতি নিষিদ্ধকরণ, পুলিশী নির্যাতন ও বিভিন্ন ষড়যন্ত্রমূলক মামলা দিয়ে বৈপ্লবিক নেতৃবৃন্দকে জেলে প্রেরণ; এবং সর্বশেষ বাংলা বিভাগ রদ ঘোষণা করা সত্ত্বেও ঢাকা অনুশীলন সমিতির বৈপ্লবিক কর্মকান্ড বন্ধ হয় নাই। সিডিশন কমিটির মন্তব্যে তা প্রতীয়মাণ হয়। দুঃখের বিষয় বিচারিক প্রক্রিয়ায় শাস্তির বিধান করেও এইজেলার অপরাধ নিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এহেন বৈপ্লবিক অবস্থা মোকাবিলায় সরকারের করণীয় সম্পর্কে গঠিত: Sedition Committee Report, 1918- এর মধ্যে বলা হয়েছে, ষড়যন্ত্রকারীদের সংখ্যাধিক্যতা এবং তাঁদের সাংগঠনিক দক্ষতার তুলনায় গ্রেফতারের অপ্রতুলতাই সম্ভবত এইব্যর্থতার কারণ।[১৯৪] এদিকে রতিলাল রায় নামক এক পুলিশ কনস্টেবল ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে ২৪ সেপ্টেম্বর ঢাকায় সন্ধ্যা ০৭ ঘটিকা নাগাদ হত্যাকান্ডের শিকার হয়। ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় তথ্য সরবরাহ এবং বিপ্লবীদের অনুসরণ করায় এ ঘটনা ঘটে বলে অনুমিত হয়।[১৯৫]

১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের ২৯ সেপ্টেম্বর কলকাতা কলেজ স্কোয়ারে দায়িত্বরত পুলিশ হরিপদ দেব জনৈক বিপ্লবীর গুলিতে নিহত হয়।আততায়ী তার কর্মসাধন করে ভীড়ের মধ্যে মিশে যায়।পরদিন রাতে ময়মনসিংহ শহরের বাসায় অবস্থানকালে পুলিশ ইনস্পেক্টর বঙ্কিম চৌধুরীকে লক্ষ্য করে বোমা নিক্ষিপ্ত বোমার আঘাতে তার মৃত্যু হয়।সংগঠিত এই উভয় হত্যাকান্ডে অনুশীলন সমিতির সদস্যরা জড়িত বলে জানা যায়।[১৯৬]

পূর্ববাংলার বাখরগঞ্জ জেলায়[১৯৭] পরপর বেশ কয়েকটি ডাকাতি[১৯৮] হয়। গোপনভাবে প্রকাশিত অনুশীলনের স্বাধীন ভারত ও রাসবিহারী বসুর লিবার্টি প্রত্রিকার মাধ্যমে তৎকালীন শাসনযন্ত্রের বিরুদ্ধে জনমত উত্তেজিত করার প্রয়াস পায়। বরিশালের একটি আড্ডায় কাগজ-পত্র ধরাপড়ে।[১৯৯] প্রাপ্ত তথ্যের মাধ্যমে পুলিশ ৪৪ জন বিপ্লবীকে নিয়ে প্রথম বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলা আরম্ভ হয়। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের ২১

নভেম্বর মামলা শুরু হয়। এতে ২৬ জনের বিচার হয়। রজনীকান্ত দাশ এবং গিরিন্দ্রমোহন দাশ রাজসাক্ষী হয়। পরবর্তীতে আরও ১২ জন অপরাধ স্বীকার করে নেয়। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের ১৫জানুয়ারি রায় হয়। ঘোষিত রায়ে প্রথম দফায় ০৭ জন, দ্বিতীয় দফায় ২ জন এবং শেষপর্যন্ত ১২ জনের ১২ বৎসর হতে ০২ বৎসর পর্যন্ত বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড হয়। অভিযুক্ত অপর ১৪ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তারা এ মামলা থেকে বেকসুর খালাস ও মুক্তি লাভ করেন। রমেশ আচার্য ও নরেন সেন এ মামলায় উল্লেখযোগ্য আসামী ছিলেন[২০০] বলে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়।

১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় বরিশাল মামলা শুরু হয়। পুলিশের হস্তগত কাগজের মধ্যে কিছু সংগঠন-প্রণালী[২০১] সংক্রান্ত কাগজপত্রও ছিল। প্রিয়নাথ আচার্য রাজসাক্ষী হয়। প্রখ্যাত বিপ্লবী মদনমোহন ভৌমিক (১৮৮৫-১৯৫৫), মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী (১৮৮৯-১৯৭০), খগেন্দ্রনাথ চৌধুরী, প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী, রমেশচন্দ্র দত্তচৌধুরী এ মামলায় আসামী হন। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে রায়ে এদের দ্বীপান্তর হয়। অবশেষে হাইকোর্টের আদেশে শেষোক্ত দু'জন মুক্ত হন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। এই মামলার বিচারকালে একটি বিষয় প্রকাশ্যে উঠে আসে, পার্বত্য ত্রিপুরায় বিলোনিয়া ও আদিয়াপুর অঞ্চলে ঢাকা অনুশীলন সমিতির দু'টি *কৃষি খামার* (Agricultural Farm) ছিল।[২০২] বৈপ্লবিক পরিকল্পনা ও অস্ত্র প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে এ খামারদ্বয় ব্যবহৃত হত বলে জানা যায়।

১৯১২ খ্রিস্টাব্দে ২৪পরগণা জেলার জগদ্দল অঞ্চলে আলেকজান্ডার জুট মিলে আত্মোন্নতি সমিতির এক সদস্য কাজ করতো। সেখানে কর্মরত ইঞ্জিনিয়ার *রবার্ট ও'ব্রায়েন* (O'Brien) বাঙালি তথা ভারতীয়দের ঘৃণা করতেন। এক বচসার ঘটনাবশত *রবার্ট ও'ব্রায়েন* সজোরে পেটে লাথি মারায় ঐ বাঙালি ভদ্রলোকের মৃত্যু ঘটে। আদালতে মামলায় রবার্ট ও'ব্রায়েন'র ৩০টাকা জরিমানা হয়। আত্মোন্নতি সমতিরি বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী, শ্রীশচন্দ্র পাল, হরিশ্চন্দ্র শিকদার মিলিত হয়ে ও'ব্রায়েনের মৃত্যু সিদ্ধান্ত হয়। ঢাকার হরিদাশ দত্ত ও কুমিল্লার খগেন দাশ দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়ে কৌশলে ঐ জুট মিলে কুলির কাজ নেন। কিন্তু ঘটনা জানাজানি হওয়ায় শ্রীশপাল ও খগেন দাশ গ্রেফতার ও মামলার আসামী হন।তবে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তারা মুক্তিলাভ করেন। ইঞ্জিনিয়ার রবার্ট ও'ব্রায়েন বিলেত চলে গেলে তাকে হত্যার বৈপ্লবিক প্রচেষ্টাও শেষ হয়।[২০৩]

১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে যোগেন চক্রবর্তীর নেতৃত্বে অনুশীলন সমিতির কয়েকজন বোমাসহ শ্রীহট্টের ম্যাজিষ্ট্রেট মি.গর্ডনকে (Mr.Gordon) হত্যা উদ্দেশ্যে যায়। নিক্ষিপ্ত হওয়ার পূর্বেই বোমা ফেটে যোগেন চক্রবর্তীর মৃত্যুতে বিভিন্নস্থানে খানাতল্লাশ হয়। সূত্রধরে কলকাতার রাজাবাজারে একগৃহে

খানাতল্লাশ করে অমৃতলাল হাজরা ওরফে শশাঙ্ক শেখর হাজরা,[২০৪] দীনেশ সেনগুপ্ত, চন্দ্রশেখর দে এবং সারদা গুহ নামক চারজন বিপ্লবীকে গ্রেফতার করে। বহু সিগারেটের টিনবাক্স, বোমা তৈরিতে সহায়ক প্রচুর রাসায়নিক দ্রব্য এবং বৈপ্লবিক পুস্তকাদি জব্দকরে। কালীপদ ঘোষ (উপেন্দ্রলাল রায়চৌধুরী) ও খগেন্দ্রনাথ চৌধুরী (সুরেশচন্দ্র চৌধুরী) নামীয় দু'যুবকও গ্রেফতার হয়। আলীপুর আদালতে রাজাবাজার বোমার মামলা শুরু হয়। আদালতের রায়ে খগেন্দ্রনাথ চৌধুরী ব্যতীত সকলেরই বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড হয়। হাইকোর্টে আপীল করলে প্রত্যেকেরই দন্ডবৃদ্ধি পায়। খগেন্দ্রনাথ চৌধুরীও শাস্তি লাভ করেন। শশাঙ্ক শেখর হাজরার কারাদন্ড ০৭বৎসর হতে বৃদ্ধি পেয়ে ১৫ বৎসরের দীপান্তর দন্ড হয়।[২০৫] উচ্চ আদালতে নজির বিহীন এইরকম সাজা বৃদ্ধির ঘটনা আইনাঙ্গনের ইতিহাসে বিরল। সাজা বৃদ্ধির এই ঘটনার মাধ্যমে সরকার বৈপ্লবিক কর্মকান্ডের ওপর কতটা বিরক্ত ও কঠোরনীতি গ্রহণ করেছিলেন তা অনুমিত হয়। উপর্যুক্ত বৈপ্লবিক কর্মপ্রচেষ্টার ধারাবাহিকতায় ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের ১৯ জানুয়ারী কলকাতার গ্রেস্ট্রীট ও শোভাবাজার মোড়ে ট্রাম হতে পুলিশ ইন্সপেক্টর নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ নামামাত্র দু'জন আততায়ীর ছোড়া গুলিতে প্রাণহারান বলে উল্লেখ পাওয়া যায়।[২০৬] এই হত্যাকান্ডের ধরণ ও পারিপাশ্বিক অবস্থা বিবেচনায় সরকারের কঠোরনীতি ও উচ্চ আদালতের রায়ে বিপ্লবীদের সাজাবৃদ্ধির প্রতিবাদ স্বরূপ বৈপ্লবিকদলের আততায়ীরা এই হত্যাকান্ডে সম্পৃক্ত ছিল বলে অনুমিত হয়।

১৯১২ খ্রিস্টাব্দে বরিশাল দল আত্মোন্নতির সঙ্গে পরিচিত হয়। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে বর্ধমান ও কাথীতে বন্যা হয়। জ্যোতিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের (বাঘাজ্যোতিন) নেতৃত্বে বন্যা প্লাবিতদের সেবায় বাংলার বিপ্লবীরা ঝাঁপিয়ে পড়ে। তরুণেরা উচ্ছসিত হয়। এ সময় বিপ্লবী ডা.যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে বরিশাল দলের ঘনিষ্ঠতা হয় এবং ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে সতীশ সেনের মাধ্যমে স্বামী প্রজ্ঞানন্দের সাথে পরিচয় এবং কাঁশির কর্মস্থলে মনোরঞ্জনের সাথে বন্ধুত্ব হয়। বরিশাল দলের ডাকে ময়মনসিংহের দল এবং অতুলকৃষ্ণ ঘোষের আহ্বানে পূর্ণচন্দ্র দাশের মাদারীপুরের দল জোটবদ্ধ হয়। বগুড়ার যতীন রায় ও রাজশাহীর সতীশ সরকারের পরিচিতিতে উত্তরবঙ্গের দলও এই জোটে আসে। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে অবিনাশ ভট্টাচার্য[২০৭] যুগান্তর দলের নেতৃত্বভার যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন) কে অর্পণ করেন। জ্যোতিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের (বাঘা জ্যোতিন) [২০৮] নেতৃত্ব বাংলার যুগান্তর দলের বিপ্লবী নেতৃবৃন্দও মেনে নেয়।[২০৯]

১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে জার্মানি প্রথম বেলজিয়াম আক্রমণ করে। ০৪ আগস্ট জার্মানির সাথে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়ার যুদ্ধ ঘোষিত হয়। ইংল্যান্ডের উদ্যোগে পূর্ব থেকেই এই তিন রাষ্ট্রের মধ্যে মৈত্রী চুক্তি বিদ্যমান ছিল।[২১০] আগস্ট মাসে ইউরোপে যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে ক্রমশ বিস্তৃত হয়ে বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হয়।

ব্রিটিশ সরকার যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ায় বিপ্লবীরা এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে স্বাধীনতা লাভের জন্য সমগ্র ভারতব্যাপী এক সশস্ত্র বিদ্রোহের পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হয়। উদ্দেশ্য হাসিলে বৈদেশিক সাহায্য লাভের প্রচেষ্টা শুরু হয়।[২১১] জ্যোতিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের (বাঘাজ্যোতিন) নেতৃত্বে বিপ্লবীদের নেয়া এ কর্ম-প্রচেষ্টা বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাসে এক নবপালক সংযোজন করে।

সশস্ত্র বিদ্রোহের পরিকল্পনা সম্পর্কে রডা অস্ত্রলুটের ঘটনায় প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারী হরিদাস দত্ত উল্লেখ করেছেন: ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে বৈপ্লবিক আন্দোলনের প্রভাবশালী নেতা জ্যোতিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘাজ্যোতিন) ও রাসবিহারী বসু সকল বিপ্লবীদলের সমন্বয়ে একটি সর্বভারতীয় সশস্ত্র বিপ্লবের পরিকল্পনা সুষ্ঠুরূপে গ্রহণের পূর্বে কিছু অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের জন্য তৎপর হন। বিদেশে নির্বাসিত বিপ্লবী নেতারা জার্মানির সাথে যোগসাজশে ভারতেবিপ্লব সংগঠিত করার পরিকল্পনা করে। সফল হলে জাহাজ বোঝাই অস্ত্র ও অর্থও আসতে পারে। কিন্তু তার আগে নিজেদের তো কিছুটা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তৈরী থাকা দরকার। *চোরাইপথে সংগৃহীত রিভলভার-পিস্তলে* (Smuggled weapons) তো আর প্রকৃত লড়াই চলে না। কারণ রাজ্য ভান্ডার খুলে অতিরিক্ত অর্থ দিলেও অধিক সংখ্যায় অস্ত্র পাওয়া যায়না। সুতরাং নেতারা অস্ত্রসংগ্রহের নতুনপথ খোঁজায় তৎপরতা শুরু করেন। বৈপ্লবিক আয়োজনের এমন মোক্ষম সময়ে রডার অস্ত্র লুটের সম্ভাবনা দেখে শ্রীশচন্দ্র পাল চুপচাপ বসে না থেকে এর বাস্তবায়নে অগ্রণী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।[২১২]

বৈদেশিক যোগাযোগ শুরুর পূর্বেই বিপ্লবীরা দেশের অভ্যন্তরেই অস্ত্রসংগ্রহের এক চমৎকার সুযোগ পেয়ে যায়। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে আত্মোন্নতি সমিতিরি সদস্য শ্রীশচন্দ্র মিত্র ওরফে হাবু কলকাতার অস্ত্র ব্যবসায়ী রডা এন্ড কোম্পানীর অফিসে কাজ নেয়। তিনি ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের ২৬ আগস্ট কোম্পানীর চালান থেকে ৫০ খানা মশার পিস্তল ও ৫০,০০০ টোটায়-ভরা একাধিক বাক্স সরাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। বিপ্লবী বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী অস্ত্রলুট ও সরিয়ে নেয়ার ব্যাপারে ডা.যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের সহায়তা চাওয়ায় তিনি তাঁকে জ্যোতিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের (বাঘাজ্যোতিন) সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। এসময়ে এবং পরেও ঢাকা অনুশীলন সমিতির সাথে তাঁদের বহুব্যাপারে সহযোগিতা ছিল; যদিও ঢাকা অনুশীলন সমিতি তাঁদের পৃথক সত্ত্বা বজায় রাখতে সক্ষম হয়।[২১৩] পরে এই অপহৃত ৪৪খানা মশার পিস্তল সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন বৈপ্লবিক সমিতির মধ্যে বিলি করা হয়। পশ্চিমবঙ্গে জ্যোতিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘাজ্যোতিন) পরিচালিত যুগান্তর সমিতি,সতীশ চক্রবর্তীর চন্দন নগরের যুগান্তর শাখা, বিপিন গাঙ্গুলির যুগান্তর শাখা, মাদারীপুর সমিতি, ঢাকা ও বরিশালের অনুশীলন সমিতি প্রমূখ নয়টি বৈপ্লবিক সমিতি অস্ত্রগুলি লাভ করে।[২১৪] চমকপ্রদ তথ্য হলো-১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট পরবর্তী বাংলায়

বৈপ্লবিককর্ম খুব কমই ঘটেছে যেখানে রডা কোম্পানীর মশার পিস্তল ব্যবহৃত হয় নাই। বাংলাদেশের বিভিন্নস্থানে অভিযান পরিচালনা করে পুলিশ মাত্র ৩১ খানা মশার পিস্তল উদ্ধার করতে পেরেছিল বলে জানা যায়।[২১৫] পরবর্তীতে ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত *মন্টেস্কু-চেমসফোর্ড* (Montagu-Chelmsford) শাসন সংস্কার সম্পর্কিত রিপোর্টে বলা হয়েছে, পঞ্চাশটি মশার পিস্তল বাংলাদেশের প্রশাসন যন্ত্রকে প্রায় অচল করে দেয়।

দ্বিতীয় পর্বের বৈপ্লবিক কার্যক্রমে দুঃসাহসী বাঙালি যুবকেরা শত্রুর বিরুদ্ধে সম্মুখ সমরে আবির্ভূত হয়। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হলে ঢাকা অনুশীলন সমিতিও পূর্ববাংলার বাইরে সর্ব ভারতীয় বৈপ্লবিক প্রচেষ্টায় নতুন পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হয়। সর্ব ভারতীয় বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান আয়োজনের অংশ হিসেবে নির্বাচিত দু'শতাধিক কর্মী বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ছড়িয়ে পড়ে।[২১৬] *সিডিশন কমিটির রিপোর্টে* (Sedition Committee Report,1918) উল্লেখ আছে, প্রথম দিকে ঢাকা ও ময়মনসিংহে অনুশীলন সমিতির জোরালো কার্যক্রম লক্ষ্যণীয়। পরবর্তীতে উত্তর-পশ্চিমে দিনাজপুর হতে দক্ষিণপূর্বে চট্রগ্রাম পর্যন্ত;এবং উত্তরপূর্ব কুচবিহার হতে দক্ষিণ-পশ্চিমে মেদিনীপুর পর্যন্ত এই সমিতির কার্যক্ষেত্র বিস্তৃত হয়। বাংলার বাইরে এই দলের কর্মীরা আসাম, বিহার, পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ ও পুণায় গুপ্তসমিতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা আরম্ভ করে।[২১৭]

ঢাকা অনুশীলন সমিতি ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের ও কলকাতার দল,মাদারীপুরের দল, বরিশালের দল, উত্তর বঙ্গের দল, ময়মনসিংহের দল ছিল। প্রত্যেক দলই তাদের কর্মক্ষেত্র বৃদ্ধি করে। চন্দননগর দলের সাথে ঢাকার অনুশীলন সমিতি যৌথভাবে অগ্রণি হয়। তাঁদের কর্মপদ্ধতি এতো সুচারু ছিল যে, অনেক সময় বিপ্লবীদের একই *প্রচারপত্র* (Pamphlet) নির্দিষ্ট দিনে চট্টগ্রামের প্রান্তভূমি হতে আরম্ভ করে পাঞ্জাবের প্রান্তদেশ পর্যন্ত বিতরিত হয়েছে। অনুশীলন সমিতির বাংলা ও ইংরেজি ইস্তেহারের নাম ছিল যথাক্রমে ও 'স্বাধীন ভারত' ও *লিবার্টি* (Liberty)। অন্যান্য বৈপ্লবিকদল গুলো মিলিত ভাবে 'যুগান্তর' নামের ইস্তেহারটি বের করতো। বলাবাহুল্য এসকল বিস্তৃত কর্মকান্ডহেতু ব্রিটিশসরকার কর্তৃক প্রতিরোধ ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হতো।[২১৮]

একদা কলকাতার গ্রিয়ার পার্কে অধুনা মহিলা উদ্যানে নানাকেন্দ্র হতে বিশিষ্ট বিপ্লববাদীরা কর্তব্য নির্ধারণের জন্য একত্রিত হয়। এদের মধ্যে আট/দশ বৎসরের সাজাপ্রাপ্ত ফেরারীও আছে। গ্রেফতারকৃত একজন বিপ্লবীর বিশ্বাসঘাতকতায় পুলিশ বিষয়টি জ্ঞাত হয়ে গ্রিয়ার পার্কটি গিরে ফেলে। পার্কে ঢুকেই বিপ্লবীরা বুঝে যায়; পালানোর কোনো পথ নেই। বিপ্লবীরা নিরস্ত্র থাকায় পুলিশের সাথে হাতাহাতি ও

ধ্বস্তাধ্বস্তি হয়। বিপ্লবী বীরেন্দ্র পালাতে উদ্যত হয়ে পার্শিবাগান থেকে ফিরে আসে। বিপ্লবী নরেন্দ্রকে পুলিশ প্রহার করতে থাকায় বীরেন্দ্র এগিয়ে যেতেই পুলিশ কর্তারা চতুর্দিক ঘিরে ধরে তার হাত ভেঙ্গে ফেলতে উদ্যত হয়। তৎক্ষনাৎ তিনি এক লহমায় কৌশলে পুলিশ অফিসার *লোম্যানের* (Lowman) ডান হাত ভেঙ্গে দেন। বীরেন্দ্র সম্পর্কে পুলিশ ইনস্পেক্টর জেনারেল লোম্যানের উক্তি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেছেন: He is a dangerouse man, If he could have arms he would have killed all of us.[২১৯] পরবর্তীতে আরও অনেকে গ্রেফতার হয়। তন্মধ্যে ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী মহারাজ যক্ষা ও হাঁপানী রোগাক্রান্ত হয়ে এক সন্ন্যাসীর ব্যবস্থামতে রোজ গঙ্গাস্নান করতেন। কিন্তু এক পুরাতন বিপ্লবীর বিশ্বাসঘাতকতার কারণে ঢাকার আই.বি.অফিসার বহুদিনের ফেরারী ও সশস্ত্র বৈপ্লবিক আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী মহারাজকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়।[২২০]

১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা বহুলাংশে বৃদ্ধিপাওয়ায় প্রচুরঅর্থের প্রয়োজন দেখা দেয়। স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনার স্বার্থে ডাকাতির মাধ্যমে অর্থসংগ্রহের সিদ্ধান্ত হয়। এই বৎসর ডাকাতির মাধ্যমে বিপ্লবীরা একলক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা পায়।[২২১] ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের ১২ ফেব্রুয়ারিতে কলকাতায় যুগান্তর সমিতি গার্ডেনরিচ-এ বার্ড কোম্পানীর গাড়ি হতে ডাকাতি করে ১৮ হাজার টাকা নেয়। সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী বিপ্লবীরা হাওড়া স্টেশনে যায়। ট্যাক্সি ভাড়া করে শিয়ালদা স্টেশন হয়ে বেলা আড়াইটার দিকে গার্ডেনরিচ সার্কুলাররোড ও গার্ডেনরিচ রোডের মোড়ে উপস্থিত হয়। টাকাসমেত ঘোড়ার গাড়িটি আসতেই টাকারব্যাগ নিয়ে বিপ্লবীরা ট্যাক্সিযোগে পালিয়ে যায়। পুলিশী অনুসন্ধানে আসামীরা ধরাপড়ে এবং মামলায় পতিতপাবন ও রাধাচরণের সাতবৎসর এবং রাধাচরণ ও হীরালাল বিশ্বাসের অস্ত্র আইনেও দুইবৎসর কারাদন্ড হয়। অতুলকৃষ্ণ ঘোষ ও নরেন্দ্র ভট্টাচার্য এমামলা থেকে অব্যাহতি পায়।[২২২] ২২ ফেব্রুয়ারি উক্ত সমিতি বেলিয়াঘাটায় এক চাউল ব্যবসায়ীর অফিসে ডাকাতি করে পায় ২২ হাজার টাকা। একজন ট্যাক্সিচালক বিপ্লবীদের গুলিতে নিহত হয়। ০২ ডিসেম্বর কলকাতা করপোরেশন স্ট্রিটে ডাকাতি করে ২৫ হাজার টাকা পায়। এতে একজনের তেরো বৎসর, একজনের দুই বৎসর ও আরেকজনের একবৎসর সশ্রম কারাদন্ডের আদেশ হয়। অর্থসংগ্রহের নিমিত্তে সংগঠিত এই তিনটি কর্মই সশস্ত্র বৈপ্লবিক আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব বিপ্লবীনেতা জ্যোতিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের (বাঘাজ্যোতিন) সক্রিয় উদ্যোগ ও পরিচালনায় সুসম্পন্ন হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় ডাকাতিতে অপর বিপ্লবী নেতা বিপিনবিহারী গাঙ্গুলীর সক্রিয় সহায়তা ছিলো বলে জানা যায়।[২২৩]

১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের ১১ এপ্রিল সশস্ত্রাবস্থায় ২০ থেকে ২৫ জন যুবক রাত ১১ ঘটিকায় ডাকাতির উদ্দেশ্যে ত্রিপুরার বলদা গ্রামে উপেন্দ্রের বাড়ি হাজির হয়।মারধোর করে প্রায় ৪,০০০ টাকা নিয়ে চলে যাবার সময় ৫,০০ টাকার একটি বান্ডিল ফেলে যায়।[২২৪] ৩০ এপ্রিল নদীয়ার প্রাগপুরে ২৭,০০ টাকা ডাকাতি হয়। এক পুলিশ ইনস্পেক্টর লোকজন নিয়ে তাদের ধাওয়া করে।রাস্তা ভূলহওয়ায় অনেকটা পথ নৌকায় আসতে হয়। এহেন প্রতিকূল পরিবেশে বিপ্লবীদের একজন নিজের লোককেই গুলি করায় বিপ্লবী সুশীল সেন[২২৫] মারা যায়। আত্মরক্ষার বিকল্প উপায় না থাকায় সুশীলের সহযোগি বিপ্লবীরাই তার ধড় কেটে মাটিতে পুতে রাখে। এবং ধড়বিহীন শরীর নদীতে ভাসিয়ে দেয়। এই ঘটনায় পুলিশী মামলায় বিপ্লবীদের তিন জনের সতের বৎসর, একজনের আট বৎসর দীপান্তর দন্ডের সাজার আদেশ হয়। এছাড়া ০২ আগস্ট পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগণা জেলার আগরপাড়ায় জনৈক বিল কালেক্টারকে আক্রমণ করা হলে তার চিৎকারে একটা শোরগোলের সৃষ্টি হয়। এ বৈপ্লবিক ঘটনায় বিপ্লবী বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি একটি রিভলভারসহ গ্রেফতার হলে তাঁর পাঁচবৎসর কারাদন্ড হয়।[২২৬]

এই বৎসর বিপ্লবীরা বেশ কয়েকটি বৈপ্লবিককর্ম সংগঠিত করে। ইউরোপে ব্রিটিশ শক্তি বিপন্ন; সুতরাং ভারতবর্ষে তাকে নানাভাবে বিব্রত করার সুযোগ গ্রহণ করা সমরকৌশল হিসেবে গৃহীত হয় সেসময় পুলিশী তৎপরতার বিরুদ্ধে নিজেদের অস্তিত্ব জানান দেবার স্বার্থে বিপ্লবীরা ডাকাতির মাধ্যমে অর্থসংগ্রহ ও অন্যদিকে গুপ্তহত্যার মাধ্যমে আপদদূর করার প্রয়াস পায়। এদিকে কয়েকটি বৈপ্লবিক ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে পুলিশ জ্যোতিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘাজ্যোতিন) কে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়ায়। তবে তাঁর কোনো সন্ধান না পাওয়ায় পুলিশের ধারণা তিনি বাংলার বাইরে চলে গেছেন অথবা কোন দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়ে থাকবে। ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের ২৪ ফেব্রুয়ারি পাথুরিয়াঘাটায় একবাড়িতে আত্মগোপন করে থাকাবস্থায় গোয়েন্দা অফিসার নীরদ হালদার অকস্মাৎ সেখানে উপস্থিত হয়ে জ্যোতিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘাজ্যোতিন) কে চিনে ফেলে। আনন্দিত হয়ে তাঁর নাম উচ্চারণ করে সম্মোধন করে। নীরদের এ আনন্দে বিপদের আশঙ্কায় জ্যোতিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গী চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী গোয়েন্দা অফিসার নীরদ হালদারকে গুলি করে। নীরদ হালদার হাসপাতালে মৃত্যুর পূর্বে ২৬ ফেব্রুয়ারি জ্যোতিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের (বাঘাজ্যোতিন) বেচে থাকার খবর পুলিশকে দিয়ে যায়।

এই ঘটনার কয়েকদিন পূর্বে রংপুরের পুলিশ সুপার রায়সাহেব নন্দকুমার বসুর কর্মকান্ড বিপ্লবীদের অসহ্য হওয়ায় তাকে সরিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত করে। ১৬ ফেব্রুয়ারি নন্দকুমার বসু সন্ধ্যার পর গৃহে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। সেখানে চারজন সশস্ত্রযুবক প্রবেশ করা মাত্র তাকে গুলিকরে উধাও হয়। পুলিশ সুপার নন্দকুমার বসু আহত অবস্থায় বেচে গেলেও তার ভৃত্য নিহত হয়। উত্তরবঙ্গ অনুশীলন সমিতি এই

ঘটনার সাথে জড়িত বলে পুলিশ সন্দেহ করে।[২২৭] ২৮ফেব্রুয়ারি কলকাতা কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটে পুলিশ ইনস্পেক্টর সুরেশ মুখার্জী ফেরারী বিপ্লবী চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরীকে চিনে ফেলে এবং তাঁকে ধরতে উদ্যত হয়। বিপ্লবী চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী তৎক্ষণাৎ গুলি করে পুলিশ ইনস্পেক্টর সুরেশ মুখার্জীকে হত্যা করে চারজন সঙ্গীসহ গাঢাকা দেন।[২২৮]

এদিকে বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে পুলিশকে খবর প্রদানের অপরাধে ০৩ মার্চ কুমিল্লা জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক শরৎকুমার বসু ২৫ আগস্ট চব্বিশ পরগণার মুরারীমোহন মিত্র বিপ্লবীদের গুলিতে নিহত এবং ১৯ অক্টোবর ময়মনসিংহের ডেপুটি পুলিশ-সুপারিন্টন্ডেন্ট যতীন্দ্রনাথ ঘোষ বিপ্লবীদের আক্রোশের শিকার হয়ে প্রাণ দেয়।[২২৯] ১৯ অক্টোবর রাত্রি সাড়ে দশটায় মসজিদ বাড়ি স্ট্রিটের ঘরে বসে কয়েকজন পুলিশ কর্মকর্তা বিপ্লবীদের সশস্ত্র কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ করছিলেন। তাদের পরামর্শ বৈঠক চলাকালীন আকস্মিকভাবে বিপ্লবীদলের কয়েকজন সেখানে উপস্থিত হয়ে পুলিশ কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে গুলি ছুড়ে চম্পট দেয়। এই ঘটনায় পুলিশের ইনস্পেক্টর সতীশ ব্যানার্জীর প্রাণরক্ষা পেলেও সাব-ইনস্পেক্টর উপেন্দ্র ব্যানার্জী আহত এবং অপর সাব-ইনস্পেক্টর গিরিন্দ্র ব্যানার্জী নিহত হয়।[২৩০] এছাড়াও ৩০ নভেম্বর কলকাতার সার্পেন্টাইন লেনে একজন পুলিশ কনস্টেবল ও অজ্ঞাত অপর একব্যক্তি এবং ১৯ ডিসেম্বর কিশোরগঞ্জ জেলার বাজিতপুরের গুপ্তসমিতির প্রাক্তন সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ পুলিশকে তথ্য দেয়ার অপরাধে বিপ্লবীদের গুলিতে প্রাণ হারায় মর্মে অভিযোগ উঠে।

১৯১১ খ্রিস্টাব্দে শেষপ্রাদে ব্রিটিশ সরকারের বাংলা বিভাগ রদ ঘোষণায় বাংলাদেশের জাতীয় গণআন্দোলন প্রায় বন্ধ হয়ে পড়ে।কংগ্রেস আপোষপন্থিদের বার্ষিক মজলিশে পরিণত হয়। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গেই ভারতে গণজাগরণ ঘটে। ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে জাপানের নিকট রুশিয়া পরাজিত হওয়ায় বিপ্লবীদের মনে ব্রিটিশকেও হারানোর আশা জাগে।যুদ্ধের প্রভাবে জনগণের দুঃখ-দুর্দশা বৃদ্ধির সাথে গণআন্দোলন মাথাচারা দেয়। এ অবস্থায় বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির মুসলিম সম্প্রদায় ব্রিটিশের সহিত সহযোগিতার নীতি পরিত্যাগ করে ক্রমশ ব্রিটিশ বিরোধী গণ আন্দোলনে শামিল হতে থাকে। জাতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে সুর মিলিয়ে মুসলমানগণও স্বায়ত্বশাসনের দাবি জানায়। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় আশু শাসনসংস্কার সমন্ধে মুসলমানদের দেয়া প্রস্তাবে দেশের মধ্যে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়।

এহেন গণআন্দোলন উপেক্ষা করে জাতীয় কংগ্রেস ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সাথে সহযোগিতার নীতি অবলম্বন করে।কিন্তু কংগ্রেসের নরমপন্থিদের আপসনীতি প্রত্যাখ্যান করে সংগ্রাম গড়ে উঠতে থাকায় জাতীয় আন্দোলন দ্বিবিধ ধারায় প্রবাহিত হয়ে ব্রিটিশ শাসনকে বিপন্ন করে তোলে। এ্যানী বেসান্তের নেতৃত্বে হোমরুল বা স্বায়ত্বশাসনের দাবি ভারতকে চঞ্চল করে তোলে; এবং অপরটি পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য বৈপ্লবিক প্রচেষ্টারূপে ভারতে ব্রিটিশ শাসনকে চরম আঘাত হানতে উদ্যত হয়। উপরন্ত ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে মোহনদাশ করমচাঁদ গান্ধী হোমরুল আন্দোলনে যোগদান করায় এ আন্দোলন আরও বেগবান হয়।

১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে লক্ষ্মৌ অধিবেশনে কংগ্রেসের সকল মতের নেতৃবৃন্দ একত্রিত হয়ে শাসনসংক্রান্ত একটি দাবির খসড়া তৈরি করলে মুসলিম লীগ তা অনুমোদন করে। অতঃপর কংগ্রেস ও মুসলিমলীগ একত্রে খসড়াটি ভারত সরকারের নিকট পেশ করে।কিন্তু সিংহভাগ নেতার মনোভাব ছিল যুদ্ধাবস্থায় ব্রিটিশ বিরোধিতা না করা। দাবি বিবেচনার মেকি আশ্বাস দিয়ে কংগ্রেসের আপোষপন্থি নেতাদের কাছে টেনে শাসকগণ বিপ্লবপন্থি নেতৃবৃন্দ ও বৈপ্লবিক সংগঠনের উপর পূর্ব অনুসৃত দমন নীতিই বহাল রাখে। এদিকে ভারতীয় সরকার ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যভাগ হতে ভারতরক্ষা আইনের প্রয়োগ শুরু হয়। এই আইনের কবলে বাংলা ও অন্যান্য প্রদেশের শতশত যুবক বিনাবিচারে আটক হয়। হোমরুল দাবি কারীরাও রেহাই পায়নি। রাজদ্রোহমূলক বক্তৃতার অপরাধে বালগঙ্গাধর তিলকের চল্লিশ হাজার টাকা জরিমানা হয়। দমন নীতির তীব্রতায় জাতীয় আন্দোলন স্থবির হয়ে পড়ে। এমনকি মুসলিম নেতা মাওলানা শওকত আলী ও মাওলানা মুহাম্মদ আলী বিনাবিচারে আটক হন। কিন্তু দমননীতি যতই বাড়তে থাকে ততোধিক আবেগ নিয়ে পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য বিপ্লবীরা ব্রিটিশ শাসনকে নাড়িয়ে দেয়।[২৩১]

১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের ০৯ সেপ্টেম্বর উড়িষ্যার বালেশ্বরে বুড়িবালাম নদীর তীরবর্তী চাষখন্ডের কাপ্তিপোদা গ্রামে বাঙালি বিপ্লবী জ্যোতিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের (বাঘাজ্যোতিন) নেতৃত্বে বিপ্লবীদের সাথে ব্রিটিশ পুলিশের সম্মুখ সংঘর্ষের ঘটনার মাধ্যমে বাধ্যতামূলক সম্মুখ সংঘর্ষ পর্বের সূচনা ঘটে। এহেন সংঘর্ষের ঘটনা তথা বৈপ্লবিক পরিকল্পনা ব্যর্থতায়[২৩২] পর্যবসিত হওয়া সত্ত্বেও সশস্ত্র বৈপ্লবিক কর্মকান্ড অব্যাহত থাকে। বড় রকমের কোন কর্মকান্ড না ঘটলেও সরকারকে সতর্ক ও ব্যস্ত থাকতে হয়।[২৩৩] মামলা আরম্ভ হওয়ায় অর্থের প্রয়োজনহেতু ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের ১৭ জানুয়ারি কলকাতা যুগান্তর সমিতির পুলিন মুখার্জী ও অতুল ঘোষের[২৩৪] নেতৃত্বে বিপ্লবীরা হাওড়ায় একটি ডাকাতি করে ছয় হাজার টাকা সংগ্রহ করে। ০৩ মার্চ বিপিন গাঙ্গুলীর দলের সদস্যগণ হাওড়া দফরপুর গ্রামে ডাকাতি করে দুইহাজার টাকা পায়। এই ডাকাতির সূত্রধরে পুলিশ বিপিনগাঙ্গুলীর দল ও বরিশালের যুগান্তর শাখার বহুসদস্যকে ভারতরক্ষা

আইনে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়।[২৩৫] ২৬ জুন যগান্তর সমিতির কয়েকজন যুবক সশস্ত্রহয়ে কলকাতার গোপীরায় লেনে গৌরচন্দ্র তালুকদার ও তার প্রতিবেশি হারানচন্দ্র পালের বাড়িতে ডাকাতির উদ্দেশ্যে হানা দিয়ে প্রায় ১১,৫০০ হাজার টাকা নিয়ে সরে পড়ে।এই ঘটনায় যুগান্তরনেতা পুলিন মুখোপাধ্যায় আটক হন। যুগান্তরের অন্যতম পরিচালক অতুল ঘোষকেও গ্রেফতারে পুলিশের প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।তবে এসময় থেকেই সরকারী দমননীতির আঘাতে যুগান্তর সমিতির চরম দুর্দিন আরম্ভ হয়।[২৩৬]

এসময় পশ্চিমবঙ্গে যুগান্তর সমিতির কার্যক্রম দুর্বল হয়ে পড়লেও পূর্ব বাংলায় অনুশীলন সমিতির কার্যক্রম অক্ষুন্ন থাকে;তাঁরা বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা অব্যাহত ভাবে চালিয়ে যায়।পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অর্থের দরকার পড়ায় পূর্ববাংলায় কয়েকটি বড় ডাকাতি সংঘটিত হয়।[২৩৭] ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের ০৬ মার্চ ত্রিপুরা জেলার মুরাদনগর থানার গান্ডেরা গ্রামে সন্ধ্যার পর অক্ষয়কুমার দাশের বাড়ি বিপ্লবীরা হাজির হয়ে ১৪,৫০০ টাকা নেয়। বিপ্লবীদের গুলিতে একজন আহত হয়। পুলিশ কয়েকজনকে আটক করে মামলা দায়ের করলে একযুবকের চারবৎসরের সশ্রম কারাদন্ড হয়।[২৩৮] ত্রিপুরা জেলার নবীনগর থানার নাথঘর গ্রামে ৩০ এপ্রিল রাত্রি ১১ টায় জগৎচন্দ্রের বাড়িতে বিপ্লবীরা চড়াও হয়ে ১৭,৫০০ টাকা হাতিয়ে নেয়। পুলিশ বহুলোককে গ্রেফতার করলে ০৬জন স্বীকারোক্তি দেয়।[২৩৯] ফরিদপুর জেলার ধানুকাঠি গ্রামে ০৯ জুন রাত্রি ১০ ঘটিকায় বিপ্লবীরা হাজির হয়ে ৪৩,০০০ টাকা এবং একটি দো'নালা বন্দুক পায়। এদিকে ০২ সেপ্টেম্বর রাত্রি প্রায় ১১ ঘটিকায় ত্রিপুরার চান্দিনা থানার শহরপদুয়া গ্রামে সাহাদের বাড়ি ডাকাতি করে বিপ্লবীরা ৩৩৭০ টাকা নিয়ে চম্পট দেয়।[২৪০] এই বৎসরের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ডাকাতি হয় ময়মনসিংহের বারবেটা থানার সাহিদেও গ্রামে। ১৭ অক্টোবর রাত্রিকালে বিপ্লবীরা মশার পিস্তল, বন্দুক প্রভৃতি আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে এক মুসলিম ব্যবসায়ী মুহাম্মদ মালিকের গৃহে উপস্থিত হয়ে ৮০,০০০ হাজার টাকা লুটে নেয়। ব্যবসায়ীটি গুলিতে নিহত হয়।[২৪১] উপরোক্ত বৈপ্লবিক কর্মকান্ড ছাড়াও ফরিদপুর ও ত্রিপুরা জেলায় আরও অসংখ্য ডাকাতি সংঘটিত হয়। ফরিদপুরের ঘটনায় কয়েকজন স্কুলছাত্র দীর্ঘ কারাদন্ডে দন্ডিত হয়। এসময় উত্তর বঙ্গেও কয়েকটি ডাকাতির খবর পাওয়া যায়।

এদিকে পুলিশী পদক্ষেপে অতিষ্ঠ হয়ে বিপ্লবীদের প্রতি আক্রমণও অব্যাহত থাকে। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের ১৬ জানুয়ারি কলকাতা মেডিকেল কলেজের সম্মুখে গুলিবিদ্ধ হয়ে সাব-ইনস্পেক্টর মধুসূদন ভট্টাচার্য নিহত হয়। এঘটনায় ০৫ জন গ্রেফতার হয়।একজনের নিকট পিস্তল পাওয়া যায়। সিডিশন কমিটির মতে সে বরিশাল দলের নেতা।[২৪২] ১৯ জানুয়ারি ময়মনসিংহ জেলার বাজিতপুর-শোভারামপুর সদর রাস্তার ওপর গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে বিপ্লবীরা শশী চক্রবর্তীকে গুলি করে এবং একই অভিযোগে ২৮

জানুয়ারি মালদা জেলাস্কুলের প্রধান শিক্ষক নবীনচন্দ্র বসু[২৪৩] কে বিপ্লবীরা ছোড়ার আঘাতে পরপারে পাঠায়।[২৪৪] ৩০ জুন পুলিশের ডেপুটি সুপারিনটেন্ডেন্ট বসন্ত চট্টোপাধ্যায়কে ভবানীপুর প্রেসিডেন্সি হাসপাতালের সন্নিকটে এক জনাকীর্ণ স্থানে প্রকাশ্য দিবালোকে বিপ্লবীরা গুলি ছুড়ে পালিয়ে যায়। এই ঘটনায় আর্দালী ও হেড কনেস্টেবল সহ বসন্ত চট্টোপাধ্যায় নিহত হয়। বৈপ্লবিক এই কর্মটি ঢাকা অনুশীলন সমিতির কাজ বলে জানা যায়।[২৪৫] পুলিশের ডেপুটি সুপারিনটেন্ডেন্ট বসন্ত চট্টোপাধ্যায় হত্যাকান্ডের ঘটনা বৈপ্লবিক কর্মপ্রচেষ্টার একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে বিবেচিত হয়। এ সম্পর্কে স্টেট্সম্যান পত্রিকার ০১ জুলাইর মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য: The most audacious crime which the Bengal anarchists have yet perpetrated.'[২৪৬] অর্থাৎ বাংলার বিপ্লবীরা এপর্যন্ত যতোগুলো দুঃসাহসিক কাজ করেছে, এই ঘটনা সে সকল ঘটনাকে ছাপিয়ে গেছে। পত্রিকাটি আরও উল্লেখ করে, It is a special triumph for the anarchists and a special source of humiliation for the Government.[২৪৭] অর্থাৎ এই ঘটনাটি বিপ্লবীদের পক্ষে একটি বিশেষ জয় এবং সরকারের পক্ষে ততটাই গ্লানিকর বিষয় বা পরাজয় বিবেচিত হচ্ছে।

উপরোক্ত মন্তব্যের যথার্থতা প্রমাণিত হয় সিডিশন কমিটির রিপোর্টে: By the crime the revolutionaries were brought within sight of the realisation of one of their prelimenary objects,namely,the demoralisation of the police.[২৪৮] অর্থাৎ পুলিশকে আতঙ্কিত করা বিপ্লবীদের অন্যতম লক্ষ্য ছিল। এবং তাঁরা তা করতে সক্ষম হয়েছে। এই ঘটনার পর সরকার বিচলিতবোধ করতে থাকে। এর আগে অনেক পুলিশ মরেছে,কিন্তু বসন্তের উপর নির্ভরতা কতটা ছিল সেটি বোঝা যায়; সরকার যখন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সিদ্ধান্ত করে: The necessity of extraordinary measures could now no longer be denied.[২৪৯] তবে বসন্ত হত্যাকান্ডের অভিযোগে বহু অনুসন্ধান করেও কাউকে গ্রেফতারে সক্ষম না হলেও এই সূত্রধরে পুলিশ বহু বিপ্লবীকে গ্রেফতার করে। ঢাকা অনুশীলন, কলকাতা শাখাসহ নিশ্চিহ্ন হবার উপক্রম হয়।[২৫০]

এদিকে কলকাতা যুগান্তর সমিতির শেষ পরিচালক অতুল ঘোষের এক আত্মীয় বরাহ নগরের উপেন ঘোষ ওরফে দেবব্রত ব্রহ্মচারী বিপ্লবী দলে যোগদান করে। কিন্তু বিপ্লবী দলে যোগদান পরবর্তী তার কার্যক্রমে তাকে পুলিশের গুপ্তচর হিসেবে সন্দেহ হয়। পরবর্তীতে ১০ আগস্ট তার মৃতদেহ বান্ডেল স্টেশনে ট্রেনের এক কামরায় বাক্সবন্দি অবস্থায় পাওয়া যায়। এই ঘটনায় পুলিশ ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বরে তিনজনকে আসামীকরে মামলা দিলেও প্রমাণাভাবে সবাই মুক্তিলাভ করে। এদিকে বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত গোয়েন্দা তৎপরতার শাস্তি হিসেবে ঢাকা সি.আই.ডি'র দুই পুলিশ কনস্টেবল

যথাক্রমে সুরেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায় এবং রোহিনীকুমার মুখোপাধ্যায় ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জুন বৈপ্লবিক গুলিতে প্রাণ হারায় বলে উল্লেখ আছে।[২৫১]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পরিচালনার অজুহাতে নয়া আইন প্রবর্তনের মাধ্যমে সরকারের নেয়া পদক্ষেপের লক্ষ্য চলমান বৈপ্লবিক আন্দোলন বন্ধ করা তা উপলব্ধ হতে বেশি দেরি হয়নি। মামলা-মোকদ্দমায় জড়িয়ে সাহসী যুবকদের অপসৃত করার নীতি অনুসৃত হচ্ছিল। তার সঙ্গে ভারতরক্ষা আইন প্রভৃতি জুরে দিয়ে বিনা বিচারে বন্দি করায় হাজার হাজার যুবক কারান্তরালে থাকতে বাধ্য হয়। বৈপ্লবিক কর্মকান্ডও হ্রাস পেতে থাকে। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে মাত্র ৭টি ডাকাতির মাধ্যমে ১,২৫,৩৪২ টাকা লুণ্ঠিত হয়। ২৩ জানুয়ারি কলকাতার চিৎপুরের হরনাথশশীভূষণ,কেদারনাথ বিশ্বাসের সরকার মশায়, সুরেন ঘোষ ও হরিপদ টাকাসহ কাটাপুকুর পৌঁছলেই ছিনতাইয়ের শিকার হয়। ২৭ ফেব্রুয়ারি ঢাকার নরসিংদী থানার পাইকারচরে হরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর বাড়িতে এবং ১৫ এপ্রিল রাজশাহী জেলার জামনগর গ্রামে রামরাঘব ও গোবিন্দচন্দ্র বসুর বাড়িতে চড়াও হয়। ০৭ মে কলকাতার আর্মেনিয়ান স্ট্রিটের মগনলাল ও ত্রিকমজীলালের অলংকারের দোকানের টাকা নিয়ে উধাও হয়। দোকানে দুইজন নিহত এবং এক বিপ্লবী সুরেন্দ্র কিশারী মারাত্মক আহত হলে ট্যাক্সি করে রওয়ানা হয়। কিন্তু ধরাপড়ার আশঙ্কায় নির্জন স্থানে বিপ্লবীরা গুলিকরে তার মৃত্যু নিশ্চিত করে। ২৫ জুন রাজশাহীর গোবিন্দপুর থানার রাখালব্রুজ গ্রামে চড়াসুদে টাকা লগ্নিকারী শরিয়তুল্লাহ সরকারকে শায়েস্তা করতে যায়; এবং সেখান থেকে টাকা নিয়ে সটকে পড়ে। পরবর্তীতে দু'জন বিপ্লবী লুণ্ঠিত সকল অলংকার ও একটি মশার পিস্তলসহ ঢাকায় ধরাপড়ে। ২৭ অক্টোবর ঢাকার আবদুল্লাহপুর ইশ্বর মন্ডলের বাড়ি এবং ০৩ নভেম্বর ত্রিপুরা জেলার মাঝিয়ারা গ্রামের রামজী, রাইচরণ ও রামগতির বাড়িতে ডাকাতি হয়।[২৫২]

এদিকে বিপ্লবী দলের সদস্য জ্ঞান ভৌমিক পুলিশকে বিপ্লবীদের সংবাদ জানিয়ে দিতো বলে তাকে সন্দেহ করা হতো। অধিকন্ত জ্ঞান ভৌমিক যে পুলিশের গুপ্তচর জেলে আটক বিপ্লবী অমৃত সরকারের পাঠানো খবরে নিশ্চিত হয়ে বিপ্লবীরা ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের ৫ জানুয়ারি গরাণহাটায় জ্ঞান ভৌমিককে হত্যাচেষ্টা করে কিন্তু সে প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।[২৫৩] ত্রিপুরার রেবতীচরণ নাগ ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাস থেকে নিরুদ্দেশ ছিল। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসের শেষ দিকে সিরাজগঞ্জে পার্টির নিয়ম-শৃঙ্খলা ভঙ্গের অপরাধে পার্টির সিদ্ধান্তে বিপ্লবীরা তাকে হত্যা করে। এদিকে ২৩ জুলাই বিপ্লবীরা ঢাকা শহরে এক অত্যাচারী পুলিশ কর্মকর্তাকে হত্যাচেষ্টা করে ব্যর্থ হয়।[২৫৪]

১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের প্রথমদিকে সরকারি দমননীতির প্রচন্ড আঘাতে ঢাকা অনুশীলন সমিতির অবস্থা সঙ্গীন হয়ে পড়ে। ঢাকায় অবস্থান করে সংগঠন পরিচালনা করা অসম্ভব হয়ে ওঠায় পুলিশী নাগালের বাইরে আসামের গৌহাটি যাওয়া সাব্যাস্ত করে। সমিতির তৎকালীন পরিচালক সতীশ পাকড়াশী (১৮৯১-১৯৭৩), নলিনী বাগচী (১৮৯৬-১৯০১৮) প্রমুখ ফেরারী বিপ্লবী ও নেতৃবৃন্দ সেখানে একত্রিত হয়।[২৫৫] কিন্তু ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের ০৭ জানুয়ারি সেখানেও পুলিশ পৌঁছে তাদের ঘিরে ফেলায় বিপ্লবীরা কৌশলে পাহাড়ে আশ্রয় নেয়। ডিসেম্বর মাসের শেষ দিকে সেখানে খন্ডযুদ্ধের পর মণীন্দ্র রায়, প্রভাস লাহিড়ী ও নলিনীকান্ত ঘোষ জখম অবস্থায় পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। তন্মধ্যে সতীশ পাকড়াশী ও নলিনী বাগচীসহ অন্যেরা সরে পরে।[২৫৬]

১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে কৃষ্ণ সাহার স্বীকারোক্তিতে পলাতক বিপ্লবী নিকুঞ্জ পাল ও গোবিন্দ কর পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার আটঘরিয়া থানার তেনিজনা গ্রামে অনুশীলন সমিতির আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থান করছেন; এই খবর পুলিশ জেনে যায়। গভীররাতে পুলিশ তাঁদের ধরতে গেলে উভয়পক্ষের আগ্নেয়াস্ত্র গর্জে উঠে। দু'পক্ষেই গুরুতর রূপে আহত হয়। বিচারে বিপ্লবী নিকুঞ্জপালের বারো বৎসর ও গোবিন্দকরের সাত বৎসরের কারাদন্ড হয়।[২৫৭]

সতীশ পাকড়াশী দীর্ঘ আত্মগোপন থাকাবস্থায় ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে গ্রেফতার হওয়ায় নলিনী বাগচী অতিসংগোপনে কলকাতা থেকে ঢাকায় যায়। তারিণী মজুমদারের সাথে কলতা বাজারের এক বাড়িতে চুপিসারে আশ্রয়নেয়। পুলিশ কোন প্রকারে এই সংবাদ পেয়ে রাত্রিতে বাড়ি ঘিরে ফেলে। ১৫ জুন উভয় পক্ষে গোলাগুলি শুরুহলে তারিণী মজুমদার নিহত হয়। পুলিশ পক্ষেও কয়েকজন গুরুতর আহত হয়। পলায়নের সুযোগ না থাকায় নলিনী বাগচী আপ্রাণ যুদ্ধকরা স্থির করেন। তিনি ঘরে ঢুকে জানালা দিয়ে গুলি ছুড়লে গোয়েন্দা অফিসার বসন্ত মুখোপাধ্যায় ধরাশায়ী হয়। নলিনী বাগচী নিজেও গুলিবিদ্ধ হলে তাঁকে পুলিশ অর্ধচেতন অবস্থায় হাসপাতালে নেয়।[২৫৮] গোয়েন্দাদের প্রশ্নের উত্তরে নলিনীর বাগচীর এক উত্তর 'Let me die peacefully.'[২৫৯] অর্থাৎ আমাকে শান্তিতে মরতে দাও। কয়েক মুহূর্ত! বিপ্লবী নলিনী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে।

প্রথম হতেই ভারতের মধ্যশ্রেণির বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা, বিপ্লবীদের অতুলনীয় সাহস, বুদ্ধি ও আত্মত্যাগের জন্য পৃথিবীর সকল দেশের মানুষের শ্রদ্ধা লাভ করে। ভারতীয় বিপ্লবীদের কর্মপ্রচেষ্টায় ব্রিটিশ বিরোধী জার্মানদের দৃষ্টি আকৃষ্টের বিষয়টি জার্মান গ্রন্থকার বার্ণহার্ডির লেখা জার্মান ও পরবর্তী যুদ্ধ নামক গ্রন্থে প্রকাশ পায়।[২৬০] মুলত বিশ শতকের প্রথমদশক থেকেই বিপ্লবী চেতনা সম্পন্ন কিছু ভারতীয় ইউরোপ,

আমেরিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে যেয়ে সেখানে বসবাসরত ভারতীয়দের মধ্যে বিপ্লবের পথে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের আগ্রহকে জাগিয়ে তোলার প্রয়াস পায়। ভারতে কর্মরত বিপ্লবী নেতাদের সাথে যোগাযোগ রেখে প্রচারপত্র,বোমা-বন্দুকসহ নানা অস্ত্রাদি গোপনে পাঠায়।একর্মে অগ্রণী ছিলেন ইন্ডিয়া হাউসের প্রতিষ্ঠাতা শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা (১৮৫৭-১৯৩০)।[২৬১] এখান থেকেই আয়ারল্যান্ডের বিপ্লবী সংস্থা সিনফিনের[২৬২] সাথে প্রবাসী বিপ্লবীদের যোগাযোগ হয়।[২৬৩] প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৯) শুরু হলে মাদামকামা[২৬৪] প্যারিসে অন্তরীণ হন এবং দলের নেতা শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা ব্রিটিশের নজর এড়িয়ে জেনেভায় চলে যায়। এসময় ইংরেজের শত্রু তুরস্ক ও জার্মানির সাহায্য পেতে বিপ্লবীরা আন্তরিকভাবে প্রচেষ্টা চালায়। ফরাসি সরকার ব্রিটিশের মিত্র হওয়ায় বিপ্লবীকেন্দ্র প্যারিস থেকে জার্মানির বার্লিনে সরিয়ে নেয়। বিপ্লবী বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, অধ্যাপক মাওলানা বরকতুল্লাহ, চম্পকরমণ পিল্লাই প্রমুখ সহযোগে বার্লিন কমিটি গঠিত হয়। প্রায় একইসময়ে আমেরিকায় হরদয়ালের উদ্যোগে বিপ্লবী সংস্থা গদর প্রতিষ্ঠা পায়। ভারতের বিপ্লবপ্রচেষ্টার ব্যাপারে জার্মানির সহায়তা সম্পর্কে আলোচনা চালায়। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি ব্রিটিশ বিরোধী বৈপ্লবিক প্রচারের জন্য মার্কিন সরকারের বিরাগ ভাজন হয়ে জার্মানিতে হাজির হন। বার্লিন কমিটি ও গদর পার্টির সংহত শক্তি ব্রিটিশকে বেকায়দায় ফেলে ভারতের মুক্তির জন্য নব অভ্যুত্থান আয়োজনে প্রচেষ্টা চালায়। গদর পার্টি বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর সাথে যোগায়োগ রেখে কাজে নেমে পড়ে।[২৬৫]

১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের ০৪ এপ্রিল হংকং হতে কোমাগাটামারু জাহাজে ৩৭২ জন পাঞ্জাবি যাত্রী ক্যানাডা যায়। অধিকাংশ যাত্রীদেরই ছিলো শিখ।[২৬৬] কিন্তু ক্যানাডায় অবতরণের অনুমতি মেলেনি এবং এ ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকারের কোনো সহায়তাও পাওয়া যায়নি। বিক্ষুব্ধ চিত্তে ভারতে ফিরে আসার পথে জাহাজে গদর পার্টির তৎপরতায় যাত্রীরা ইংরেজের বিরুদ্ধে আরও ক্ষিপ্তহয়ে উঠে। বিদ্রোহাত্মক পুস্তিকা বিতরণ করে ভারতে ফিরে ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আরম্ভকরার জন্য অনুপ্রাণিত করে। শিখরাও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে ফিরে আসে।[২৬৭] কোমাগাটামারু ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের ২৯ সেপ্টেম্বর কলকাতার দক্ষিণে বজবজ জেটিতে পৌঁছে। বিদ্রোহ উদ্দীপনায় ভরপুর শিখ যাত্রীরা জানতে পেরে যায়, তাদের বন্দি করে পাঞ্জাবে পাঠিয়ে দেয়া হবে। ট্রেন প্রস্তুত।শিখরা পদব্রজে হেঁটে অগ্রসর হতেই কলকাতার পুলিশ কমিশনার *স্যার ফেডারিক* (Sir Frederick Loch Halliday) এবং ২৪পরগণার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট *ডোনাল্ড* (Donald) পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী নিয়ে তাদের বাধা দান করলেই দাঙ্গা আরম্ভ হয়ে যায়। ১৮ জন শিখ নিহত এবং অধিক সংখ্যক আহত হয়। অপরদিকে পুলিশ কমিশনার স্যার ফ্রেডারিক ও হামফ্রি আহত, লোমেক্স নিহত হয়। এই দলের ১৭ জন পাঞ্জাবি মুসলামান এবং ৪৩ জন শিখকে জোর করে ট্রেনে তুলে দেয়া হয়। কিন্তু ২২৭ জন যাত্রীর সবাই পালিয়ে যায়।অনেকে পরে ধরা পড়ে। তন্মধ্যে ৩১

জনকে অন্তরীণ করা হয়।গুরদিৎ সিং ও অন্যান্য ২৮ জন শিখকে শেষপর্যন্ত পুলিশ ধরতে পারেনি।[২৬৮] এসময় বিদেশাগত শিখদের মরিয়া ও কিছুটা বেপরোয়া আচরণে পাঞ্জাবের শানকবর্গ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে। প্রকৃতপক্ষে বিদ্রোহের মন্ত্রে অভিষিক্ত থাকায় আইন-কানুন মেনে চলার মতো মন-মানসিকতা তাদের একেবারেই ছিলো না। ভারত সরকারের ধারণা: The majority of these shikhs had returned expecting to find India in a State of acute unrest and meaning to convert this unrest into revolution.[২৬৯] অর্থাৎ বিদেশ প্রত্যাগত অধিকাংশ শিখের মনোজগৎ এমন ছিলো যেন ভারতে বিদ্রোহ-বহ্নি'র ক্ষেত্র প্রস্তুত; প্রজ্জ্বলনের অপেক্ষামাত্র।

পরবর্তীতে ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের ২৯ অক্টোবর *টোসামারু* (Tosamaru) নামক একটি জাপানি জাহাজ আমেরিকা, ম্যানিলা, চীন, সাংহাই ও হংকং থেকে ১০৭ জন ভারতীয় যাত্রী, যাদের অধিকাংশই শিখ নিয়ে কলকাতায় আসে। ভারত সরকার যাত্রীদের মধ্য হতে বিপ্লবী সন্দেহে ১০০ জনকে গ্রেফতার করে। তথাপি বিদেশে অবস্থিত বিপ্লবীরা নানাভাবে প্রভাবান্বিত করে বহু ভারতীয়কে জাহাজে তুলে দেশে পাঠাতে থাকে। এই বিপ্লবীদের মধ্যে অনেকেই আমেরিকা বা বিদেশের নানাস্থানে শিখ বাসিন্দা ও শিখ সৈন্যদের মধ্যে স্বাধীনতার বাণী প্রচার করার সংকল্প নিয়ে একদা দেশ ত্যাগ করেছিলেন।[২৭০]

একই সময়ে অর্থাৎ ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে *এসএম সালামীর* (SM Salamir) নামক অপর একটি জাহাজে শিখ যাত্রীদের সঙ্গে[২৭১] বার্লিন কমিটির সত্যেন্দ্রনাথ সেন ও মারাঠী যুবক গদর পার্টির বিষ্ণুগণেশ পিংলে জার্মানির অস্ত্র সাহায্যের খবর নিয়ে কলকাতায় উপস্থিত হয়। অতঃপর বিষ্ণুগণেশ পিংলে উত্তর প্রদেশের কাশীতে রাসবিহারী বসুর সাথে সাক্ষাৎ করে অস্ত্রপূর্ণ জাহাজ আসার খবর দেয়। রাসবিহারী বসুর সাথে আলোচনা করে বিদ্রোহের নানা তথ্য জেনে পশ্চিমভারতে কাজে নেমে পড়ে। এবং সত্যেন্দ্রনাথ সেন বাংলার বিপ্লবীদের সাথে সংযোগ স্থাপনের প্রয়াস পায়। সত্যেন্দ্রনাথ সেন বিপ্লবী নেতা জ্যোতিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের (বাঘা জ্যোতিন) সাথে সাক্ষাৎ করে পূর্ব এশিয়ায় ঘাটি স্থাপন এবং ভারতীয়দের বিপ্লব প্রচেষ্টায় জার্মান সাহায্য লাভের সংবাদ জ্ঞাপন করে।[২৭২] অর্থাৎ বিদেশে নির্বাসিত ভারতীয় বিপ্লবীদের চেষ্টায় জার্মান সরকার ভারতে বিপ্লব ঘটানোর কাজে অর্থ ও অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করতে রাজী হয়। ভারতের বিপ্লবীরা রাসবিহারী বসু ও জ্যোতিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের (বাঘাজ্যোতিন) নেতৃত্বে একটি নির্দিষ্ট তারিখে ভারতব্যাপী একটি সশস্ত্র বিদ্রোহ সংগঠিত করার আয়োজনে তৎপরতা চালায়। সারা উত্তর ভারতে বিশেষ করে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর মধ্যে রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে প্রচার ও সাংগঠনিক কাজ করে যাচ্ছিলেন; বর্হিবাংলার বাঙালি-অবাঙালি বিপ্লবীরা। জ্যোতিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের (বাঘাজ্যোতিন) নেতৃতে বাংলার বিপ্লবীরা সমস্তঘাঁটি আগলে আছেন জার্মান অস্ত্রবাহী জাহাজের

অপেক্ষায়। অস্ত্র পাওয়া মাত্র সমগ্র ভারতবর্ষে তা বিলি হয়ে যাবে; একই লগ্নে সশস্ত্র বিদ্রোহ প্রতীক্ষায়।[২৭৩]

উত্তর প্রদেশের কাশীতে বাংলা, মহারাষ্ট্র, রাজপুতানা, পাঞ্জাব ও উত্তর ভারতের বিপ্লবী নেতারা একত্রে মিলিত হয়ে ভারতব্যাপী সৈন্যবাহিনী একসাথে ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি অভ্যুত্থান স্থির হয়। অনুশীলন দল পাঞ্জাবের দলের সঙ্গে রাসবিহারী বসুর মাধ্যমে বিদ্রোহের আয়োজনে শরীক হয়। বাংলার নগেন্দ্র দত্ত ও অনুকূল চক্রবর্তী ও বেনারসের শচীন্দ্র স্যানাল, রাসবিহারী বসুর সঙ্গে চন্দন নগরে রাসবিহারী বসুর অধিনায়কত্বে সশস্ত্র অভ্যুত্থান সংগঠনের সিদ্ধান্ত হয়। উত্তর ভারতের ভার থাকে তাঁর হাতে। নগেন্দ্র দত্ত ও অনুকূল চক্রবর্তীর ওপর বাংলা, বিহার ও আসামের দায়িত্ব বর্তায়। চন্দন নগরের মতিলাল রায় পূর্ব ও পশ্চিম ভারতে সমন্বয়ের দায়িত্ব পান।[২৭৪]

লাহোর কেন্দ্র হতেই বিদ্রোহ ঘোষণার সঙ্কেত সকল স্থানে জানিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা হয়। বিভিন্ন সেনা শিবিরে সৈন্যদের বিদ্রোহের অনুকূলে আনার পরিকল্পনা হয়। বহুসৈন্য বিদেশে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়ে দেয়ায় ভারতে মুষ্টিমেয় ইংরেজ সৈন্য এবং দেশীয় সৈন্য সংখ্যাও হ্রাস পায়। তদুপরি অফিসারদের অসদ্ব্যবহারের জন্য তারা খুব অসন্তুষ্ট ছিল। সুতরাং বিভিন্ন সেনা ব্যারাকে গিয়ে সহজেই সৈন্যদের বিদ্রোহে অনুপ্রাণিত করা সম্ভব হয়। অস্ত্রসংগ্রহ,সরকারি ট্রেজারি লুট ও বোমা তৈরির ব্যবস্থা;রেল লাইন ও তারকাটা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থির হয়। রাসবিহারী বসু ও বিষ্ণুগণেশ পিংলে বাংলা ও পাঞ্জাবে বোমা তৈরির ব্যবস্থা নেয়। পাঞ্জাবের ও উত্তর ভারতের সকল সেনানিবাসে বৈপ্লবিক কর্মীরা সৈন্যদের সঙ্গে সংগোপনে যোগায়োগ করে অভুত্থানের প্রস্তুতি চালাতে থাকে।পাঞ্জাবের গ্রামাঞ্চলে, সেনানিবাসে ও গ্রামে গ্রামে প্রচারপত্র বিলি করা হয়। *স্বাধীন ভারতীয় প্রজাতন্ত্র* (Independent Republic of India) ঘোষণা এবং স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকা তৈরি করে ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণাপত্র রচিত হয়।[২৭৫]

অনুশীলনের প্রবোধবিশ্বাস এইঅভুত্থান প্রসঙ্গে বলেন,ঢাকা হতে লাহোর লোক মারফৎ যোগাযোগের ব্যবস্থা ছিল। লাহোর হতে কাশী, কাশী হতে চন্দননগর, চন্দননগর হতে কলকাতা, কলকাতা হতে ঢাকা, ঢাকা হতে পূর্ববঙ্গের ও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন কেন্দ্রে, তেমনি ঢাকা হতে লাহোরে যোগাযোগ ও আনাগোনা চলছিল। সবাই কর্মতৎপর; গোপন কর্মচাঞ্চল্য ও লক্ষ্যণীয়।কর্মচাঞ্চল্যে বিষ্ণুগণেশ পিংলে এসময় দু'বার কলকাতায় আসেন বলে তিনি উল্লেখ করেন।[২৭৬]

ঢাকার বিপ্লবীরা পাঞ্জাবের বিপ্লবীদের সাহায্যে ঢাকায় অবস্থিত সৈন্যদের সাথে যোগাযোগ স্থাপনে সমর্থ হয়। নেতৃস্থানীয় দু'জন শিখ সৈনিক বিদ্রোহের ব্যাপারে ঔৎসুক্য দেখায়। ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও ফরিদপুর জেলার বিপ্লবীরা গোপনে দ্রুত সামরিক শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করেন। জেলায় জেলায় বন্দুক, রিভলভার চুরি হতে থাকে।ঠিক এসময় রডা কোম্পানির ৫০ খানা মশার পিস্তল চুরি[২৭৭] হয়। এসময় কলকাতায় জ্যোতিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের (বাঘাজ্যোতিন) পরামর্শে ও নেতৃত্বে ব্যাপকভাবে আগ্নেয়াস্ত্র ও অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে রামচন্দ্র মজুমদার ও অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় শ্রমজীবি সমবায় নামে একটি কাপড়ের দোকান এবং জ্যোতিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের (বাঘাজ্যোতিন) অপর সহকর্মী বিপ্লবী হরিকুমার চক্রবর্তীর পরিচালনায় হ্যারি এন্ড সন্স নামে বিবিধপণ্য সরবরাহের প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা হয়। বালেশ্বরের ইউনিভার্সেল এম্পোরিয়াম ছিল হ্যারি এন্ড সন্সের শাখা।[২৭৮]

বিদ্রোহ আয়োজন প্রায় সমাগত; সেই মুহূর্তে কৃপাল সিং নামক এক সৈনিক ২১ ফেব্রুয়ারি'র সংবাদটি পুলিশকে জানিয়ে দেয়। অভুত্থানের সংবাদ পুলিশ পেয়েছে; এরূপ সন্দেহ হওয়ায় তারিখ দুইদিন এগিয়ে ১৯ ফেব্রুয়ারি করা হয়। কিন্তু কঠোর গোপনীয়তা সত্ত্বেও পরিবর্তিত তারিখটিও সে পুলিশকে জানাতে সক্ষম হয়।ওইদিনই পাঞ্জাব সরকার সৈন্যদের স্থানান্তর করা শুরু করে।পাঞ্জাবের সর্বত্র দোষী-নির্দোষ-নির্বিশেষে ব্যাপক ধরপাকর আরম্ভ হয়।[২৭৯] তৎসত্ত্বেও ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে সিঙ্গাপুরে শিখ সৈন্যবাহিনী বিদ্রোহ ঘোষণা করে একসপ্তাহ সিঙ্গাপুর শহর অধিকারে রাখে। ব্রহ্মদেশে অবস্থিত বালুচ, ঢাকায় পাঞ্জাবি সৈন্যবাহিনী এবং বেনারস ক্যান্টনমেন্ট, দিল্লী প্রভৃতি স্থানে অবস্থানকারী দেশীয় সৈন্যদল অভ্যুত্থান আয়োজনে শামিল হয়।[২৮০]

রাসবিহারী বসু ও বিষ্ণুগণেশ পিংলে তখনো লাহোরে বিপ্লব কার্যে ব্যাপৃত। লাহোর হতে কাশী ফিরবার পথে ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের ২৩মার্চ মীরাট কেল্লার সৈন্যদের মাঝে বিপ্লবের বাণী প্রচার রত অবস্থায় নবাব খান নামক আরেক বিশ্বাসঘাতক সৈনিক একবাক্স মারাত্মক বোমাসহ বিষ্ণুগণেশ পিংলেকে ধরিয়ে দেয়।[২৮১] এ বিদ্রোহ পরিকল্পনার সময়ে কাবুলে জার্মান সহায়তায় মহেন্দ্রপ্রতাপ সিং এর নেতৃত্বে একটি বিপ্লবী সরকার গঠনের কথা জানা যায়।[২৮২]

বিশ্বাস ঘাতকতার ফলে সবাই হতাশ হলেন। প্রত্যাশিত বিপ্লব ব্যাপক ধরপাকড় ও তল্লাশির ফলে সব আয়োজন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। পাঞ্জাবসহ সারাদেশে গ্রেফতার শুরু হয়। পুলিশ হন্যে হয়ে রাসবিহারী বসুর খোঁজে নেমে পড়ে। জরুরি ভিত্তিতে তিনি বিদেশে যেয়ে অস্ত্রশস্ত্র পাঠানোর ব্যবস্থা করতে পারলে এখনো বিদ্রোহ সম্ভব করা যায়। উত্তর ভারতের সৈন্যশ্রেণির উপর কঠোর নিগ্রহের ফলে

আপাতত সৈন্যদের সাহায্য পাওয়া সম্ভবপর নয়। এরূপ চিন্তাভাবনার মধ্যে তাঁর বিদেশ যাওয়াই স্থির হয়। পুলিশ তাঁকে ধরিয়ে দেবার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করে। কিন্তু তিনি তাঁর আরদ্ধ কর্ম সার্থকভাবে সমাপন করার সংকল্পে পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়ে ১০১৫ খ্রিস্টাব্দের ১২ মে পি.এন.ঠাকুর ছদ্মনামে জাপানের উদ্দেশ্যে *শানুকিমারু* (SANUKI MARU) নামক জাপানি জাহাজ যোগে দেশ ত্যাগ করেন।[২৮৩] জাপানে পৌঁছে সাংহাই থেকে ভারতে অস্ত্র প্রেরণের উদ্যোগ নেন। কিন্তু ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।[২৮৪] ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের ২৭ এপ্রিল লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের হয় এবং ১৩ সেপ্টেম্বর রায় ঘোষিত হয়। অন্যান্যরা বিভিন্ন মেয়াদে দন্ডিত হলেও বিষ্ণুগণেশ পিংলে, হরনাম সিং, কর্তার সিং, বক্সিস সিং, সুরান সিং, সুরান সিং (দ্বিতীয়) এবং জগৎ সিং এর ফাঁসির আদেশ হয়। এবং ১৭ নভেম্বর লাহোর সেন্ট্রাল জেলে এই পঞ্চবীর ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলে দেশপ্রেমের একঅপূর্ব পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে।[২৮৫] তাঁদের আত্মদান হতাশার মধ্যেও ভারতকে বৈপ্লবিক প্রেরণায় উদ্দীপ্ত করে।

বৈদেশিক বিপ্লবীদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন ও অস্ত্রসংগ্রহের দায়িত্ব জ্যোতিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের (বাঘাজ্যোতিন) ওপর পড়ে। গদর পার্টির ব্যাঙ্কক কার্যালয়ের সাথে বাটাভিয়া কেন্দ্রের মাধ্যমে বাংলার বিপ্লবীদের সমন্বয় সাব্যস্ত হয়। ইতোমধ্যে ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে ৩০ হাজার রাইফেল, ৬০ লক্ষ কার্তুজ এবং দুই লক্ষ টাকা নিয়ে জাহাজ *এস.এস.ম্যাভারিক* (SM MAVERICK) ক্যালিফোর্নিয়া থেকে যাত্রা শুরুকরে। জ্যোতিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘাজ্যোতিন), ডা. যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, নরেন্দ্র ভট্টাচার্য, ভোলানাথ চ্যাটার্জি, অতুল ঘোষ, সতীশ চক্রবর্তী জাহাজ থেকে অস্ত্রগ্রহণ কর্মে ব্যাপৃত হয়। হাতিয়া দ্বীপে, কলকাতায় ও বালেশ্বরে অস্ত্র নামবে স্থির হয়। জুনের শেষ দিকেও অস্ত্র সম্পর্কে কিছুই জানা গেল না। ইতোমধ্যে ব্যাঙ্ককের উকিল কুমুদনাথের মাধ্যমে জার্মান অস্ত্র গ্রহণের বিষয়টি সরকার জেনে যায় অনুমিত হয়। এবং সঙ্গে সঙ্গে সতর্কতামুলক পদক্ষেপ হিসেবে কলকাতার হ্যারি এন্ড সন্স তল্লাশ নেয়। সূত্র ধরে ০৪ সেপ্টেম্বর কলকাতার পুলিশ বালেশ্বরে ইউনিভার্সাল এম্পেরিয়াম তল্লাশ করে কতিপয় বিপ্লবী নিকটেই আছে সন্দেহ করে অনুসন্ধানকার্য জোরদার করে। ০৪ সেপ্টেম্বর পুলিশ কাপ্তিপোদায় জ্যোতিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের (বাঘাজ্যোতিন) গোপন আবাসের তল্লাশ চালায়। সুন্দরবনের ম্যাপ, পেনাংয়ের একটি সংবাদপত্রের কার্টিংয়ে ম্যাভারিক জাহাজের সংবাদ ছিল।বিপ্লবীরা পূর্বাহ্নেই পুলিশের খবর পেয়ে সরে পড়ে। জ্যোতিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘাজ্যোতিন) ভবিষ্যতে সফল বিপ্লব ঘটানোর জন্য পালিয়ে আত্মরক্ষা করতে পারতেন। কিন্তু তিনি দেখলেন বিপ্লব আপাতত ব্যর্থ হয়েছে। জাতীর সম্মুখে কোন আদর্শ রেখে না গেলে বিপ্লবীরা অবসন্ন হয়ে পড়বে এবং স্বাধীনতার স্বপ্ন ধুসরিত হবে। এইকলঙ্ক মোচনে বলিষ্ঠ কীর্তি স্থাপনে প্রয়াস পান।সঙ্গী

চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী, নীরেন দাশগুপ্ত, মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত ও জোতিষ পালসহ সরে বুড়িবালাম নদীর তীরে উচু ঢিবির পাশে অবস্থান নেয়।[২৮৬]

ইতোমধ্যে কলকাতা পুলিশ কমিশনার *টেগার্টের* (Sir Charles Augustus Tegart) নেতৃত্বে একদল পুলিশ ও রাইফেলধারী অস্ত্রারোহী সৈন্য তাদের দুদিক থেকে ঘিরে ফেলে। বিপ্লবীরা পুলিশের নিকট আত্মসমর্পণ নয়, যুদ্ধ করা স্থির করে। ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের ০৯ সেপ্টেম্বরের এই অসমযুদ্ধে বিপ্লবীরা বুড়িবালাম নদীর তীরবর্তী বালুকারাশির মধ্যে অপূর্ব ট্রেঞ্চ তৈরি করে। পুলিশের দল নিকটবর্তী হওয়ামাত্র ট্রেঞ্চের মধ্য থেকে গুলিবর্ষণ করায় শত্রুপক্ষের কয়েকজন ধরাশায়ী হয়। সম্মুখ যুদ্ধে চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী প্রাণ দেয়। জ্যোতিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘাজ্যোতিন) মারাত্মক যখম অবস্থায় বন্দি হয়। পরদিন উড়িষ্যার বালেশ্বর হাসপাতালে মৃত্যুর মাধ্যমে বুড়িবালামের তীরে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হয়। এই ঘটনায় পুলিশের দায়ের করা মামলার রায়ে বালেশ্বর জেলে ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের ২২ নভেম্বর নীরেন দাশগুপ্ত, মনোরঞ্জন সেনগুপ্তের ফাঁসি হয়। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের ০৪ ডিসেম্বর বহরমপুর জেলে জোতিষ পালের মৃত্যু হয়।[২৮৭] এভাবে উড়িষ্যার বালেশ্বর জেলায় বুড়িবালাম নদীর তীরে বিপ্লবীরা প্রাণ উৎসর্গের মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে স্বাধীনতার বার্তা রেখে যান।

বলাবাহুল্য বুড়িবালামের এই বার্তা ব্যর্থ হয়নি। এই বৈপ্লবিক ত্যাগের ঘটনা অবগত হয়ে ১৬ বৎসর বয়স্ক কবি কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) একদিন ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীতে যোগদানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে যে গোপন অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছিলেন, সেটি তাঁর স্কুল জীবনের বন্ধু সাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় উল্লেখ করছেছেন; নজরুল যুদ্ধবিদ্যার প্রশিক্ষণ গ্রহণ সমাপনান্তে পরবর্তীতে ফিরে এসে ভারতবর্ষে একবিরাট সৈন্যবাহিনী গঠন করবে। তারপর দেশ থেকে ইংরেজ তাড়াবে।[২৮৮]এসময় নজরুল গভীর জঙ্গলে গিয়ে শিয়ারশোল স্কুলে তার শিক্ষক ও যুগান্তর দলের সদস্য নিবারণচন্দ্র ঘটকের কাছে পিস্তল চালানোর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।[২৮৯] প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার কৌশল হিসেবে বিপ্লবীদলের সদস্যরা বাঙালি পল্টন সহ বেশকিছু ভারতীয় সেনা ইউনিটে যোগদান করে। এই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে লেখাপড়ায় ভালো হওয়া সত্ত্বেও নজরুল[২৯০] ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিকে ১৮ বৎসর বয়সে মাধ্যমিক টেস্টপরীক্ষা দেওয়ার পূর্বেই তিনি ৪৯ বেঙ্গল রেজিমেন্ট সৈনিক হিসেবে যোগদান করেন বলে জানা যায়। সুঠামদেহ, মেধাবী, বুদ্ধিমান ও চৌকস নজরুল ইসলাম দক্ষতার স্বাক্ষর রেখে তিনি খুব অল্পসময়ের মধ্যে সেনাবাহিনীতে কোয়াটার মাস্টার ও পরে হাবিলদার পদে উন্নীত হয়।[২৯১] সূর্যকুমার সেনের ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ভয়াবহ ব্রিটিশ বিরোধী ও সফল চট্টগ্রাম বিপ্লবীদের

অস্ত্র চালনায় নজরুলের এই সৈনিক জীবনের ব্রিটিশের নিকট থেকে আয়ত্ব করা অস্ত্র প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত দক্ষতা প্রতিভাত হয়।

প্রকৃতপক্ষে রাসবিহারী বসু ও জ্যোতিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের (বাঘাজ্যোতিন) বিপ্লব প্রচেষ্টার প্রস্তুতি সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বতন্ত্রভাবে সম্পূর্ণ হয় মর্মে যে অভিযোগ করা হয়।[২৯২] এ সম্পর্কে গবেষক অমিত দেবনাথ উল্লেখ করেছেন: রাসবিহারী বসু উত্তর ভারতে বৈপ্লবিক সংগঠনের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। বিদেশ থেকে অস্ত্র এবং অর্থ লাভের ক্ষেত্র প্রস্তুত। এই অবস্থায় ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের শুরুতেই জ্যোতিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা জ্যোতিন) কলকাতায় বিপ্লবী নেতৃবৃন্দের একটি গোপন বৈঠক ডাকেন এবং সেখানে নিজের বিপ্লব পরিকল্পনা পেশ করেন। পরিকল্পনাটি হলো-ব্যাঙ্কক, বাটাভিয়া, নিঙ্গাপুর, সাংহাই, পেনাঙ, জাভা ও বার্মায় অবিলম্বে বিপ্লবী কেন্দ্র তৈরি করতে হবে। অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহের জন্য এইসব কেন্দ্রগুলো থেকে আমেরিকা এবং জার্মানির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা হবে। সংগ্রহীত অস্ত্র-শস্ত্র ভারতে আনার ব্যবস্থা করা হবে। প্রস্তুতি সম্পুর্ণ হলে পেশোয়ার থেকে কলকাতা পর্যন্ত অভ্যুত্থান পক্রিয়া শুরু করা হবে এবং উক্ত কেন্দ্রগুলো থেকে অভ্যুত্থান সংগঠনে সাহায্য করা হবে।[২৯৩] বৈঠকে অংশগ্রহণকারী বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ পরিকল্পনাটি অনুমোদন করেন। জ্যোতিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘাজ্যোতিন) পিংলের মাধ্যমে রাসবিহারী বসুকে এক বার্তায় অতিসত্ত্বর উত্তর ভারতের বিপ্লবী নেতৃবৃন্দকে নিয়ে কাশীতে বৈঠক আয়োজন করার নির্দেশ দেন। কাশীর বৈঠকে দিল্লি, কানপুর, অমৃতসর, লাহোর, আজমীর, বাঁকিপুর প্রভৃতি অঞ্চলের বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকটিতে রাসবিহারী বসুর সাথে পরামর্শ করে জ্যোতিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘাজ্যোতিন) ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি দেশব্যাপি অভ্যুত্থানের দিন নির্ধারণ করেন। রাসবিহারী বসু ও পিংলেকে পাঞ্জাব বিশেষত লাহোর সেনানিবাসের ভার দিয়ে তিনি স্বয়ং বাংলা, বিহার এবং উড়িষ্যার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।[২৯৪]

বাংলার যুগান্তর সমিতির উদ্যোগে ইন্দ্রনাথ নন্দী স্বদেশী আন্দোলনের আগেই (১৯০৫খ্রি.) কয়েকজন বিপ্লবীকে নিয়ে বিহার যায়। স্থানীয় বিপ্লবী পুনিতলালের সাথে পরামর্শক্রমে গ্রামে গ্রামে স্বাধীনতার বাণী প্রচার শুরু করে। ভবানী মন্দির স্থাপন উপলক্ষে পরবর্তীতে কয়েকজন বিহারে গেলে আরা,বাঁকিপুর এলাকায় স্বদেশী আন্দোলনের সাথে জড়িত আইনজীবি, শিক্ষক ও ছাত্রদের সাথে পরিচয় হয়। তারা আমাদের কাজে সহানুভূতি জানায়। পশ্চিমবিহারেও কার্যবিস্তার এবং উত্তরপশ্চিম বিহারে বাংলার বিপ্লবীরা মাস্টারি করার উছিলায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৈপ্লবিকমন্ত্র প্রচারের কৌশল নেয়। বিপ্লববাদ হিন্দি বা হিন্দুস্থানী ভাষা-ভাষীদের মধ্যে বিশেষ কার্যকর হয়নি। তবে উত্তরপশ্চিম বিহারে বৈপ্লবিক কার্য সফলতা না পেলেও ছোট নাগপুরে সফলতা আসে। ছোটনাগপুর বিদ্রোহের নায়ক বিরশা ভগবানের[২৯৫]

দলের নায়ক জোয়ান সর্দারের সাথে সাক্ষাৎ পাওয়া যায় নাই। যুগান্তর সমিতির গনেশচন্দ্র ঘোষের চেষ্টায় রাঁচিতে বড় একটি কেন্দ্র গড়ে উঠে। রাঁচির হিন্দুস্থানী পল্টনের একাংশ বৈপ্লবিক কর্মকান্ডে সহানুভূতি জানায়[২৯৬] বলে উল্লেখ আছে। হিন্দিভাষী কতিপয় বিহারীছাত্র যুগান্তর প্রত্রিকার হিন্দি সংস্করণ বের করার উদ্যোগ নেয় কিন্তু পুলিশি হাঙ্গামার জন্য এ প্রচেষ্টা স্থগিত হয়।[২৯৭] বিহার প্রদেশে বিপ্লব প্রচেষ্টায় বিহার প্রবাসী বাঙালিদের অবদানই প্রধান। বিহার প্রবাসী রাজনারায়ণ বসুর নিকট থেকেই রাজনৈতিক শিক্ষা ও ঐতিহ্য ধারণ করে তার দৌহিত্র অরবিন্দকুমার ঘোষ এবং বারীন্দ্রকুমার ঘোষ। তারা দেওঘরে[২৯৮] গোল্ডেন লীগ নামক এক রাজনৈতিক সংগঠনের সাথে বাল্যকালেই যুক্ত হয়েছিলেন বলে জানা যায়। আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলার সাক্ষ্য-প্রমাণাদির মাধ্যমে বিহারপ্রবাসী আরো কতিপয় বাঙালি এ কর্মে যুক্ত ছিলেন তথ্য পাওয়া যায়। বিপ্লবীরা দেওঘরে শীললজ ভাড়া করে বোমাতৈরি ও বোমা মজুদকেন্দ্র স্থাপন করে। পুলিশ একথা জানতে পারে আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলার বেশ পরে ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে। বাঙালি বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী কর্তৃক বিহারের মুজাফফ্রপুরের বোমা বিস্ফোরণের[২৯৯]ঘটনা সমগ্র ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণির যুব শক্তির মধ্যে বৈপ্লবিক চেতনা জাগ্রত করতে সক্ষম হয়।

এছাড়া ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের ২০ মার্চ মতিচাঁদ ও মানিকচাঁদসহ চার বিপ্লবী বিহারের নিমেজ মন্দিরে ডাকাতিকালে মোহান্ত হত্যাকান্ডের শিকার হয়। প্রায় একবৎসর পর সিউ নারায়ণ নামের একছাত্র বৈপ্লবিক কাগজপত্রসহ গ্রেফতার হলে পুলিশ এ হত্যার কথা জেনে যায়। বিচারে মতিচাঁদের ফাঁসি ও বিষণ দত্ত'র দশবৎসর দীপান্তর দন্ড হয়।[৩০০] বেনারস সমিতির প্রতিষ্ঠাতা শচীন্দ্রনাথ স্যানালের উদ্যোগে ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে বিহারের তৎকালীন রাজধানী বাকীপুর শহরে কয়েকজন কলেজ ছাত্রকে নিয়ে বেনারস সমিতির একটি শাখা প্রতিষ্ঠা পায়। বেনারস সমিতির সদস্য বিহার ন্যাশনাল কলেজের ছাত্র বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র এ শাখার পরিচালক নিযুক্ত হয়। রঘুবীর নামীয় আরেক ছাত্রকে বঙ্কিমের প্রধান সহকারী করা হয়। বেনারস ষড়যন্ত্র মামলার সময় বঙ্কিমের জনৈক সহপাঠি বঙ্কিমের কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে নিম্মোক্ত তথ্য দেয়: বঙ্কিমচন্দ্র অধ্যয়নের জন্য বিহারে কলেজে ভর্তি হয়ে কয়েকজন ছাত্রবন্ধুকে নিয়ে এক সমিতি প্রতিষ্ঠা করে বিবেকানন্দের রচনাবলি পাঠচক্র শুরু করে। বাইরের কোন লোকের নিকট সমিতির গোপন কথা প্রকাশ না করার শর্তে প্রত্যেক সদস্যকে ভগবানের নামে শপথ করায়। এদেশ হতে ইংরেজ বিতাড়নের সক্ষমতা অর্জনকল্পে আমাদের উদ্বুদ্ধ এবং প্রস্তুত হওয়ার পরামর্শ দেয়।[৩০১] কিছুদিন পরে রঘুবীর এলাহাবাদে সৈন্যবাহিনীর কেরানী পদে চাকরী পায়। সেখানে রাজদ্রোহমূলক ইস্তাহার বিলি করার অপরাধে দুই বৎসরের কারাদন্ড হয়। বেনারস ষড়যন্ত্র মামলায় ধৃত হয়ে বঙ্কিমচন্দ্র ১০ বৎসরের কারাদন্ড লাভ করে।[৩০২]

বেনারস ষড়যন্ত্র মামলার পর ঢাকার অনুশীলন সমিতি সরাসরি বিহারে সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ে ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে বৈপ্লবিক ঘটনায় পলাতক রেবতী নাগকে বিহার পাঠায়। সে ভাগলপুরের বাররী উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্রের নিকট বিপ্লবের আদর্শ তুলে ধরে তাদের উদ্বুদ্ধ করে। তাদের নিয়ে সেখানে অনুশীলন সমিতির শাখা স্থাপন করে। ক্রমশ অন্যান্য শহরেও অনুশীলন সমিতির শাখা সমিতি প্রতিষ্ঠা পায়। বাংলার বিপ্লবীরা যাতে ভাগলপুরে আশ্রয় নিতে পারে সেজন্য গোপন আশ্রয়স্থলের ব্যবস্থা হয়। কিন্তু ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলার পুলিশ রেবতী নাগকে গ্রেফতার করতে ভাগলপুর উপস্থিত হলে সে পলায়ন করে। পুলিশকে সহযোগিতার সন্দেহে রেবতী নাগ বিপ্লবীদের দ্বারা নিহত হয়। এ পলায়নের পর ভাগলপুর অনুশীলন সমিতির সকল সদস্যকে পুলিশ গ্রেফতার হয়। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বিচারে এদের কয়েকজনকে নজরবন্দি এবং বাকীদের সতর্ক করে ছেড়ে দেয়। এভাবে বিহারে বিপ্লব প্রচেষ্টার অবসান ঘটে।[৩০৩] এই ডিসেম্বরেই (১৯১৭খ্রি.) সরকার বিপ্লব প্রচেষ্টা কঠোর হস্তে দমনের প্রত্যয়ে *বিচারপতি রাউলাটের* (Justice Rowlatt) নেতৃত্বে সিডিসন কমিতি গঠন করে।

বাংলাদেশে যুগান্তর সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা দেবব্রত বসু ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে উড়িষ্যায় গিয়ে সর্বপ্রথম বৈপ্লবিক সমিতি গড়ার প্রয়াস পান। পরবর্তীতে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, জ্যোতিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘাজ্যোতিন), ভূপেন্দ্রনাথ দত্তও তিনবার এবং আরও কয়েকজন বিপ্লবী নেতা বৈপ্লবিক সমিতি প্রতিষ্ঠার জন্য উড়িষ্যায় গিয়েছিলেন। গনেশ ঘোষ মহাশয়ও উড়িষ্যায় অবস্থান করে সমিতি গঠনের চেষ্টা করেছিলেন[৩০৪] বলে উল্লেখ পাওয়া যায়।এসকল বিপ্লবীদের সমবেতচেষ্টার ফলে দলে দলে উড়িষ্যাবাসী বাঙালি, ওড়িয়া ভাষাভাষী যুবকের দল, মাস্টার, উকিল, লেখক, ডাক্তার, জমিদার, মোহান্ত ও উচ্চপদস্থ প্রবীণ ব্যক্তিরা বৈপ্লবিক দলভূক্ত হন বা সহানুভূতি দেখাতেন।কটকের ব্যায়াম সমিতি বৈপ্লবিক যুগান্তর দলের একটি বড়ো শাখা ছিল। কটক, পুরী, বালেশ্বর ও অন্যান্য স্থানসমূহ বৈপ্লবিক কর্মকান্ডে মুখরিত ছিল। উড়িষ্যায় স্বদেশী আন্দোলন যুগান্তর দলের কর্মীদের দ্বারাই সংঘটিত হতো। উড়িষ্যাবাসীর বৈপ্লবিক উৎসাহ ও উদ্যম ছিলো প্রশংসনীয়। পূর্ববঙ্গ ও উড়িষ্যা এ দু'জায়গা ছিল বিপ্লবীদের বিশেষ কর্মক্ষেত্র। কার্যত স্বাধীনতার মন্ত্রকে বাংলার চেয়ে উড়িষ্যাবাসী দ্রুতগ্রহণ করায় সেখানে বৈপ্লবিক কর্মকান্ড খুব দ্রুত বিস্তার লাভ করেছিল[৩০৫] বলে তথ্য পাওয়া যায়।

পুরীর গোবর্ধন-মঠের জগৎগুরু শঙ্করাচার্য মহাশয় বিপ্লববাদে আগ্রহী হয়ে জ্যোতিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘাজ্যোতিন) কুলকর্ণী প্রমূখ বিপ্লবীদের সাথে ভারতের বিপ্লব প্রচেষ্টা সম্পর্কে আলোচনান্তে ভবানী মন্দির প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে পারে। শঙ্করাচার্য মহাশয় তাঁর মঠ বৈপ্লবিক কাজে ব্যবহারের জন্য ছেড়ে দেয়ার প্রস্তাব করেন মর্মে উল্লেখ আছে।উড়িষ্যার বৈষ্ণব ও মালিকা নামক বৈষ্ণব

সম্প্রদায় বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপ শুরু করায় উড়িষ্যা সরকার নিপীড়নপূর্বক তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়।[৩০৬] অতঃপর দীর্ঘকাল উড়িষ্যায় আর কোন বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপ দৃশ্যমান হয়নি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরুর পর সেখানে দুইটি বৈপ্লবিক ঘটনা ঘটে। ঘটনা দু'টিই বাংলাদেশের বিপ্লবীদের দ্বারাই সংগঠিত হয়। প্রথমত: যুগান্তর সমিতির কয়েকজন সদস্য স্থানীয় এক ছাত্রের সাহায্যে ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের ২০ সেপ্টেম্বর কটক জেলায় একধনাঢ্য জমিদার গৃহে ডাকাতি করে প্রচুর অর্থ পায়; দ্বিতীয়ত: ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের ০৯ সেপ্টেম্বর বালেশ্বর জেলার বুড়িবালাম নদীর তীরে জ্যোতিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের (বাঘাজ্যোতিন) নেতৃত্বে ইংরেজ বাহিনীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধে বিপ্লবী দলের আত্মত্যাগের ঘটনা।[৩০৭]

ব্রিটিশ সরকারের দমননীতির ফলে ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে অধিকাংশ বিপ্লবী নেতা ও কর্মী কারারুদ্ধ হয়।কিছুসংখ্যক আত্মগোপনে থাকে।[৩০৮] এদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪-১৯১৮)[৩০৯] তুরস্কসহ জার্মান পক্ষ পরাজিত হলে ভারতীয় রাজনীতিতেও এর প্রভাব পড়ে। বিজয়ী মিত্রশক্তি বিজিত শক্তির বিরুদ্ধে কঠোর নিপীড়নমূলক পদক্ষেপ নেয়। তারা ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ২৮ জুন জার্মানির উপর নির্মম ও অসম্মান জনক ভার্সাই চুক্তি চাপিয়ে দেয়। ভার্সাই চুক্তির মাধ্যমে তুর্কি সাম্রাজ্য নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে রাজধানী কনস্টান্টিনোপল সহ মূল তুর্কি ভূখন্ডেও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়।এই অবস্থায় মুসলিম জাহানে খলিফার মর্যাদাসহ তুর্কি জাতির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব ভূলুণ্ঠিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়।[৩১০]

তুরস্কের এহেন বিপন্ন অবস্থায় মুসলিম বিশ্বে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। ভারতে এ প্রতিক্রিয়ার সর্বাধিক ব্যাপকতা লক্ষ্যণীয়।ভারতীয় মুসলমানেরা ইসলামের অস্তিত্ব ও মর্যাদা রক্ষায় খিলাফতকে একটি অপরিহার্য বিষয় মনে করত।[৩১১] খলিফা তথা তুর্কিদের দুরাবস্থার জন্য মিত্রশক্তির গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার ব্রিটিশ সরকারে বিশেষভাবে দায়ী ছিল।[৩১২] এজন্য ভারতে সরকার অনুগত মুসলমানদের মধ্যে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে। অন্যদিকে,যুদ্ধকালীন প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি[৩১৩] মোতাবেক দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা বা স্বায়ত্বশাসন প্রদানে অনীহার কারণেও ভারতে ব্রিটিশবিরোধী মনোভাব দানা বাঁধতে শুরু করে। সরকার *রাওলাট আইন* (Rowlatt Act,1919) পাসের মাধ্যমে পুলিশের হাতে অবাধ ক্ষমতা দিয়ে 'ভারতের বিপ্লব প্রচেষ্টা[৩১৪] সহ সকল প্রকার সরকার বিরোধী বিক্ষোভ ও অসন্তোষ মোকাবিলার কৌশল নেয়। বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা সমুলে উচ্ছেদসাধনে নয়াআইন ও নিপীড়নের প্রতিবাদে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ১৩ এপ্রিল পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে জনতা সমবেত হয়। জেনারেল *ডায়ারের* (Reginald Dyer) নির্দেশে সেনাবাহিনীর নির্বিচার গুলিবর্ষণে প্রায় চারশতলোক নিহত ও হাজারের

অধিক আহতের ঘটনায় সমগ্রভারত বিক্ষোভে ফেটে পড়ে।[৩১৫] এবং ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের গোড়ার দিকে ভারতে একটি ব্যাপক ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়।

পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনার প্রতিবাদে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে বড়োলাটকে চিঠি লিখে স্যার' উপাধি বর্জন করেন।[৩১৬] ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ২১ সেপ্টেম্বর লক্ষ্মৌতে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় মুসলিম সম্মেলন তুরস্কের খলিফার মর্যাদা ও ক্ষমতা অক্ষুণ্ন রাখার দাবি জানায়। সিদ্ধান্তক্রমে ১৭ অক্টোবর খিলাফত দিবস ও হরতাল পালিত হয়। ২৩-২৪ নভেম্বর দিল্লীতে কেন্দ্রীয় খিলাফত কমিটির প্রথম অধিবেশনে খিলাফত রক্ষায় অসহযোগ কর্মসূচি গৃহীত হয়। পূর্ব থেকেই খিলাফতের সক্রিয় সমর্থক মহাত্মাগান্ধী এই সম্মেলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। দ্রুতই তিনি খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের প্রধান নেতৃত্বে আসীন হন।মহাত্মাগান্ধীর উদ্যোগে কংগ্রেসের ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে বিশেষ এবং ডিসেম্বরের বার্ষিক অধিবেশনে অসহযোগ কর্মসূচি[৩১৭] অনুমোদিত হয়।[৩১৮]

এহেন খিলাফত-আসহযোগ আন্দোলনের শুরুতে আলী ভ্রাতৃদ্বয় (Ali Brothers)[৩১৯]গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁদের যোগদানের মাধ্যমে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের শুরুতে খিলাফত আন্দোলন ভারতীয় রাজনীতির প্রধান আলোচ্যসূচিতে স্থানলাভ করে।[৩২০] ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ২২ জুন মহাত্মাগান্ধী ভাইসরয়কে চিঠিলিখে জানান, কুশাসকের সঙ্গে প্রজাদের সহযোগিতা না করার অধিকার স্মরণাতীত কাল থেকেই স্বীকৃত।[৩২১] এই নোটিশের বেধে দেয়া সময় পার হলে ০১ আগস্ট থেকে আনুষ্ঠানিক ভাবে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করা হয়।সমকালীন নেতৃবৃন্দের মধ্যে ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের শুরুতে উদীয়মান নেতা সুভাষচন্দ্র বসু *ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের* (ICS=Indian Civil Service) চাকুরিতে ইস্তফা দেয়। লব্ধ প্রতিষ্ঠিত আইনজীবি চিত্তরঞ্জন দাশ আইন ব্যবসা ত্যাগ করে অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন।[৩২২]

একে ফজলুল হক ও নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী খিলাফত আন্দোলন সমর্থন করলেও অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধিতা করেন। কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ তুর্কীদের দূরাবস্থায় ব্যথিত হওয়া সত্ত্বেও খিলাফত আন্দোলন সমর্থন করেননি। তিনি অসহযোগ আন্দোলনেরও তীব্র বিরোধিতা করেন।[৩২৩] কিন্তু করটিয়ার বিপ্লবী জমিদার মৌলভী ওয়াজেদ আলী খান পন্নী (চাঁদ মিয়া) এ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে কারাবরণ করেন।[৩২৪] যদিও এসময় জমিদারশ্রেণি ব্রিটিশ বিরোধী খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলনে অংশ নেয়নি। অন্যদিকে রায় বাহাদুর, খান বাহাদুর খেতাবধারী জমিদাররা

খেতাব ও জমিদারি হারানোর ভয়ে এ আন্দোলন থেকে দূরে থেকেছেন।[৩২৫] তাদের ব্যঙ্গ করে বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন 'আপীল' কবিতায় চমৎকার ভাবে উল্লেখ করেছেন:

কারো আছে জমিদারী
কেহবা উপাধীধারী,
বাঙ্গালা বিহারে মোরা যত কিছু ধারী,
সকলে মিলিয়া এই আব্দেন করি।
প্রাণে মরি সেও ভাল,শতবার মৃত্যু ভাল,
লাঙ্গুল[৩২৬] বিরহ কিন্তু সহিতে না পারি।[৩২৭]

এ সকল উপাধীধারীদেরদের নিষ্ক্রিয়তা সত্ত্বেও গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের বিদ্যুৎস্পর্শে আসমুদ্র হিমাচল-ভারতবর্ষ আলোক চঞ্চল হয়ে ওঠে। এদিকে বাংলায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্ব মহাত্মাগান্ধীকে সাহসী করে তোলে।[৩২৮] বিশ্বযুদ্ধ থেমে যাওয়ার সাথে সাথে ব্রিটিশ সরকার সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করায় অনেক কয়েদী মুক্ত হয়, অনেকের কয়েদকাল হ্রাস পায়। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের শেষদিকে *মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার* (Montagu Chelmsford Reforms)[৩২৯] জারি হবার সাথে সাথে রাজনৈতিক বন্দিরা মুক্তিলাভ করতে থাকে। বিনা বিচারে যাঁরা আবদ্ধ ছিলেন; প্রথমে তাঁরা মুক্তি পায়। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বিপ্লবী নেতারা ঘরে ফিরে দেখেন ভারতবর্ষের চেহারা বদলে গেছে। রাজনৈতিক গগণে উত্থিত হয়েছেন এক নতুন বিপ্লবী। যাঁর বাণী স্বতন্ত্র, যাঁর পথ স্বতন্ত্র। তাঁর অহিংসার আহ্বান স্বতন্ত্রসুরে আসমুদ্র হিমাচল প্রত্যেকটি নরনারীর কানে ধ্বনিত।[৩৩০] দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ বিপ্লবীদের এ আন্দোলনে শামিল হওয়ার আহবান জানান। মহাত্মা গান্ধীও একপর্যায়ে সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে বলেন, Had India sword,I would have asked her to draw it,But she had no sword-I asked her to Non-violent Non-Cooperation.[৩৩১] তিনি আরো পরিস্কার করে বলেন, Non-violent may be accepted as creed or policy.I am out to destroy this satanic Government.[৩৩২] অসহযোগ আন্দোলনের সবখানি তত্ত্ব বাংলার বিপ্লবীরা গ্রহণ করতে না পারলেও এই আন্দোলনের মধ্যে যে স্বাদেশিকতা ছিলো এবং এই আন্দোলনের মাধ্যমে জনগণের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার সুযোগ কাজে লাগানোর প্রত্যয়ে অনেক বিপ্লবী এতে আকৃষ্ট হয়। এবং নব উদ্যমে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনের পর এ অহিংসাকে আন্দোলনের কৌশল হিসেবে গ্রহণ করে চলমান আন্দোলনে বিপ্লবীরা শামিল হয়। আন্দোলন গতি পায়।[৩৩৩] বাংলায় বেশকিছু দিন নরহত্যা, ডাকাতি প্রভৃতি বৈপ্লবিক কর্মকান্ড প্রকাশ পায়নি। বস্তুত এ সময়ে ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধী যুগের (Gandhi-era.) সূত্রপাত হয়।[৩৩৪]

১৯২১ খ্রিস্টাব্দের দ্বিতীয়ার্ধে ছাত্ররা স্কুল-কলেজ ও আইনজীবীরা আদালতে ফিরতে থাকে। মহাত্মা গান্ধীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এক বৎসরের মধ্যে স্বরাজ তথা স্বায়ত্বশাসিত পূর্ণ দায়িত্বশীল সরকার না

পাওয়ায় চলমান আন্দোলন-সংগ্রামে ভাটার টান অনুভূত হয়। এদিকে ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ০৫ ফেব্রুয়ারি উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুর জেলার চৌরীচোরা গ্রামের কৃষক,স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক[৩৩৫] ভগবান আহীরের উপর পুলিশের বেত্রাঘাত ও অকথ্য নির্যাতনে জনতা উত্তেজিত হয়। বিক্ষুব্ধ জনতা অহিংসভাবে থানার সামনে জমায়েত হলে পুলিশ তাদের ওপর গুলি চালায়। প্রতিবাদে থানায় অগ্নিসংযোগ করলে ২২ জন পুলিশ অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যায়। এতে মহাত্মাগান্ধী আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন। উল্লেখ্য ১২ ফেব্রুয়ারি তাঁর সিদ্ধান্ত কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটিতে অনুমোদিত হয়।[৩৩৬] তবে চরকা, তাঁত,অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ,ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সৌহাদ্য স্থাপন, মাদক বর্জন ইত্যাদি চালু থাকায় সরকারের অস্বস্তি দূর হয়।

মহাত্মাগান্ধীর এসিদ্ধান্তে জনতা ক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং নেতৃবৃন্দ বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে।[৩৩৭] অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারের পর ব্রিটিশ সরকার ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ১৩ মার্চ মহাত্মাগান্ধীকে গ্রেফতার করে এবং তাঁকে ৬ মাসের কারাদন্ড দেয়। অপরদিকে মোস্তফা কামালের নেতৃত্বে নব্যতুর্কী দল তুরস্কের সুলতানকে পদচ্যুত করলে খিলাফত আন্দোলনও বন্ধ হয়।[৩৩৮] আপাতদৃষ্টিতে অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার হলেও মহাত্মা গান্ধীর এ অভিনব বৈপ্লবিক ও গণভিত্তিক কর্মসূচির ফলে স্বাধীনতা আন্দোলনের ঢেউ প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছে যায়।সশস্ত্র বিপ্লবীরা জীবনাহুতি দিয়েও যা পৌঁছাতে পারেনি।

প্রকৃতপক্ষে মহাত্মাগান্ধী ভারতের মুক্তির স্বপ্ন দেখতেন রক্তহীন বিপ্লবের পথে। কিন্তু ব্রিটিশ শাসনে পর্যুদস্ত ও শোষণে জর্জরিত হয়ে ইংরেজ ও ব্রিটিশ সরকারের প্রতি জনসাধারণ যে দারুণ ঘৃণা ও বৈরীভাব পোষণ করতো;আন্দোলনের উৎসমুখে তা স্বাভাবিকভাবেই দুর্বার হয়ে উঠে। তাই সংগ্রামের সূচনায় আঘাত হানবার স্বাভাবিক প্রেরণায় তারা উদ্বুদ্ধ হয়। সংগ্রামের কৌশল হিসেবে অহিংসাকে সর্বক্ষেত্রে মেনে চলা জনসাধারণের পক্ষে সম্ভব হয়নি। মুক্তি প্রত্যাশী ভারতীয় জনতার আরাধ্য স্বাধীনতার অগ্রগতি অহিংসার চোরাবালিতে সেদিন পথ হারায়।[৩৩৯]

জাতির এহেন ক্লান্তিলগ্নে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ১৩ অক্টোবর ধুমকেতু প্রত্রিকায় ভারতের পূর্ণস্বাধীনতা দাবি উত্থাপন করেন। এবং সকল নিয়ম-কানুন-বাধন-শৃঙ্খল-মানা-নিষেধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আহ্বান জানান।অথচ তখন পর্যন্ত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কোনো নেতা পূর্ণস্বাধীনতা দাবি করেনি। তবে, ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেস অধিবেশনে মাওলানা হযরত মোহানী

সর্বপ্রথম পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব উত্থাপন করায় স্বয়ং মহাত্মাগান্ধী কর্তৃক তিনি তিরস্কৃত হন বলে উল্লেখ আছে।[৩৪০]

আমাদের দেশের বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার সমসাময়িক কালে রাশিয়ার সফল বিপ্লবী নায়কদের সাথে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক ও বৈপ্লবিক সম্পর্ক স্থাপনের জানা যায়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সে সময় ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্ন রূপায়ণে অগ্রণী ভূমিকায় অবতীর্ণ হন: সর্বজনাব রাসবিহারী বসু, মানবেন্দ্রনাথ রায়, অবনী মুখার্জি, ড.ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, বীরেন চ্যাটার্জি, অধ্যাপক মাওলানা বরকতউল্লাহ (ভুপাল), হরদয়াল সিং (পাঞ্জাব), রামচন্দ্র (পেশোয়ার), ভাই পরমানন্দ, রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ সিং ও তারক নাথ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অবনী মুখার্জি ও নলিনী গুপ্তের রাশিয়া থেকে গোপনে ভারত আগমন তৎকালীন তরুণ বিপ্লবী মনে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা পায়।[৩৪১] এসময় রাজনৈতিক অঙ্গনে কংগ্রেসের কর্মপন্থা নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ আইনসভা বর্জনের সিদ্ধান্তে অনঢ় থাকে। কিন্তু চিত্তরঞ্জন দাশ,মতিলাল নেহেরু প্রমুখ নেতৃবৃন্দ নির্বাচিত হয়ে আইনসভায় বাধাদানের মাধ্যমে সরকারকে অচলকরে দেয়ার পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হন। অবশেষে চিত্তরঞ্জন দাশ ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারিতে কংগ্রেসের আওতার মধ্য থেকেই স্বরাজ দল গঠন করেন।[৩৪২]

অসহযোগ আন্দোলন চলাকালীন সময়ে অনুশীলন কর্মীরা বিপ্লবী পুলিনবিহারী দাশের সশস্ত্র বিপ্লবের অলীক পরিকল্পনায় অনাস্থা দিয়ে তাঁর নেতৃত্ব অস্বীকার করে। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে তিনি দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন।[৩৪৩] বাংলার দুর্ভাগ্য যে বিপ্লবীরা কখনো ঐক্যবদ্ধভাবে ইংরেজ শাসনকে আঘাত করতে পারেনি।[৩৪৪] এসময় বিপ্লবীদের মধ্যে দ্বিবিধধারা পরিলক্ষিত হয়। অনুশীলন ও যুগান্তর দলের বিপ্লবীরা নিজেদের প্রতিষ্ঠার জন্য কংগ্রেস নেতা চিত্তরঞ্জন দাশের স্বরাজ পার্টিতে যোগদেয়। বাংলার বিপ্লবীরা কেউই মহাত্মাগান্ধীর পরিবর্তন বিরোধী নীতি মানতে পারেনি। কলকাতা দলের বিপিন গাঙ্গুলী, সন্তোষ মিত্র ও জ্যোতিষ ঘোষ প্রমুখ বিপ্লবীর প্ররোচনায় একদল যুবক আবার পূর্বের মতো বৈপ্লবিক কাজে নেমে পড়ে।[৩৪৫] ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা শাঁখারীটোলা পোস্টঅফিস লুট ও পোস্টমাস্টার হত্যাকান্ডের ঘটনায় অনেকদিন বন্ধ থাকা বৈপ্লবিক কর্মকান্ড আবার প্রকাশ পায়। এই ঘটনায় বরেনঘোষ এবং সন্তোষ মিত্র গ্রেফতার হয়।দ্বিতীয় আলীপুর মামলা হয়।কিন্তু মামলাটি টেকেনি। মানিকতলায় বোমা আবিস্কৃত হলে যশোদা ও অবনী দন্ডিত হয়।[৩৪৬]

১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে দিল্লী কংগ্রেসকে কেন্দ্র করেই অনুশীলন দলের নিখিল ভারতীয় বিপ্লবী নেতৃত্বের সমাবেশ লক্ষ্যণীয়। পূর্ব থেকেই বাংলার প্রত্যেক জেলায় দায়িত্বপ্রাপ্ত বিপ্লবী নেতৃবৃন্দের উপর সমবেত

হবার নির্দেশ ছিল। নিখিল ভারতীয় সদস্যদের গোপন বৈঠকে দলের ভাবী কর্মকান্ড নিয়ে কথা হয়।[৩৪৭] কিন্তু দিল্লী কংগ্রেস হতে বাংলায় না ফিরতেই বহু মুক্ত বিপ্লবী নেতাকে ১৮১৮ খিস্টাব্দের তিন আইনে গ্রেফতারপূর্বক রাজবন্দি করে। তন্মধ্যে ডা.যদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন ধর, ভূপেন দত্ত, প্রতুল গাঙ্গুলী, রবি সেন, উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিন গাঙ্গুলি, অধ্যাপক জ্যোতিষ ঘোষ ও পূর্ণ দাশ প্রমুখ ১৭ জন উল্লেখযোগ্য।[৩৪৮] সংবাদপত্রে এই সংবাদ প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে অনেক নেতৃবৃন্দ গ্রেফতার এড়িয়ে আত্মগোপনে যায়। এ ফেরারী বিপ্লবীরাই পরবর্তীতে বৈপ্লবিক কর্মকান্ড এগিয়ে নেয়। এদের মধ্যে অনুশীলনের নরেন সেন, প্রতুল গাঙ্গুলী, রমেশ আচার্য, রবীন্দ্রমোহন সেন এবং আশুতোশ কাহিল অন্যতম। এই সময় রাশিয়া প্রত্যাগত নলিলী গুপ্তের তত্ত্বাবধানে ঢাকাতে বোমা তৈরির ব্যবস্থা হয়। দলীয় অর্থের প্রয়োজনে পরিকল্পনার অংশ হিসেবে বীরেন চ্যাটার্জি জাল নোট তৈরির একজন বিশেষজ্ঞকে ঢাকায় পাঠান। শচীন চক্রবর্তী, পূর্ণান্দ দাশগুপ্ত[৩৪৯] এবং গৌহাটি যুদ্ধের অন্যতম যোদ্ধা প্রবোধ দাশগুপ্তের সক্রিয় প্রচেষ্টায় কিছুটা সফলতা আসে।কিন্তু পরে প্রবোধ দাশগুপ্ত পুলিশের হাতে ধরা পড়েন বলে জানা যায়।[৩৫০]

যুগান্তরের তরুণ বিপ্লবী গোপীমোহন সাহা[৩৫১] ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের ১২ জানুয়ারি সকাল বেলায় কলকাতার পুলিশ কমিশনার *চালর্স টেগার্টকে* (Sir Charles Augustus Tegart) হত্যা করতে যেয়ে ভুলক্রমে *মি.ডে* (Ernest Day) নামের এক ইংরেজ পথচারীকে হত্যা করে।[৩৫২] গোপীমোহন তৎক্ষানাৎ ধরাপড়ে এবং তার বিচার শুরু হয়। ০১ মার্চ প্রথম প্রহরে আলিপুর প্রেসিডেন্সি জেলে গোপীমোহনের ফাঁসি কার্যকরের পর পুলিশ তাঁর মৃতদেহ পরিবারের নিকট হস্তান্তর না করে জেলের অভ্যন্তরেই দাহ করে। জেলগেটে অপেক্ষারত সুভাষচন্দ্র বসু প্রভাতে গোপীনাথের চাদরখানা কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে সংগ্রহ করে মাথায় জড়িয়ে নেন। অতঃপর সিটি করপোরেশন অফিস কক্ষে চলে যান; এবং ভারতবর্ষের মানচিত্রের সামনে দাঁড়িয়ে ধ্যানস্থ সুভাষ গুণগুণিয়ে বলতে থাকেন:

'তোমার পতাকা যারে দাও
তারে বহিবার দাও শকতি।'
নয়ন অশ্রুসিক্ত।...বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত।[৩৫৩]

গোপীমোহন সাহার কর্মে ব্যর্থতার দুঃখথাকলেও তা বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে সিরাজগঞ্জ প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মেলনে স্বদেশপ্রেমিক এই বীরের প্রশংসায় প্রস্তাব পাস হয়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ উত্থাপিত আত্মত্যাগী এই যুবকের প্রশংসাসূচক প্রস্তাব যদিও নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে নাকচ হয়; তথাপি তাঁর এই বৈপ্লবিক কর্মের মাধ্যমে স্বাধীনতার বার্তা ভারতের ঘরে ঘরে পৌঁছে যায়।

১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের ২৫ অক্টোবর নতুননিরাপত্তা আইন *বেঙ্গল অর্ডিনেন্স* (Bengal ordinance) জারির সাথে সাথেই বাংলার সর্বত্র খানাতল্লাস ও ধরপাকড় আরম্ভ হয়। গোটা বাংলাদেশ থেকে প্রায় দুইশত বিপ্লবীকে আটক করে। পূর্বে স্বল্পসংখ্যক বিপ্লবী নেতা তিন আইনে গ্রেফতার হয়ে রাজবন্দি ছিলেন। এবারেও অনেক ভূতপূর্ব রাজবন্দিকে পুনরায় আটক করা হয়। নতুন করে আটকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কলকাতা করপোরেশনের চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার সুভাষচন্দ্র বসু।[৩৫৪] ১৯২৪-২৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ছোটবড় প্রায় সকল নেতাই ধরা পড়ে যায়। বিপ্লবী সূর্যকুমার সেন কিছুদিন পুলিশের দৃষ্টি এড়িয়ে থাকলেও অবশেষে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে রাজবন্দী হন বলে উল্লেখ আছে।[৩৫৫]

১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে দিল্লী কংগ্রেসের সময়ে আড়ালে বিপ্লবীদের আলোচনা অনুসারে অনুশীলন দলের পক্ষে বোমা তৈরি ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের আয়োজন চলমান থাকে এবং[৩৫৬] ১৯২৪-২৫ খ্রিস্টাব্দে নেতা ও কর্মী গ্রেফতারের পরেও তা নিয়ে কারাগারে বিপ্লবীদের মধ্যে এক ব্যাপক ও গভীর আলোচনা আরম্ভ হয়। আলোচনার বিষয় স্থির হয়; (ক) ১৯২৩-২৫ ও তার পূর্বের বিপ্লব প্রচেষ্টার ব্যর্থতার কারণ এবং বৈপ্লবিক সংগ্রামের বিভিন্ন ত্রুটি সংশোধনের উপায় নির্ণয়; (খ) পরবর্তী বিপ্লব প্রচেষ্টার পরিকল্পনা প্রস্তুত করা।

এই উভয় বিষয়েই বিপ্লবীদের মধ্যে দ্বিবিধমত পরিলক্ষিত হয়। একপক্ষে বিভিন্ন বিপ্লবী গুপ্তসমিতির প্রবীণ নেতৃবৃন্দ;অপরপক্ষে বিভিন্ন বিপ্লবী সমিতির তরুণ নেতাকর্মীবৃন্দ। প্রবীণ নেতৃবৃন্দের মতে, বিপ্লব প্রচেষ্টা ব্যর্থতার অন্যতম প্রধান কারণ হলো উপযুক্ত আয়োজনের অভাব। একারণেই বিপ্লব প্রচেষ্টা বার বার ব্যর্থ হইতেছে। সুতরাং মুক্তির পরে পুনরায় দ্রুত বিপ্লবপ্রচেষ্টা আরম্ভ না করে প্রথমে আয়োজন সম্পূর্ণ করতে হবে। এবং যতোদিন সে আয়োজন সম্পূর্ণ না হয়; ততোদিন পর্যন্ত ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু তরুণ নেতৃবৃন্দ এইমতের ঘোরতর বিরোধীতা করে বলেন, বিপ্লব প্রচেষ্টা ব্যর্থতার কারণ আয়োজনের অভাব নয়; বরং বিভিন্ন বৈপ্লবিক সমিতির মধ্যে সহযোগিতার অভাব ও তাঁদের আভ্যন্তরিণ কলহই এই ব্যর্থতার মূল ও অন্যতম প্রধান কারণ। তাঁদের বক্তব্য হলো-বিভিন্ন বিপ্লবী দলকে, অন্ততপক্ষে বাংলার প্রধান দুইটি দল তথা অনুশীলন ও যুগান্তর সমিতিকে অবিলম্বে কাজের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। কেবলমাত্র গুপ্তহত্যা দ্বারা সন্ত্রাস সৃষ্টির পরিবর্তে ব্যাপক অভ্যুত্থান পরিকল্পনার ভিত্তিতে বিভিন্ন দলের মধ্যে পূর্ণসহযোগিতার ব্যবস্থা করতে হবে। এবং জেলমুক্তির পর অবিলম্বে কাজ আরম্ভ করতে হবে। বিভিন্ন দলের মধ্যে ঐক্য ও সহযোগিতার প্রশ্নেও গুরুতর মতভেদ দেখা দেয়। প্রবীণ বিপ্লবীরা নিজ নিজ দলের স্বতন্ত্রতা বজায় রাখার পক্ষপাতী, পক্ষান্তরে তরুণরা দেশের স্বাধীনতার জন্য আশুবিপ্লবের স্বার্থে দলীয় স্বাতন্ত্রতা বিসর্জনের পক্ষে মতদেয়। জেলের অভ্যন্তরেই

উভয়পক্ষের এই মতভেদ তীব্রআকার ধারণ করে।[৩৫৭] বিপ্লবী নেতৃবৃন্দের মধ্যকার এই তীব্র মতপার্থক্য ঐক্যবদ্ধ বিপ্লব প্রচেষ্টার ভিতকে দূর্বল করে দেয় মনে করা হয়।

অন্যদিকে মেদিনীপুর জেলের অভ্যন্তরে যখন প্রবীণ নেতারা স্থির করেন, জেল থেকে মুক্তিলাভের পর সর্বভারতীয় বিপ্লবের জন্য মিলিতভাবে কাজ করবেন। তখনও তরুণ নেতৃবৃন্দ এই সিদ্ধান্তে উৎসাহ দেখায়নি। তারা মনে করতেন, এই সকল নেতা আসলে কিছু করবেননা, ঐক্যবদ্ধ হয়ে কিছু একটা করার গালগল্পই করবেন; তাতে অপেক্ষাকৃত নতুন কর্মীরা বিভ্রান্ত হবে। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের শেষভাগে[৩৫৮] জেল থেকে মুক্তিলাভের পর এই মতভেদ আরও প্রবল হয়। প্রবীণ নেতৃবৃন্দ তাঁদের মতে অটল থাকেন এবং তরুণ নেতৃবৃন্দ ও কর্মীরা তাঁদের বিরুদ্ধে ক্রমশ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। এভাবে কিছুদিন চলার পর দু'পক্ষের মধ্যে আপসরফা অসম্ভব বুঝে দলের তরুণকর্মীরা অবশেষে নিজ নিজ মূল দলের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে; দল থেকে বের হয়ে একত্রে বিদ্রোহী দল তথা *রিভোল্ট গ্রুপ* (Revolt group) নামে সম্মিলিত হয়। পরে তাঁরা অগ্রবর্তীদল বা *অ্যাডভান্সড গ্রুপ* (Advance group) নামে পরিচিতি পায়। এই রিভোল্ট গ্রুপ বা সম্মিলিত দলে থাকে অনুশীলন পার্টি ও যুগান্তর সংযুক্ত দলের ময়মনসিংহ, বরিশাল, মাদারীপুর, হুগলী ও চট্টগ্রামের যুগান্তর শাখার কর্মীগণ। ১৯২৮-৩২ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লব প্রচেষ্টা প্রধানত এদের দ্বারাই সম্পাদিত হয়।[৩৫৯]

১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে অনুশীলন দলের বিশিষ্ট নেতা প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে সামরিক অভ্যুত্থান প্রচেষ্টার নায়ক শচীন্দ্রনাথ স্যানালের বিপ্লবী ভূমিকা প্রচলিত ব্যবস্থায় একধরণের বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনে। তিনি বাংলার অনুশীলন দলের নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা ক্রমে *হিন্দুস্থান রিপাবলিক অ্যাসোসিয়েশন* (Hindustan Republic Association) নামে একটি নতুন বিপ্লবী সংগঠন গঠন করেন। সিদ্ধান্ত হয়; অনুশীলন দলের কর্মীরা অপরাপর দলের কর্মীদের সঙ্গে এইনামে বাংলার বাইরে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতসহ পাঞ্জাবে এবং বাংলার অভ্যন্তরে কাজ করবে। কাজ শুরু হয়। বাংলার বাইরে উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ ভারতে এইসংগঠন বিস্তারের জন্য অনুশীলন থেকে যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে প্রেরণ করা হয়। তাঁর অপূর্ব কর্মতৎপরতায় দ্রুতই যুক্তপ্রদেশ, বিহার ও পাঞ্জাবে এই বিপ্লবী সংগঠন শক্ত ভিত্তি লাভ করে।[৩৬০] উত্তর প্রদেশে বিজয় কুমার সিনহা,শিব বার্মা ও জয়দেব কাপুর,পাঞ্জাবে ভগৎ শিং, ভগবতীচরণ ভোরা ও সুখদেব প্রমুখ এই সংগঠনে যোগ দেয়।[৩৬১] ব্রিটিশ শাসনের ওপর দ্রুত আঘাত হানবার উদ্দেশ্যে কলকাতায় ও সন্নিকটবর্তী 'দক্ষিণেশ্বরে[৩৬২] বোমা তৈরির জন্য দু'টি কেন্দ্র স্থাপিত হয়। প্রখ্যাত বিপ্লবী সূর্যকুমার সেন ও পরে প্রমোদরঞ্জন চৌধুরী কলকাতা কেন্দ্রের এবং অনন্তহরি মিত্র ও পরে বীরেন ব্যানার্জি দক্ষিনেশ্বর কেন্দ্রের দায়িত্বে থাকে।[৩৬৩]

অর্থ সংগ্রহে সাহায্যের জন্য অনুশীলন দলের কর্মী আন্দামান প্রত্যাগত বিপ্লবী গোবিন্দকর ঢাকা থেকে উত্তর প্রদেশে প্রেরিত হন। তাদের বৈপ্লবিক পরিকল্পনায় লক্ষ্মৌ স্টেশনের সন্নিকটবর্তী কাকোরী স্টেশনে সরকারি টাকা লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের ০৯ আগস্ট রাত্রে ডাকাতি হয়। ইতোমধ্যে শচীন্দ্রনাথ স্যানালের উদ্যোগে বৈপ্লবিক সংস্থা *'হিন্দুস্থান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন'* (Hindustan Republic Association) এর নামে এক বিপ্লবী ইস্তাহার প্রকাশ পায়। এই সংস্থার ১৫/১৬ জন দুঃসাহসী কর্মী ট্রেন আটকিয়ে নিরাপত্তা রক্ষীর নিকট থেকে টাকা ভর্তি সিন্দুক ছিনিয়ে নেয়।[৩৬৪] এহেন বৈপ্লবিককর্মে ব্রিটিশ সরকার চমকে যায়। এবং পুলিশ কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে। মামলায় ৪৫ জন গ্রেফতার এবং ১৫০ টি বাড়ি খানা তল্লাশ করা হয়। মামলার স্থান যদিও উত্তর ভারত এবং ষড়যন্ত্রে যদিও যুক্তপ্রদেশের কয়েকজন অবাঙালি সম্পৃক্ত ছিলেন; তবু প্রকাশ পায় যে, ওই বিপ্লব-ষড়যন্ত্রের প্রাণস্বরূপ ছিলেন অনুশীলন কর্মী ও বাঙালি বিপ্লবী যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। পুলিশী মামলার বিচারান্তে ঘোষিত রায়ে ইতোপূর্বেকার মামলার তুলনায় এই মামলায় অত্যন্ত কঠোর সাজা পরিদৃষ্ট হয়। দন্ডিত আসামীদের আদর্শ ও কর্মপন্থা সম্পর্কে কিছু বলা না হলেও তাঁদের কর্মফল, কর্মের শুভাশুভ, দুঃখকষ্ট প্রভৃতি অবিচলিতভাবে শেষ পর্যন্ত তাঁরা একনিষ্ঠতায় বরণ করে নেন; এটিও বাংলার বিপ্লব প্রচেষ্টার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।[৩৬৫]

কাকোরী ট্রেন ডাকাতি সম্পর্কে আরেকটি ষড়যন্ত্র মামলার সূত্রপাত হয়। পূর্বে কাশী ষড়যন্ত্র মামলায় দন্ড ভোগ করে মুক্ত থাকাকালীন শচীন্দ্রনাথ স্যানাল বাকুড়া ষড়যন্ত্র মামলার বিপ্লবাত্মক ইস্তাহার প্রচারে ব্যাস্ত থাকেন। এসময় ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের প্রথম ভাগে কলকাতায় পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। বাকুড়া ষড়যন্ত্র মামলায় ঘোষিত রায়ে শচীন্দ্রনাথ স্যানাল দুই বৎসর কারাদন্ড ভোগ করেন।[৩৬৬]

১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের ১০ নভেম্বর পুলিশ দক্ষিণেশ্বরে একটি বোমার কেন্দ্র খুঁজে পায়। এতে পুলিশী হানায় উভয় বাড়ি থেকে হিন্দুস্থান রিপাবলিক অ্যাসোসিয়েশন তথা যুগান্তর ও অনুশীলনের কতিপয় বিদ্রোহী কর্মী ধরা পড়লেও[৩৬৭] সূর্যকুমার সেন, যতীন দাস, বিশ্বনাথ মুখার্জি পালাতে সক্ষম হয়। এ দক্ষিণেশ্বর মামলায় দীর্ঘ মেয়াদে কারাদন্ডে দন্ডিত হন প্রমোদ রঞ্জনচৌধুরী, অনন্তহরি মিত্র, বীরেন্দ্র ব্যানার্জী, হরিনারায়ণ চন্দ, অনন্তকুমার চক্রবর্তী, রাখালচন্দ্র দে, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সুধাংশু শেখর চৌধুরী, ধ্রুবেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নিখিলবন্ধু বন্দোপাধ্যায়।[৩৬৮] দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলায় যারা সাজাপ্রাপ্ত বিপ্লবীরাই আলীপুর সেন্ট্রাল জেলে ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের ২৮ মে সি.আই.ডি. বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ভূপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়[৩৬৯] কে হত্যা করে। এ ঘটনায় ২৮ সেপ্টেম্বর প্রত্যুষে আলীপুর সেন্ট্রাল

জেলে অনন্তহরি মিত্র ও প্রমোদ রঞ্জনচৌধুরীর ফাঁসি কার্যকর হয়।[৩৭০] এই ফাঁসি স্বাধীনতা সংগ্রামীর এ মৃত্যুকে সমুজ্জ্বল করে তোলে। জাতি পায় বৈপ্লবিক স্পৃহা। কবি কাজী নজরুল ইসলামের ভাষায়:

ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান হে।
আসি অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা দিয়ে কোন বলিদান।[৩৭১]

১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে শাখারীটোলার বিচ্ছিন্ন বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা আশা সঞ্চার করা সত্ত্বেও চৌরীচোরার ঘটনায় আন্দোলন বন্ধ করে দেয়ায় বিপ্লবীরা বুঝতে পেরে যায় এইপথে স্বাধীনতা লাভের আশা সুদূর পরাহত।[৩৭২] এহেন ক্রান্তিকালে নতুন কৌশল সমন্ধে পর্যালোচনা শুরু হয়। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে জেলে আবদ্ধ মেদিনীপুর জেলের অভ্যন্তরে অনুশীলনের নরেন্দ্র সেন, রবিসেন, ত্রৈকল্যনাথ চক্রবর্তী মহারাজ, প্রতুল গাঙ্গুলি, সঙযুক্ত যুগান্তর দলের যদুগোপাল মুখার্জী, মনোরঞ্জন গুপ্ত, ভূপতি মজুমদার প্রমূখ প্রবীণ নেতারা স্থিরকরেন জেল থেকে মুক্তিলাভের পর বৈপ্লবিক সংস্থার লোকসংগ্রহ ব্যাপারে, অস্ত্রসংগ্রহ কার্যে, দেশীয় সৈন্যদলের ও বিদেশি রাষ্ট্রের সাহায্য লাভের জন্য নতুন উদ্যমে কাজ করা হবে। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সুযোগগ্রহণ ও অর্থসংগ্রহের নতুন কর্মনীতি নেয়। সর্বভারতীয় বিপ্লবের জন্য মিলিত ভাবে কাজের সিদ্ধান্ত হয়। জেলখানায় তরুণ রেভোল্টিং গ্রুপ এই সিদ্ধান্তের বাইরে থাকলেও ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের শেষভাগে কারাগার থেকে মুক্তিলাভের পর জেলের অভ্যন্তরে আসা ঐক্যমত্য অনুযায়ী প্রবীণ নেতৃবৃন্দের সাথে ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের কলকাতা কংগ্রেসে মিলিতভাবে কাজকর্ম আরম্ভ হয়।[৩৭৩]

ভারতবর্ষের ইতিহাসে ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দ রাজনৈতিক কারণে স্মরণীয়। কলকাতায় মতিলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে পার্ক-সার্কাস ময়দানে জাতীয় কংগ্রেসের বাৎসরিক সমাবেশে[৩৭৪] কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ স্বাধীনতার দাবি উত্থাপন না করার সিদ্ধান্ত নেয়। এতে অসন্তুষ্ট হয়ে বাংলার বিপ্লবীরা কংগ্রেসের মূল প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য অধিবেশনে অবিলম্বে সংশোধনী এনে ভারতের স্বাধীনতা প্রস্তাব উত্থাপনের দাবি জানায়। বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির তরুণ বিপ্লবী নেতা সুভাষচন্দ্র বসু স্বাধীনতার প্রস্তাব তুলতে রাজী না থাকলেও সত্যেন সেন প্রমূখ বিপ্লবী উদ্দীপ্ত করায় তিনি রাজী হন। তিনি জানতেন কংগ্রেসের কোনো নেতাই স্বাধীনতার দাবি সমর্থন করবেন না। অবশেষে মহাত্মা গান্ধী ও অন্যান্য নেতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সুভাসচন্দ্র বসু স্বাধীনতার সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ভোটাভুটিতে ১০০০ এর কিছু বেশি ভোটে স্বায়ত্বশাসনের প্রস্তাব পাস হয়। প্রায় ৯০০ভোট পেয়ে স্বাধীনতার প্রস্তাব পরাজিত হলেও বিপ্লবী বাংলার রুখে দাড়াবার শক্তি দেখে মহাত্মাগান্ধী ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ স্তম্ভিত হন ও বিস্ময় প্রকাশ করেন।[৩৭৫]

অধিবেশনে অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি দেশ প্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর *সর্বাধিনায়ক* (G.O.C.) সুভাষচন্দ্র বসু। একই সময়ে সর্বভারতীয় যুব কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। এতে

মূল কমিটির সভাপতি বোম্বাইয়ের নরিম্যান এবং অভ্যর্থনা কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর একটি নারীশাখা গঠিত হয়। এ নারী বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন লতিকা বসু। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বাংলার কংগ্রেস বিপ্লবীদের নিয়ন্ত্রণে এসে যায়। স্বভাবতই স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর নেতৃস্থানীয় পদে তাঁরাই (বিপ্লবীরা) আসীন হয়।আড়াই হাজারের অধিক বিপ্লবী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে যোগ দেয়। দলবৃদ্ধির কাজেও বিশেষ সুবিধা হয়। এবাহিনী স্বভাবতই সামরিক রীতিতে কতকগুলো বিভাগে বিভক্ত ছিল। তন্মধ্যে দক্ষিণকলকাতা বিভাগটি নিয়মানুবর্তিতা, সুশিক্ষা এবং কর্তব্য নিষ্ঠায় বিস্ময় সৃষ্টি করে। এই কৃতিত্ব মেজর সত্যগুপ্তের ও শহীদ যতীন দাশের প্রাপ্য।[৩৭৬]

গুপ্তসমিতির প্রবীণ নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্নদল একত্রিত হয়ে কলকাতা কংগ্রেসে কর্ম করে। কিন্তু কর্মভার নিয়ে বিভিন্ন দলের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিতে থাকে। আবার দলগত স্বাতন্ত্র ও স্বার্থবোধ আমদানি করে;মিলনপ্রয়াস আরম্ভ না হতেই আবার ব্যর্থহতে থাকে। নেতৃস্থানীয়দের অনেকের আন্তরিকতা থাকা সত্ত্বেও কারও কারও নেতৃত্বহানির আশঙ্কা এবং মিলন সত্ত্বেও বিভিন্ন গ্রুপের স্বতন্ত্র অনুভূতি সংস্থার মধ্যে কার্যকর থাকা এবং বিশেষ করে কোনো কোনো ব্যক্তির অনুদারতা ও অবিশ্বাসের দরুণ এই শুভ প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।[৩৭৭] এই ব্যর্থতা সত্ত্বেও বিপ্লবীদের সম্মিলিত প্রয়াসের কারণেই কলকাতা কংগ্রেসের এইঅধিবেশন খুবই তাৎপর্যবাহী। কেননা; প্রথমত: এ কংগ্রেসেই বিপ্লবীদের প্রতিনিধিরূপে সুভাষচন্দ্র বসু ভারতবর্ষের পূর্ণস্বাধীনতা দাবি করেন ;দ্বিতীয়ত: কংগ্রেসের এই স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীই হলো ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনের পূর্বপর্যন্ত সকল বৈপ্লবিক কর্মের প্রাণস্বরূপ। পার্ক-সার্কাস ময়দানের কর্নেল লতিকা বসু পরিচালিত নারী বাহিনী যেন আজাদ হিন্দ ফৌজের কর্নেল লক্ষ্মী'র নেতৃত্বাধীন ঝাঁসির রাণী বাহিনীর অঙ্কুর। এ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীই যেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর স্বাপ্নিক দুর্জেয় আজাদ হিন্দ ফৌজ (বাহিনী)।

কংগ্রেস সম্মেলনের সময়েই পাঞ্জাবের লাহোর থেকে আগত তরুণ ভগৎসিং ও বিপ্লবী রামশরণ দাশ কলকাতায় আসে। প্রতুল গাঙ্গুলীর উপস্থিতিতে ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী মহারাজের সাথে আলোচনার এক পর্যায়ে বোমা ও পিস্তল চায়। বিপ্লবী ভগৎসিং জানায় পাঞ্জাব অনেক পিছনে পড়ে আছে। তাঁর কথা ও আন্তরিকতায় মুগ্ধহয়ে বাংলার বিপ্লবীনেতা ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী মহারাজ কয়েকটা পিস্তল ও বোমা দিলেও রামশরণ দাশকে এগুলোর সত্ত্বর ব্যবহার করতে বারণ করা হয়। ভগৎসিং অস্ত্রশস্ত্র পেয়ে খুশি মনে পাঞ্জাবে ফিরে যায়।[৩৭৮]

১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের ০৮ এপ্রিল নব গঠিত *হিন্দুস্থান সোসালিস্ট রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন (আর্মি)* (Hindustan Socialist Republican Association) যা সংক্ষেপে *'এইচএসআরএ'* (HSRA) এর উদ্দেশ্য জনসম্মুখে জানানোর কৌশল হিসেবে এবং গণবিরোধী 'জন-নিরাপত্তা বিল' ও 'শিল্প-বিরোধ বিল'পাসের প্রতিবাদে ভগৎসিং ও বটুকেশ্বর দত্ত ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের অধিবেশন কালে পরিষদ গৃহে একটি বোমা নিক্ষেপ করে।[৩৭৯] কাউকে মারবার জন্য নয়; প্রতিবাদ হিসেবে নিক্ষেপ করেন বলে জানা যায়। তাঁরা ঘোষণা করে, সাম্রাজ্যলিপ্সু ব্রিটিশের আইন তাঁরা মানেন না। পালাবার চেষ্টাও করেনি। পুলিশ তাঁদের গ্রেফতার করে।[৩৮০] ভারতের বিপ্লবীদলের সঙ্গে সংযোগ থাকায় কলকাতা থেকে যতীন দাশকে ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের ১৪ জুন গ্রেফতার করে। তাকে লাহোর জেলে নেয়া হয় ১৬ জুন। ভগৎ সিং, রাজগুরু ও সুখদেবসহ যতীন দাশের তৃতীয় লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা শুরু হয়।[৩৮১]

ইতোমধ্যে জেলের ভয়ঙ্কর অবস্থার প্রতিবাদে বিচারাধীন বিপ্লবীদের দীর্ঘস্থায়ী অনশন-ধর্মঘটে আলোড়িত হয় গোটাদেশ। তাদেরকে অপরাধী নয়, রাজনৈতিক বন্দিগণ্য করার দাবিও জানায়।তাদের সমর্থনে দেশবাসী ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু লৌহদৃঢ় মানসিকতা সম্পুর্ণ যুবক যতীন দাশ ৬৪ তম দিনে ভগ্নদেহে ১৩ সেপ্টেম্বর মারা যায়। মৃতদেহবাহী ট্রেনটি লাহোর থেকে কলকাতার পথে যে স্টেশনেই থেমেছে সেখানেই হাজার হাজার লোক সমবেত হয়ে তাঁরপ্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছে। কলকাতায় ছ'লক্ষ লোকের দু'মাইল লম্বা মিছিল তাঁর শবদেহ অশ্রুসজল নয়নে হাওড়া থেকে কেওড়াতলা শ্মশানে নিয়ে গিয়েছিল বলে জানা যায়।[৩৮২] কিন্তু এমৃত্যুতে বিপ্লবীরা নেয় নতুন শপথ।কবি কাজী নজরুলের ভাষায়:

'যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল
আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ
ভীম রণভূমে রণিবেনা–
আমি বিদ্রোহী রণক্লান্ত,
সেই দিন হব শান্ত।'[৩৮৩]

স্পেশাল ট্রাইবুনালে তৃতীয় লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ০৭ অক্টোবর ভগৎ সিং, রাজগুরু ও সুখদেবের ফাঁসির রায় প্রকাশের পর দেশব্যাপী প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। বাধ্য হয়ে ফাঁসিরোধ কল্পে মহাত্মাগান্ধী ব্যস্ত হয়ে উঠেন। মহাত্মাগান্ধীই একদিন গোপীনাথ সাহার আত্মত্যাগ ও বীরত্বের প্রশংসায় সিরাজগঞ্জ প্রাদেশিক কংগ্রেস সভা প্রস্তাব গ্রহণ করায় ক্ষিপ্ত হন এবং কলকাতা সিটি করপোরেশনের অনুরূপ গৃহীত প্রস্তাব প্রত্যাহারে বাধ্য করেছিলেন। সেই মহাত্মাগান্ধী জনমতের চাপে এই ত্রয়ী বীরের আত্মত্যাগ ও বীরত্বের মর্যাদা দিতে বাধ্য হন। তাঁদের প্রাণরক্ষায় গান্ধী-অরউইন চুক্তির আলোকে রাজদরবারে আবেদন করেন; কিন্তু তা নাকচ হয়।[৩৮৪] ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের ২৩ মার্চ ভগৎ সিং, রাজগুরু ও সুখদেবের ফাঁসি কার্যকর হয়। প্রতিক্রিয়ায় সুভাষচন্দ্র বসু বক্তৃতা মঞ্চে অবিরত বলেন:

পদানত এই ভারতবর্ষ হাজার ভগৎ সিং চাইছে।[৩৮৫] অর্থাৎ ভারতের স্বাধীনতার জন্য আরও রক্তের প্রয়োজন। সায় দিয়ে জনতাও শহীদ ভগৎ সিং জিন্দাবাদ ধ্বনিতে মুখরিত করে তুলেছে ভারতে আকাশ বাতাস।

প্রবীণনেতাদের সমন্বিত কাজের ব্যর্থতার ধারাবাহিকতা তাঁদেরও অর্থাৎ বিদ্রোহী তথা অগ্রবর্তী দলকেও (Revolt/advance group) পেয়ে বসে। বাসনা ও কল্পনা সত্ত্বেও কার্যত পূর্বেকার সেই মামুলি প্রথা অস্ত্রসংগ্রহ, বোমা নির্মাণ, অন্যান্য সব কাজকর্ম,দল গড়ার চেষ্টা, পুলিশের খানাতল্লাশ,গ্রেফতার ও ষড়যন্ত্র মামলা পর্যন্তই গড়ায়।[৩৮৬] এসকল কার্যক্রমে জড়িতরা হলেন আত্মোন্নতি সমিতির সন্তোষ মিত্র প্রমুখের সঙ্গে অনুশীলন সমিতির সতীশ পাকড়াশী, নিরঞ্জন সেন, প্রতুল ভট্টাচার্য, যতীন দাশ ও বিনয় রায়। চট্টগ্রামের নগেন (জুলু) সেন ও গণেশ ঘোষ। মাদারীপুরের পঞ্চানন চক্রবর্তী, যতীন ভট্টাচার্য, অমলেন্দু দাশগুপ্ত, 'কালীপদ গুহ-রায়[৩৮৭] ও ফণী মজুমদার। যুগান্তর বরিশাল গ্রুপের রাখালদাশ প্রমুখ। তাঁদের প্রত্যাশা ছিল বিপ্লবী বাংলা তথা বিপ্লবী ভারতকে *বিকল্প নেতৃত্বের* (Alternative leadership) দিশা দান করা। কিন্তু তা কার্যকরী করা যায়নি।[৩৮৮] তবে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন এক ব্যতিক্রমধর্মী বৈপ্লবিক প্রয়াস।[৩৮৯] বলাবাহুল্য ইতোপূর্বে ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দেই সূর্য সেন কলকাতায় এসে গণেশ ঘোষকে *অগ্রবর্তীদলের* (Advance group) আওতা থেকে সরিয়ে চট্টগ্রাম নিয়ে যান এবং 'বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষের পরামর্শে[৩৯০] নগেন (জুলু) সেনকেও তিনি এ ব্যাপারে সাবধান করেন।[৩৯১]

বিপ্লবের একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ে যুগান্তর দলের বরিশাল শাখা, মাস্টারদা সূর্যসেনের চট্টগ্রাম দল, ঢাকা অনুশীলন, ময়মনসিংহ, বরিশাল, দক্ষিণ কলকাতা ও বহরমপুরের প্রধান অংশ অনতিবিলম্বে সংগ্রাম আরম্ভকরার জন্য অগ্রসর হয়। ঢাকার বেঙ্গল ভলান্টিয়ারর্স দলও সম্মিলিত সংগ্রাম্মুখ দলে শামিল হয়।[৩৯২] ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের প্রথমভাগে রংপুরে প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মেলনের সময় নিরঞ্জন সেন, চট্টগ্রামের অম্বিকা চক্রবর্তী, যতীন দাশ, বিনয় রায় এবং সতীশ পাকড়াশী মিলিত হন। আলাপ আলোচনায় বলা হয়, বাংলার দেখানো ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদের পুরানো অকেজোপন্থা এখনও অন্যান্য প্রদেশের আদর্শ। কিন্তু এবার উচ্চতরপন্থা প্রতিষ্ঠা সিদ্ধান্ত হয়। তিনটি জেলায় অস্ত্রাগার আক্রমণ করা হবে। ঢাকা ওকলকাতায় ছোট ছোট ঘাঁটি একই দিন ও ক্ষণে আক্রমণ করে অভ্যুত্থান ঘটানো হবে।[৩৯৩] ব্যক্তিগত বীরত্ব ও সশস্ত্র বৈপ্লবিক কর্মকর্মকান্ড না করে এবং দেশব্যাপী বড়ো রকমের বিপ্লবের অপেক্ষায় না থেকে ছোটো ছোটো বিদ্রোহাত্মক সংগ্রাম করত: সশস্ত্র বিদ্রোহের প্রতি জনগণের চিত্তকে আকৃষ্ট করার প্রেরণা ও কল্পনার স্বপ্ন তাদের মধ্যে দানাবাধে। সত্যি সত্যিই কোন বৈপ্লবিক কর্মকারন্ড

সামান্য কিছু সাফল্যলাভ করতে পারলে পুরাতন বিপ্লবীরাও একাজে শামিল হবেন; এই বিশ্বাস তাঁদের মধ্যে জাগরূক ছিলো।

১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে সুর্য সেন ও গণেশ ঘোষ কলকাতায় আসেন। সতীশ পাকড়াশী ও নিরঞ্জন সেনের মেছুয়া বাজারের বাসায় গোপন পরামর্শে অস্ত্রের চাহিদা পূরণ করত: যথাসম্ভব বিভিন্ন জেলায় একই সময়ে একযোগে সশস্ত্র বিদ্রোহাত্মক কার্য আরম্ভ করার সিদ্ধান্ত হয়। নভেম্বরের মধ্যেই বিদ্রোহাত্মক গোপন ইস্তাহার বিতরণ করে যুবকদের আসন্ন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে বলা হয়। কিন্তু ১৮ ডিসেম্বর রাত্রে পুলিশ কলকাতার মেছুয়া বাজারের বাড়ি ঘেড়াও করে। কাগজপত্র, বহু ঠিকানা, লাল ইস্তাহার, বোমা তৈরির ফরমুলাসহ সতীশ পাকড়াশী, নিরঞ্জন সেন ও রমেন বিশ্বাস ধরা পড়ে। ভোর বেলায় পুলিশ যখন খানা তল্লাশিতে ব্যস্ত তখন পূর্বের কথামত সুধাংশু দাশগুপ্ত বোমা ও রিভলবারসহ সেখানে উপস্থিত হয়ে গ্রেফতার হয়। কলকাতায় পরপর কয়েকটি বাড়ি ও কলকাতার বাইরে বিভিন্ন জেলায় খানা তল্লাশিতে বোমা তৈরির সরঞ্জামসহ বরিশালের পান্নালাল দাশগুপ্ত[৩৯৪] মুকুল সেন, শচীন কর, জগদীশ চ্যাটার্জি, খুলনার নির্মল দাশসহ ৩২ জন যুবকধরা পড়ে। মেছুয়া বাজার বোমা ষড়যন্ত্র মামলা হয়। অতঃপর ঘোষিত রায়ে সতীশ পাকড়াশী ও নিরঞ্জন সেনের ০৭ বৎসর দীপান্তর এবং সুধাংশু দাশগুপ্ত, রমেন বিশ্বাস প্রমুখের পাঁচবৎসর করে সশ্রম কারাদন্ডাদেশ হয়।[৩৯৫] এই মেছুয়াবাজার বোমা ষড়যন্ত্র মামলার সাথে সাথেই রিভোল্ট গ্রুপের কার্যক্রমের সমাপ্তি ঘটে[৩৯৬] মনে করা হলেও গোপনে প্রস্তুতিপর্ব সম্পূর্ণ হওয়ায় চট্টগ্রামের সুর্য সেন চঞ্চল হয়ে উঠেন।নিজস্ব বৈপ্লবিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে জোর কদমে এগিয়ে চলে চট্টগ্রাম ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি।[৩৯৭]

কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হতেই বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স ভেঙ্গে দেয়ার পরিবর্তে সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে সমগ্র বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে।শহর ও পল্লীর রাস্তাঘাটে সামরিক পোষাক পরিহিত যুবক দল নিয়মিত কুচকাওয়াচ করতে থাকে। বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সকে বাংলায় শক্ত করে গড়ে তোলার দায়িত্ব সবগুলো বিপ্লবী দলই অল্পবিস্তর গ্রহণ করায় এর ক্রমবর্ধমান প্রসার লক্ষ্য করা যায়। সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে গ্রুপইজম এর উর্ধ্বে উঠে একে সমগ্র বাংলায় একটি মুভমেন্টে রূপদিতে কৃতিত্ব প্রদর্শনকারীদের অন্যতম হলেন সত্যগুপ্ত, পঞ্চানন চক্রবর্তী, প্রতুল ভট্টাচার্য,জগদীশ চ্যাটার্জি, বিনোদ চক্রবর্তী, জ্যোতিষ জোয়ারদার, বিনয় বসু, দীনেশ গুপ্ত, ননী চৌধুরী, সৌরভ ঘোষ, লোকনাথ বল প্রমুখ বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ।[৩৯৮] এছাড়া ১৯২৮-২৯ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় যেসকল বিপ্লবী নেতা অপরিমেয় ত্যাগ, কষ্ট-সহিষ্ণুতা, ব্রিটিশের কঠোর কারাদন্ড ও অশেষ লাঞ্ছনার মাঝেও অটল থেকে খাঁটি জাতীয় আন্দোলনকারী হিসেবে সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করেন তাঁদের মধ্যে শ্রীমান নরেন সেন, মহারাজ

ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, প্রতুল গাঙ্গুলি, রবি সেন, রমেশ আচার্য্য, ডা. যাদুগোপাল মুখার্জি, সুরেন ঘোষ, মনোরঞ্জনগুপ্ত, ভূপেন দত্ত, সতীশ চক্রবর্তী, পূর্ণ দাশ, বিপিন গাঙ্গুলী, জ্যোতিষ ঘোষ, অনিল রায় প্রমূখ নেতৃবৃন্দের অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।[৩৯৯]

সুর্যকুমার সেন ও তাঁর সহকর্মীদের উদ্যোগে একদিকে যেমন চট্টগ্রামের কংগ্রেসের কাজ নতুন করে আরম্ভ হয়, তেমনি অপরদিকে কংগ্রেসের কাজের মাধ্যমে বহু যুবককে গোপন বিপ্লবী দলের সদস্য করা হয়। চট্টগ্রামের সর্বত্র যুবসমিতি ও শরীরচর্চার আখড়া স্থাপিত হয় এবং নানা কর্মকান্ডের একটি সুশৃঙ্খল বিপ্লবী দল গড়ে উঠে। তাঁরা বন্দুক ও রিভলভার ছোঁড়া এবং মোটরগাড়ি চালানোর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। স্বেচ্চাসেবক বাহিনীর আড়ালে বৈপ্লবিক বাহিনীটি প্রকৃতপক্ষে সেনাবাহিনীরূপে গড়ে উঠে। বিপ্লবী গণেশ ঘোষ ও অনন্ত সিংহ'র ওপর এই বৈপ্লবিক বাহিনীর পরিচালনার দায়িত্ব বর্তায়।[৪০০] চট্টগ্রাম শহরে এবং গ্রামে গ্রামে ক্রমশ এবাহিনী প্রসারিত হতে থাকে।

১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম চট্টগ্রাম এসে বিপ্লবী তরুণদের মনে আরও উদ্দীপনা তৈরি করেন।[৪০১] কবি নজরুল অত্যন্ত সংগোপনে চট্টগ্রামের গহীণ অরন্যে এই বিপ্লবী তরুণদের প্রশিক্ষক হিসেবে বিভিন্ন সমরাস্ত্র প্রশিক্ষণ দেয়া শুরু করেন। তিনি সেনাবাহিনীতে থাকাকালীন অর্জিত সমরাস্ত্র প্রশিক্ষণের সকল কৌশল বিপ্লবী তরুণদের শিক্ষা দান করেন। এই বৈপ্লবিক প্রশিক্ষণে চট্টগ্রাম বিপ্লব এক অনন্য উচ্চতায় উন্নীত হওয়ার পথ সুগম করে।[৪০২] বৈপ্লবিক প্রয়োজনে কবি নজরুল সাংস্কৃতিক সভা-সমাবেশের আড়ালে চট্টগ্রাম ও কমিল্লায় বহুবার যাতায়াত করেছেন। কিন্তু ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে সূর্য সেনের ফাঁসির পরে তিনি আর কোনো দিন চট্টগ্রাম আসেননি মর্মে তথ্য পাওয়া যায়।

এদিকে ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে সর্য সেন চট্রগ্রাম জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হলে কংগ্রেস অফিসকে কেন্দ্র করেই তাঁর যাবতীয় কর্মকান্ড পরিচালিত হতে থাকে। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের ১১ থেকে ১৩ মে অনুষ্ঠিত চট্টগ্রাম কংগ্রেসের সম্মেলনে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু বলেন, অন্যান্য জাতির ন্যায় স্বাধীন হওয়াই আমাদের প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য।[৪০৩] এবং 'স্বাধীনতা পাবার পূর্বে সর্বসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে হবে। তবেই আমাদের আশা পূরণ হবে। সময় অতি অল্প, বৃথা সময় নষ্ট করা চলবে না।[৪০৪] বলে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন। বিপুল উপস্থিতির এই সম্মেলনে বিদেশি দ্রব্য বয়কটের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

ইতোমধ্যে ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের ১৩ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামে অতিপরিচিত কলকাতার বিপ্লবী যতীন দাশ দীর্ঘ ৬৪ দিন অনশন করে লাহোর কারাগারে বরণ করেন। মৃত্যুর এই ঘটনা চট্টগ্রামে স্ফুলিঙ্গ তৈরি করে। তাঁর মৃত্যুর প্রতিবাদে ১৫ সেপ্টেম্বর গণেশ ঘোষ, অম্বিকা চক্রবর্তী, অনন্ত সিংহ, লোকনাথ বল, নির্মল সেন, তারকেশ্বর দস্তিদার, নরেশ রায়, ত্রিপুরা সেন ও সূর্য সেন প্রমুখের নেতৃত্বে এক বিরাট শোক মিছিল বের হয়।[৪০৫] ১৯১৪ খ্রি. থেকে ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাধ্যতাতামূলক সম্মুখ সংঘর্ষ পর্বে বিপ্লবীরা গণসংযোগ পরম নিষ্ঠার সঙ্গেই শুরু করেছিলেন বলে প্রতিভাত হয়। তবে একথা সত্যি যে, ১৯১৯ থেকে ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সশস্ত্র বৈপ্লবিক কর্মতঃপরতা অনেকেটা স্তিমিতি হয়ে আসে। মূলত এ সময়ে বিপ্লবীদের একটি অংশ কংগ্রেসের গণসংযোগের কর্মসূচিকে বৈপ্লবিক প্লাটফর্ম হিসেবে ব্যবহার করে; অপরাংশ আশু সশস্ত্র বৈপ্লবিক তৎপরতার নীরব প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে। এ সময়ে সশস্ত্র বৈপ্লবিক তৎপরতা একেবারেই স্তিমিত ছিল তেমন নয়; মাঝে-মধ্যেই বিচ্ছিন্ন সশস্ত্রবৈপ্লবিক তৎপরতার চমক দেখা গেছে।

বিপ্লবী সূর্যকুমার সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম যুববিদ্রোহ ও চট্টগ্রামের স্বাধীনতা ঘোষণার মাধ্যমে তৃতীয় স্তর বা খন্ড অভ্যুত্থান পর্বেও শুভ সূচনা ঘটে। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে মহাত্মাগান্ধীর নেতৃত্বে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়। কংগ্রেসের কর্মসূচি হিসেবে ২৬ জানুয়ারি স্বাধীনতা দিবসে বন্দেমাতরম ও ইনকিলাব জিন্দাবাদ শ্লোগানের মুর্চনায় কংগ্রেসের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। এদিন কামানের পরিবর্তে একুশটি দেশি বোমা ফাটানো হয়। গণেশ ঘোষের নেতৃত্বে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী কুচকাওয়াজ করে।[৪০৬] চলমান আইন অমান্য আন্দোলনের ছত্রছায়ায় জনগণ ও পুলিশ উভয়েরই নজর এড়িয়ে বিপ্লবীদের গোপন বৈপ্লবিক কর্মকান্ড জোরকদমে এগিয়ে চলে।

মহাত্মাগান্ধী স্বয়ং ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের মার্চে গুজরাটের উপকূলে স্বহস্তে লবণ তৈরি করে আইন অন্য আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু ও যতীন্দ্রমোহন সেন গ্রেফতার হন। জনসাধারণ হরতাল ও ধর্মঘটের মাধ্যমে উত্তপ্ত হয়ে উঠে।[৪০৭] ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন ব্যর্থ হয়ে যাওয়ায় বিপ্লবী যুব সম্প্রদায় অস্থির হয়ে উঠে। প্রবীণেরা দল সামলাবার জন্য অগ্রসর হবার কথা ভাবলেও কিছু একটা করে নিঃশেষ হওয়ার চাইতে তাঁরা নিষ্ক্রিয় থাকাই শ্রেয় মনে করেন। কিন্তু চট্টগ্রামের সুর্যকুমার সেনের দল সবার অলক্ষ্যে পূর্ণ প্রস্তুতির পথে এগিয়ে যায়।[৪০৮] চট্টগ্রাম জেলা প্রায় তাঁদের আয়ত্ত্বে থাকায় প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করা এবং গোপনঘাঁটি ঠিক করা সম্ভভ হয়। বৈপ্লবিক অর্থভান্ডারে প্রায় অর্ধ লক্ষ টাকা জমা হয়।

১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের আইন অমান্য আন্দোলনের এক পর্যায়ে ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতার উপাসক ও বিপ্লবী নায়ক সুর্য সেনের নেতৃত্বে ১৩ এপ্রিল[৪০৯] চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা বৈঠকে বসে।[৪১০] কাঙ্ক্ষিত বিপ্লবের দিন স্থির হয় ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ১৮ এপ্রিল, শুক্রবার রাত দশ ঘটিকা। ঐদিন ছিলো গুড *ফ্রাইডে* (Good Friday)[৪১১] আইরিশ প্রজাতন্ত্রী বাহিনীর ইস্টার বিদ্রোহের স্মরণে এদিন ধার্য করা হয়।[৪১২] ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ কবলিত আয়ারল্যান্ড দীর্ঘদিন যাবৎ স্বাধীনতার লড়াই চালিয়ে ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের ২৪ এপ্রিল, ইস্টার উৎসবের দিনে ডাবলিন শহরে মুক্তিকামী আইরিশ বিপ্লবীরা যে সশস্ত্র বিদ্রোহের সূচনা করেছিলেন, সেই বজ্রগর্ভ আন্দোলনে ব্রিটিশ প্রশাসন দুর্বল হয়ে যায়।[৪১৩] ব্রিটিশ ভারতের বৈপ্লবিক ইতিহাসে দিনটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইতোপূর্বে বহুবৈপ্লবিক পরিকল্পনা হয়; কিন্তু কোনো পরিকল্পনাই আলোর মুখ দেখে নাই। সেজন্য তাঁরা 'ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সামরিক শক্তিকেও যে সশস্ত্রপন্থায় চ্যালেঞ্জ জানানো সম্ভব;তা প্রয়োগিকভাবে করে দেখানোর জন্য ছোটো পরিসরে হলেও বিদ্রোহ পরিকল্পনা সংগঠিত ও তা বাস্তবে রূপদানের কাজে নেমে পড়েন।[৪১৪]

চট্রগ্রামের আসন্ন বিদ্রোহাত্মক কাজের জন্য একটি বৈপ্লবিক কর্মপরিকল্পনা করা হয়। পরিকল্পনাটি এইরূপ; **১.** সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর ঘাঁটি ও ঘাঁটির অস্ত্র-শস্ত্র দখলকরা; **২.** চট্টগ্রামে অবস্থিত সৈন্য বাহিনীর ঘাঁটি বিধ্বস্ত করা এবং ঘাঁটির অস্ত্রশস্ত্র দখল করে সেগুলো পুলিশ ঘাঁটিতে নিয়ে আসা; **৩.** চট্টগ্রামের সাথে ঢাকা ও কলকাতার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করার জন্য শহরের টেলিফোন-এক্সচেঞ্জ ধ্বংস করা; **৪.** চট্টগ্রামের সাথে বাইরের রেল ও টেলিফোন-সংযোগ নষ্ট করা; **৫.** পাহাড়তলি ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণ করে ইংরেজদের বন্দি করা।[৪১৫]

বৈঠকে সূর্যকুমার সেন বিপ্লব বাহিনীর সর্বাধিনায়ক এবং নির্মল সেন, লোকনাথ বল, অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ, অম্বিকা চক্রবর্তী ও উপেন ভট্টাচার্য ওয়ার কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হন। বাহিনীর নাম রাখা হয় *ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি* (Indian Republican Army)। সভায় বিশ্বস্ত কর্মীদের উপস্থিতিতে দায়িত্বভার সর্ব সম্মতভাবে কয়েকটি উপদলে বিন্যস্ত করা হয়; (ক) অনন্ত সিংহ ও গণেশ ঘোষের নেতৃত্বে পুলিশ বাহিনীর ঘাঁটি ও ঘাঁটির অস্ত্রশস্ত্র দখল করা; (খ) নির্মল সেন ও লোকনাথ বলের নেতৃত্বে চট্টগ্রামের সাথে বাইরের রেললাইন ও টেলিফোন-সংযোগ নষ্ট করা; এবং (গ) অম্বিকা চক্রবর্তীর নেতৃত্বে টেলিফোন-এক্সচেঞ্জ ধ্বংসের দায়িত্ব বর্তায়।

বৈঠকে স্থির হয়, এই তিনটি উপদল একই সময়ে তিনটি মোটর গাড়িতে যথাস্থানে পোঁছে আক্রমণ চালাবে। এছাড়া ৩০ সদস্যের একটি পদাতিক বাহিনী পুলিশ বাহিনীর ঘাঁটির নিকটে এক গুপ্তস্থানে

অপেক্ষমান থাকবে। সংকেত পেলেই তারা বিপ্লবীদের সাহায্যার্থে এগিয়ে যাবে। অপর একটি মোটরে রক্ষীদলসহ সর্বাধিনায়ক সুর্যকুমার সেন পুলিশবাহিনীর ঘাঁটির নিকটবর্তী সুবিধাজনক স্থানে সংগোপনে অপেক্ষা করবেন। এই নির্দেশিত স্থানটিই হবে সর্বাধিনায়কের হেডকোয়ার্টার। বিদ্রোহাত্মক মিশন সমাপ্ত করে উপদল-গুলোকে সর্বাধিনায়কের দপ্তরে রিপোর্ট করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।[৪১৬]

পূর্বপরিকল্পনা মতো বিপ্লবের সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন ও করণীয় বিশ্লেষণ সাপেক্ষে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ১৮ এপ্রিল সন্ধ্যায় *ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মির* (Indian Republican Army) পক্ষে একটি ঘোষণা-পত্র চট্টগ্রাম শহরে বিলি করে বিপ্লবীরা ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রাম ঘোষণা করে। ঘোষণা-পত্রে ভারতের স্বাধীনতা পুন.প্রতিষ্ঠার জন্য সশস্ত্রসংগ্রাম আরম্ভ করার কথা ঘোষণা করা হয়। রাত দশটায় চট্টগ্রামের কংগ্রেস অফিস ও গণেশ ঘোষের দোকান থেকে বিপ্লবীরা চারটি উপদলে বিভক্ত হয়ে নিজ নিজ গন্তব্য পথে অগ্রসর হয়। ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করার ভার যে উপদলের ওপর ছিল তারা অকুস্থলে যেয়ে ক্লাবটি ফাঁকা পায়। এমতাবস্থায় উপদলটি দুইভাগে বিভক্ত হয়ে একভাগ পুলিশ অস্ত্রাগার লুণ্ঠনরত উপদলের সাথে এবং অপরভাগ সৈন্যবাহিনীর অস্ত্রাগার লুণ্ঠনরত উপদলের সাথে যোগদান করে[৪১৭] দেশ প্রেমের অনুপম স্বাক্ষর রাখে।

শহরের প্রান্তে ডামপাড়ায় অবস্থিত পুলিশ লাইনের অস্ত্রাগার আক্রমণকালে এক রক্ষী রাধা দিতে এসে নিহত হয়। অপরাপর রক্ষীরা পালিয়ে প্রাণে রক্ষা পায়।[৪১৮] প্রায় বিনা বাধায় নিয়ন্ত্রণ এসে গেলে পুলিশ অস্ত্রাগারগারকে বিপ্লবীরা *হেডকোয়ার্টারে* (Headquarter) পরিণত করে।[৪১৯] রেলওয়ে সামরিক অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে দায়িত্বপ্রাপ্ত উপদলটি সশস্ত্রাবস্থায় অকুস্থলে এসে প্রধান ফটকের দিকে অগ্রসর হয়। বাধা দিতে এসে সেখানকার রক্ষী এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত *মেজর ফারেল* (Major Farrell) প্রাণ হারায়।[৪২০] অতঃপর বিপ্লবীরা অস্ত্রাগারের ফটক ভেঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করে একটি লুইসগানসহ অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র হাতিয়ে নেয়। কিন্তু দ্রুততার সাথে কাজ করতে যেয়ে সংগৃহীত অস্ত্রের গোলাবারুদ অন্যকক্ষে থাকায় সেগুলো সংগ্রহ করতে তারা ভূলে যায়। এই ভুলের জন্য সংগৃহীত রাইফেলগুলি ও লুইসগানটি ব্যবহার করা যায়নি। লুণ্ঠন চলাকালে ঐপথ অতিক্রমকারী ম্যাজিস্ট্রেটের গাড়ি বিপ্লবীদের গুলিবর্ষণের কবলে পড়ে এবং এতে একজন কনস্টেবল নিহত হয়। অস্ত্রাগারটিতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে লুণ্ঠিত অস্ত্রশস্ত্রসহ পুলিশ লাইনের দিকে রওয়ানা দেয়।ইতোমধ্যে ব্যারাক থেকে বিপ্লবীদের ওপর আক্রমণ হলেও প্রতিআক্রমণের মাধ্যমে তা প্রতিহত করে তারা পুলিশ লাইনে পৌঁছুতে সক্ষম হয়।[৪২১]

টেলিফোন সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার দায়িত্বপ্রাপ্ত উপদল টেলিগ্রাফ এবং টেলিফোন অফিসে যায় এবং রিভলভার দেখিয়ে ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে সরিয়ে হাতুরির সাহায্যে *এক্সচেঞ্জ বোর্ড* (Exchange Board) কে ভেঙ্গে চুরমার করে বাইরের সাথে যোগায়োগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। টেলিগ্রাফ সুপারিন্টেন্ডেন্ট বন্দুক নিয়ে ছুটে আসে কিন্তু বিপ্লবীদের গুলিবর্ষণে তিনি পিছু হটেন।[৪২২] ওদিকে চট্টগ্রাম শহর থেকে পঞ্চাশ মাইল দুরে ধুম এবং লাঙ্গল কোটের মাঝামাঝি জারাগঞ্জের সন্নিকটে রেল-লাইন উপড়ে ফেলা হয় এবং একখানা মালগাড়ি লাইনের ওপর পড়ে যাওয়ায় রেলগাড়ি চলাচল রুদ্ধ হয়।[৪২৩] অপারেশন শেষ করে উপদলগুলোর বিপ্লবীরা দ্রুত পুলিশ লাইনে স্থাপিত হেডকোয়ার্টারে প্রত্যাবর্তন করে। দ্রুততম সময়ের মধ্যে পুলিশ অস্ত্রগার হতে সংগৃহীত মাস্কেট বন্দুক চালানোর কৌশল সকল বিপ্লবীকে শিক্ষা দেয়া হয়।[৪২৪]

পুলিশ অস্ত্রগারের বাইরে উপদলগুলো পরিকল্পনা মতো ৬০ জন বিপ্লবী সামরিক কায়দায় সারিবদ্ধভাবে দন্ডায়মান হয়। বন্দেমাতরম ও ইনকিলাব জিন্দাবাদ ধ্বনির মাধ্যমে সূর্যকুমার সেনকে প্রেসিডেন্ট করে ভারতের অস্থায়ী স্বাধীন সরকার ঘোষণা করা হয়। ধবধবে সাদা খাদি ধুতি, লংকোট ও কড়া ইস্ত্রীকৃত গান্ধী টুপি পরা সূর্যকুমার সেন বিপ্লবীদের অভিবাদন গ্রহণ করেন।[৪২৫] চট্টগ্রামের বিজয় গৌরব সারা বাংলায় ছড়িয়ে দেওয়া এবং এ আদর্শে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করাই এই সরকারের লক্ষ্য হয়ে দাড়ায়।[৪২৬] চট্টগ্রাম বিপ্লবীদের করায়ত্বে আসার পরে চট্টগ্রামের সকল ইংরেজ পরিবার সমুদ্রগামী এক জাহাজে আশ্রয়গ্রহণ করে।[৪২৭] পরাধীনতার অর্গল ছিন্ন করে বিপ্লবীরা স্বাধীনতার পরশ অনুভব করে। পৃথিবীর সমস্ত মাধুর্য, সমস্ত পবিত্রতা দিয়ে বুঝি গড়ে উঠেছিল সে অনুভূতি।

১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ১৮ এপ্রিল রাত প্রায় ১২ ঘটিকার সময় বাংলা পুলিশের ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল ফারমার, চট্টগ্রামের পুলিশ-সুপারিন্টেন্ডেট *জনসন* (Johonson) ও সহকারী পুলিশ-সুপারিন্টেন্ডেট এবং *বারক্লাফ* (Barclays) নামের সৈন্যবাহিনীর একজন অফিসার একত্রে পরামর্শক্রমে চট্টগ্রাম বন্দরের জেটির অস্ত্রগার হতে একটি মেশিনগান সংগ্রহ করে। এবং একটি উচুপানির ট্যাংকের উপর উঠে বিপ্লবীদের ওপর মেশিনগান হতে অবিরাম গুলিবর্ষণ আরম্ভ করে। বিপ্লবীরাও মাস্কেটবন্দুক হতে পাল্টা প্রত্যাঘাত করার পরেও তারা গোলাগুলি অব্যাহত রাখায় বিপ্লবীরা পিছন হটার সিদ্ধান্ত নেয়। এবং পুলিশ ব্যারাকে আগুন লাগানোর সময় বিপ্লবী হিমাংসু সেন সাংঘাতিক রূপে অগ্নিদগ্ধ হয়। তাঁর চিকিৎসার উদ্দেশ্যে সরে পড়ায় অনন্ত সিংহ ও গণেশ ঘোষ মূল দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।[৪২৮]

ইতোমধ্যে চট্টগ্রামের পোতাশ্রয়ের একটি জাহাজের বেতার মারফৎ এ অভ্যুত্থানের সংবাদ কলকাতা ও অন্যান্য স্থানে পাঠানো হয়। আতঙ্কে দিশাহারা হয়ে সরকার চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে দলে দলে সৈন্য পাঠাতে থাকে।সুর্য সেনের নেতৃত্বে মোট ৫৭ জন বিপ্লবী[৪২৯] ১৯এপ্রিল সুলক বাহার ও পরের দিন ফতেহাবাদ পাহাড় হয়ে জালালাবাদ পাহাড়ে উপনীত হয়।[৪৩০] এদিকে ২২ এপ্রিল দুপুরের পর কয়েক হাজার সৈন্য জালালাবাদ পাহাড়ে তাদের ঘিরে ফেলে এবং বিকেল ০৫ ঘটিকার সময় পাহাড়ের নীচ থেকে পুলিশ আক্রমণ আরম্ভ করে। বিপ্লবীরাও পাল্টা জবাব দেয়। পুলিশ রাত্রি ০৮ ঘটিকার সময় পিছু হটে। প্রচন্ড লড়াইয়ে ৮০ জনেরও বেশি ব্রিটিশ সৈন্য নিহত ও প্রায় ১৫০ জন আহত হয়। এদিন ১২ জন[৪৩১] বিপ্লবী মারা যায়। ২৩ এপ্রিল সরকার পক্ষ উড়োজাহাজ হতে বিপ্লবীদের ওপর বোমা ও মেশিনগানের সাহায্যে গুলিবর্ষণের উদ্যোগ নেয়। কিন্তু তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।[৪৩২]

এ বৈপ্লবিক সাফল্যে উদ্দীপ্ত হয়ে সুর্যকুমার সেন আশে পাশের গ্রামগুলোতে আশ্রয় নিয়ে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে সরকারি কর্মচারি ও তাদের সম্পত্তির ওপর গেরিলা পদ্ধতিতে আক্রমণ পরিচালনা সিদ্ধান্ত হয়। গ্রামবাসীদের অধিকাংশই ছিল মুসলমান। প্রচন্ড দমনপীড়ন ও বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের সম্মিলিত অভিযান সত্ত্বেও গ্রামবাসীরা পলাতক বিপ্লবীদের খাদ্য ও আশ্রয় দেয়ায় তিন বৎসর জেলের বাইরে থাকার সুযোগ পায়।[৪৩৩] এদিকে ২৩ এপ্রিল অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ, জীবন ও আনন্দ পলায়নের উদ্দেশ্যে ফেণী রেল-স্টেশনে পুলিশের কবলে পড়ে। গুলিবর্ষণ[৪৩৪] করে গ্রেফতার এড়িয়ে কলকাতা যুগান্তর কেন্দ্রে পৌঁছাতে সক্ষম হয়। সূর্যকুমার সেন আশ্বস্ত হয়ে লোকনাথ বলকে তাদের সাথে মিলিত হওয়ায় নির্দেশ দেয়ায় সেও গোপনে কলকাতায় পৌঁছে যায়।[৪৩৫] এই ঘটনার কয়েকদিন পর বিপ্লবী ফকির সেন গ্রেফতার হলে তাঁর নিকট থেকে পুলিশ সকল তথ্য জেনে যায়।[৪৩৬]

গেরিলা যুদ্ধের সিদ্ধান্ত[৪৩৭] অনুসারে ০৬ মে তারিখে বিপ্লবীদের একটি দল ইংরেজ কর্মচারীদের বাসভবন আক্রমণের উদ্দেশ্যে কর্ণফুলী নদী পাড় হয়ে কালারপোল পৌঁছামাত্র পুলিশ তাঁদের লক্ষ্য করে গুলি চালায়। বিপ্লবীরাও পাল্টা আক্রমণ চালায়। খন্ডযুদ্ধে চার জন বিপ্লবী যথাক্রমে স্বদেশ রায়,রজত সেন, মনোরঞ্জন সেন ও দেবপ্রাসাদ গুপ্ত নিহত হয় এবং সুবোধ চৌধুরী ও ফণী নন্দী পুলিশের হাতে বন্দি হয়।[৪৩৮]

এদিকে অনন্ত সিং বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে ২৮ জুন স্বেচ্ছায় কলকাতা পুলিশের নিকট ধরা দিলে তাঁকে চট্টগ্রামে পাঠানো হয়। অস্ত্রগার-লুন্ঠন ও সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অভিযোগে ত্রিশজনকে আসামী করে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ২৪ জুলাই মামলা আরম্ভ হয়। কলকাতা গোয়েন্দা পুলিশ খবর পেয়ে পুলিশ কমিশনার

টেগার্ট (Sir Charles Agustus Tegart) একদল সশস্ত্রপুলিশ নিয়ে ০১ সেপ্টেম্বর মাঝরাতে চন্দন নগরের একটি বাড়ি ঘেড়াও করে। সংঘর্ষে জীবন ঘোষাল প্রাণ হারায়। গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল, অন্নদাগুপ্ত ও আনন্দকে গ্রেফতার করে চট্টগ্রামে প্রেরণ করে চলমান মামলার আসামী করে।[৪৩৯]

১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ০১ মার্চ এই মামলার ঘোষিত রায়ে অনন্ত সিংহ, লালমোহন সেন, সুবোধ রায়, রণধীর দাশগুপ্ত, সুবোধ চৌধুরী, ফণীন্দ্র নন্দী, সহায়রাম দাশ, গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল, সুখেন্দু দস্তিদার, ফকির সেন ও আনন্দ গুপ্তের যাবজ্জীবন দীপান্তর হয়।[৪৪০] অনিল বসু ও নন্দন সিংহকে বোস্টাল জেলে যথাক্রমে তিন ও দুই বৎসর রাখার আদেশ হয়। নিতাই ঘোষ, শান্তিনাগ, অশ্বিনী চৌধুরী, ননী দেব, মলিন ঘোষ, শ্রীপতি চৌধুরী, সুকুমার ভৌমিক, হীরালাল বল, বিজয় সেন, আশুতোষ ভট্টাচার্য এবং বীরেন দস্তিদারকে মুক্তি দেয়া হয়। কিন্তু বঙ্গীয় অর্ডিন্যান্স অনুসারে আবার তাঁদের আটক করা হয়।[৪৪১]

এদিকে সূর্যকুমার সেনের নির্দেশে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ০১ ডিসেম্বর চট্টগ্রাম ছেড়ে যাওয়া পুলিশের বড় কর্তা মি. ক্রেগ ভ্রমে চাঁদপুরের ইন্সপেক্টর তারিণী মুখার্জিকে রিভলভারের গুলিতে হত্যা[৪৪২] এবং ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম জেলখানার প্রাচীর ভেঙ্গে বন্দীদের মুক্তি ও আদালতগৃহ উড়িয়ে দেয়ার এক পরিকল্পনা হয়। জেলের ভিতরে কিছু অস্ত্রশস্ত্র ও বিস্ফোরক দ্রব্য ও শহরের বিভিন্ন জায়গায় মাটির নীচে ডিনামাইট আবিষ্কৃত হলে ০৮ জন বিপ্লবীকে অভিযুক্ত করে স্বতন্ত্র ডিনামাইট মামলা দায়ের করা হয়। ঘোষিত বিচারের রায়ে আসামীদের কারো কারো তিন বৎসর ও ০৬ মাসের সাজা হয়।[৪৪৩] একই বছরের ৩০ আগস্ট চট্টগ্রাম গোয়েন্দা বিভাগের অফিসার আহসান উল্লাহ খেলারমাঠে পুরস্কার বিতরণীর পরে প্রকাশ্য দিবালোকে বিপ্লবী হরিপদ ভট্টচার্যের গুলির আঘাতে প্রাণ হারায়।[৪৪৪]

১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে জুন মাসে বিপ্লবী নায়ক সূর্যকুমার সেন কয়েকজন সঙ্গীসহ চট্টগ্রামের ধলঘাট গ্রামে একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহে আত্মগোপনে থাকা অবস্থায় পুলিশ বাড়িটি ঘিরে ফেলে। পুলিশ তাঁদের লক্ষ্য করে মেশিনগানের গুলি ছোড়ে। বিপ্লবীরাও রিভলবার দিয়ে পুলিশের ওপর গুলি চালায়। এসময় উভয়পক্ষের গোলাগুলিতে পুলিশ অফিসার *ক্যামেরুন* (Captain Cameroon) সহ বিপ্লবী নির্মল সেন ও অপূর্ব সেন নিহত হয়। সূর্যকুমার সেন ও প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার পুলিশের চক্ষু এড়িয়ে সরে যেতে সক্ষম হয়।[৪৪৫] এদিকে ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ২৪সেপ্টেম্বর সূর্যকুমার সেনের পরিকল্পনায় প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের নেতৃত্বে বোমা ও পিস্তল নিয়ে পাহাড়তলী রেলওয়ে ক্লাব আক্রান্ত হলে উভয়পক্ষে গুলি চলে। এই ঘটনায় *মিসেস সুলিভান* (Mrs. Sullivan) নিহত এবং আরও ১০/১২ জন আহত হন। প্রীতিলতা গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে ফিরবার সময় ১০০ ফুট দূরে এসেই পড়ে যান। ঘটনাস্থলেই পটাসিয়াম

সায়ানাইড পান করে তিনি আত্মহত্যা করেন। প্রীতিলতার লাশ ব্যতীত অন্যকোন বিপ্লবীকে পুলিশ ধরতে না পারায় কোন মামলা রুজু করতে পারে নাই।[৪৪৬] বৈপ্লবিককর্মে কোন নারীর নেতৃত্বদানের ঘটনা ঘটিয়ে চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা ইতিহাস সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। কবি নজরুলের ভাষায় ধ্বনিত হয়;

বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি
চির কল্যাণকর,
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী,
অর্ধেক তার নর।' [৪৪৭]

সূর্যকুমার সেন ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের ১৬ফেব্রুয়ারি গোপন আস্তানা থেকে সহকর্মী তারকেশ্বর দস্তিদার, শান্তি চক্রবর্তী, মণি দত্ত, কল্পনা দত্ত, সুশীল দাশগুপ্ত, ব্রজেন সেন প্রমুখের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বের হয়। সংবাদ পেয়ে পুলিশ ও সশস্ত্র বাহিনী রাত্রি ১০ টায় গৈড়লা গ্রামের গোপন আস্তানা ঘেড়াও করে। সবাই সরে পড়লেও সূর্যকুমার সেন ও ব্রজেন সেন গ্রফতার হয়। কল্পনা দত্ত ও তারকেশ্বর দস্তিদার তিনমাস পরে ধরা পড়ে। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের ১৪ আগস্ট স্পেশাল ট্রাইবুনাল প্রদত্ত রায়ে তারকেশ্বর দস্তিদার ও সূর্যকুমার সেনের ফাঁসি এবং কল্পনা দত্ত'র দীপান্তর আদেশ হয়। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের ১২ জানুয়ারি উভয়ের ফাঁসি কার্যকর হয়।[৪৪৮] এ প্রাণবিসর্জনের আর্তনাদ বিমূর্ত হয়ে ওঠে কবি কণ্ঠে:

স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায়?
দাসত্বশৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে,
কে পরিবে পায়।'[৪৪৯]

বাঙালি জাতির সম্মুখে এ প্রশ্ন ঘুর্ণায়মান হতে থাকে। চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার আক্রমণের ঘটনা সম্পর্কে বিপ্লবী সতীশ পাকড়াশীর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি উল্লেখ করেছেন, বিশ শতকে ভারতে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম পরিকল্পিত সশস্ত্র বিদ্রোহ। পঁচিশ বৎসর ধরে বাংলায় বিপ্লবী দলের যে সশস্ত্র সংগ্রাম চলছিল তার চরম উৎকর্ষ চট্টগ্রামের এই অভ্যুত্থান। এর বীরত্ব,রণকৌশল ও কর্মোদ্যোগ অতি অপূর্ব। শহর দখল করার পর প্রবল শত্রুপক্ষের প্রতি-আক্রমণের মুখে পাহাড় অঞ্চলে বিপ্লবী বাহিনীর সরে পড়া, সুশৃঙ্খলভাবে জালালাবাদ পাহাড়ে ইংরেজ সেনাদলের বিরুদ্ধে যুদ্ধকরে বিপ্লবী যুবকদের মৃত্যুবরণ, গেরিলা পদ্ধতিতে লড়াই করার পণ নিয়ে অধিনায়কের নির্দেশে শৃঙ্খলার সাথে বিভিন্ন স্থানে ছোট ছোট দলে ছড়িয়ে পড়া-এ সবই অপূর্ব নিষ্ঠা,দৃঢ়তা ও দেশপ্রেমের পরিচায়ক। দুর্গম পথের ক্লান্তি, ক্ষুধা,তৃষ্ণা ও অনিদ্রা তাদের মনোবল হ্রাস করতে পারে নাই। চট্টগ্রামের ছোট্ট একটি বিপ্লবী দলের উদ্যোগে এ অভ্যুত্থান; বাংলা তথা ভারতবর্ষ এ সংগ্রামী গৌরবের উত্তরাধিকারী। গুলিতে, ফাঁসিতে যারা মরে গেলেন; সেই মৃত্যুঞ্জয়ী যোদ্ধাদের স্মৃতি জাতিকে উজ্জীবিত রাখবে।[৪৫০] বস্তুত সূর্যকুমার সেনের এ আত্মত্যাগের মাধ্যমে বিপ্লবী নেতা জ্যোতিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের (বাঘাজ্যোতিন) বুড়িবালামের তীরের

যুদ্ধ, গৌহাটি পাহাড়ের যুদ্ধ, কলতাবাজারে নলিনী-তাড়িণীর যুদ্ধের আদর্শিক দাবি স্বাধীনতা; সমগ্র বাংলায় পরিব্যাপ্ত হয়। এ ধারাবাহিকতায় আসে বোম্বাইয়ের নৌ বিদ্রোহ, আজাদ হিন্দ ফৌজের আন্দোলন ও জনঅভুত্থান। এই অভ্যুত্থান ভারতীয় স্বাধীনতা অর্জনে দৌড়গোড়ায় উন্নীত করতে সক্ষম হয়।

১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ১৮ এপ্রিল সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক স্বাধীনতা ঘোষণার দিনেই রাজশাহীতে পূর্ব নির্ধারিত রাজনৈতিক কর্মী সম্মেলনের চারজন সভাপতি যথাক্রমে ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, প্রতুল গাঙ্গুলি, জ্যোতিষ ঘোষ ও বিপিন গাঙ্গুলিকে গ্রেফতার করা হয়। সাথে সাথে বিপ্লবী দলগুলোর ছোটবড় বহু নেতা ওইদিনই বাংলার বিভিন্ন স্থানে গ্রেফতার হয়।[৪৫১] চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের প্রতি এসকল বিপ্লবীর সহযোগিতার হাত রুদ্ধ করাই এ গ্রেফতারের নেপথ্য কারণ অনুমিত হয়।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণ বাংলার জনমানসে উপর গভীর প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়। সরকারি প্রকাশনায় মন্তব্য করা হয়, এই ঘটনা বিপ্লবী মনোভাবাপন্ন যুবকদের কল্পনাকে উজ্জীবিত করে। বিভিন্ন বৈপ্লবিক গোষ্ঠীতে কর্মীরা যোগ দেয়। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের চট্টগ্রাম বিপ্লব পরবর্তী সময়ে বৈপ্লবিক তৎপরতায় বড়রকমের পুনরুজ্জীবন ঘটে।[৪৫২] এসময় ঢাকার শ্রীসংঘ ও বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স (বি.ভি.) বৈপ্লবিক কর্মকান্ডে তৎপর হয়। যুগান্তর দলও বিশেষ বৈপ্লবিক পরিকল্পনা[৪৫৩] নিয়ে মাঠে নামে এবং ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তাদের কর্মকান্ড অব্যাহত থাকে।[৪৫৪]

যুগান্তর দল তাদের পরিকল্পনা অনুসারে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দেই ২৫ আগস্ট ডালহৌসি স্কোয়ারে *টেগার্টের* (Sir Charles Augustus Tegart) গাড়ি প্রবেশ করার সাথে সাথেই পূর্বথেকে অপেক্ষমান অনুজাচরণ সেন ও দীনেশচন্দ্র মজুমদার বোমা নিক্ষেপ করে হত্যাচেষ্টা চালায়।গাড়িটি সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত হলেও টেগার্ট বেচে যায়।নিজের নিক্ষিপ্তবোমার আঘাতে অনুজাচরণ নিহত এবং পলায়ন উদ্যত দীনেশচন্দ্র মজুমদার কিছুদূর অগ্রসরহতেই পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়।[৪৫৫] ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ২৯ আগস্ট বাংলা পুলিশের ইনস্পেক্টর জেনারেল *মি.লোম্যান* (Mr. Lowman) ঢাকা জেলা পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট *মি. হডসন* (Mr. Hodson) কে নিয়ে ঢাকা মিটফোর্ড হাসপাতাল পরিদর্শনে যায়। সেখানে বি.ভি.দলের বিনয়কৃষ্ণ বসু গুলিবর্ষণ করে সর্বপ্রথম ব্রিটিশ শাসন উৎখাতের মিশনে নামে। এ ঘটনায় লোম্যানের মৃত্যু হয় কিন্তু হডসন বেচেঁ উঠেন। পুলিশ বিপ্লবী বিনয়কৃষ্ণ বসুর সন্ধান লাভে ব্যর্থ হয়।[৪৫৬]

ব্রিটিশ ভারতীয় পুলিশ যখন মি.লোম্যানের হত্যাকারীর সন্ধান লাভে ব্যস্ত; তখন বিনয়কৃষ্ণ বসু, দীনেশ চন্দ্রগুপ্ত ও সুধীরকৃষ্ণ বসু ওরফে বাদলকে নিয়ে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ০৮ ডিসেম্বর বেলা ১১ ঘটিকায় কলকাতা রাইটার্স বিল্ডিংয়ে প্রবেশ করে। কারা বিভাগের ইন্সপেক্টর জেনারেল *কর্নেল সিম্পসন* (Col N.S. Simson) কে গুলি করায় সঙ্গে সঙ্গেই তার মৃত্যু হয়। গুলির আঘাতে বিচার বিভাগের সেক্রেটারি *মি. নেলসন* (Mr Nelson) ধরাশায়ী এবং বাংলা সরকারের সেক্রেটারি *মি.টাইনাম* (Mr Twynam) গুরুতর আহত হয়।[৪৫৭] এহেন প্রকাশ্য দিবালোকে রাইটার্স বিল্ডিং-এ খন্ডযুদ্ধ রচনাকারী বিনয়-বাদল ও দীনেশের বিক্রম প্রত্যক্ষ করে প্রেস অফিসার *টাফনেল বারেট* (Tafnel baret) বিহ্বল কণ্ঠে উচ্চারণ করেন: 'My tongue stuck to the roof !' [৪৫৮] বলে উল্লেখ পাওয়া যায়।

এসকল বিপ্লবীদের হাতেই ১৯৩১খ্রিস্টাব্দের ০৭ এপ্রিল মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট *মি.জেমস পেডি* (James Peddy, ICS), ১৪ ডিসেম্বর কুমিল্লার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মি.স্টিভেন্স (Mr Stevens), ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ৩০ এপ্রিল মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট *মি.ডগলাস* (Rovert Douglas,ICS),[৪৫৯] ২৭ জুন ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট কামাক্ষ্যানাথ সেন এবং ২৯ জুলাই ত্রিপুরা জেলা পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট *মি. এলিসন* (MR Alison)[৪৬০] এবং ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের ০৩ সেপ্টেম্বর মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মি.বার্জ (D.E.Burge, ICS) নিহত হয়।[৪৬১]

১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের ২৯ অক্টোবর কলকাতা ইউরোপীয় সমিতির সভাপতি ভিলিয়ার্স (Mr Villiers) আক্রান্ত।[৪৬২] এবং ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জের দেওভোগ গ্রামে স্যার জন এন্ডারসনের (Sir Jhon Anderson) একজন ভিলেজ গার্ড বিপ্লবীদের গুলিতে নিহত ও কয়েকজন আহত হয়।[৪৬৩] ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে ০৮ মে দার্জিলিং পাহাড়ে ঘোড়দৌড়ের মাঠে বাংলার গভর্ণর স্যার জন এন্ডারসনকে নিক্ষিপ্ত গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় তার প্রাণ রক্ষা পায়।[৪৬৪] এছাড়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক ও পৃষ্ঠপোষক স্টেটস্ম্যান পত্রিকার সম্পাদক *মি.ওয়াটসন* (Mr. H.E. Watson), রাজশাহী কেন্দ্রীয় জেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট মি. লিউক (Mr Luke), আলীপুর স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের জজ *মি.গার্লিক* (Mr Garlic) প্রমুখ বৈপ্লবিক কর্মীদের কোপে পড়ে।[৪৬৫]

উপরিউল্লিখিত বৈপ্লবিককর্ম সম্পাদনের কারণে বিচাওে বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স (বি.ভি.) দলের যে সকল বিপ্লবী ফাঁসিরমঞ্চে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে শহীদ হন তারা হলেন; বিনয়কৃষ্ণ বসু, সুধীরকৃষ্ণ বসু ওরফে বাদল ও দীনেশ চন্দ্রগুপ্ত, বীরেন রায়চৌধুরী, প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য, অনাথ পাঞ্জা, মৃগেন দত্ত, ব্রজকিশোর চক্রবর্তী, রামকৃষ্ণ রায়, নির্মলজীবন ঘোষ, নবজীবন ঘোষ, মতি মল্লিক, সন্তোষ বেরা, ভবানী ভট্টাচার্য,

হৃষীকেষ সাহা, অসিত ভট্টাচার্য, প্রবোধ মজুমদার, জৌতির্ময় ভৌমিক, শচীন কর, গোপাল সেন (ছোট), অমলেন্দু ঘোষ ওরফে খোকন প্রমুখ। বি.ভি'র কর্ম নৈপুণ্য ও নিখুঁত সংঘ-শক্তির মুলে ছিল তাদের দলীয় সাংগঠনিক টেকনিক ও কর্মীদের মন্ত্রগুপ্তি রক্ষার তেজী ধারা। শান্তি সেন,কামাক্ষ্যা ঘোষ, সনাতন রায়, সুকুমার সেন, নন্দ দুলাল সিংহের উপর চরম অত্যাচার সত্ত্বেও বি.ভি'র মন্ত্রগুপ্তি'র বোধ অক্ষুণ্ন ছিল সবাই আন্দামানে দ্বীপান্তরিত হন। এ ধারাবাহিকতায় ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে যারা সশ্রম কারাদন্ড লাভ করে আন্দামানে দীপান্তরিত হন তাঁদের মধ্যে রংপুর জেলাধীন কুড়িগ্রামের কুমুদ মুখার্জী, রাজমোহন করঞ্জাই ও নরেন দাশ এবং মেদেনীপুরের ভূপাল পান্ডা ও বিমল দাশগুপ্ত অন্যতম। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে দার্জিলিংয়ে গভর্নর এন্ডারসন শুটিং মামলায় সুকুমার ঘোষ, মধু ব্যানার্জি, রবি ব্যানার্জি, মনোরঞ্জন ব্যানার্জি ও সুশীলকে আন্দামানে পাঠায়। পূর্ব থেকেই সেখানে ছিলেন ময়মনসিংহের চিত্ত বিশ্বাস।[৪৬৬]

পাঁচ বৎসরের ধারাবাহিক সাফল্যের সাথে বাংলার নানা জেলায় বৈপ্লবিক কর্মকান্ড সমাপিত করে যাওয়ার এবং সর্বগ্রাসী পুলিশের নির্যাতন সত্ত্বেও দলের কাঠামো শক্ত রাখার নজির সৃষ্টি করে বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স (বি.ভি.) দল বিপ্লবের ইতিহাসে অনন্য ইতিহাস গড়েছে। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দেই বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স (বি.ভি.) বা অন্যান্য দলের বৈপ্লবিক কর্মকান্ড থেমে যেতো না। কিন্তু সশস্ত্র বিপ্লবে বিমুখ ও বিহ্বল মহাত্মাগান্ধী বনাম কংগ্রেস, জাতীয়তাবাদী কাগজগুলো এবং দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ তৎকালে দেশোদ্ধারের কর্ম মুলতবী রেখে সরকারের চেয়েও অধিক আগ্রহী হয়ে জনমত বিগড়ে দেবার চেষ্টায় নেমে পড়ে। তাঁরা একটা শস্তা পথের আশ্রয়ে শ্যামরাখি না কুল রাখি; উভয়কুল রক্ষার নীতিগ্রহণ করে। এসময় একই সাথে 'পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু[৪৬৭] বিপ্লবীদের সাহসের প্রশংসা করে আবার তাঁদের বৈপ্লবিক কর্মকান্ডের নিন্দা করে বিবৃতি দেন। এহেন পরিস্থিতিতে বৈপ্লবিক দলগুলো বেকায়দায় পড়ে যায়।অস্ত্রসংবরণ ভিন্ন কোন গত্যন্তর ছিল না।[৪৬৮] মূলতঃ এসময় বাংলার বিপ্লবীরা ক্রমাগত বৈপ্লবিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে বাংলা সরকারকে সন্ত্রস্ত ও বিব্রতকরে তোলে। নিজেরাও ফাঁসিতে, গুলিতে মরে, দ্বীপান্তরে যায়। চট্টগ্রামের দল, ঢাকার শ্রীসংঘ ও বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স (বি.ভি.) দল এবারকার বৈপ্লবিক কর্মকান্ডে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। অনুশীলনের কর্মীরা ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে দল গঠন করতে গিয়ে বিভিন্ন ষড়যন্ত্র মামলায় দন্ডিত হয়।[৪৬৯]

উপর্যুক্ত বৈপ্লবিক সংগ্রাম সত্ত্বেও ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ হতে প্রচন্ড দমননীতি আরম্ভ হওয়ায় বাংলাদেশের বৈপ্লবিক সংগ্রামের জোয়ার ধীরে ধীরে হ্রাস প্রাপ্ত হয়। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে ১১ নং বঙ্গীয় বিশেষ ক্ষমতা অর্ডিন্যান্স, ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের বঙ্গীয় ফৌজদারী আইন (অস্ত্র ও বিস্ফোরক) পাস করে

সরকার বৈপ্লবিক সংগ্রাম দমনের প্রয়াস পায়। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ হতে ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের জুলাই এই বেগ বিশেষভাবে হ্রাস প্রাপ্ত হয়। এই সময়ে পুলিশের তৎপরতায় একে একে নেতৃবৃন্দ ও দলে দলে কর্মীরা গ্রেফতার হওয়ায় বিপ্লবীদের বহু-পরিকল্পনা[৪৭০] কার্যকরী হবার পূর্বেই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। বড়ো রকমের কোন কর্মকান্ড করা যায় নাই। দমন নীতির প্রচন্ড আঘাতে বড়ো বড়ো বৈপ্লবিক সমিতিগুলো ভেঙ্গে যায়। এবং অবশিষ্ট কর্মীরা দল ও সংগঠনহারা হয়ে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় তাঁরা কিছু বৈপ্লবিক কর্মকান্ড চালায়। এভাবে তৃতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টার অবসানের সূচনা হওয়া সত্ত্বেও ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে কতিপয় বিপ্লবীর কয়েকটি ব্যক্তিগত বৈপ্লবিক কর্মের কথা প্রকাশ পায়।[৪৭১] সেগুলোর মধ্যে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতাসহ সমগ্র বাংলাদেশে ডাকাতি, লুণ্ঠন প্রভৃতি ৩৬টি, ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে ৪৮টি, ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে ৬৮টি, ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে ০৮টি এবং ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে কয়েকটি রাজনৈতিক ডাকাতি ও ডাকলুট সংক্রান্ত ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়।[৪৭২]

বাংলাদেশে তৃতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টার অবসান সম্পর্কে গভর্নর *স্যার জন উডহেড* (Sir John Woodhead) পূর্বাপেক্ষা আইন শৃঙ্খলার যথেষ্ট উন্নতি প্রসঙ্গে সদম্ভে বলেন, পুলিশ বিপ্লবীদের পরিকল্পনা একটার পর একটা নস্যাৎ ও তাঁদের উপযুক্ত শাস্তি দিতে সক্ষম হওয়ায় বিপ্লবীরা তাঁদের প্রচেষ্টায় ক্রমাগত ভাবে ব্যর্থ হচ্ছে। প্রত্যেক জেলা হতে বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র ও বিস্ফোরক পদার্থ ধরা পড়ার ভুরি ভুরি সংবাদ আসছে। এ সবের মাধ্যমে অব্যাহত ও ধারাবাহিক দমন অভিযানের সফলতা সহজেই অনুমেয়। শাসকগণ এতেও নিশ্চিত হতে না পেরে ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের পূর্বের 'বেঙ্গল অর্ডিনান্স' সংশোধিত আকারে আইনসভায় পাস করে আইনে পরিণত করে। এই আইনের দ্বারা বাংলাদেশের বিভিন্ন সমিতি ও ক্লাবগুলোকে বে-আইনী ঘোষণা এবং অন্যান্য উপায়ে বৈপ্লবিক সংগঠনের সদস্য সংগ্রহ বন্ধ করার ক্ষমতা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে অর্পিত হয়। এর আওতায় বৈপ্লবিক সংবাদপত্র সমূহ দমন এবং যে কোন ব্যক্তির নিকট রিভলভার প্রভৃতি অস্ত্র পাওয়া গেলে তাকে প্রাণদন্ড দানের ব্যবস্থা থাকে। ১৯৩০ হতে ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রতি বৎসরের গ্রেফতারের একটি হিসেব নিচে দেয়া হলো।[৪৭৩]

সারণি নং ২

বৎসর	সংশোধিত ফৌজদারী আইনে গ্রেফতার ও আটক	১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের ৩নং আইনে গ্রেফতার ও আটক
১৯৩০	৪৫৪	-
১৯৩১	৪৫২	১৮
১৯৩২	৯২৭	৩
১৯৩৩	৩৩৪	-
১৯৩৪	১৬৭	-
মোট=	২৩৩৪	২১

উদ্ধৃত: সুপ্রকাশ রায়,ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম,প্রাগুক্ত,পৃ.৩২৩।

এভাবে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকদের দমননীতির প্রচন্ড আঘাতে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির সশস্ত্র বৈপ্লবিক কর্মকান্ড স্তব্ধ হয়ে আসলেও বিপ্লবীদের মৃত্যুঞ্জয়ী আত্মত্যাগের আদর্শ ও পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি অপরাজেয় থাকে।

এ সময় কারাভ্যান্তরে আটক মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিপ্লবীদের চিন্তাধারায় ব্যাপক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। বিদেশে রুশিয়ার গণবিপ্লবের প্রভাব, স্বদেশে বিক্ষুব্ধ গণশক্তির নবচেতনার উন্মেষ তাদের আকুল করে তোলে। স্বাধীনতার জন্য শুধু সশস্ত্রবৈপ্লবিক সংগ্রামের ধরাবাধা পথে এগোনো চলবে না, জনসাধারণকে সঙ্গে নিতে হবে; জনসাধারণের সাথে কাধে-কাধ মিলিয়ে চলতে হবে। কারাগার থেকে মুক্তির পর তাঁরা কমিউনিস্ট ও সোসালিস্ট পার্টিতে যোগদান স্থির করে।[৪৭৪] পরবর্তীতে বাংলার বিপ্লবীদের অধিকাংশই কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদেন বলে জানা যায়।[৪৭৫] আবার অনেকে মার্কসবাদ গ্রহণ করলেও ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেননি। তাদের মধ্যকার কেউ কেউ ভারতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেন, কেউবা সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করেন মর্মে তথ্য পাওয়া যায়।

অন্যদিকে কংগ্রেসের পরিচালনায় ১৯৩০-৩৪ খ্রিস্টাব্দের ভারতব্যাপী গণসংগ্রাম[৪৭৬] এবং বাংলাদেশ ও উত্তর ভারতব্যাপী ১৯২৯-৩৪ খ্রিস্টাব্দের বৈপ্লবিক সংগ্রাম যে মহা সংগ্রামের সৃষ্টি করেছিল তার ব্যর্থতার ফলে সারাদেশ গভীর হতাশাচ্ছন্ন ও রাজনৈতিক উৎসাহ-উদ্দীপনায় ভাটা পড়ে। কিন্তু এই হতাশাজনক পরিস্থিতিতে কংগ্রেসের মধ্যে সমাজবাদী ভাবধারা জাগরিত হলে কংগ্রেসের তরুণ নেতৃবৃন্দ একে স্বাগত জানায়; কিন্তু প্রতিবাদে মহাত্মা গান্ধী ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবরে কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ লগ্নে বলেন, আমার ও বহু কংগ্রেস কর্মীর মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির ব্যবধান ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে। এটি পরিস্কার যে, বেশিরভাগ কংগ্রেস কর্মীদের নিকট অহিংসা মৌলিক আদর্শ নয়, কেবল একটা কর্ম কৌশল মাত্র। এসময় কংগ্রেসের মধ্যে সমাজবাদীদের প্রভাববৃদ্ধি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, যদি তারা কংগ্রেসের মধ্যে প্রভাবশালী হয়ে উঠে, আর তা সম্ভবও বটে;তাহলে আর আমার পক্ষে কংগ্রেসে থাকা সম্ভব নয়। এ ঘটনা ছাড়াও সাধারণভাবে বিপুল সংখ্যক কর্মীর মধ্যে প্রবীণ নেতৃত্বের আপস পন্থার[৪৭৭] বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মনোভাব জেগে উঠতে থাকে। এর ফলে জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে একটা সুদূর প্রসারী পরিবর্তনের সুচনা হয়। এই নতুন ভাবধারা ও নতুন শক্তির আবির্ভাব কেবল ১৯৩০-৩৪ খ্রিস্টাব্দের একটানা গণ-সংগ্রাম ও বৈপ্লবিক সংগ্রামের ফলেই সম্ভব হয়। পরবর্তীকালে জাতীয় আন্দোলনের পক্ষে যে ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয় তা এই মিলিত মহাসংগ্রামেরই অনিবার্য পরিণতি। ইহা ব্যতীত ভারতের জনসাধারণ ঐ মহাসংগ্রামের মাধ্যমে যে বিপুল রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ও চেতনা লাভ করে তার ফলেই সমগ্র জাতীয় আন্দোলন ভবিষ্যৎ সফলতার দিকে কয়েকধাপ অগ্রসর হতে সক্ষম হয়। এই মহাসংগ্রামের

মধ্যে কংগ্রেস যে বিপুল গণ-সমর্থন লাভ করেছিল; জনগণের অফুরন্ত সংগ্রাম-শক্তির যে বিপুল উৎস বাধামুক্ত হয়ে গিয়েছিল; জনগণের যে অভূতপূর্ব উৎসাহ উদ্দীপনা, স্বাধীনতা-স্পৃহা, বীরত্ব ও আত্মত্যাগ প্রত্যক্ষকরা গিয়েছিল তা হতে ইহাই চূড়ান্তরূপে প্রমাণিত হয় যে, এই বিপুল সংগ্রামী শক্তি যদি নির্ভূল ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নেতৃত্বের দ্বারা পরিচালিত হয় তবে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের জয় অবশ্যম্ভাবী।[৪৭৮]

অন্যদিকে ব্রিটিশ সরকারের উদ্যোগে দেশের সাংবিধানিক জটিলতা নিরসনের লক্ষে লন্ডনে সর্বদলীয় গোলটেবিল বৈঠক(১৯৩০-৩২) হয়। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে মহাত্মাগান্ধীর সভাপতিত্বে কলকাতা অধিবেশন কালে কংগ্রেস ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের ২৯ডিসেম্বরের মধ্যে সরকার নেহেরু রিপোর্ট গ্রহণ না করলে অসহযোগ আন্দোলনের হুমকি দেয়। অন্যদিকে নেহেরু রিপোর্টের প্রতিবাদস্বরূপ কায়েদে আজম মুহম্মদ আলী জিন্নাহ তাঁর বিখ্যাত ১৪ দফা দাবি পেশ করেন। ভারতীয় মুসলিম লীগ এর ভিত্তিতে সংবিধান রচনায় উৎসাহী হয়ে ওঠে। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে সাইমন কমিশন রিপোর্ট করে। ভারতের সকল রাজনৈতিক দল কর্তৃক এই রিপোর্ট প্রত্যাখ্যাত হয়। নেহেরু রিপোর্ট সরকার গ্রহণ না করায় কংগ্রেস ভারতব্যাপী আইন অমান্য আন্দোলনের ডাক দেয়। সমস্যা উত্তরণে সুপারিশের ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ সংবিধান রচনার প্রত্যয়ে ১৯৩০, ১৯৩১ ও ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে তিনটি বৈঠক বসে।[৪৭৯] মহাত্মাগান্ধী প্রথমবৈঠক বর্জন করলেও[৪৮০] ব্রিটিশ সরকারের সাথে একটা আপোষ রফার[৪৮১] ফলে তিনি কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের ২৯ আগস্ট ইংল্যান্ড অভিমুখে যাত্রা করেন।[৪৮২] গোলটেবিল বৈঠকের ফলে কিছু ক্ষমতা[৪৮৩] পাবার আশায় সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা মেনে নিয়ে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের শেষ সম্ভাবনাকেও তিনি কুঠারাঘাত করেন[৪৮৪] বলে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়।

এদিকে ১৯৩০-৩৪ খ্রিস্টাব্দের গণ-সংগ্রাম ও বৈপ্লবিক সংগ্রামের অস্থিরতা প্রশমনে ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের আগস্টে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারত শাসন আইন পাস হয়।[৪৮৫] ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে ১৯৩৭-১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ সময়কাল অতীব তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ হতেই ভারতব্যাপী স্বায়ত্বশাসন কেন্দ্রিক আলোচনা শুরু হয়। এই আলোচনার পথ ধরেই ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ভিত রচিত হয়। ব্রিটিশ সরকার ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইন অনুসারে ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন ঘোষণা করে।[৪৮৬] বাংলার কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও প্রজা পার্টি তথা ভারতীয়রা গভীরভাবে আলোড়িত হয়।

১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে কংগ্রেস সর্বশক্তি নিয়ে মাঠে নামে।[৪৮৭] ১৯৩৫খ্রিস্টাব্দের ভারতশাসন আইনে প্রস্তাবিত প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন ব্যবস্থা ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে কার্যকরের উদ্যোগ নেয়া হয়। এই নির্বাচনে অধিকাংশ প্রদেশেই কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। অন্যদিকে নির্বাচনি ফলাফলে তেমন ভাল না করলেও রাজনৈতিকভাবে মুসলিম লীগ কংগ্রেসের শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আবির্ভূত হতে সক্ষম হয়। নির্বাচনপূর্ব সমঝোতা অনুযায়ি বিভিন্ন প্রদেশে মুসলিম লীগ কোয়ালিশন সরকার গঠনের প্রস্তাব করলে কংগ্রেস যে সকল প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী হয়েছে সে প্রদেশ গুলোতে কোয়ালিশন সরকার গঠনে অসম্মত হয়। এ সকল প্রদেশে কংগ্রেস একক ভাবে সরকার গঠন এবং হিন্দুত্ববাদী শাসন শুরু করে। নির্বাচনে আশাতীত সাফল্য লাভ করে কংগ্রেস নেতৃত্ব একমাত্র কংগ্রেসকেই জাতীয় সংগঠন হিসেবে দাবি করে। কংগ্রেস নেতা পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের মার্চে ভারতে কেবলমাত্র ব্রিটিশ এবং কংগ্রেসের অস্তিত্ব লক্ষ্যণীয় বলে মন্তব্য করেন।[৪৮৮] পন্ডিত জওহরলাল নেহেরুর মন্তব্য কংগ্রেসের আধিপত্যবাদী মনোভাব ও ভারতের মুসলিম সম্প্রদায়কে দাবিয়ে রাখার প্রয়াস। এই মন্তব্যের মাধ্যমে পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু তথা কংগ্রেস কর্তৃক ভারতীয় মুসলমানদের স্বতন্ত্র সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অধিকারকে অস্বীকার করার নামান্তর বলে মনে করা হয়। এহেন বাস্তবতায় মুসলিম লীগ নেতা কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ যিনি হিন্দু-মুসলিম মিলনের প্রবক্তা ছিলেন তিনি ব্যথিত হন। এবং ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের সিন্ধু প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভায় দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতকে বিভক্ত করার প্রস্তাব নেয়া হয়। প্রস্তাবে বলা হয়: সিন্ধু মুসলিম লীগ কনফারেন্স মনেকরে যে, ভারতীয় উপ-মহাদেশের শান্তি ও সাংস্কৃতির উৎকর্ষতার স্বার্থে হিন্দু ও মুসলমান এই দু'জাতির অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি এবং রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ভারতকে দু'টি ফেডারেশনে বিভক্ত করা হোক; যেমন মুসলিম এবং অমুসলিম রাষ্ট্রসমূহের ফেডারেশন।[৪৮৯] এই প্রস্তাবটিই জিন্নাহ'র দ্বিজাতি তত্ত্ব নামে বহুল পরিচিতি লাভ করে।[৪৯০]

অন্যদিকে ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে একে ফজলুল হকের কৃষকপ্রজা পার্টি উল্লেখযোগ্য আসন লাভ করেছিল সত্য, কিন্তু কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মতো একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে পারেনি। ফলে যুক্তমন্ত্রিসভা গঠন নিয়ে আলোচনা চলতে থাকে। মুসলিম লীগের সঙ্গে মন্ত্রিসভা গঠনে কংগ্রেসের অস্বীকৃতির ফলে কৃষকপ্রজা পার্টির সাথে কংগ্রেসের যুক্তমন্ত্রিসভা গঠনের সম্ভাবনা দেখা দেয়।[৪৯১] রাজনৈতিক এই মাহেন্দ্রক্ষণে একে ফজলুল হক বাংলার মুসলিম রাজনৈতিক নেতাদের একেবারে সম্মুখে চলে আসেন।[৪৯২] প্রকৃতপক্ষে একে ফজলুল হক নিজেও কংগ্রেসের সাথে যুক্ত মন্ত্রিসভা গঠনের ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন।[৪৯৩] কেননা এই সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস ও কৃষকপ্রজা পার্টির মধ্যে একটা অনানুষ্ঠানিক বোঝাপড়া হয়েছিল। এজন্য কংগ্রেস কোনো মুসলমান আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেনি। এ সময় কংগ্রেস

স্থানীয় পর্যায়ে কৃষক প্রজা পার্টির নির্বাচনি প্রচারণায় সমর্থন দেয়।[৪৯৪] কিন্তু ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে সরকার গঠন প্রশ্নে কংগ্রেসের শর্তাবলি[৪৯৫] গ্রহণ না করায় কৃষকপ্রজা পার্টি এবং কংগ্রেসের বোঝাপড়া ভেঙ্গে যায়।[৪৯৬] অপরদিকে মুসলিম লীগের নেতারা কংগ্রেস-কৃষক প্রজাপার্টির যুক্ত মন্ত্রিসভা যাতে গঠিত না হয়; সে বিষয়ে তৎপরতা অব্যাহত রাখে। এজন্য তাঁরা মুসলীম লীগের সাথে শেরেবাংলা একে ফজলুল হকের বোঝাপড়ায় আসার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে।[৪৯৭] এরকম এক বিশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ যুক্ত মন্ত্রিসভায় যোগদান করবে কি করবেনা সে-বিষয়ে ইতস্তত করতে থাকে। একে ফজলুল হক সক্রিয় বা মৌন সমর্থন দেওয়ার জন্য তাদের প্রতি বারংবার অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি ব্যর্থমনোরথ হয়ে অবশেষে মুসলিম লীগের সাথে যুক্ত মন্ত্রিসভা গঠনে বাধ্য হন। এবং ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের ০১ এপ্রিল শপথগ্রহণ করেন।[৪৯৮] এ শপথ গ্রহণের কয়েকদিন পর কৃষকপ্রজা পার্টি মুসলিম লীগের সাথে একীভূত হয়। একই সাথে একে ফজলুল হক বেঙ্গল প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন।[৪৯৯]

ইত্যবসরে ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের শেষভাগে সরকার কারাগার থেকে পুনরায় *০৩নং নিরাপত্তা* (Regulation III,1818) আইনে আটক রাজবন্ধিদের মুক্তিদেয়া শুরু করে।[৫০০] ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলার বিপ্লবী নেতৃবৃন্দকে ভারতের বিভিন্ন জেলখানা হতে মেদিনীপুরের হিজলী জেলে একত্রিত করার মাধ্যমে একটি প্রক্রিয়া শুরু হয়। নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, রমেশচন্দ্র আচার্য্য, ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী মহারাজ, প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী, রবীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, পূর্ণচন্দ্র দাশ, ভূপতি মজুমদার, সত্যরঞ্জন গুপ্ত, প্রতুলচন্দ্র ভট্টাচার্য, ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত, মনোরঞ্জন গুপ্ত, অরুনচন্দ্র গুহ, ভূপেন দত্ত, রসিকলাল দাশ ও জীবনলাল চ্যাটার্জি। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী খাজা নাজিম উদ্দীন সকাল ১১ ঘটিকায় হিজলী জেলখানা পরিদর্শনে গমন করে রাত্রি ১০ ঘটিকা পর্যন্ত বিপ্লবীদের সাথে বন্ধুভাবে আলোচনা ও গল্প করেন। বিদায়কালে তিনি বিপ্লবীদের মতের কোনো পরিবর্তন হয়েছে কিনা জানতে চান। বিপ্লবীদের অনুরোধে তিনি সকল জাতীয়তাবাদী পত্রিকা মঞ্জুর এবং রাত্রিবেলায় দরজা বন্ধ করা হবেনা; মর্মে নির্দেশ দেন। পরবর্তীতে বাংলার অর্থসচিব নলিনীরঞ্জন সরকার, ডা. বিধান রায়, শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু, শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়, শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপধ্যায় বিপ্লবী নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্যে হিজলী জেলখানা পরিদর্শন করেন মর্মে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়।

সরকার বিপ্লবীদের মনের পরিবর্তন ঘটাতে মহাত্মাগান্ধীকে ভূমিকা রাখার অনুরোধ করেছিলেন। পূর্বেই মহাত্মাগান্ধীর হিজলী জেলে আগমন সংবাদপেয়ে তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনার জন্য বিপ্লবীরা প্রস্তুতি নেয়। ফুলের তোঁড়াদিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হয়। জেল কর্তৃপক্ষের অনুপস্থিতিতে মহাত্মাগান্ধীর সাথে বিপ্লবীদের তিন ঘন্টাব্যাপী আলোচনা চলে। তিনি চেয়েছিলেন আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বিপ্লবীদের মতের পরিবর্তন করতে। বিপ্লবীরা যেন হিংসানীতি পরিত্যাগ করে মহাত্মাগান্ধীর অহিংসানীতিতে বিশ্বাসী হয়ে দেশের স্বাধীনতার কাজে অগ্রসর হয়। বিপ্লবীরা যদিও মহাত্মাগান্ধীর অহিংসানীতিতে বিশ্বাসী ছিলেননা, তবুও তাঁরা অহিংসা সংগ্রামে যোগদান করেছেন, খাঁটি সত্যাগ্রহীর ন্যায় পুলিশের লাঠিচার্জের সম্মুখীন হয়েছেন; কোন প্রকার দুর্বলতা বা হিংসাপ্রকাশ করেন নাই। তাঁরা বিশ্বাস করতেন মহাত্মাগান্ধীর অহিংসা আন্দোলন দেশকে স্বাধীনতার পথে অগ্রসর করবে। মহাত্মাগান্ধী বলেছিলেন, বিপ্লবীরা যদি মৌখিকভাবে এই প্রতিশ্রুতি দেয়; হিংসায় আমাদের বিশ্বাস নাইঃ আমরা অহিংসানীতিতে বিশ্বাসী। তবে তিনি বিপ্লবীদের মুক্তির জন্য সরকারকে সুপারিশ করবেন। আশাকরা যায় সরকার সকল রাজনৈতিক বন্দিদিগকে মুক্তি দিবেন।

কিন্তু বিপ্লবীরা অহিংসা নীতিতে মোটেই বিশ্বাসী ছিলেন না। সশস্ত্র বৈপ্লবিক পথেই ভারতের স্বাধীনতা আসবে; একথা তাঁরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন। বিপ্লবী নের্তৃবৃন্দ মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাবে সায় দিতে পারেন নাই। বিদায়কালে তিনি বিপ্লবীদের প্রতি আশাবাদব্যক্ত করে বলেন, আমি আবার তোমাদের এখানে এসে তিন দিন থাকবো এবং তোমাদেরকে স্বমতে আনবো। কয়েক মাস পর তিনি অসুস্থ থাকায় বিশেষ ব্যবস্থায় কলকাতা প্রেসিডেন্সি জেলে বিপ্লবীদের সাথে বেলা ০৩ ঘটিকায় মিলিত হন। আলাপ আলোচনায় কেহ কাহাকেও স্বমতে আনতে পারলেন না। প্রত্যেকেই নিজ নিজ মতে অটল থাকেন।[৫০১] বিপ্লবীরা তাঁকে সরাসরি জানিয়ে দেয়; শর্তযুক্ত মুক্তিতে তাঁরা সম্মত নয়।[৫০২] মহাত্মাগান্ধী দুইঘন্টা আলোচনার পরে হাসিমুখেই বিদায় নেন।[৫০৩] পরদিন সংবাদপত্রের শিরোনাম বের হলো–The Revolutionary Leaders Refused Conditional Release![৫০৪] বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ কতটা দৃঢ়চেতা ও আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন ছিলেন; দেশের স্বাধীনতার জন্য তাঁরা কতটা ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিলেনঃ শর্তাধীন কারামুক্তি প্রত্যাখানের মাধ্যমে তা সহজেই অনুমেয়।

বিপ্লবীরা তাঁকে অনুরোধ জানায় তিনি যেন শুধু তাঁদের মুক্তির জন্য চেষ্টা না করে আন্দামানে এবং ভারতের সকল রাজনৈতিক বন্দি মুক্তির চেষ্টা করেন। অবশেষে ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে যারা বিনাবিচারে আটক ছিলেন তাঁরা সকলেই নিঃশর্ত মুক্তি লাভ করেন।[৫০৫] এদের মধ্যে বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স (বি.ভি) দলের কর্মী সংখ্যাই অধিক ছিলো বলে জানা যায়। তাঁদের কিছুটা পরে ১৯৩৯

খ্রিস্টাব্দে দন্ডিত মহিলা রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি দেয়া হয়। দীর্ঘমেয়াদে আটক বড়ো বড়ো রাজনৈতিক মামলার বন্দিরা বাইরের মুক্ত আলো দেখার পূর্বেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ব্রিটিশের ফায়দা হাসিল নস্যাৎ হয়ে যায় মনে করা হয়।[৫০৬]

১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের জুলাইমাসে বাংলা ব্যতীত অপরাপর সাতটি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠন করে। শাসনকার্যে দক্ষতার স্বাক্ষর রাখে। শ্রমিক ও কৃষকদের স্থানীয় সংগ্রাম ব্যতীত জাতীয় আন্দোলন একরূপ বন্ধ থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে মতানৈক্য না হওয়ায় কংগ্রেস-মন্ত্রিসভা গুলো ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে পদত্যাগ করে। কিন্তু এসময়ে কংগ্রেস সরকার ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা, রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি, বিভিন্ন সংগঠন, সংবাদপত্র ও ছাপাখানার উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করায় রাজনৈতিক কর্মীরা অবাধ চলাফেরার সুযোগলাভ করে। দেশে রাজনৈতিক সাহিত্য প্রকাশিত হতে থাকে। সাধারণ মানুষেরমধ্যে রাজনৈতিক চেতনা বিকাশের সম্ভাবনা দেখা দেয়। এসব সত্ত্বেও বিশেষ করে বিহার,উড়িষ্যা ও যুক্তপ্রদেশে কৃষক সংগ্রাম ব্যাপক আকার ধারণ করে।

১৯৩৪ হতে ১৯৩৬ তিন বৎসরে যতগুলো শ্রমিক ধর্মঘট হয়েছিল কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠনের এক বৎসরের মধ্যে পূর্বাপেক্ষা অনেকবেশি ধর্মঘট হয়। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা মিল মালিকদের বিরোধিতা অগ্রাহ্য করে শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির পদক্ষেপ নিলেও সাধারণভাবে শ্রমিকশ্রেণির ধর্মঘট ও ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের অধিকারে অস্বীকৃত হয়। শ্রমিক সংগ্রাম দমনের জন্য বহুক্ষেত্রে ব্রিটিশ শাসকদের তৈরি ঘৃণ্য ১৪৪ ধারা প্রয়োগ, এমনকি গুলিবর্ষণ করার ঘটনাকে কংগ্রেসের আপোষপন্থি অংশ সাম্রাজ্যবাদের দিকে আরও বেশি ঝুঁকে পড়ে মনে করা হয়। এদিকে শ্রমিক-কৃষকের প্রতি কংগ্রেসের আচরণে জনমনে প্রশ্ন দেখা দেয়ার প্রেক্ষাপটে দেশের সমাজবাদী ও বামপন্থি শক্তিসমূহের প্রভাববৃদ্ধি পেতে থাকে। জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্র তৈরি হয়।[৫০৭]

১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে উপর্যুক্ত যুদ্ধ পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে সুভাষচন্দ্র বসু আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠা এবং মিত্রশক্তি ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার মাধ্যমে বিপ্লবের চতুর্থ ধাপ বা চূড়ান্ত বিপ্লব পর্বে উন্নীত হয়। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে সর্বসম্মতভাবে সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের ত্রিপুরী অধিবেশনে যুগপৎ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ভূমিকার প্রত্যয়ে পুনরায় তিনি সভাপতি পদে প্রার্থী হন। একইপদে মহাত্মাগান্ধীর আর্শীবাদ পুষ্ট হয়ে সীতারাম পট্টভি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ২৯ জানুয়ারির নির্বাচনে সুভাষচন্দ্র বসু ভোটে জয়লাভ করেন। কিন্তু মহাত্মাগান্ধী সীতারাম পট্টভির পরাজয়কে তাঁর নিজের পরাজয় বলে অভিমতব্যক্ত করেন।[৫০৮] সুভাষচন্দ্র বসু মনে

করতেন, দেশ ভিতরে ভিতরে বিপ্লবের জন্যে অতীতের চেয়ে বেশি প্রস্তুত রয়েছে; আসন্ন আন্তর্জাতিক সঙ্কট ভারতকে তাঁর কাঙ্ক্ষিত মুক্তি অর্জনের সুযোগ বয়ে আনবে। ভারতের স্বাধীনতালাভ হবে মানবজাতির ইতিহাসে একটি বিরাট ঘটনা।[৫০৯] সুতরাং ত্রিপুরিতে সভাপতির ভাষণে তিনি ব্রিটিশ সরকারকে ছ'মাসের সময়-সীমা দিয়ে অবিলম্বে স্বাধীনতার দাবি মেনে নেয়ার কর্মসূচি গ্রহণ এবং সরকার যদি স্বাধীনতা নাদেয়; তবে ব্যাপক আইন অমান্য আন্দোলন শুরুকরার আহ্বান জানান। কিন্তু এ প্রস্তাবে মহাত্মাগান্ধীর সায় মেলেনি।[৫১০] ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের মার্চে (৮-১২) অনুষ্ঠিত ত্রিপুরি-কংগ্রেসের পর কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির সদস্য নির্বাচন সম্পর্কে মহাত্মাগান্ধী ও কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসুর মধ্যে আপস আলোচনা চলে। কিন্তু সমঝোতা না হওয়ায় অবশেষে সুভাষচন্দ্র বসু বাধ্য হয়ে কংগ্রেসের সভাপতি পদে ইস্তফা প্রদান করেন।[৫১১]

পরবর্তীতে মে মাসে সুভাষচন্দ্র বসু ও তাঁর অনুগামীরা কংগ্রেসের আওতার মধ্যে একটি নতুন পার্টি হিসেবে *ফরোয়ার্ড ব্লক* গঠন করেন। এবং এ.আই.সি.সি (All India Congress Committee)-র প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ০৯ জুলাই তারিখে তিনি যখন সর্বভারতীয় প্রতিবাদের আহ্বান জানান; তখন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে কংগ্রেসের কোনো প্রকার পদ গ্রহণের সুযোগ থেকেও তাঁকে তিন বৎসরের জন্য নিষেধাজ্ঞাসহ বাংলা প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি পদ থেকে ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের আগষ্টে বহিষ্কার করা হয়।[৫১২] সুভাষচন্দ্র বসুর রাজনৈতিক সেই সঙ্কটকালে বাংলার বিপ্লবী দলের সকলেই তাঁর পাশে দাঁড়ায় নাই। সে সময় যারা তাঁর পাশে দাড়ায় তন্মেধ্যে উল্লেখযোগ্য দলগুলো হলো; বিস্তৃত সংঘ শক্তি সম্পন্ন অনুশীলন এবং জোতিষ ঘোষ, সুরেশ মজুমদার, হেমন্ত বসুদের কলকাতার দল, মাদারীপুরের পূর্ণদাশের দল, ঢাকার শ্রীসংঘ ও বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স (বি.ভি.) প্রমূখ দল।[৫১৩] এ সময় ডা. যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে বিপ্লবী যুগান্তরদল বিলুপ্ত ঘোষণা করে ভূপেন দত্তসহ কংগ্রেসের রাজনীতিতে বিলীন হয়।[৫১৪] এ সময় যেখানে তাদের উচিৎ ছিলো স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষী নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর হাতকে শক্তিশালী করা; সেখানে কংগ্রেসের আপসকামী ধারায় তাঁদের এই বিলীন হয়ে যাওয়া; তাদের নিজেদেরই গড়ে তোলা স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষী বিপ্লবী যুগান্তর দলের বৈপ্লবিক আদর্শের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার শামিল বলে অনুমিত হয়। কিন্তু এই ধারার বিপরীতে অনুশীলন সমিতির প্রভাবশালী নেতা বিপ্লবী মহারাজা ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীর নেতৃত্বে অনুশীলন সমিতির বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে ভারতব্যাপী বিপ্লব আয়োজনে নেমে পড়েন।[৫১৫]

এদিকে সুভাষচন্দ্র বসুর সাথে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থি গ্রুপের বিরোধের ফলে ফরোয়ার্ড ব্লক গঠন করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এই দল গঠনের জন্য সাংগঠনিক সফওে বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স (বি.ভি.) ও শ্রীসংঘের হেমচন্দ্র ঘোষ, সত্যরঞ্জন বক্সি, লীলা রায়, অনিল রায়,সত্যগুপ্ত, ভবেশ নন্দী, মণীন্দ্রকিশোর রায়, জ্যোতিষ জোয়ারদার, মিহির মোতায়েদ, দ্বিজেন দাশ ও সুরেন সরকার ঢাকা, কলকাতা, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ ও পাবনায় যায়। তারক বন্দ্যোপাধ্যায় ও অমর বসুর দল এবং উত্তরবঙ্গ গ্রুপও এসময় সুভাষচন্দ্র বসুর পাশে দাড়ায়।[৫১৬]

১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের ০১ সেপ্টেম্বর নাৎসি জার্মানি পোল্যান্ড আক্রমণের মাধ্যমে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। ইতোপূর্বে জার্মানি ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে অস্ট্রিয়া ও ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে চোকোশ্লাভাকিয়া দখল করে নেয়। তখন ব্রিটেন ও ফ্রান্স হিটলারকে সমর্থন যোগায়। কিন্তু ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের ০৩ সেপ্টেম্বর তারা পোল্যান্ডকে সাহায্যের হাত বাড়ায় এবং জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে বাধ্য হয়।[৫১৭] এদিকে ভারতীয় জনপ্রতিনিধিদের সাথে কোনো প্রকার আলোচনা ছাড়াই মাত্র কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে বড়োলাট *লর্ড লিনলিথগো* (Lord Linlithgow) ভারতের পক্ষ হতে অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে সংশোধিত ভারত শাসন আইন নামে একটি জরুরি আইন পাস করে ভারতের সকল গণতান্ত্রিক অধিকার বাতিল ও বড়লাটের হাতে সকল ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়। একটি নতুন ভারতরক্ষা অর্ডিন্যান্স দ্বারা ভারত সরকার ভারতের নিরাপত্তা রক্ষা, যুদ্ধ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা ও আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন অর্ডিন্যান্স জারির ক্ষমতা লাভ করে। যুদ্ধের অজুহাতে আবার ভারতের ওপর ব্রিটিশের স্বেচ্ছাচারী শাসন চেপে বসে।[৫১৮]

ভারতবর্ষে এই যুদ্ধের মারাত্বক প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। ১৪ সেপ্টেম্বর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির এক প্রস্তাবে বলা হয়: যে যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়, যে যুদ্ধের একমাত্র উদ্দেশ্য ভারতবর্ষে ও অন্যত্র সাম্রাজ্যবাদের শক্তি সংহত করা, কংগ্রেস কমিটি সে যুদ্ধের সাথে জড়িত হতে অথবা কোনো প্রকার সাহায্য দিতে পারে না। ওয়ার্কিং কমিটির এপ্রস্তাবে ভারতের জাতীয় দাবি পূণর্ব্যক্ত করে আরও বলা হয়: ভারতের জনগণকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দিতেই হবে। বাইরের কোন শক্তির প্রভাব হতে মুক্ত একটি *গণপরিষদ* (Constituent Assembly) দ্বারা তৈরি করা একটি গঠনতন্ত্রের মাধ্যমে ভারতবাসীগণ এই আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ভোগ করবে।এবং তাঁদের নিজেদের নীতি তাঁরা নিজেরাই স্থির করবে।

কংগ্রেসের এই দাবির প্রেক্ষিতে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে আপাতত ভারত শাসন ও ব্রিটিশের যুদ্ধপ্রচেষ্টায় সহযোগিতার উদ্দেশ্যে বড়লাট *লর্ড লিনলিথগো* (Lord Linlithgow) কে সাহায্য করবার জন্য ভারতীয় নেতৃবৃন্দকে নিয়ে একটি পরামর্শ-সভা গঠনের প্রস্তাব করে। এ ব্যাপারে কংগ্রেস নেতৃবর্গ বড়োলাটের সাথেও আলোচনা চালায় কিন্তু দাবি অগ্রাহ্য করা হলে ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেস মন্ত্রিসভাগুলি পদত্যাগ করে। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের মার্চে কংগ্রেসের রামগড় অধিবেশনের প্রস্তাবে গ্রেটব্রিটেনের যুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদীযুদ্ধ বলে ঘোষণা করে কোনো প্রকার সহযোগিতা না করবার সিদ্ধান্ত নেয়।[৫১৯]

রামগড়ের কংগ্রেসের পাশে সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে আপস বিরোধী সম্মেলন বসে। এসময় মহাত্মাগান্ধী জানান, যুদ্ধের সময়ে কংগ্রেস আপস রফার পথে রাষ্ট্রীয় অধিকার অর্জন করতে পারবে, যুদ্ধে আক্রান্ত ও বিপন্ন ব্রিটিশকে এই সময়ে বিব্রত করা সত্যাগ্রহের নীতি সম্মত নয়। মীমাংসার পথেই স্বাধীনতা আসবে এই বিশ্বাসও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের ছিল বলে জানা যায়। পক্ষান্তরে স্বাধীনতার দাবি ও সংগ্রামের এখনই মাহেন্দ্রক্ষণ বলে সুভাষচন্দ্র বসু দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করেন।[৫২০]

সুভাষচন্দ্র বসু ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ডাক দিতে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান।[৫২১] এবং বাঙালির কলঙ্ক কলকাতার *হলওয়েল মনুমেন্ট* (Hollwell Monument) অপসারণের দাবিতে আন্দোলন শুরু করায়[৫২২] ব্রিটিশ সরকার ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের ০২ জুলাই তাঁকে ভারতরক্ষা আইনে গ্রেফতার করে আলীপুর সেন্ট্রাল জেলে রাখে। ২৯ নভেম্বর আমৃত্যু অনশন শুরু করায় তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটায় তাঁকে ০৫ ডিসেম্বর জেল থেকে মুক্তি দিয়ে কলকাতা এলগিন রোডের বাড়িতে গৃহবন্দি করা হয়।[৫২৩] এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে রাজনৈতিক কর্মকান্ড হতে দূরে রাখতে প্রচেষ্টা চালায় মনে করা হয়। এতদসত্ত্বেও বিপুল সংখ্যক গোয়েন্দা পুলিশের নজর এড়িয়ে অত্যন্ত নাটকীয় ভাবে মুহাম্মদ জিয়াউদ্দীন নাম নিয়ে ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের ১৭ জানুয়ারি মধ্যরাতে তিনি অন্তরীণ অবস্থা থেকে গাঢাকা দেন। কলকাতা থেকে ২১০ মাইল দূরবর্তী গেমো স্টেশনে ১৮ জানুয়ারি উত্তরভারত অভিমুখে ট্রেনে উঠে পড়েন। ভারতের সীমানা পেরিয়ে প্রথমে আফগানিস্তানের কাবুল যেতে সক্ষম হন। সেখান থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের মস্কো হয়ে জার্মানির বার্লিন পৌঁছান। তখনও সোভিয়েত-জার্মান মৈত্রী চুক্তি বলবৎ ছিল।[৫২৪]

জার্মানিতে তিনি প্রবাসী দেশপ্রেমিক ভারতীয়দের নিয়ে ব্রিটিশ বিরোধী ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগ গড়ে তোলেন। এবং জার্মানির নিকট ভারতীয় যুদ্ধবন্দিদের ব্রিটিশের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণে উদ্বুদ্ধ করেন।

১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের ০৭ ডিসেম্বর জাপান ইঙ্গ-আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীময় ধ্বংস-যজ্ঞ আরম্ভ হয়।[৫২৫] এ রকম বৈশ্বিক জটিল পরিস্থিতিতে হটাৎ জার্মান রেডিওতে ভেসে ওঠে তাঁর বৈপ্লবিক কণ্ঠস্বর: আমি সুভাষ; এতোদিন আপনাদের কাছে আমার বক্তব্য বলবার সুযোগ ছিলনা। শত্রুপক্ষ যে অপবাদই দিক–আমি জানি আপনারা তা বিশ্বাস করেন না। আমি আমার কাজ ক'রে যাব, কে কী, বলে না বলে; তাতে আমার কিছুমাত্র যায় আসে না। অক্ষশক্তির আক্রমণ থেকে নিজেদের সাম্রাজ্য রক্ষা করবারজন্য যদি ব্রিটেন আজ আমেরিকার দ্বারস্থ হ'তে লজ্জা না পায়, তাহলে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে অপর কোনো জাতির সাহায্য প্রার্থীহওয়া আমার পক্ষেও অন্যায় নয়, অপরাধও হতে পারেনা। আপনারা আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির দিকে লক্ষ্যরেখে প্রস্তুত থাকবেন। আমি যেভাবে ব্রিটিশ সরকারকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে ভারতবর্ষ থেকে চলে এসেছি, ঠিক সেভাবেই উপযুক্ত সময়ে আপনাদের মধ্যে গিয়ে উপস্থিত হ'ব। প্রয়োজনের উপযুক্ত পাথেয় আপনাদের কাছে ঠিক সময়েই হাজির হ'বে, আপনারা প্রস্তুত থাকবেন। যে সুযোগ আসছে; সেটা সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগাতে পারেন– তাঁর জন্য নিজেরা জাতি ও ধর্ম নির্বিশেষে অবিলম্বে সংঘবদ্ধ হোন। চাই ঐক্য ও একাগ্রতা।[৫২৬] জার্মান রেডিওতে বক্তৃতাদানের সময় থেকেই তার সঙ্গী-সহচররা শ্রদ্ধাবনত চিত্তে তাঁকে নেতাজি বলে অভিহিত করতে থাকে বলে জানা যায়।[৫২৭]

সুভাষচন্দ্র বসু[৫২৮] জার্মানিতে বসে ব্রিটিশ বিরোধী প্রচার অব্যাহত রাখেন।[৫২৯] বস্তুতঃ ভারতের স্বাধীনতার জন্য প্রথমে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহায্য প্রার্থণা করেছিলেন বলে জানা যায়। কিন্তু সাহায্যকরা দূরে থাক,সোভিয়েত ইউনিয়ন তাঁকে আশ্রয় দিতেও অস্বীকৃত হয়। অবশেষে জার্মান দূতের সহায়তায় তিনি বার্লিনে উপস্থিত হন।[৫৩০] জার্মানির চ্যাঞ্জেলর *হিটলার* (Adolf Hitler) আশ্রয় দিলেও তিনি নেতাজিকে দিয়ে সোভিয়েত বিরোধী কোন বক্তব্য দেয়াতে পারেননি। বরং হিটলার সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করলে নেতাজি ক্ষুব্ধপ্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়।[৫৩১] প্রকাশ থাকে যে, তিনি পশ্চিম রণাঙ্গনের দিকে আগ্রহী ছিলেন। ইউরোপের সাথে তিনি পূর্ব হতেই পরিচিত ছিলেন। পশ্চিমা শক্তির উপর তাঁর দৃঢ় আস্থা ছিল। অন্যদিকে জাপান সরকারের সাথে তখনো তাঁর কোন প্রকার যোগাযোগ হয়নি বিধায় রাসবিহারী বসুর আহ্বান সত্ত্বেও তাঁকে পুরোপুরি নির্ভর করতে পারেননি। সুভাষচন্দ্র বসু ধারণা করেছিলেন পশ্চিমাশক্তি থেকে অধিক সহায়তা পাওয়া যাবে। এতদ্ব্যতীত জার্মানির বিজয় রথ তখন সমগ্র ইউরোপকে স্তম্ভিত করে। জার্মান সেনাপতি *রিবেনট্রপ* (Ribrentrop) অক্রুক অধিকার করে আল আমিনে আক্রমণ শুরু করেন। যেরূপ বিদ্যুৎগতিতে জার্মান অগ্রসর হতে থাকে, তাতে একবার যদি তারা আফ্রিকার পূর্বোপকূলে উপস্থিত হতে পারে তবে ভারতের পশ্চিমদিক দিয়ে আক্রমণ করে স্থল, জল বা বিমানপথে ভারতে প্রবেশ করতে সক্ষম হবে। কিন্তু তিনি প্রত্যক্ষ করেন

ইতালির দুর্বলতার জন্য *রিবেনট্রপকে* আল আমিন পরিত্যাগ করতে হয়। কাজেই ভারতের পশ্চিমদিক দিয়ে আক্রমণ করে ভারতে প্রবেশের আশা সুভাষচন্দ্র বসুকে ত্যাগ করতে হয়। এবার তিনি পূর্ব-রণাঙ্গনের দিকে দৃষ্টিপাত করেন। এখনও আশা আছে জাপান যদি পূর্ব দ্বার দিয়ে ভারতে প্রবেশ করতে পারে।[৫৩২] এরূপ পরিস্থিতিতে জার্মানি অপেক্ষা পূর্বএশিয়া বেশি অনুকূল প্রতিভাত হওয়ায় সুভাষচন্দ্র বসু জাপান গমন সিদ্ধান্ত করেন।[৫৩৩]

ইতোপূর্বেই জাপান, সিঙ্গাপুর, জাভা ও মালয়ে বাংলার কতিপয় বিপ্লবী ভারতীয় স্বাধীনতার পক্ষে কার্যরত ছিলেন।[৫৩৪] প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠবিপ্লবী রাসবিহারী বসু ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের ১২ মে কলকাতার খিদিরপুর থেকে জাপানি জাহাজ *সানুকি-মারু* (Sanuki Maru) সহযোগে ভারতবর্ষ ত্যাগ করে ০৬ জুন জাপানে পৌঁছেন। তিনি জাপানেই অবস্থান করছিলেন। সেখানে ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে ত্রিশজন ভারতবাসীর সমন্বয়ে *ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগ* (Indian Independence League) প্রতিষ্ঠা করেন। পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়গণকে সংঘবদ্ধ করত: ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের উদ্দেশ্যে তৎপরতা চালানো হয়।[৫৩৫] অনুশীলনের পুরাতন কর্মী ফরিদপুর নিবাসী প্রফুল্লকুমার সেন হালে স্বামী সত্যানন্দপুরী এই কাজে তাঁকে সহায়তা দেন[৫৩৬] বলে জানা যায়।

অপরদিকে জাপানে অবস্থানরত বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর সাথে জাপান সরকারের একটি চমৎকার আস্থার সম্পর্ক গড়ে উঠে।[৫৩৭] জাপান ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের ০৮ ডিসেম্বর ইঙ্গ-আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।[৫৩৮]এবং ব্রিটিশের নিকট থেকে ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের ১৫ ফেব্রুয়ারি সিঙ্গাপুর, ০৮ মার্চ রেঙ্গুন[৫৩৯] ও মালয় দখলে নেয়। বহু ভারতীয় সৈন্য জাপানীদের হস্তে বন্দি হয়।[৫৪০] এসময় *ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগের* (Indian Independence League) তরফে কুটনৈতিক প্রচেষ্টা জোরদার করে রাসবিহারী বসু জাপান সরকারে সাথে ভারতের স্বাধীনতার অনুকূলে একটি সমঝোতায় পৌঁছেন। এর ফলে জাপান সরকার তাদের নিকট বন্দি থাকা ভারতীয় সৈন্যদের মুক্ত করে দেয়। রাসবিহারী বসু এই সৈনিকদের নিয়ে জাপানের সহায়তায় ভারতীয়দের প্রধান শত্রু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন স্থির হয়। সাথে সাথে জাপান অধিকৃত ব্রিটিশ এলাকা তত্ত্বধানের আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সিদ্ধান্তক্রমে ০৮ডিসেম্বর ১১-ই, ১/১৪ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের মোহন সিংকে প্রধান করে *ভারতের জাতীয় বাহিনী* (INA=Indian National Army) গঠিত হয়। স্থির হয় এই বাহিনী *ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগের* (Indian Independence League) সাথে একযোগে কাজ করবে।[৫৪১]

১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের ১৫ ফেব্রুয়ারি সিঙ্গাপুরের পতনের পর জাপানের প্রধানমন্ত্রী *তেজো* (Tojo Hideki) ভারতের স্বাধীনতার দাবিকে প্রকাশ্যে সমর্থন জ্ঞাপন করেন। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের মার্চের শেষে পূর্বএশিয়ায় অবস্থানরত ও যুদ্ধে জাপানিদের হাতে বন্দি ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে একসভা হয়। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনায় ভারতীয়দের দ্বারা সৈন্যবাহিনী গঠিত হবে। সিদ্ধান্ত হয়; প্রয়োজনে জাপান সরকারের প্রতিশ্রুত সাহায্যগ্রহণ করা হবে। *ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগের* (Indian Indpendence League) *পরিচালক সমিতি* (Council of Action) সর্বময় কর্তৃত্ব গ্রহণ করবে।

১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের ১৫ জুন ব্যাঙ্ককে যে কনফারেন্স হয় তাতে বার্মা, থাইল্যান্ড, মালয়, জাভা, বোনিয়া মাঞ্চুকুয়ো, হংকং ও জাপানে অবস্থানরত ভারতীয়দের শতাধিক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সেখানে বলা হয় এশিয়া পর্যন্ত ব্রিটিশের রণক্ষেত্র বিস্তারলাভ করায় ভারতের স্বাধীনতা লাভের পথ সুগম হয়েছে; *ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগ* (Indian Indpendence League) অবিলম্বে নিজ সেনা দল গঠন করবে এবং সংগ্রামে মিত্রশক্তি জাপানের পাশে যুদ্ধ করবে। বিপ্লবী রাসবিহারী বসুকে *কর্মনির্দেশ সমিতির* (Council of Action) প্রধান করা হয়। এ বিভাগ যেন সম্পূর্ণরূপে ভারতীয়দের দ্বারা পরিচালিত হয় আলোনায় তা গুরুত্ব পায়। ব্রিটিশের নিকট থেকে অধিকৃত ও সমগ্র মুক্তএলাকা এবং ভারতীয়দের পরিত্যক্ত সম্পত্তি কর্মনির্দেশ সমিতি'র নিয়ন্ত্রণে আনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ সম্মেলনে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবে সুভাষচন্দ্র বসুকে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় চলে আসার অনুরোধ করা হয়। একই সাথে জাপান সরকারকে সকল ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করা হয়।[৫৪২]

ইতোমধ্যে বন্দি ভারতীয় সৈন্যগণকে জাপানের সঙ্গে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে বলায় *ভারতের জাতীয় বাহিনী* (I.N.A.) ভেঙ্গে যায়। কিন্তু বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর ঐকান্তিক চেষ্টায় ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি'র মধ্যেই এই বাহিনীকে পুনর্গঠন করা হয়।[৫৪৩] সাথে সাথে *ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগে* (Indian Indpendence League) মতবিরোধ দেখা দেয়ায় সমর্থন লাভের প্রত্যয়ে রাসবিহারী বসু পূর্ব এশিয়ার নানাস্থান সফর করে পরিস্থিতি সামাল দিতে প্রয়াস চালায়। ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগের কার্যালয় ব্যাঙ্কক থেকে সিঙ্গাপুর স্থানান্তর করা হয়।[৫৪৪]

রাসবিহারী বসুর আহ্বানে সুভাষচন্দ্র বসু জার্মান ও জাপান সাবমেরিন সহযোগে ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের ০২ জুন সিঙ্গাপুরের অদূরবর্তী সুমাত্রা পৌঁছেন। ১৩ জুন আকাশ পথে টোকিও হাজির হয়ে জাপানি মন্ত্রিসভা ও সমর দপ্তরের সাথে আলোচনায় বসেন।[৫৪৫] জাপান রেডিও থেকে ২১ জুন বক্তৃতার মাধ্যমে সুভাষচন্দ্র বসু কর্মসমুদ্রে ডুবে যান।[৫৪৬] প্রধানমন্ত্রী *তেজো* (Tojo Hideki) ঘোষণা করেন ভারত দখলের কোন

ইচ্ছা জাপানের নেই।[৫৪৭] এসময় অনুশীলন সমিতির যে সকল সদস্য যারা মালয়, ব্রহ্মদেশ ও অন্যান্য স্থানে পূর্ব থেকেই মালয়, ব্রহ্মদেশ ও অন্যান্য স্থানে অবস্থান করছিলেন তাঁরা সকলেই নেতাজির নেতৃত্বে ভারতের মুক্তি সংগ্রামে যোগদেয়। নেতাজি এদের মধ্য হতে ডা. পবিত্র রায়কে ভারতে পাঠালে তিনি কয়েকজন বিপ্লবীসহ পুলিশের হাতে ধরাপড়েন। পরে সংক্ষিপ্ত বিচারে প্রাণদন্ডে দন্ডিত হন।[৫৪৮]

১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের জুনে রাসবিহারী বসু সিঙ্গাপুর থেকে টোকিও প্রত্যাবর্তন করে সুভাষচন্দ্র বসুর সাথে আলোচনা হয়। নেতাজি ভারতের বাইরে অতিসত্ত্বর স্বাধীন ভারত সরকার গঠনের প্রস্তাব দেয়। প্রথমে সায় না থাকলেও ভারত স্বাধীন হওয়া মাত্রই ভারতীয়রাই প্রকৃত রাষ্ট্র ও শাসনবিধি গঠন করবে এবং অস্থায়ী স্বাধীন সরকারের বিলুপ্তি ঘটবে; এইশর্তে রাসবিহারী বসু সম্মত হন। রাসবিহারী বসু সিঙ্গাপুরে ফিরে ০২ জুলাই নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর আগমনবার্তা ঘোষণা করেন।[৫৪৯] সকল শ্রেণির কর্মী ও অধিবাসীদের প্রতিনিধি নিয়ে ০৪ জুলাই রাসবিহারী বসু ও সুভাষচন্দ্র বসুর উপস্থিতিতে বিরাট কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। সর্বসমক্ষে রাসবিহারী বসু যুদ্ধ পরিচালনার সমস্ত ভার অর্পণপূর্বক সুভাষচন্দ্র বসুর ওপর *ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগ* (Indian Independence League)[৫৫০] ও *ভারতের জাতীয় বাহিনীর* (INA) সকল দায়িত্ব অর্পণপূর্বক এক আবেগময়ী বক্তৃতায় তাঁর অবসর গ্রহণের ঘোষণা দেন। সভায় সর্বাধিনায়কত্ব স্বীকার করে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এক দীর্ঘ বক্তব্য রাখেন। যার মর্মার্থ হলো "দিল্লী চলো, দিল্লী চলো।" রাসবিহারী বসুকে প্রধান পরামর্শদাতা নিযুক্ত করা হয়।[৫৫১]

রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে গঠিত *ভারতের জাতীয় বাহিনী* (INA) দলাদলির ফলে তা প্রায় বিলুপ্ত হওয়ার উপক্রম হয়। ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে ভারতের অভ্যন্তরীণ সংগ্রামকে চাঙ্গা করার অভিপ্রায়ে সুভাষচন্দ্র বসু ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের ০৫ জুলাই ভারতের জাতীয় বাহিনী (INA) কে পুনর্গঠন করে আজাদ হিন্দ ফৌজ নাম দেন।[৫৫২] ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের ০১ আগস্ট বার্মার স্বাধীনতা ঘোষিত হলে আজাদ হিন্দ ফৌজের[৫৫৩] সর্বস্তরে শৃঙ্খলাস্থাপনের উদ্দেশ্যে ২৫ আগস্ট তিনি এবাহিনীর সর্বাধিনায়কের পদগ্রহণ করেন।[৫৫৪] নেতাজি রেঙ্গুন ও সিঙ্গাপুরে দু'টি সদর দপ্তর স্থাপন করে আজাদ হিন্দ ফৌজের পুনর্গঠনে হাত দেন। বেসামরিক নাগরিকদের মধ্য থেকে শুরু হয় সৈন্য ও অর্থ সংগ্রহ। ঝাঁসির রাণী বাহিনী নামে একটি নারী বাহিনীও গঠন করা হয়।[৫৫৫]

সিঙ্গাপুরে নেতাজির সর্বাধিনায়কত্ব লাভ পরবর্তী ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের ২১ অক্টোবর অস্থায়ী *স্বাধীন ভারত সরকার* (Azad Hind Government) গঠিত হয়। ২৩ অক্টোবর থেকে ১৯ নভেম্বরের মধ্যে অক্ষশক্তি তথা জাপান, জার্মানি প্রভৃতি আটটি রাষ্ট্র এই সরকারকে স্বীকৃতি দেয়। ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের ২৪ অক্টোবর

ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির বিরুদ্ধে নবগঠিত এই সরকার যুদ্ধঘোষণা করে। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের জাপানি কর্তৃত্ব নভেম্বরে আজাদ হিন্দ সরকারে হাতে অর্পিত হয় এবং ২৯ নভেম্বর নেতাজি আন্দামান দ্বীপ পরিদর্শন করেন।[৫৫৬] ব্রিটিশ চিফ কমিশনার ভবনে ত্রিবর্ণ রঞ্জিত স্বাধীন ভারতের পতাকা উত্তোলন করেন।[৫৫৭] আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপকে যথাক্রমে শহীদ ও স্বরাজ নাম প্রদত্ত হয়। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দের ১৪ ফেব্রুয়ারি আজাদ হিন্দ সরকার এই দ্বীপ দু'টির শাসনভার গ্রহণ করে।[৫৫৮] এতে উৎসাহিত হয়ে নেতাজি ০৬ জুলাই (১৯৪৪) আজাদ হিন্দ রেডিওতে ভাষণ দিতে গিয়ে মহাত্মাগান্ধীর উদ্দেশ্যে বলেন, ভারতের স্বাধীনতার যুদ্ধ শুরু হয়েছে। "জাতির জনক!" ভারত মুক্তির এই পবিত্র সংগ্রামে আমরা আপনার আর্শীবাদ ও শুভেচ্ছা চাই।[৫৫৯]

জেনারেল শাহ নেওয়াজ খানের নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজের একটি ব্যাটালিয়নকে জাপানি বাহিনীর সঙ্গে ভারত ও ব্রহ্মদেশ সীমান্তে যাওয়ার ও ইম্ফল অভিযানে অংশ নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়।[৫৬০] ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দের ৩১ মার্চ আজাদ হিন্দ ফৌজ দক্ষিণ মণিপুরে প্রবেশ করায় এই এলাকা আজাদ হিন্দ সরকারের শাসনাধীন হয়।[৫৬১] ১৭ এপ্রিল আসামের নাগা জেলার প্রধান শহর কোহিমা আজাদ হিন্দ ফৌজের অধিকারে আসে।[৫৬২] মণিপুর ও নাগা পাহাড়ের ভূমিতে স্বাধীন ভারতের ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা উত্তোলনের সাথে সাথে বিপ্লবী মনে নবউদ্যম জেগে উঠে। কিন্তু ইম্ফল আক্রমণের সকল আয়োজন সম্পন্ন হলেও প্রবলবর্ষণ আরম্ভ হওয়ায় রণকৌশলগত কারণে[৫৬৩] আক্রমণ স্থগিত রেখে ২৫ জুন কোহিমা ইম্ফলের পথ থেকে পশ্চাৎপসরণ করতে হয়।[৫৬৪] ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের ১৫ আগস্ট ব্রিটিশদের নিকট জাপান আত্মসমর্পণ করায় নেতাজির স্বাধীনতার স্বপ্ন আরাধ্যই থাকে।[৫৬৫] এদিকে ১৭ আগস্ট নেতাজি আজাদ হিন্দ ফৌজের বিমানে অজ্ঞাত যাত্রা করেন; সে সম্পর্কে সঠিক কিছু জানা যায়না।[৫৬৬] জাপানের পরাজয়ের মাধ্যমে আজাদ হিন্দ ফৌজের স্বাধীন ভারত ভূমির স্বপ্ন নস্যাৎ হলেও নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর বিপ্লবী কার্যক্রম থেকে ভারতীয় জনতা প্রতিবাদের শিক্ষা আয়ত্ব করে। এ পথেই ব্রিটিশ ভারত ছাড়তে বাধ্য হয়।

এদিকে ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের ২৯ অক্টোবর থেকে নভেম্বরের মধ্যে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গুলো মন্ত্রীত্ব ছেড়ে দিলে মুসলীম লীগ ১২ ডিসেম্বর ভারতে মুক্তি দিবস পালন করে। তারা অভিযোগ করে কংগ্রেস শুধু মুসলমান বিরোধী সংস্থা, তাই নয়; তার রাজনৈতিক নীতিও পৌরুষহীন। স্বাধীনতা সম্পর্কে মহাত্মাগান্ধীর দ্বিমুখী নীতির জন্যই বিরক্ত হয়ে কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ, মাওলানা হযরত হাসরত মোহানী (সৈয়দ ফজল-উল-হাসান) প্রমূখ মুসলিম নেতৃবৃন্দ কংগ্রেস ছাড়তে বাধ্য হন। ব্রিটেনের সাথে রাজনৈতিক সমঝোতার মাধ্যমে মুসলমানদের দাসত্ব -শৃঙ্খলে আবদ্ধ করাই কংগ্রেসের

অভিপ্রায়। এই প্রচার মুসলিম তরুণ ও ক্ষুদে বুর্জোয়াদের মনে প্রভাব ফেলে, তদুপরি যুদ্ধ সম্পর্কে কংগ্রেসের কান্ডদেখে মুসলিম লীগে যোগ দিতে থাকে।[৫৬৭] এহেন পরিবেশে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের উদ্যোগে ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের ২৩ মার্চ লাহোর সম্মেলনে কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর সভাপতিত্বে বাংলার প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক সর্ব ভারতীয় মুসলমানদের স্বার্থে এক রাজনৈতিক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। মুসলিম লীগের এ সম্মেলনে উক্ত প্রস্তাব লাহোর প্রস্তাব নামে গৃহীত হয়। এ লাহোর প্রস্তাব পরবর্তীতে পাকিস্তান আন্দোলনের পথ সুগম করে এবং ভারতীয় মুসলমানদের নিকট জনপ্রিয়তা লাভ করে।[৫৬৮] সভাপতির অভিভাষণে কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলি জিন্নাহ স্মরণ করিয়ে দেন যে, মুসলিম লীগের লক্ষ্য ভারতের স্বাধীনতা, কিন্তু হিন্দু এবং মুসলমান দুই পৃথক জাতি; মেনে এবং তথাদর্শে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে বলে মন্তব্য করেন মর্মে উল্লেখ পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে (১৯৩৯-৪৫) যুদ্ধরত ব্রিটিশ শক্তি যাতে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ফলে কোনো প্রকার অসুবিধায় না পড়ে সে কথা মহাত্মাগান্ধী বেশ কয়েকবার ব্যক্ত করেন।[৫৬৯] কংগ্রেস নেতারা যুদ্ধকালে প্রথমে সংগ্রামের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু ব্রিটিশের আপসহীন মনোভাবের ফলে কংগ্রেস সংগ্রামের পথ ধরে।[৫৭০] ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের ০৮ আগস্ট বোম্বাই শহর অধিবেশনে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি দেশকে মুক্ত করতে অহিংস পথে আন্দোলন সিদ্ধান্ত করে।[৫৭১] শুরু হয় মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারত ছাড় আন্দোলন। তিনি মানুষকে উৎসাহ দিয়ে বলেন, হয় স্বাধীনতা লাভ কর, না হয় মৃত্যুবরণ কর। পরাধীন হয়ে আর প্রাণধারণ করে থেকো না।[৫৭২] পরদিন ০৯ আগস্ট সকাল থেকে দেশ জুরে ধরপাকড় শুরু হয়। বোম্বাই শহরে মহাত্মাগান্ধি, পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু ও মাওলানা আবুল কালাম আজাদকে গ্রেফতার করার সাথে সাথে সরকার কর্তৃক কংগ্রেসকে বেআইনি ঘোষণা করা হয়।[৫৭৩]এ আন্দোলন ক্রমে বিপ্লবে পরিণত হয়। বিপ্লবী জনতাই তখন সংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। বাংলা, উড়িষ্যা, কর্ণাটক ও মহারাষ্ট্রে বিপ্লবী জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা হয়। স্বাধীনতার জন্য এ গণআন্দোলন ছিল অভূতপূর্ব।[৫৭৪]

গণআন্দোলনের তীব্রতায় সরকার দমন-পীড়ন চালায় এবং একপর্যায়ে ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দের ০৬ মে মহাত্মাগান্ধীকে তাঁর ভগ্নস্বাহ্যের জন্য বিনা শর্তে মুক্তি দিলেও সরকার কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির অন্যান্য সদস্যদের মুক্তিদানে অস্বীকৃত হয়।[৫৭৫] তাঁর মুক্তির পর ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের সাহায্যে কোহিমা থেকে আজাদ হিন্দ ফৌজকে হটিয়ে দেয়। বার্মায় বর্মীদের সাহায্যে জাপানিদের হটিয়ে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ নেয়। এসময় মহাত্মাগান্ধী প্রচার করেন, আগস্ট বিপ্লব আমার বা কংগ্রেসের কাজ নয়; সরকারি নির্যাতনেই বিপ্লব তুঙ্গে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সৃহৃদ জয়প্রকাশ নারায়ণ প্রচার করেন, এখন দেশ আর

বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত নয়।[৫৭৬] সুতরাং মহাত্মাগান্ধীকে বিনাশর্তে মুক্তির পিছনে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের নূন্যতম সম্ভাব্যতাকেও অকার্যকর করার জন্য বিপ্লব বিরোধী শক্তিকে কাজে লাগানোর পরিকল্পনা ছিল বলে অনুমিত হয়।

১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের ০৮ মে জার্মানির এবং ১৫আগস্ট জাপানের সম্রাট হিরোহিতো নিঃশর্ত আত্মসমর্পনের ঘোষণা করেন। ফলশ্রুতিতে ০২ সেপ্টেম্বর থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞ বন্ধ হয়।[৫৭৭] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বন্ধ হলেও গ্রেটব্রিটেনের অর্থনৈতিক অবস্থা ভেঙ্গে পড়ে। এদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্বরূপ সমগ্র বিশ্বের, বিশেষ করে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের শোষণ-উৎপীড়নে জর্জরিত দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার নবজাগরণের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে সমগ্র ভারতবর্ষেও এক অভুতপূর্ব গণঅভ্যুত্থান উঁকি দেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও আগস্ট সংগ্রামের শিক্ষালব্ধ উন্নত রাজনৈতিক চেতনায় সমৃদ্ধ জনতা এবার আপসহীন সংগ্রামের প্রস্তুতি নেয়।[৫৭৮]

জাপানের পরাজয়ের পর পূর্ব রণাঙ্গনে ব্রিটিশের হাতে বন্দি আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসার ও সৈনিকরা।[৫৭৯] জনমানসে মহান দেশপ্রেমিক হিসেবে আভিনন্দিত হয়।[৫৮০] তবে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের আগস্টে ব্রিটিশ সরকার রাজদ্রোহের অপরাধে তাদের বিচারের ঘোষণা দেয়ায় জনতা ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানায়।[৫৮১] জনগণের মনোভাব বুঝে কংগ্রেসও বিচারের নিন্দা করে। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের ২১ থেকে ২৩ সেপ্টেম্বর বোম্বাইয়ের ওয়াকিং কমিটির বৈঠকে প্রস্তাব গ্রহণ করে ফায়দা হাসিলের প্রয়াস পায়। লাল কেল্লার ঐতিহাসিক বিচারে তাদের হয়ে মামলা লড়েন ভুলাভাই দেশাই,তেজবাহাদুর সাপ্রু, কৈলাশনাথ কাটজু,পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু ও আসফ আলী। মুসলিম লীগও এ বিচারের প্রতিবাদ জানায়। কংগ্রেস অহিংস এবং মুসলিম লীগ নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের কথা বলে। কিন্তু জনগণের মনোভাব ছিল অন্যরকম। তাঁরা ব্রিটিশ শাসকদের কোনো বিধি-নিষেধ মানতে রাজী ছিল না।[৫৮২] সরকারি ভূমিকার সমালোচনায় সংবাদপত্রে সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশিত হতে থাকে। আজাদ হিন্দ ফৌজের খবরে আন্তর্জাতিক সকল খবর ম্লান হয়ে যায়। অসংখ্য পুস্তিকা প্রকাশিত হতে থাকে। দেশ প্রেমিকরা বিশ্বাসঘাতক নয়; পুস্তিকাটি জনপ্রিয়তা পায়।

১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে আজাদহিন্দ ফৌজের সেনাদের মুক্তির দাবিতে প্রথম বিস্ফোরণ ঘটে। পরবর্তীতে অসংখ্য গণ-বিস্ফোরণে ভারতে ইংরেজ শাসনের ভিত ধ্বসে পড়তে থাকে। এবং শেষ আঘাতে দুইশত বৎসরের পুরাতন ব্রিটিশ শাসনের পতন অবশ্যম্ভাবী করে তোলে।[৫৮৩] ২২ নভেম্বর বিচারের প্রতিবাদ জানিয়ে ব্রিটিশ বন্দি-শিবিরে আবদ্ধ আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তির দাবিতে এক বিশাল

মিছিল কলকাতা শহর প্রদক্ষিণ করে। ছাত্র, শ্রমিক, নিম্নমধ্যবিত্ত ও অফিস কর্মচারীরা এতে যোগদেয়। কলকাতা পৌরসভার শ্রমিকরা ধর্মঘট করায় কয়েকদিন পানি সরবরাহ, বিদ্যুৎকেন্দ্র ও ট্রাম-বাস বন্দ থাকে। বাংলার গভর্নর সেনাবাহিনী তলব করে পরিস্থিতি সামাল দিতে সচেষ্ট হয়।[৫৮৪] কিন্তু এ সংগ্রাম সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলে। ব্রিটিশ সরকার এই নতুন বৈপ্লবিক গণ-অভ্যুত্থানের রূপ দেখে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ০৪ জানুয়ারি আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দিদের মুক্তি দেয়। এ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ভারতে ব্রিটিশ শাসন অবসানের সূচনা হয়।[৫৮৫]

এদিকে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনা অফিসার ক্যাপ্টেন রশিদ আলীকে সাত বৎসরের কারাদন্ড দেয়ার প্রতিবাদে জনগণ অধৈর্য হয়ে পড়ে। ১১ থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কলকাতায় চলা আন্দোলন গণপ্রতিরোধের রূপ পায়। এতে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যবদ্ধভাবে অংশ নেয়। জনতা ঔপনিবেশিক শাসন প্রত্যাখান করে কলকাতাগামী ট্রেনে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের পতাকা লাগায়। শহরের বিভিন্ন অংশে পুলিশ ও সেনাসদস্যরা গুলি চালায়। বিক্ষুব্ধ জনতা পুলিশ ও সেনাবাহিনীর গাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে। দিল্লী, লাহোর, বোম্বাই, এলাহাবাদ ও মাদ্রাজেও আন্দোলন হয়। ৪৬ জনের প্রাণহানি ঘটে।[৫৮৬] এ প্রাণহাণির ঘটনায় পুরো দেশ আন্দোলিত হয়ে উঠে।

বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণির এই বৈপ্লবিক সংগ্রামে ভারতীয় বিমান, নৌ ও সশস্ত্রবাহিনী চঞ্চল হয়ে ওঠে এবং নানা প্রকার দাবি আদায়ে এই মহাসংগ্রামে শামিল হয়। সশস্ত্র বাহিনীর এ যোগদান বৈপ্লবিক সংগ্রামের শেষ স্তরের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য মনে করা হয়। ০৭ ফেব্রুয়ারি বোম্বাই শহরে অবস্থিত ভারতীয় বৈমানিকগণ ইংরেজ অফিসারদের বৈষম্যমূলক আচরণের প্রতিবাদে অনশন শুরু করে।[৫৮৭] ভারতীয় বিমান বাহিনীর বোম্বাই ঘাটিতে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে প্রথম এঘটনা ঘটে। বিমান বাহিনীর ভারতীয় অফিসাররা ধর্মঘটে শামিল হয়। একজন ব্রিটিশ অফিসার কর্তৃক এক ভারতীয় পাইলটকে অপমান করার প্রতিবাদে এই ধর্মঘট হয়।[৫৮৮]

সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এবিক্ষোভ বিমান বাহিনী থেকে নৌবাহিনীতে সম্প্রসারিত হয়। নানা ধরণের আর্থিক দাবি-দাওয়াসহ নিম্নমানের খাবার পরিবেশনা বিক্ষোভের একটি কারণ ছিল। পাশাপাশি ব্রিটিশ অফিসারদের জাতি বিদ্বেষ মূলক আচরণও নৌসেনাদের বিক্ষুব্ধ করে তোলে। ১৮ ফেব্রুয়ারি বোম্বাইয়ে তলোয়ার জাহাজে ঐতিহাসিক নৌবিদ্রোহ শুরু হয়। পরদিন সমুদ্রে থাকা দুটি জাহাজের নাবিকরা যোগদেয়ায় বিদ্রোহীদের সংখ্যা কুড়ি হাজারে পৌঁছায়।[৫৮৯] গুরুত্ব অনুধাবনপূর্বক ব্রিটিশ সরকার পরদিনই ভারতীয় সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে একটি ক্যাবিনেট মিশন প্রেরণ সিদ্ধান্ত করে।[৫৯০]

অহিংসপথে ধর্মঘটের সূচনা হলেও ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ধর্মঘটিদের সেনা ব্যারাকের ওপর আক্রমণ চালানোয় ধর্মঘট বিদ্রোহের রূপপরিগ্রহ করে। ২১ ফেব্রুয়ারির মধ্যে এ বিদ্রোহে কলকাতা, করাচি, দিল্লী, বিশাখাপত্তম ও মাদ্রাজ নৌবাহিনীর ভারতীয় সদস্যরা যোগদান করে।[৫৯১] করাচিতে হিন্দুস্থান জাহাজের ধর্মঘটি নৌসেনাদের ওপর ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ গুলি চালালে ২৫ মিনিটের মধ্যে তারা পরাজিত হয়। বিদ্রোহের সমর্থনে করাচিতে হরতাল চলাকালে পুলিশ-জনতা সংঘর্ষ হয় বলে জানা যায়। ধর্মঘট পরিচালনা কমিটি[৫৯২] উত্থাপিত দাবি পরিপূর্ণ রাজনৈতিক ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী উপাদানে ঠাসা প্রতিভাত হয়। ইন্দোনেশিয়া থেকে সকল ভারতীয় সেনা প্রত্যাহারও দাবি করে।[৫৯৩] নৌবিদ্রোহীরা ব্রিটিশ রাজকীয় পতাকা জাহাজ থেকে নামিয়ে কংগ্রেস,মুসলিম লীগ ও কমিউনিস্ট পার্টির পতাকা উড়িয়ে এসকল পার্টির নিকট সাহায্যের আবেদন জানাতে থাকে।[৫৯৪]

উদ্ভুত পরিস্থিতি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলি কমনস সভায় ঘোষণা করেন, রয়াল নেভির জাহাজগুলো যাত্রা করেছে বোম্বাইয়ের দিকে। আর.আই.এন.'র অ্যাডমিড়াল গডফ্রে নৌ সেনাদের উদ্দেশ্যে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করার পর জাহাজগুলোকে সৈন্যরা ঘিরে ফেলে। আকাশে বোমারু বিমান চক্কর দিতে থাকে।[৫৯৫] এহেন যুদ্ধাবস্থায় নৌবিদ্রোহীদের সমর্থনে বোম্বাইয়ের তিনলক্ষ শ্রমিক ধর্মঘট শুরু করে।[৫৯৬] অমৃতবাজার পত্রিকার মতে বোম্বাই শহরকে ঘিরে কার্যত ইস্পাতের বলয় গড়ে তোলা হয়। শহরে ব্রিটিশ মিলিটারী ও পুলিশ গুলি চালায়। ২২৮ জন বেসামরিক ব্যক্তি নিহত ও ১০৪৬ জন আহত হয়।[৫৯৭]

নৌবিদ্রোহীদের সমর্থনে জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের কেউই এগিয়ে আসেনি। মহাত্মাগান্ধী, পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু, বল্লভভাই প্যাটেল সকলেই বিদ্রোহের সমালোচনা করে। অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে ২৪ ফেব্রুয়ারি কংগ্রেস নেতা বল্লভভাই প্যাটেলের আহ্বানে নৌবিদ্রোহীরা আত্মসমর্পণ কালে বলে:আমরা ব্রিটিশ রাজের নিকট আত্মসমর্পণ করছিনা, আমরা আত্মসমর্পণ করছি ভারতবাসীদের নিকট।[৫৯৮] কংগ্রেসনেতা পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু এই নৌ বিদ্রোহকে এ যুগের একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করেন।[৫৯৯] আপাত: মহান নৌ বিদ্রোহের অবসান ঘটলেও ভারতীয় সেনাবাহিনীর আনুগত্যের সঙ্কট; ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অশনি সংকেত মনে করা হয়। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম এগিয়ে যায়। বৈশ্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় ব্রিটিশ সরকার তাদের দোসর কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সাথে আপস আলোচনায় ক্ষমতা হস্তান্তর করত:দ্রুত ভারত ত্যাগের সিদ্ধান্ত করে। যাতে করে ভারত ত্যাগের পরেও এদেশে তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ বজায় থাকে। আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচার কেন্দ্রিক অভ্যুত্থান ও নৌবাহিনীর বিদ্রোহ এক্ষেত্রে নিয়ামক ভূমিকা পালন করে অনুমিত হয়।

১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসের নির্বাচনে রক্ষণশীল দলের পরাজয়ে শ্রমিক দলের *ক্লেমেন্ট অ্যাটলি* (C.R.Attlee) ও *স্যার প্যাথিক লরেন্স* (Sir Pathick Lawrence) যথাক্রমে প্রধানমন্ত্রী ও ভারত সচিব নিযুক্তির সাথে সাথে ব্রিটিশ সরকার ভারতের শাসনতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য নতুনভাবে চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের ০৪ ডিসেম্বর ব্রিটিশ লর্ডসভায় ভারত সচিবের ঘোষণা অনুযায়ী ভারতে একটি পার্লামেন্টারি দল প্রেরণ করে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সাপেক্ষে ভারতকে স্বাধীনতা প্রদান করাই এর উদ্দেশ্য ছিল বলা হয়। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারিতে দলটি ভারতে আগমন করে কিন্তু উদ্যোগটি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।[৬০০]

পরবর্তীতে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারি বোম্বাইতে নৌবিদ্রোহ শুরু হলে ১৯ ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী *ক্লেমেন্ট অ্যাটলি* (C.R.Attlee) কমন্সসভায় ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধান রচনার ব্যাপারে আলাপ আলোচনার জন্য তিনজন ব্রিটিশ মন্ত্রীকে ভারতে পাঠানোর কথা ঘোষণা করেন।[৬০১] ক্যাবিনেট মিশন সদস্য ভারতসচিব *প্যাথিক লরেন্স* (Sir Pathic-Lawrence), বোর্ড অব ট্রেডের সভাপতি *স্টাফোর্ড ক্রিপস্* (Sir Richard Stafford Cripps) এবং ফাস্ট লর্ড অব অ্যাডমিরালটি *এ.ভি. আলেকজান্ডার* (A.V.Alexander) ২৪ মার্চ দিল্লি পৌঁছায়।[৬০২] রাজনৈতিক নেতা, প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নেতা ও দেশীয় রাজ্যের রাজাদের সাথে মতবিনিময় করেন। এবং ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ১৬ মে তাঁরা নিজস্ব পরিকল্পনা ঘোষণা করে; যা *মন্ত্রি মিশন পরিকল্পনা* (Cabinet Mission Plan) নামে খ্যাত।[৬০৩]

কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ক্যাবিনেট মিশন প্রস্তাব মেনে নেয়ায় ঐ বৎসর ০৬ জুনে মুসলিম লীগের ওয়াকিং কমিটিতে এই প্রস্তাব পাস হয়।[৬০৪] অপরদিকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনাকে আংশিকভাবে গ্রহণ করে। কিন্তু ১০ জুলাই কংগ্রেসের নব নির্বাচিত সভাপতি পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু জনৈক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে এক বিবৃতিতে বলেন, কংগ্রেস বোঝাপড়ার কোনো রকম বাঁধন না মেনে এবং সবসময় অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা গ্রহণের স্বাধীন মনোভাব নিয়ে গণপরিষদে যোগদান করবে। তবে সেখানে তেমন বুঝলে কংগ্রেস অবাধে ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনার রদ-বদল করতে পারে।[৬০৫] পন্ডিত জওহরলাল নেহেরুর এই বিবৃতির ফলে মুসলিম লীগ মহলে কংগ্রেসের অভিসন্ধি সম্পর্কে সন্দেহের উদ্রেক করে। পরিস্থিতিতি আমলে নিয়ে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ২৭-২৯ জুলাই বোম্বে শহরে অনুষ্ঠিত কাউন্সিল সভায় ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা গ্রহণ করার পূর্ব সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার ঘোষণা করে।[৬০৬] এভাবে ভারতীয় কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের মধ্যে মতবিরোধ বৃদ্ধি পায়। উদ্ভুত পরিস্থিতি সামাল দিতে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার আহ্বানে বড়োলাট,

কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের লন্ডন সম্মেলনও ব্যর্থ হলে ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা বাতিল করে সরকার নতুন পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হয়।[৬০৭]

এহেন সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ২০ ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট অ্যাটলি ব্রিটিশ পার্লামেন্টে এক ঘোষণায় এক নতুন পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ৩০ জুনের মধ্যে ভারতকে স্বাধীনতা দানে *লর্ড ওয়াভেলের* (Lord Archibald Percival Wavell) স্থলে *লর্ড মাউন্টব্যাটেন* (Lord Nicholas Mounbatten) কে ভারতে বড়লাট নিয়োগ জানায়।[৬০৮] ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ২২ মার্চ লর্ড মাউন্টব্যাটেন তার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতৃবর্গের সাথে আলোচনার উদ্যোগ নেন।[৬০৯] ২৩ মার্চ মুসলিম লীগ পাকিস্তান দিবস পালন করে। সমগ্রদেশে অব্যাহত সাম্প্রদায়িক হানাহানি গতিতে চলতে থাকে। দেশ ক্রমশ গৃহযুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়। এ অবস্থায় লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারতের সার্বিক পরিস্থিতি মূল্যায়ন করে *ক্যাবিনেট মিশন* (Cabinet Mission Plan) পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্ভব নয়; ভারত বিভাগ সিদ্ধান্ত করেন। তিনি লক্ষ্য করেন, কংগ্রেস নেতা পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু ও সরদার বল্লভ ভাই প্যাটেলও বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে একথা স্বীকার করতে বাধ্য হন যে, দেশ বিভাগ ছাড়া তাঁদের সামনে কোন বিকল্প রাস্তা নেই। তবে মহাত্মাগান্ধী এ ভয়াবহ সময়েও দেশ বিভাগের বিরোধিতা করেন।[৬১০] ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ৩১ মার্চ তিনি বলেন, If the Congress wishes to accept partition, it would be over my dead body.[৬১১] তবে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির ভয়াবহতা লক্ষ্য করে শেষপর্যন্ত তিনিও দেশ বিভাগে সম্মতি জ্ঞাপন করেন বলে জানা যায়।[৬১২] দেশ বিভাগ মেনে নেয়া ছাড়া এ সময় তাঁর অন্য কোনো উপায়ও ছিল না। কারণ ভারতীয় রাজনীতিতে ইতোমধ্যে মহাত্মাগান্ধির স্থলে প্যাটেল-নেহেরু গোষ্ঠীর জামানা চালু হয়ে যায়।

ইতোমধ্যে লর্ড মাউন্টব্যাটেন তাঁর উপদেষ্টাদের পরামর্শক্রমে একটি শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। এ পরিকল্পনায় প্রদেশগুলির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রস্তাব করা হয়। এবং এতে বলা হয়, ইচ্ছা করলে প্রদেশগুলো উপ-যুক্তরাষ্ট্র (Confedaration) গঠন করতে পারবে। বাংলাদেশ ও পাঞ্জাব বিভাগেরও প্রস্তাব করা হয়।[৬১৩] জনগণের মতামত জানার জন্য উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে নতুন করে নির্বাচন করতে হবে।[৬১৪] এই পরিকল্পনাটি ১৫ ও ১৬ এপ্রিল গভর্নরদের বৈঠকে অনুমোদিত হয়।[৬১৫] ০২ মে এই পরিকল্পনা লন্ডনে প্রেরণ করলে লেবার পার্টির সরকার কছিুটা সংশোধন করে অনুমোদন দেয়। বড়োলাট লর্ড মাউন্টব্যাটেন সিমলায় অবস্থানকালে ১০ মে বিলটি তাঁর হাতে পৌঁছায়। মাউন্টব্যাটেন তার সঙ্গে থাকা পন্ডিত জওহরলাল নেহেরুকে পরিকল্পনাটি দেখতে দেন। নেহেরু পরিকল্পনাটির ব্যাপারে তীব্র আপত্তি করে বলেন, এর ফলে বলকান অঞ্চলের মত ভারতে বহু রাষ্ট্রের সৃষ্টি হবে।

পরিকল্পনাটি বাতিল হয়ে যায়। নতুন পরিকল্পনার উদ্যোগ হয়। মাউন্টব্যাটেন এ পরিকল্পনা প্রণয়নের ভার তাঁর শাসনতান্ত্রিক উপদেষ্টা ভি.পি. মেননের উপর ন্যস্ত করেন। নতুন পরিকল্পনা রচিত হয়। ১১ মে পরিকল্পনাটি পন্ডিত জওহরলাল নেহেরুকে দেখতে দেয়া হয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর নেহেরু এতে সম্মতি জানায়। লর্ড মাউন্টব্যাটেন নিজে ১৮ মে এই পরিকল্পনাটি নিয়ে লন্ডন যান। এবং পরিকল্পনাটি ব্রিটিশ সরকারের অনুমোদনের পর ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। ০২ জুন বড়োলাট পরিকল্পনাটি নিয়ে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও শিখ নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা করেন। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ০৩ জুন বড়লাট লর্ড মাউন্টব্যাটেন তাঁর পরিকল্পনাটি ভারতীয় জনগণের কাছে প্রকাশ করেন।[৬১৬] এই পরিকল্পনাটি মাউন্টব্যাটেন ০৩ জুন পরিকল্পনা নামে পরিচিত।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ০৩ জুনের শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনায় ভারতবর্ষকে ডোমিনিয়ন স্টাটাসের ভিত্তিতে বিভক্ত করে ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রকে পূর্ব ঘোষিত সময়ের পূর্বেই ক্ষমতা হস্তান্তরের রূপরেখা হয়।[৬১৭] রাষ্ট্র দু'টি ইচ্ছা করলে ব্রিটেনের সাথে সম্পর্ক ছেদও করতে পারবে। ভারতের আভ্যন্তরীণ অবস্থা তখন এমন বিস্ফোরন্মুখ হয় যে, শাসন-ক্ষমতা হস্তান্তর ব্যতীত ব্রিটিশ শাসকদের সম্মুখে আর কোন পথ খোলা ছিল না। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়েই এই পরিকল্পনা গ্রহণ করে।[৬১৮]

ডোমিনিয়ন স্টাটাস ভারতীয় নতুন প্রশাসনকে এ সকল ঝামেলা থেকে মুক্তি দেবে মনে করা হয়। কেননা ব্রিটিশ সিভিল সার্ভিসের অফিসাররা আরো কিছুদিন ভারতে থেকে ভারতীয়দের প্রশাসন পরিচালনায় সাহায্য করবেন। এ ব্যবস্থা ভারতকে সাময়িকভাবে হলেও কমনওয়েলথে রাখার সুযোগ করে দেয়, যা ব্রিটেন হারাতে চায়নি। অন্যদিকে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ পাকিস্তানকে কমনওয়েলথে অন্তর্ভূক্তির প্রস্তাব দিলেও ভারতের অর্থনৈতিক শক্তি ও প্রতিরক্ষা সামর্থ্যের নির্ভরযোগ্যতা; তাছাড়া ভারতে ব্রিটেনের বাণিজ্য ও লগ্নির পরিমাণও অনেক বেশি থাকায় কমনওয়েলথে ভারতের সদস্যপদ ব্রিটেনের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়।[৬১৯]

অবশেষে ০৩ জুন পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্রিটিশ সরকার নিশ্চিত হয় যে, ভারত উপমহাদেশ স্বাধীন হবে দু'টি রাষ্ট্র হিসেবে। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৮ জুলাই ভারত স্বাধীন আইন পাস করে। এই আইন পাসের সাথে সাথে ভারত বর্ষের উপর থেকে প্রায় দীর্ঘ দু'শত বৎসরের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের আইনগত অবসান ঘটে।[৬২০] শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিকতার প্রহর শুরু হয়। ইতোমধ্যে পরিকল্পনা অনুসারে আসামের সিলেট জেলা ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে অনুষ্ঠিত গণভোট জনতা পাকিস্তানের পক্ষে রায় দেয়। বাংলা ও পাঞ্জাব বিভক্ত হয়ে পশ্চিমপাঞ্জাব এবং পূর্ববাংলা পাকিস্তানের সাথে

যুক্তহয়।[৬২১] র‍্যাডক্লিফ কমিশন বাংলা ও পাঞ্জাব প্রদেশকে বিভক্তসূচক সীমানা নির্ধারণ করে।[৬২২] ব্রিটিশ ভারতের মধ্যকার আন্দোলন মুখি দুটি জনগোষ্ঠী তথা বাঙালি ও পাঞ্জাবিদের বিভক্ত করার মাধ্যমে বিপ্লবপন্থি মধ্যবিত্ত শ্রেণির বৈপ্লবিক শক্তিকে খর্বকরার প্রয়াস পায়।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ আগস্ট লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন পাকিস্তান গণপরিষদে ভাষণ দান করত; ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। অত:পর কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল হিসেবে অভিষিক্ত হন। অনুরূপভাবে ১৫ আগস্ট লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন ভারতীয় গণপরিষদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। পন্ডিত জওহরলাল নেহেরুর প্রস্তাবে লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন ভারতের গভর্নর জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।[৬২৩] এভাবে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ আগস্ট ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যেই পাকিস্তান-ডোমিনিয়ন ও ভারত-ডোমিনিয়ন এর অভ্যূদয় ঘটে।[৬২৪] বস্তুতপক্ষে এভাবে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির বৈপ্লবিক সংগ্রামের অভিঘাতে দিশেহারা সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকার স্বীয় স্বার্থের প্রতিভূ ভারতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের অনুকূলে ক্ষমতা ত্যাগ করত: ব্রিটিশ স্বার্থ সমুন্নত রাখতে প্রয়াস পায়।

সর্বোপরি ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের বঙ্গবিভাগ বিরোধী বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন সঞ্জাত স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাবে যে বৈপ্লবিক আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে পরবর্তীতে তা স্বাধীনতার দাবিতে উন্নীত হয়। জেল-জুলুম, দীপান্তর, ফাঁসিকাষ্ঠে জীবনাহুতির মাধ্যমে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণি বৈপ্লবিক দাবি আদায়ে বলিষ্ঠতার প্রমাণ দেয়। ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে প্রথম বিশ্বকালীন ২১ ফেব্রুয়ারি দেশব্যাপী সেনা অভ্যুত্থান প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় বিপ্লবী রাসবিহারী বসু জাপানে পাড়ি জমান। এই ব্যর্থতার পর একই বৎসরে নব উদ্যমে জার্মান অস্ত্র নিয়ে বিপ্লব প্রচেষ্টায় অস্ত্রের সন্ধ্যানে উড়িষ্যার বালেশ্বরে বুড়িবালাম নদীর তীরে অপেক্ষমান বিপ্লবী জ্যোতিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘাজ্যোতিন) ০৯ সেপ্টেম্বর ০৪ জন সঙ্গীসহ পুলিশ কমিশনার চালর্স টেগার্ট নেতৃত্বাধীন পুলিশ বাহিনীর নিকট এক অসমযুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন দেন। এসবের মাধ্যমে ক্রমে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব জাগরিত হতে থাকে। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ডের মাধ্যমে দেশের গণরাজনৈতিক ধারা আবেদন-নিবেদনের পথ থেকে সরে আসে। ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব নিয়ে স্বরাজের দাবিতে খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে নেমে পড়ে। কংগ্রেস নেতৃত্ব আপসকামী হলেও মধ্যবিত্ত শ্রেণির বৈপ্লবিক সংগ্রাম কখনো প্রকাশ্যে কখনো বা চুপিসারে এগিয়ে যেতে থাকে কাঙ্ক্ষিত বিজয় অর্জন না হওয়া অবধি। সর্বোপরি ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের ২৪ অক্টোবর বিপ্লবী আজাদ হিন্দ সরকারের পক্ষে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির রুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধঘোষণা করেন। যুদ্ধ জয়ের মাধ্যমে মণিপুরের কোহিমায় স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে বিপ্লবের সফলতার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হন। কিন্তু অকস্মাৎ জাপানের আত্মসমর্পণ এবং ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের ১৮

আগস্ট নেতাজির মৃত্যুর ফলে বৈপ্লবিক স্বাধীনতার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়নি। কিন্তু এই ঘটনা পরম্পরায় জনতা বৈপ্লবিক মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়। ভারত স্বাধীনতার দোরগোড়ায় উপনীত হয়।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে মোহনদাস করমচাঁদগান্ধী ওরফে মহাত্মাগান্ধী ও নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর অবদান অবিস্মরণীয়। তবে উভয় নেতার মত ও পথের মধ্যে ভিন্নতা ছিল আকাশ পাতাল। মহাত্মাগান্ধী ছিলেন অহিংসবাদী, পক্ষান্তরে সুভাসচন্দ্র বসু এপথে ছিলেন আস্থাহীন। মহাত্মাগান্ধী নরমপন্থি রাজনৈতিক কিন্তু সুভাসচন্দ্র বসু ছিলেন চরমপন্থি ও বিপ্লবী নেতা। এটি মনে করিনা যে, শুধু মহাত্মাগান্ধী পরিচালিত নিরস্ত্র বিপ্লব, অহিংস অসহযোগ, অনশন ও আত্মশুদ্ধির আন্দোলনেই ভারতবর্ষ স্বাধীনতা অর্জন করেছে। বরং এটিই প্রতীয়মান হয় যে, যখন কোন গণআন্দোলন ব্যাপকতা লাভ করেছে; তখনই মহাত্মাগান্ধী সে আন্দোলনের রাশ টেনে ধরেছেন। আন্দোলন থমকে গেছে; একইসাথে চাহিত স্বাধীনতা দূরে সরে গেছে। বরং বিশ্বাস করি, মহাত্মাগান্ধীর অহিংসা ও আইন অমান্য আন্দোলনের সাথে সশস্ত্র সংগ্রামীদের আক্রমণাত্মক কার্যাবলি ও নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর বিদেশ গমন, জার্মানিতে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন, ইউরোপ থেকে দক্ষিণ-পূর্বএশিয়ায় আগমন, আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠা ও সে সরকারকে বেশ কয়েকটি প্রভাবশালী রাষ্ট্রের স্বীকৃতিদান,ইঙ্গ-মার্কিন মিত্র শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা, ভারতবর্ষের পূর্ব সীমান্তে আক্রমণ, নাগাপাহাড় ও মনিপুরের অধিকাংশ অঞ্চল অধিকার করে স্বাধীন পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে সাফল্যের প্রান্ত সীমায় পৌঁছেন। পরবর্তীতে দিল্লীর লাল কেল্লায় আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনাপতি ক্যাপ্টেন শাহনেওয়াজ, ক্যাপ্টেন ধীলন ও ক্যাপ্টেন সাইগলের বিচারকালে ভারতীয় জনগণ তাদের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন ব্যক্তকরে ও বিচারের প্রতিবাদ জানায়। সর্বোপরি ভারতীয় সৈন্যদলের ভেতর বিদ্রোহের ভাবপ্রকাশের ঘটনায় ব্রিটিশ সরকার ভারত ত্যাগের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয় বলে অনুমিত হয়। এহেন আঘাতের স্বরূপ ও ক্ষমতা জেনেই ব্রিটিশ কবি, কুটনীতিক ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী রাজনৈতিক কর্মী W. S. Blunt বলেন: My experience is that when England has her face well slapped,she apologises,not before. অর্থাৎ আমার অভিজ্ঞতায় একথা বলতে পারি যে, ইংলন্ড তার গন্ডদেশে চপেটাঘাত না খেয়ে কখনো নিজের ত্রুটির জন্য ক্ষমা চায়না। কাজেই একথা বললে অত্যুক্তি হবেনা যে, বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির সশস্ত্র বৈপ্লবিক আন্দোলনের ফলে ভারতব্যাপী যে সশস্ত্র বৈপ্লবিক আন্দোলন গড়ে উঠে তারই প্রভাবে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ আগস্ট ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যেই পাকিস্তান-ডোমিনিয়ন ও ১৫ আগস্ট ভারত-ডোমিনিয়ন এর অভ্যুদয় ঘটে। এভাবে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির সশস্ত্র বৈপ্লবিক আন্দোলনের অভিঘাতে পাওয়া স্বাধীনতা পরবর্তী শাসনভার মুসলিম লীগ ও ভারতীয় কংগ্রেসের হাতে হস্তান্তরের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকার ভারত ত্যাগ করে।

টিকা ও তথ্য নির্দেশ

১. সুপ্রকাশ রায়, *ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম*, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, ২০১৮, পৃ.১৭৫

২. সুপ্রকাশ রায়,*ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম (১৮৯৩-১৯৪৭)*,র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন,কলকাতা,২০১৩,পৃ.২৩

৩. A.R.Desai, *Social Background of Indian Nationalism,* Popular Book Depot, Bombay,1948,p. 237.

৪. সুপ্রকাশ রায়, *ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস (১৯০১-১৮)*, ডিএনবিএ ব্রাদার্স, কলকাতা, ১৯৭০,পৃ.১৫৫

৫. বিপান চন্দ্র ও অন্যান্য,*ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ১৮৫৭-১৯৪৭* (অনুবাদ,সুশীল মুখোপাধ্যায়), কেপি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী,কলকাতা,২০১৪, পৃ.১০৩।

৬. *The New Fontana Dictionary of Mordern Thought* Third Edition,Allan Bullock and Stephen Trombley, Eds. 1999, pp. 754-56. (উদ্ধৃতঃ https://en.m.wikipedia.org>wiki, Accessed on: 23.04.2022.)

৭. হেমচন্দ্র কানুনগো, *বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা*, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেসন, কলকাতা, ২০১৬,পৃ.৭০

৮. উমা মুখোপাধ্যায় ও হরিদাস,*শ্রী অরবিন্দ ও বাংলায় বিপ্লববাদ*,ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়,কলকাতা,১৯৭২,পৃ.০১

৯. অনন্ত সিংহ, *সূর্যসেনের স্বপ্ন ও সাধনা*,র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, ২০১৯, পৃ.৭৭

১০. অনন্ত সিংহ, *প্রাগুক্ত*

১১. অনন্ত সিংহ, *প্রাগুক্ত*

১২. অনন্ত সিংহ, *প্রাগুক্ত*

১৩. অনন্ত সিংহ, *প্রাগুক্ত*

১৪. সুপ্রকাশ রায়, *ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস (১৯০১-১৮)*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. (মুখবন্দ) নয়-দশ।

১৫. সুপ্রকাশ রায়, *ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস (১৯০১-১৮)*, *প্রাগুক্ত*

১৬. Subash Chandra Bose,*The Indian Struggle,1935–42.*, p.1. (উদ্ধৃতঃ সত্যেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, *বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টার বিস্তৃত অধ্যায় (১৮৮৭–১৯২০)*, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেসন, কলকাতা,২০১৬,পৃ.১২)

১৭. Karl Marx,*Notes on Indian History*.,p.73.(উদ্ধৃতঃ সত্যেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত,* পৃ.১২)

১৮. Rash Behari Basu, *His Struggle for Indian Independence*., p.69. (উদ্ধৃতঃ সত্যেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*,পৃ.১২)

১৯. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, *ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম*, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেসন, কলকাতা, ২০১৬, পৃ.৭

২০. সত্যেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*,পৃ. ১৩

২১. ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখী বর্মণ, *ব্রিটিশ ভারতে রাজনৈতিক উন্নয়ন*, আজিজিয়া বুক ডিপো, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ৪৯

২২. সত্যেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৩

২৩. প্রকাশ থাকে যে,১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের এই মামলাটি দ্বিতীয় লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা নামে পরিচিত। মোট আসামী ছিল প্রায় পাঁচশত। ২৮ জনের ফাঁসি এবং অবশিষ্টদের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর অথবা দীর্ঘ কারাদন্ড হয়।মাত্র ২৯ জন বেকসুর খালাস পান। ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের শেষভাগে শুরু হয়ে ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের ১৩ মে মামলাটি শেষ হয়। প্রধান আসামী ছিলেন রাসবিহারী বসু, বিষ্ণুগণেশ পিংলে, ভাই পরমানন্দ, কার্তার সিং, হরনাম সিং, মনি সিং প্রমুখ বিপ্লবী। এই মামলা আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই প্রধান আসামী রাসবিহারী বসু অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে ভারতবর্ষ ত্যাগ করে জাপানে চলে যেতে সক্ষম হন। এ মামলায় সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যম, স্বদেশে এবং বিদেশে বৈপ্লবিক প্রচার এবং বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপ বৈপ্লবিক উদ্দেশ্যে নরহত্যা, ডাকাতি ও লুণ্ঠন ইত্যাদি। মামলার রায়ে যাদের ফাঁসি হয় তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন বিষ্ণুগণেশ পিংলে, কার্তার সিং ও মনি সিং। এছাড়া দুইটি দেশীয় সৈন্য ৫ রজিমেন্টের কয়েকজন সৈন্যও প্রাণদন্ডে দন্ডিত হন।ভারতের স্বাধীনতার জন্য বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিপ্লবী নেতা রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি পাঞ্জাবের লাহোরকে কেন্দ্র করে সমগ্র ভারতব্যাপী অভ্যুত্থানের চেষ্টা করা হয়েছিল বলে জানা যায়। (উদ্ধৃতঃ সুপ্রকাশ রায়, *ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস*, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৪০৩)

২৪. *অমৃতবাজার পত্রিকা*, তারিখঃ ২১. ৬. ১৯১৫ (উদ্ধৃতঃ সত্যেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৩)

২৫. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, *ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম*, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেসন, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ১১–১২

২৬. সুপ্রকাশ রায়, *ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস (১৯০১-১৮)*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৪৩

২৭. কৃষ্ণধর,*ভারতের মুক্তিসংগ্রামে বাংলা*, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ,পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, ১৯৭৭,পৃ.(ভূমিকা দ্র.)

২৮. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, *প্রাগুক্ত*

২৯. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, *প্রাগুক্ত*

৩০. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, *প্রাগুক্ত*

৩১. অর্থাৎ যিনি ফরাসি বিশ্বকোষের সংকলক বা লেখক (১৭৫১-৮০); জ্ঞানদানের সাথে পরিচিত এবং দেবতাবাদ এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের পক্ষে ছিলেন। (উদ্ধৃত: https://www.merriam-webster.com), Accessed 0n 24 April, 2025)

৩২. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, *প্রাগুক্ত*

৩৩. সুপ্রকাশ রায়, *ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস (১৯০১-১৮)*, *প্রাগুপ্ত*, পৃ. ১৪৪

৩৪. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১-১২

৩৫. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১-১২

৩৬. অর্থ হলো– "হে অর্জুন দুর্বলতা বা কাপুরুষতার বশবর্তী হয়ো না। এটি তোমার মতো সাহসীর পক্ষে অনুচিত।" শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ২.২ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন,যখন অর্জুন যুদ্ধ করতে দ্বিধাগ্রস্থ ছিলেন। (উদ্ধৃত: https://ai overview), Accessed 0n 05.9.2025)

৩৭. অর্থ হলো–শরীর ধ্বংস হলেও আত্মা ধ্বংস হয়না। কারণ আত্মাই অবিনাশী,জন্মহীন এবং চিরন্তন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২০তম শ্লোকের অংশ, যা আত্মার অবিনশ্বরতা ও চিরন্তন সত্ত্বাকে বোঝায়। (উদ্ধৃত: https://ai overview), Accessed 0n 05.9.2025.

৩৮. রমেশচন্দ্র মজুমদার,*বাংলাদেশের ইতিহাস,চতুর্থ খন্ড (১৯০৫-১৯৪৭)(মুক্তিসংগ্রাম)*,দিব্যপ্রকাশ,ঢাকা,২০২১,পৃ.১১৯-২০

৩৯. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম, *প্রাগুক্ত*,পৃ.১১–১২; সুপ্রকাশ রায়,ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম (১৮৯৩-১৯৪৭), *প্রাগুক্ত*, পৃ.৬৪

৪০. জীবনতারা হালদার, *অনুশীলন সমিতির ইতিহাস*, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেসন, কলকাতা, ২০১৬,পৃ.১৪

৪১. জীবনতারা হালদার, *প্রাগুক্ত*,পৃ.১৪

৪২. জীবনতারা হালদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪

৪৩. জীবনতারা হালদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪-১৫

৪৪. জীবনতারা হালদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫

৪৫. এসকল সদস্যগণ হলেন, প্রমথনাথ মিত্র, চিত্তরঞ্জন দাশ, অরবিন্দ ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ভগ্নি নিবেদিতা। (উদ্ধৃত: ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, *অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস*, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেসন, কলকাতা,২০১৭,পৃ.১২৬)

৪৬. সুপ্রকাশ রায়, *ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম (১৮৯৩–১৯৪৭)*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬২–৬৩; জীবনতারা হালদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬

৪৭. অত:পর পরবর্তীতে পি.মিত্রের পূর্ণ নাম প্রমথনাথ মিত্র ব্যবহৃত হবে।

৪৮. লর্ড কার্জন কর্তৃক বাঙলা বিভাগ সম্পন্ন হলে এ বাংলা বিভাগের বিরুদ্ধে কলকাতা কেন্দ্রিক হিন্দু বুদ্ধিজীবি ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ বাংলা বিভাগকে ব্যঙ করে নাম দেন বঙ্গভঙ্গ। অতঃপর এ বাংলা বিভাগের বিরুদ্ধে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ প্রবল গণআন্দোলন গড়ে তোলেন। বাংলা বিভাগের বিরুদ্ধে সংগঠিত এই গণআন্দোলনই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন নামে পরিচিতি পায়। (উদ্ধৃত: শরিফুল ইসলাম ভূঁইয়া, *জাতীয় রাজনীতি ও টাঙ্গাইল জেলার নেতৃবৃন্দ (১৯৭১–১৯৭১)*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০২২; পৃ. ৩০; কামাক্ষানাথ সেন, *'ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন ও টাঙ্গাইল'*, মুহাম্মদ বাকের (সম্পা.), টাঙ্গাইল জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য, জেলা পরিষদ, টাঙ্গাইল, ১৯৯৭, পৃ. ৩৪৮)

৪৯. সুপ্রকাশ রায়, ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস *(১৯০১-১৮)*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৫১; অশোক চট্টোপাধ্যায় (সংকলন ও সম্পা.), *বৈপ্লবিক সমিতির প্রারম্ভ কালের ইতিহাস ও অন্যান্য*, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেসন,কলকাতা, ২০১৭,পৃ.৩৯; জীবনতারা হালদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬

৫০. শেখ ফজলুল করিম সেলিম, *ভারতেবর্ষের স্বাধীনতা ঘটনাবহুল ইতিহাস*, ত্রয়ী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৯,পৃ.২০৬

৫১. সুপ্রকাশ রায়, ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস *(১৯০১-১৮)*, *প্রাগুক্ত*,পৃ. ১৫১–৫২

৫২. অশোক চট্টোপাধ্যায় (সংকলন ও সম্পা.), *প্রাগুক্ত*,পৃ.২২–২৩

৫৩. সুপ্রকাশ রায়, ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস *(১৯০১-১৮)*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৫৩

৫৪. ১৯০৮খ্রিস্টাব্দে বিচারাধীন অবস্থায় জনৈক ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বারীন্দ্রের স্বীকারোক্তি। (উদ্ধৃত: সুপ্রকাশ রায়, ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস *(১৯০১-১৮)*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৩)

৫৫. বিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, *ভারতের সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রাম*, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেসন, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ৫৫–৫৬

৫৬. অশোক চট্টোপাধ্যায় (সংকলন ও সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩

৫৭. বিপ্লবী পুলিনবিহারী দাশের প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে, অনুশীলন শব্দের অর্থ চর্চা। চর্চা দ্বারা উন্নতি লাভ ও অভিষ্ট

সিদ্ধ করতে হবে। এটিই এই নাম গ্রহণের তাৎপর্য। (উদ্ধৃত: সুপ্রকাশ রায়,ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস *(১৯০১-১৮)*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৩-৫৪)

৫৮. জীবনতারা হালদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬

৫৯. আখড়া পরিচালনার পদ্ধতি নিয়ে পি.মিত্র সাহেবের সাথে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনোমালিন্য বেড়ে যায়। এমন সময়ে বরোদা থেকে অরবিন্দকুমার ঘোষের নিকট থেকে দীক্ষা নিয়ে কলকাতার এই কেন্দ্রে উঠেন বারীন্দ্রকুমার ঘোষ।কিন্তু তার সাথেও পি.মিত্র কিংবা যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথেও মতের মিল হলো না। তখন যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আস্তানা থেকে অনুশীলন উঠিয়ে নিয়ে পি.মিত্র চলে যান ৪৯নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রিটে। বারীন্দ্রকুমার ঘোষের ধারণা হলো তিনি যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেয়ে ভাল বোঝেন অরবিন্দকুমার ঘোষের বিপ্লব-আদর্শ। মুলত অন্যকারো চেয়ে দেশপ্রেমের ঘাটতি বারীন্দ্রকুমার ঘোষের ছিল না।কিন্তু তিনি ছিলেন অত্যন্ত চঞ্চল প্রকৃতির আর অন্যের মতবাদ সম্বন্ধে অসহিষ্ণু।একদল তরুণকে নিয়ে একদিন ডাকাতির সিদ্ধান্ত করে ভগ্নী নিবেদিতার কাছে লোক পাঠালেন রিভলভার চেয়ে। কিন্তু কেউই অনর্থক এই সন্ত্রাসবাদ পছন্দ করে নাই। উপরন্তু নিবেদিতা অস্ত্র তো দিলেনই না, বিষয়টি যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানাতেই সে খবর বরোদায় পৌঁছে যায়। (উদ্ধৃত: আবরার আবীর, *বাঘা যতীন*, আফসার ব্রাদার্স,ঢাকা, ২০১৪, পৃ.২৮; সুপ্রকাশ রায়, ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস *(১৯০১-১৮)*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৫৪)

৬০. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, *ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০

৬১. হায়দার আকবর খান রনো,*পলাশী থেকে মুক্তিযুদ্ধ প্রথম খন্ড (মধ্যযুগ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত)*,ছায়াবীথি,ঢাকা,২০১৮,পৃ. ১১৫

৬২. হায়দার আকবর আকবর রনো, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫-১০৬

৬৩. হায়দার আকবর খান রনো,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১০৫-১০৬; সুপ্রকাশ রায়, ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস, *প্রাগুক্ত*,পৃ.১৯৭

৬৪. ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখী বর্মণ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৪

৬৫. মুহম্মদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৯৫,পৃ. ৪৬৬

৬৬. হায়দার আকবর খান রনো,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১০৬-১০৭; বিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭

৬৭. বিপান চন্দ্র ও অন্যান্য, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ১৮৫৭-১৯৪৭, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯২

৬৮. S. Gopal, '*British Policy in India,1858-1905'*. New Delhi, Cambridge, 1965., p. 270.

৬৯. বিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭

৭০. রাশেদ রহমান, *নওয়াব আলী চৌধুরীঃ মুসলিম বাংলার অগ্রগতির এক প্রাণপুরুষ*, মাহমুদ কামাল (সম্পা.), টাঙ্গাইলের স্মরণীয় বারো মনীষী, সাধারণ গ্রন্থাগার, টাঙ্গাইল, ২০০৩, পৃ, ১০৪

৭১. যারা বাংলা বিভাগ বা বঙ্গ বিভাগের বিরোধী ছিলেন তারা বাংলা বিভাগকে ব্যঙ্গ করে বঙ্গভঙ্গ নাম দেয়। (উদ্ধৃত: কামাক্ষা নাথ সেন, 'ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন ও টাঙ্গাইল', মুহাম্মদ বাকের (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪৮)

৭২. মো. আনোয়ার হোসেন, বৃটিশ বাংলার রাজনীতি: প্রসঙ্গ বৃহত্তর যশোর জেলা, *ইসলামী গবেষণা পত্রিকা*, ৪র্থ সংখ্যা,
২০০৯, ISSN ২০৭২-৯১৬২. পৃ. ৩৯

৭৩. ইউসুব আলী, 'মওলানা ভাসানীর জীবন ও দর্শন', মাহমুদ কামাল (সম্পা.), *প্রাগুপ্ত*, পৃ.৯৬

৭৪. ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখীবর্মণ, *প্রাগুপ্ত*, পৃ.৭৩

৭৫. ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়, *ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব*, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেসন, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ৩৫

৭৬. বাংলাদেশের ইতিহাস (৪র্থ খন্ড),রমেশচন্দ্র মজুমদার,পৃ.২৯-৩০(উদ্ধৃত, বিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায়,*প্রাগুক্ত*,পৃ. ৫৯-৬০)

৭৭. ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩৫; সুপ্রকাশ রায়, ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২১১; বিপান চন্দ্র ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৫

৭৮. ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখী বর্মণ,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২১।

৭৯. খান মোহাম্মদ খালেদ, 'আবদুল হালীম গযনবী: এক উদারপন্থী দিশারী রাজনীতিক', মাহমুদ কামাল (সম্পা.),*প্রাগুপ্ত*,পৃ.৫৪

৮০. এ বঙ্গবিভাগ বিরোধী আন্দোলন স্বদেশী আন্দোলন হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। মুসলমান সম্প্রদায়ের অনেক বাগ্মী নেতা পার্কে পার্কে বক্তৃতা দিয়ে স্বদেশী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার জন্য অনুপ্রাণিত করেন। তাঁদের মধ্যে আবদুল হালিম গজনবী উল্লেখযোগ্য। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ২৭ আগস্ট ঢাকার জগন্নাথ কলেজ প্রাঙ্গণে বঙ্গবিভাগের প্রতিবাদে অনুষ্ঠিত সভায় স্যার আবদুল হালীম গজনবী হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করে বক্তৃতা করেন। ঐ বক্তব্যে তিনি ব্রিটিশ পণ্য বর্জনের আহ্বান জানান।ঐ একই বছর ২৭-৩০ডিসেম্বর বেনারসে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের

২১তম অধিবেশনে তিনি বাংলা বিভাগের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারীদের প্রতি সরকারের দমনমূলক পদক্ষেপের প্রতিবাদ করে বক্তব্য রাখেন। স্যার আবদুল হালীম গজনবী কিছুদিন কংগ্রেস পরিচালিত 'স্বদেশী আন্দোলনে' নেতৃত্ব দেন। এসময় তিনি কলকাতায় 'ইউনাইটেড বেঙ্গল কোম্পানী' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। স্বদেশী পণ্য জনপ্রিয় করা সহ তার সরবরাহ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এ কোম্পানীটি স্থাপন করে শেষপর্যন্ত তিনি ক্ষতিগ্রস্থ হন বলে জানা যায়। (উদ্ধৃত: সফিক ইসলাম (সম্পা.), বিজ্ঞান চিন্তা (জগদিশচন্দ্র বসু সংখ্যা), ঢাকা: নভেম্বর, ২০১৪, পৃ. ১৭৬; শান্তিময় রায়, *ভারতের মুক্তি সংগ্রাম ও মুসলিম অবদান*, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ.৩৩; খান মোহাম্মদ খালেদ, আবদুল হালীম গযনবী: এক উদারপন্থী দিশারী রাজনীতিক, মাহমুদ কামাল (সম্পা.), *প্রাগুপ্ত*, পৃ.৫৪)

৮১. বিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬০

৮২. জীবনতারা হালদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮

৮৩. জীবনতারা হালদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯

৮৪. নলিনীকিশোর গুহ, *বাংলায় বিপ্লববাদ*, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেসন, কলকাতা,২০১৭, পৃ. ৩৬

৮৫. জীবনতারা হালদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯

৮৬. জীবনতারা হালদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯

৮৭. জীবনতারা হালদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০

৮৮. সুপ্রকাশ রায়, ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১১

৮৯. ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬

৯০. Roll of Honour', p. 122. (উদ্ধৃত: ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৩৬)

৯১. শ্রীঅরবিন্দ ও বাঙলার স্বদেশী যুগ, পৃ. ৩৬৯ (উদ্ধৃত: ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৩৬)

৯২. ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬

৯৩. যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, *বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি*, গোপাল হালদার ও অন্যান্য (সম্পা.), র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, পৃ. ২৯৩

৯৪. ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬-৩৭

৯৫. L.S.S.O'.Malley,*History of Bengal,Bihar and Orissa Under British Rule*,p.528-29. (উদ্ধৃত: সুপ্রকাশ রায়, ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২১৬)

৯৬. সুপ্রকাশ রায়, ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২১৩

৯৭. ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখী বর্মণ,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২৩-২৪; সুপ্রকাশ রায়, ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস, *প্রাগুক্ত*, বিপান চন্দ্র ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৫

৯৮. অর্থাৎ যুব সম্প্রদায় জনসাধারণের অপ্রিয় ব্রিটিশ অফিসারদের হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিলেন।এই ধরনের হত্যাকান্ড শাসকদের আতঙ্কিত করে তুলবে। জনগণকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করবে।এবং তাদের মন থেকে কর্তৃপক্ষ সম্পর্কে ভয় দূর করবে। প্রতিটি হত্যা এবং হত্যাকারী যদি ধরা পড়ে তাহলে সংশ্লিষ্টি বিপ্লবীদের বিচার, কাজের মাধ্যমে প্রচার; এর কাজ করবে। এই ধরনের সংগ্রামের জন্য প্রয়োজন নিজের জীবন বিসর্জন দিতে প্রস্তুত কিছু যুবকের। এটা অবশ্যম্ভাবী রূপেই যুব সমাজের আদর্শবাদে নাড়া দিয়েছিল; জাগিয়ে তুলেছিল তাদের সুপ্ত বীরত্বকে। (উদ্ধৃত: বিপান চন্দ্র ও অন্যান্য,*প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৭)

৯৯. বিপান চন্দ্র ও অন্যান্য,*প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৮; সুপ্রকাশ রায়, ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস, *প্রাগুক্ত*,পৃ.২২১-২২

১০০. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত,ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫

১০১. কালীচরণ ঘোষ, *জাগরণ ও বিস্ফোরণ (১৯০৮-১৯৪৭) দ্বিতীয় খন্ড*, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা,২০১৭,পৃ.২০

১০২. নলিনী কিশোর গুহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৩

১০৩. ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭

১০৪. ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়, *প্রাগুক্ত*

১০৫. ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়, *প্রাগুক্ত*

১০৬. ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়, *প্রাগুক্ত*

১০৭. ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়, *প্রাগুক্ত*

১০৮. ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়, *প্রাগুক্ত*

১০৯. উমা মুখোপাধ্যায় ও হরিদাস মুখোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১

১১০. শরিফুল ইসলাম ভূঁইয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০

১১১. সরল চট্টোপাধ্যায়, *ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা,১৯৯০,পৃ. ৩০১

১১২. ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত-রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭

১১৩. সুপ্রকাশ রায়, ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম (১৮৯৩-১৯৪৭), *প্রাগৃক্ত*, পৃ. ১৫-১৯; সরল চট্টোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৬-৩১৮

১১৪. পারভীন আক্তার জেমী, *নজরূল সাহিত্যে বিপ্লবী চেতনা*, অনন্যা, ঢাকা, ২০২০, পৃ. ২৮; সুপ্রকাশ রায়, *ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১০

১১৫. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯

১১৬. সুপ্রকাশ রায়, ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম (১৮৯৩–১৯৪৭),*প্রাগুক্ত*,পৃ. ৯৪

১১৭. অশোক চট্টোপাধ্যায়, *'উপেক্ষিত বিপ্লবী অবিনাশ ভট্টাচার্য'*, অশোক চট্টোপাধ্যায়, (সংকলন ও সম্পা.), বৈপ্লবিক সমিতির প্রারম্ভকালের ইতিহাস ও অন্যান্য, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ৩৯-৪০; সুপ্রকাশ রায়, ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম (১৮৯৩–১৯৪৭), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৪

১১৮. সুপ্রকাশ রায়,ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২১৯

১১৯. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম, *প্রাগুক্ত*,পৃ.১৮

১২০. সুপ্রকাশ রায়, ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস, পৃ. ২২০; কালীচরণ ঘোষ, জাগরণ ও বিস্ফোরণ (১৯০৮-১৯৪৭) দ্বিতীয় খন্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪

১২১. নলিনীকিশোর গুহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৯৪

১২২. নলিনীকিশোর গুহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৪; কালীচরণ ঘোষ, জাগরণ ও বিস্ফোরণ (১৯০৮-১৯৪৭) দ্বিতীয় খন্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২০

১২৩. কালীচরণ ঘোষ,জাগরণ ও বিস্ফোরণ (১৯০৮-১৯৪৭) দ্বিতীয় খন্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০-২১

১২৪. নলিনী কিশোর গুহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৪

১২৫. কালীচরণ ঘোষ, জাগরণ ও বিস্ফোরণ (১৯০৮-১৯৪৭) দ্বিতীয় খন্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১

১২৬. সুপ্রকাশ রায়, ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস, পৃ. ২২০-২১; Amiya K. Samanta (edt.), *Terrorism in Bengal*. vol. 1, Calcutta: Goverment of West Bengal.,1935, p. 20; কালীচরণ ঘোষ, জাগরণ ও বিস্ফোরণ (১৯০৮-১৯৪৭) দ্বিতীয় খন্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫-২৬

১২৭. ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭

১২৮. ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮

১২৯. জানা যায়, গুপ্তদলের এ মৃত্যুদন্ডের রায় স্থির করেন শ্রীঅরবিন্দকুমার ঘোষ, চারুদত্ত ও সুবোধ মল্লিক। (উদ্ধৃতঃ ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০

১৩০. প্রথমে এ কাজের জন্য প্রফুল্ল চাকী ও সুশীল সেনকে দায়িত্ব দেয়া হয় এবং তারা স্থান পরিদর্শনের জন্য বিহারের মুজাফ্ফরপুরে যান। কিন্তু পিতার গুরুতর পীড়ার সংবাদে সুশীল সেন কলকাতায় ফিরে আসেন। পরে হেমচন্দ্রদাস ক্ষুদিরামকে মনোনীত করলে তিনি ২৯ এপ্রিল বিহারের মুজাফফ্রপুরে যান এবং স্টেশনে প্রফুল্লর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়; তৎপূর্বে পরস্পরের পরিচয় ছিল না। ক্ষুদিরাম এবং প্রফুল্লর বাড়ি ছিল যথাক্রমে মেদিনীপুর ও রংপুরে। (উদ্ধৃতঃ সুপ্রকাশ রায়, ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২১; কালীচরণ ঘোষ, জাগরণ ও বিস্ফোরণ (১৯০৮-১৯৪৭) দ্বিতীয় খন্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩১)

১৩১. Sedition Committee Report, 1918., p. 32. (উদ্ধৃতঃ ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০)

১৩২. কালীচরণ ঘোষ, জাগরণ ও বিস্ফোরণ (১৯০৮-১৯৪৭) দ্বিতীয় খন্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১; সুপ্রকাশ রায়, ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২১

১৩৩. Roll of Honour', p. 166. (উদ্ধৃতঃ ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৪)

১৩৪. হেমচন্দ্র কানুনগো, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬২

১৩৫. হায়দার আকবর খান রনো, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৫

১৩৬. হায়দার আকবর খান রনো, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৫-১১৬

১৩৭. নরেন গোস্বামী সম্পর্কে মতভেদ আছে।কেউ বলেন,নরেন পুলিশের গুপ্তচর হিসেবে যুগান্তর সমিতির গোপন সংবাদ সংগ্রহের উদ্দেশ্য নিয়েই বিপ্লবী দলে যোগ দিয়েছিল। অবার কেউ বলেন,নরেন্দ্রের বিপ্লবী দলে যোগদানের পিছনে কোন অসদুদ্দেশ্য ছিল না;ধরা পড়ার পর ভয়ে সে রাজসাক্ষী হয়। তৎকালীন নেতাদের মধ্যে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

প্রথমোক্তমত এবং বারীন্দ্রকুমার ঘোষ দ্বিতীয়মত সমর্থন করেন।(উদ্ধৃতঃ সুপ্রকাশ রায়, ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস,*প্রাগুক্ত*,পৃ. ২২২)

১৩৮. সুপ্রকাশ রায়, ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২২

১৩৯. অত:পর নরেন গোস্বামী উল্লেখ করা হবে।

১৪০. দেশ সেবার উদ্দেশ্যে তাঁর উল্লেখযোগ্য দানের জন্য তাঁকে রাজা উপাধি দেয়া হয়েছিল। (উদ্ধৃতঃ সুপ্রকাশ রায়, ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৩ (১ নং পাদটীকা)

১৪১. সুপ্রকাশ রায়, ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৩

১৪২. হেমচন্দ্র কানুনগো, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৮৪-৯০

১৪৩. ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়, ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৭

১৪৪. যদিও নরেন গোসাইকে গুলি করার প্রথম পরিকল্পনাকারী হিসেবে তদানীন্তন গোয়েন্তা দপ্তরে হেমচন্দ্রের নাম উল্লেখ রয়েছে। (উদ্ধৃতঃ হেমচন্দ্র কানুনগো, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯১; Amiya K.Samanta (edt.), *op.cit*., p. 32.)

১৪৫. ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৭-৬৯

১৪৬. নরেন গোস্বামী বন্দী হয়ে যখন নতুন খেয়ালের বশে আত্মসংযম হারিয়ে যখন দূর্বলতা দেখাইতেছিল, তখনই

শয়তানরূপি ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী আমাদের দেশের উপর এক ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র চাপিয়ে দেবার পায়তারা করছিল। ঠিক সেই মুহুর্তে মহান বিপ্লবী কানাইলাল ভারতীয়দের শৈর্যবীর্যের বহিঃপ্রকাশ প্রত্যয়ে নিজের সমস্ত শক্তি সংহত করে এক মরণভেদী বজ্রনিনাদ ঝংকৃত করেন। ব্রিটিশের সুরক্ষিত লৌহশৃঙ্খল আর দেয়াল ঘেড়া আলিপুর জেলের অভ্যন্তরে বিশ্বাসঘাতকের বুকের রক্তে ধরণী রঞ্জিত করেছেন। বাংলার বুকে যে উদ্দাম বৈপ্লবিক অগ্নিশিখা প্রজ্জলিত হয়েছে তার মূলে কী বিস্ময়কর শক্তি নিহিত রয়েছে;তখনই ব্রিটিশ বেনিয়া বুঝতে পেরেছে। (উদ্ধৃতঃ Sedition Committee Report, 1918., P. 78; সুপ্রকাশ রায়, ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২২৩)

১৪৭. সুপ্রকাশ রায়, ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৩-২৪

১৪৮. Sedition Committee Report, 1918., P. 78. (উদ্ধৃতঃ সুপ্রকাশ রায়, ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস, *প্রাগুক্ত*,পৃ. ২২৪)

১৪৯. প্যারিসের তৎকালীন সোসালিস্ট অর্থাৎ বর্তমানের কম্যুনিস্ট মুখপাত্র লিখেছিল ভারতের বৈপ্লবিকেরা যেভাবে ব্রিটিশ জেলে বন্দী থাকা অবস্থায় রক্ষী বেষ্টিত স্বজাতির বিশ্বাস ঘাতককে শাস্তি দিয়েছে; তা জগতের বৈপ্লবিক ইতিহাসে প্রথম। (উদ্ধৃতঃ সুপ্রকাশ রায়, ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৪;ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত,ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৭২)

১৫০. সুপ্রকাশ রায়,ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস,*প্রাগুক্ত*,পৃ. ২২৫

১৫১. ইতিহাসে সংক্ষেপে তিনি বাঘা যতীন নামে বহুল পরিচিত।

১৫২. জীবনতারা হালদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৪০; ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১০১; সুপ্রকাশ রায়, ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২২৫

১৫৩. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০১

১৫৪. জীবনতারা হালদার, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৪৩।

১৫৫. শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, "যুগান্তর দল ও নেতৃত্ব", জীবনতারা হালদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৩-৭৪

১৫৬. সুপ্রকাশ রায়, ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৫

১৫৭. সুপ্রকাশ রায়, ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৫-২৭

১৫৮. Amiya K.Samanta (edt.),*opcit.,*p.34-35.

১৫৯. Amiya K.Samanta (edt.), *opcit.,*p.35-36.;সুপ্রকাশ রায়,ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস,*প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৭

১৬০. Amiya K.Samanta (edt.), *opcit.,*p.37.

১৬১. সত্যেন্দ্রনাধ গঙ্গোপাধ্যায়,বাংলার বিপ্লব প্রচেষ্টা,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৬৬-৬৭;ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়,*প্রাগুক্ত*,পৃ. ৪৫

১৬২. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাস, *প্রাগুক্ত*,পৃ.১২৩

১৬৩. Amiya K.Samanta (edt.), *opcit.,*p.35.

১৬৪. সুপ্রকাশ রায়, ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস, *প্রাগুক্ত*,পৃ.২২৭

১৬৫. সুপ্রকাশ রায়, ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস,*প্রাগুক্ত*, পৃ.২২৭

১৬৬. এই আইন অনুসারে কতগুলি বিশেষ অপরাধে সাজা দানের জন্য বিশেষ আদালত (Special Tribunal) গঠিত হয়। হাইকোর্টের তিনজন জজ জুরির সাহায্য ব্যতীত সংক্ষিপ্ত ও নাম মাত্র অনুসন্ধানের পর বিচার করতে পারবেন। বলা হয় প্রদত্ত রায়ের বিরুদ্ধে কোন আপিল করা যাবে না। এ আইনে এমন একটি ধারা সংযোজিত হয়,কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনায় কেউ সাক্ষ্য দেবেন তা কেবল তখনই আদালতে প্রমাণ হিসেবে গ্রাহ্য হবে যখন একজন ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে উক্ত সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এ আইনের যথার্থতা প্রমাণিত হয় নাই। নিষিদ্ধ ঘোষিত সমিতিগুলোর অস্তিত্বই এ কথা জানান দেয়। সমিতিগুলো না ভেঙ্গে বরং তারা তাদের কর্মকান্ডে আরো অধিক সতর্কতা অবলম্বন করছে। পূর্বে তারা প্রকাশ্যেই চলাফেরা করত কিন্তু এখন তাদের হদিস সহজে পাওয়া যায় না। নিষিদ্ধ ঘোষিত ঢাকা অনুশীলন সমিতি এই আইন পাস হওয়ার পর থেকে এ পদ্ধতি আরো কঠোরভাবে অনুসরণ করছে। এই আইন বলে সারথি যুবক মন্ডলি এবং খুলনা জেলার অলকার এক সমিতি নিষিদ্ধ করা হয়। (উদ্ধৃত: Amiya K.Samanta (edt.), *opcit.,*p.37.;সুপ্রকাশ রায়,ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২২৮)

১৬৭. সুপ্রকাশ রায়,ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস, *প্রাগুক্ত*,পৃ.২২৮

১৬৮. সুপ্রকাশ রায়,ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২২৮;ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৬৯-৭০

১৬৯. ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়,ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৭০

১৭০. কালীচরণ ঘোষ, জাগরণ ও বিস্ফোরণ(১৯০৮-১৯৪৭)দ্বিতীয় খন্ড,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৬৬;ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৭০

১৭১. সুপ্রকাশ রায়, ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২২৮

১৭২. পুলিশ খানা তল্লাশী করে বহু রাজদ্রোহ মূলক পুস্তক ও বোমা তৈরীর নিয়মাবলি পায় এবং ১৬ জন বিপ্লবীকে চালান দেয়। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দের ১৪ মার্চ বিশেষ আদালতে (Special Tribunal) এ মামলা হয়। অবনীভূষণ চক্রবর্তী রাজসাক্ষী হয়ে মামলা থেকে অব্যাহতি লাভ করে। পরদিন সে স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করায় অপরাপর আসামীদের বিরুদ্ধে কোনো সাক্ষী-প্রমাণ না থাকায় ১৬ মার্চ সরকার মামলা প্রত্যাহার করে নেয়ায় সকলে মুক্তি লাভ করে। সরকার মামলা প্রত্যাহার করে নেয়ায় মনে করা হয়েছিল মামলা শেষ কিন্তু তেমনটি ঘটেনি। অবনীভূষণ চক্রবর্তীর স্বীকারোক্তি তার বিরুদ্ধে প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করে ১৯১০ খ্রিস্টাব্দের ১৬ জুন হাইকোর্টে নথিপত্র প্রেরণ করলে ১৩ জন অভিযুক্তের বিরূদ্ধে হাইকোর্টের ট্রাইবুনালে পিনাল কোডের ১২১-এ ধারা (সম্রাটের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান) অনুসারে ০২ জুন নাঙ্গলা ষড়যন্ত্র মামলা রুজু করা হয়। ২৭ জুন হাইকোর্ট অবনীভূষণ চক্রবর্তীকে ০৭ বৎসরের দ্বীপান্তর দন্ডের আদেশ দেয়।(উদ্ধৃত:সুপ্রকাশ রায়,ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২২৯; কালীচরণ ঘোষ,জাগরণ ও বিস্ফোরণ(১৯০৮-১৯৪৭)দ্বিতীয় খন্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৬-৬৮

১৭৩. এ মামলায় সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী নামে এক অভিযুক্ত ফেরার থাকাবস্থায় ১৯১০ খ্রিস্টাব্দের ১০ জানুয়ারি গ্রেফতার হয়ে শ্রীহট্টের হবিগঞ্জ আদালতে সোপর্দিত হন।তবে তার সাজার বিষয়টি উল্লেখ পাওয়া যায়না।(উদ্ধৃত:Sedition Committee Report'1918.,p.41.;সুপ্রকাশ রায়,ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২২৯; কালীচরণ ঘোষ, জাগরণ ও বিস্ফোরণ (১৯০৮-১৯৪৭) দ্বিতীয় খন্ড,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৬৮)

১৭৪. কালীচরণ ঘোষ,জাগরণ ও বিস্ফোরণ(১৯০৮-১৯৪৭)দ্বিতীয় খন্ড, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৬৮-৬৯;সুপ্রকাশ রায়,ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস,*প্রাগুক্ত*,পৃ. ২২৯-৩০

১৭৫. সুপ্রকাশ রায়,ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস, *প্রাগুক্ত*,পৃ.২৩০;কালীচরণ ঘোষ,জাগরণ ও বিস্ফোরণ (১৯০৮-১৯৪৭) দ্বিতীয় খন্ড,পৃ.৬৯

১৭৬. সুপ্রকাশ রায়, ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩০

১৭৭. এ সময় ছোট লাট ত্রিপুরার মহারাজার প্রাসাদে এক সামাজিক উৎসবে যোগদেন বলে উল্লেখ আছে। (উদ্ধৃত: ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়,*প্রাগুক্ত*,পৃ. ২৪১)

১৭৮. কালীচরণ ঘোষ,জাগরণ ও বিস্ফোরণ (১৯০৮-১৯৪৭) দ্বিতীয় খন্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৪

১৭৯. ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত-রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭১

১৮০. বীরেন এসময় বীরেনের বয়স ছিল আঠার বৎসর। (উদ্ধৃত: সুপ্রকাশ রায়, ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস, *প্রাগুক্ত*,পৃ.২৩০;কালীচরণ ঘোষ,জাগরণ ও বিস্ফোরণ(১৯০৮-১৯৪৭) দ্বিতীয় খন্ড,*প্রাগুক্ত*,পৃ. ৭৫)

১৮১. Sedition Committee Report,1918.,p.32.(উদ্ধৃত:সত্যেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়,*প্রাগুক্ত*, পৃ.৮০)

১৮২. কালীচরণ ঘোষ,জাগরণ ও বিস্ফোরণ(১৯০৮-১৯৪৭)দ্বিতীয় খন্ড,*প্রাগুক্ত*,পৃ. ৭৬

১৮৩. ব্রিটিশ সরকার স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে এই হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলা (gange case) শুরু করে।(উদ্ধৃত:কালীচরণ ঘোষ, জাগরণ ও বিস্ফোরণ (১৯০৮-১৯৪৭)দ্বিতীয় খন্ড,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৭৮)

১৮৪. এ মামলা আরম্ভ করা হয় বিঘাতি,রায়টা মোরেহাল,হলুদবাড়ি প্রভৃতি কয়েকটি বড় বড় ডাকাতির উল্লেখ করা হয়। অভিযুক্তদের মধ্যে পূর্বোক্ত হলুদবাড়ি মামলার ছয়জন দন্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিও অন্তর্ভূক্ত হয়।(উদ্ধৃত:সুপ্রকাশ রায়,ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২৩১)

১৮৫. সত্যেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৮১-৮২; সুপ্রকাশ রায়,ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২৩১

১৮৬. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত,অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাস,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১২২

১৮৭. কালীচরণ ঘোষ,জাগরণ ও বিস্ফোরণ (১৯০৮-১৯৪৭) দ্বিতীয় খন্ড,*প্রাগুক্ত*,পৃ. ৭৮

১৮৮. Amiya K.Samanta (edt.), *op.cit*., p.42.

১৮৯. সত্যেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়,*প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৬

১৯০. কালীচরণ ঘোষ,জাগরণ ও বিস্ফোরণ (১৯০৮-১৯৪৭) দ্বিতীয় খন্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৮

১৯১. সুপ্রকাশ রায়,ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস,পৃ.২৩৪;নলিনীকিশোর গুহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৬২;কালীচরণ ঘোষ, জাগরণ ও বিস্ফোরণ (১৯০৮-১৯৪৭) দ্বিতীয় খন্ড,*প্রাগুক্ত*,পৃ. ৬২-৭৯

১৯২. সুপ্রকাশ রায়,ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২৩৭

১৯৩. দিল্লি ষড়যন্ত্র মামলা আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে ভারতব্যাপি সশস্ত্র বিদ্রোহের উদ্যোগ শুরু হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভারত থেকে ব্রিটিশ সরকার যে সেনাবাহিনী সংগ্রহ করেছিল তার ৬০% ছিল পাঞ্জাবি। রাসহিারী যথার্থই বুঝেছিলেন; এদের ওপরই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নির্ভও করছে। সুতরাং পাঞ্জাবি সৈনিকদের আনুগত্যে চিড় ধরানোকে রাসবিহারী প্রধান লক্ষ্য স্থির করেন। তিনি পূর্ব সীমান্তে আসাম-বাংলা থেকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পেশোয়ার পর্যন্ত একসঙ্গে সশস্ত্র বিপ্লবের প্রস্তুতি আরম্ভ করলেন। বিভিন্ন সৈন্য ব্যারাকে সেনাবাহিনীর মধ্যে জোরেশোরে বিপ্লবের বাণী প্রচার করা শুরু করলেন। (উদ্ধৃত: সরল চট্টোপাধ্যায়,*ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ*,পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ,কলকাতা,১৯৯০,পৃ.৩১০; চিন্মোহন সেহানবীশ ও অন্যান্য, মুক্তির সংগ্রামে ভারত, পশ্চিম বঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০১০,পৃ. ৮)

১৯৪. Sedition Committee Report,1918.,p.46.(উদ্ধৃত: সুপ্রকাশ রায়,ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস,*প্রাগুক্ত*, পৃ.২৩৫)

১৯৫. Amiya K.Samanta (edt.), *op.cit*.,p.241.

১৯৬. Amiya K.Samanta (edt.), *op.cit*.,p.244.

১৯৭. স্বাধীন বাংলার নবাব আলীবর্দী খান এর আমলে বুজুর্গ উমেদপুরে আগা বাকের খান নামে একজন প্রভাবশালী জমিদার ছিলেন। ঢাকার জমিদার আগা বাকের খান এ অঞ্চলে ১৭৪১ খ্রিস্টাব্দে নিজ নামে একটি গঞ্জ বা হাট প্রতিষ্ঠা করেন। তখন থেকেই এলাকাটি বাকেরগঞ্জ নামে পরিচিতি পায়। পরবর্তীতে ১৭৯৭ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার বাকেরগঞ্জ নামে একটি জেলা প্রতিষ্ঠা করে এবং ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এনামটি বহাল ছিল। ১৮০১খ্রিস্টাব্দে বাকেরগঞ্জ নদী নাব্যতা হারালে জেলাসদর স্থাপন করা হয় বরিশালে কিন্তু জেলার নাম বাকেরগঞ্জই বহাল থাকে। ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দের গেজেটিয়ারে বাকেরগঞ্জ মহকুমার একটি থানা হিসেবে বাকেরগঞ্জ বা বাখরগঞ্জের উল্লেখ পাওয়া যায়।১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে বরিশাল বিভাগ সৃষ্টির ফলে বাকেরগঞ্জ নামটি জেলা থেকে বাদ যায়।নানা প্রশাসনিক বিবর্তনে ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে বাকেরগঞ্জ থানা ঘোষিত হয়। ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দের ৭ নভেম্বর তারিখে থানাটি উপজেলায় উন্নীত হয়ে বর্তমানে বাকেরগঞ্জ একটি উপজেলা শহর হিসেবে বিদ্যমান আছে। (উদ্ধৃত: https//bn.m. wikipedia.org>wiki., accessed on: 26.4.2022)

১৯৮. কাকুরিয়া(১৩.৪.১২),কুশাঙ্গল(১৭.৪.১২),বীরাঙ্গল (২৪.৫.১২)প্রভৃতি রাজনৈতিক ডাকাতি সংঘটিত হয়। (উদ্ধৃত: কালীচরণ ঘোষ, জাগরণ ও বিস্ফোরণ(১৯০৮-১৯৪৭) দ্বিতীয় খন্ড,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৯৮)

১৯৯. যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৩২১।

২০০. যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৩২১; সুপ্রকাশ রায়,ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২৪১-২৪২; কালীচরণ ঘোষ, জাগরণ ও বিস্ফোরণ (১৯০৮-১৯৪৭) দ্বিতীয় খন্ড,*প্রাগুক্ত*,পৃ. ৯৮)

২০১. বিপ্লবীদের সংগঠন পদ্ধতি ছিল খুবই পরিকল্পিত।শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিশেষত স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে প্রচারকার্যে জোর দেয়া হত।মেধাবী ও চৌকশ প্রকৃতির ছাত্রদের বাছাই করে দলভুক্ত করে শপথ/দীক্ষা গ্রহণ পূর্বক তাদের সংগঠনের সদস্য করা হত। ছাত্রদের দলভূক্ত করার পূর্বে স্কুল শিক্ষকদের দলভূক্ত করনের জন্য তাদের বিশেষ পরিকল্পনা ছিল লক্ষণীয়। (উদ্ধৃত:Sedition Committee Report,1918.,p.91;সুপ্রকাশ রায়, ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৪৪)

২০২. যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়,বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৩২১-২২;সুপ্রকাশ রায়,ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২৪৪

২০৩. সত্যেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়,*প্রাগুক্ত*, পৃ.৮৯-৯১

২০৪. শশাঙ্কের গৃহ থেকে যে সকল কাগজপত্র জব্দ করা হয় তন্মধ্যে একটিতে লেখা ছিল; দেশভক্ত বীরদের দ্বারা রক্তপাত ও হত্যাকান্ডের মাধ্যমে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে হবে। সে উদ্দেশ্যেই এ আয়োজন। (উদ্ধৃতঃ Sedition Committee Report,1918.,p.92; সুপ্রকাশ রায়,ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস, *প্রাগুক্ত*,পৃ.২৪৬)

২০৫. মি.গর্ডনকে টার্গেট করার কারণ হিসেবে জানা যায়,তিনি সিলেট জেলার ম্যাজিস্ট্রেট থাকাকালীন সময়ে অরুণাচল আশ্রম পুলিশের নজরে পড়ে। রাজনৈতিক কারণে পুলিশ আশ্রম অভিমুখে ধাওয়া করে এবং গর্ডন সাহেবের নির্দেশেই আশ্রমবাসীকে লক্ষ্য করে গুলি করে। অবশেষে তিনি আশ্রমটিকে বেআইনী সংস্থারূপে ঘোষণা করায় অনুশীলন সমিতি তাকে শায়েস্তা করার সিদ্ধান্ত করে। মামলার বিচারে প্রকাশ,শশাঙ্ক হাজরাকে এক বিশাল বিপ্লবী দলের অন্যতম নায়করূপে বর্ণনা করা হয়েছে। এ দলটিই স্বল্পমূল্যে বোমা তৈরী করে ভারত বর্ষের বিভিন্নস্থানে এই প্রকার ভয়ঙ্কর বোমা সরবরাহ করত। এ বোমাই কলকাতা,লাহোর,দিল্লী,শ্রীহট্ট,ময়মনসিংহ,মেদিনীপুর ও ভদ্রেশ্বরে ব্যবহৃত হয়েঠিছল। (উদ্ধৃতঃ ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত রায়,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৮১;সুপ্রকাশ রায়,ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২৪৫-৪৬)

২০৬. Amiya K.Samanta (edt.),*Terrorism in Bengal*. vol.1, Calcutta: Goverment of West Bengal., 1935,p.245.

২০৭. অবিনাশ চক্রবর্তী মহাশয় আগাগোড়া মহানুভব ব্যক্তি ছিলেন। বিপ্লবী কর্মযোগে তার কর্মকান্ড সকল বিতর্কের উর্ধ্বে। তাঁর ত্যাগ,ক্লেশ বরণ ও নির্যাতন ভোগ আদর্শস্থানীয়। কোনরূপ হীনতা বা নীচতা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে নাই। এক কথায় 'He Stopped to poverty but never to discharge'. (উদ্ধৃতঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাস,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১২৩-২৪)

২০৮. জ্যোতিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ছিলেন নদীয়া জেলার অধুনা বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলার কয়া গ্রামের সন্তান। যখন কলকাতায় অনুশীলন সমিতি কলকাতায় প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় তখন থেকেই তিনি এ সমিতির সংস্পর্শে আসেন। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা কংগ্রেসের সময় যখন নিখিল বঙ্গবৈপ্লবিক সম্মেলন হয় একজন প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ১৯০৭খ্রিস্টাব্দে কেবলমাত্র দৈহিক শক্তিদ্বারা একবাঘের সাথে যুদ্ধকরে হত্যা করে সহকর্মীদের নিকট থেকে বাঘা জ্যোতিন আখ্যা লাভ করেন।(উদ্ধৃতঃ সুপ্রকাশ রায়,ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম (১৮৯৩-১৯৪৭),*প্রাগুক্ত*, পৃ.১৪০)

২০৯. স্মরণযোগ্য,আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলায় অরবিন্দকুমার ঘোষ,বারীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রমুখ নেতৃবৃন্দের অনুপস্থিত জনিত কারণে যুগান্তর সমিতির প্রধান পরিচালকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এ সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা অবিনাশ চক্রবর্তী। জ্যোতিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে তিনি সহকারী পরিচালক রূপে গ্রহণ করে সমিতির কার্যপরিচালনা শুরু করেন। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর বাংলাদেশে বিপ্লবীদের জন্য এক অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়। অবিনাশ চক্রবর্তী একদিন যুগান্তর সমিতির প্রধানদের ডেকে বলেন,'তোমাদের মধ্যে জ্যোতিন 'best man', তাকে নেতৃত্ব ভার দিলাম। (উদ্ধৃতঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত,অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাস, *প্রাগুক্ত*,পৃ.১২৩; সুপ্রকাশ রায়,ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম (১৮৯৩-১৯৪৭), *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৪০-৪১)

২১০. যাদু গোপাল মুখোপাধ্যায়, বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি, *প্রাগুক্ত*,পৃ. ৩২৪

২১১. সুপ্রকাশ রায়, ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস,*প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৮

২১২. উল্টোরথ (অগ্নিযুগ সংখ্যা,তারিখ,১৫.০২.১৯৬৮),পৃ.১০-১২ ।(উদ্ধৃত,ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত-রায়, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৯৪)

২১৩. সত্যেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৯১;ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত,অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাস,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১২৩

২১৪. সুপ্রকাশ রায়, ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস, পৃ.২৪৭

২১৫. Sedition Committee Report,1918.,p.65.(উদ্ধৃতঃ সুপ্রকাশ রায়,ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২৪৮)

২১৬. সুপ্রকাশ রায়,ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম (১৮৯৩-১৯৪৭), *প্রাগুক্ত*,পৃ. ১৪২

২১৭. নলিনীকিশোর গুহ,*প্রাগুক্ত*,পৃ. ১১৪

২১৮. নলিনীকিশোর গুহ,*প্রাগুক্ত*,পৃ. ১১৪

২১৯. নলিনীকিশোর গুহ,*প্রাগুক্ত*, পৃ.১১৮

২২০. নলিনীকিশোর গুহ,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১১৮

২২১. সুপ্রকাশ রায়,ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৩৬৯

২২২. নলিনীকিশোর গুহ,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১০৪

২২৩. সুপ্রকাশ রায়,ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৩৬৯

২২৪. কালীচরণ ঘোষ,জাগরণ ও বিস্ফোরণ(১৯০৮-১৯৪৭) দ্বিতীয় খন্ড,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১২৮

২২৫. অতুলকৃষ্ণ বলেন,পুলিন সেন এসে বলে;সুশীলকে ডুবিয়ে দিয়ে এলাম।এই সুশীলকেই পুলিশকে ঘুশি মারার অপরাধে কিংসফোর্ড প্রকাশ্য আদালতে ১৫টি বেত্রদন্ড দিয়েছিলেন। (উদ্ধৃত:নলিনীকিশোর গুহ,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১০৪(পাদটিকা দ্রষ্টব্য)

২২৬. নলিনীকিশোর গুহ,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৭৩

২২৭. কালীচরণ ঘোষ,জাগরণ ও বিস্ফোরণ(১৯০৮-১৯৪৭) দ্বিতীয় খন্ড,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৩৯-৪০

২২৮. নলিনীকিশোর গুহ,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৭৩

২২৯. সুপ্রকাশ রায়,ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম(১৮৯৩-১৯৪৭),*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৪৩

২৩০. নলিনীকিশোর গুহ,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৭৩

২৩১. সুপ্রকাশ রায়,ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম(১৮৯৩-১৯৪৭),*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৪৪-৪৬

২৩২. ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সশস্ত্রবিদ্রোহের দিন পর্যন্ত ঠিক করা সত্ত্বেও তা ব্যর্থ হয়।এবং উড়িষ্যার বুড়িবালাম নদীর তীরে বালেশ্বর যুদ্ধে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়সহ পাঁচ জন বিপ্লবীর মৃত্যু-ঘটনা ইঙ্গিত করা হয়েছে,যা পরে বর্ণিত হবে।

২৩৩. কালীচরণ ঘোষ,জাগরণ ও বিস্ফোরণ (১৯০৮-১৯৪৭) দ্বিতীয় খন্ড,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৪৬

২৩৪. এদিকে ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের ০৯ সেপ্টেম্বর বালেশ্বরে জ্যোতিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের (বাঘা জ্যোতিন) মৃত্যু হলে পুলিন মুখার্জী ও অতুল ঘোষ একত্রে যুগান্তর সমিতির পরিচালনা-ভার গ্রহণ করেছিলেন।(উদ্ধৃত:সুপ্রকাশ রায়,ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস,পৃ.৩৭১(পাদটিকা)

২৩৫. নলিনীকিশোর গুহ,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৭৫;সুপ্রকাশ রায়,ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৩৭১

২৩৬. কালীচরণ ঘোষ,জাগরণ ও বিস্ফোরণ(১৯০৮-১৯৪৭) দ্বিতীয় খন্ড,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৪৮;সুপ্রকাশ রায়,ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৩৭২

২৩৭. সুপ্রকাশ রায়,ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৩৭২

২৩৮. কালীচরণ ঘোষ,জাগরণ ও বিস্ফোরণ(১৯০৮-১৯৪৭) দ্বিতীয় খন্ড,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৪৭;সুপ্রকাশ রায়,ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৩৭২

২৩৯. কালীচরণ ঘোষ,জাগরণ ও বিস্ফোরণ(১৯০৮-১৯৪৭) দ্বিতীয় খন্ড, *প্রাগুক্ত*,পৃ.১৪৭;সুপ্রকাশ রায়,ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৩৭২

২৪০. কালীচরণ ঘোষ,জাগরণ ও বিস্ফোরণ(১৯০৮-১৯৪৭) দ্বিতীয় খন্ড,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৪৮-৪৯

২৪১. সুপ্রকাশ রায়,ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৩৭২;কালীচরণ ঘোষ,জাগরণ ও বিস্ফোরণ (১৯০৮-১৯৪৭) দ্বিতীয় খন্ড,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৫১

২৪২. নলিনীকিশোর গুহ,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৭৫

২৪৩. নবীনচন্দ্র বসু ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে সাক্ষী দিয়েছিলেন।(উদ্ধৃত:কালীচরণ ঘোষ,জাগরণ ও বিস্ফোরণ (১৯০৮-১৯৪৭) দ্বিতীয় খন্ড,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৫৪)

২৪৪. কালীচরণ ঘোষ,জাগরণ ও বিস্ফোরণ(১৯০৮-১৯৪৭) দ্বিতীয় খন্ড,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৫৩-৫৪

২৪৫. নলিনীকিশোর গুহ,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৭৫-৭৬;সুপ্রকাশ রায়,ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৩৭৩।

২৪৬. কালীচরণ ঘোষ,জাগরণ ও বিস্ফোরণ(১৯০৮-১৯৪৭) দ্বিতীয় খন্ড,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৫৬

২৪৭. কালীচরণ ঘোষ,জাগরণ ও বিস্ফোরণ(১৯০৮-১৯৪৭) দ্বিতীয় খন্ড,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৫৬।

২৪৮. Sedition Committee Report,1918.,p.181.(উদ্ধৃত:কালীচরণ ঘোষ,জাগরণ ও বিস্ফোরণ(১৯০৮-১৯৪৭) দ্বিতীয় খন্ড,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৫৬)

২৪৯. কালীচরণ ঘোষ,জাগরণ ও বিস্ফোরণ (১৯০৮-১৯৪৭) দ্বিতীয় খন্ড,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৫৬

২৫০. সুপ্রকাশ রায়,ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৩৭৩

২৫১. কালীচরণ ঘোষ,জাগরণ ও বিস্ফোরণ(১৯০৮-১৯৪৭) দ্বিতীয় খন্ড,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৫৪

২৫২. সুপ্রকাশ রায়,ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৩৭৪;নলিনীকিশোর গুহ,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৭৬;কালীচরণ ঘোষ,জাগরণ ও বিস্ফোরণ(১৯০৮-১৯৪৭) দ্বিতীয় খন্ড,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৫৯-৬০

২৫৩. নলিনীকিশোর গুহ,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৭৬

২৫৪. সুপ্রকাশ রায়,ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৩৭৪;কালীচরণ ঘোষ,জাগরণ ও বিস্ফোরণ(১৯০৮-১৯৪৭) দ্বিতীয় খন্ড,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৬৩

২৫৫. সুপ্রকাশ রায়,ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৩৭৫

২৫৬. পরে পুলিশ অন্যান্য আস্তানা থেকে নরেন্দ্রনাথ বন্ধ্যোপাধ্যায় এবং তারা প্রসন্নদেকে গ্রেফতার করে। এপ্রিল মাসে

নলিনীকান্ত ঘোষ প্রমুখ একসঙ্গে পাঁচজনের গৌহাটি স্পেশাল ট্রাইবুনালে বিচার আরম্ভ হয়। নলিনীকান্ত ইতোপূর্বে (২৩.১২.১৬খ্রি.) প্রবোধ বিশ্বাসের সঙ্গে কলকাতা কঠিন বন্দিশালা (Dalanda House) থেকে পালিয়েছিলেন। এখন গৌহাটি মামলায় অস্ত্রআইন ভঙ্গ ও হত্যা প্রচেষ্টার অভিযোগে ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের ২২ এপ্রিল নলিনীকান্ত ঘোষের (ওরফে নিখিলনাথ রায়,নিখিল চক্রবর্তী,মাস্টার) সাত বৎসর সশ্রম কারাদন্ডের আদেশ হয়। নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (ওরফে বটাদা) এবং তারা প্রসন্নদে(ওরফে টিপু সুলতান,টি.পি.মনু.,) প্রত্যেকের পাঁচ বৎসর এবং প্রভাস লাহিড়ী (ওরফে ফিলজফার) ও মণীন্দ্রনাথ রায় প্রত্যেকের তিন বৎসর সশ্রম কারাদন্ডের আদেশ হয়। (উদ্ধৃত: ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়, *প্রাগুক্ত*,পৃ.১৩১-৩২;নলিনীকিশোর গুহ,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৭৭;কালীচরণ ঘোষ, জাগরণ ও বিস্ফোরণ(১৯০৮-১৯৪৭) দ্বিতীয় খন্ড,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৬৫)

২৫৭. ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৩১;নলিনীকিশোর গুহ,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৭৭

২৫৮. নলিনীকিশোর গুহ,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৭৭;সুপ্রকাশ রায়,ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৩৭৬

২৫৯. সতীশ পাকড়াশী,*অগ্নিযুগের কথা*,কলকাতা:র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেসন,২০১৫,পৃ.৭২

২৬০. বার্ণহার্ডি তার গ্রন্থে আশা প্রকাশ করেন,চলমান বৈপ্লবিক ও জাতীয়তাবাদী মনোভাব সম্পন্ন বাঙালি হিন্দু জনসাধারণ যদি সমগ্র ভারতের মুসলমান জনসাধারণের সাথে ঐক্য গড়তে পারে তবে তাদের সহযোগিতায় এমন একটা ভয়ঙ্কর বিপদ সৃষ্টি হবে যা ইংলন্ডের বিশ্বব্যাপী প্রভাবের ভিত নাড়িয়ে দিবে। (উদ্ধৃত:Sedition Committee Report, 1918.,p.119; সুপ্রকাশ রায়,ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৩৮০)

২৬১. তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক ছিলেন।লন্ডনে Indian sociologist নামে একটি পত্রিকা ও ইন্ডিয়া হাউস নামে ভারতীয় ছাত্রদের জন্য একটি মেস বাড়ি প্রতিষ্ঠা করেন।অভিনব ভারত সমাজের প্রতিষ্ঠাতা বিনায়ক দামোদর সাভারকর এখান থেকেই যোগাযোগ করেছিলেন আয়ার ল্যান্ডের বিপ্লবী সংস্থা সিন ফিনের সাথে।কিছুটা সাফল্যের পরে ইংরেজ পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দন্ডে দন্ডিত হন।এই বিপ্লবী সংস্থার সাথে যুক্ত হয়েছিলেন মদন লাল ধিংড়া। ভারতের স্বাধীনতার শত্রু,ব্রিটিশ প্রশাসনের ইন্ডিয়া অফিসের অফিসার কার্জন উইলিকে নিধন করে ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে প্রবাসেই ফাঁসির মঞ্চে আত্মাহুতি দেন। (উদ্ধৃত: বিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৪৬।)

২৬২. সিন-ফিন-আইরিশ ভাষায় অর্থ আমরা আমাদের নিজেদের। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামরত আয়ারল্যান্ডের একটি বিপ্লবী সংগঠন। আর্থার গ্রিফিথ(১৮৭২-১৯২২)ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ ও সাংবাদিক। তিনি ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে এই সংস্থা গঠন করেন। (উদ্ধৃত: বিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*,পৃ. ৪৮ (পাদটীকা)।

২৬৩. বিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*,পৃ. ৪৬

২৬৪. পার্শি সম্প্রদায় থেকে আসা মাদামকামা প্যারিসে দেশাত্মবোধক পত্রিকা বন্দেমাতরম্ প্রত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে জার্মানির ষ্টুটগার্ড শহরে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে লেলিনের সাথে মাদাম কামার মতবিনিময় হয়েছিল। (উদ্ধৃত:বিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায়,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৪৬)

২৬৫. বিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায়,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৪৭;সুপ্রকাশ রায়,ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৩৮০

২৬৬. ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১০২

২৬৭. সতীশ পাকড়াশী,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৫১

২৬৮. নলিনীকিশোর গুহ,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১২৬-২৭

২৬৯. Sedition Committee Report,1918.,p.105.(উদ্ধৃত:ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১০৪)

২৭০. ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১০৪

২৭১. ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১০৪

২৭২. সতীশ পাকড়াশী,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৫৪;সুপ্রকাশ রায়,ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৩৮১

২৭৩. ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়,*সবার অলক্ষ্যে*,র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন,কলকাতা,২০১৫,পৃ.২৯

২৭৪. সতীশ পাকড়াশী,*প্রাগুক্ত*, পৃ.৫৪

২৭৫. সতীশ পাকড়াশী,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৫৪

২৭৬. নলিনীকিশোর গুহ,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৩২

২৭৭. পূর্বে এ পিস্তল চুরি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

২৭৮. সতীশ পাকড়াশী,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৫৪;সুপ্রকাশ রায়,ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৩৮২

২৭৯. নলিনীকিশোর গুহ,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৩২

২৮০. সুপ্রকাশ রায়,ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস,*প্রাগুক্ত*,পৃ.ষোল (মুখবন্ধ)।

২৮১. ভারত সরকার বোমার সক্ষমতা সম্পর্কে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করে বলে:'Suffient to annihilate half a regiment'. (উদ্ধৃত:নলিনী কিশোর গুহ,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৩২-৩৪;ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়,ভারতে সশস্ত্রবিপ্লব,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১০৮;সৌম্যব্রত দাশগুপ্ত,*জাপানে রাসবিহারী*, কলকাতা,র‍্যাডিক্যাল ইমপ্রেশন,২০১৯,পৃ.৪৫)

২৮২. পাঞ্জাবে ১৯ ফেব্রুয়ারি ভারতের সিপাহীরা বিদ্রোহ করলে তারা পশ্চিম দিক আক্রমণের প্রস্তুত ছিল।কিন্তু ভারতের অভুত্থান প্রয়াস ব্যর্থ হলে কাবুলে ধরপাকড় শুরু হয়। মহেন্দ্রপ্রতাপ সিং ও অজিত সিং বাধ্য হয়ে পারস্য চলে যান। সুফি অম্বাপ্রসাদকে কাবুল সরকার গ্রেফতার করে।(উদ্ধৃত:নলিনীকিশোর গুহ,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৩৪)

২৮৩. ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়,সবার অলক্ষ্যে,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৩০;নলিনীকিশোর গুহ,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৩৩;ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়, ভারতে সশস্ত্রবিপ্লব,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১০৭

২৮৪. Sedition Committee Report,1918.,p.85.(উদ্ধৃত:ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়,ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব,*প্রাগুক্ত*, পৃ.১১৫; সৌম্যব্রত দাশগুপ্ত,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৬৭-৬৯)

২৮৫. ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়,ভারতে সশস্ত্রবিপ্লব,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১০৮-৯

২৮৬. নলিনীকিশোর গুহ,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৩৭-৯

২৮৭. ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়,ভারতে সশস্ত্রবিপ্লব,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১১১;সুপ্রকাশ রায়,ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৩৮৭

২৮৮. মুহাম্মদ লুৎফুল হক,রুশ বিপ্লব ও নজরুল,*প্রথম আলো*,তারিখ:২৪ আগস্ট,২০১৭ খ্রিস্টাব্দ।

২৮৯. *সাক্ষাৎকার*,ড.ইঞ্জি.মো.খালেকুজ্জামান,সভাপতি,বাঁশরী,নজরুল চর্চাকেন্দ্র,ঢাকা,তারিখ:১১মে,২০২২ খ্রিস্টাব্দ।

২৯০. মুহাম্মদ লুৎফুল হক,রুশ বিপ্লব ও নজরুল,*প্রথম আলো*,তারিখ:২৪ আগস্ট,২০১৭ খ্রিস্টাব্দ।

২৯১. আবদুল গণি,কবি নজরুলের সৈনিক জীবন, *চাঁদপুর টাইমস*, ২৫ জানুয়ারি,২০০১ খ্রিস্টাব্দ।

২৯২. গুপ্তবিপ্লবী সংস্থার প্রকৃতি ও ধারা অনুযায়ী ইহাই স্বাভাবিক। কোনো বিশেষ সংস্থা কর্তৃক কোনো কর্মনীতি আরম্ভ হলে সাধারণত অপরাপর দল থেকে তা গোপন রাখা হতো। পরিকল্পণা প্রায় সম্পূর্ণ হবার পর সেনাদলের সাহায্যে সশস্ত্রবিদ্রোহ ঘোষণার সম্ভাবনার কথা শুনে জ্যোতিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা জ্যোতিন) ওই প্রক্রিয়ায় শামিল না হয়ে নিজস্ব পরিকল্পণায় অগ্রসর হন। একইভাবে রাসবিহারী বসুর সংস্থা ও অনুশীলন সমিতি জার্মানঅস্ত্র আমদানী প্রক্রিয়ায় যুক্ত হন নাই অনুমিত হয়। তবে ডা. যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন: জার্মানি থেকে অস্ত্র এসে গেলে ঢাকা অনুশীলনের সাহায্য পাওয়া যাবে; এই ভরসা আমাদের ছিল। জ্যোতিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের (বাঘা জ্যোতিন) সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করার ব্যাপারে আর্য নিবাস, শোভাবাজার ও শ্রীদাম মুদিলেনে যে সকল কথাবার্তা হয় তা কলকাতার গোপন কেন্দ্রে বিস্তারিতভাবে বলা হলে রাসবিহারী বসু রবীন্দ্রনাথের যে গান উদ্ধৃত করেন তা হলো:

"ঘন্টা যখন উঠবে বেজে
আসবে সবাই আপনি সেজে
এক সঙ্গে যাব যাত্রী যত
একই রাস্তা লবেই লবে।"

বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর এ প্রত্যয় ও বিশ্বাস বাংলার সকল দল ও নেতাকর্মীর ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য বলে মনে করা হয়।(উদ্ধৃত: নলিনীকিশোর গুহ,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২৬১-৬৪)

২৯৩. অমিত দেবনাথ, *ব্রিটিশরাজ বনাম বাঘাজ্যোতিন*,পত্রলেখা,কলকাতা,২০২৩,পৃ.৭৬-৭৭

২৯৪. অমিত দেবনাথ, *প্রাগুক্ত*

২৯৫. কোল উপজাতির স্বাধীনতা লাভের জন্য বীরশা ভগবানের নেতৃত্বে আন্দোলন হয়েছিল।

২৯৬. সুপ্রকাশ রায়,ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২৭৭

২৯৭. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত,ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৭৯

২৯৮. বিহারের দেওঘরে রাজনারায়ণ বসুর কর্মজীবন কাটে এবং সেখানেই তিনি বসবাস করতেন। বাংলার বিপ্লব প্রচেষ্টার দুই প্রধান নায়ক অরবিন্দ ঘোষ এবং বারীন্দ্র কুমার ঘোষের বাল্যকাল এখানেই অতিবাহিত হয়।(উদ্ধৃত: সুপ্রকাশ রায়, ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২৭৯)

২৯৯. সুপ্রকাশ রায়,ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২৭৯

৩০০. বোম্বাই প্রদেশের শোলাপুর জেলার মতিচাঁদ ও মানিক চাঁদ নামক দুইজন ছাত্র জয়পুরে অর্জুন লাল শেঠি পরিচালিত স্কুলে ভর্তি হন। বিদ্যালয়ে অর্জুনলাল ধর্ম ও বিষণ দত্ত রাজনীতি সমন্ধে বক্তৃতা করতেন।বিষণ দত্ত তার বক্তৃতায় ভারতের স্বাধীনতা লাভের জন্য ডাকাতি,গুপ্ত হত্যা প্রভৃতি বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব

আরোপ করতেন। তারা মাৎসীনির জীবনীসহ বৈপ্লবিক গ্রন্থাদি পড়ে বৈপ্লবিক কর্মকান্ডে অনুপ্রাণিত হণ।(উদ্ধৃত:সুপ্রকাশ রায়,ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস,পৃ.২৭৯-৮০)

৩০১. Sedition Committee Report,1918.,p.168.(উদ্ধৃত:সুপ্রকাশ রায়,ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস, *প্রাগুক্ত*,পৃ.২৮০-৮১)

৩০২. সুপ্রকাশ রায়,ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২৮১

৩০৩. সুপ্রকাশ রায়,ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২১৭-৮

৩০৪. সুপ্রকাশ রায়,ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২৭৫

৩০৫. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত,ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৭৯

৩০৬. সুপ্রকাশ রায়,ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২৭৬

৩০৭. সুপ্রকাশ রায়,ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২৭৭

৩০৮. নলিনীকিশোর গুহ,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২৯৪

৩০৯. প্রথম বিশ্বযুদ্ধে এক পক্ষে ছিল বৃটেন,ফ্রান্স,রাশিয়া,ইতালি ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।এদেরকে একত্রে মিত্রশক্তি (Allied Power) বলা হতো। অপর পক্ষে জর্মানী ও অষ্ট্রিয়া।জর্মানির সাথে তুরস্কের পূর্ব থেকেই সুসম্পর্ক ছিল। এজন্য তুরস্ক প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জর্মানির পক্ষে যোগ দেয়। (উদ্ধৃত: সুলায়মান কবীর,*বাংলায় মুসলিম জাগরণে ওয়াজেদ আলী খান পন্নী*, সুবর্ণ, ঢাকা,২০২০,পৃ.১৩০(পাদটীকা)।

৩১০. সফিউদ্দীন জোয়ারদার,*আধুনিক মধ্যপ্রাচ্য,প্রথম খন্ড*,ঢাকা:বাংলা একাডেমী,২০০৩,পৃ.১৩৫-৫৯

৩১১. বিষয়টি অনুধাবনের জন্য খেলাফত আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর 'খেলাফৎ' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত করা হলো:পবিত্র স্থান সমূহ এবং আরব রাজ্য খলিফার হাতছাড়া হলে,রাজধানী কনস্টান্টিনোপলে বিজাতির কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে খলিফার পদ মর্যাদা থাকে না।খলিফার পদমর্যাদা না থাকলে তিনি খলিফারূপে থাকতে পারেন না। খলিফা না থাকলে,ইমাম নির্দিষ্ট না থাকলে মুসলমানের মুসলমানিত্ব থাকে না।ইসলাম কায়েম থাকে না। অতএব ইসলাম রক্ষা করতে হলে,মুসলমান নামে অভিহিত হতে হলে খলিফাকে রক্ষা করা,খলিফার রাজ্য,তাঁর ক্ষমতা ও পদমর্যাদা রক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের ফরজ। (উদ্ধৃত:সুলায়মান কবীর,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১১২)

৩১২. B.M.Taunk, *None-cooperation Movement in Indian Politics(1919-1924)*,Delhi, Sundeep Prakasan,1978,p.16-18.

৩১৩. ১৯১৭খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে ব্রিটিশ সরকার ভারতে ক্রমশ স্বায়ত্বশাসনের প্রতিশ্রুতি দেয়।(উদ্ধৃত:সতীশ পাকড়াশী, অগ্নিযুগের কথা, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৮২

৩১৪. নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়,*বিপ্লবের সন্ধানে*,র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন,কলকাতা, ২০১৫,পৃ.৬১

৩১৫. R.C.Aggrarwal,*Constitutional History of India and National Movement,*Delhi,S.Chand & Co.(Pvt.), 1974,p.219-21;নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৬১

৩১৬. ঐ চিঠিতে তিনি (কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) লেখেন,ভারতবাসীর অসহায় অবস্থা পাঞ্জাবে যেরকম নগ্নভাবে ফুটে উঠেছে,তাতে সরকারি খেতাবে ভূষিত হয়ে চুপ করে বসে থাকার লজ্জা সহ্য করা আমার পক্ষে অসম্ভব।আমিও ঐ লাঞ্ছিত অসহায় ভারতবাসীদেরই একজন।এবং আমার স্থান তাদের পাশেই। (উদ্ধৃত: নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়,*প্রাগুক্ত*, পৃ.৬১)

৩১৭. এ অসহযোগ কর্মসূচির প্রধান দিকগুলো ছিল:১.সরকার প্রদত্ত উপাধি ত্যাগ করা;২.সরকারি বা সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত স্কুল এবং কলেজ বর্জন এবং এর পরিবর্তে জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন; ৩.সরকারি আদালত ও আইন সভা বর্জন; এবং ৪.বিদেশী তথা ব্রিটিশ পণ্য বর্জন করা। (উদ্ধৃত:সুলায়মান কবীর, *প্রাগুপ্ত*, পৃ.১৩১ (পদটীকা)।

৩১৮. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ,*বাংলায় খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলন*,ঢাকা:বাংলা একাডেমী,১৯৯৬,পৃ.১৭-১৯

৩১৯. মাওলানা মোহাম্মদ আলী ও মাওলানা শওকত আলী ইতিহাসে এই নামে খ্যাত।

৩২০. B.M.Taunk,*op.cit.*,p.28-29.

৩২১. Ghadhi,*Collected works,*Vol.17,p.504.(উদ্ধৃত:বিপানচন্দ্র ও অন্যান্য,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৪২)

৩২২. কালীচরণ ঘোষ,জাগরণ ও বিস্ফোরণ(১৯০৮-১৯৪৭) দ্বিতীয় খন্ড,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৮০

৩২৩. সুলায়মান কবীর,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১১৩

৩২৪. তোফায়েল আহমেদ,'ইতিহাস পুরুষ:ওয়াজেদ আলী খান পন্নী,' *দৈনিক ইত্তেফাক*,১১ জুলাই ১৯৮২,পৃ.৯।

৩২৫. সুলায়মান কবীর,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১১৪

৩২৬. লাঙ্গুল শব্দের অর্থ লেজ। এখানে ব্রিটিশের অনুচর জমিদারদেরদের নামের সাথে যুক্ত খেতাবকে কবি বিদ্রুপ করেছেন।

৩২৭. আপীল (কবিতা), *রোকেয়া রচনাবলি*,ঢাকা:উত্তরণ,২০০৬,পৃ.২১২

৩২৮. ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়,সবার অলক্ষ্যে প্রথম পর্ব,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৩৭

৩২৯. বিপানচন্দ্র ও অন্যান্য,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৪১

৩৩০. ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়,ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৩৪

৩৩১. ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়,ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৩৬

৩৩২. ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়,ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৩৬

৩৩৩. নলিনী কিশোর গুহ,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৫৯

৩৩৪. ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখী বর্মণ,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১১৩

৩৩৫. অসহযোগ আন্দোলন চলার সময় এ কর্মসূচিতে বিশ্বাসী একটি স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করা হয়। স্বরাজ লাভের জন্য 'অহিংস সংগ্রামে বিশ্বাস করি'এ প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করলেই এদলের সদস্য হওয়া যেতো। (উদ্ধৃত: সতীশ পাকড়াশী,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৮৯-৯০

৩৩৬. বিপান চন্দ্র ও অন্যান্য,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৪৬;প্রফেসর ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখী বর্মণ,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১১৭;সুলায়মান কবীর, *প্রাগুক্ত*,পৃ.১১৬-২২। এ সম্পর্কে Micheal Brecher উল্লেখ করেছেন,...In Chaurichaura,an infortunate incident took place.A crowed passed infornt of the police station and the constables opened fire.They went on firing till their ammunitions where exhausted.Then they took shelter inside the police station.The crowed then returned and set fire to the police station.Twenty-two victimes were killed including the young son of the sub-inspector of police.Gandhi was shocked at this incident.He announced that the Indian people were not yet ready to wage a non-violent strugle and summarily called off the non-cooperation movement.(উদ্ধৃত: Micheal Brecher, *Nehru*, p.77;ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখী বর্মণ, *প্রাগুক্ত*,পৃ.১১৭)

৩৩৭. Louis Fischer লিখেছেন,গান্ধীর একটি কথাতেই ভারত বিদ্রোহে ফেটে পড়তে পারত। কিন্তু সে কথাটি তিনি বলেন নাই।পরিবর্তে সমগ্র আগ্রহ ও আত্মদানের প্রচেষ্টাকে অহিংস মতবাদের দোহাই দিয়ে বিনষ্ট করা হলো। চিত্তরঞ্জন দাশ,মতিলাল নেহেরু,লাজপৎ রাই,প্রমুখ নেতৃবৃন্দ,দুঃখে,ক্ষোভে,হতাশায় ফেটে পড়েন। লাজপৎ রাই গান্ধীর কাজের তীব্র নিন্দা করে তাঁকে ৭০ পৃষ্ঠার একটি চিঠি দেন।মতিলাল নেহেরু ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন,ভারতের একটি গ্রামের কিছু অধিবাসীদের ভুলের জন্য গান্ধীজি গোটা দেশকে শাস্তি দিলেন।সুভাষচন্দ্র বসু বলেন,যে মুহূর্তে জনসাধারণের উৎসাহ ফুটন্ত অবস্থায় পৌছায়,ঠিক সেই মুহূর্তে আন্দোলন প্রত্যাহার একটি জাতীয় বিপর্যয়বহ অন্য কিছু নয়। তিনি আরো বলেন,দেশ বন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশও তখন জেলে বসে বারদৌলী সিদ্ধান্তের জন্য তীব্র বিরক্তি প্রকাশ করে বলেন,সারা জীবনের মত সুযোগ হাত ছাড়া হলো।জওহরলাল নেহেরু মৃদু সমালোচনা করে বলেছেন,বারদৌলী সিদ্ধান্তের ফলে কিছুটা অবসাদ দেখা দেয়। অকস্মাৎ আন্দোলন প্রত্যাহার দেশে শোচনীয় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। রজনী পাল দত্তের ভাষায়,যুদ্ধ শেষ, সমগ্র অভিযানও শেষ হয়ে গেল।পর্বত বাস্তবে মুষিক প্রসব করল।আন্দোলন প্রত্যাহারে ব্যথিত হয়ে সুদূর ফ্রান্স থেকে Romain Rolland (রোমাঁ রোঁলা) লেখেন, একজন মাত্র ব্যক্তির হাতে চূড়ান্ত ক্ষমতা অর্পিত হলে তার যে কতখানি অপপ্রয়োগ হতে পারে,এ ঘটনা তারই জ্বলন্ত প্রমাণ।(উদ্ধৃত:প্রফেসর ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখী বর্মণ,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১১৭)

৩৩৮. ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখী বর্মণ,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১১৮

৩৩৯. পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত,*বিপ্লবের পথে*,র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন,কলকাতা,২০১৭,পৃ.১৮

৩৪০. হায়দার আকবর খান রনো, *প্রাগুক্ত*,পৃ.১৮৭

৩৪১. পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৮

৩৪২. Leonard A Gordon, *Bengal:The nationalist movement 1876-1940,*New Delhi,1979, p.189-91.(উদ্ধৃত: হুমায়ুন কবীর,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১২২-২৩)

৩৪৩. তাঁর পরিকল্পনা ছিল ছোট ছোট কারখানায় বড় বড় অস্ত্র তৈরী করে বিদ্রোহের জন্য তৈরী হতে হবে। অবশ্য স্বদেশী যুগে তার পরিচালিত মিলিটারী সংগঠন যুবকদের আন্দোলিত করেছিল।তবে গণ-সংগঠনে তিনি বিশ্বাস করতেন না এজন্য অহিংস নীতির কাছে তিনি মাথা নত করেননি।(উদ্ধৃত:সতীশ পাকড়াশী,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৯০)

৩৪৪. পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৯

৩৪৫. সতীশ পাকড়াশী,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৯০

৩৪৬. নলিনীকিশোর গুহ,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৫৯

৩৪৭. বিপ্লবীরা অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় সহযোগিতা করায় দিল্লী কংগ্রেসে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ কাজে লাগায়। এসময় বিপ্লবীরা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বিপ্লবী নেতৃবৃন্দের ভাবের আদান প্রদানসহ বাংলার বিভিন্ন দলের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের অন্তরঙ্গ মেলামেশার সুযোগ হয়।(উদ্ধৃত:পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২০।)

৩৪৮. সতীশ পাকড়াশী,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৯০

৩৪৯. পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২০-২১

৩৫০. নলিনীকিশোর গুহ,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৫৯

৩৫১. রমেশচন্দ্র মজুমদার,*বাংলাদেশের ইতিহাস চতুর্থ খন্ড (১৯০৫-১৯৪৭) (মুক্তি সংগ্রাম)*,দিব্যপ্রকাশ,ঢাকা,২০২১,পৃ.২৬৪

৩৫২. ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত-রায়,ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৩৭; নলিনীকিশোর গুহ,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৯১

৩৫৩. ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত-রায়,ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৩৭-৩৮

৩৫৪. তবে এটি সত্য যে,ধৃত অনেকেই অশান্তিকর কিছু করেন নাই। কেহ করেছেন,এমন কোনও প্রমাণই সরকার দিতে পারেন নাই। (উদ্ধৃত:নারায়ণ বন্ধ্যোপাধ্যায়,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১০২;নলিনীকিশোর গুহ,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৬০;পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত, *প্রাগুক্ত*,পৃ.২১)

৩৫৫. ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত-রায়,সবার অলক্ষ্যে,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৪৯

৩৫৬. পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২১

৩৫৭. সুপ্রকাশ রায়,ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম(১৮৯৩-১৯৪৭),*প্রাগুক্ত*,পৃ.২৯২

৩৫৮. নলিনীকিশোর গুহ,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২০৮-৯

৩৫৯. সুপ্রকাশ রায়,ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম (১৮৯৩-১৯৪৭),*প্রাগুক্ত*,পৃ.২৯২-৯৩।

৩৬০. পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২১-২২

৩৬১. বিপান চন্দ্র ও অন্যান্য,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৯২

৩৬২. ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত রায়,ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৩৯

৩৬৩. বিপ্লবী যতীন দাশ ও বিশ্বনাথ মুখার্জী এ সময় শচীন্দ্রনাথ স্যানালের সাথে যোগাযোগ রক্ষাপূর্বক বোমা তৈরীর কাজে সহায়তা করেন। শচীন্দ্রনাথ স্যানালের ফেরারী আড্ডায় অনুশীলন,হাওড়া,নদীয়া ও চট্টগ্রাম দল মিলিত হয় বলে জানা যায়।অনুশীলন নেতা প্রতুল গাঙ্গুলীর নির্দেশে চট্রগ্রামের চারুবিকাশ দত্ত চট্রগ্রাম অনুশীলনের সদস্য প্রমোদরঞ্জনকে সাথে নিয়ে ঢাকা থেকে বিস্ফোরক দ্রব্য,বোমার খোল প্রভৃতির জন্য ঢাকায় উপস্থিত হন। সেসময় নির্দেশিত হয়ে পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত পার্টি ভান্ডার থেকে তাদের চাহিত সে দ্রব্যগুলো সরবরাহ করেন। (উদ্ধৃত: পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২২)

৩৬৪. পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২২;ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত-রায়,ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৩৮

৩৬৫. এই মামলায় রাজেন্দ্র লাহিড়ী,পন্ডিত রাম প্রাসাদ এবং আসফাক উল্লা এবং ঠাকুর রোশন সিংয়েরও ফাঁসি হয়। যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,শচীন্দ্রনাথ স্যানাল, গোবিন্দ কর, মুকুন্দীলাল গুপ্তা এবং শচীন্দ্রনাথ বক্সী যাবজ্জীবন দীপান্তর বাসের সাজা হয়। এছাড়া মন্মথগুপ্ত ১৪ বৎসর,সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ১০ বৎসর, বিষ্ণুশরণ দুব্লিস ১০বৎসর, রামকৃষ্ণ ক্ষেত্রী ১০ বৎসর,রাজকুমার সিংহ ১০বৎসর এবং আরো কয়েকজন ভিন্ন ভিন্ন মেয়াদে সাজা প্রাপ্ত হয়। (উদ্ধৃত:নলিনীকিশোর গুহ,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৬০-৬১;ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়,ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৩৮-৪০)

৩৬৬. নলিনীকিশোর গুহ,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৬০

৩৬৭. সুপ্রকাশ রায়,ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম(১৮৯৩-১৯৪৭),*প্রাগুক্ত*,পৃ.২৬৩; ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়, ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব, *প্রাগুক্ত*,পৃ.১৩৯

৩৬৮. পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২২

৩৬৯. তাঁর কাজ ছিল প্রায়ই জেলখানায় এসে বিপ্লবীদের মনোবল ভাঙ্গার চেষ্টা করা। তিনি যখনই জেলখানায় আসতেন বহুক্ষণ থাকতেন এবং পরম ধৈর্যের সাথে বিপ্লবীদের সাথে মেশার চেষ্টা করতেন।যাদের মনোবল একটু দুর্বল মনে করতেন তাদের আলাদাভাবে অফিস ঘরে ডাকিয়ে এনে নানা স্তোকবাক্যে ও প্রলোভন দেখিয়ে বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে কাজে লাগাতে তৎপরতা বৃদ্ধি করায় বিপ্লবীরা তার প্রতি ক্ষিপ্ত হয়।(উদ্ধৃত: ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়,ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৩৯)

৩৭০. রাখালচন্দ্র দে,ধ্রুবেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,অনন্তকুমার চক্রবর্তীর দীপন্তর দন্ড এবং বাকী পাঁচজন খালাস পায়। (উদ্ধৃত: ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়,ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৩৯-৪০)

৩৭১. সতীশ পাকড়াশী,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৯৫

৩৭২. নলিনীকিশোর গুহ,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২০৮

৩৭৩. নলিনীকিশোর গুহ,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২০৮-৯

৩৭৪. ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়,সবার অলক্ষ্যে,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৪৯

৩৭৫. সতীশ পাকড়াশী,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১০৩

৩৭৬. ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত-রায়,সবার অলক্ষ্যে,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৪৯

৩৭৭. নলিনীকিশোর গুহ,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২০৯

৩৭৮. *ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী,জেলে ত্রিশ বছর ও পাক-ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম*,র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন,কলকাতা,২০১৫,পৃ.১২১-২২

৩৭৯. প্রকাশ থাকে যে,১৯২৪খ্রিস্টাব্দে কানপুরে শচীন্দ্রনাথ স্যানাল,রামপ্রসাদ বিসমিল,যোগেশ চ্যাটার্জীর নেতৃত্বে হিন্দুস্থান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন বা আর্মি (H.R.A.,) সমবেত হলেও ভগৎ সিং প্রমুখ সমাজতন্ত্রকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে নব উদ্যমে নেমে পড়েন। (উদ্ধৃত:সুপ্রকাশ রায়,ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম (১৮৯৩-১৯৪৭), *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৬৩:বিপানচন্দ্র ও অন্যান্য,ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ১৮৫৭-১৯৪৭, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৯১-৯২)

৩৮০. ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়,সবার অলক্ষ্যে,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৪০

৩৮১. সতীশ পাকড়াশী,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১১৪

৩৮২. বিপান চন্দ্র ও অন্যান্য,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৯৩

৩৮৩. ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়,সবার অলক্ষ্যে,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১১২

৩৮৪. ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়,সবার অলক্ষ্যে,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৪০

৩৮৫. ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়,ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৫১-৫২

৩৮৬. নলিনীকিশোর গুহ,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২০৯

৩৮৭. ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়,সবার অলক্ষ্যে,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৪৫

৩৮৮. ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়,ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৪২

৩৮৯. নলিনীকিশোর গুহ,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২০৯

৩৯০. চট্টগ্রাম বিদ্রোহের নায়ক সূর্য সেন এ সময় (১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিকে) হেমচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে আলাপকালে সকলে মিলে একটা কিছু করার প্রস্তাব করায় তিনি বলেছিলেন,যদি সত্যি কিছু করতে চাও তবে চুপে চুপে প্রস্তুতি নিয়ে সহসা একদিন দুঃসাহসে ঝাঁপিয়ে পড়ো। কাউকে কিছু বলোনা। আমাকেও না। সব পন্ড হয়ে যাবে।'মন্ত্রগুপ্তি-রক্ষা' মানে যাকে একান্ত বিশ্বাস কর তাঁকেও অকারণে কিছু না বলা। একেবারে নিজের কাছে তোমার কথা লুকিয়ে না রাখলে দেখবে–সার্থক বিপ্লবের নায়ক না হয়ে আখেরে হয়তো হবে একটি ব্যর্থ ষড়যন্ত্রের নেতা। (উদ্ধৃত: ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়,সবার অলক্ষ্যে,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৪৪)

৩৯১. ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়,ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৪২

৩৯২. সতীশ পাকড়াশী,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১১৩;নলিনীকিশোর গুহ,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২১০

৩৯৩. সতীশ পাকড়াশী,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১১৩-১৪

৩৯৪. ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়,ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৪৩

৩৯৫. নলিনীকিশোর গুহ,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২১০-১১

৩৯৬. ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়,ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৪৩

৩৯৭. ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়,ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৪৪-৪৫

৩৯৮. ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়,সবার অলক্ষ্যে,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৪৯-৫০

৩৯৯. সতীশ পাকড়াশী,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১১৭

৪০০. সুপ্রকাশ রায়,ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম (১৮৯৩-১৯৪৭), *প্রাগুক্ত*,পৃ.২৯৮

৪০১. শরীফ শমশির (সম্পা.),ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম চট্টগ্রাম বিদ্রোহ ও বিপ্লবী মহানায়ক সূর্য সেন,অনিন্দ্য প্রকাশ,ঢাকা, ২০১৭,পৃ.২১

৪০২. *সাক্ষাৎকার*,ড.ইঞ্জি.মো.খালেকুজ্জামান,সভাপতি,বাঁশরী,নজরুল চর্চাকেন্দ্র,ঢাকা,তারিখ:১১মে,২০২২খ্রিস্টাব্দ।

৪০৩. শরীফ শমশির (সম্পা.),*প্রাগুক্ত*,পৃ.২১-২২

৪০৪. শরীফ শমশির(সম্পা.),*প্রাগুক্ত*,পৃ.২২

৪০৫. শরীফ শমশির(সম্পা.),*প্রাগুক্ত*,পৃ.২২

৪০৬. শরীফ শমশির(সম্পা.),*প্রাগুক্ত*,পৃ.২২

৪০৭. শরীফ শমশির(সম্পা.),*প্রাগুক্ত*,পৃ.২২

৪০৮. ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়,সবার অলক্ষ্যে,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৫০

৪০৯. বিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায়,ভারতের সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রাম,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৯০

৪১০. সুপ্রকাশ রায়,ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম(১৮৯৩-১৯৪৭), *প্রাগুক্ত*,পৃ.২৯৮

৪১১. আয়ারল্যান্ডের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে ইস্টার বিদ্রোহ একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা।ইস্টার বিদ্রোহের দিনটিও ছিল ১৮ এপ্রিল, শুক্রবার-Good Friday.এই দিনটি যীশু খ্রিস্টের ক্রুশ-বিদ্ধ হওয়ার স্মরণ দিবস।খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের কাছে দিনটি যীশুর কবর হতে পুনরভ্যুত্থানের পর্ব বিশেষ।এই উৎসবের দিনে ইউরোপীয়ান ক্লাবে উচ্চ পদস্থ সাহেবদের এক সঙ্গে আমোদ-প্রমোদে বিভোর অবস্থায় পাওয়া যাবে ধরে নিয়ে এ দিবস ধার্য করা হয়। (উদ্ধৃত: অনন্ত সিং,*অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম*, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ৪১৭)

৪১২. নলিনীকিশোর গুহ, *প্রাগুক্ত*,পৃ.২১৩

৪১৩. *Encyclopedia Britannica,* 15th Edition(Easter Rising),p.334.(উদ্ধৃত:বিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায়,ভারতের সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রাম,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৯০)

৪১৪. বিপান চন্দ্র ও অন্যান্য,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৯৪

৪১৫. সুপ্রকাশ রায়,ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম(১৮৯৩-১৯৪৭), *প্রাগুক্ত*,পৃ.২৯৯

৪১৬. ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত-রায়,সবার অলক্ষ্যে,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৫১

৪১৭. সুপ্রকাশ রায়,ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম(১৮৯৩-১৯৪৭),*প্রাগুক্ত*,পৃ.২৯৯

৪১৮. কালিচরণ ঘোষ,জাগরণ ও বিস্ফোরণ(১৯০৮-১৯৪৭),দ্বিতীয় খন্ড,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২১০

৪১৯. নলিনীকিশোর গুহ,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২১৫

৪২০. কালিচরণ ঘোষ,জাগরণ ও বিস্ফোরণ(১৯০৮-১৯৪৭),দ্বিতীয় খন্ড,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২১০

৪২১. সুপ্রকাশ রায়,ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম(১৮৯৩-১৯৪৭),*প্রাগুক্ত*,পৃ.৩০০

৪২২. নলিনীকিশোর গুহ,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২১৫

৪২৩. কালিচরণ ঘোষ,জাগরণ ও বিস্ফোরণ (১৯০৮-১৯৪৭),দ্বিতীয় খন্ড, *প্রাগুক্ত*,পৃ.২১১; নলিনীকিশোর গুহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২১৫

৪২৪. সুপ্রকাশ রায়,ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম (১৮৯৩-১৯৪৭), *প্রাগুক্ত*,পৃ.৩০০

৪২৫. সুপ্রকাশ রায়,ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম(১৮৯৩-১৯৪৭),*প্রাগুক্ত*,পৃ.৩০০; বিপান চন্দ্র ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত*,পৃ.১৯৪

৪২৬. কালিচরণ ঘোষ,জাগরণ ও বিস্ফোরণ (১৯০৮-১৯৪৭), দ্বিতীয় খন্ড, *প্রাগুক্ত*,পৃ.২১১

৪২৭. নলিনীকিশোর গুহ,বাংলায় বিপ্লববাদ,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২১৫

৪২৮. সুপ্রকাশ রায়,ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম(১৮৯৩-১৯৪৭),*প্রাগুক্ত*,পৃ.৩০১

৪২৯. সুপ্রকাশ রায়, ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম(১৮৯৩-১৯৪৭),*প্রাগুক্ত*,পৃ.৩০০

৪৩০. কালিচরণ ঘোষ,জাগরণ ও বিস্ফোরণ(১৯০৮-১৯৪৭), দ্বিতীয় খন্ড,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২১১

৪৩১. জালালাবাদ যুদ্ধে যে ১২ জন বিপ্লবী শহীদ হন তারা হলেন,হরিগোপাল বল (টেগরা),নির্মল সেন,নরেশ রায়,বিধু ভট্টাচার্য, ত্রিপুরা সেন,প্রভাস বল,শশাঙ্ক দত্ত,জিতেন্দ্র দাশ,মধুসুদন দত্ত,পুলিন ঘোষ, অর্ধেন্দু দস্তিদার ও মতিলাল কানুনগো নিহত হয়। আহত দুই জন হলেন,অম্বিকা চক্রবর্তী ও বিনোদ দত্ত। (উদ্ধৃত:নলিনীকিশোর গুহ,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২১৬)

৪৩২. সুপ্রকাশ রায়,ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম(১৮৯৩-১৯৪৭), *প্রাগুক্ত*,পৃ.৩০১-২;বিপান চন্দ্র ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৯৪

৪৩৩. বিপান চন্দ্র ও অন্যান্য,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৯৫

৪৩৪. এ গুলিবর্ষণে একজন দারোগা ও দুইজন কনস্টেবল আহত হয় সুপ্রকাশ রায়।(উদ্ধৃত: ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম (১৮৯৩-১৯৪৭),পৃ.৩০২)

৪৩৫. সুপ্রকাশ রায়,ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম (১৮৯৩-১৯৪৭), *প্রাগুক্ত*,পৃ.৩০২; ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত-রায়, সবার অলক্ষ্যে,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৬০

৪৩৬. সুপ্রকাশ রায়,ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম(১৮৯৩-১৯৪৭),*প্রাগুক্ত*,পৃ.৩০২

৪৩৭. বিপ্লবী নায়ক সূর্য সেন অবশিষ্ট বিপ্লবীদের নিয়ে নতুন নতুন পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হন এবং চট্টগ্রামের ইংরেজ সরকার ব্যতিব্যস্ত হয়। দিশেহারা হয়ে চারিদিক হতে চট্টগ্রামে সৈন্য সমাবেশ ঘটায়। সূর্যকুমার সেন ও তাঁর সহকর্মীদের খুঁজে বের করার জন্য সমগ্র চট্টগ্রাম তোলপাড় করতে থাকে। জনসাধারণ বিপ্লবীদের সাহায্য করছে

ধারণার বশবর্তী হয়ে সরকার চট্টগ্রাম জেলার ওপর অত্যাচারের বন্যা বইয়ে দেয়। (উদ্ধৃত: সুপ্রকাশ রায়,ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম (১৮৯৩-১৯৪৭), *প্রাগুক্ত*,পৃ.৩০৩)

৪৩৮. সুপ্রকাশ রায়, ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম(১৮৯৩-১৯৪৭),*প্রাগুক্ত*,পৃ.৩০২-৩

৪৩৯. সুপ্রকাশ রায়,ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম(১৮৯৩-১৯৪৭),*প্রাগুক্ত*,পৃ.৩০৩; কালিচরণ ঘোষ,জাগরণ ও বিস্ফোরণ (১৯০৮-১৯৪৭), দ্বিতীয় খন্ড,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২১৪; নলিনীকিশোর গুহ,বাংলায় বিপ্লববাদ, *প্রাগুক্ত*,পৃ.২১৮

৪৪০. কালিচরণ ঘোষ, জাগরণ ও বিস্ফোরণ (১৯০৮-১৯৪৭),দ্বিতীয় খন্ড, পৃ.২১৪

৪৪১. নলিনীকিশোর গুহ,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২১৮

৪৪২. এ ঘটনায় ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ফাঁসি এবং কালিপদ চক্রবর্তীর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর সাজা হয়। (উদ্ধৃত: ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত-রায়,সবার অলক্ষ্যে,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৬৪)

৪৪৩. নলিনীকিশোর গুহ,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২১৮

৪৪৪. এ ঘটনায় আসামী হরিপদ'র বয়স কম হওয়ায় দীপান্তর দন্ড হয়েছিল বলে জানা যায়। এদিকে ২৮ অক্টোবর চট্টগ্রামের বিপ্লবী সরোজগুহ এবং যুগান্তরের নোয়াখালীবাসী রমেন ভৌমিকের গুলিবর্ষণে নবাবপুর রোডে ঢাকার জেলা হাকিম ডুর্নো আহত হয়। কিন্তু পুলিশ আততায়ীর সন্ধান পায়নি বলে জানা যায়। (উদ্ধৃত: ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত-রায়,সবার অলক্ষ্যে,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৬৫-৬৮)

৪৪৫. বিপ্লবীদের আশ্রয় দেবার অপরাধে বৃদ্ধা সাবিত্রী দেবী ও তার পুত্র রামকৃষ্ণের চার বৎসর কারাদন্ড হয়। (উদ্ধৃত: নলিনীকিশোর গুহ,*প্রাগুক্ত*, পৃ.২১৮)

৪৪৬. নলিনীকিশোর গুহ,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২১৯

৪৪৭. ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত-রায়,সবার অলক্ষ্যে,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১০০

৪৪৮. নলিনীকিশোর গুহ,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২১৯-২০

৪৪৯. ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত-রায়,সবার অলক্ষ্যে,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৯৯

৪৫০. সতীশ পাকড়াশী,অগ্নিযুগের কথা,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১২১

৪৫১. নলিনীকিশোর গুহ,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২১১

৪৫২. বিপান চন্দ্র ও অন্যান্য,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৯৫

৪৫৩. ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে কলকাতার মূল যুগান্তর সমিতির নেতারা একত্রিত হয়ে একটি পরিকল্পনা তৈরী করেন এবং পরিকল্পনা কার্যকরী করবার উদ্দেশ্যে ব্যাপকভাবে বোমা তৈরীর ব্যবস্থা করেন।তাঁদের পরিকল্পনা ছিল নিম্নরূপ: ১.কলকাতার ও বিভিন্ন জেলায় একই সময়ে হোটেল,ক্লাব,সিনেমা প্রভৃতি স্থানে ইংরেজদের বোমা দ্বারা হত্যা করা। ২.দমদমের বিমান-ঘাঁটি পেট্রোল দিয়ে ভস্মীভূত করা।৩.কলকাতার গ্যাস ও বিদ্যুৎ উৎপাদন-কেন্দ্রগুলি ধ্বংস করে নগরীর গ্যাস ও বিদ্যুৎ-সরবরাহ বন্ধ করা।৪.বজবজের পেট্রোল-ডিপো বোমা দ্বারা ধ্বংস করে কলকাতার পেট্রোল-সরবরাহ বন্ধ করা। ৫. ট্রামের তার কেটে কলকাতার ট্রাম চলাচল বন্ধ করা।৬.কলকাতার সাথে মফঃস্বল জেলাগুলির টেলিগ্রাম যোগাযোগ বানচাল করা। ৭.কলকাতা ও পাশ্ববর্তী অঞ্চলের বিভিন্ন পুল ও রেল-লাইন ডিনামাইট ও হাতবোমা দ্বারা ধ্বংস করা। (উদ্ধৃত:Joint Committee Report, P.331.(Goverrntment Publication.);সুপ্রকাশ রায়, ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম (১৮৯৩-১৯৪৭), *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩০৪)

৪৫৪. সুপ্রকাশ রায়,ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম(১৮৯৩-১৯৪৭),*প্রাগুক্ত*,পৃ.২৯৭-৩০৪

৪৫৫. ঐদিনই ডা.নারায়ণ রায়কে গ্রেফতারের সময় যুগান্তরের বোমার কারখানা আবিস্কৃত হয়।চারিদিকে ধরপাকড় শুরু হলে যুগান্তরের বহুকর্মী ধরা পড়ে। সেপ্টেম্বরে ডালহৌসি স্কোয়ার ষড়যন্ত্র মামলা শুরু হয়। মামলার রায়ে বিপ্লবীদের ২০ বৎসরের দীপান্তর হতে ৫ বৎসর পর্যন্ত কারা দন্ড হয়।(উদ্ধৃত:সুপ্রকাশ রায়,ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম (১৮৯৩-১৯৪৭), *প্রাগুক্ত*,পৃ.৩০৪)

৪৫৬. ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়,সবার অলক্ষ্যে,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৪৯;সুপ্রকাশ রায়,ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম (১৮৯৩-১৯৪৭),*প্রাগুক্ত*,পৃ.৩০৫-৬

৪৫৭. সুপ্রকাশ রায়,ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম(১৮৯৩-১৯৪৭),*প্রাগুক্ত*,পৃ.৩০৬; (https://www.the betterindia.com>be), access on 27 april 2022.

৪৫৮. ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়,সবার অলক্ষ্যে,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৪৯

৪৫৯. ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়,ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২৪৩

৪৬০. তবে মি.এলিসন হত্যাকারী সম্পর্কে কাউকে গ্রেফতার করা না গেলেও কামাক্ষা সেন হত্যাকান্ডে কালিপদ ভট্টাচার্য নামক এক যুবকের ফাঁসির আদেশ হয়।এ দু'হত্যাকারী গুপ্তদল সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায় নাই। (উদ্ধৃত: সুপ্রকাশ রায়,ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম(১৮৯৩-১৯৪৭),*প্রাগুক্ত*,পৃ.৩১৫)

৪৬১. ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়,ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২৪৩;নলিনীকিশোর গুহ,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৯৬

৪৬২. ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়,ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২৪৩

৪৬৩. সুপ্রকাশ রায়,ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম(১৮৯৩-১৯৪৭), *প্রাগুক্ত*,পৃ.৩১৯-২০

৪৬৪. ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়,ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২৪৩

৪৬৫. সতীশ পাকড়াশী,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১১৬;ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়,ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৯৩-৯৪

৪৬৬. ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়,সবার অলক্ষ্যে,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৫১

৪৬৭. কংগ্রেস নেতা পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু কলকাতায় সাম্রাজ্যবাদের নিন্দা করে দেয়া এক বক্তৃতার এক পর্যায়ে স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষী সশস্ত্র বিপ্লবীদের বৈপ্লবিক নীতিকে ব্যর্থ ও সেকেলে বলে সমালোচনা করলেও বিপ্লবী যুবকদের বীরত্বের প্রশংসা ও পুলিশী নির্যাতনের নিন্দা করেন। বস্তুতপক্ষে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণ পরবর্তীকালে বৈপ্লবিক কার্যক্রম বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে প্রথমে সরকার আতঙ্কিত হয়ে পড়লেও বর্বর দমনপীড়ন চালাতে থাকে।২০টি দমনমূলক আইন পাস করে সকল জাতীয়তাবাদীর বিরুদ্ধে পুলিশ লেলিয়ে দেয়।চট্টগ্রামে কয়েকটি গ্রাম জ্বালিয়ে এবং পিটুনি কর চাপিয়ে সরকার নিজেই সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে।কলকাতায় দেয়া উপর্যুক্ত বক্তব্যের কারণে রাষ্ট্রদ্রোহীতার অভিযোগ এনে সরকার পন্ডিত জওহরলাল নেহেরুকে ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে গ্রেফতার করে। (উদ্ধৃত: শরীফ শমশির (সম্পা.), *ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম চট্টগ্রাম বিদ্রোহ ও বিপ্লবী মহানায়ক সূর্য সেন*,অনিন্দ্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৭,পৃ.৩০)

৪৬৮. ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়,সবার অলক্ষ্যে,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৫১-৫২

৪৬৯. সতীশ পাকড়াশী,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১১৬

৪৭০. ১৯৩৩-৩৪ খ্রিস্টাব্দে সর্বভারতের একটা ব্যাপক সশস্ত্র অভ্যুত্থান প্রচেষ্টার এই মামলাটি আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলা নামে পরিচিত পায়।রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন এই অভিযোগে ৩৮ জন বিপ্লবীর বিরুদ্ধে মামলা হয়।এই ষড়যন্ত্র পাঞ্জাব হতে ব্রহ্মদেশ,বোম্বাই,মাদ্রাজ,মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং এ সকল স্থান হতে সাক্ষী সংগ্রহ করা হয়েছে।এই মামলায় প্রভাত চক্রবর্তী,জিতেনগুপ্ত,পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত,ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য,সীতানাথ দে, নরেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ যাবজ্জীবন দীপান্তর প্রাপ্ত হন।কিশোরীমোহন দাশগুপ্ত,মণীন্দ্রলাল চৌধুরী,পরেশচন্দ্র গুহ,দশ বৎসর দীপান্তর দন্ড। যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী,দ্বিজেন্দ্রনাথ তলাপাত্র,অবনীমোহন ভট্টাচার্য,প্রভাত কুমার মিত্র,সত্যেন্দ্র নারায়ণ মজুমদার,হরিপদ দে, নিরঞ্জন ঘোষাল,অমল চন্দ্র সেনগুপ্ত,অমিয়কুমার পাল সাত বৎসর,হেম ভট্টাচার্য,বিমল ভট্টাচার্য, সুরেশ চন্দ্র চৌধুরী, জ্যোতিষচন্দ্র মজুমদার ছয় বৎসর;সুধীর ভট্টাচার্য পাঁচ বৎসর;সন্তোষ চ্যাটার্জী,শ্যাম বিহারী লাল শুকলা,ইন্দ্রভূষণ মজুমদার,প্রবোধ কুমার ঘোষ,অজিত কুমার বসু,অবনী রঞ্জন সরকার,সুশীল কুমার রায় চৌধুরী তিন বৎসর;জ্যোতি মুকুল ঘোষ, লক্ষ্মীনারায়ণ শর্মা,সঞ্জীব মুখার্জী,কালী মোহন দে,ভোলানাথ দাশ এক বৎসর কারাদন্ড প্রাপ্ত হন।দ্বিজেন রায় মুক্তি পায়। মহানন্দপুর বিহারের বিপ্লবী মধুসূদন রায় ছিলেন পলাতক।ইহারা সকলেই অনুশীলন দলের সদস্য।নেতারা যখন জেলে ছিলেন তখন প্রভাত চক্রবর্তী,পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত,জিতেনগুপ্ত, সীতানাথ দে প্রমুখ তরুণ বিপ্লবীরা এই বিপ্লবের আয়োজন করেন।২৫০ জন বিপ্লবীকে গ্রেফতার করে শুরু হওয়া এ মামলা দুই বৎসর চলে। (উদ্ধৃত: ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, *প্রাগুক্ত*,পৃ.১৮৭-৮৮; নলিনীকিশোর গুহ,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২৩৩;পূর্ণানন্দদাশ গুপ্ত,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৮৪-৮৭) এতদসঙ্গে চিটাগর ষড়যন্ত্র মামলাও প্রাসঙ্গিক। (উদ্ধৃত: নলিনীকিশোর গুহ,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২৩৪)

৪৭১. সুপ্রকাশ রায়,ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম(১৮৯৩-১৯৪৭),*প্রাগুক্ত*,পৃ.৩২০-২১

৪৭২. সুপ্রকাশ রায়,ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম(১৮৯৩-১৯৪৭),*প্রাগুক্ত*,পৃ.৩০৮-২৩

৪৭৩. সুপ্রকাশ রায়,ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম(১৮৯৩-১৯৪৭),*প্রাগুক্ত*,পৃ.৩২৩

৪৭৪. সতীশ পাকড়াশী,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৪২

৪৭৫. হায়দার আকবর খান রনো,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১১৭

৪৭৬. ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি জাতীয় কংগ্রেস পূর্ণ স্বরাজ প্রস্তাব গ্রহণ করে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে ভারতে লবণ প্রস্তুত করা নিষিদ্ধ ছিল।এ আইন অমান্য করে আন্দোলনের প্রত্যয়ে ১২ মার্চ গান্ধীজির নেতৃত্বে ডান্ডি পদযাত্রা বা লবণ সত্যাগ্রহ শুরু হয়। গান্ধীজি আহমেদাবাদের নিকটবর্তী সবরমতী আশ্রম থেকে পদযাত্রা শুরু করে ২৬ দিনে ২৪০ মাইল পথ হেঁটে ৬ এপ্রিল ডান্ডি গ্রামে পৌঁছেন। এবং সেখানে সমুদ্রের জল থেকে লবণ প্রস্তুত করেন।গান্ধীজির বাছাই করা ৭৮ জন সত্যাগ্রহী নিয়ে শুরু হলেও এ অভিযানে লক্ষাধিক লোক সমবেত হয়। সারা দেশে এ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ায় গান্ধীজি গ্রেফতার হন।প্রতিবাদে কলকাতা,বোম্বাই,পুনায় হরতাল হয়। কলকাতা ও বোম্বাইয়ের পরিস্থিতি ছিল অভ্যুত্থানের মতো।পুলিশ বেপরোয়া গুলিচালিয়ে অসংখ্য মানুষকে হত্যা করে। বাংলার মেদিনীপুরেও লবণ আন্দোলন ব্যাপকতা লাভ করায় সেখানেও ব্রিট্রিশের অত্যাচার বর্বরতম রূপ পরিগ্রহ করে। মে মাসে গান্ধীজি গ্রেফতার হন।এসময় জাতীয় কংগ্রেস নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়।(উদ্ধৃত:হায়দার আকবর খান রনো,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১১০-১১)

৪৭৭. ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের ০৫ মার্চ গান্ধী-আরউইন চুক্তিতে সরকার লবণ কর প্রত্যাহার ও কংগ্রেস কর্মীদের মুক্তির ঘোষণা দিলেও স্বাধীনতার জন্য যারা সশস্ত্র পথ গ্রহণ করেছেন,তাদের মুক্তি দেয়া হবেনা; অহিংসা আন্দোলনের নেতা গান্ধীজি তাতে সম্মত হন। এই চুক্তির পরেই ২৩ মার্চ ভগৎ সিং, রাজগুরু ও শুকদেবের ফাঁসি কার্যকর করা হয়। গান্ধীজি এ ফাঁসির নিন্দা পর্যন্ত করেন নি। (উদ্ধৃত: হায়দার আকবর খান রনো, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১১১-১২)

৪৭৮. সুপ্রকাশ রায়,ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম(১৮৯৩-১৯৪৭),*প্রাগুক্ত*,পৃ.৩৬২-৬৩

৪৭৯. ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখী বর্মণ,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৭৭।

৪৮০. গঙ্গানারায়ণ চন্দ্র,*অবিস্মরণীয়*,র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেসন,কলকাতা,২০১৬,পৃ.১৬১

৪৮১. ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের ৫ মার্চ স্বাক্ষরিত হলো গান্ধী-আরউইন চুক্তি।

৪৮২. কালীচরণ ঘোষ,জাগরণ ও বিস্ফোরণ(১৯০৮-১৯৪৭),দ্বিতীয় খন্ড,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২৩৩

৪৮৩. ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ভারতশাসন আইনের মতো স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা।

৪৮৪. অথচ ওই ঐক্যের জন্য দেশের লোক এতোকাল প্রাণান্ত প্রচেষ্টা চালায়।ব্রিটিশের চাতুর্যে ও কপটতায় তা ত্যাগে বাধ্য হলেন।কাজেই পাকিস্তানের জন্ম ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে নয়,১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে।জন্মদাতাও কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ নন,জন্মদাতা ব্রিটিশ পার্লামেন্ট।১৯২২ খ্রিস্টাব্দে যেমন হঠাৎ একদিন মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করেন,তেমনী ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে হঠাৎ তিনি আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করেন।দু'বারই বাধা পেয়েছিলেন বাংলা ও মহারাষ্ট্র থেকে।(উদ্ধৃত:গঙ্গানারায়ণ চন্দ্র,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৬১)

৪৮৫. বিপান চন্দ্র ও অন্যান্য,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২৪৮

৪৮৬. শরিফুল ইসলাম ভূঁইয়া,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৪৫

৪৮৭. বিপান চন্দ্র ও অন্যান্য,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২৫২

৪৮৮. Michael Brecher, Nehru: *A Political Biography,* Oxford University Press, London:1959, p.231.

৪৮৯. Ram Gopal,*Indian Muslims:A Political History*,1858-1947.Bombay,(Reprint,1964.), p.265.

৬৯০. মুসলিম নেতৃবৃন্দের চিরন্তন দাবি হচ্ছে মুসলিম লীগকে মুসলমানদের প্রতিনিধি হিসেবে স্বীকার করা, কিন্তু কংগ্রেস সর্বদা এটি অস্বীকার করে এসেছে।মুসলিম লীগ সর্বদা মুসলমানদেরকে তার পতাকাতলে সমবেত হতে আহ্বান জানায়।এই পক্রিয়ায় হিন্দু মহাসভাও হিন্দুদেরকে অনুরুপ আহ্বান জানায়।হিন্দু মহাসভা তার আগ্রাসী কার্যকলাপ আরম্ভ করলে মুসলিম লীগের কাজ আরো সহজতর হয়ে যায়।এতদসঙ্গে মুসলিম লীগ মুসলমানদের প্রতি এই দাবিও সম্প্রচার করে যে,ভারতের হিন্দু ও মুসলমানরা কখনও এক জাতি হতে পারে না।হিন্দু মহাসভাও এ দাবির যথার্থতা স্বীকার করে।হিন্দু মহাসভার সভাপতি বিনয়ক সভারকার ১৯৩৭খ্রিস্টাব্দের বার্ষিক অধিবেশনে বলেন,ভারতকে কখনও একটি একক এবং সুসংঘবদ্ধ জাতি হিসাবে বিবেচনা করা যায় না,বরং তার বিপরীতে এখানে প্রধানত দু'টি জাতি বিদ্যমান,একটি হিন্দু অপরটি মুসলমান।(উদ্ধৃত:ড.মো.শাহজাহান,*স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস*,চয়নিকা, ঢাকা, ২০১৪, পৃ.৫৯;Lord zetland Essayez,Quoted by P.Hardy on *The Muslims of British India*, Cambridge, 1972,p.229; Ram Gopal, *op.cit*.,p.264.)

৪৯১. সালাউদ্দিন আহমেদ, মোনায়েম সরকার ও ড.নূরুল ইসলাম মঞ্জুর(সম্পা.),*বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস (১৯৪৭-১৯৭১)*,আগামী প্রকাশনী,ঢাকা,১৯৯৭,পৃ.১৯

৪৯২. মুহম্মদ আবদুর রহিম,*বাংলার মুসলমানদের রাজনৈতিক ইতিহাস (১৭৫৭-১৯৪৭)*,আহমদ পাবলিশিং হাউস,ঢাকা,১৯৭৬,পৃ.২৪১

৪৯৩. সালাউদ্দিন আহমেদ ও অন্যান্য (সম্পা.),*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৯

৪৯৪. জয়া চ্যাটার্জী,*বাঙলা ভাগ হল*,(অনু.আবু জাফর),দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড,ঢাকা,২০০৩,পৃ.১২৪

৪৯৫. কংগ্রেস মুখপাত্র (শরৎবসু,বিধানচন্দ্র রায় ও কিরণশঙ্কর রায়) চান যে,রাজবন্দিদের মুক্তির বিষয়টি অগ্রাধিকার পাওয়া উচিৎ;এই ইস্যুতে প্রয়োজন হলে মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। অন্য দিকে কৃষকপ্রজা পার্টির নেতারা মনে করেন যে,কৃষকের কল্যাণই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাঁরা বলেন, রাজবন্দিদের মুক্তির প্রশ্নে পদত্যাগের অঙ্গীকার কৃষকের কল্যাণের বিষয়টিকে অনিশ্চিত করতে পারে। (উদ্ধৃত:জয়া চ্যাটার্জী, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১২৪) এছাড়াও কংগ্রেস ও কৃষকপ্রজা পার্টির মধ্যে আলোচনা ভেঙ্গে যাওয়ায় একাধিক বক্তব্য আছে। যেমন মহাত্মা গান্ধী এবং কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি কোয়ালিশন সরকারে যোগদান করতে বেঙ্গল কংগ্রেসকে অনুমতি না দেওয়ায় আলোচনা ভেঙ্গে যায়।(অমিয় বসুর সাথে জয়া চ্যাটার্জীর সাক্ষাৎকার। কলকাতা, তারিখ: ০৪ মার্চ, ১৯৯০ (উদ্ধৃত:জয়া চ্যাটার্জী,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৬২)

৪৯৬. জয়া চ্যাটার্জী,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১২৪

৪৯৭. সালাউদ্দিন আহমেদ,বাংলাদেশ: *জাতীয়তাবাদ,স্বাধীনতা,গণতন্ত্র*,আগামী প্রকাশনী,ঢাকা:১৯৯৩,পৃ.৬৩

৪৯৮. জয়া চ্যাটার্জী,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১২৩-১২৪

৪৯৯. মো.সাজ্জাদুর রহমান (সম্পা.),*টাঙ্গাইল জেলার স্মরণীয়-বরণীয় ব্যক্তিত্ব*,ছায়াবীথি,টাঙ্গাইল,২০১০,পৃ.১২৫-১২৬; মুহম্মদ আবদুর রহিম,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২৪১

৫০০. ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়,সবার অলক্ষ্যে,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৬৩

৫০১. ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৩১-৩৩

৫০২. ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়,সবার অলক্ষ্যে,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৬৪

৫০৩. ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৩৩

৫০৪. ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৬৪

৫০৫. প্রকৃতপক্ষে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের পর বিপ্লব আন্দোলনে দন্ডিত বন্দীদিগকে আন্দামানে পাঠানো হয়েছিল। সেখানে বন্দিরা দুইবার অনশন ব্রত গ্রহণ করেছিলেন এবং এতে কয়েকজনের মৃত্যু ঘটে। আন্দামানের বন্দীদিগকে দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য ও সকল বন্দীকে মুক্তিদানের জন্য দেশে আন্দোলন শুরু হয়েছিল। (উদ্ধৃত: ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী,*প্রাগুক্ত*, পৃ.১৩১-৩৩)

৫০৬. ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়,সবার অলক্ষ্যে,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৬৪

৫০৭. সুপ্রকাশ রায়,ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম(১৮৯৩-১৯৪৭),*প্রাগুক্ত*,পৃ.৩৬৬

৫০৮. বিপান চন্দ্র ও অন্যান্য,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৩৫৫

৫০৯. Subhas Chandra Bose,*The Indian Struggle 1920-42'*,Bombay:1967(Reprint),p.335.(উদ্ধৃত: বিপান চন্দ্র ও অন্যান্য,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৩৫৬-৭)

৫১০. বিপান চন্দ্র ও অন্যান্য,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৩৫৭

৫১১. সুপ্রকাশ রায়,ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম(১৮৯৩-১৯৪৭),*প্রাগুক্ত*,পৃ.৩৭০

৫১২. বিপান চন্দ্র ও অন্যান্য,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৩৫৮

৫১৩. নলিনীকিশোর গুহ,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২৭০

৫১৪. যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৪৬০;নলিনীকিশোর গুহ,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২৭০

৫১৫. ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৫০-৫১

৫১৬. ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়,সবার অলক্ষ্যে,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৬৪

৫১৭. বিপান চন্দ্র ও অন্যান্য,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৩৫৮

৫১৮. সুপ্রকাশ রায়,ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম(১৮৯৩-১৯৪৭),*প্রাগুক্ত*,পৃ.৩৭০-৭১

৫১৯. সুপ্রকাশ রায়,ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম(১৮৯৩-১৯৪৭),*প্রাগুক্ত*,পৃ.৩৭১-৭২

৫২০. নলিনীকিশোর গুহ,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২৭০

৫২১. বিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায়,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৮৬

৫২২. কামাক্ষা নাথ সেন,ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন ও টাঙ্গাইল,মুহম্মদ বাকের (সম্পা.),*প্রাগুক্ত*,পৃ.৩৬০

৫২৩. নলিনীকিশোর গুহ,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২৭৬

৫২৪. হায়দার আকবর খান রনো,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১১৯;বিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায়,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৮৬;নলিনীকিশোর গুহ,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২৭০

৫২৫. কালীচরণ ঘোষ,জাগরণ ও বিস্ফোরণ(১৯০৮-১৯৪৭),দ্বিতীয় খন্ড,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৩৫২;নলিনীকিশোর গুহ,*প্রাগুক্ত*, পৃ.২৭৮

৫২৬. নলিনীকিশোর গুহ,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২৭৮

৫২৭. কালীচরণ ঘোষ,জাগরণ ও বিস্ফোরণ(১৯০৮-১৯৪৭),দ্বিতীয় খন্ড,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৩৫২

৫২৮. অতঃপর পরবর্তীতে সুভাসচন্দ্র বসু নামের পরিবর্তে নেতাজী ব্যবহৃত হবে।

৫২৯. হায়দার আকবর খান রনো,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১১৯

৫৩০. বিজনবিহারী বসু,কর্মবীর রাসবিহারী,র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন,কলকাতা,২০১৭,পৃ.১৫৫

৫৩১. হায়দার আকবর খান রনো,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১১৯-২০

৫৩২. বিজনবিহারী বসু,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৫৫

৫৩৩. হায়দার আকবর খান রনো,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১১৯-২০

৫৩৪. নলিনীকিশোর গুহ,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২৭০-৭১

৫৩৫. কালীচরণ ঘোষ,জাগরণ ও বিস্ফোরণ(১৯০৮-১৯৪৭),দ্বিতীয় খন্ড,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৩৫১

৫৩৬. নলিনীকিশোর গুহ,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২৭১

৫৩৭. হায়দার আকবর খান রনো,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১১৯

৫৩৮. কালীচরণ ঘোষ,জাগরণ ও বিস্ফোরণ(১৯০৮-১৯৪৭),দ্বিতীয় খন্ড,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৩৫১

৫৩৯. ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখী বর্মণ,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২৬৮

৫৪০. নলিনীকিশোর গুহ,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২৭১

৫৪১. কালীচরণ ঘোষ,জাগরণ ও বিস্ফোরণ(১৯০৮-১৯৪৭),দ্বিতীয় খন্ড,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৩৫১;হায়দার আকবর খান রনো, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১১৯

৫৪২. কালীচরণ ঘোষ,জাগরণ ও বিস্ফোরণ(১৯০৮-১৯৪৭),দ্বিতীয় খন্ড,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৩৫১-৫২

৫৪৩. কালীচরণ ঘোষ,জাগরণ ও বিস্ফোরণ (১৯০৮-১৯৪৭), দ্বিতীয় খন্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩৫২; বিজনবিহারী বসু, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৪৯-৫০) এবং (১৩৩-৫০);বিপান চন্দ্র ও অন্যান্য,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৩৭৭

৫৪৪. ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগ পরিচালনায় রাসবিহারী বসুর বিকল্প কেউ না থাকলেও তিনি আশাহত না হয়ে এ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।(উদ্ধৃত:কালীচরণ ঘোষ,জাগরণ ও বিস্ফোরণ(১৯০৮-১৯৪৭),দ্বিতীয় খন্ড,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৩৫২)

৫৪৫. কালীচরণ ঘোষ,জাগরণ ও বিস্ফোরণ(১৯০৮-১৯৪৭),দ্বিতীয় খন্ড,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৩৫২-৫৩;বিজনবিহারী বসু,*প্রাগুক্ত*, পৃ.১৫৬

৫৪৬. কালীচরণ ঘোষ,জাগরণ ও বিস্ফোরণ(১৯০৮-১৯৪৭),দ্বিতীয় খন্ড,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৩৫২-৫৩

৫৪৭. বিপান চন্দ্র ও অন্যান্য,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৩৭৭

৫৪৮. পবিত্র রায় আলিপুর সেন্ট্রালজেল থেকে অনুশীলন নেতা প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলির নিকট চিঠিপত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ করেছিলেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। (উদ্ধৃত: ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৫০-৫১)

৫৪৯. বিজনবিহারী বসু,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৫৮।

৫৫০. কালীচরণ ঘোষ,জাগরণ ও বিস্ফোরণ (১৯০৮-১৯৪৭),দ্বিতীয় খন্ড, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৩৫২

৫৫১. বিজনবিহারী বসু,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৫৮

৫৫২. এম.জি.মুলকর,*আজাদী সৈনিকের ডায়েরি*,র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন,কলকাতা,২০১৮,পৃ.২৭

৫৫৩. এটি রাসবিহারী প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর (INA=Indian National Army) হিন্দি নাম।এসম্পর্কে জানা যায়,পূর্ববর্তী ভারতীয় জাতীয় বাহিনীকে দ্বিতীয় পর্যায়ে সুভাষচন্দ্র বসু কর্তৃক সংস্কার সাধনের মাধ্যমে আজাদ হিন্দ ফৌজ নাম করন করেন। অর্থাৎ পুর্নগঠিত ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর নাম হিন্দিতে আজাদ হিন্দ ফৌজ (Azad Hind Fauj) হলেও ইংরেজিতে তার পূর্বনাম আইএনএ (INA=Indian National Army) বহাল থাকে।

৫৫৪. কালীচরণ ঘোষ,জাগরণ ও বিস্ফোরণ (১৯০৮-১৯৪৭),দ্বিতীয় খন্ড,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৩৫৩

৫৫৫. বিপান চন্দ্র ও অন্যান্য,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৩৭৭

৫৫৬. কালীচরণ ঘোষ,জাগরণ ও বিস্ফোরণ(১৯০৮-১৯৪৭),দ্বিতীয় খন্ড,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৩৫৩

৫৫৭. বিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায়,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৮৭

৫৫৮. কালীচরণ ঘোষ,জাগরণ ও বিস্ফোরণ(১৯০৮-১৯৪৭),দ্বিতীয় খন্ড,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৩৫৩

৫৫৯. *Selected Speeches of Subhas Chandra Bose*,New Delhi,1965,p.218. (উদ্ধৃত:বিপান চন্দ্র ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৩৭৭)

৫৬০. বিপান চন্দ্র ও অন্যান্য,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৩৭৭

৫৬১. এম.জি.মুলকর,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৫৬-৫৭

৫৬২. এম.জি.মুলকর,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৬২-৬৩

৫৬৩. এম.জি.মুলকর,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৫৬-৫৭

৫৬৪. এম.জি.মুলকর,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৬২-৬৩

৫৬৫. উল্লেখ্য ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের ৬ ও ৯ আগস্ট জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে আমেরিকা এটম বোমা ফেলে। (উদ্ধৃত: হায়দার আকবর খান রনো, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১২০-২১)

৫৬৬. হায়দার আকবর খান রনো,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১২০-২১।

৫৬৭. নারায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়,বিপ্লবের সন্ধ্যানে,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৩৩৬-৩৭

৫৬৮. শরিফুল ইসলাম ভূঁইয়া,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৩৯

৫৬৯. লন্ডনের রাজ প্রাসাদের উপর বোমা পড়বে,একথা ভাবতেও আমার কষ্ট হচ্ছে।';'আমার সেবার ফলে ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থেকে সমান মর্যাদা লাভ করবে। (উদ্ধৃত:বিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায়,ভারতের সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রাম, পৃ.৭৬)

৫৭০. ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী,জেলে ত্রিশ বছর ও পাকভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম,পৃ.১৩৮

৫৭১. বিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায়,ভারতের সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রাম,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৭৬

৫৭২. ইয়াসমীন আহমেদ,উপমহাদেশের রাজনীতি ও স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব,*প্রাগুপ্ত*,পৃ.১৭১

৫৭৩. বিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায়,ভারতের সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রাম,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৭৬

৫৭৪. ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি এ সময় সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারের এজেন্টের কাজ করে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধিতা করে। নেতাজীর স্বাধীনতা প্রচেষ্টাকে নিন্দা এবং ব্রিটিশের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে জনযুদ্ধ বলে দেশবাসিকে বিভ্রান্ত করে। (উদ্ধৃত: ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, জেলে ত্রিশ বছর ও পাকভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম,পৃ.১৩৮;বিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ভারতের সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রাম,পৃ.৭৮)

৫৭৫. সুপ্রকাশ রায়,ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম(১৮৯৩-১৯৪৭),*প্রাগুক্ত*,পৃ.৪০৯

৫৭৬. নারায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়,বিপ্লবের সন্ধ্যানে,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৩৬৫;জীতেশচন্দ্র লাহিড়ী,*নমামী*,র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, ২০১৭,পৃ.১৫৩

৫৭৭. https://bn.m.wikipedia.org>Wiki.,accessed on:08.6.2022.

৫৭৮. সুপ্রকাশ রায়,ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম(১৮৯৩-১৯৪৭),*প্রাগুক্ত*,পৃ.৪০৯-১০

৫৭৯. বিপান চন্দ্র ও অন্যান্য,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৩৮১

৫৮০. হায়দার আকবর খান রনো,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১২১

৫৮১. বিপান চন্দ্র ও অন্যান্য,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৩৮১

৫৮২. হায়দার আকবর খান রনো,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১২১; বিপান চন্দ্র ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৩৮১

৫৮৩. সুপ্রকাশ রায়,ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম(১৮৯৩-১৯৪৭),প্রাগুক্ত,পৃ.৪১০

৫৮৪. হায়দার আকবর খান রনো,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১২১

৫৮৫. সুপ্রকাশ রায়,ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম(১৮৯৩-১৯৪৭),প্রাগুক্ত,পৃ.৪১০

৫৮৬. হায়দার আকবর খান রনো,*প্রাগুক্ত*, পৃ.১২২

৫৮৭. সুপ্রকাশ রায়,ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম(১৮৯৩-১৯৪৭),*প্রাগুক্ত*,পৃ.৪১০

৫৮৮. হায়দার আকবর খান রনো,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১২২

৫৮৯. হায়দার আকবর খান রনো,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১২২-২৩

৫৯০. সুপ্রকাশ রায়,ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম(১৮৯৩-১৯৪৭),*প্রাগুক্ত*,পৃ.৪১০

৫৯১. হায়দার আকবর খান রনো,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১২৩;সুপ্রকাশ রায়,ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম (১৮৯৩-১৯৪৭), প্রাগুক্ত,পৃ.৪১০

৫৯২. শৃঙ্খলিত ভাবে এ বিদ্রোহ পচিালনার জন্য নেতৃস্থানীয়দের সমন্নয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল বলে।

৫৯৩. প্রকাশ থাকে যে,দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ফরাসি কলোনী ইন্দোচীন(ভিয়েতনাম,লাওস ও কম্বোডিয়া),ডাচ (ওলন্দাজ) ও ইন্দোনেশিয়া জাপানের দখলে চলে যায়। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে জাপান পরাজিত হলে এই দেশগুলো স্বাধীনতা ঘোষণা করে। কিন্তু ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা স্বাধীনতা অস্বীকার করে কলোনী বজায় রাখার প্রত্যয়ে এ অঞ্চলে সৈন্য সমাবেশ করে। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ভারতীয় জনতা তীব্র প্রতিবাদ জানায়। ইন্দোনেশিয়াতে সৈন্যদের জন্য অস্ত্রশস্ত্র ও খাদ্যবোঝাই জাহাজ পাঠানো হচ্ছিল কলকাতার ডক শ্রমিকরা তাতে মাল তুলতে অস্বীকৃত হয়।ধর্মঘটি নাবিকদের অন্যান্য দাবির মধ্যে ছিল:১.ধর্মঘটীদের গ্রেফতার ও দন্ডাদেশ দেয়া চলবে না।২.ব্রিটিশ সেনাদের সমান ভাতা ও খাদ্য ভারতীয় সেনাদের দিতে হবে। ৩.ইন্দোনেশিয়া থেকে সকল ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার করতে হবে। ৪.আজাদ হিন্দ বাহিনীর বিচার বন্দ করতে হবে।৫.তলোয়ার জাহাজে যে ব্রিটিশ কর্মকর্তা ভারতীয়দের অপমান করেছিল,তাকে বরখাস্ত করতে হবে।(উদ্ধৃত:হায়দার আকবর খান রনো,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১২৩-২৪)

৫৯৪. হায়দার আকবর খান রনো,*প্রাগুক্ত*, পৃ.১২৪

৫৯৫. বিপান চন্দ্র ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৩৮৮

৫৯৬. সুপ্রকাশ রায়,ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম(১৮৯৩-১৯৪৭),*প্রাগুক্ত*,পৃ.৪১০-১১

৫৯৭. বিপান চন্দ্র ও অন্যান্য,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৩৮৮; হায়দার আকবর খান রনো,*প্রাগুক্ত*, পৃ.১২৪

৫৯৮. বিপান চন্দ্র ও অন্যান্য,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৩৮৯;সুপ্রকাশ রায়,ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম (১৮৯৩-১৯৪৭), *প্রাগুক্ত*,পৃ.৪১১

৫৯৯. সুপ্রকাশ রায়,ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম(১৮৯৩-১৯৪৭),*প্রাগুক্ত*, পৃ.৪১১

৬০০. ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখী বর্মণ, *প্রাগুক্ত*,পৃ.২৮৭

৬০১. Rajani Palme Dutt, *India Today,* Bombay,1959. ,p.542.

৬০২. ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখী বর্মণ, *প্রাগুক্ত*,পৃ.২৮৮

৬০৩. ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখী বর্মণ, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৮৮

৬০৪. হায়দার আকবর খান রনো,*প্রাগুক্ত*, পৃ.২৬৮

৬০৫. মৌলানা আবুল কালাম আজাদ,*ভারত স্বাধীন হল* (অনুবাদ,সুভাস মুখোপাধ্যায়),ওরিয়েন্ট লংম্যান প্রা.লি., কলকাতা, ২০১৫,পৃ.১১৬

৬০৬. কালীচরণ ঘোষ,জাগরণ ও বিস্ফোরণ(১৯০৮-১৯৪৭) দ্বিতীয় খন্ড,পৃ.৩৬১-৬২

৬০৭. সুপ্রকাশ রায়,ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম(১৮৯৩-১৯৪৭),*প্রাগুক্ত*,পৃ.৪১৩

৬০৮. বিপান চন্দ্র ও অন্যান্য,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৩৯৮

৬০৯. এম.এ.রহিম,*বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস(১৭৫৭-১৯৪৭)*,আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা,২০১৭,পৃ.২৪৪

৬১০. ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখী বর্মণ,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২৯৮

৬১১. কালীচরণ ঘোষ,জাগরণ ও বিস্ফোরণ(১৯০৮-১৯৪৭)দ্বিতীয় খন্ড,পৃ.৩৬৩

৬১২. ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখী বর্মণ, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৯৮

৬১৩. এম.এ.রহিম,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২৪৫

৬১৪. ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখী বর্মণ,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২৯৮

৬১৫. এম.এ.রহিম, *প্রাগুক্ত*,পৃ.২৪৫

৬১৬. ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখী বর্মণ,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২৯৮-৯৯

৬১৭. বিপান চন্দ্র ও অন্যান্য,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৪০১

৬১৮. সুপ্রকাশ রায়, ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম (১৮৯৩-১৯৪৭), *প্রাগুক্ত*,পৃ.৪১৩

৬১৯. বিপান চন্দ্র ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৪০১

৬২০. ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখী বর্মণ,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৩০০

৬২১. হায়দার আকবর খান রনো,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২৭২

৬২২. ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখী বর্মণ,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৩০১

৬২৩. হাসান আলী চৌধুরী,ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস (মধ্য ও আধুনিক যুগ), আইডিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ.৬৭৫;এম.এ.রহিম, *প্রাগুক্ত*,পৃ.২৪৭

৬২৪. সুপ্রকাশ রায়, ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম (১৮৯৩-১৯৪৭), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১৩

পঞ্চম অধ্যায়

বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিপ্লব প্রচেষ্টা ও এর বিচার-বিশ্লেষণ

সাধারণত সমাজের শিক্ষিত ও মননশীল ব্যক্তিবর্গ যেমন শিক্ষক, সাংবাদিক, চাকরিজীবী, আইনজীবী, প্রকৌশলী, চিকিৎসক প্রমুখ পেশাজীবী, বুদ্ধিজীবী ও শিল্পীগোষ্ঠীর সমন্বিতরূপই মধ্যবিত্ত শ্রেণির পরিচায়ক। তবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যিক প্রতিনিধি *লর্ড কর্নওয়ালিশ* (Lord Cornwallis) ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে যে জমিদারশ্রেণি সৃষ্টি করেছিলেন; সে জমিদারশ্রেণি তাদের সহকারী হিসেবে এ মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে গড়ে তোলে। কলকাতাকে কেন্দ্র করেই এই মধ্যবিত্ত শ্রেণি বিকশিত হয়। এদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সুপ্রকাশ রায় উল্লেখ করেছেন, নতুন জমিদার গোষ্ঠী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণি ভূসম্পত্তির একচ্ছত্র অধিকার বলে ব্রিটিশ শাসনের রক্ষণাবেক্ষণে থেকে সমাজের শীর্ষস্থানে আরোহন এবং সামাজিক নেতৃত্ব লাভের জন্য উন্মুখ হয়ে উঠে। উন্নত ইউরোপীয় শিক্ষা ও সভ্যতা তাদেরকে সামাজিক নেতৃত্বলাভের সংগ্রামে বিশেষভাবে সহায়তা করে। এই সামাজিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ইউরোপীয় শিক্ষা ও সভ্যতার প্রেরণায় একত্রে ইউরোপীয় *রিনাসান্স'র* (Renaissance) অনুকরণে তাঁরা উনিশ শতকের গোড়ার দিকে প্রথমে বাংলায় এবং পরে সমগ্রভারতে *রিনাসান্স* বা নবজাগরণ আন্দোলন আরম্ভ করে। এই আন্দোলন কেবলমাত্র জমিদার এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণির নিজ স্বার্থে পরিচালিত হয়েছিল বলে আন্দোলন চলাকালীন শোষিত কৃষক-সম্প্রদায়কে প্রথম থেকেই তারা বর্জন করে চলে। এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে এই আন্দোলনকারীরা কৃষক-সংগ্রামের বিরোধীতা করতেও কুণ্ঠিত হয় নাই।[১] নব জাগরণের এই পুরোধা ব্যক্তিবর্গ ভারতে ইংরেজ শাসনকে বিধাতার আর্শীবাদ জ্ঞান করেন এবং সর্বাবস্থায় তাদের সহায়ক শক্তি হিসেবে নিজেদের ভাগ্য গড়বার প্রচেষ্টা চালান। নবজাগরণের প্রভাবে তাদের মধ্যে নানান অধিকার এবং অধিক সচেতনতাবোধ জাগরিত হয়। ক্রমে তারা অধিকার আদায়ে তৎপরতা চালায় এবং বিভিন্ন সংগঠন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জনমত সংগঠিত করতে থাকেন। এই ধারাবাহিকতায় মধ্যবিত্ত শ্রেণির নেতৃত্বে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়।এই কংগ্রেস আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে বিভিন্ন দাবি-দাওয়া আদায়ের প্রচেষ্টা চালায়।

ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাসে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে ব্রিটিশ বিরোধিতার সূত্রপাত এক যুগান্তকারি ঘটনা। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহ তথা প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের পর হতে এই ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয় আন্দোলনের সূচনা হয়। আন্দোলনের সে পথ-পরিক্রমায় ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা ইংরেজ শাসনের অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক শোষণ-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে ভারতের নবজাত ধনিক শ্রেণি ও উন্নত পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াসেরই

অনিবার্য পরিণতি। ইংরেজ-রাজ ভারতবর্ষে যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিল তার ভিতর হতেই এই শ্রেণি দু'টির জন্ম। কিন্তু জন্মের পর হতেই বিদেশি ইংরেজ রাজের কায়েমি স্বার্থের সাথে তাদের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠে।[২]

ব্রিটিশ ভারতে ১৮৮৫ থেকে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতীয় কংগ্রেসের দাবি-দাওয়ার প্রধান বিষয় ছিল ভারতীয়দের উচ্চপদে নিয়োগ প্রদান এবং প্রশাসনে ভারতীয়দের দাবি সুপ্রতিষ্ঠিত করা। কিন্তু ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে *বাংলা ভাগের* (Partition of Bengal) সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে কংগ্রেসের বিপ্লবপন্থি নেতাগণ মাথাচারা দিয়ে উঠে। প্রতিক্রিয়া স্বরূপ অরবিন্দ ঘোষ, লালালাজপাত রায়, বালগঙ্গাধর তিলক, প্রমুখ বিপ্লবপন্থি নেতৃবৃন্দ আনুগত্য রাজনীতির পরিবর্তে আন্দোলন, বয়কটসহ বৈপ্লবিক আন্দোলনের উপর গুরুত্ব প্রদান করেন। তাঁরা ভারতীয় সংস্কৃতি বিশেষ করে হিন্দুধর্মের অতীত গৌরবের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাপোষণ করতেন। ফলে বিপ্লবপন্থি কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের আন্দোলন ভারতীয় মুসলমানদের মনে সন্দেহের সৃষ্টি করে। অবশ্য বাংলা বিভাজনের এই ঘটনা বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটায়। বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিপ্লবপন্থি হিন্দু নেতাদের এই আন্দোলন দ্রুত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। ক্রমে এই আন্দোলন সকল শ্রেণি ও পেশার লোকের মধ্যে সম্প্রসারিত হয়।[৩] ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হলে শীঘ্রই মধ্যবিত্ত শ্রেণি দলটিতে যোগদান করে আবেদন নিবেদনের মাধ্যমে তাদের দাবি দাওয়া আদায়ের প্রচেষ্টা চালায়। ক্রমে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের বাংলা বিভাগকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন শুরু করে; পরবর্তীতে যা স্বদেশী আন্দোলনে পর্যবসিত হয়। এই আন্দোলনের কৌশল নিয়ে কংগ্রেসে নরমপন্থি ও বিপ্লবপন্থি দু'টি উপদলের সৃষ্টি হয়। নরমপন্থি নেতৃবৃন্দ আবেদন নিবেদনের মাধ্যমেই দাবি দাওয়া আদায়কেই শ্রেয় মনে করেন। কিন্তু এই আবেদন নিবেদনে আস্থাহীন বিপ্লবপন্থিগণ সশস্ত্র বৈপ্লবিক সংগ্রামের মাধ্যমে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের নীতি গ্রহণের দাবি উত্থাপন করে। কংগ্রেসের এই বিপ্লবপন্থি অংশ ইতোপূর্বে প্রতিষ্ঠিত অনুশীলন সমিতির মাধ্যমে সংগঠিত হতে থাকে। ক্রমে কংগ্রেসের বিপ্লবপন্থি অংশ ইতোপূর্বে গঠিত অনুশীলন সমিতির সাথে মিশে যায়। তাঁরা স্বাধীনতার দাবিতে সশস্ত্র বৈপ্লবিক তৎপরতা শুরু করে। পরবর্তীতে অনুশীলন নেতৃবৃন্দের মধ্যকার এক নীতিগত মতদ্বৈধতার কারণে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের এক পর্যায়ে যুগান্তর গোষ্ঠীর আত্মপ্রকাশ ঘটে। বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত এই অনুশীলন ও যুগান্তর গোষ্ঠী স্বাধীনতার বৈপ্লবিক মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে সশস্ত্র পন্থায় সমগ্র ভারতকে স্বাধীন করার ব্রত নিয়ে মাঠে নেমে পড়ে। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারত স্বাধীনতা লাভের মাধ্যমে এ সশস্ত্র বৈপ্লবিক আন্দোলন সাফল্য মন্ডিত হয়।

বিপ্লব ধারণা

বিপ্লবের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Revolution' শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ *'Revolutio'* থেকে। শব্দটির ইংরেজি অর্থ– 'a turnd around' বলতে বুঝায়, রাজনৈতিক ক্ষমতা বা প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে একটি মৌলিক সামাজিক পরিবর্তন যা তুলনামূলক ভাবে সংক্ষিপ্ত সময়ে ঘটে; জনগণ যখন চলমান কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে জেগে উঠে।[৪] এ সম্পর্কে বিপ্লবী হেমচন্দ্র কানুনগো তাঁর বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, ইংরেজি 'Revolution' শব্দটির মাধ্যমে বাংলায় বিপ্লব বা বৈপ্লবিক কার্যক্রমকে চিহ্নিত করা হয়। ইতিহাসে 'Revolution' শব্দটি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। কোন দেশের শাসন-প্রণালী যদি হঠাৎ কোন *ভীষণ* (Voilent) উপায়ে আমূল পরিবর্তিত হয়, যদি সেই পরিবর্তন সে দেশের জনসাধারণের সাহায্যে বা চেষ্টায় সাধিত হয়। যদি পরিবর্তিত শাসনকার্যে সে দেশের জনসাধারণের সম্যক অধিকার লাভ হয়; তবে সেই পরিবর্তনকে *বিপ্লব* (Revolution) বলা হয়ে থাকে। কিন্তু বিপ্লবের চেষ্টা জনিত সংঘর্ষের পরিণামে যদি ওই প্রকার পরিবর্তন সাধিত না হয়, তবে কেবল পরিবর্তন আনবার চেষ্টাকে *বিপ্লব* (Revolution) বলা যায়না। এই চেষ্টার ফলে যদি শাসন প্রণালীর কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন সাধিত না হয়ে কেবলমাত্র শাসনকর্তার পরিবর্তন ঘটে; তবে সে অবস্থাকেও *বিপ্লব* (Revolution) নামে অভিহিত করা যাবেনা।[৫]

পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো পরাধীন জাতির মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস প্রত্যক্ষ করলে এটা লক্ষ্য করা যায় যে, কোথাও শুধুমাত্র বৈধ ও নিয়মতান্ত্রিকতার সরল পথ ধরে অগ্রসর হওয়ার ইতিহাস বিরল। ঘটনার অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে নব নব চিন্তাধারা আবির্ভূত হলে তদনুযায়ী কর্মপন্থাও গৃহীত হয়ে থাকে। সাধারণত অহিংস বা নিয়মতান্ত্রিক পথধরে মুক্তিসংগ্রাম শুরু হলেও সময়ের যাত্রাপথে সংগ্রামের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবে সশস্ত্র বৈপ্লবিক কর্মনীতি গ্রহণ করতে দেখা যায়।[৬] একই নিয়ম অনুসরণ করে পৃথিবীর সকল বিপ্লব সংগঠিত হয়নি। সাধারণত কোন দেশে বিপ্লব সংঘটিত হবার পূর্বে সর্বপ্রথম সে দেশের স্থান, কাল ও প্রয়োজন উপযোগী বিপ্লবী দর্শনের বিকাশ ঘটে। সর্বাগ্রে মনীষী ও বিপ্লবীদের মানসিক বিপ্লব ঘটে। তাঁরা বিভিন্ন দেশের বৈপ্লবিক ইতিহাসের নতুন নতুন চিন্তাধারা বয়ে আনেন এবং পরাধীনতার বন্ধন ছিন্ন করতে দেশের জনসাধারণ ও বিপ্লবীদেরকে উদ্বুদ্ধ করণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।[৭]

আমাদের জানা মতে, ১৬৮৮ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লব ইংল্যান্ডে স্বৈরতন্ত্রের ধ্বংসস্তুপের ওপর সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। ইতিহাসে লক্ষ্য করা যায় যে, ১৭৭৫ থেকে ১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মার্কিনবাসী এই দীর্ঘ স্বাধীনতা যুদ্ধের পর আমেরিকায় সাধারণতন্ত্রী সরকার প্রতিষ্ঠা করে।[৮] ইংল্যান্ড ও আমেরিকার

সফল বিপ্লবের দৃষ্টান্তই ফরাসিদের সবচাইতে বেশি অনুপ্রাণিত করেছিল। ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে তারা স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রকে সশস্ত্র বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের প্রবল বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে যায়। ফরাসি বিপ্লব কেবল স্বৈরাচারী রাজার একাধিপত্যের বিরুদ্ধেই সংঘটিত হয়নি, বরং অভিজাতবর্গ ও পাদ্রিবর্গের অধিকাংশ যারা অতি দরিদ্র কৃষকদের নিকট থেকে অধিকহারে কর আদায় করতো; তাদের বিরুদ্ধেও সংঘটিত হয়েছিল।[৯] কৃষকরা রাজাকে তো কর দিচ্ছিলই, তার ওপর এদের কর আদায়ের ফলে তারা একেবারে নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছিল। এই দরিদ্র কৃষকদের সঙ্গে শহরের কিছু সংখ্যক *শিল্পপতি* শ্রেণির মানুষও, যদিও তাঁদের আর্থিক অবস্থা কৃষকদের মতো অতখানি খারাপ ছিল না; তবু সরকারের বিরুদ্ধে তাদেরও বিক্ষোভ পুঞ্জিভূত হচ্ছিল বিধায় তারাও এ বিদ্রোহে শামিল হয়। কারণ তাদের ব্যবসা বাণিজ্যের অবাধ প্রসার স্বৈরতন্ত্রী রাজতন্ত্র নানান ভাবে প্রতিহত, নিয়ন্ত্রণ ও খর্ব করে আসছিল। যার ফলে তারাও নানাভাবে শোষিত হচ্ছিল।[১০]

ফরাসি বিপ্লবের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো- জার্মানি, রুশ বা ইংল্যান্ডের কৃষকদের তুলনায় ফরাসি কৃষকদের অর্থনৈতিক অবস্থা তখনও কিছুটা ভালো থাকা সত্ত্বেও তারাই বিপ্লবের আগুন প্রজ্জ্বলিত করে। রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকা-তিন লক্ষ সুবিধাভোগী পাদ্রি ও অভিজাত বর্গের অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে দু'কোটি দুঃস্থ, দরিদ্র ও বঞ্চিত জনতা বিপ্লব সংগঠিত করে[১১] বিশ্বে কে অনন্য নজির সৃষ্টি করে। সর্বোপরি বিপ্লব বলতে বুঝায়, স্বাভাবিক পন্থায় যে সকল অধিকার স্বীকৃত নয়, পূর্বে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ছিল কিন্তু কৌশলে তা কেড়ে নেয়া হয়েছে; মৌল মানবাধিকার ঔপনিবেশিক শৃঙ্খলে বন্দি। সকল অধিকার অর্জন তথা হৃত স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার কল্পে সশস্ত্র বৈপ্লবিক সংগ্রামের মাধ্যমে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থাকে এই দেশ ত্যাগে বাধ্য করত; মধ্যবিত্ত শ্রেণির নেতৃত্বে বাঙালির স্বাধিকার তথা ভারতীয় স্বাধীনতা অর্জনের রক্তাক্ত পথ-পরিক্রমাই আলোচ্য অভিসন্দর্ভে বিপ্লব নামে অভিহিত হবে।

বাংলা তথা ভারতের মধ্যবিত্ত শ্রেণি ব্রিটিশ সৃষ্ট সামন্তপ্রথা মূলক ভূমি ব্যবস্থার মধ্য হতে সৃষ্ট হয়ে বিশ শতকের আর্থিক সঙ্কটের চাপে তার একাংশ কৃষি ভূমির সংস্পর্শ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এবং হতাশাচ্ছন্ন হয়ে আর্থিক সঙ্কট হতে পরিত্রাণ ও দেশের স্বাধীনতা লাভের জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। কংগ্রেসের নিষ্ক্রিয়তা ও আপসমূলক মনোভাবের ফলে বুর্জোয়া নেতৃত্বের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে তারা নিজস্ব পন্থায় এক বিশেষ প্রকারের সশস্ত্র বৈপ্লবিক সংগ্রামের পথ অবলম্বন করে। মধ্যশ্রেণিসুলভ ভূম্যধিকারীর মনোবৃত্তির বশে তারা শ্রমিক-কৃষককে বৈপ্লবিক শক্তি হিসেবে স্বীকার করতে ব্যর্থ হয়। এই ব্যর্থতার ফলেই তাদের সংগ্রামের প্রধান উপায় হিসেবে তারা সন্ত্রাসবাদ অবলম্বন করতে বাধ্য হয়।[১২] কারণ যে চরমপন্থা বা সশস্ত্র সংগ্রাম জনসাধারণ হতে সম্পুর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে

চলে, শ্রমিক কৃষককে এড়িয়ে যায়; সে সংগ্রামে সন্ত্রাসবাদ অবলম্বন করা ব্যতীত অন্য কোন উপায় থাকে না।[১৩] এই সন্ত্রাসবাদীদের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের দূর পরিকল্পনা থাকলেও প্রধানত অর্থ সংগ্রহের জন্য ডাকাতি এবং গুপ্তহত্যার মধ্যেই তাদের বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপ সীমাবদ্ধ থাকে। তারা রাজনৈতিক ডাকাতিকে গেরিলা যুদ্ধের এক বিশেষরূপ হিসেবে এবং গুপ্তহত্যাকে জনসাধারণকে জাগ্রত করা এবং গণঅভ্যুত্থান ঘটানোর উপায় হিসেবে গ্রহণ করে।[১৪] বাংলাদেশে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার যে বীজ রোপিত হয়, বিশ শতকের শুরুতে তা পল্লবিত ও বিকশিত হয়ে যে উত্তাল তরঙ্গমালা উত্থিত হয়; বিপ্লবী অরবিন্দকুমার ঘোষের হাত ধরে ক্রমান্বয়ে বিপ্লবী পুলিনবিহারী দাশ, জ্যোতিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘাজ্যোতিন), রাসবিহারী বসু, হেমচন্দ্র ঘোষ, সুর্যকুমার সেন, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু সহ জানা-অজানা অসংখ্য বৈপ্লবিক নায়কের সংগ্রামী অভিঘাতে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় স্বাধীনতা অর্জনের মাধ্যমে তার পরিসমাপ্তি ঘটে।

বিপ্লব প্রচেষ্টার বিচার বিশ্লেষণ

পৃথিবীর প্রত্যেকটি বিপ্লবের ইতিহাসেই চারটি স্তর বা ধাপ লক্ষ্য করা যায় ঃ (ক) প্রথম স্তর হলো রাষ্ট্র-প্রতীক বা *ব্যক্তি বিশেষ নিধন-পর্ব* (Stage of individual murder); (খ) দ্বিতীয় স্তর হলো *বাধ্যতামূলক সম্মুখ সংঘর্ষ পর্ব* (Force open fight); (গ) তৃতীয় স্তর হলো *খন্ড অভ্যুত্থান পর্ব* (Insurrection); এবং (ঘ) চতুর্থ স্তর হলো *বিপ্লব* (Revolutionn) বা শেষ পর্ব।[১৫]

বাঙালির প্রথম পর্বের বৈপ্লবিক কার্যক্রমে দুঃসাহসী যুবকেরা প্রয়োজনে ব্রিটিশ কর্মকর্তা ও তাদের স্বজন এবং তাদের তাঁবেদার তথা ভারতের শত্রুদের একটির পর একটি করে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজকে ভীত করা, দেশবাসীকে ভয়হীন করে তোলা; ইংরেজ শাসনকে প্রত্যাখান করা। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলার লেফটোন্যান্ট গভর্নর এন্ড্রু হিন্ডারসন ফ্রেজার হত্যার প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়া[১৬] সত্ত্বেও ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের ৩০ এপ্রিল বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্লচাকী বিহারের মুজাফফরপুরের বিচারপতি কিংসফোর্ডের গাড়ি মনে করে ভ্রমে কেনেডির গাড়ি লক্ষ্য করে বোমা নিক্ষেপ করলে মিসেস কেনেডী ও তার কন্যা হত্যাকান্ডের শিকার হয়।[১৭] এ সকল হত্যাকান্ড থেকে শুরু করে '১৯১২ খ্রিস্টাব্দের ২৩ ডিসেম্বর দিল্লীতে বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জের ওপর বোমাবর্ষণ পর্যন্ত সকল বৈপ্লবিক কার্যক্রম উল্লিখিত রাষ্ট্র-প্রতীক বা *ব্যক্তি বিশেষ নিধন-পর্বের* (Stage of individual murder) আওতাভুক্ত হবে।[১৮]

ভারতবর্ষের বিপ্লব ইতিহাসেও বিপ্লবের প্রথম পর্ব শেষ না হতেই ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের ২৮ জুলাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। এই যুদ্ধে ইংরেজের প্রতিপক্ষ ছিল জার্মানি। এ সময় ভারতের এবং বহির্ভারতের বিপ্লবীরা জার্মানির সাথে বন্ধুত্ব সূচিত করে ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব সংগঠনের পরিকল্পনা করেন। এই কার্যক্রমে ব্রিটিশ-ক্যাম্প থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে ভারতীয় আশু বিপ্লবের অনুকূলে আনার পরিকল্পনা করা হয়। তাদের পরিচালনায় থাকবেন ভারতীয় বিপ্লবীরা। পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিপ্লবী রাসবিহারী বসু উত্তর-ভারত ও পাঞ্জাবে ব্রিটিশ ভারতের দেশীয় সৈন্যদের মধ্যে বিপ্লবী মতাদর্শ প্রচারপূর্বক তাদের মাধ্যমে ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি সেনা অভ্যুত্থানের দিন ধার্য করা হয়। কিন্তু কৃপাল সিং নামক এক সৈন্যের বিশ্বাসঘাতকতায় সে পরিকল্পনা নস্যাৎ হয়ে যায়।[১৯]পাঞ্জাব সেনানিবাসের ব্রিটিশ ভারতের দেশীয় সৈন্যদের মাধ্যমে বিপ্লব বাস্তবায়ন পরিকল্পনা করা বিপ্লবীদের হিসেবে ভুল হলো। কারণ তারা বিপ্লবের দ্বিতীয় ধাপ *বাধ্যতামূলক সম্মুখ সংঘর্ষ পর্ব* (Force open fight) এবং তৃতীয় ধাপ *অভ্যুত্থান পর্বে* (Insurrection) অবতীর্ণ না হয়েই বিপ্লবের চতুর্থ ধাপ বা সরাসরি *বিপ্লব* (Revolutionn) সংগঠনে নেমে পড়েন। শুধুমাত্র সেনাবাহিনী ও বিপ্লবীদের যোগসাজশে যে বিপ্লব করতে চেয়েছিলেন; জনসাধারণ তাতে শরীক ছিলনা। কারণ *বাধ্যতামূলক সম্মুখ সংঘর্ষ* (Force open fight) এবং *অভ্যুত্থান* (Insurrection) ও গণসংযোগ ব্যতীত বিপ্লবের পথ তৈরি হয়না। এ সত্য বিপ্লবীদের জানা ছিল। তবুও তারা এ পথে অগ্রসর হয়েছিলেন কেননা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণে অনুকূল সুযোগ তৈরি হয়: আর ইচ্ছা করলেই তো এইরকম মোক্ষম সুযোগ পাওয়া যায়না। সুতরাং সুযোগের অবহেলা না করেই বিপ্লবের দুটো ধাপ ডিঙিয়ে তারা বিপ্লবের শেষ ধাপ তথা *বিপ্লব* (Revolutionn) সংগঠনে অবতীর্ণ হন।[২০] এই কাজে দেশপ্রেম ও দুঃসাহসের অন্ত ছিলনা কিন্তু আপাতত তারা ব্যর্থ হলেও '১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের ১৯ ফেব্রুয়ারি সিঙ্গাপুর সেনানিবাসের সৈন্যবাহিনী বিদ্রোহ করে সাত দিন সিঙ্গাপুর শহর অবরোধ করে রাখে। বার্মায় অবস্থিত বালুচ, ঢাকায় পাঞ্জাবি সৈন্যবাহিনী এবং বেনারস সেনানিবাস, দিল্লি সেনানিবাস প্রভৃতি স্থানে অবস্থিত দেশীয় সৈন্যদল অভ্যুত্থান আয়োজনে শামিল হয়। অভ্যুত্থান ব্যর্থ হওয়ায় বহু সৈন্য ফাঁসি কাষ্ঠে ও কামানের মুখে হাসিমুখে প্রাণ বিসর্জন দেয়।[২১] দেশীয় সৈন্যদলের এই ত্যাগে বিপ্লবীরা নতুন করে উৎসাহিত হয়ে সানন্দে তাই বিপ্লবের নতুন পথে যাত্রা শুরু করেন। অভিজ্ঞতায় ও দুর্জয় সংকল্পে সে যাত্রা হলো আরো বৈচিত্রময়। বিভিন্ন সেনানিবাসে ভারতীয় সৈন্যরা জাতীয় যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে উন্মুখ থেকেও বিপ্লবের আহ্বান আর শুনতে পেল না। অপরদিকে '১৯১২ খ্রিস্টাব্দের ২৩ ডিসেম্বর রাসবিহারীর ইশারায় দিল্লিতে লর্ড হার্ডিঞ্জের ওপর বোমা হামলার অভিযোগে পুলিশ তাঁকে খুজতে থাকে। অবশেষে বাধ্য হয়ে তিনি ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের ১২ মে

প্রিয়নাথ ঠাকুর (P.N. Tagor) ছদ্মনাম ধারণ করে সানুকি-মারু জাহাজে করে ভারত ত্যাগ করেন এবং জুন মাসের মাঝপর্যায়ে জাপানে পৌঁছেন।[২২]

জার্মানির অস্ত্র সাহায্যে বাংলায় বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান পরিকল্পনা করেছিলেন বিপ্লবী জ্যোতিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা জ্যোতিন) ও তাঁর সহযোগীরা। ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে শ্রীরামপুরের জীতেন লাহিড়ী জার্মানি থেকে ফিরে এসে খবর দেন, জার্মান জাহাজ 'মেভেরিক' প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এপ্রিল মাসে ভারত আসছে। জ্যোতিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘাজ্যোতিন) ও তাঁর সহযোগীরা 'মেভেরিক' জাহাজ থেকে জার্মান অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ এবং সেগুলোকে বন্টন ও রক্ষণাবেক্ষণের বন্দোবস্ত করেন। নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (এম.এন.রায়) 'মার্টিন' ছদ্মনাম গ্রহণ করে জার্মান কনসালের সাথে যোগাযোগের জন্য ইন্দোনেশিয়ার বাটাভিয়ায় যান। জ্যোতিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা জ্যোতিন) এ সময় জার্মান অস্ত্রের সাহায্যে বাংলাকে ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন করার পরিকল্পনাগ্রহণ করেন। কিন্তু এ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়নি। কারণ অস্ত্রসমেত জার্মান জাহাজ ভারতে আসেনি। দীর্ঘ দশ দিন সুন্দরবনের রাইমঙ্গলে জার্মান জাহাজের জন্য অপেক্ষা করে জ্যোতিন্দ্রনাথ ও তাঁর সহযোগীরা আত্মগোপনের জন্য উড়িষ্যায় চলে যান।[২৩]

পাঞ্জাবে রাসবিহারী বসুর ব্যর্থতায় বিপ্লবী জ্যোতিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের (বাঘাজ্যোতিন) স্থির করলেন পরবর্তী প্রজন্মের জন্যে এমন একটি আদর্শ রেখে যেতে হবে যাতে তারা তা অনুসরণ করতে পারে। এদিকে 'ইন্দো-জার্মান ষড়যন্ত্র' ফেঁসে গেছে। ব্রিটিশ পুলিশ বাহিনী তাদের পিছু নিয়েছে বুঝতে পেরে তিনি সঙ্গীদের নিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। অবশেষে টেগার্টের নেতৃত্বাধীন পুলিশ বাহিনী তাদের ঘিরে ফেলে এবং বিপ্লবীরা শত্রুর বিরুদ্ধে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হন। ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের ০৯ সেপ্টেম্বর উড়িষ্যার বালেশ্বরে বুড়িবালাম নদীর তীরে কাপ্তিপোদায় চাষখন্ডে বিপ্লবী জ্যোতিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের (বাঘাজ্যোতিন) নেতৃত্বে ব্রিটিশ পুলিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে বাঙালি বিপ্লবীদের সম্মুখ-সশস্ত্র সংঘর্ষের মাধ্যমে *বাধ্যতামূলক সম্মুখ সংঘর্ষ পর্ব* (Force open fight) শুরু হয়।[২৪] এভাবে বাঙালি বিপ্লবীরা জ্যোতিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের (বাঘাজ্যোতিন) নেতৃত্বে বিপ্লব ইতিহাসের দ্বিতীয় পর্বে উন্নীত হয়।

এই ঘটনায় চিত্তপ্রিয় ঘটনাস্থলেই এবং শহীদ হয়। বিপ্লবী জ্যোতিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘাজ্যোতিন) পর দিন হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। শুরু হলো সম্মুখ যুদ্ধে প্রাণ দেবার ইতিহাস। কানে কানে বৈপ্লবিক আদেশ প্রচারিত হলো-ধরা যদি পড়ো তবে পালাবার প্রয়োজন নেই, যুদ্ধ করে শত্রুকে ধ্বংস

করো। প্রয়োজনে ধ্বংসের মুখে নিজেও নিঃশেষ হও। 'রাসবিহারী বসু জার্মান অস্ত্রশস্ত্র পাওয়ার নিশ্চয়তা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেছিলেন।[২৫] বিদেশি অস্ত্রশস্ত্রের ওপর নির্ভর করে ভারতে বৈপ্লবিক কার্যকলাপ চালানো কি দুরূহ ব্যাপার জ্যোতিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের (বাঘাজ্যোতিন) বালেশ্বরে আত্মগোপন ও পুলিশের সাথে তুমুল সংঘর্ষের ঘটনাটি থেকে তা প্রমাণিত হয়।

এদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঘোরতর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় ভারতের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে। যুদ্ধের ব্যয় মেটাতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকার ভারতের ওপর শোষণ তীব্রতর করে। কৃষকের অবস্থা হয় শোচনীয়।[২৬] সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় পরাধীন ভারতের শ্রমিক কৃষকরা যখন দুর্দশার চরমে তখনই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী ঘটনা ঘটে। মহামতি লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণি ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের ১৭ নভেম্বর বিপ্লব সংঘটিত করে। জারতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে রাশিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হয় শ্রমিক শ্রেণির রাষ্ট্র। সমাজতান্ত্রিক এই বিপ্লবের ঘটনা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী ও পশ্চিমা ধনবাদী রাষ্ট্রের মিত্রদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত করে তোলে। কিন্তু ভারতের সশস্ত্র বৈপ্লবিক আন্দোলনে তার সুদূর প্রসারী প্রভাব লক্ষ্যণীয়। যে সকল ভারতীয় বিপ্লবী ইউরোপে নির্বাসিত জীবনযাপন করছিলেন তাঁদের অনেকেই বিপ্লবী এই নবীন রাষ্ট্রকে স্বাগত জানাতে মস্কোতে যান এবং মার্কসবাদে দীক্ষিত হন। ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতাদের মধ্যে অনেকে রুশ বিপ্লবের তাৎপর্য সম্পর্কে যথেষ্ট আগ্রহ না দেখালেও সাধারণ মানুষের ওপর বিশেষত বামপন্থিদের ওপর তার প্রভাব ছিল অপরিসীম। চরমপন্থি জাতীয়তাবাদী নেতা বালগঙ্গাধর তিলক তাঁর কেশরী পত্রিকায় (২৯জানুয়ারি,১৯১৮) লিখলেন, 'ধনাঢ্য জমিদারদের জমিজমা কৃষকদের মধ্যে বন্টন করার ফলে সেনাবাহিনী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে লেনিনের জনপ্রিয়তা বেড়েছে।[২৭] বাংলার প্রগতিবাদী ও চরমপন্থি নেতা বিপিনচন্দ্র পাল সুস্পষ্ট ভাষায় রাশিয়ার নভেম্বর বিপ্লবকে সমর্থন জানিয়ে বলেন যে, লেনিনের নেতৃত্বাধীন বলশেভিকরা সবরকমের অর্থনৈতিক ও পুজিবাদী শোষণ, ফটকাবাজী ও সামাজিক অসাম্যের বিরোধী।[২৮] ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে কাবুলে শপথ নেওয়া অস্থায়ী বিপ্লবী ভারত সরকারের প্রেসিডেন্ট রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ সিং ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের মার্চে প্রেত্রোগ্রাদ (লেলিনগ্রাদ) যান, বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নকে অভিনন্দন জানাতে। ভারতের মুক্তিসংগ্রামে সোভিয়েটের সমর্থন জানাতে সংস্কৃতিমন্ত্রী লুনাচারস্কির সভাপতিত্বে একটি সভা হয়। তার পরের বছর কাবুলস্থিত অস্থায়ী বিপ্লবী ভারত সরকারের প্রধানমন্ত্রী অধ্যাপক মাওলানা বরকতুল্লাহ মস্কো সফরে গিয়ে সোভিয়েটের প্রতি মৈত্রী ও সংহতি জ্ঞাপন করেন।[২৯] এসময় থেকেই ভারতের বিপ্লবীদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক সমাজবাদ সম্পর্কে আগ্রহ বাড়ে। এদিকে ভারতের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকার এই সংবাদে সচকিত হয়ে উঠে। সোভিয়েত বিপ্লবকে জন্ম থেকেই টুটি চেপে ধরতে সচেষ্ট হয়। আফগান সিমান্তের ওপর কড়া নজরদারি শুরু হয়; যাতে করে কমিউনিস্টরা ভারতে প্রবেশ করতে না পারে।

ব্রিটিশ সরকারের দমন নীতির ফলে ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে অধিকাংশ বিপ্লবী নেতা ও কর্মী কারারুদ্ধ হয়। কিছুসংখ্যক আত্মগোপনে থাকে।[৩০] এদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪-১৯১৮)[৩১] তুরস্কসহ জার্মানপক্ষ পরাজিত হলে বিজয়ী মিত্রশক্তি বিজিত শক্তি জার্মানির উপর নির্মম ও অসম্মান জনক ভার্সাই চুক্তি (২৮জুন,১৯১৯) চাপিয়ে দেয়। এবং তুর্কি সাম্রাজ্য নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে রাজধানী কনস্টান্টিনোপলসহ মূলতুর্কি ভূখন্ডেও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়। এ অবস্থায় মুসলিম জাহানে খলিফার মর্যাদাসহ তুর্কি জাতির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব ভূলুণ্ঠিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়।[৩২]

তুরস্কের এহেন বিপন্ন অবস্থায় মুসলিম বিশ্বে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। ভারতে এ প্রতিক্রিয়ার সর্বাধিক ব্যাপকতা লক্ষ্যণীয়। ভারতীয় মুসলমানেরা ইসলামের অস্তিত্ব ও মর্যাদা রক্ষায় খিলাফতকে একটি অপরিহার্য বিষয় মনে করত।[৩৩] খলিফা তথা তুর্কিদের দুরাবস্থার জন্য মিত্রশক্তির গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার ব্রিটিশ সরকারে বিশেষভাবে দায়ী ছিল।[৩৪] এজন্য ভারতে সরকার অনুগত মুসলমানদের মধ্যে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে। অন্যদিকে, যুদ্ধকালীন প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি[৩৫] মোতাবেক দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা বা স্বায়ত্বশাসন প্রদানে অনীহার কারণেও ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব দানা বাঁধতে শুরু করে। সরকার *রাওলাট আইন* (Rowlatt Act,1919) পাসের মাধ্যমে পুলিশের হাতে অবাধ ক্ষমতা দিয়ে 'ভারতের বিপ্লব প্রচেষ্টা[৩৬] সকল প্রকার সরকার বিরোধী বিক্ষোভ ও অসন্তোষ মোকাবিলার কৌশল নেয়। বিপ্লব প্রচেষ্টা সমুলে উচ্ছেদ সাধনে নয়া আইন ও নিপীড়নের প্রতিবাদে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ১৩ এপ্রিল পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে জনতা সমবেত হয়। জেনারেল ডায়ারের নির্দেশে সেনাবাহিনীর নির্বিচার গুলিবর্ষণে প্রায় চারশত লোক নিহত ও হাজারের অধিক আহতের ঘটনায় সমগ্র ভারত বিক্ষোভে ফেটে পড়ে।[৩৭] এ প্রেক্ষাপটে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের গোড়ার দিকে ভারতে একটি ব্যাপক ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়।

এদিকে কংগ্রেস নেতা মোহনদাশ করমচাদ গান্ধী প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সরকারকে শুধু নৈতিক মদদই দেননি; বরং সৈন্য সংগ্রহেও উৎসাহ দিয়েছেন। তাঁর আশা ছিল যুদ্ধের পর ব্রিটিশ সরকার ভারতের দাবি-দাওয়া সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করবে। কিন্তু বাস্তবতা হলো সম্পুর্ণ বিপরীত। তিনি প্রথমেই সত্যাগ্রহ কর্মসূচির অংশ হিসেবে রাউলাট আইনের প্রতিবাদে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ০৬ এপ্রিল সারা ভারতে হরতাল পালনের ডাক দেন।[৩৮]

পাঞ্জাবে হরতাল ও বিক্ষোভ তীব্র আকার ধারণ করে। পাঞ্জাব থেকেই যুদ্ধের সময় বেশি সংখ্যক যুবককে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে নেওয়া হয়েছিল। যুদ্ধের ঋণ মেটাতে পাঞ্জাবের কৃষকদের ওপর সামরিক

ব্যয়ের চাপ পড়ে। বৃহৎশিল্পের চাপে পাঞ্জাবের ক্ষুদ্র শিল্পের অবস্থা অত্যন্ত নাজুক হয়ে পড়ে। এই সকল কারণে রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে পাঞ্জাবের জনসাধারণের প্রতিবাদ বিস্ফোরণের পর্যায়ে পৌঁছায়। তাছাড়া যুদ্ধ শেষ হলেও জনসাধারণের কোনো প্রত্যাশাই পূর্ণ হয়নি। এ অবস্থায় বিক্ষোভকারী জনতার মিছিল পাঞ্জাবের অমৃতসরের জালিয়ানওলাবাগ চত্বরে পৌঁছলে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ১৩ এপ্রিল পাঞ্জাবের সামরিক বাহিনীর প্রধান জেনারেল ডায়ারের নির্দেশে নিরস্ত্র জনতার ওপর মেশিনগানের গুলি চালিয়ে একহাজার জনতাকে হত্যা এবং দুই হাজার মানুষ গুরুতর আহত হন।[৩৯] এই ঘটনায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মুখোশ খসে পড়ে। ভারতের মুক্তিসংগ্রাম এবার থেকে এক নতুন বাক নেয়-গণজাগরণ ও শ্রমিক সংগঠনের বিস্তৃতি। 'বিপ্লবীরা গণ-সংযোগ পরম নিষ্ঠার সঙ্গেই শুরু করেছিলেন বলে প্রতিভাত হয়। কেননা যে জনসাধারণ অজ্ঞতার বশে বিপ্লবী জ্যোতিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের (বাঘাজ্যোতিন) তেৃত্বাধীন বিপ্লবী দলকে উড়িষ্যার বালেশ্বরে বুড়িবালাম নদীর তীরে কাপ্তি পোদায় চাষখন্ডে পুলিশকে ধরিয়ে দেবার ফাঁদে পা বাড়িয়ে ছিল; সেই জনসাধারণই পনের বছর পর ১৯৩০ থেকে ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ অবধি বিপ্লবী সূর্যসেন ও তাঁর বাহিনীকে কর্ণফুলীর তীরে আশ্রয় ও খাদ্য দিয়ে মাতৃস্নেহে লালন করেছিল।[৪০]

অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই বিপ্লবী নেতৃবৃন্দের ইশারায় ১৯১৯ থেকে ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বৈপ্লবিক তৎপরতা অনেকটা স্তিমিতি হয়ে আসে। তন্মেধ্যে প্রধান কারণ হলো-সর্বাগ্রে নতুন করে প্রস্তুতি নিতে হবে। নচেৎ একটি ধাপ অতিক্রম করে পরবর্তী ধাপে ওঠা যায়না; আগামীর বিপ্লব এগিয়ে আসেনা। বিপ্লবীরা খুব ভালো করেই বুঝেছেন যে, গণ-সংযোগ তাঁদের করতেই হবে। মূলত এ সময়ে বিপ্লবীদের একটি অংশ কংগ্রেস তথা মোহনদাশ করম চাঁদ গান্ধীর গণসংযোগ কর্মসূচিকে বৈপ্লবিক প্লাটফর্ম হিসেবে ব্যবহার করে; অপরাংশ অতি সংগোপনে আশু সশস্ত্র বৈপ্লবিক তৎপরতার নীরব প্রস্তুতি গ্রহণ করে।[৪১] তবে এসময়ে সশস্ত্র বৈপ্লবিক তৎপরতা একেবারেই স্তিমিত ছিল তেমন নয়; মাঝে মাঝেই বিচ্ছিন্ন সশস্ত্র বৈপ্লবিক তৎপরতার চমক দেখা গেছে।

সূর্যকুমার সেনের নেতৃত্বে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ১৮ এপ্রিল চট্টগ্রাম যুববিদ্রোহ ও চট্টগ্রামের স্বাধীনতা ঘোষণার[৪২] ফলে তৃতীয় ধাপের সশস্ত্রবৈপ্লবিক কর্মের শুভ সূচনা হয়। এ বিদ্রোহের মাধ্যমে চার দিনের জন্য চট্টগ্রাম শহর ব্রিটিশ শাসনের বাইরে চলে যায়।[৪৩] অত:পর ধলঘাট[৪৪] কালারপোল[৪৫] এবং ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে প্রীতিলতার পাহাড়তলি ইউরোপীয়ান ক্লাব[৪৬] আক্রমণ ইত্যাদি নানাস্থানের সম্মুখ সংগ্রামের মাধ্যমে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির সশস্ত্রবৈপ্লবিক শৈর্যের ইতিহাস রচিত হতে থাকে। চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহের মাত্র আটমাসের মধ্যেই শুধুমাত্র ভারতের স্বাধীনতার জন্যে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ০৮ ডিসেম্বর

প্রকাশ্য দিবালোকে বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষের *বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স* (B.V.) দলের কর্মী **বিনয়কৃষ্ণ বসু-বাদল গুপ্ত**-দীনেশচন্দ্র গুপ্ত' নামের অসম সাহসী তিন বাঙালি বিপ্লবীর নেতৃত্বে কলকাতার ডালহৌসী স্কয়ারে রাইটার্স বিল্ডিং আক্রমণ ও বারান্দা যুদ্ধের[৪৭] ভয়ঙ্কর মুর্তিরূপ ধারণ করে। এছাড়াও এ দলটি মেদিনীপুরের ০৩ জন ম্যাজিস্ট্রেটসহ ৪/৫ জন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হত্যার[৪৮] মাধ্যমে তাদের সশস্ত্র বৈপ্লবিক তৎপরতার চরম উৎকর্ষতা প্রদর্শন করে সমগ্র ভারত ব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করে। এ সকল অফিসারদের হত্যার ঘটনায় ব্রিটিশ সরকার অত্যন্ত বিচলিত এবং চিন্তিত হয়ে পড়ে। এ সময় তারা সশস্ত্র বৈপ্লবিক তৎপরতা দমনের কৌশল নেয়। তবে সরকারি দমন-পীড়ন বৃদ্ধি পাওয়ায় 'এ সকল সশস্ত্র বৈপ্লবিক তৎপরতা শেষাবধি ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের দিকে স্তিমিত হয়ে যায়।[৪৯] এ প্রসঙ্গে ইতিহাসবিদ হোসেনউদ্দীন হোসেনের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন,

> 'বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির সশস্ত্র বৈপ্লবিক তৎপরতার কারণে ভারতে ব্রিটিশ শাসন যখন বিপর্যস্ত হওয়ার উপক্রম হয়, তখন এই সশস্ত্র বৈপ্লবিক তৎপরতাকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সরকার এক নতুন কৌশল গ্রহণ করে যা ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইন (প্রাদেশিক স্বশাসন পরিকল্পনা) নামে পরিচিতি পায়।[৫০]

অর্থাৎ এটি এমনই একটি আকর্ষণীয় ও লোভনীয় আইন যার মাধ্যমে ক্ষমতার লোভ দেখিয়ে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির সশস্ত্র বিপ্লবী ও বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে স্বদেশী সুবিধাবাদীদের লেলিয়ে দিয়ে দমন-পীড়ন করার এক চমৎকার পরিকল্পনা করা হয়। পরিণামে একশ্রেণির লোক ক্ষমতার লোভে 'রাজনীতির নামে' ব্রিটিশের পাতা ফাঁদে পা দেয়। তাঁরা কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ সহ নানা দলে বিভক্ত হয়ে জনগণের মধ্যে দলাদলি শুরু করে এবং জনগণ বিভক্ত হয়ে পড়ে। ফলশ্রুতিতে ব্রিটিশ পরিকল্পনা ষোলআনা বাস্তবায়িত হয় এবং কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা প্রাপ্তি বিলম্বিত হতে থাকে। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইন অনুসারে ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচন পরবর্তী ফলাফল অনুযায়ী বাংলা এবং পাঞ্জাবে মুসলিম লীগ এবং অন্য সকল প্রদেশে কংগ্রেস সরকার গঠন করে। বাংলা ও পাঞ্জাবের কোয়ালিশন সরকার গঠনের সুযোগ থাকলেও কংগ্রেস কোয়ালিশন সরকার গঠনে আগ্রহ দেখায়নি।

১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে সুভাষচন্দ্র বসু তাঁর যে সংগ্রামী পরিকল্পনার প্রচার শুরু করেন তা হলো- 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের উচিৎ হবে স্বাধীনতার দাবি নিয়ে একটি চরমপত্রের মাধ্যমে ব্রিটিশদের রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করা। যদি ছয় মাসের মধ্যে গ্রেট ব্রিটেন যদি স্বাধীনতা প্রদানে সম্মত না হয় তাহলে 'জাতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধের' জন্য ভারতকে সংগ্রামের প্রস্তুতি নিতে হবে'।[৫১] ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের ২১ ডিসেম্বর তিনি মহাত্মাগান্ধী এবং পন্ডিত জওহরলাল নেহেরুর নিকট আরেকটি সংগ্রামী

পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন। এতে তিনি সুকৌশলে সাংবিধানিক প্রক্রিয়া সম্বলিত মহাত্মাগান্ধীর 'সত্যাগ্রহ' পন্থা ও সংকটের সুযোগ গ্রহণের বিষয়ে তাঁর নিজের যে ধারণা সেই দুটোর মধ্যে সমন্বয় বিধানের প্রয়াস পান। প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে তিনি ভারতবর্ষে জাতীয় সমঝোতা প্রতিষ্ঠার ওপর জোর দেন এবং প্রস্তাব করেন যে, জাতীয় পর্যায়ে সমঝোতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সদস্যদের উচিৎ হবে বাংলা ও পাঞ্জাব প্রদেশের কোয়ালিশন সরকারে যোগদান করা।[৫২] এর ফলে কংগ্রেস যথার্থই দাবি করতে পারবে যে, সমগ্র ভারতের পক্ষ থেকে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বোঝাপড়ায় তাদের প্রকৃত অধিকার রয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে কংগ্রেসের ত্রিপুরী সম্মেলনে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ব্রিটিশ প্রশাসন থেকে পুর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা দাবি করতে পারবে।[৫৩] কিন্তু মহাত্মাগান্ধী কর্তৃক কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসুর এ সকল প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়। উপরন্তু ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরী সম্মেলনে সুভাষচন্দ্র বসু দ্বিতীয় মেয়াদে কংগ্রেস সভাপতি পদে নির্বাচিত হলেও মহাত্মাগান্ধীর সঙ্গে নীতিগত বিরোধের কারণে তিনি কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। পরবর্তীতে অত্যন্ত নীতিগর্হিত ভাবে জাতীয় কংগ্রেস থেকে সুভাষচন্দ্র বসুকে বহিস্কার করা হয়।

১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে চলমান যুদ্ধ পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে বিপ্লবীরা ভারতের স্বাধীনতার জন্য পুনরায় তৎপরতা শুরু করে। 'নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ছদ্মবেশ ধারণ করে ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের ১৭ জানুয়ারি অত্যন্ত চুপিসারে ভারত ত্যাগ করে জার্মানি পৌঁছেন। পরবর্তীতে বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর আহ্বানে তিনি জার্মানি থেকে জাপানে গমন করেন।[৫৪] বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর ইচ্ছানুসারে ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের ১৪ জুলাই নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আজাদ হিন্দ ফৌজের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।[৫৫] এবং ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের ২১ অক্টোবর অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার গঠন করেন। অত:পর ২৪ অক্টোবর নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু মিত্র শক্তি ইঙ্গ-মার্কিন জোটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার[৫৬] মাধ্যমে বিপ্লবের চতুর্থ ধাপ অর্থাৎ বিপ্লব (Revolutionn) বা শেষ পর্বের শুভ সূচনা করেন। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দের ১৪ জানুয়ারি বার্মার রাজধানী রেঙ্গুনে প্রধান সামরিক ঘাটি স্থাপন করেন।[৫৭] সেখান থেকে সশস্ত্র অভিযানের মাধ্যমে ১৭ এপ্রিল ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের কোহিমায়[৫৮] উপনীত হয়ে সেখানে স্বাধীন ভারতের ত্রিবর্ণ পতাকা উত্তোলন করেন।[৫৯] অপর একবাহিনী মণিপুরের রাজধানী ইম্ফলের অদূরে মৈরাং-এ জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন।[৬০] কোহিমা এবং মৈরাংসহ ভারতীয় এলাকার ১৫০ মাইল ব্রিটিশ শাসনমুক্ত করে মণিপুরের রাজধানী ইম্ফল অধিকারের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হন। কিন্তু পথিমধ্যে প্রবলবর্ষণ শুরু হলে আজাদ হিন্দ ফৌজের ভারত অভিযান ব্যাহত হয়।[৬১] কিন্তু ইতোমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অক্ষশক্তির পরাজয়[৬২] এবং ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের ১৮ আগস্ট নেতাজির মৃত্যু; পরিস্থিতি বদলে দেয়।[৬৩]

এছাড়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জয়লাভ করে ব্রিটিশ সরকার লালকেল্লায় আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচারের উদ্যোগ গ্রহণ করে।[৬৪] কিন্তু এ বিচার প্রশ্নে দেশে গণবিক্ষোভের রূপ পরিগ্রহ করে।[৬৫] এসময় কংগ্রেস আজাদ হিন্দ ফৌজের পক্ষসমর্থন করে আদালতে পন্ডিত জওহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে তেজবাহাদুর সাপ্রু, ভুলাভাই দেশাই, কৈলাসনাথ কাটজু প্রমূখের সমন্বয়ে একটি ডিফেন্স টিম গঠন করে।[৬৬] যদিও ইতোপূর্বে তারা আজাদ হিন্দ ফৌজের বিরোধিতা করেছেন। কিন্তু এই বিচার বিরোধী তীব্র জনমত নিজেদের পক্ষে নেওয়ার প্রত্যয়ে পন্ডিত জরহরলাল নেহেরু ব্যারিস্টার রূপে জীবনে এই প্রথম এবং শেষবারের মতো কোন মামলার কৌশলী হন। এদিকে আজাদ হিন্দ ফৌজের ক্যাপ্টেন রশিদ আলীর বিচার প্রশ্নে কলকাতার ছাত্র সমাজের আহ্বানে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের ১১ ফেব্রুয়ারি ধর্মঘট এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচার বন্ধের দাবিতে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের ২১ নভেম্বর এক বিক্ষোভ মিছিল কলকাতা শহর প্রদক্ষিণ করে।[৬৭]

সর্বোপরি ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারি বোম্বাই বন্দরে ঐতিহাসিক নৌ বিদ্রোহ সংগঠিত হলে তা করাচি বন্দরে ছড়িয়ে পড়ে।[৬৮] রয়্যাল ইন্ডিয়ান নেভির এই বিদ্রোহের খবর বোম্বাই শহরের সাধারণ জনতা, ছাত্র-যুবক ও শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে ছড়িয়ে পড়লে তারাও বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।[৬৯] মহাত্মাগান্ধী নৌবিদ্রোহের নিন্দা এবং কংগ্রেস নেতা সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল এবং মুসলিম লীগ নেতা মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ বিদ্রোহী নাবিকদের অবিলম্বে আত্মসমর্পণ করার আহ্বান জানান।[৭০] ব্রিটিশ সাম্রাজ্য টিকে ছিল মূলত সামরিক এবং প্রতিরক্ষা বাহিনীর নিঃশর্ত আনুগত্যের ওপর। কিন্তু এ নৌবিদ্রোহ সেই আনুগত্যকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তোলে। ব্রিটিশ সরকার স্পষ্টতই উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় যে, সামরিক বাহিনীর দুর্বল আনুগত্যের ওপর নির্ভর করে সাম্রাজ্য রক্ষা করা যাবেনা।[৭১] এ সময় শ্রমিকশ্রেণির অর্থনৈতিক সংগ্রাম ও ছাত্র-জনতার রাজনৈতিক আন্দোলন একীভূত হয়ে ব্রিটিশ বিরোধী এক গণআন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। তাছাড়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানে সমগ্র ভারতে কৃষি অর্থনীতিতে সঙ্কট দেখা দেয় এবং ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলার কৃষক বিদ্রোহ তথা তেভাগা আন্দোলন সহ সমগ্র ভারতের অন্যান্য কৃষক আন্দোলন ব্রিটিশ সরকারকে বিচলিত করে তোলে।

উর্পযুক্ত ঘটনাপ্রবাহ বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির দীর্ঘ ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র বৈপ্লবিক তৎপরতা তথা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বাধীন আজাদ হিন্দ ফৌজের সশস্ত্র বৈপ্লবিক কর্মকান্ডের অভিঘাতের প্রতিফলন বলেই অনুমিত হয়। কাজেই বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির আন্দোলনের ফলে ইংরেজ শাসনের ভিত্তি জমিদারি পদ্ধতি নড়বড়ে হয়ে পড়া, আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচার কেন্দ্রিক উদ্ভুত সৈনিক-শ্রমিক-ছাত্র-সাধারণ জনতা ও কৃষক সমাজের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন-সংগ্রামের ফলশ্রুতিতে আইনশৃঙ্খলা

পরিস্থিতির চরম অবনতিতে ব্রিটিশ সরকার ভারতশাসন কার্যক্রম পরিত্যাগের বিষয়টি বিবেচনা করতে থাকে। তাছাড়া 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতি মিটিয়ে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে ভারতের শাসনকার্য ধরে রাখা প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে।[৭২] উদ্ভুত পরিস্থিতি বিবেচনায় ব্রিটিশ সরকার ভারতের শাসনভার ত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।[৭৩] ব্রিটিশ সরকারের এ সিদ্ধান্ত বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির সশস্ত্র বৈপ্লবিক তৎপরতার সফল পরিণতি যা বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির বৈপ্লবিক চিন্তা ও কর্মতৎপরতার সাফল্যের ইঙ্গিতবাহী মনে করা হয়। এক্ষেত্রে সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী *লর্ড ক্লিমেন্ট এটলির* (Clement Attlee) মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'ব্রিটিশ সরকারের ভারত ত্যাগের সিদ্ধান্তে মহাত্মাগান্ধীর ভূমিকা 'স-ব-চে-য়ে-ক-ম'।[৭৪] তিনি আরও বলেন, 'তবে সুভাষচন্দ্র বসুর সামরিক কার্যকলাপে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী ও অনেক অফিসারদের মধ্যে ব্রিটিশ রাজশক্তির প্রতি আনুগত্যের অভাব পরিলক্ষিত হলে আমরা ভারত ত্যাগের সিদ্ধান্ত নেই।'[৭৫] সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লর্ড ক্লিমেন্ট এটলির উপর্যুক্ত মন্তব্য অর্থাৎ বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির দীর্ঘ সশস্ত্র বৈপ্লবিক আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বাধীন বিপ্লবী আজাদ হিন্দ সরকারের সশস্ত্র বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতার অভিঘাতে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকারের ভারত ত্যাগের ঘটনা বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিপ্লব কে সফল্য মন্ডিত করে তোলে।

টিকা ও তথ্য নির্দেশ:

১. সুপ্রকাশ রায়, *ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম*, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা,২০১৮,পৃ.১৭৫

২. সুপ্রকাশ রায়, *ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম (১৮৯৩-১৯৪৭)*, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, ২০১৩,পৃ.২৩

৩. A. R. Desai, *Social Background of Indian Nationalism,* Popular Book Depot, Bombay, 1948, p.237.

৪. *The New Fontana Dictionary of Mordern Thought* Third Edition, Allan Bullock and Stephen Trombley, Eds.1999, pp.754-56. (উদ্ধৃতঃ https://en.m.wikipedia.org>wiki, accessed on: 23.04. 2022.)

৫. হেমচন্দ্র কানুনগো, *বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা*, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেসন, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ৭০

৬. উমা মুখোপাধ্যায় ও হরিদাস মুখোপাধ্যায়, *শ্রী অরবিন্দ ও বাংলায় বিপ্লববাদ*, ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়, কলকাতা, ১৯৭২,পৃ.০১

৭. অনন্ত সিংহ, *সূর্য সেনের স্বপ্ন ও সাধনা*, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন,কলকাতা, ২০১৯, পৃ. ৭৭

৮. অনন্ত সিংহ, *প্রাগুক্ত*

৯. অনন্ত সিংহ, *প্রাগুক্ত*

১০. অনন্ত সিংহ, *প্রাগুক্ত*

১১. অনন্ত সিংহ, *প্রাগুক্ত*

১২. সুপ্রকাশ রায়, *ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস*, ডিএনবি ব্রাদার্স, কলকাতা, ১৯৭০,পৃ.(মুখবন্ধ) নয়-দশ)

১৩. সুপ্রকাশ রায়, *প্রাগুক্ত*

১৪. সুপ্রকাশ রায়, *প্রাগুক্ত*

১৫. ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়, *ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব*, র‍্যাডিক্যাল ইমপ্রেশন, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ৯৫

১৬. সুপ্রকাশ রায়, ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২০-২১; Amiya K.Samanta (edt.), *Terrorism in Bengal*. vol. 1, Goverment of West Bengal., Calcutta, 1935, p. 20; কালীচরণ ঘোষ, *জাগরণ ও বিস্ফোরণ (১৯০৮-১৯৪৭) দ্বিতীয় খন্ড*, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, ২০১৭, পৃ.২৫-২৬

১৭. কালীচরণ ঘোষ, *জাগরণ ও বিস্ফোরণ (১৯০৮-১৯৪৭) দ্বিতীয় খন্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩১; সুপ্রকাশ রায়, ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২১

১৮. ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৫

১৯. ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৩-৭

২০. ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত-রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৫-৯৬

২১. সুপ্রকাশ রায়, ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস, *প্রাগুক্ত*, ১৯৭০, পৃ. ষোলো

২২. সরল চট্টোপাধ্যায়, *ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ*,পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ,কলকাতা,১৯৯০,পৃ. ৩১০

২৩. সরল চট্টোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩১১

২৪. ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১১

২৫. সরল চট্টোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১১

২৬. কৃষ্ণধর, *ভারতের মুক্তিসংগ্রামে বাংলা*, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ,পশ্চিমবঙ্গ সরকার,কলকাতা,১৯৭৭,পৃ. ৬৪

২৭. কৃষ্ণধর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫

২৮. কৃষ্ণধর, *প্রাগুক্ত*

২৯. কৃষ্ণধর, *প্রাগুক্ত*

৩০. নলিনীকিশোর গুহ, *বাংলায় বিপ্লববাদ*, র‍্যাডিক্যাল ইমপ্রেশন, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ২৯৪

৩১. প্রথম বিশ্বযুদ্ধে এক পক্ষে ছিল বৃটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া, ইতালি ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এদেরকে একত্রে *মিত্র শক্তি* (Allied Power) বলা হতো। অপর পক্ষে জার্মানি ও অষ্ট্রিয়া। জার্মানির সাথে তুরস্কের পূর্ব থেকেই সুসম্পর্ক ছিল। এজন্য তুরস্ক প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির পক্ষে যোগ দেয়। (উদ্ধৃত: সুলায়মান কবীর, *বাংলায় মুসলিম জাগরণে ওয়াজেদ আলী খান পন্নী*, ঢাকা: সুবর্ণ, ২০২০, পৃ. ১৩০)

৩২. যুদ্ধপরবতী তুরস্কের শোচনীয় অবস্থার বিবরণ জানতে দেখুন । (উদ্ধৃত: সফিউদ্দীন জোয়ারদার, *আধুনিক মধ্যপ্রাচ্য, প্রথম খন্ড*, বাংলা একাডেমী, ২০০৩, পৃ. ১৩৫-৫৯

৩৩. বিষয়টি অনুধাবনের জন্য খেলাফত আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর 'খেলাফৎ' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত করা হলো:পবিত্র স্থান সমূহ এবং আরব রাজ্য খলিফার হাতছাড়া হলে,রাজধানী কনস্টান্টিনোপলে বিজাতির কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে খলিফার পদ মর্যাদা থাকে না।খলিফার পদমর্যাদা না থাকলে তিনি খলিফারূপে থাকতে পারেন না। খলিফা না থাকলে,ইমাম নির্দিষ্ট না থাকলে মুসলমানের মুসলমানিত্ব থাকে না। ইসলাম কায়েম থাকে না...অতএব ইসলাম রক্ষা করতে হলে, মুসলমান নামে অভিহিত হতে হলে...খলিফাকে রক্ষা করা,খলিফার রাজ্য, তাঁর ক্ষমতা ও পদমর্যাদা রক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের ফরজ। (উদ্ধৃত: মো. রফিকুল ইসলাম,*তুরস্কের মুসলিম খিলাফতের বিপর্যয়ে ভারতের তথা বাংলার মুসলমানদের প্রতিক্রিয়া*, অপ্রকাশিত এম.ফিল থিসিস, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, নভেম্বর, ২০০৬,পৃ.৫-৬; সুলায়মান কবীর, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১১২)

৩৪. B.M.Taunk, *None-cooperation Movement in Indian Politics (1919-1924)*, Delhi, Sundeep Prakasan, 1978, p.16-18.

৩৫. ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে ব্রিটিশ সরকার ভারতে ক্রমশ স্বায়ত্বশাসনের প্রতিশ্রুতি দেয়। (উদ্ধৃত: সতীশ পাকড়াশী, অগ্নিযুগের কথা, র‍্যাডিক্যাল ইমপ্রেশন, কলকাতা, ২০১৫, পৃ.৮২)

৩৬. উদ্ধৃত: নারায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়, *বিপ্লবের সন্ধানে*,র‍্যাডিক্যাল ইমপ্রেশন,কলকাতা,২০১৫,পৃ.৬১

৩৭. R.C.Aggrarwal,*Constitutional History of India and National Movement,* Delhi, S. Chand & Co. (Pvt.), 1974, p. 219-21.; নারায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপ্লবের সন্ধানে,*প্রাগুক্ত*, পৃ.৬১

৩৮. কৃষ্ণধর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫

৩৯. কৃষ্ণধর, *প্রাগুক্ত*, ৬৬

৪০. ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়, ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৬

৪১. ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৬

৪২. সুপা সাদিয়া, *অগ্নিযুগ*, দ্যু প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ২৭

৪৩. চিন্মোহন সেহানবীশ ও অন্যান্য, *মুক্তির সংগ্রামে ভারত*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি,কলকাতা, ২০১০,পৃ.১১

৪৪. চিন্মোহন সেহানবীশ ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৮

৪৫. চিন্মোহন সেহানবীশ ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত*

৪৬. চিন্মোহন সেহানবীশ ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত*

৪৭. করলে কারা বিভাগের বড় কর্তা সিমসনকে নিহত ও কতিপয় ইংরেজ অফিসার আহত হয়। (উদ্ধৃত: ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৩

৪৮. *প্রাগুক্ত*; বিপানচন্দ্র ও অন্যান্য, *ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম*, কেপি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী,কলকাতা,২০১৪,পৃ.১৯৫

৪৯. সুপ্রকাশ রায়, *ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৫-১৯

৫০. হোসেনউদ্দীন হোসেন, *বাঙলার বিদ্রোহ প্রথম খন্ড (৬০০-১৯৪৭)*,বিদ্যা প্রকাশ,ঢাকা,২০১৬,পৃ.(কিছু কথা দ্রষ্টব্য)

৫১. আবুল কালাম, *সুভাষ বসুর রণনীতি ও কূটনীতি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন ২০০৭, পৃ. ৪৯

৫২. আবুল কালাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯

৫৩. আবুল কালাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯

৫৪. নলিনীকিশোর গুহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭০ এবং ২৭৬

৫৫. চিন্মোহন সেহানবীশ ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৭১

৫৬. সরল চট্টোপাধ্যায়,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৪০৮; কালিচরণ ঘোষ, *জাগরণ ও বিস্ফোরণ (১৯০৮-১৯৪৭), দ্বিতীয় খন্ড*,প্রাগুক্ত,পৃ.৩৫৩

৫৭. সরল চট্টোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০৯

৫৮. বর্তমান ভারতের নাগাল্যান্ড রাজ্যের রাজধানী।

৫৯. এম. জি. মুলকর, *আজাদী সৈনিকের ডায়েরি*, র‍্যাডিক্যাল ইমপ্রেশন, কলকাতা,২০১৮,পৃ.৬২-৬৩

৬০. এম. জি. মুলকর, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৫৬-৫৭

৬১. এম. জি. মুলকর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬-৫৭; ৬২-৬৩

৬২. সরল চট্টোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৪১২-১৩

৬৩. সরল চট্টোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১৩

৬৪. সৌম্যব্রত দাশগুপ্ত, *অগ্নিগর্ভ '৪৫ আদালতে আজাদ হিন্দ*, পত্রলেখা,কলকাতা,২০২৩,পৃ. ৮০

৬৫. সৌম্যব্রত দাশগুপ্ত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮১

৬৬. সরল চট্টোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৬৩

৬৭. হায়দার আকবর খান রনো,*পলাশী থেকে মুক্তিযুদ্ধ, প্রথম খন্ড (মধ্যযুগ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত)*,পৃ. ১২১

৬৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ.১২২-২৩; সুপ্রকাশ রায়, *ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম*, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৪১০

৬৯. বিপানচন্দ্র ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩৮৮

৭০. সরল চট্টোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭২

৭১. আবুল কালাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩২

৭২. পারভীন আক্তার জেমী, *নজরুল সাহিত্যে বিপ্লবী চেতনা*, *অনন্যা,ঢাকা,২০২০*,পৃ. ২৮; সুপ্রকাশ রায়, *ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৪১০; সরল চট্টোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০১

৭৩. সুপ্রকাশ রায়, *ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৪১১; ইয়াসমিন ও রাখী বর্মন, *ব্রিটিশ ভারতে রাজনৈতিক উন্নয়ন*, আজিজিয়া বুক ডিপো, ঢাকা, ২০০৬,পৃ.২৮৭

৭৪. M N Majumdar, *Voilence, Non-Violence and Gandhi,* Frontier, Vol. 44, Non. 9, September 11-17, 2011. (উদ্ধৃত: https://www.frontierweekly.com), Accessed 0n 15 December, 2025

৭৫. *op.cit.,*

উপসংহার

পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো পরাধীন জাতির মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস প্রত্যক্ষ করলে এটা লক্ষ্য করা যায় যে, কোথাও শুধুমাত্র বৈধ ও নিয়মতান্ত্রিকতার সরলপথ ধরে অগ্রসর হওয়ার ইতিহাস বিরল। ঘটনার অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে নব নব চিন্তাধারা আবির্ভূত হলে তদনুযায়ী কর্মপন্থাও গৃহীত হয়ে থাকে। সাধারণত অহিংস বা নিয়মতান্ত্রিক পথধরে মুক্তিসংগ্রাম শুরু হলেও সময়ের যাত্রাপথে সংগ্রামের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবে সশস্ত্র বৈপ্লবিক কর্মনীতি গ্রহণ করতে দেখা যায়।[১] একই নিয়ম অনুসরণ করে পৃথিবীর সকল বিপ্লব সংঘটিত হয়নি। সাধারণত কোন দেশে বিপ্লব সংঘটিত হবার পূর্বে সর্বপ্রথম সে দেশের স্থান, কাল ও প্রয়োজন উপযোগী বিপ্লবী দর্শনের বিকাশ ঘটে। সর্বাগ্রে মনীষী ও বিপ্লবীদের মানসিক বিপ্লব ঘটে। তারা বিভিন্ন দেশের বৈপ্লবিক ইতিহাসের নতুন নতুন চিন্তাধারা বয়ে আনেন এবং পরাধীনতার বন্ধন ছিন্ন করতে দেশের জনসাধারণ ও বিপ্লবীদেরকে উদ্বুদ্ধ করণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

আমাদের জানা মতে, ১৬৮৮ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডে বিপ্লব স্বৈরতন্ত্রের ধ্বংস স্তুপের ওপর সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। ১৭৭৫ থেকে ১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত মার্কিনবাসী এই দীর্ঘ স্বাধীনতা যুদ্ধের পর আমেরিকার সাধারণতন্ত্রী সরকার প্রতিষ্ঠা করে।[২] ইংল্যান্ড ও আমেরিকার সফল বিপ্লবের দৃষ্টান্তই ফরাসিদের সবচাইতে বেশি অনুপ্রাণিত করেছিল। ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে তারা স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রকে রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের প্রবল বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে যায়। ফরাসি বিপ্লব কেবল স্বৈরাচারী রাজার একাধিপত্যের বিরুদ্ধেই সংঘটিত হয়নি। বরং অভিজাতবর্গ ও পার্দ্রিবর্গের অধিকাংশ যারা অতি দরিদ্র কৃষকদের নিকট থেকে অধিকহারে কর আদায় করতো;তাদের বিরুদ্ধেও সংঘটিত হয়েছিল।[৩] কৃষকরা রাজাকে তো কর দিচ্ছিলই, তার ওপর এদের কর আদায়ের ফলে তারা একেবারে নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছিল। এই দরিদ্র কৃষকদের সঙ্গে শহরের কিছু সংখ্যক শিল্পপতি শ্রেণির মানুষও, যদিও তাঁদের আর্থিক অবস্থা কৃষকদের মতো অতখানি খারাপ ছিল না; তবু সরকারের বিরুদ্ধেও তাদের বিক্ষোভ পুঞ্জিভূত হচ্ছিল বিধায় তারাও এ বিদ্রোহে শামিল হয়। কারণ তাদের ব্যবসা বাণিজ্যের অবাধ প্রসারতাকে স্বৈরতন্ত্রী রাজতন্ত্র নানাভাবে প্রতিহত, নিয়ন্ত্রণ ও খর্ব করে আসছিল। যার ফলে তারাও নানাভাবে শোষিত হচ্ছিল।[৪] ফরাসি বিপ্লবের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো–জার্মানি, রুশ বা ইংল্যান্ডের কৃষকদের তুলনায় ফরাসি কৃষকদের অর্থনৈতিক অবস্থা তখনও কিছুটা ভালো থাকা সত্ত্বেও তারাই বিপ্লবের আগুন প্রজ্জ্বলিত করে। রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকা– তিন লক্ষ সুবিধাভোগী পাদ্রি ও অভিজাত বর্গের অত্যাচার ও শোষণের

বিরুদ্ধে দু'কোটি দুঃস্থ দরিদ্র ও বঞ্চিত জনতা বিপ্লব সংগঠিত করে[৫] বিশ্বে এক অনন্য নজির স্থাপন করে।

বাংলা তথা ভারতের মধ্যবিত্ত শ্রেণি ব্রিটিশ সৃষ্ট সামন্তপ্রথা মূলক ভূমিব্যবস্থার মধ্য হতে সৃষ্ট হয়ে বিশ শতকের আর্থিক সঙ্কটের চাপে তার একাংশ কৃষি ভূমির সংস্পর্শ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এবং হতাশাচ্ছন্ন হয়ে আর্থিক সঙ্কট হতে পরিত্রাণ ও দেশের স্বাধীনতা লাভের জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। কংগ্রেসের নিষ্ক্রিয়তা ও আপসমূলক মনোভাবের ফলে বুর্জোয়া নেতৃত্বের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে তারা নিজস্ব পন্থায় একবিশেষ প্রকারের সশস্ত্র বৈপ্লবিক সংগ্রামের পথ অবলম্বন করে। মধ্যশ্রেণিসুলভ ভূম্যধিকারীর মনোবৃত্তিরবশে তারা শ্রমিক-কৃষককে বৈপ্লবিক শক্তি হিসেবে স্বীকার করতে ব্যর্থ হয়। এই ব্যর্থতার ফলেই তারা তাদের সংগ্রামের প্রধান উপায় হিসেবে সশস্ত্রপন্থা অবলম্বন করতে বাধ্য হয়।[৬] কারণ যে চরমপন্থা বা সশস্ত্র সংগ্রাম জনসাধারণ হতে সম্পুর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে চলে, শ্রমিক কৃষককে এড়িয়ে যায়; সে সংগ্রামে সশস্ত্রপন্থা অবলম্বন করা ব্যতীত অন্য কোন উপায় থাকে না।[৭] সশস্ত্র অভ্যুত্থানের দূর পরিকল্পনা থাকলেও প্রধানত অর্থ সংগ্রহের জন্য ডাকাতি এবং গুপ্তহত্যার মধ্যেই তাদের বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপ সীমাবদ্ধ থাকে। তারা রাজনৈতিক ডাকাতিকে গেরিলা যুদ্ধের এক বিশেষরূপ হিসেবে এবং গুপ্তহত্যাকে জনসাধারণকে জাগ্রত করা এবং গণঅভ্যুত্থান ঘটানোর উপায় হিসেবে গ্রহণ করে।[৮] বাংলায় উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার যে বীজ রোপিত হয়, বিশ শতকের শুরুতে তা অরবিন্দকুমার ঘোষ (১৮৭২-১৯৫০), পুলিনবিহারী দাশ (১৮৭৭-১৯৪৯), জ্যোতিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘাজ্যোতিন) (১৮৭৯-১৯১৫), রাসবিহারী বসু (১৮৮৫-১৯৪৫), সুর্যকুমার সেন (১৮৯৪-১৯৩৪), নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু (১৮৯৭-১৯৪৫), মহাত্মাগান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮) প্রমুখ প্রধানতম বিপ্লবীর নেতৃত্বে সশস্ত্র বৈপ্লবিক সংগ্রাম ও আন্দোলনের ফলে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতের জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের মাধ্যমে তার পরিসমাপ্তি ঘটে।

বাংলায় ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর যুগান্তকারী ঘটনার ফলে ব্রিটিশ শোষণ-নির্যাতনের প্রভাব পড়ে জনগণের সর্বস্তরে। এতে দু'টি পথ খোলা থাকে; একটি নির্বিবাদে মেনে নেওয়া অন্যটি বিদ্রোহ। আঠারো শতকের মধ্যভাগ থেকে উনিশ শতকের শুরুঅবধি ব্রিটিশ আধিপত্য স্থাপনের সূচনা থেকেই ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে উঠে। কৃষক, শ্রমিক ও কারিগর শ্রেণির জীবন বিপর্যস্ত হওয়ায় তারাই প্রথম বিদ্রোহের আগুন প্রজ্বলিত করে।[৯] ব্রিটিশ শাসন-শোষণ বিরোধী ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ (১৭৬৩-১৮০০) ও জমিদার-মহাজন বিরোধী সকল আন্দোলন-

সংগ্রামে বাংলার এক ধারাবাহিক বিপ্লবী তৎপরতা লক্ষ্যণীয়। বাঙালির এই বৈপ্লবিক কার্যক্রম পরবর্তীতে সমগ্র ভারতব্যাপী পরিব্যাপ্ত হয়।

১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কারণে যে নতুন জমিদার এবং কোম্পানির এদেশীয় মুন্সি, বেণিয়া ও মুৎসুদ্দি সহ নানাধরণের মধ্যসত্ত্বভোগী শ্রেণির উদ্ভব ঘটে,তারা প্রায় সকলেই ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়ভূক্ত। এ অবস্থায় ইংরেজরা একটি শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণি গড়ে তুলতে তৎপরতা চালায়।[১০] বাংলায় মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব সমাজের ক্রমবির্তনের ফল। ১৭৫৭-১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বাংলায় ব্রিটিশ প্রশাসন কতগুলো পদক্ষেপগ্রহণ করে। এগুলোর মধ্যে ভূমিব্যবস্থার নতুন বিন্যাস,ব্যবসায়-বাণিজ্যে পুঁজিবাদী চেতনার বিকাশ, ইংরেজি শিক্ষার বিস্তার, আইন-আদালত স্থাপন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এসকল পদক্ষেপের ফলেই বাংলায় আধুনিক মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব অনিবার্য হয়ে ওঠে। ইংরেজ সরকারের নীতির কারণে প্রধানত চারটি শ্রেণি যেমন; (ক) ব্যবসায় নির্ভর, (খ) শিল্প নির্ভর (গ) ভূমি নির্ভর ও (ঘ) শিক্ষা নির্ভর মধ্যবিত্তের বিকাশ ঘটে।[১১] তবে এই শ্রেণিরগুলোর মধ্য আমাদের আলোচনায় প্রাধান্য পাবে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি। সাধারণত ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত এবং ইংরেজ সৃষ্ট ও স্বীকৃত পেশাসমূহে নিয়োজিতরাই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি নামে পরিচিত। মানসিক গঠন, নৈতিকতা, মূল্যবোধ, জীবন দর্শন ও জাতীয়তাবোধে অন্যান্য মধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকে তারা স্বতন্ত্র বৈশিষ্টের অধিকারী হয়। কলকাতাকে কেন্দ্র করেই মধ্যবিত্ত শ্রেণি বিকশিত হয়।

প্রকৃতপক্ষে বাংলার বিপ্লব প্রচেষ্টা স্বল্পসংখ্যক অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত যুবকদের হুজুগের বিষয় ছিল না। স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষী এ বিপ্লব প্রচেষ্টার ঘটনাবলি বাংলার ইতিহাস হতে বাদ দেওয়ার অবকাশ নেই। এটি বাংলার জাতীয় ইতিহাসের ক্রমবিকাশের একটি স্তরমাত্র।[১২] সর্বোপরি ভারতের পরাধীন অবস্থা এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণির বৈপ্লবিক চিন্তা ও চেতনা বিকাশের দু'টি মূল উৎস[১৩] বিবেচিত হয়। উনিশ শতকের শুরুতে পাশ্চাত্যেরে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংস্পর্শে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির মনে সামাজিক ন্যায়বিচার ও রাজনৈতিক অধিকার সমন্ধে নতুন ধ্যান-ধারণার উদ্ভব ঘটে, যা বঙ্গীয় নবজাগরণ নামে অভিহিত।[১৪] রামগোপাল ঘোষের সময় হতে ইয়ংবেঙ্গলের অভ্যুদয়। তৎপরে ব্রাহ্মসমাজের আবির্ভাব ও বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের চিন্তার ওপর তার প্রভাব। রাজনারায়ণ বসুর বৈপ্লবিক মত ও নবগোপাল মিত্রের জাতীয় বা হিন্দু মহামেলা।[১৫] ন্যাশনাল পেপারের সংস্থাপনা; ন্যাশনাল থিয়েটারে স্বদেশ প্রেমমূলক নাটক সমূহের অভিনয়; তৎপরে হিন্দুধর্ম পুনরুত্থানকারীদের অভ্যুদয়; বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ভূদেব মূখোপধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ প্রমূখের বৈপ্লবিক চেষ্টা ও তদনুসারে হুগলির চারিদিকে লাঠিখেলার আখড়া স্থাপন; শিবনাথ শাস্ত্রীর দেশসেবার উদ্যম,

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপধ্যায়, আনন্দমোহন বসুর বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা[১৬] ও ষ্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা এবং পরিশেষে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ও কংগ্রেসের কার্য; শিশিরকুমার ঘোষের বৈপ্লবিক পরিকল্পনা; তৎপরে স্বামী বিবেকানন্দের *আক্রমণশীল হিন্দুধর্মের* (Aggressive Hinduism) মতবাদ এবং শেষে বিপ্লববাদীদের দল প্রতিষ্ঠা ও কর্ম–এগুলি বাংলার জাতীয় জীবনের ধারাবাহিক ক্রমবিকাশের সোপান। এদের একটি ব্যতীত অপরটিতে পৌঁছানো যায় না।[১৭] স্বভাবতই দু'টি সভ্যতা ও চর্চা পরস্পর সন্নিকটে চলে আসার ফলশ্রুতিতে একটি নতুন চর্চা ও ভাব প্রণালীর অভ্যুত্থান ঘটে থাকে। বাংলার ক্ষেত্রে এর যথার্থতা প্রতিভাত হয়। ইংরেজি প্রভাব বিস্তৃত হলে ভারতীয় শিক্ষা ও পাশ্চাত্য শিক্ষার সংঘর্ষের ফলে বাংলায় এক নতুন চিন্তাস্রোতের ধারা পরিলক্ষিত হয়। রাজা রামমোহন রায় হতেই এর সূচনা। তিনি ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে এসে ফরাসি বিপ্লব ও তার অগ্রগামী দূত *এনসাইক্লোপিডিস্টদের* (encyclopedist)[১৮] ভক্ত হন।[১৯] রাজা রামমোহন রায় তাঁর সময়ে দিল্লীর নামমাত্র বাদশাহকে কেন্দ্র করে বিদেশি ইংরেজ শাসনের উচ্ছেদের জন্য একটি সর্বভারতীয় বৈপ্লবিক পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছিলেন[২০] বলে জানা যায়। কিন্তু তিনি সেই বৈপ্লবিক মতবাদ রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রচার করেন নাই;কারণ বাংলায় তখন রাজনৈতিক চর্চা ছিল না। তিনি তা ধর্ম ও সামাজিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। তবে ঐ বৈপ্লবিক মতবাদের প্রতিধ্বনি ব্রাহ্মসমাজে পৌঁছায় ও তার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ব্রাহ্মসমাজ পরে এতোটা চরমপন্থি হয় যে,তারা সনাতন সমাজ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পরে।[২১] অনেকে আশ্চর্যান্বিত হবেন যে, ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব বাংলার বৈপ্লবিক সমিতির প্রথম সভ্যদলের অনেকের ওপর বিশেষভাবে ছিল। তৎকালে নামকরা বিপ্লবীদের মধ্যকার অনেকেই ব্রাহ্মসমাজ ভুক্ত ছিলেন বলে জানা যায়।[২২] বর্তমান ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণ করলে এটি পরিলক্ষিত হয় যে, যেসকল প্রদেশে ব্রাহ্মসমাজ, প্রার্থনাসমাজ বা আর্যসমাজ যে নতুন চিন্তা ও চেতনা প্রচার করেছিল, সেইসব প্রদেশে জাতীয় আন্দোলন ও স্বাধীনতা স্পৃহা আজ বিশেষ প্রবলভাব ধারণ করেছে।

বাঙালির বিপ্লবের লক্ষণ বা স্বরূপ সমন্ধে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বলেছেন, গুপ্তসমিতির রাজনৈতিক ডাকাতি, ব্যায়ামাগার সংস্থাপন, গুপ্তভাবে বিপ্লবের বাণী প্রচার, রাজনৈতিক হত্যা, গণসঙ্গ হতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নতা, কেবল *ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীশ্রেণির* দ্বারা আন্দোলনের পুষ্টিসাধন, কোন নিদিষ্ট *রাজনৈতিক প্রণালীর* অভাব। বিপ্লবীদের কেবলমাত্র রাজনৈতিক বিপ্লব চেষ্টার পর্যবসান, চিন্তাক্ষেত্রে *জড়তার* অবস্থা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপ্লবসাধন প্রক্রিয়া থেকে দূরে থাকা। বিপ্লবের *সামাজিক ও অর্থনৈতিক* প্রোগ্রামের অভাব ইত্যাদি। যদিও ব্রাহ্মসমাজ ও তৎপূর্ব আন্দোলনাদি বাংলায় নতুন আলো এনেছিল। মৌখিকভাবে গান গেয়ে বেশিরভাগ বাঙালি রাজনীতিবিদগণই বিপ্লবীদের অনুপ্রাণিত করতেন। তাছাড়া সহচরকে সাহস দেবার জন্য বিপ্লবীরা যেরূপ **'ক্লৈব্যং-মাস্ম-গমঃ-পার্থ'**[২৩] উপদেশদান করতেন, তদ্রুপ

আত্মোৎসর্গ করার জন্য **'ন-হন্যতে- হন্যমানে-শরীরে'**[২৪] তত্ত্বজ্ঞানে তাদের নৈতিক তেজ আনয়ন করতো।[২৫]

পাশ্চাত্যশিক্ষার ফলশ্রুতিতে বাংলায় বিশেষভাবে স্বাধীনতার স্পৃহা জাগ্রত হয়।পূর্বতন বাংলা সাহিত্যে এর সত্যতা দৃশ্যমান হবে। বাংলায় ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে অনেকবারই বৈপ্লবিক গুপ্তসমিতি স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু স্বাধীনতার স্পৃহা সর্বজনীন না হওয়া ও অন্যান্য কারণে এসব সমিতি বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। তৎকালে শিক্ষিত বাঙালি মাত্রই স্বাধীনতা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর বন্ধুদের এমতানুযায়ী কাজ করতে উৎসাহিত করতেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়।[২৬] এভাবে বাংলায় তথা ভারতে ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত বৈপ্লবিক কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত পরিলক্ষিত হয়। বিপ্লবের ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যায়,পৃথিবীর সকল বিপ্লব মধ্যবিত্ত শ্রেণির নেতৃত্বেই সংগঠিত হয়েছে।

বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিপ্লব প্রচেষ্টা দু'টি ধারায় প্রবাহিত।[২৭] ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহ তথা প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম দমিত হওয়ার পর থেকেই নানাবিধ শোষণ বঞ্চনার ফলে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির মনে বিদ্রোহ ও বিপ্লব প্রচেষ্টার স্বপ্ন বিচ্ছিন্নভাবে লালিত হয়ে এসেছে। পরবর্তীকালে সেই স্বপ্ন নানা ক্রম ও পরিবেশে বাস্তবরূপ-গ্রহণ করেছে। উনিশ শতকের শেষভাগে ব্রিটিশের কবল থেকে ভারত মুক্তির পরিকল্পনা তরুণ চিত্তকে ব্যাকুল করে তোলে।[২৮] এসময়ে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির যুবকদের মধ্যে রাজনারায়ণ বসুর মনে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে দেশের মুক্তিঅর্জন চিন্তার উন্মেষ ঘটে। তিনি ভারতীয় অতীত ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবন,বিদেশী প্রভাব ও দেশীয় হিন্দু সমাজের জীবনের জয়গানের অনুভূতি প্রত্যক্ষ করে বাংলায় বৈপ্লবিক চিন্তার অনুকূল পটভূমি তৈরি করেন। ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত 'আর্যদর্শন' বাংলা মাসিকপত্রে প্রকাশিত রচনা সমূহ বাংলার যুবকদের বৈপ্লবিক চিন্তায় উদ্দীপ্ত করে।[২৯] মাৎসিনি ও ইতালির স্বদেশ প্রেমিকদের নিকট থেকে তাঁরা ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন ভারতের চিন্তায় অনুপ্রাণিত হন।[৩০] ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় বিপ্লবী গুপ্ত সমিতি গঠিত হয়।[৩১] কলকাতা থেকে বৈপ্লবিক চিন্তার সে বাণী মহারাষ্ট্রের পুণা শহরে নিয়ে যান চাপেকার-ভ্রাতৃবৃন্দ।[৩২] অত:পর ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে মহারাষ্ট্রে বিপ্লবী গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন বাসুদেব বলবন্ত ফাদকে। সেখানে তিনি বিপ্লবের বাণী জোরালোভাবে প্রচার শুরু করেন।

এদিকে ইংরেজ গোয়েন্দা দপ্তর একগোপন প্রতিবেদনে জানায়,মাতৃভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্র গুলো ভারতে ইংরেজ শাসনের চরম বিরোধিতা করছে। ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে বড়লাট লর্ড লিটন মাতৃভাষায় প্রকাশিত সকল সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করার উদ্দেশে ***ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট*** নামে এক দমনমূলক

আইন পাস করেন।[৩৩] ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় গড়ে ওঠা জাতীয়তাবাদী সংগঠন ভারতসভা সংবাদপত্রের কণ্ঠ রোধকারী *ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্টের* বিরুদ্ধে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দের ১৬ এপ্রিল ভারতব্যাপি প্রতিবাদ দিবস পালন করে।[৩৪] এভাবে ইংরেজদের দমননীতি,বাঙালির জাতীয় চেতনাকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করার পরিবর্তে ভারতব্যাপি জাতীয়তাবাদী চেতনাবোধ জাগ্রত করে। ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দের ০৯ ফেব্রুয়ারি প্রবর্তিত ইলবার্ট বিলকে কেন্দ্র করে এই ঘাত-প্রতিঘাত তীব্রতর হয়ে ওঠে।

ইংরেজ-শাসনও দমননীতির বিরূদ্ধে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির দেশব্যাপী প্রতিবাদের সূচনায় অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজ অফিসার *অ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম* চিন্তিত হন। তারই উদ্যোগে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের বোম্বাই শহরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে সংগঠনটি ইংরেজ সরকারের নিকট আবেদন নিবেদনের মাধ্যমে বিভিন্ন দাবি-দাওয়া আদায়ের নীতিগ্রহণ করে।[৩৫] ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেসের এহেন আবেদন-নিবেদন নীতির তীব্র সমালোচনা করে বরিশালের অশ্বিনীকুমার দত্ত কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনকে তিন দিনের তামাশা বলে মন্তব্য করেন। এই মন্তব্যের মাধ্যমে কংগ্রেসের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী একটি ধারার প্রথম উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

বাংলার ক্রমবর্ধমান জাতীয় মুক্তির চেতনা ব্রিটিশসরকারকে ক্রমে উদ্বিগ্ন করে তোলে। এহেন আন্দোলন দমন ও প্রশাসনিক সুবিধার্থে লর্ড কার্জন ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে *বাংলা ভাগ* (Partition of Bengal) করে 'পূর্ববাংলা ও আসাম' নামে নতুন একটি প্রদেশ গঠন করেন।[৩৬] এই বাংলা ভাগের বিরুদ্ধে জাতীয় কংগ্রেস তথা বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির নেতৃবৃন্দ তীব্র গণআন্দোলন গড়ে তোলেন যা *বঙ্গভঙ্গ*[৩৭] *আন্দোলন* (Anti-Partition movement of Bengal) নামে পরিচিতি পায়।[৩৮] এটি ক্রমে স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনে পর্যবসিত হয়।

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলা ভাগকে কেন্দ্র করে স্বদেশী আন্দোলন প্রধানত রাজনৈতিক কারণে গুরুত্ব লাভ করে এবং গণ-আন্দোলনের রূপ লাভ করে। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ বাংলা বিভাজনকে রদ করার প্রত্যয়ে ব্রিটিশ সরকারের ওপর চাপপ্রয়োগের কৌশল হিসেবে স্বদেশী আন্দোলনের আদর্শগ্রহণ করে ব্রিটিশ দ্রব্য বর্জন করে দেশীয় দ্রব্য ব্যবহারের আহ্বান জানায়। এদিকে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ১৩ জুলাই কলকাতার 'সাপ্তাহিক সঞ্জীবনী পত্রিকার' সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র সর্বপ্রথম *বয়কট* (Boycott) আন্দোলনের ডাক দেন এবং অল্প সময়ের মধ্যে স্বদেশী আন্দোলন সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। এই স্বদেশী আন্দোলনের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য তাৎক্ষণিকভাবে পূরণ হয়নি। এ আন্দোলন চলা সত্ত্বেও ব্রিটিশ সরকার বাংলা

ভাগকে টিকিয়ে রাখার সিদ্ধান্তে অটল থাকে। ব্রিটিশ সরকারের এ অনঢ় মনোভাবের ফলে 'স্বদেশী আন্দোলনে নতুন গতিবেগ সঞ্চার করে এবং বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণি 'বন্দে মাতরম' সঙ্গীত গেয়ে সশস্ত্র বৈপ্লবিক পন্থায় প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথে অগ্রসর হয়।

স্বদেশী আন্দোলনের সূচনা হওয়ার পর বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে যেসকল সমিতি গড়ে ওঠে তা হলো- কলকাতার ডন সোসাইটি, ছাত্রভান্ডার, স্বদেশ সেবক সমিতি, যুবক সমিতি, ময়মনসিংহের শক্তি সমিতি, সাধনা সমিতি, ফরিদপুরের ব্রতি সমিতি, বরিশালের স্বদেশবান্ধব সমিতি, চব্বিশপরগণার চিংড়িপোতায় স্বাস্থ্যকেন্দ্র, সুপ্রদ সম্মিলনী, আরবেলিয়ার একটি সমিতি, ঢাকার মুক্তিসংঘ, ঢাকা অনুশীলন সমিতি, মাদারিপুর সমিতি, রংপুরের শক্তি সমিতি অন্যতম।[৩৯] অবশ্য বাংলা বিভাজনের পূর্বেই ময়মনসিংহের সুহৃদ সমিতি, কলকাতার আত্মোন্নতি সমিতি, অনুশীলন সমিতি, জ্যোতিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ওরফে বাঘাজ্যোতিনের[৪০] আখড়া, বালিগঞ্জে সরলাদেবির আখড়া, রামবাগান অঞ্চলে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস্ ক্লাব গড়ে উঠেছিল। এছাড়া অতীন বসু ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে মহেশালয় এবং ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে ভারত ভান্ডার নামে দুটি সমিতি গঠন করেন।[৪১] অন্যান্য সংগঠনের মধ্যে ছিল আহিরীটোলায় ললিতমোহন ঘোষালের শক্তিসমিতি, মধ্য কলকাতায় ইন্দ্রনাথ নন্দীর ছাত্রভান্ডার, ভবানীপুরে কবি কালীপ্রসন্ন কাব্য বিশারদের স্বদেশ সেবক সমিতি, কলকাতার ব্রতি সমিতি, শচীন্দ্রনাথ বসু ও কৃষ্ণকুমার মিত্রের অ্যান্টিসার্কুলার সোসাইটি, নারকেলডাঙ্গা অঞ্চলের সাধনা সমিতি, কালীঘাটের সন্তান সম্প্রদায় প্রমূখ সংগঠন গড়ে উঠে। এ সকল সমিতির সদস্যদের গোপনে স্বশস্ত্র বিপ্লবের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হতো।

মহারাষ্ট্রের লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক এ বিপ্লববাণীর একজন শক্তিমান সমর্থক।[৪২] সে বৈপ্লবিক বাণী নিয়ে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে গুজরাটের বরোধা কলেজের অধ্যক্ষ অরবিন্দকুমার ঘোষ কলকাতায় হাজির হন। বাংলায় এসে তিনি প্রত্যক্ষ করেন; শ্রী চৈতন্যদেব, রাজা রামমোহন রায়, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, স্বামী বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, রমেশচন্দ্র দত্ত, রাজনারায়ণ বসু, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার বাঙলায় বিপ্লবের অনুকূল জমিন তৈরি করে রেখেছেন।[৪৩] অরবিন্দকুমার ঘোষ পেলেন লোকমাতা নিবেদিতার অকুণ্ঠ সহযোগিতা ও পরামর্শ। এসময় প্রমথনাথ মিত্র, বিপিনচন্দ্র পাল, স্বামী ব্রহ্মানন্দ উপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, প্রফুল্লচন্দ্র, জগদীশচন্দ্র বসু,রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিশিরকুমার ঘোষ, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখের সহায়তা ছাড়াও প্রতিভাদীপ্ত ও আত্মবিলিয়নে উন্মুখ এক বিপ্লবী তরুণদলের অকুণ্ঠ সমর্থন লাভ করেন।

পূর্ণস্বাধীনতা দাবি করে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য তাঁরা বিদেশি শক্তির বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত ও দলবদ্ধ সশস্ত্র বৈপ্লবিক সংগ্রামের প্রত্যক্ষ ও গুপ্ত কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করে।[৪৪] বাংলার স্কুল-কলেজগুলো হয়ে উঠে সে বিদ্রোহের কেন্দ্রস্থল। শিক্ষকগণ কেন্দ্র পরিচালক এবং বৈপ্লবিক মন্ত্রের প্রচারক রূপে আবির্ভূত হন।[৪৫] কলকাতায় ১৯০২ খ্রিস্টাব্দের ২৪ মার্চ অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠিত হলে প্রমথনাথ মিত্র এর সভাপতি, চিত্তরঞ্জন দাশ এবং অরবিন্দকুমার ঘোষ সহসভাপতি, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর কোষাধ্যক্ষ[৪৬] এবং সতীশচন্দ্র বসু সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব লাভ করেন।[৪৭] গুজরাটের বরোদায় অবস্থানকারী অরবিন্দকুমার ঘোষের নির্দেশে তাঁর ভাই বারীন্দ্রকুমার ঘোষ এবং যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতায় এসে গুপ্তসমিতি প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং সবাই মিলে প্রমথনাথ মিত্র প্রতিষ্ঠিত অনুশীলন সমিতিতে যোগ দেন।[৪৮] এই সমিতির প্রথম কার্যালয় ছিল সকিয়া স্ট্রীট থানার নিকট এক ভাড়াটে বাড়িতে। কিন্তু পরে এটি ৪৯নং কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে স্থানান্তর করা হয়। শারীরিক শক্তিবৃদ্ধির জন্য ব্যায়াম, লাঠিখেলা প্রভৃতি ছাড়াও শিক্ষা, সংস্কৃতি ও চরিত্র গঠনের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেয়া হতো।[৪৯] ম্যাটসিনী, গ্যারিবল্ডি প্রমূখ জন নায়কদের জীবনী, ইংরেজ ঔপনিবেশিক শক্তি ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিদ্রোহ, ইউরোপে নানা জাতির স্বাধীনতালাভ বা অত্যাচারী শাসকের দমন-পিড়নের বিরুদ্ধে মুক্তিসংগ্রাম প্রভৃতি ঐতিহাসিক বিষয় সমন্ধে আলোচনা হতো। সখারামগণেশ দেউস্কর ইংরেজ আমলে আর্থিক দুরবস্থা বুঝানোর জন্য রীতিমত বিদ্যালয়ের মতো ক্লাসে বক্তৃতা দিতেন। তাঁর লেখা দেশের কথা নামক গ্রন্থটি সে সময় খুবই জনপ্রিয় ছিল। প্রমথনাথ মিত্র ইতিহাস এবং ভগিনী নিবেদিতাও মাঝে মাঝে ক্লাসে বক্তৃতা করতেন।[৫০] এছাড়া তরুণ ব্যারিস্টার সুরেন হালদার, রজত রায় এবং প্রভাতকুসুম রায় চৌধুরী সহ অনেকেই এখানে এসে সমিতির সদস্যদের সাথে দেশের বিষয়ে আলোচনা করতেন। ফলশ্রুতিতে দ্রুতই অনুশীলন সমিতির খ্যাতি ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধিপায়। কলকাতার বাইরে নানাস্থানে অনুশীলন সমিতির শাখা সমিতি গঠিত হয়। শাখাগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধি লাভ করে ঢাকা অনুশীলন সমিতি।

প্রমথনাথ মিত্র (পি.মিত্র) ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় অনুশীলন সমিতির শাখা প্রতিষ্ঠা করে পুলিনবিহারী দাশকে পরিচালক[৫১] এবং আনন্দ চক্রবর্তীকে অধিনায়ক নিয়োগ করেন।[৫২] তরুণ ও যুবকদের নিয়ে গঠিত এ সমিতি শৃঙ্খলা, সাহসিকতা, স্বদেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। পুলিনবিহারী দাশের নেতৃত্বে ঢাকা অনুশীলনের বৈপ্লবিক কার্যক্রম অতিদ্রুত বাংলায় এবং উত্তর ভারতে ছড়িয়ে পড়ে।[৫৩] অনুশীলন সমিতির আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে যা জানা যায় তা হলো-অনুশীলনের নেতারা এরূপ একটি আদর্শ সমাজ কল্পনা করেছিলেন যে,সমাজের প্রত্যেকটি নরনারীর মনুষত্বের পূর্ণবিকাশ হবে; এই সমাজে নিরক্ষর, দুর্নীতিপরায়ণ, চরিত্রহীন ও ভীরুলোক থাকতে পারবেনা। মানবসমাজ হতে ধন-বৈষম্যসহ সামাজিক, সাম্প্রদায়িক, প্রাদেশিক বৈষম্য দূর করে সকল মানুষের

মধ্যে সাম্য নিশ্চিত করতে হবে। কেবলমাত্র একটি জাতীয় সরকার এগুলো নিশ্চিত করতে পারে। সেজন্য পরাধীনতার বিরুদ্ধে অনুশীলনের বিদ্রোহ ঘোষণা, অনুশীলন চায় ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা।[৫৪] স্বার্থসিদ্ধির উপায় হিসেবে এ সমিতি ডাকাতি ও সরকারি কর্মকর্তা হত্যার কৌশল বেছে নেয়।

অরবিন্দ কুমারঘোষ ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে যখন *ভবানী মন্দির* পুস্তিকা প্রকাশ করেন ততদিনে বাংলা বিভাগ ঘোষণার বিরুদ্ধে বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি উত্তপ্ত হতে শুরু করেছে।[৫৫] প্রতিষ্ঠার পর থেকেই অনুশীলন সমিতি অনেক ক্ষয়ক্ষতির মধ্যদিয়ে অগ্রসর হয়। যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই সমিতি থেকে বিতাড়িত হলে বাংলার সশস্ত্র বৈপ্লবিক আন্দোলনের যথেষ্ট ক্ষতি হয়।[৫৬] এদিকে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের দৈনিক পত্রিকা সন্ধ্যার জনপ্রিয়তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে[৫৭] বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ও অবিনাশ ভট্টাচার্য ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের ১৮ মার্চ কলকাতায় অনুশীলন সমিতির মুখপাত্র হিসেবে যুগান্তর পত্রিকা প্রকাশ করেন।[৫৮] ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত পত্রিকাটির সম্পাদক হন।[৫৯] লেখকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবব্রত বসু, অবিনাশ ভট্টাচার্য, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, কিরণচন্দ্র মুখার্জী প্রমূখ। পত্রিকাটিতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় বৈপ্লবিক বাণী প্রকাশিত হতে থাকে। ঔপনিবেশিক সরকার বন্ধ করে দেয়া সত্ত্বেও পত্রিকাটি গোপনে প্রকাশিত হতে থাকে।

যুগান্তর পত্রিকা প্রকাশিত হওয়ার পর বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ও তাঁর সমর্থকদের সাথে অনুশীলন সমিতির সভাপতি প্রমথনাথ মিত্রের মতপার্থক্য দেখা দেয়।[৬০] বারীন্দ্রকুমার ঘোষ এবং তাঁর সহযোগিরা প্রমথনাথ মিত্রের লাঠিখেলা-ব্যায়াম পদ্ধতির ওপর আস্থা হারাতে থাকেন। ক্রমশ যুগান্তর পত্রিকাকে কেন্দ্র করে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ এবং তাঁর সহযোগিরা স্বতন্ত্রভাবে সশস্ত্র বৈপ্লবিক পথগ্রহণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন।[৬১] ইতোমধ্যে ইউরোপে নির্বাসিত রুশ বিপ্লবীদের নিকট থেকে বোমা তৈরির কলাকৌশল রপ্তকরে হেমচন্দ্র কানুনগো ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারিতে বিদেশ থেকে ফিরে উল্লাসকর দত্তসহ অনুশীলন সমিতিতে যোগ দেন। কলকাতার মানিকতলায় এক বাগান বাড়িতে বোমা তৈরির সাথে বিপ্লবীদের অস্ত্র মহড়া শুরু হয়।[৬২] আলীপুর ষড়যন্ত্র মামলাকে কেন্দ্র করে মতান্তর আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় যুগান্তর সংশ্লিষ্টরা পৃথকভাবে সশস্ত্র বৈপ্লবিক তৎপরতা শুরু করে;এর মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ এবং তাঁর সহযোগিরা বাংলায় বোমা এবং বন্দুকের প্রবর্তন শুরু করেছিলেন।

১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে সুরাট কংগ্রেসে বিশৃঙ্খলার পর বাংলার বৈপ্লবিক সমিতিগুলোতে নতুন উৎসাহের সৃষ্টি হয়। অরবিন্দকুমার ঘোষ এসময় তার সহযোগিদের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি নিতে বলেন। তিনি নতুন আগত তরুণদের সশস্ত্র বৈপ্লবিক কর্মে দীক্ষিত করার ওপর জোর দেন।[৬৩] ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের

মধ্যভাগে যুগান্তরের সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে রাজদ্রোহ প্রচারের অভিযোগ করা হলে অরবিন্দের নির্দেশে তিনি অভিযোগ স্বীকার করেন। তাঁকে এক বছরের কারাদন্ড দেয়া হয়।[৬৪] সন্ধ্যার সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধবও গ্রেফতার হন; তবে বিচারের পূর্বেই তাঁর মৃত্যু ঘটে।[৬৫] এদিকে বিপিনচন্দ্র পালের সম্পাদনায় *বন্দেমাতরম্* পত্রিকায় রাজদ্রোহীমূলক প্রবন্ধগুলোতে রচয়িতার নাম উল্লিখিত না থাকলেও পুলিশের ধারণা সেগুলোর রচয়িতা অরবিন্দকুমার ঘোষ। এমতাবস্থায় চিফ-প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট মি. কিংস্‌ফোর্ডের আদালতে বিপিনচন্দ্র পালকে উক্ত প্রবন্ধগুলো রচয়িতার পরিচয় জানতে চাওয়া হলে তিনি উত্তর না দিয়ে বলেন; I have conscientious objection against taking part in a prosecution which i believe to be unjust and injurious to the cause of popular freedom and interest of public. I have objections to swear in these proceedings. I refuse to answer any question in connection with case.[৬৬] এতে আদালত অবমাননার দায়ে ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের ২০ আগস্ট ম্যাজিস্ট্রেট মি. কিংসফোর্ডের রায়ে বিপিনচন্দ্র পালের ছ'মাসের কারাদন্ড দেওয়া হয়।[৬৭] এই সকল কারণে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ এবং তাঁর সহযোগিদের পরিকল্পনায় ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের ৩০ এপ্রিল বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্লকুমার চাকি বিহারের মুজাফ্‌ফরপুরে বোমা মেরে ম্যাজিস্ট্রেট মি.কিংসফোর্ডকে হত্যা করতে যেয়ে ভুলক্রমে বোমা নিক্ষেপ করলে মি. কেনেডির স্ত্রী ও কন্যা নিহত হয়।[৬৮] ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্লকুমার চাকি বিহারের উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার প্রাক্কালে বিপ্লবী অরবিন্দকুমার ঘোষ তাঁদের আর্শীবাদ করেন বলে জানা যায়। এই ঘটনায় ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে আলীপুর ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হলে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ এবং তাঁর সহযোগিদের সশস্ত্র বৈপ্লবিক কার্যকলাপের অবসান ঘটে।

১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের ৩০ এপ্রিল বিহারের মুজাফ্‌ফরপুর কিংস্‌ফোর্ড হত্যাপ্রচেষ্টার সূত্রধরে ইংরেজ সরকার ২১ মে আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে।[৬৯] ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের ১৩ জুলাই ঘোষিত রায়ে ১১আগস্ট ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয় এবং **'একবার বিদায় দে মা, ঘুরে আসি'**[৭০] গানটি বাংলার শহরে-গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে; গণমানুষের হৃদয়-মনকে বিগলিত করে। এদিকে দেশে সশস্ত্র বৈপ্লবিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি পাওয়ায় পুলিনবিহারী দাশসহ ৫৫ জনকে গ্রেফতার করে সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যম,ডাকাতি ও মানুষ হত্যার অভিযোগে ১৯১০ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে ঢাকা ষড়যন্ত্রমামলার বিচার আরম্ভ হয়।[৭১] বিচারে পুলিনবিহারী দাশের সাতবছরের কারাদন্ড এবং অন্যদের বিভিন্ন মেয়াদে সাজা হয়।[৭২] বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির এহেন বৈপ্লবিক আন্দোলনের প্রচন্ডতায় ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের ১২ডিসেম্বর এক ঘোষণায় বাংলা বিভাগ রদ করা হয়। কিন্তু তবু বৈপ্লবিক আন্দোলন থামেনি।

অপরদিকে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ গঠিত হয় এবং এ দলটি বাংলা বিভাগকে সমর্থন করে।[৭৩] কিন্তু ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে বাংলা বিভাগ রদ করা হলে মুসলিম লীগও ব্রিটিশ বিরোধীতায় অগ্রণী হয়।[৭৪] ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন এবং স্ব-শাসনের দাবি আদায়ের প্রত্যয়ে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে লক্ষ্ণৌ চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে সম্পর্কোন্নয়নের প্রচেষ্টা চালায়। ইতোমধ্যে ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের ২৮ জুলাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ব্রিটিশদের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের বিনিময়ে ভারতের স্ব-শাসন আদায়ের পথ সহজ হবার প্রত্যয়ে জাতীয় কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকারকে সমর্থন দেয়।

এদিকে ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় পুলিনবিহারী দাশ সাতবছরের কারাদন্ড হলে সমিতির প্রধান পরিচালকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন নগেন্দ্রনাথ দত্ত ওরফে গিরিজা বাবু।[৭৫] পর্যায়ক্রমে এই দায়িত্বভার মহারাজা ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, নরেন সেন, প্রতুল গাঙ্গুলি, অমৃত হাজরা প্রমুখ বিপ্লবীগণ নিষ্ঠার সাথে পালন করেন। এসকল নেতৃবৃন্দ দেশের মঙ্গলের স্বার্থে অপরাপর বৈপ্লবিক দলগুলোর সাথে মিলিত হয়ে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করে জানা যায়।

বাংলার প্রথম ও মূল গুপ্তসমিতি হলো কলকাতা অনুশীলন সমিতি। এ সমিতি হতে পরবর্তীতে ঢাকা অনুশীলন,যুগান্তর ও উত্তরবঙ্গ সমিতি গঠিত হয়। এ তিনটি সমিতি ক্রমশ বিস্তার লাভ করে সমগ্র বাংলাকে বৈপ্লবিক স্বাধীনতা সংগ্রামের বিস্তৃত ক্ষেত্রে পরিণত করে।[৭৬] এদিকে ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে আলীপুর ষড়যন্ত্র মামলার পর ডিসেম্বর মাসে 'Criminal Law Amendment Act of 1908' আইন বলে ব্রিটিশ সরকার বাংলায় অনুশীলন সমিতি নিষিদ্ধ ঘোষণার সাথে সাথে সবশাখা পৃথক হয়ে যায়। একই সাথে কলকাতার আত্মোন্নতি সমিতি, সতিশচন্দ্র বসু প্রতিষ্ঠিত এ দলটি বিপিন বিহারীর দল নামে পরিচিতি পায়, অশ্বিনীকুমার দত্তের বরিশালের স্বদেশবান্ধব সমিতি,ময়মনসিংয়ের হেমেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরীর সাধনা সমিতি, ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর সুহৃদ সমিতি ও ফরিদপুরের অম্বিকাচরণ মজুমদারের ব্রতি সমিতি নিষিদ্ধ করা হয়। অনুশীলন সমিতি বন্ধ করে দেয়ায় অনেকের মনে ক্ষোভের সঞ্চার হয়। আলীপুর মামলায় অরবিন্দকুমার ঘোষ প্রমুখ শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের গ্রেফতার জনিত শূন্যতায় যুগান্তর দলের *নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য*, জ্ঞান মিত্র, সুধীররায় চৌধুরী, পাবনার অবিনাশ চক্রবর্তী ও অন্নদা কবিরাজের পাবনা সম্মিলনী প্রমুখ গুপ্তসমিতির নেতৃবৃন্দ এ অবস্থায় চুপচাপ বসে না থেকে জ্যোতিন্দ্রনাথ মুখপাধ্যয়ের (বাঘাজ্যোতিন)[৭৭] সাথে যোগাযোগ ক্রমে তাঁকে ব্রিটিশ সরকারকে উপযুক্ত শায়েস্তা করার নিমিত্তে নেতৃত্বগ্রহণের প্রস্তাব দেওয়া হয়। এতে তিনি সম্মতি জ্ঞাপন করেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়।

১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে অনুশীলন সমিতি নিষিদ্ধ করা হলে সমিতির নাম পরিবর্তন করে 'Bengal Youngmen's Zamindary Co-Operative Society' নামকরণ এবং জজ সারদাচরণ মিত্রকে এর সভাপতি করা হয়।বাহ্‌রার পর পুনরায় ডাকাতির অপরাধে প্রমথনাথ মিত্র ঢাকা অনুশীলন থেকে পুলিনবিহারী দাশকে বহিষ্কার করেন।[৭৮] প্রকৃতপক্ষে মুরারিপুকুরের গুপ্তআড্ডায় অস্ত্রসংগ্রহ,বিপ্লবাত্মক কর্মপ্রয়াস বিশেষত; মুজাফ্‌ফরপুর অভিযান বারীন ঘোষের নেতৃত্বেই সংগঠিত হয়। এতে সতীশচন্দ্র বসু এবং প্রমথনাথ মিত্রের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক দেখা যায়না। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দের ২৩ সেপ্টেম্বর প্রমথনাথ মিত্রের মৃত্যুর সাথে সাথে সংস্থা হিসেবে কলকাতা অনুশীলন সমিতি ক্রমশঃ স্তিমিত হয়ে পড়ে এবং কখনো এই সমিতির কর্মপ্রবণতা দৃশ্যমান হয়নি। কিন্তু মূল সমিতির শাখা, ঢাকা অনুশীলন সমিতি সুবিস্তৃত হয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে অনুশীলন সমিতি বলতে ঢাকা অনুশীলন সমিতিকেই বুঝায়। ঢাকা অনুশীলন সমিতিই পূর্ব ও উত্তর বাংলায়, কলকাতায় এবং বাংলার বাইরে আসাম, বিহার, পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ এবং পুনা শহরেও বৈপ্লবিক কর্মকান্ড সম্প্রসারণ করে।[৭৯] পুলিনবিহারী দাশ, নগেন্দ্রনাথ দত্ত ওরফে গিরিজা বাবু, মহারাজা ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, মাখনলাল সেন, প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলি, অমৃত হাজরা, নরেন সেন প্রমুখ বিপ্লবীগণ এ দলের পরিচালক ছিলেন। পূর্ব বাংলাতেই এ দলের প্রায় ৫০০ এর অধিক শাখা ছিল বলে জানা যায়।

ইতোমধ্যে জ্যোতিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের (বাঘাজ্যোতিন) নেতৃত্বে বৈপ্লবিক কর্মকান্ড গতি পায়। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের জুনে বর্ধমান এবং মেদিনীপুর জেলায় প্রলয়ঙ্করী বন্যায় বিপুল প্রাণ ও সম্পত্তির ক্ষতি হলে বিভিন্ন অঞ্চলের বিপ্লবী নেতারা ত্রাণকার্যে অংশগ্রহণ করেন। জ্যোতিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘাজ্যোতিন)ও এসময় ত্রাণকার্যে অংশগ্রহণ এবং দুর্যোগ পীড়িতদের সেবার অন্তরালে গোপন বৈঠকে বিপ্লবী নেতাদের ইউরোপের আসন্ন যুদ্ধের আভাস দেন। যুদ্ধ বাধলে সেই সুযোগে সর্বভারত ব্যাপি সশস্ত্র বিপ্লব সংগঠিত করার পরিকল্পনা নেতৃবৃন্দকে অবহিত করেন।[৮০] এভাবে সকলকে একত্রিত করে এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক দলগুলির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে সমগ্র বাংলার সশস্ত্রদল গুলিকে তিনি তাঁর একক কর্তৃত্বে নিয়ে আসেন।[৮১] তাঁর গতিশীল নেতৃত্বে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানদের সহায়তায় দেশব্যাপী এক বিদ্রোহ আয়োজন হয়। ইতোপূর্বে বাংলাদেশের সকল বিপ্লবী দলগুলোকে এক সংগঠনে শামিল করার চেষ্টা হয়। বাংলার অন্যান্য দল সে আহ্বানে সাড়া দিলেও ঢাকা অনুশীলন সমিতি ও কলকাতার বিপিন গাঙ্গুলীর দল এ উদ্যোগের বাইরে থাকলেও তারা পুরোপুরি সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেয়। কার্যক্ষেত্রে সক্রিয় দলগুলো সকলেই এক সংগঠনের মধ্যে এসে যায়। বরিশাল দলের নিজস্ব সংগঠন, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ফরিদপুর, শ্রীহট্ট জেলায়।[৮২] ময়মনসিংহের মণি চৌধুরী ও ক্ষিতিশ চৌধুরীর আগ্রহে ও চেষ্টায় ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে বরিশাল দলের নরেনঘোষ চৌধুরী ও সত্যেন্দ্রচন্দ্র

মিত্র ময়মনসিংহের সাধনা সমিতির প্রধান হেমেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরীর সাথে আলোচনা করে একদলে মিলিত হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন বলে জানা যায়।

পাবনার অবিনাশ চক্রবর্তীর আগ্রহে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত যতীন রায়ের দলের সঙ্গে বরিশাল দলের প্রায় একসংস্থায় অন্তর্ভূক্ত হওয়ার মতো ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হয়। এছাড়া ফরিদপুরের পূর্ণচন্দ্র দাশের দল, বরিশাল দলের পূর্বে বাঘা জ্যোতিনের দলের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল বলে উল্লেখ পাওয়া যায়।[৮৩] কার্যত জ্যোতিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘাজ্যোতিন) এই মিলিত দলের নেতা রূপে আবির্ভুত হন। যদিও ভোটের মাধ্যমে তিনি নেতা হননি; অপরিমেয় ত্যাগই তাঁকে ঐপদে বরণ করে নেয়।[৮৪] বিপ্লবী মনোরঞ্জন গুপ্ত উল্লেখ করেছেনে, এই দলগুলো মূলত কতগুলো উপদলের সমষ্টি। তাঁদের নিজস্ব ইতিহাস ও ঐতিহ্য এবং পৃথক-পৃথক নেতৃত্ব ও শাসন-শৃঙ্খলা রয়েছে। কিন্তু দেশমাতৃকার বৃহত্তর প্রয়োজনে একযোগে কাজ করার প্রয়াসে তাঁরা একসূত্রে গ্রথিত হয়েছে। এই উপদল গুলো[৮৫] হচ্ছে:

এক. বরিশাল, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, শ্রীহট্ট জেলার শাখাসংগঠন নিয়ে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতি ও নরেনঘোষ চৌধুরীর নেতৃত্বে গঠিত বরিশাল দল,

দুই. ময়মনসিংহের হেমেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরী, সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, আনন্দ রায়, মণি রায়, ক্ষিতিশ চৌধুরী, নরেন চৌধুরী প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গের দ্বারা পরিচালিত সাধনা সমিতি।

তিন. উত্তর বঙ্গের যতীন রায়, যোগেশদে সরকার, কালী বাগচী, বাদল দাশগুপ্ত প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গের দ্বারা পরিচালিত যতীন রায়ের দল।

চার. ফরিদপুরের পূর্ণচন্দ্র দাশ, চিত্তপ্রিয় রায়, মনোরঞ্জন সেন, নীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গের দ্বারা পরিচালিত পূর্ণদাশের দল।

পাঁচ. ইদিলপুরের নিখিলগুহ রায়ের দল এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ছড়ানো জ্যোতিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘাজ্যোতিন), যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, অতুলকৃষ্ণ ঘোষ, হরিকুমার চক্রবর্তী, সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী, সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমূখ ব্যক্তিবর্গের নেতৃত্বাধীন জ্যোতিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের (বাঘাজ্যোতিন) দল।

১৯১৪-১৫ খ্রিস্টাব্দে জ্যোতিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের (বাঘাজ্যোতিন) নেতৃত্বে দলগুলি যখন সংঘবদ্ধ হয় তখন পর্যন্ত যুগান্তর নাম ব্যবহার পরিগৃহিত বা প্রচলিত হয় নাই। কিন্তু পরবর্তীতে এইসকল স্বতন্ত্রদলের অস্তিত্বের অসুবিধা অনুভুত হওয়ায় এবং একটি নির্দিষ্ট নামে দল গড়ে না উঠায় উদ্ভুত সমস্যা

মোকাবিলায় ব্যক্তির পরিবর্তে যুগান্তর নামে পরিচয় দানের সিদ্ধান্ত হয়।[৮৬] আরও অনেক পরে ঢাকার হেমচন্দ্র ঘোষের (১৮৮৪-১৯৮০) *বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স* (B.V.) এবং চট্টগ্রামের সূর্যকুমার সেনের দল এ সম্মিলিত স্রোতধারায় শামিল হয়[৮৭] বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। এছাড়াও রাধিকামোহন রায়ের ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস্ ক্লাব, সতিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ডন সোসাইটি, চন্দননগর-গোন্দলপাড়ার বসন্তকুমার প্রমুখের বান্ধব সম্মিলনী, হরিকুমার চক্রবর্তী প্রমূখের ২৪ পরগণা চিংড়িপোতা গ্রুপ, ইন্দ্রনন্দী ও নিখিলেশ্বর রায় মৌলিকের ছাত্রভান্ডার, কলকাতার ললিতমোহন ঘোষালের স্বদেশ সেবক সমিতি, নদীয়া রানাঘাটের শক্তি সমিতি এবং কলকাতা যুবক সমিতি প্রমূখ দল গুপ্ত সশস্ত্র বৈপ্লবিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করে বলে তথ্য পাওয়া যায়।

অভুতপূর্ব মনীষা, অশ্রুতপূর্ব যোগ ও সাধনা, প্রতিভা ও বোধ এবং অম্লান শৌর্য বলে অরবিন্দকুমার ঘোষ বাংলায় বৈপ্লবিক সংস্থার পত্তন করেন। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের স্বদেশী আন্দোলনের সদ্ব্যবহার করে বৈপ্লবিক আন্দোলনকে তুঙ্গে তোলেন।[৮৮] তাঁর পাশে ছিলেন লোকমাতা নিবেদিতা,বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, যতীন বন্দোপাধ্যায়, জ্যোতিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘাজ্যোতিন), উল্লাসকর দত্ত, দেবব্রত বসু প্রমুখ তরুণ যুবশক্তির সহায়ক সমাবেশ।[৮৯] প্রমথনাথ মিত্রের (পি.মিত্র) সঙ্গে অরবিন্দকুমার ঘোষের সাংগঠনিক যোগাযোগ সত্ত্বেও সশস্ত্র-বিপ্লবের চিন্তা তাঁর কর্মকান্ডে ছিল না। তিনি অনুশীলন সমিতিকে একটি ব্যায়াম ও শরীর চর্চা ও চরিত্র গঠনমুলক প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছিলেন।[৯০] সারা বাংলায় অনুশীলন সমিতির প্রসার ও কার্যক্রম বৃদ্ধির লক্ষ্যে এর প্রতিষ্ঠাতা ও সর্বাধিনায়ক প্রমথনাথ মিত্রের (পি.মিত্র) অভিপ্রায়ে পশ্চিমবঙ্গ অনুশীলন সমিতির সম্পাদকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন সতীশচন্দ্র বসু এবং ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে পুর্ববঙ্গে অনুশীলন সমিতির শাখা প্রতিষ্ঠা করে পুলিনবিহারী দাশের ওপর সম্পাদকের ভার ন্যস্ত করেন।[৯১] পুলিনবিহারী দাশ তাঁর অতুলনীয় দক্ষতাবলে অনুশীলন সমিতিকে অতি সঙ্গোপনে দেশব্যাপী বিপ্লবী সমিতিতে রূপান্তরিত করেন। এই বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠানের সর্বাধিনায়ক ছিলেন পুলিনবিহারী দাশ কিন্তু প্রমথনাথ মিত্রের (পি.মিত্র) সাথে উক্ত প্রতিষ্ঠানের কোনো সম্পর্ক ছিল না বলে জানা যায়।[৯২] 'বন্দেমাতরম্'[৯৩] কে বিপ্লবের মন্ত্র হিসেবে গ্রহণ করে তারা বৈপ্লবিক কর্মে নেমে পড়ে। তাদের এহেন কর্মের পক্ষে বিপ্লবীরা যে যুক্তি উত্থাপন করেন তা হলো; যে দেশে রাজশক্তি পশুবলকে সহায় করে প্রজাকে উৎপীড়ন করে, সে দেশে নৈতিক বলের সাহায্যে বিপ্লব বা রাজ পরিবর্তন করা অসম্ভব। সেখানে প্রজাকেও সহায়ক শক্তি হিসেবে পশুবলকে গ্রহণ করতে হবে।

প্রকৃতপক্ষে ভাইসরয় লর্ড কার্জন ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলা ভাগ কার্যকর করলে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণি প্রতিবাদে গর্জে উঠে এবং বাংলা বিভাজন বিরোধী বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন গড়ে তোলে।[৯৪] এই বঙ্গভঙ্গ

আন্দোলনের মাধ্যমে সশস্ত্র বৈপ্লবিক আন্দোলনের ধারা উত্তরোত্তর শক্তিশালী হয়ে উঠে।[৯৫] বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিপ্লব প্রচেষ্টাকে আমরা চারটি স্তরে ভাগ করতে পারি;

(ক) প্রথম স্তর ১৯০৫[৯৬] থেকে ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বা রাষ্ট্র-প্রতীক বা ব্যক্তি বিশেষ নিধন পর্ব ।

(খ) দ্বিতীয় স্তর ১৯১৪ থেকে ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাধ্যতামূলক সম্মুখ সংঘর্ষ এবং নতুনতর প্রস্তুতি পর্ব।

(গ) তৃতীয় স্তর ১৯৩০ থেকে ১৯৩৪ খিস্টাব্দ পর্যন্ত বা খন্ড অভ্যুত্থান পর্ব[৯৭] এবং

(ঘ) চতুর্থ স্তর ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বা বিপ্লব বা শেষ পর্ব।[৯৮]

বাঙালির প্রথম পর্বের বৈপ্লবিক কার্যক্রমে দুঃসাহসী যুবকেরা প্রয়োজনে ব্রিটিশ কর্মকর্তা ও তাদের স্বজন এবং তাঁবেদার তথা ভারতের শত্রুদের একটির পর একটি করে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। 'তাদের উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজকে ভীতকরা, দেশবাসীকে ভয়হীন করে তোলা; ইংরেজ শাসন না মানা।[৯৯] ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর এন্ড্রু হিন্ডারসন ফ্রেজার হত্যার প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়া সত্ত্বেও একই উদ্দেশ্যে ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী বিহারের মুজাফফরপুরের ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যার উদ্দেশ্যে বোমা নিক্ষেপ করে; কিন্তু ভুলক্রমে মিসেস কেনেডি ও তার কন্যা মিস কেনেডি হত্যাকান্ডের শিকার হয়।[১০০] এ হত্যাকান্ড থেকে শুরু করে ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের ২৩ ডিসেম্বর দিল্লিতে বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর ইশারায় ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জের ওপর বোমাবর্ষণ পর্যন্ত সকল বৈপ্লবিক কার্যক্রম প্রথম পর্বের আওতাভুক্ত হবে।

বাঙালির দ্বিতীয় পর্বের বৈপ্লবিক কার্যক্রমে দুঃসাহসী যুবকেরা শত্রুর বিরুদ্ধে সম্মুখ সমরে আবির্ভূত হয়। এসময় (১৯১৫) বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা বহুলাংশে বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রচুর অর্থের প্রয়োজন দেখা দেয়। বৈপ্লবিক নেতৃবৃন্দ পরামর্শক্রমে ডাকাতির সিদ্ধান্ত নেয় এবং ডাকাতির মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করতে থাকে।[১০১] ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের ০৯ সেপ্টেম্বর উড়িষ্যার বালেশ্বরে বুড়িবালাম নদীর তীরবর্তী চাষখন্ডের কাপ্তিপোদায় বাঙালি বিপ্লবী জ্যোতিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের (বাঘাজ্যোতিন) নেতৃত্বে বিপ্লবীদের সম্মুখ সংঘর্ষের ঘটনার মাধ্যমে **বাধ্যতামূলক সম্মুখ সংঘর্ষ** পর্বের সূচনা ঘটে।[১০২] ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে সিরাজগঞ্জ মহকুমার আটঘরিয়া থানার তেনিজনা গ্রামের সম্মুখ সংঘর্ষে গোবিন্দপাল ও নিকুঞ্জ পাল আহত হয়।[১০৩] একই বছরে বিপ্লবীদের আসামের গৌহাটির নবগ্রহ পাহাড়ে পুলিশের সঙ্গে সম্মুখ সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়।[১০৪] ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের ১৫ জুন ঢাকার কলতাবাজারে পুলিশের সাথে এক সংঘর্ষে বিপ্লবী নলিনী বাগচী ও তারিনী মজুমদার নিহত হয়।[১০৫] ১৯১৭ হতে ১৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অপেক্ষাকৃত নবীন বিপ্লবীরা সাহসের সাথে বৈপ্লবিক কর্ম পরিচালনা করে।[১০৬] বৈপ্লবিক কার্যক্রমের এই পর্যায়ে বিপ্লবীদের ওপর

ব্রিটিশ সরকারের অত্যাচারের নির্মম খড়্গ নেমে আসে। সরকারের দমন নীতির ফলে ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের পর অধিকাংশ বিপ্লবী নেতা ও কর্মী কারারুদ্ধ হয়। অমরেন্দ্রনাথ চট্টপাধ্যায়, যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, সতীশ চক্রবর্তী, নলিনী কর, প্রমূখ আত্মগোপনে থাকে।[১০৭]

এদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪-১৯১৮)[১০৮] তুরস্কসহ জার্মানপক্ষ পরাজিত হলে ভারতীয় রাজনীতিতেও এর প্রভাব পড়ে। বিজয়ী মিত্রশক্তি বিজিত শক্তির বিরুদ্ধে কঠোর নিপীড়নমূলক পদক্ষেপ হিসেবে জার্মানির ওপর নির্মম ও অসম্মানজনক ভার্সাই চুক্তি চাপিয়ে দেয়; একই সাথে তুর্কি সাম্রাজ্য ভাগাভাগি করে রাজধানী কনস্টান্টিনোপলসহ মূল তুর্কি ভূখন্ডেও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়। এ অবস্থায় মুসলিম জাহানে খলিফার মর্যাদাসহ তুর্কি জাতির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব ভূলুণ্ঠিত হওয়ার শঙ্কা তৈরি হয়।

তুরস্কের এহেন বিপদাপন্ন অবস্থায় মুসলিম বিশ্বে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। ভারতে এ প্রতিক্রিয়ার সর্বাধিক ব্যাপকতা লক্ষ্যণীয়। ভারতীয় মুসলমানেরা ইসলামের অস্তিত্ব ও মর্যাদা রক্ষায় খিলাফতকে একটি অপরিহার্য বিষয় বলে মনে করতো।[১০৯] খলিফা তথা তুর্কিদের দুরবস্থার জন্য মিত্রশক্তির গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার ব্রিটিশ সরকার বিশেষভাবে দায়ী ছিল।[১১০] এজন্য ভারতে সরকার অনুগত মুসলমানদের মধ্যে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব বৃদ্ধিপেতে থাকে। অন্যদিকে যুদ্ধকালীন প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি[১১১] মোতাবেক দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা বা স্বায়ত্বশাসন প্রদানে অনীহার কারণেও ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব দানা বাঁধতে শুরু করে। সরকার *রাওলাট আইন* (Rowlatt Act,1919) পাসের মাধ্যমে পুলিশের হাতে অবাধ ক্ষমতা দিয়ে 'ভারতের বিপ্লব প্রচেষ্টা'[১১২] সহ সকল প্রকার সরকার বিরোধী বিক্ষোভ ও অসন্তোষ মোকাবিলার কৌশল নেয়।[১১৩] বিপ্লব প্রচেষ্টা সমুলে উচ্ছেদ সাধনে নয়া আইন ও নিপীড়নের প্রতিবাদে বিক্ষুব্ধ জনতা ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ১৩ এপ্রিল পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে সমবেত হয়।[১১৪] জেনারেল ডায়ারের নির্দেশে ব্রিটিশ আর্মির নির্বিচার গুলিবর্ষণে প্রায় চারশত লোক নিহত ও হাজারের অধিক আহতের ঘটনায় সমগ্র ভারত বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। এহেন নৃশংস হত্যাকান্ডের ঘটনায় ভারতে একটি ব্যাপক ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়।

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের এই মোক্ষম সময়ে মহাত্মাগান্ধীর খেলাফত আন্দোলনের পরামর্শক হিসেবে যোগদান এবং ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করায় রাজনৈতিক ময়দানের পরিস্থিতি বদলে দেয়।[১১৫] মহাত্মার আন্দোলন ভারতবর্ষের গণচেতনাকে উদ্বুদ্ধ করে দেশপ্রেমের জোয়ারে প্লাবিত করতে সক্ষম হন। 'অসহযোগ কর্মসূচিকে সফল করার জন্য বিপ্লবীরা হুগলিতে বিদ্যামন্দির, চট্টগ্রামে সাম্যাশ্রম, বরিশালে শঙ্করমঠ প্রভৃতি সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। বাংলায় অসহযোগ আন্দোলনের

সাফল্যের মূলে নেতৃত্ব দেন চিত্তরঞ্জন দাশ।[১১৬] প্রকৃতপক্ষে '১৯২১ থেকে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালে বৈপ্লবিক সংস্থার নিখুঁত টেকনিক অনুসারে সংগোপনে সশস্ত্র বৈপ্লবিক প্রস্তুতিপর্ব সমাপিত হয়।[১১৭] 'যে কাজ বিপ্লবীদের পক্ষে এতোদিন করা সম্ভব হয়ে উঠেনি; মহাত্মাগান্ধীর অপূর্ব রাজনৈতিক প্রজ্ঞায় তা আরম্ভ ও পূর্ণতা পায়।[১১৮] বিপ্লবীরাও গান্ধী প্রদত্ত সুযোগ উপেক্ষা করেননি। তাঁরাও কংগ্রেস প্রদত্ত সুযোগকে পলিসি হিসেবে গ্রহণ করে এমনভাবে গণআন্দোলনে শরীক হন[১১৯] যে, বাংলায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ পর্যন্ত অন্তত তাঁদের বাদ দিয়ে পথচলা সম্ভব মনে করেননি।[১২০] দেশপ্রিয় জে.এম. সেনগুপ্ত বা তরুণ নেতা সুভাষচন্দ্র বসুকেও তাঁদেরই সম্পূর্ণ সহায়তা নিয়ে কাজ করতে হয়েছে।[১২১] তবে পুলিনবিহারী দাশের নেতৃত্বাধীন ঢাকা অনুশীলনের প্রধান অংশটি প্রত্যক্ষভাবে অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেনি বরং তাদের বিরোধীতার তথ্য পাওয়া যায়।

যুগান্তরের বিপ্লবী গোপীমোহন সাহা ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের ১২ জানুয়ারি সকালবেলা কলকাতা চৌরঙ্গীতে পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্ট সাদৃশ্যে ভ্রমক্রমে *মি.ডে* (Earnest Day) নামক এক ইংরেজকে গুলি করে হত্যা করে।[১২২] ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় অনুশীলন নেতা মহারাজা ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, প্রতুল গাঙ্গুলি এবং নরেন সেনের সাথে পরামর্শ করে হিন্দুস্থান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন গঠন করেন।[১২৩] কলকাতার যতীন দাশ সার্বক্ষনিক কর্মি হিসেবে এ সমিতির সাথে যুক্ত হন।বিপ্লবীরা গণ-সংযোগ পরম নিষ্ঠার সঙ্গে শুরু করেছিলেন বলেই প্রতিভাত হয়। তবে একথা সত্যি যে, ১৯১৯ থেকে ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতা অনেকটা স্তিমিত হয়ে আসে। মূলত এসময়ে বিপ্লবীদের একটি অংশ কংগ্রেসের গণসংযোগের কর্মসূচিকে বৈপ্লবিক-প্লাটফর্ম হিসেবে ব্যবহার করে; অপরাংশ আশু সশস্ত্র বৈপ্লবিক তৎপরতার নীরব প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে। এসময়ে সশস্ত্র বৈপ্লবিক তৎপরতা একেবারেই স্তিমিত ছিল তেমন নয়; মাঝে মাঝেই বিচ্ছিন্ন সশস্ত্র বৈপ্লবিক তৎপরতার চমক দেখা গেছে।

বিপ্লবী সূর্যকুমার সেনের নেতৃত্বে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ১৮ এপ্রিল চট্টগ্রাম যুববিদ্রোহ ও চট্টগ্রামের স্বাধীনতা ঘোষণার[১২৪] ফলে তৃতীয় ধাপের সশস্ত্র বৈপ্লবিক কর্মের শুভ সূচনা হয়। এ বিদ্রোহের মাধ্যমে চার দিনের জন্য চট্টগ্রাম শহর ব্রিটিশ শাসনের বাইরে চলে যায়।[১২৫] অত:পর ধলঘাট[১২৬] কালারপোল[১২৭] এবং ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে প্রীতিলতার পাহাড়তলি ইউরোপীয়ান ক্লাব[১২৮] আক্রমণ ইত্যাদি নানা স্থানের সম্মুখ সংগ্রামের মাধ্যমে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির সশস্ত্র বৈপ্লবিক শৈর্যের ইতিহাস রচিত হতে থাকে। চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহের মাত্র আটমাসের মধ্যেই শুধুমাত্র ভারতের স্বাধীনতার জন্যে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ০৮ ডিসেম্বর প্রকাশ্য দিবালোকে বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষের *বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স* (B.V.) দলের কর্মী **বিনয় বসু-বাদল গুপ্ত**-দীনেশ গুপ্ত' নামের অসম সাহসী তিন বাঙালি বিপ্লবীর নেতৃত্বে কলকাতার ডালহৌসী স্কয়ারে

রাইটার্স বিল্ডিং আক্রমণ ও বারান্দা যুদ্ধের[১২৯] ভয়ঙ্কর মুর্তিরূপ ধারণ করে। এছাড়াও এ দলটি মেদিনীপুরের ০৩ জন ম্যাজিস্ট্রেটসহ ৪/৫জন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হত্যার[১৩০] মাধ্যমে তাদের সশস্ত্র বৈপ্লবিক তৎপরতার চরম উৎকর্ষতা প্রদর্শন করে সমগ্র ভারত ব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করে। তবে সরকারি দমন-পীড়ন বৃদ্ধি পাওয়ায় এ সকল সশস্ত্র বৈপ্লবিক তৎপরতা শেষাবধি ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের দিকে স্তিমিত হয়ে যায়।

এ পর্যায়ে বৈপ্লবিক মতাদর্শে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এ সময় নেতৃস্থানীয় বিপ্লবীদের বেশিরভাগই আন্দামানের সেলুলার জেলের অভ্যন্তরে মার্কসীয় সাহিত্য, দর্শন, অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্ববাদ অধ্যয়নের প্রভাবে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন।[১৩১] অনেকে আবার মার্কসবাদগ্রহণ করলেও ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেননি। তাদের মধ্যকার কেউ কেউ ভারতীয় কংগ্রেসের যোগদান করেন, কেউবা সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করেন মর্মে উল্লেখ পাওয়া যায়।

১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে চলমান যুদ্ধ পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে বিপ্লবীরা ভারতের স্বাধীনতার জন্য পুনরায় তৎপরতা শুরু করে। 'নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ছদ্মবেশ ধারণ করে ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে ১৭ জানুয়ারি অত্যন্ত চুপিসারে ভারত ত্যাগ করে জার্মানি পৌঁছেন। পরবর্তীতে বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর আহ্বানে তিনি জার্মানি থেকে জাপানে গমন করেন।[১৩২] রাসবিহারী বসুর ইচ্ছানুসারে ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের ১৪ জুলাই নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আজাদ হিন্দ ফৌজের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।[১৩৩] ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের ২১ অক্টোবর তিনি অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার গঠন করেন। অত:পর ২৪ অক্টোবর নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু মিত্র শক্তি ইঙ্গ-মার্কিন জোটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার[১৩৪]মাধ্যমে বিপ্লবের চতুর্থ ধাপ অর্থাৎ বিপ্লব (Revolutionn) বা শেষ পর্বের শুভ সূচনা করেন। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দের ১৪ জানুয়ারি বার্মার রাজধানী রেঙ্গুনে প্রধান সামরিক ঘাটি স্থাপন করেন।[১৩৫] সেখান থেকে সশস্ত্র অভিযানের মাধ্যমে ১৭ এপ্রিল ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের কোহিমায় উপনীত হয়ে সেখানে স্বাধীন ভারতের ত্রিবর্ণ পতাকা উত্তোলন করেন।[১৩৬] অপর এক বাহিনী মণিপুরের রাজধানী ইম্ফলের অদূরে মৈরাং-এ জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন।[১৩৭] কোহিমা এবং মৈরাংসহ ভারতীয় এলাকার ১৫০ মাইল ব্রিটিশ শাসনমুক্ত করে মণিপুরের রাজধানী ইম্ফল অধিকারের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হন। কিন্তু পথিমধ্যে প্রবলবর্ষণ শুরু হলে আজাদ হিন্দ বাহিনীর ভারত অভিযান ব্যাহত হয়।[১৩৮] কিন্তু ইতোমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অক্ষশক্তির পরাজয়[১৩৯] এবং ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের ১৮ আগস্ট নেতাজির মৃত্যু; পরিস্থিতি বদলে দেয়।[১৪০]

এছাড়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জয়লাভ করে ব্রিটিশ সরকার লালকেল্লায় আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচারের উদ্যোগ গ্রহণ করে।[১৪১] কিন্তু এ বিচার প্রশ্নে দেশে গণবিক্ষোভের রূপ পরিগ্রহ করে।[১৪২] এসময় কংগ্রেস

আজাদ হিন্দ ফৌজের পক্ষসমর্থন করে আদালতে পন্ডিত জওহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে তেজবাহাদুর সাপ্রু, ভুলাভাই দেশাই, কৈলাসনাথ কাটজু প্রমূখের সমন্বয়ে একটি ডিফেন্স টিম গঠন করে।[১৪৩] যদিও ইতোপূর্বে আজাদ হিন্দ ফৌজের বিরোধীতা করেছে। কিন্তু এই বিচার বিরোধী তীব্র জনমত নিজেদের পক্ষে নেওয়ার প্রত্যয়ে জরহরলাল নেহেরু ব্যারিস্টাররূপে জীবনে এই প্রথম এবং শেষবারের মতো কোন মামলার কৌশলী হন। এদিকে আজাদ হিন্দ ফৌজের ক্যাপ্টেন রশিদ আলির বিচার প্রশ্নে কলকাতার ছাত্রসমাজের আহ্বানে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের ১১ ফেব্রুয়ারি ধর্মঘট এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচার বন্ধের দাবিতে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের ২১ নভেম্বর এক বিক্ষোভ মিছিল কলকাতা শহর প্রদক্ষিণ করে।[১৪৪] সর্বোপরি ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারি বোম্বাই বন্দরে ঐতিহাসিক নৌ বিদ্রোহ সংগঠিত হলে তা করাচি বন্দরে ছড়িয়ে পড়ে।[১৪৫] রয়্যাল ইন্ডিয়ান নেভির এই বিদ্রোহের খবর বোম্বাই শহরের সাধারণ মানুষ ও ছাত্র-যুব-শ্রমিকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লে তারাও বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।[১৪৬] মহাত্মা গান্ধী নৌবিদ্রোহের নিন্দা এবং কংগ্রেস নেতা সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল এবং মুসলিম লীগ নেতা মুহাম্মদ আলি জিন্নাহ বিদ্রোহী নাবিকদের অবিলম্বে আত্মসমর্পণ করার আহ্বান জানান।[১৪৭] ব্রিটিশ সাম্রাজ্য টিকে ছিল মূলত সামরিক এবং প্রতিরক্ষা বাহিনীর নিঃশর্ত আনুগত্যের ওপর। কিন্তু এ নৌ বিদ্রোহ সেই আনুগত্যকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তোলে। ব্রিটিশ সরকার স্পষ্টতই উপলব্ধি করে সামরিক বাহিনীর দুর্বল আনুগত্যের ওপর নির্ভর করে সাম্রাজ্য রক্ষা করা যাবেনা।

১৯৪৬-৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতের মুক্তি আন্দোলনের শেষপর্বে কৃষক সম্প্রদায়ের তেভাগা আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। এতে জমিদার ও জোতদারদের স্বার্থরক্ষায় ইংরেজ শাসকদের মতোই কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন।[১৪৮] তীব্র ব্রিটিশ বিরোধী এ আন্দোলনে অহল্লা, যশোদা রাণী ও ভবানী বর্মণ সহ অন্তত ২৫ জন কৃষক রমণী শহীদ হন বলে জানা যায়। এ ঘটনায় ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন আরও তীব্র আকার ধারণ করে এবং ভারতে তাদের ভিত নড়বড়ে হয়ে উঠে।

ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে এদেশে তাদের স্থায়ী সমর্থক ও মিত্র হিসেবে জমিদার শ্রেণি তৈরি করে। এ জমিদার শ্রেণি এবং জমিদারি ব্যবস্থাপনায় জড়িত কর্মচারী ও অন্যান্য মধ্যস্বত্বভোগী ব্যক্তিবর্গের সন্তানেরা ইংরেজি শিক্ষাগ্রহণের সাথে সাথে ইংরেজের শোষণ ও নিপীড়ন প্রত্যক্ষ করে। এই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি এবং তাদের সন্তানেরা ক্রমবর্ধমান বেকারত্বের গ্লানিবোধে জর্জড়িত হয় এবং মুক্তির উপায় হিসেবে ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র বৈপ্লবিক তৎপরতা শুরু করে। ফলশ্রুতিতে ইংরেজ শাসনের ভিত নড়বড়ে হয়ে পড়ে। তাছাড়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে বিজয়ী ব্রিটিশ সরকারের হাতে বন্দি আজাদ হিন্দ সৈনিকদের লাল কেল্লায় বিচার আরম্ভ করলে

দেশবাসী তাদের দেশপ্রেম এবং স্বাধীনতার জন্য তাদের অপরিমেয় ত্যাগ স্বীকারের কথা জানতে পারে। দেশব্যাপী আজাদ হিন্দ ফৌজের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায় এবং সাধারণ জনতা তাদের বিচার বন্ধের দাবি জানায়। একপর্যায়ে ব্রিটিশ বিরোধী গণ-আন্দোলন শুরু হলে ব্রিটিশ সরকার প্রমাদ গুণতে থাকে। সর্বোপরি 'আজাদ হিন্দ ফৌজের কার্যক্রম ও বোম্বের নৌবিদ্রোহীদের সুদৃঢ় সংযোগের[১৪৯] খবর বিটিশ সরকারকে বিচলিত করে তোলে। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর প্রভাবে ইংরেজের বিরুদ্ধে আজাদ হিন্দ ফৌজের কার্যক্রম এবং বোম্বের নৌবিদ্রোহে হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক বিভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধভাবে অংশগ্রহণ করেছিল যা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হয় ।

বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির এ সশস্ত্র বৈপ্লবিক কর্মকান্ডে নারী সমাজের অংশগ্রহণও ছিল বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। বিপ্লবী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম পাহাড়তলীর ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণে নেতৃত্বদান ও প্রাণ উৎসর্গ করে।[১৫০] বৈপ্লবিক ইতিহাসে এছাড়াও সশস্ত্র বৈপ্লবিক আন্দোলনে সরোজিনী নাইডু, নেলী সেনগুপ্তা, অরুণা আসফ আলী, সুচেতা কৃপানলি, কল্পনা দত্ত, সুনীতি চৌধুরী, বীণা দাশ, সুহাসিনী গাঙ্গুলি, আশালতা সেন, ফুলরেনু গুহ, হিরন্ময়ী দেবি, জ্যোর্তিময়ী গাঙ্গুলি, কমুদিনী ডাকুয়া[১৫১] প্রমুখ মহিয়সী নারীদের অসামান্য ত্যাগের কথা স্মরণযোগ্য। বাংলার নারীদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ছাড়া গণ-আন্দোলন এবং বৈপ্লবিক সংগ্রাম কোনটাই সাফল্যলাভ করতে পারতো না। শুধু শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির নারীরাই নয়; কৃষক ও শ্রমিকশ্রেণির নারীরাও ব্রিটিশ শোষকদের বিরুদ্ধে দৃপ্ত প্রতিবাদ ও ত্যাগ স্বীকারে অগ্রণি ভূমিকায় ছিলেন মর্মে তথ্য পাওয়া যায়।

বাঙালির মধ্যবিত্তের এই সশস্ত্র বৈপ্লবিক তৎপরতায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ০৬ ফেব্রুয়ারি সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বাংলার গভর্নর *স্ট্যানলি জ্যাকসন* (Stanly Jacson) সিনেট ভবনে বক্তৃতা আরম্ভ করতেই বিপ্লবী ছাত্রী বীণা দাশ গভর্নরকে লক্ষ্য করে গুলি করে। গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হলে তিনি প্রাণে বেচে গেলেও তৎক্ষনাৎ বীণা দাশকে গ্রেফতার ও বিচারে তার যাবজ্জীবন কারাদন্ড হয়।[১৫২] ইংরেজ-সৃষ্ট নানান বৈষম্যের বিরুদ্ধে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির অসন্তোষ ও বিক্ষোভের মধ্যেই জাগ্রত হয়েছে স্বাধীনতার স্পৃহা ও স্বাদেশিকতার অনুভূতি।[১৫৩] এহেন অনুভূতির বশবর্তী হয়ে ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে এমএ শ্রেণিতে ভর্তি হন লীলাবতী নাগ (১৯০০-১৯৭০)। পরবর্তীতে ঢাকার বিপ্লবী সংগঠন 'শ্রী সংঘের' প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা অনিলচন্দ্র রায়ের (১৯০১-১৯৫২) সঙ্গে পরিণয় সূত্রে তিনি লীলা রায় নামে পরিচিত হন।[১৫৪] ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে লবণ সত্যাগ্রহের সময় তিনি 'ঢাকা মহিলা সত্যাগ্রহ সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেন। অনিলচন্দ্র রায়ের

গ্রেফতারের পর তিনি 'শ্রী সংঘ' পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।[১৫৫] ১৯৩১ থেকে ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি কারাগারে বন্দি ছিলেন বলে জানা যায়।

১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ আন্দোলনের দায়ে লীলা রায় ও অনিলচন্দ্র রায় আবারও কারাবন্দি হন। মুক্তি পেয়ে লীলা রায় সুভাষচন্দ্র বসুর নির্দেশে 'ফরওয়ার্ড ব্লক' সাপ্তাহিকীর সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন।[১৫৬] মূলত নারীর মুক্তিকে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার পূর্ব শর্ত মনে করতেন। যেখানে শিক্ষা, সমাজসেবা এবং সশস্ত্র বৈপ্লবিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে একটি সাম্যবাদী সমাজ ও রাষ্ট্রকাঠামোর স্বপ্ন তাদের তাড়িত করতো। অতএব উপর্যুক্ত সশস্ত্র বৈপ্লবিক কর্মকান্ডে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ও গৌরবময় ভূমিকা পালন করে।

পূর্ব বাংলার বিপ্লবী সংগঠন ঢাকা অনুশীলন ১৯১১-১২ খ্রিস্টাব্দ থেকে কলকাতাকে কেন্দ্র করে পূর্ববাংলার ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, ফরিদপুর, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, রাজশাহী, কুচবিহার, সিলেট, কলকাতা, বিহার থেকে পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশ তথা সমগ্র ভারতবর্ষে সশস্ত্র বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতা পরিচালনা করে ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে এক বিরল সম্মান ও সমীহ অর্জন করতে সক্ষম হয়। এক্ষেত্রেও পশ্চিমবঙ্গের বিপ্লবীদের গৌরবময় ভূমিকা অপেক্ষা পূর্ববঙ্গের বিপ্লবীদের ত্যাগ ও সাধনার মহিমা অধিকতর গৌরবময় ও ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করতে সমর্থ হয়। তাছাড়া ঢাকা অনুশীলন দীর্ঘ বৈপ্লবিক পথ পরিক্রমায় শেষাবধি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর সশস্ত্র বৈপ্লবিক কার্যক্রমে জড়িত হয়ে স্বাধীনতার অনুকূলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের মাধ্যমে বৈপ্লবিক সংগঠন হিসেবে তার শৈর্য বীর্যের স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়। বাঙালির এ সশস্ত্র বৈপ্লবিক তৎপরতা একাধারে প্রায় বিয়াল্লিশ বছর (১৯০৫-১৯৪৭) চলমান ছিল বলে পরিদৃষ্ট হয়।

বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির এই সশস্ত্র বৈপ্লবিক তৎপরতাকে অনেক দেশি-বিদেশি ঐতিহাসিক সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন বলে অভিহিত করে থাকেন। তবে আমার গবেষণাতে প্রতীয়মান হয়েছে যে, এটি সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন ছিলনা। কেননা এই আন্দোলনকে ব্রিটিশ সরকার এবং তার আমলারা নিজেদের স্বার্থে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন বলে অভিহিত করেছেন। কোন নাগরিক তার নিজের দেশের স্বাধীনতা বা মুক্তির লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করলে তাকে সন্ত্রাসী বলা সমীচীন নয়। এই অর্থে বাংলার সশস্ত্র বিপ্লব প্রচেষ্টা দেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্য সম্পূর্ণরূপে নিবেদিত ছিল। তাই আমরা একে সশস্ত্র বিপ্লব বলে অভিহিত করতে চাই।

এই আন্দোলনের প্রকৃতি ছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে গোপন সশস্ত্র বিপ্লব। গোপন সংগঠন যেমন অনুশীলন ও যুগান্তর সমিতির সদস্যরা পুলিশ ও সরকারি অফিসারদের হত্যা, ডাকাতি এবং ইংরেজ শাসকদের লক্ষ্যবস্তু করার মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসন উচ্ছেদ করে হিন্দু ধর্মীয় রাজ্য প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা ছিল বলে জানা যায়। এই সশস্ত্র বৈপ্লবিক তৎপরতার মধ্যে লক্ষ্যণীয় কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হলো-

প্রথমত: বৈপ্লবিক সংগঠনগুলোর মধ্যে কর্ম প্রচেষ্টার ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। যে কারণে সংগঠন গুলোর সম্মিলিত শক্তিকে একসাথে কাজে লাগানো সম্ভব হয়নি।

দ্বিতীয়ত: সমন্বয়ের অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। কোন নিদিষ্ট কাজের জন্য বিপ্লবী দলগুলোকে সবসময় একত্রে পাওয়া যায়নি।

তৃতীয়ত: বিপ্লবীদের কর্মপদ্ধতি অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে সম্পাদিত হত এবং তাদের গোপনীয়তা রক্ষার শপথ গ্রহণ করতে হতো। শপথ ভঙ্গের শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদন্ডের বিধান ছিল। 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি, দেশ-মাতৃকার প্রতি আনুগত্যের শপথ এবং ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বৈপ্লবিক সংগ্রামের দীক্ষা নিতেন। অনুশীলন সমিতিতে বিপ্লবীদের প্রশিক্ষণ এবং দেশ সেবার শপথ করানো হতো। যুগান্তর দলে দেশের মুক্তি অর্জনের জন্য জীবন উৎসর্গ করার শপথ করানো হতো। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এ বৈপ্লবিক ধারা অব্যাহত ছিল।

চতুর্থত: সমিতিগুলো দু'টি ভাগে বিভক্ত ছিল- প্রকাশ্য এবং গুপ্ত। এ বৈপ্লবিক সমিতিগুলোর কাঠামো ক্যাডার বা স্তর ভিত্তিক ছিল। নিম্ন স্তরের সদস্যরা কার্যে দক্ষতা ও বিশ্বস্ততায় উত্তীর্ণ হলে পরবর্তী উচ্চতর স্তরে উন্নীত হতে পারতো। প্রতিটি স্তরেই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে হতো। চারটি স্তর ও প্রতিজ্ঞার সন্ধ্যান পাওয়া যায়। সেগুলো হলো-আদ্য, অন্ত্য, প্রথম বিশেষ ও দ্বিতীয় বিশেষ প্রতিজ্ঞা। আদ্য প্রতিজ্ঞা পাঠ করে সমিতির প্রকাশ্য সদস্য থাকা যেতো। এ ধাপ সফলতার সাথে উত্তীর্ণ হলে অন্ত্য প্রতিজ্ঞা পাঠ করিয়ে পরবর্তীতে সমিতির গুপ্ত শাখার সদস্য করা হতো।

পঞ্চমত: ঔপনিবেশিক সরকারের জেল-জুলুম ও সম্মুখ যুদ্ধে ব্রিটিশ পুলিশের গুলিতে বিপ্লবীরা নিহত হয়। অনেকেই গ্রেফতার হয়ে নানাবিধ শারীরিক নির্যাতনের ফলে বিপ্লবীদের শক্তি একেবারে দুর্বল হয়ে পড়ে। বৈপ্লবিক আন্দোলনের কৌশল এবং নিজেদের মতাদর্শের লোক সংগ্রহের প্রত্যয়ে তারা মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করে প্রত্যক্ষভাবে গণ-আন্দোলনে সম্পৃক্ত হয়।

ষষ্ঠতঃ জাতীয় কংগ্রেস ব্রিটিশ সহযোগীতার নীতি অবলম্বন করে এবং আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে দেশের স্বাধীনতা আসবে বলে মনে করতো। কিন্তু বিপ্লবীরা কংগ্রেসের এই ধীরে চলা নীতি প্রত্যাখ্যান করে। ভারতের স্বাধীনতা দাবি আদায়ে সরাসরি সশস্ত্র বৈপ্লবিক তৎপরতা শুরুর মাধ্যমে ব্রিটিশ অফিসারদের জীবন অনিরাপদ করে তাদের মধ্যে ভীতি সঞ্চার করতে প্রচেষ্টা চালায়।

সপ্তমতঃ বিপ্লবীদের প্রতি কংগ্রেসের প্রচ্ছন্ন সমর্থনের ঈঙ্গিত মেলে। কংগ্রেস হয়তো ভেবেছিল সশস্ত্র বিপ্লবীরা যদি ভীতিকর পরিবেশ তৈরি করতে পারে সেক্ষেত্রে হয় তাদের পক্ষে ব্রিটিশের সাথে স্বাধীনতার প্রশ্নে দেন-দরবার করতে সুবিধা হবে এবং সেটিই হয়েছিল।

অষ্টমতঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সুযোগে বিপ্লবী আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠা এবং ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা। এ সময় আজাদ হিন্দ সরকার ব্রিটিশ সরকারের শত্রুরাষ্ট্র জাপানের সাথে মিত্রতা স্থাপন এবং তার সহযোগীতায় ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের উদ্যোগ গ্রহণ করে।

নবমতঃ বাংলার নবজাগরণ তথা ডিরোজিওর ইয়ংবেঙ্গল দলের মুক্তচিন্তা চর্চার ফলে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির শিক্ষিত অংশটি স্বাধীনচেতা হয়। তারা যাবতীয় কুসংস্কার ভেঙ্গে নতুন জীবনের স্বপ্ন বাস্তবায়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল।

দশমতঃ বল প্রয়োগের মাধ্যমে ঔপনিবেশিক ইংরেজ শাসকদের বিতাড়িত করা এবং হিন্দু ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য শিক্ষিত, সাহসী ও চৌকস যুবকদের উদ্বুদ্ধ করে দলে ভিড়ানো হতো।

একাদশতমঃ এই আন্দোলনে প্রধানত হিন্দু যুবকরাই অংশগ্রহণ করতো। মুসলিম বিরোধী কিছু উপাদান যুক্ত থাকায় দু'একজন ব্যতীত অধিকাংশ মুসলিম যুবকেরা এই আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত হয়নি।

দ্বাদশতমঃ মূলত এটি ছিল ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র বেপ্লবিক সংগ্রাম। কৌশল হিসেবে ডাকাতি, বোমা হামলা ও পিস্তলের মাধ্যমে টার্গেটকৃত ব্যক্তিকে হত্যা চেষ্টা করা।

ত্রয়োদশতমঃ বিপ্লবকে সাফল্যমন্ডিত করার প্রত্যয়ে সশস্ত্র বৈপ্লবিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে দেশব্যাপী গণ-অভ্যুত্থান সংগঠনের প্রচেষ্টা ছিল।

চৌদ্দতমঃ যদিও ইতোপূর্বে আন্দোলনটিতে গণমানুষের সম্পৃক্ততা ছিলনা। কিন্তু ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিকদের বিচার প্রশ্নে এবং ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে বোম্বের নৌ বিদ্রোহের সমর্থনে ও বোম্বে, কলকাতা ও ভারতের অন্যান্য শহর গুলোতে ছাত্র, শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণি ধর্মঘট সহ ব্রিটিশ বিরোধী বিক্ষোভ ও রাজনৈতিক আন্দোলনে সম্পৃক্ততা একে গণ আন্দোলনে রূপদান করে। এটিই হলো এ আন্দোলনের একটি টার্নিং পয়েন্ট।

পনেরতমঃ মূলত এটি ছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষী সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন। সর্বোপরি এটি ছিল বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির সশস্ত্র বৈপ্লবিক আন্দোলন যা ব্রিটিশ সরকারকে ভারত ত্যাগে বাধ্য করে।

আমরা মনে করি, ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে নৌবিদ্রোহ ভারতের স্বাধীনতার অনুকূলে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। এর মাধ্যমে ব্রিটিশ সাম্রজ্যের প্রধান স্তম্ভ সামরিক তথা প্রতিরক্ষা বাহিনীর নিরঙ্কুশ আনুগত্য প্রবলভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়। ব্রিটিশ সরকার স্পষ্টতই উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় যে, প্রতিরক্ষা বাহিনীর দূর্বল আনুগত্যের ওপর নির্ভর করে আর সাম্রাজ্য পরিচালনা করা সম্ভব হবেনা। তাছাড়া ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে বোম্বের নৌ বিদ্রোহ সমর্থনে কলকাতা ও ভারতের অন্যান্য শহর গুলোতে ছাত্র, শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণি ধর্মঘট সহ ব্রিটিশ বিরোধী বিক্ষোভ প্রদর্শন ও রাজনৈতিক আন্দোলনে শামিল হয়। এ সময় শ্রমিকশ্রেণির অর্থনৈতিক সংগ্রাম ও ছাত্র-জনতার রাজনৈতিক সংগ্রামের সাথে একীভূত হয়ে ব্রিটিশ বিরোধী এক রাজনৈতিক রূপ পরিগ্রহ করে। তাছাড়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানে সমগ্র ভারতে কৃষি অর্থনীতিতে সঙ্কট দেখা দেয় এবং ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলার কৃষক বিদ্রোহ তথা তেভাগা আন্দোলন সহ সমগ্র ভারতের অন্যান্য কৃষক আন্দোলন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে।

উর্পযুক্ত ঘটনাপ্রবাহ বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির দীর্ঘ ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র বৈপ্লবিক তৎপরতা তথা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বাধীন আজাদ হিন্দ ফৌজের সশস্ত্র বৈপ্লবিক কর্মকান্ডের অভিঘাতের প্রতিফলন বলেই অনুমিত হয়। কাজেই বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির আন্দোলনের ফলে ইংরেজ শাসনের ভিত্তি জমিদারি পদ্ধতি নড়বড়ে হয়ে পড়া, আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচার কেন্দ্রিক উদ্ভুত সৈনিক-শ্রমিক-ছাত্র-সাধারণ জনতা ও কৃষক সমাজের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন-সংগ্রামের ফলশ্রুতিতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতিতে ব্রিটিশ সরকার ভারতশাসন কার্যক্রম পরিত্যাগের বিষয়টি বিবেচনা করতে থাকে। তাছাড়া 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতি মিটিয়ে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে ভারতের শাসনকার্য ধরে রাখা প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে।[১৫৭] উদ্ভুত পরিস্থিতি বিবেচনায় ব্রিটিশ সরকার ভারতের শাসনভার ত্যাগের সিদ্ধান্তগ্রহণ করে।[১৫৮] ব্রিটিশ সরকারের এ সিদ্ধান্ত বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির সশস্ত্র বৈপ্লবিক তৎপরতার সফল পরিণতি যা মধ্যবিত্ত বাঙালির বৈপ্লবিক চিন্তা ও কর্মতৎপরতার সাফল্যের ইঙ্গিতবাহী মনে করা হয়। এক্ষেত্রে সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী *লর্ড ক্লিমেন্ট এটলির* (Clement Attlee) (1883-1967) মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ব্রিটিশ সরকারের ভারত ত্যাগের সিদ্ধান্তে গান্ধীজির ভূমিকা 'স-ব-চে-য়ে-ক-ম'।[১৫৯] তিনি আরও বলেন, তবে সুভাষচন্দ্র বসুর সামরিক কার্যকলাপে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী ও অনেক অফিসারদের মধ্যে ব্রিটিশ রাজশক্তির প্রতি আনুগত্যের

অভাব পরিলক্ষিত হলে আমরা ভারত ত্যাগের সিদ্ধান্ত নেই।'[১৬০] সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর উপর্যুক্ত মন্তব্য বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির দীর্ঘ সশস্ত্র আন্দোলন তথা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বাধীন আজাদ হিন্দ সরকারের সশস্ত্র বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতার সাফল্যের অনবদ্য স্বীকৃতির স্মারকচিহ্ন স্বরূপ। নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির সহচর হিসেবে উপর্যুক্ত পরিস্থিতিতে মধ্যবিত্ত শ্রেণির সশস্ত্র বৈপ্লবিক আন্দোলনের ফসল; জাতীয় কংগ্রেস ও ভারতীয় মুসলিম লীগ তাদের নিজেদের পক্ষে নেয়ার দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তান ও ভারত নামে দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে।

সবশেষে বলতে চাই, ভারতের স্বাধীনতা কোনো এককধারার ফসল নয়। কিন্তু ১৮৫৮-১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির সশস্ত্র আন্দোলন ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে স্থায়ী মানসিক যুদ্ধ চালিয়েছে। প্রধানত গুপ্ত সশস্ত্র বৈপ্লবিক সংগঠন অনুশীলন, যুগান্তর ও বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স সহ অন্যান্য সশস্ত্র দলের কর্মকান্ডের মাধ্যমে ব্রিটিশ প্রশাসনে স্থায়ী আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এছাড়াও আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রভাব এবং ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের নৌ বিদ্রোহ; এই তিনটি স্রোতধারা মিলে ব্রিটিশ আমলাতন্ত্র ও সেনাবাহিনীর আনুগত্য ভেঙ্গে দেয়। কংগ্রেস তথা মহাত্মাগান্ধীর গণআন্দোলন জনমত তৈরি করেছে অপরদিকে মুসলিম লীগ তথা কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ'র সাংবিধানিক রাজনীতি (Constitutional Politics) আইনি কাঠামোর মাধ্যমে ব্রিটিশ রাজকে চাপে রেখেছে, কিন্তু স্বাধীনতা ত্বরান্বিত করতে চূড়ান্ত ধাক্কা দিয়েছে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির সশস্ত্র বিপ্লবীরা। কংগ্রেসের রাজনৈতিক কৌশল ব্রিটিশ শাসনের মেয়াদকাল বৃদ্ধি করেছে কিনা সেটা তর্ক সাপেক্ষ; কিন্তু এর ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণির সশস্ত্র বৈপ্লবিক ধারায় নিবেদিত বিপ্লবীদের জন্য রাজনৈতিক পরিসর সংকুচিত হয়ে যায়। বিশেষত নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর অন্তর্ধানের ফলে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ বলয়ের বাইরের মধ্যবিত্ত শ্রেণির সশস্ত্র বিপ্লবীরা মূল রাজনৈতিক স্রোতধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ গণভিত্তি সম্পন্ন শক্তি হিসেবে উঠে আসে। এ বাস্তবতায় ভারত ত্যাগের প্রাক্কালে ব্রিটিশ সরকার প্রশাসনের শুন্যতা মুসলিম লীগ এবং কংগ্রেসের মাধ্যমে পূরণের উদ্যোগ গ্রহণ করে। সশস্ত্র বৈপ্লবিক আন্দোলনকারীদের সাংগঠনিক দূর্বলতা এখানেই স্পষ্ট হয়ে উঠে। এ দূর্বলতা সত্ত্বেও ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের ইতিহাসে সশস্ত্র বৈপ্লবিক আন্দোলনের মাধ্যমে প্রধানতম ভূমিকা পালন ও ত্যাগের মহিমায় ভাস্বর বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির অবদান অম্লান হয়ে থাকবে।

টিকা ও তথ্য নির্দেশঃ

১. উমা মুখোপাধ্যায় ও হরিদাস মুখোপাধ্যায়,*শ্রী অরবিন্দ ও বাংলায় বিপ্লববাদ*, ফার্মা কে.এল. মুখোপাধ্যায়, কলকাতা, ১৯৭২, পৃ.০১

২. অনন্ত সিংহ, *সুর্য সেনের স্বপ্ন ও সাধনা*, র‍্যাডিক্যাল ইমপ্রেশন,কলকাতা, ২০১৯,পৃ.৭৭

৩. *প্রাগুক্ত*

৪. *প্রাগুক্ত*

৫. *প্রাগুক্ত*

৬. সুপ্রকাশ রায়,*ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস(১৯০১-১৮)*,ডিএনবিএ ব্রাদার্স,কলকাতা,১৯৭০,পৃ.(মুখবন্ধ)নয়-দশ

৭. *প্রাগুক্ত*

৮. *প্রাগুক্ত*।

৯. কৃষ্ণধর, *ভারতের মুক্তি সংগ্রামে বাংলা*,তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ,পশ্চিমবঙ্গ সরকার,কলকাতা,১৯৭৭,পৃ.(ভূমিকা দ্র.)

১০. মোঃ শহীদুল্লাহ,*বাংলাদেশ বিষয়াবলি:ইতিহাস,সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য*, গ্রন্থ কুটির, ঢাকা,২০১৬,পৃ.৪৯

১১. আবদুল বাছির, *বাংলার কৃষক বিদ্রোহ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণি*,বাংলা একাডেমী, ঢাকা,২০১২,পৃ.৮

১২. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত,*ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম*, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেসন,কলকাতা, ২০১৬,পৃ.১১–১২

১৩. সুপ্রকাশ রায়, *প্রাগুক্ত*,পৃ.১৪৩

১৪. কৃষ্ণধর,*প্রাগুক্ত*

১৫. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত,*প্রাগুক্ত*

১৬. *প্রাগুক্ত*

১৭. *প্রাগুক্ত*

১৮. অর্থাৎ যিনি ফরাসি বিশ্বকোষের সংকলক বা লেখক (১৭৫১-৮০); জ্ঞানদানের সাথে পরিচিত এবং দেবতাবাদ এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের পক্ষে ছিলেন। (উদ্ধৃত: https://www.merriam-webster.com), Accessed 0n 24 April, 2025

১৯. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত,*প্রাগুক্ত*

২০. সুপ্রকাশ রায়,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৪৪

২১. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত,*প্রাগুক্ত*

২২. *প্রাগুক্ত*

২৩. অর্থ হলো– "হে অর্জুন দুর্বলতা বা কাপুরুষতার বশবর্তী হয়ো না। এটি তোমার মতো সাহসীর পক্ষে অনুচিত।" শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ২.২ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, যখন অর্জুন যুদ্ধ করতে দ্বিধাগ্রস্থ ছিলেন। (উদ্ধৃত: https://ai overview), Accessed 0n 05.9.2025

২৪. অর্থ হলো–শরীর ধ্বংস হলেও আত্মা ধ্বংস হয়না। কারণ আত্মাই অবিনাশী,জন্মহীন এবং চিরন্তন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২০তম শ্লোকের অংশ, যা আত্মার অবিনশ্বরতা ও চিরন্তন সত্ত্বাকে বোঝায়। (উদ্ধৃত: https://ai overview), Accessed 0n 05.9.2025

২৫. রমেশচন্দ্র মজুমদার,*বাংলাদেশের ইতিহাস,চতুর্থ খন্ড(১৯০৫-১৯৪৭)(মুক্তিসংগ্রাম)*,দিব্যপ্রকাশ,ঢাকা,২০২১,পৃ.১১৯-২০

২৬. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত,*প্রাগুক্ত*

২৭. ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত-রায়,*ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব*,র‍্যাডিক্যাল ইমপ্রেশন,কলকাতা, ২০১৬, পৃ.১৫

২৮. *প্রাগুক্ত*

২৯. কৃষ্ণধর, *প্রাগুক্ত*

৩০. *প্রাগুক্ত*

৩১. *প্রাগুক্ত*

৩২. ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত-রায়,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৬

৩৩. চিন্মোহন সেহানবীশ ও অন্যান্য,*মুক্তির সংগ্রামে ভারত*,পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি,কলকাতা,২০১০,পৃ.৬

৩৪. *প্রাগুক্ত*

৩৫. *প্রাগুক্ত*

৩৬. A.R.Desai,*Social Background of Indian Nationalism*,Popular Book Depot,Bombay,1948,p.237

৩৭. আমরা মনে করি, বাংলা ভাগের বিরেধিতা করে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস নেতবৃন্দ বাংলা ভাগকে ব্যঙ্গ করে এর নাম দেয় বঙ্গভঙ্গ।

৩৮. শরিফুল ইসলাম ভূঁইয়া, *জাতীয় রাজনীতি ও টাঙ্গাইল জেলার নেতৃবৃন্দ(১৯৪৭-১৯৭১)*,মাওলা ব্রাদার্স,ঢাকা,২০২২,পৃ.৩০

৩৯. সুপা সাদিয়া,*অগ্নিযুগ*,দ্যু প্রকাশন,ঢাকা,২০১৭,পৃ.১৭

৪০. *প্রাগুক্ত* (অত:পর জ্যোতিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘাজ্যোতিন) হিসেবে উল্লেখ করা হবে)

৪১. *প্রাগুক্ত*
৪২. ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত-রায়, *প্রাগুক্ত*,পৃ.১৬
৪৩. *প্রাগুক্ত*
৪৪. সরল চট্টোপাধ্যায়,*ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ*,পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ,কলকাতা,১৯৯০,পৃ.৩০১
৪৫. সুপ্রকাশ রায়, *প্রাগুক্ত*,পৃ.২৪
৪৬. সুপা সাদিয়া,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৫;সুপ্রকাশ রায়,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৫১-৩
৪৭. সরল চট্টোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩০০
৪৮. বিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, *ভারতের সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রাম*, র‍্যাডিক্যাল ইমপ্রেশন, কলকাতা,২০১৪,পৃ.৫৫
৪৯. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *প্রাগুক্ত*,পৃ.১১৩
৫০. *প্রাগুক্ত*
৫১. সুপ্রকাশ রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৫৬
৫২. সরল চট্টোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩০৩
৫৩. *প্রাগুক্ত*
৫৪. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১১৯
৫৫. সুপা সাদিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৭
৫৬. সরল চট্টোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৩০১
৫৭. *প্রাগুক্ত*
৫৮. সুপ্রকাশ রায়, *প্রাগুক্ত*,পৃ.১৫৬;সরল চট্টোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৩০১
৫৯. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১১৬
৬০. সরল চট্টোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৩০১
৬১. *প্রাগুক্ত*
৬২. বিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৫৬
৬৩. *প্রাগুক্ত*,পৃ.৩০২
৬৪. পারভীন আক্তার জেমী, *নজরুল সাহিত্যে বিপ্লবী চেতনা*, অনন্যা, ঢাকা,২০২০,পৃ.৩৯
৬৫. *প্রাগুক্ত*
৬৬. *শ্রী অরবিন্দ ও বাঙলার স্বদেশী যুগ*,পৃ,৬১৫-১৬(উদ্ধৃত:ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত-রায়, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৩৭)
৬৭. ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত-রায়, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৩৮
৬৮. *প্রাগুক্ত*,পৃ.৪০
৬৯. *প্রাগুক্ত*,পৃ.৩০২
৭০. নলিনীকিশোর গুহ, *বাংলায় বিপ্লববাদ*, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা,২০১৭,পৃ.৪৬
৭১. সুপ্রকাশ রায়, *প্রাগুক্ত*,পৃ.২৩৪
৭২. *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৩৫
৭৩. মো.আনোয়ার হোসেন,*বৃহত্তর যশোর জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*,গতিধারা,ঢাকা,২০১০,পৃ.৬৭
৭৪. পারভীন আক্তার জেমী, *প্রাগুক্ত*,পৃ.২১
৭৫. সুপ্রকাশ রায়, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৩৬৮
৭৬. সুপ্রকাশ রায়, *প্রাগুক্ত*,পৃ.১৫৮
৭৭. জীবনতারা হালদার,*অনুশীলন সমিতির ইতিহাস*,র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন,কলকাতা,২০১৬,পৃ.৬৩-৪;সুপ্রকাশ রায়, *প্রাগুক্ত*,পৃ.১৫৫
৭৮. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, *প্রাগুক্ত*,পৃ.১০১
৭৯. জীবনতারা হালদার, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৪৩;সুপ্রকাশ রায়, *প্রাগুক্ত*,পৃ.১৫৯ এবং ৩৬৯
৮০. অমিত দেবনাথ,*ব্রিটিশরাজ বনাম বাঘা জ্যোতিন*,পত্রলেখা,কলকাতা,২০২৩,পৃ.৪২
৮১. *প্রাগুক্ত*,পৃ.৪৩
৮২. জীবনতারা হালদার,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৭৩-৭৪
৮৩. *প্রাগুক্ত*
৮৪. *প্রাগুক্ত*
৮৫. জীবনতারা হালদার, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৭৩-৭৪
৮৬. নলিনীকিশোর গুহ,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২৬১
৮৭. জীবনতারা হালদার,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৭৩-৭৪
৮৮. ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত-রায়, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৫৭

৮৯. *প্রাগুক্ত*
৯০. *প্রাগুক্ত*
৯১. *প্রাগুক্ত*
৯২. *প্রাগুক্ত*
৯৩. *প্রাগুক্ত*
৯৪. শরিফুল ইসলাম ভূঁইয়া, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৩০
৯৫. সরল চট্টোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩০১
৯৬. ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত-রায়, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৫৭
৯৭. সুপ্রকাশ রায়,*ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম(১৮৯৩-১৯৪৭)*,র‍্যাডিক্যাল ইমপ্রেশন,কলকাতা,২০১৩, পৃ.১৫-১৯;সরল চট্টোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*,পৃ.২৯৬-৩১৮
৯৮. পারভীন আক্তার জেমী,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২৮;সুপ্রকাশ রায়,*ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম*,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৪১০
৯৯. ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত-রায়, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৯৫
১০০. বিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৫৬
১০১. সুপ্রকাশ রায়,*ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস(১৯০১-১৮)*, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৩৬৯
১০২. ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত-রায়, *প্রাগুক্ত*,পৃ.১৩১;চিন্মোহন সেহানবীশ ও অন্যান্য,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৯
১০৩. ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত-রায়, *প্রাগুক্ত*,পৃ.১৩১-৩২
১০৪. *প্রাগুক্ত*,পৃ.১৩১; নলিনীকিশোর গুহ, *প্রাগুক্ত*,পৃ.১৭৭
১০৫. ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত-রায়, *প্রাগুক্ত*,পৃ.১৩৩-৩৪; নলিনীকিশোর গুহ, *প্রাগুক্ত*,পৃ.১৭৭
১০৬. নলিনীকিশোর গুহ, *প্রাগুক্ত*,পৃ.১৫৯
১০৭. *প্রাগুক্ত*
১০৮. প্রথম বিশ্বযুদ্ধে এক পক্ষে ছিল বৃটেন,ফ্রান্স,রাশিয়া,ইতালি ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।এদেরকে একত্রে *মিত্র শক্তি* (Allied Power) বলা হতো। অপর পক্ষে জার্মানি ও অষ্ট্রিয়া। জার্মানির সাথে তুরস্কের পূর্ব থেকেই সুসম্পর্ক ছিল।এজন্য তুরস্ক প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির পক্ষে যোগ দেয়। (উদ্ধৃত:সুলায়মান কবীর,*বাংলায় মুসলিম জাগরণে ওয়াজেদ আলী খান পন্নী*, ঢাকা:সুবর্ণ,২০২০,পৃ.১৩০ (পাদটীকা নং ৮৭)
১০৯. বিষয়টি অনুধাবনের জন্য খেলাফত আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর 'খেলাফৎ' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত করা হলো:পবিত্র স্থান সমূহ এবং আরব রাজ্য খলিফার হাতছাড়া হলে,রাজধানী কনস্টান্টিনোপলে বিজাতির কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে খলিফার পদমর্যাদা থাকে না। খলিফার পদমর্যাদা না থাকলে তিনি খলিফারূপে থাকতে পারেন না।খলিফা না থাকলে,ইমাম নির্দিষ্ট না থাকলে মুসলমানের মুসলমানিত্ব থাকে না।ইসলাম কায়েম থাকে না...অতএব ইসলাম রক্ষা করতে হলে,মুসলমান নামে অভিহিত হতে হলে...খলিফাকে রক্ষা করা,খলিফার রাজ্য,তাঁর ক্ষমতা ও পদমর্যাদা রক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরজ। (উদ্ধৃত:সুলায়মান কবীর,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১১২)
১১০. B.M.Taunk*, None-cooperation Movement in Indian Politics(1919-1924)*,Delhi,Sundeep Prakasan, 1978,p.16-18.
১১১. ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে ব্রিটিশ সরকার ভারতে ক্রমশ স্বায়ত্বশাসনের প্রতিশ্রুতি দেয়। (উদ্ধৃত: সতীশ পাকড়াশী, *অগ্নিযুগের কথা*, র‍্যাডিক্যাল ইমপ্রেশন,কলকাতা,২০১৫,পৃ.৮২)
১১২. নারায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৬১
১১৩. *প্রাগুক্ত*
১১৪. *প্রাগুক্ত*
১১৫. নারায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৭৪-৭৫
১১৬. সুপা সাদিয়া, *প্রাগুক্ত*,পৃ.২৪
১১৭. ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত-রায়, *প্রাগুক্ত*,পৃ.১৪৪
১১৮. নারায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৭৫-৭৬
১১৯. ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত-রায়, *প্রাগুক্ত*,পৃ.১৩৬-৩৭
১২০. *প্রাগুক্ত*,পৃ.১৩৬
১২১. নারায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*,পৃ.১১৭
১২২. ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত-রায়,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৩৭; নলিনীকিশোর গুহ,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৯১;রমেশচন্দ্র মজুমদার,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২৬৪
১২৩. সুপা সাদিয়া, *প্রাগুক্ত*,পৃ.২৫
১২৪. সুপা সাদিয়া, *প্রাগুক্ত*,পৃ.২৭
১২৫. চিন্মোহন সেহানবীশ ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত*,পৃ.১১
১২৬. *প্রাগুক্ত*,পৃ.১২৮

১২৭. *প্রাগুক্ত*

১২৮. *প্রাগুক্ত*

১২৯. করলে কারাবিভাগের বড় কর্তা সিমসনকে নিহত ও কতিপয় ইংরেজ অফিসার আহত হয়। (উদ্ধৃত:ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত-রায়, *প্রাগুক্ত*,পৃ.২৪৩

১৩০. *প্রাগুক্ত*;বিপানচন্দ্র ও অন্যান্য, *ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম*, কেপি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা,২০১৪,পৃ.১৯৫

১৩১. সতিশ পাকড়াশী,*প্রাগুক্ত*, পৃ.১৩৫-৩৭

১৩২. নলিনীকিশোর গুহ, *প্রাগুক্ত*,পৃ.২৭০,২৭৬

১৩৩. চিন্মোহন সেহানবীশ ও অন্যান্য,*প্রাগুক্ত*,পৃ.১৭১

১৩৪. সরল চট্টোপাধ্যায়,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৪০৮;কালিচরণ ঘোষ,*জাগরণ ও বিস্ফোরণ(১৯০৮-১৯৪৭),দ্বিতীয় খন্ড*, র‍্যাডিক্যাল ইমপ্রেশন,কলকাতা,২০১৭,পৃ.৩৫৩

১৩৫. সরল চট্টোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৪০৯

১৩৬. এম.জি.মুলকর,*আজাদী সৈনিকের ডায়েরি*, র‍্যাডিক্যাল ইমপ্রেশন, কলকাতা, ২০১৮, পৃ.৬২-৬৩

১৩৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ.৫৬-৫৭

১৩৮. *প্রাগুক্ত*,পৃ.৫৬-৫৭;৬২-৬৩

১৩৯. সরল চট্টোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৪১২-১৩

১৪০. *প্রাগুক্ত*,পৃ.৪১৩ (বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের নেতাজি গবেষক সৌম্যব্রতদাশ গুপ্ত বলছেন,১৯৪৫খ্রি. ১৮আগস্ট তাইওয়ানের তাইপে বিমান বন্দরে কোনো বিমান দূর্ঘটনা ঘটেনি। ১৮আগস্টে কথিত বিমান দূর্ঘটনায় সুভাষচন্দ্র বসুর মৃত্যুর ঘটনাটিকে তিনি উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে প্রচার করা হয়েছিল বলে উল্লেখ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে ঐ দিন নেতাজির মৃত্যুর সংবাদটি সঠিক নয়।)

১৪১. সৌম্যব্রত দাশগুপ্ত,*অগ্নিগর্ভ '৪৫ আদালতে আজাদ হিন্দ*,পত্রলেখা,কলকাতা,২০২৩,পৃ.৮০

১৪২. *প্রাগুক্ত*, পৃ.৮১

১৪৩. সরল চট্টোপাধ্যায়,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৪৬৩।

১৪৪. হায়দার আকবর খান রনো,*পলাশী থেকে মুক্তিযুদ্ধ,প্রথম খন্ড(মধ্যযুগ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত)*,পৃ.১২১

১৪৫. *প্রাগুক্ত*,পৃ.১২২-২৩; সুপ্রকাশ রায়,*ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম*, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৪১০

১৪৬. বিপানচন্দ্র ও অন্যান্য,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৩৮৮

১৪৭. সরল চট্টোপাধ্যায়,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৪৭২

১৪৮. কৃষ্ণধর, *প্রাগুক্ত*,পৃ.১০১-০২

১৪৯. সৌম্যব্রত দাশগুপ্ত,*প্রাগুক্ত*,পৃ.২১০

১৫০. কৃষ্ণধর, প্রাগুক্ত,পৃ.৭৮

১৫১. কৃষ্ণধর,*প্রাগুক্ত*, পৃ.৮০-৮২

১৫২. সতীশ পাকড়াশী,প্রাগুক্ত, পৃ.১৪৪

১৫৩. নাজমা জেসমিন চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*,পৃ.১৯

১৫৪. মালেকা বেগম, *দৈনিক প্রথম আলো*, তারিখ,০২.০৭.২০২১

১৫৫. কমলা দাশগুপ্ত, *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী*, র‍্যাডিক্যাল ইমপ্রেশন,কলকাতা,২০১৫,পৃ.৯৫

১৫৬. কমলা দাশগুপ্ত, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৯৬

১৫৭. পারভীন আক্তার জেমী, *প্রাগুক্ত*,পৃ.২৮; সুপ্রকাশ রায়,*ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম*,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৪১০; সরল চট্টোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৩০১

১৫৮. সুপ্রকাশ রায়, *ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম*,*প্রাগুক্ত*,পৃ.৪১১; ইয়াসমিন ও রাখী বর্মন,*ব্রিটিশ ভারতে রাজনৈতিক উন্নয়ন*, আজিজিয়া বুক ডিপো,ঢাকা, ২০০৬,পৃ.২৮৭

১৫৯. M N Majumdar, *Voilence, Non-Violence and Gandhi,* Frontier, Vol. 44, Non. 9, September 11-17, 2011. (উদ্ধৃত: https://www.frontierweekly.com), Accessed 0n 15 December, 2025

১৬০. *op.cit.,*

পরিশিষ্ট (ক)

তথ্য উৎস (Bibliography)

প্রাথমিক উৎস (Primary Sources):

Gladwin,Francis, *A Narrative of Transactiong in Bengal,* Stuart Press & Company, Calcutta,1788.

Jahangir,Emperor of Hindustan,*The Tuzuk-i-jahangiri or Memories of Jahangir* (Trans. by Alexander Rogers,2 vols.),Royal Asiatic Society, London,1904-1909.

Salim, Golam Hosain,*Riaz-uz-Salatin (Trans.by Abdus Salam),*Asiatic Society of Calcutta,1902.

Sen, Benoy Chandra. *Some Historical Aspects of the Inscriptions of Bengal,* University of Calcutta, Calcutta,1942.

বিভিন্ন সরকারি দলিলপত্র ও প্রতিবেদন(Documents):

*Bengal Judicial Proceedings,*April 3,1832.

*Bengal Judicial Proceedings,*April 30,1839.

*Bengal Judicial Proceedings,*April 7,1887,No.99.

*Bengal Judicial Proceedings,*April 20,1847.

*Bengal Judicial Proceedings,*September 10,1857.

*Bengal Judicial(Criminal) Proceedings,*May 29,1843.

*Bengal Judicial(Criminal) Proceedings,*October 25,1848.

*Bengal Judicial(Criminal) Proceedings,*January 23,1850.

*Bengal Revenue Proceedings,*1772-1857.

Khan, M.A.(ed.), *Selection from Bengal Goverment Records on Wahhabi Trials,1865-1870,*Asiatic Society of Pakistan,Dacca,1961.

*Reports of the land Revenue Commission,*Bengal,Vol.1,1940.

Samanta,Amiya K.(ed.),*Terrorism in Bengal:A Collection of Documents on Terrorist Activities From 1905 to 1939*,Volume 1, Goverments of West Bengal,1995.

.....,*Terrorism in Bengal:A Collection of Documents on Terrorist Activities From 1905 to 1939,*Volume 11,Goverments of West Bengal,1995.

.....,*Terrorism in Bengal:A Collection of Documents on Terrorist Activities From 1905 to 1939,*Volume 111,Goverments of West Bengal,1995.

.....,*Terrorism in Bengal:A Collection of Documents on Terrorist Activities From 1905 to 1939,*Volume 1V,Goverments of West Bengal,1995.

.....,*Terrorism in Bengal:A Collection of Documents on Terrorist Activities From 1905 to 1939,*Volume V,Goverments of West Bengal,1995.

.....,*Terrorism in Bengal:A Collection of Documents on Terrorist Activities From 1905 to 1939,*Volume V1,Goverments of West Bengal,1995.

Government of Bengal. *Administration of Bengal Under the early of Ronaldshay*, 1917-1922, Bengal Secretariat Press, Calcutta,1922.

.....*Bengal Self-Government Act III of 1885*. Bengal Secretariat Book Depot., Calcutta,1933.

.....*Bengal village Self-Government Act.V,*1919, Bengal Government Press,Alipure, 1937.

.....*Report on the Administration of Bengal*:1871-71.Part I,Bengal Secretariat Press, Calcutta,1875.

.....*Report on the Administration of Bengal:1886-87*,Bengal Secretariat Press, Calcutta,1888.

.....*Report on the Public Instruction in Bengal:1886-87*.

.....*Report on the Public Instruction in Bengal:1902-03.*

.....*Report on the Public Instruction in Bengal:1904-05*,Bengal Secretariat Press, Calcutta,1905.

.....*Imperial Gazetteer of India,* Vol. XIV, New edition,Clarendon Press,Oxford, 1908.

.....*Imperial Gazetteer of India. Vol. IV*. New edition. Clarendon Press. Oxford, 1909.

Progress of Education in Bengal, 1912-13 to 1916-17.

*Report of the Indian Education Commission,*1882,Chapter-V.

Report of the Indian Education Commission, Chapter-V ,1835,W.Adam, Low Price Publication, Culcutta, 1976.

*The Administration of Bengal under Sir Andrew Fraser 1903-08,*The Government of Bengal,Calcutta, 1908.

*Report of Indian Industrial Commission,*1916-18.

আদমশুমারি (Census):

Beverly,H. *Report on the Cencus of Bengal,1872.* Bengal Secretariat Press, Calcutta, 1872.

Bowedillon,J.A. *Cencus of Bengal,1881.* Bengal Secretariat Press, Calcutta,1883.

Donnell,C.J.O. *Cencus of Lower Province Bengal,1891*.Bengal Secretariat Press, Calcutta,1893.

Gait,E.A. *Cencus of India, 1901.Vol.V &VI, Part I*, Bengal Secretariat Press, Calcutta, 1902.

Porter,A.E. *Cencus of India, 1931.Vol.V,Part I,*General Publication Brance,Calcutta, 1933.

Thompson, H.H. *Cencus of India, 1921.Vol.V,Bengal Part I,*Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1921.

অগ্নিযুগের গ্রন্থমালা (Books of Revolutionist):

কানুনগো,হেমচন্দ্র,*বাংলার বিপ্লব প্রচেষ্টা*,র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেসন,কলকাতা,২০১৬।

গঙ্গোপাধ্যায়,বিশ্বনাথ,*ভারতের সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রাম*,র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেসন,কলকাতা,২০১৪।

গুহ, নলিনীকিশোর,*বাংলায় বিপ্লববাদ*,র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেসন,কলকাতা,২০১৭।

ঘোষ,কালীচরণ,*জাগরণ ও বিস্ফোরণ বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবের পূর্বাপর ইতিবৃত্ত(১৭৫৭-১৯০৭)*,প্রথম খন্ড,র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেসন,কলকাতা,২০১৭।

.....,*জাগরণ ও বিস্ফোরণ দ্বিতীয় খন্ড*,র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেসন,কলকাতা,২০১৭।

.....,বারীন্দ্রকুমার,*বারীন্দ্রের আত্মকাহিনী ও সন্ত্রাসবাদীর প্রতি*,র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেসন,কলকাতা,২০১৬।

চক্রবর্তী,ত্রৈলোক্যনাথ,*জেলে ত্রিশ বছর ও পাক–ভারতের স্বাধীনতা*,র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেসন,কলকাতা,২০১৫।

চন্দ্র,গঙ্গানারায়ণ,*অবিস্মরণীয়*,র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেসন,কলকাতা,২০১৬।

....,হরিনারায়ন,*বিপ্লবীর সাধনা*, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেসন,কলকাতা,২০১৫।

দত্ত,উল্লাসকর,*কারাজীবনী*,র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেসন,কলকাতা,২০১৫।

....,কল্পনা,*চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণকারীদের স্মৃতিকথা*,র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেসন,কলকাতা,২০২০।

....,ভূপেন্দ্রনাথ,*অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাস*,র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেসন,কলকাতা,২০১৭।

.....,*ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম*,র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেসন,কলকাতা,২০১৭।

দাশ,শান্তি,*অরুণ-বহ্নি*,র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেসন,কলকাতা,২০১৭।

....,বীণা,*শৃঙ্খল ঝঙ্কার*,র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেসন,কলকাতা,২০১৫।

দাশগুপ্ত,কমলা,*স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী*,র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেসন,কলকাতা,২০১৫।

.....,পূর্ণানন্দ,*বিপ্লবের পথে*,র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেসন,কলকাতা,২০১৭।

দেউস্কর,শ্রীসখারাম গণেশ,*দেশের কথা*,র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেসন,কলকাতা,২০১৬।

পাকড়াশী,সতীশ,*অগ্নিযুগের কথা*,র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেসন,কলকাতা,২০১৫।

বসু,সুভাষচন্দ্র,*অসমাপ্ত আত্মজীবনী (অনু.রাব্বি উস সানী)*,সবুজপাতা,ঢাকা,২০১৫।

.....,*কেন দেশ ছেড়েছি (সম্পা.,নন্দ মুখোপাধ্যায়)*,মুক্তদেশ প্রকাশন,ঢাকা,২০১৮।

বাগচী,অমলেন্দু,*অগ্নিযুগের আগ্নেয়াস্ত্র*,র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেসন,কলকাতা,২০১৬।

বন্দ্যোপাধ্যায়,উপেন্দ্রনাথ,*নির্বাসিতের আত্মকথা*,র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেসন,কলকাতা,২০১৮।

.....,নারায়ণ,*বিপ্লবের সন্ধানে*,র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেসন,কলকাতা,২০১৫।

ভট্টাচার্য,অবিনাশ,*বৈপ্লবিক সমিতির প্রারম্ভকালের ইতিহাস ও অন্যান্য*,র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেসন,কলকাতা,২০১৭।

ভৌমিক,মদনমোহন,*আন্দামানে দশ বৎসর*,র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেসন,কলকাতা,২০১৭।

মজুমদার,সত্যেন্দ্রনারায়ণ,*বন্দী জীবন*,র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেসন,কলকাতা,২০১৪।

মুলকর,এম.জি,শুভেন্দু,*আজাদী সৈনিকের ডায়েরি*,র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেসন,কলকাতা,২০১৮।

মুখোপাধ্যায়,যাদুগোপাল,*বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি*, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেসন,কলকাতা,২০১৯।

রক্ষিত-রায়,*ভূপেন্দ্রকিশোর*,*ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব*, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেসন,কলকাতা,২০১৬।

.....,*সবার অলক্ষ্যে*, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেসন,কলকাতা,২০১৫।

রায়,পবিত্র মোহন,*নেতাজির সিক্রেট সার্ভিস(সম্পা.,সৈকত নিয়োগী ও সৌম্যব্রত দাশগুপ্ত)*,ভাষাভেঞ্চার প্রাইভেট লিমিটেড,কলকাতা,২০২৪।

লাহিড়ী,জীতেশচন্দ্র,*নমামী*,র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেসন,কলকাতা,২০১৭।

.....,*বিপ্লবী বীর নলিনী বাগচী*,র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেসন,কলকাতা,২০১৭।

সিংহ,অনন্ত,*অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম*,র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেসন,কলকাতা,২০১৬।

.....,*আমি সেই মেয়ে*,র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেসন,কলকাতা,২০১৫।

.....,*কেউ বলে বিপ্লবী কেউ বলে ডাকাত*,র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেসন,কলকাতা,২০১৮।

.....,*চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহ প্রথম খন্ড*,র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেসন,কলকাতা,২০১৭।

.....,*চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহ দ্বিতীয় খন্ড*,র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেসন,কলকাতা,২০১৭।

.....,*সূর্য সেনের স্বপ্ন ও সাধনা*,র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেসন,কলকাতা,২০১৯।

.....,*মহানায়ক সূর্য সেন ও চট্টগ্রাম বিপ্লব*,র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেসন,কলকাতা,২০১৮।

হালদার,জীবনতারা,*অনুশীলন সমিতির ইতিহাস*,র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেসন,কলকাতা,২০১৬।

গৌণ উৎস (Secondary Sources)

ইংরেজি গ্রন্থঃ

Ahmad, Kamruddin. *A Socio-Political History of Bengal and the Birth of Bangladesh.* Dacca: Inside Library,1975.

....., Nafis. *An Economic Geography of East Pakistan*.London: Oxford University Press,1968.

Ahmed, Sufia. *Muslim Commuunity in Bengal(1884-1912),*University Press Ltd.,1996.

....., Qeyamuddin. *The Wahabi Movement in India,*Firma K.L. Mukhopadhyay, Calcutta,1966.

....., Rafiuddin.The Bengal Muslims,1871-1906: A Quest for Identity, Oxford University Press. New York,1981.

Akthter,Shirin,*The Role of Zamindars in Bengal 1707-1772,*Dhaka,1982.

Ali,Karam,Muzaffar Nama,MS.No.VII,,*Khuda Bakhsh Public Library,Patna, Eng. Trans. Jadunath Sarkar,*Calcutta,,1952.

....,Mohar.*The Fall of Sirajuddulah,*Chittagong,1975.

.....,*History of the Muslims of Bengal,*Vol.II,Islamic Foundation,Dhaka,2004.

...., Mohammad Mohar. *The Bengali Reaction to Christan Missonary Activities 1833-1857,*The Mehrub Publications,Chittagong: 1965.

Anderson, G. and M.Subedar,*The Expansion of British India 1818-58,*G.bell and Sons Ltd.,London,1918.

Aspinal, C.A. Cornwallis in Bengal,Manchester,1931.

Ascoli, F.David,*Early Revenue History of Bengal and the fifth Report*,Oxford University Press.London,1917.

Aziz, K.K., Amir Ali:*His Life and Work,* Lahore,1968.

Bagal, J.C., *Peasant Revolution in Bengal,*Calcutta,1953.

Bahadur, L., *The Muslim League:Its History,Activation and achievement,*Agra,1954.

Bari, Abdul, A History of Freedom Movement (1707-1947),Vol.II,Pakistan Historical Society,Karachi,1957.

Bernier,Francois,*Travels in the Moghul Empire,*S.Chand and Co.,New Delhi,1972.

Benerjee,S.N.,*A Nation in Making,*Oxford University Press,London,1963.

.....,A.C.(ed.,), *Indian Constitutional Documents,Vol.*II,A Mukherjee and Co., Calcutta,1948.

.....,A.C.,*The Agrarian System of Bengal(1582-1793),*Vol.I,K.P.Bagchi & Co., Calcutta,1980.

.....,*The Agrarian System of Bengal,*Vol.II,K.P.Bagchi & Co.,Calcutta,1981.

Bhatia,O.P.Singh, *History of India,* S.Amardeep Publishers,New Delhi,1975.

Bhattacharja,Dhiresh, *A Coinsize History of Indian Economy 1750-1950*,Gyandeep, New Delhi,1979.

Bhattacharya,*The East India Company and the Economy of Bengal,*Low Price Publication, Calcutta,1969.

Bottomore, T.B.,*Classes in Mordern Society*, Georg Allen and Unwin,London,1963.

Bolts,William,*Considderations on Indian Affairs;Particularly Respecting The Present State of Bengal and Its Dependencies,*2nd ed.,J.Alman,London,1772.

Brecher,Micael, *Neheru:A Political Biography,* Oxford University Press,London,1969.

Buckland,C.E., *Bengal under the Lieutenant Govornor,*Vol.I,S.K Lahiri and Co., Calcutta,1901.

....., *Bengal Under Lietenant Govornors,*Vol.II, Deep Publication, Calcutta, 1976.

Chand,Tara, *History of Freedom Movement in India,*Vol.I, Publications Divisions Ministry,India, Delhi,1992.

Chaterjee,Sanjib Chandra *Bengal Riots:Their Rights and Liabilities,* K.P.Bagchi, Calcutta,1977.

Chowdhury,Nurul Haq,*Peasant Radicalism in Nineteenth Century Bengal,*Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka,2001.

.....,Binoy, *Growth of Commercial Agriculture in Bengal,*Vol.I,R.K.Maitra, Calcutta,1964.

.....,Sirajul Islam(ed.),*The History of Bangladesh*,Vol.I,Asiatic Society of Bangladesh,Dhaka,1993.

.....,Soshi Bhushan,*Civil Rebilion in the Indian Mutinies,*World Press Private, Calcutta,1957.

Colebrook,H.T.,*Remarks on the Present State of Husbandary and Commerce of Bengal*,Calcutta,1804.

De,Amalendee, Roots of Separaratism in Nineteenth Century Bengal.Callcutta,1974.

Desai,A.R., S*ocial Background of Indian Nationalism.,*Popular Book Depot., Bombay, 1959.

Desraeli,Benain,*Military Mutiny or National Revolt,India in 1857*,Ed.Ember,Delhi, 1963.

Dodwell, H.,*Cambridge History of India,*Cambridge University Prees,Delhi,1963.

Dutta,R.Palme.,*India Today*,People's Publishing House,Bombay,1949.

.....,R. C.,*The Economic History of India,*Vol.II,A.M.Kelly,NewYork,1969.

.....,Ramesh Chandra, *The Economic History of India,* Low Price Publications,Delhi, 1990.

....., *Peasentry of Bengal,* L.L.C Publications,New Delhi,2009.

Dhangare,D.N.,*Peasent Movement in India (1920-1850),*Oxford University Press, Delhi,1983.

Edwards,Micheal,*Battles of Indian Mutiny*,London,1957.

E.F.,Robert,(ed.), *Land Controll and Social Structure in Indian History*,Delhi,1979.

Field,C.D., *Introduction to the Regulations of Bengal Code*,Calcutta,1883.

Firminger,W.K., *Historical Introduction to the Bengal Portion of the fifth Report,* Bengal Secretariat Press, Calcutta,1962.

Fraser,Lovat, *India under Curzon and after,* Heinemann,London,1911.

Gaham,G.F.I.,*The Life and Work of Sir Syed Ahmed Khan*,Oxford University Press, Karachi,1974 (Reprint).

Guha,Ranjit, *A Rule of Property for Bengal:An Essay on the Idea of Permanent Settlement*, Orient Longman, Delhi,1982.

....., *Elementery Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India,*Oxford University Press,Delhi,1983.

Gopal,Ram*,Indian Muslims,A Political History (1858-1947),*Asia Publishing House, Calcutta,1964.

Gould,Julius, and William L.Kolt (eds.), *A Dictionary of Social Science,*Tavistock Publication,London,1964.

Graver,B.L.,and R.R.Sethi., *A New Look on Mordern Indian History,*S.Chand and Co., Ltd.,New Delhi,1979.

Hardy,P.,*The Muslims of British India,* Cambridge at the University Press,1972.

Habib,Irfan,*Agrarian System of Mughal India,*Asia Publishing House,Delhi,1979.

Hashmi,Tajul Islam,*Pakistan as a Peasant Utopia,The Communalization of class politics in East Bengal,1920-1947,*Westview,Oxford,USA,1992.

Husain,Mahmud(ed.),*A History of the Freedom Movement,*Vol.III,Part-I, Pakistan Historical Society, Karachi,1963.

Husband,Young,*Transactions in India,* John Stockdale, London,1786.

Hunter,W.W., *Annals of Rural Bengal,* Smith,Elder & Co.,London,1883.

....., *The Indian Musulmans*,Primier Book House,1968.

*A Statistical Account of Bengal,*Vol.V(Reprint),Delhi,1973.

Islam,Sirajul(ed.),*History of Bangladesh 1704-1971),Vol., I,II,III,* Asiatic Society of Bangladesh,1992.

.....,*The Parmanent Settlement in Bengal,A Study of Its Operation1790-1819,* Bangla Academy,Dacca,1979.

.....,*Bengal Land Tenure: The Origin and Growth of Intermediate Interests in the,19th Century,* K.P.Bagchi & Co., Calcutta,1988.

Kabeer,Rokeya Rahman, *Administrative Policy of Government of Bengal,*1870-1890, Dacca, 1965.

Karim,A.K.Nazmul, *The Changing Society of India and Pakistan,*Ideal Publications, Dacca,1961.

....., *The Dynamics of Banladesh Society,*Vikas,New Delhi,1980.

Kaye, J.W., *A History of the Sepoy War in India,1857-58,*Vol.I, London,1877.

Keith(ed.),A.B., *Speaches and Documents on Indian policy,1750-1921,*Vol.1,Oxford University Press,London,1922.

Khan,A.M.,*Transition in Bengal:A Study of Saaiyid Muhammad Reza Khan(1756-75), Cambridge* University Prees,London,1969.

Kling,B.B.,*The Blue Mutiny:The Indigo Disterbances in Bengal,1559-62,*University of Pennsylvania Press,Philadephia,1966.

Leasor,James,*The Red Fort: An Account of Sige of Delhi in 1857,* W.Laurie, Delhi, 1957.

Macaulay,T.B., *Eassy on Lord Clive,*Kessinger Publishing,London,2010.

Majumder, Ambika Charan,*Indian National Evolution.,*Natesan & Co.,Madras,1917.

Mallick, A.R.,*British policy and the muslims in Bengal 1757-1856,*Bangla Academy, Dacca,1977.

Majumder,R.C.,*Glimpses of Bengal in Nineteenth Century,*Firma K.L.Mukhopadhyay, Calcutta,1985.

.....,(ed.), *British Paramountacy and the Indian Renaissance, Part-II, Bhartiya Vidya Bhawan*,Bombay,1956.

....., The History of Bengal, Vol.I,Dacca University,Dacca,1943.

.....,*The Sepoy Mutiny and the Revolt of 1857*,2nded.,Firma K.L. Mukhopadhyay, Calcutta, 1963.

.....,*An Advance History of India*, Macmillan India Ltd.,Delhi,2003.

Mahmood, Syed, *A History of English Education in India(1781-1893)*, K.P.Bagchi, Calcutta,1991.

Maitra,Joyanti,*Muslim Politics in Bengal (1805-1906),*K.P.Bagchi and Co.,Calcutta, 1984.

Marx,Karl,and Federic Angel, *Selected Works*, International Publishers,London,1968.

Misra, B.B., *The Indian Middle Classes:Their Growth in Modern Times,* Oxford University Press. London.1961.

Mitra,Debandra Bijoy,*The Cotton Weavers of Bengal,1757-1833*,Firma K.L.M., Calcutta,1965.

Moreland, W.H., *India at the Death of Akbar,* Oxford University Press,London,1920.

Mukherjee,Radha Kamal,*Land Problems In India*,Longmans,1933.

Mukherji,S.N.,*History on Education on India(Mordern Period)*,Gian Publishing House,Delhi,1983.

Muir,Ramsay,*The Making of British India1756-1858,*Manchester University Press, London,1923.

Mallick, A.R.,*British policy and the Muslims in Bengal 1757-1856,*Bangla Academy, Dacca,1977.

Malleson,Colonel G.B.,*Lord Clive and Establishment of the English in India,*S.Chand and Co., Delhi,1962.

Marshal, P.J., *Problems od Empire:Britain and India1757-1813,*Cambridge Unicersity Prees, London, 1923.

Norton,*Rebellion In india:How to Prevent another*,Richardson Brothers,London, 1857.

Palit, Chittabrata,*Tensions in Bengal Rural Society:Landlords, Planters and Colonial Rule (1830-1860)*, Oreint Longman,New Delhi,1998.

Panda,D.Chitta,*The Decline of the Bengal Zamindars;Madinipore (1874-1820),* Oxford University Press,Delhi,1986.

Philip,C.H.,*The Evolution of India and Pakistan,1858-1947,*George Allen and Unwine Ltd., London,1962.

.....,& M.Doreen, *Indian Society and African Studies,* Praaeger Publishers,

London,1976.

Powell,B.H.Baden, *A Short Account of the Land Revenue and its Administration in British India:with a Sketch of the Land Tanures*,Clarendon Press,Oxford,1913.

....., *Land Revenue System of India,*2 vols., at the Claren Press,London, 1889. Qureshi,

I.H.,*The Struggle for Pakistan,*2nd ed.,University of Karachi,Karachi,1969.

Rahim,M.A., *Social and Cultural History of Bengal,*Vol.2,Karachi,1961.

Ray,B.Datta(ed.),*The Emergence and Role of Middle Class in North-East India,*Uppal Pub.House,New Delhi,1983.

....,Ratnalekha,*Changes in the Bangla Agrarian Society (1760-1850)*, Monoharlal, Delhi,1979.

Salahuddin,A.F.M.,Social Ideas and Social Change in Bengal 1835-1919, Radhi, Calcutta,1976.

Sarkar,J.N.,*The History of Bengal,*Vol.II, Dacca University,Dacca,1965.

.....,Susobhan, *Bangali Renaissance and other Essays,*Oxford Press,New Delhi, 1970.

Savarkar, V.D.,*The Indian War of Independence of 1857*,Phoenix Publications, Bombay,1947.

Scrafton, Luke, *A History of Bengal before and after the Plassey(1739-1758),*Oxford University Prees, Delhi,1975.

Sinha, C.J. *Economic Annals of Bengal,* Calcutta,1927.

.....,N.K.,*The Economic History of Bengal,* Vol.I, Firma L.K.M.,Calcutta,1965.

.....,*The Economic History of Bengal,*Vol.II,K.L. Mukhopadhya,Calcutta,1965.

.....,(ed.),*The History of Bengal (1757-1905),*Calcutta University,Calcutta, 1967.

Skrine,F.H.B., *Memorandum on the Material Condition of the lower Orders in Bengal during the ten years from 1881-82 to 1891-92,*Calcutta,1862.

Smith,C.W.,*Mordern Islam in India,A Social Analysis,* Ripon Printing Press,London, 1947.

.....,R.Bosworth., *Life of Lord Lawrence,*Vol.2,Charles Scribner's Sons,New york, 1883.

....., V.A.,*Oxford History of India,*4th Edition,Oxford University Prees,Oxford, 1981.

Sen,Rangolal., *Political Elites in Bangladesh,* UPL,Dhaka,1986.

.....,Sachin,*Studies in the Land Economics of Bengal,*The Book Co.Ltd.,Calcutta,

1935.

.....,Sunil., *Agrarian Relations in India(1793-1947),*People's Publishing House,New Delhi,1979.

.....,Surendra Nath., *Eighteen Fifty Seven*,Publications Divition,New Delhi,1957.

Sherer,J.W.,*Daily life During the Indian Mutiny,Personal Experience of 1857,*Legend Publications,London,1974.

Stock,A.G.,*Memories of Dacca University,1947-51,*Dacca University,1965.

Tripathi,Amolesh, *Trade and Finance in Bengal Presidency:1793-1833,*Oxford University Prees, Calcutta, 1979.

Vansittart, H., *A Narrative of the Transactions in Bengal*, Vol.I,London,1766.

Woodrow,H.,*Macaulay's Minutes on Education in India,* Ashish Publishing House, Calcutta,1862.

Weber, Max., *Essays in Soceity,*(Trans.) by H.H.Greth and Wright Mills,Nutt,London, 1946.

বাংলা গ্রন্থঃ

আজাদ,মৌলানা আবুল কালাম,*ভারত স্বাধীন হল* (অনু.সুভাস মুখোপাধ্যায়),ওরিয়েন্টলংম্যান প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা,২০১৫।

আজম,মোহাম্মদ,বাংলা ভাষার উপনিবেশায়ন ও রবীন্দ্রনাথ,আদর্শ,ঢাকা,২০১৯।

আনসারী,অধ্যাপক মুসা,*ইতিহাস:সমাজ ও সংস্কৃতি ভাবনা*,বাংলা একাডেমী,ঢাকা,১৯৯২।

আনিসুজ্জামান,*মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য(১৭৫৭-১৯১৮)*,মুক্তধারা,ঢাকা,১৯৭১।

আন্তোনভা,কোকা ও অন্যান্য,*ভারতবর্ষের ইতিহাস*,প্রগতি প্রকাশন,মস্কো,১৯৮৬।

আবীর,আবরার,*বাঘা যতীন*,আফসার ব্রাদার্স,ঢাকা,২০১৪।

আলী,সৈয়দ মকসুদ,*রাজনীতি ও রাষ্ট্রচিন্তায় উপমহাদেশ*,বাংলা একাডেমী,ঢাকা,১৯৮৮।

আহমদ,ওয়াকিল,*উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা*,বাংলা একাডেমী,ঢাকা,১৯৯৭।

.....,কামরুদ্দিন,*বাংলার মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশ*,স্টুডেন্ট পাবলিকেশন,ঢাকা,১৩৮২ সন।

আহমেদ,ইয়াসমিন,*উপমহাদেশে রাজনীতি ও স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব*,আজিজিয়া বুক ডিপো,ঢাকা,১৯৯৪।

.....,ও রাখী বর্মণ,*ব্রিটিশ ভারতে রাজনৈতিক উন্নয়ন*,আজিজিয়া বুক ডিপো,ঢাকা,২০০৬।

ইসলাম,আমিনুল,*বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও জাতীয়তাবাদ*,দিব্য প্রকাশ,ঢাকা,২০১৫।

.....,সিরাজুল,*বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থা ও সামাজিক সমস্যা*,কথা বিচিত্রা,ঢাকা,১৯৮১।

ইসলাম,সিরাজুল,*বাংলাদেশের ইতিহাস*,এশিয়াটিক সোসাইট,ঢাকা,১৯৯৩।

.....,*বাংলার ইতিহাস:ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো*,চয়নিকা,ঢাকা,২০০৮।

উমর,বদরুদ্দিন,সাম্প্রদায়িকতা,মুক্তধারা,ঢাকা,১৯৮৭।

কালাম,আবুল,*সুভাষ বসুর রণনীতি ও কূটনীতি*,বাংলা একাডেমী,ঢাকা,২০০৭।

কবিরাজ,নরহরি,*স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা*,ন্যাশনাল বুক এজেন্সি,কলকাতা,১৯৬১।

করিম,নাজমুল,*সমাজ বিজ্ঞান সমীক্ষণ*,১৯৭৩।

কুমার,কুমুদ,*রাজা রামমোহন রায়:বঙ্গ দেশের অর্থনীতি ও সংস্কৃতি*,বর্ণ পরিচয়,কলকাতা,১৯৯২।

গুপ্ত,প্রমোদসেন,*নীল বিদ্রোহ ও বাঙালি সমাজ*, কলিকাতা,১৯৬০।

খান,কে.এম.রাইছ উদ্দিন,*বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা(প্রাচীন,মধ্য ও আধুনিক)*,খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানী,ঢাকা, ১৯৯৪।

....,এ.কে.এম.শওকত আলী,*বাংলাদেশের সমাজ কাঠামো*,গ্রন্থকুটির,ঢাকা,২০১৬।

গঙ্গোপাধ্যায়,সত্যেন্দ্রনাথ,*বাংলার বিপ্লব প্রচেষ্টার বিস্মৃত অধ্যায়*,র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেসন,কলকাতা,২০১৬।

ঘোষ,কালীচরণ,*জাগরণ ও বিস্ফোরণ বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবের পূর্বাপর ইতিবৃত্ত(১৭৫৭-১৯০৭)*,প্রথম খন্ড,র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেসন,কলকাতা,২০১৭।

.....,*জাগরণ ও বিস্ফোরণ দ্বিতীয় খন্ড*,র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেসন,কলকাতা,২০১৭।

....,বিনয়, *বাংলার বিদ্বৎসমাজ-সমাজ*,দে'জ পাবলিশিং,কলিকাতা,১৯৭৮।

.....,*বাংলার নবজাগৃতি*, হাওলাদার প্রকাশনী,ঢাকা,২০১৬।

....., জীবন,*অগ্নিযুগের অস্ত্রগুরু হেমচন্দ্র*,র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেসন,কলকাতা,২০১৭।

চক্রবর্তী,প্রফুল্ল কুমার,*ফরাসী বিপ্লব*,পশ্চিবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ,কলকাতা,২০০০।

.....,রতন লাল,*সিপাহী যুদ্ধ ও বাংলাদেশ*,ঢাকা,১৯৯৬।

.....,*ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রন্থিত ইতিহাস(১৯২১-১৯৫২)*,দি ইউনিভার্সেল একাডেমী,ঢাকা,২০১৩।

চ্যাটার্জী,জয়া,*বাংলা ভাগ হলো(অনু.,আবু জাফর)*,দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড,ঢাকা,২০০৩।

চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র,*বঙ্কিম রচনাবলী* দ্বিতীয় খন্ড,সাহিত্য সংসদ,কলকাতা,১৩৮৪।

.....,সরল,*ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ*,পশ্চিবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ,কলকাতা,১৯৮৫।

চন্দ্র,বিপান,*ভারতে অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ও বিকাশ*,কে.পি বাগচী,কলকাতা,১৯৯৮।

....., ও অন্যান্য,*ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ১৮৫৪৭-১৯৪৭(অনু.,সুনীল মুখোপাধ্যায়)*,কে পি বাগচী,কলকাতা, ২০১৪।

চৌধুরী,বিনয়,*বাংলার ভূমিব্যবস্থার রূপরেখা*,নিউএজ পাবলিকেশন্স,কলকাতা,১৯৮১।

.....,প্রমথ,*রায়তের কথা*,কলকাতা,১৯৪৪।

ত্রিপাঠি,অমলেশ,*ভারতের মুক্তি সংগ্রামে চরমপন্থী পর্ব*,আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড,কলকাতা,১৯৮৭।

দত্ত,সোনালী,*প্রীতিলতা*,র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেসন,কলকাতা,২০১৫।

.....,*বাঘা যতীন*,র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেসন,কলকাতা,২০১৭।

.....,*মুক্তি সংগ্রামে বাংলার উপেক্ষিতা নারী*,র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেসন,কলকাতা,২০১৫।

.....,*ক্ষুদিরাম*,র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেসন,কলকাতা,২০১৯।

দাশগুপ্ত,সৌম্যব্রত,*অগ্নিপুরুষ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত*,র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেসন,কলকাতা,২০১৮।

.....,*জাপানে রাসবিহারী*,র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেসন,কলকাতা,২০১৯।

দীক্ষিত,জে.পি.,*১৮৫৭ সিপাহী বিদ্রোহ প্রসঙ্গ*, কে.পি.বাগচী,কলকাতা,১৯৭৫।

দে,অমলেন্দু,*বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ*,জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ,ঢাকা,২০১৭।

বসু,সৌম্য,*ভারতের মুক্তি সংগ্রাম ও বাংলার মুসলমান*,বর্ণ সংস্থাপন,কলকাতা,২০১৮।

....,বিজন বিহারী,*কর্মবীর রাসবিহারী*,র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেসন,কলকাতা,২০১৭।

বাগল,যোগেশচন্দ্র,*মুক্তির সন্ধানে ভারত*,বিবেকানন্দ বুক সেন্টার,কলকাতা,২০১৩।

বাছির,আবদুল,*বাংলার কৃষক বিদ্রোহ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণি*,বাংলা একাডেমী,ঢাকা,২০১২।

বন্দ্যোপাধ্যায়,সন্দীপ,*নৌবিদ্রোহ ঝলসে-ওঠা তলোয়ার*,র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেসন,কলকাতা,২০১৫।

.....,রাখালদাস,*বাংলার ইতিহাস,প্রথম খন্ড*,*দেজ* পাবলিশিং,কলকাতা,১৯৮৭।

.....,রাখালদাস,*বাংলার ইতিহাস,দ্বিতীয় খন্ড*,*দেজ* পাবলিশিং,কলকাতা,১৯৮৮।

.....,সুপ্রসন্ন,*ইতিহাস আশ্রিত বাংলা কবিতা(১৭৫১-১৮৫৫)*,বর্ণ প্রকাশ,কলকাতা,১৯৭৭।

ভূঁইয়া,ড.গোলাম কিবরিয়া,*বাংলায় মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ*,খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি,ঢাকা,২০১৩।

ভট্টাচার্য,তুহিন শুভ্র,*ব্রিটিশ পুলিশের টিকটিকি ও অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের গুপ্তচর*,পত্রলেখা,কলকাতা,২০১৯।

ভদ্র গৌতম,*ইমান ও নিশান,বাংলার কৃষক চৈতন্যের এক অধ্যায়*,সুবর্ণ রেখা,কলকাতা,১৯৯৪।

মকসুদ,সৈয়দ আবুল মকসুদ,*বাঙালি জাতি বাঙালি মুসলমান ও বাঙালি জাতীয়তাবাদ*,সূচীপত্র,ঢাকা,২০২০।

মওদুদ,আবদুল,*মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ;সংস্কৃতির রূপান্তর*,মাওলা ব্রাদার্স,ঢাকা:২০১১।

মজুমদার, রমেশচন্দ্র, *বাংলাদেশের ইতিহাস (প্রাচীন যুগ)*,জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা,১৯৯২।

.....,*বাংলাদেশের ইতিহাস (মধ্যযুগ)*,জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা,১৯৭৮।

.....,*বাংলাদেশের ইতিহাস(৪র্থ খন্ড)*,*১৯০৫-৪৭*,জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা,১৯৭৫।

.....,শুভেন্দু,*অগ্নিযুগের ফাঁসি*,র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেসন,কলকাতা,২০১৭।

.....,*অগ্নিযুগের চিঠি*,র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেসন,কলকাতা,২০১৮।

মুকুল,এম আর আখতার,*কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী*,অনন্যা,ঢাকা,২০১৪।

মুরশিদ,গোলাম,*রেনেসন্স বাংলার রেনেসন্স*,অবসর,ঢাকা,২০১৫।

মুখোপাধ্যায়,সুবোধ কুমার,*বাংলার আর্থিক ইতিহাস*,অষ্টাদশ শতাব্দী,কে.পি.বাগচী এন্ড কোং.,কলকাতা,১৯৮৫।

.....,*বাংলার আর্থিক ইতিহাস*,ঊনবিংশ শতাব্দী,কে.পি.বাগচী অ্যান্ড কো.,কলকাতা,১৯৮৭।

.....,*বাঙালি মধ্যবিত্ত ও তার মানসলোক*, কে পি বাগচী,কলকাতা,১৯৯৮।

মুনতাসীর *মামুন (সম্পা.),চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বাঙালি সমাজ,মাওলা ব্রাদার্স,ঢাকা,২০১৭*।

মিত্র,অমরেন্দ্র প্রসাদ,*নীল বিদ্রোহ*,ভারত কোষ,চতুর্থ খন্ড,কলকাতা,১৯৭০।

রহমান,মো.মকসুদুদুর,*বঙ্গভঙ্গ ও বাঙালির ঐক্য ?* প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা,ঢাকা,২০১৪।

রশিদ,হারুন অর,*বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০*,নিউএজ পাবলিকেশন,ঢাকা,

২০০৭।

রহিম,এম.এ.,*বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস(১২০৩-১৫৭৬)*,১ম খন্ড,বাংলা একাডেমী,ঢাকা,১৯৮২।

.....,*বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস(১৭৫৭-১৯৪৭)*,আহমদ পাবলিশিং হাউস,ঢাকা,২০১৭।

রায়,অন্নদাশঙ্কর,*বাংলার রেনেসাঁস*,বাণীশিল্প,কোলকাতা,২০০৪।

....,কুমুদ কুমার,*রাজা রামমোহন রায়:বঙ্গদেশের অর্থনীতি ও সংস্কৃতি*,বর্ণ পরিচয়, কলিকাতা,১৯৮৭।

....,শিবনারায়ন,*রেনেসাঁস*,শিল্পতরু প্রকাশনী,ঢাকা,১৯৯২।

....,সুপ্রকাশ,*ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম*, র‍্যাডিক্যাল,কলকাতা,২০১৮।

.....,*ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস(১৯০১-১৮)*,ডিএনবিএ ব্রাদার্স,কলকাতা,১৯৭০।

.....,*ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম(১৮৯৩-১৯৪৭)*,র‍্যাডিক্যাল,কলকাতা,২০১৩।

রনো,হায়দার আকবর খান,*পলাশী থেকে মুক্তিযুদ্ধ,প্রথম খন্ড*,ছায়াবীথি,ঢাকা,২০১৮।

শহীদুল্লাহ,মোঃ,*বাংলাদেশ বিষয়াবলি:ইতিহাস সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য*,গ্রন্থকুটির,ঢাকা:২০১৬।

সরকার,সুশোভন,*বাংলার রেনেসাঁস*,দীপায়ন,কলকাতা,কার্তিক ১৩৯৭।

সাহা,রাধারমণ,*পাবনা জেলার ইতিহাস*,৩য় খন্ড,পাবনা,১৩৩৩।

সিংহ,যশোবন্ত,*জিন্না ভারত দেশভাগ স্বাধীনতা*,আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি.,কলকাতা,২০০৯।

সেন,দীনেশ চন্দ্র,*বৃহৎ বঙ্গ,প্রথম খন্ড*, দেজ পাবলিশিং,কলকাতা,১৯৯৩।

....,সচীন,*বাংলার রায়ত ও জমিদার*,ন্যাশনাল বুক হাইজ,কলিকাতা,১৯৯১।

সেহানবীশ,চিন্মোহন,*রুশ বিপ্লব ও প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী*,র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেসন,কলকাতা,২০১৯।

হক,মুহাম্মদ ইনাম-উল,*বাংলার ইতিহাস,ভারতে ইংরেজ রাজত্বের সূচনা পর্ব*,বাংলা একাডেমী,ঢাকা,১৯৯৯।

.....,*ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন(১৭০৭-১৯৪৭)*,বাংলা একাডেমী,ঢাকা,১৯৯৩।

হক,মোঃ নুরুল,*ভূমি আইন ও আলোচনা*,অধুনা,ঢাকা,১৯৯১।

হাননান,মোহাম্মদ,*বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস(১৮৩০-১৯৭১)*,আগামী প্রকাশনী,ঢাকা,২০০০।

হালদার,গোপাল,*সংস্কৃতির রূপান্তর*,পুস্তক বিপণী,কলকাতা,১৯৭৭।

হাশমী,তাজুল ইসলাম,*ঔপনিবেশিক বাংলা*,প্যাপিরাস,কলকাতা,১৯৮৫।

হোসেন, হোসেনউদ্দীন,*বাঙলার বিদ্রোহ (৬০০-১৯৪৭)*,প্রথম খন্ড,বিদ্যা প্রকাশ,ঢাকা,২০১৬।

প্রবন্ধ (ইংরেজি):

Alavi,Hamza, The Colonial Transformation of India,*The Journal of Social Studies*, No-8,1980.

Chattopadhyaya,Harapasad,The Sepoy Mutiny and the Hindu Muslim Reaction, *Calcutta Review,* Vol.142,March,1957.

Singh,Satindra, Sociological Interpretation of Indian Mutiny,*Calcutta Review,* November,1946.

Karim,A.K.Nazmul,The Role of Middle Class in Bangladesh,*Bangladesh Journal of*

*Sociology,*Vol.II,No-1, Dhaka,1976.

Ray,Rajat and Ray,Ratnalekha, Zamindars and Jotedars:A study of Rural politics in Bengal, *Mordern Asian Studies,*Vol.IX,Part-1,1975.

Salimolla,K.,The New Province-Its Future Possibilities, *The Journal of Muslim Instititute,* 1906.

Tarafder,M.R.,Trade and Society in Early Medieval Bengal*, Indian Historical Reveiw,* Vol.IV, No-ii,1978.

Thorpe,C.L.,Education and Development of Muslim Nationalism in pre-partition India', *Journal of Pakistan Historical Society,*Vol.XIII,part-1,1965.

বাংলা প্রবন্ধঃ

ইসলাম, এম.মোফাখখারুল,নীল বিদ্রোহের ইতিহাস,*ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*,জুন,১৯৮২।

চৌধুরী, হেমচন্দ্র রায়,বঙ্গ কোন দেশ, *মানসী ও মর্মবাণী*,কলকাতা,১৩৩৬ বঙ্গাব্দ(১৯২৯খ্রিস্টাব্দ)।

মওদুদ, আবদুল, 'আঠারো শতকের বাঙ্গালাদেশে বিচার ও শান্তি রক্ষা',*ইতিহাস*,১ম বর্ষ,২ সংখ্যা,ভাদ্র-অগ্রাহায়ণ ১৩৭৪(১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ)।

মন্টু,কালী কিংকর,পরাধীনতার শেকল ছেড়ার দুর্বার আন্দোলনের সূর্যসেনা বাঘাযতীন, *দৈনিক বীর দর্পন*,ঝিনাইদহ, ৭ ডিসেম্বর,১৯৯৯।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষকসভা,তেভাগার লড়াই,*পশ্চিম বঙ্গ:তেভাগা সংখ্যা*,বর্ষ ৩০,সংখ্যা ৪২-৪৬,কলকাতা,১৯৯৭।

বসাক,রাধা গোবিন্দ,গুপ্ত যুগে বঙ্গ দেশ, *মানসী*,৭ম বর্ষ,প্রথম খন্ড,৫ম সংখ্যা,আষাঢ়,কলকাতা,১৩২২(১৯১৫খ্রিস্টাব্দ)।

বাছির,আবদুল, বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির (১৭৫৭-১৮৫৭ খ্রি.) উদ্ভব ও বিকাশ:একটি পর্যালোচনা,*দর্শন ও প্রগতি*:২৪শ বর্ষ:১ম ও ২য় সংখ্যা:জুন-ডিসেম্বর,২০০৭।

বিদ্যাভূষণ,শ্রী অমূল্যচরণ,বাঙালির ইতিহাস,*প্রবাসী*,প্রথম খন্ড,৫ম সংখ্যা,ভাদ্র,কলকাতা,১৩২৫(১৯১৮খ্রিস্টাব্দ)।

রায়,অনুরাধা, তেভাগার গান ও কবিতা, *পশ্চিম বঙ্গ*, বর্ষ ৩০,সংখ্যা ৪২-৪৬,কলকাতা,১৯৯৭।

রায়,বিনয় ভূষণ,'কলকাতা স্কুল সোসাইটি', *এক্ষণ*, ১৭শ বর্ষ,১-২ সংখ্যা,১৯৩১।

রাজ্জাক,'আবদুর ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মন'(অনু.,মাহমুদ রশীদ),*বক্তব্য*,২ সংখ্যা,সেপ্টেম্বর ১৯৭৭।

সেন,রঙ্গলাল, উত্তর বঙ্গে ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহের সমাজততত্ত্ব:ঐতিহাসিক সাহিত্যের একটি পর্যালোচনা, *রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ প্রতিষ্ঠার রজত জয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধ*,১৯৯৮।

পত্র-পত্রিকা (ইংরেজি):

*Bengal Past and Present,*vol.C111,July-december,1983.

Bengal Directory, 1854.

Calcutta Review,vol.III,No-7,1885.

*English Historical Review,*vol.X,1895.

Dhaka University Institutional Repository

Englishman,July 10,1873,July 11,1873.

Friend of India,February 27,1862.

Indian Economic and Social History Review, vol.V,No.1,1968.

*Indian Gazette,*october,12,1829.

*Journal of the Pakistan Historical Society,*vol.X11, Part 1,1964.

*Journal of Asian studies,*vol.XXX1X,No.1,November,1977.

*Journal of Asiatic Society of Bengal,*vol.LX111,part 111,No.1,1894.

*Mordern Asian studies,*vol.1X,part.1,1975.

The Mordern Review,vol,XXXV111.No.4,1925.

The Bengalee, 13th December,1903,14thDecember,1906.

The Calcutta Review,July,1905.

The Moslem Chronicle, March 21,1895,18 April,1895,11th November,1905.

The Pioneer, 2 January 1907.

পত্র-পত্রিকা (বাংলা):

ঢাকা প্রকাশ,১ম বর্ষ,২৯ সংখ্যা,১১ আশ্বিন,১২৬৮সন।(১৮৬১খ্রি.)।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, বৈশাখ,১৭৭২,শক ৮১সংখ্যা,শ্রাবণ,১৭৭২,শক,৭৪সংখ্যা।

সংবাদ প্রভাকর,৫ ভাদ্র,১২৬৪(১৮৫৭খ্রি.)।

সম্বাদ ভাস্কর ৩৯ সংখ্যা, ১৮৪৯,শক,৮ডিসেম্বর।

সোমপ্রকাশ,১৪ ভাদ্র,১২৭০ সন (১৮৬৩ খ্রি.),১৯ আশ্বিন ১২৮৯(১৮৮২ খ্রি.)।

হিন্দু রঞ্জিকা,২৪.৭.১৮৭৮।

ইতিহাস সমিতি পত্রিকা,১৩ সংখ্যা,২০০১।

সামাজিক বিজ্ঞান পত্রিকা,১ম সংখ্যা,ডিসেম্বর ২০০৫।

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা,১ম খন্ড,জুন ২০০২।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা,২২ সংখ্যা,অক্টোবর,১৯৮৮।

বাংলা একাডেমী পত্রিকা,২য় সংখ্যা,শ্রাবন-আশ্বিন,১৩৮৫(১৯৭৮খ্রি.)।

বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা,২০ সংখ্যা,১৯৯৭।

সমাজ নিরীক্ষণ পত্রিকা,৩৮ সংখ্যা,১৯৯২।

সাহিত্য পত্রিকা, ১ম সংখ্যা,কার্তিক ১৪০৮(২০০১ খ্রি.)

Dhaka University Institutional Repository

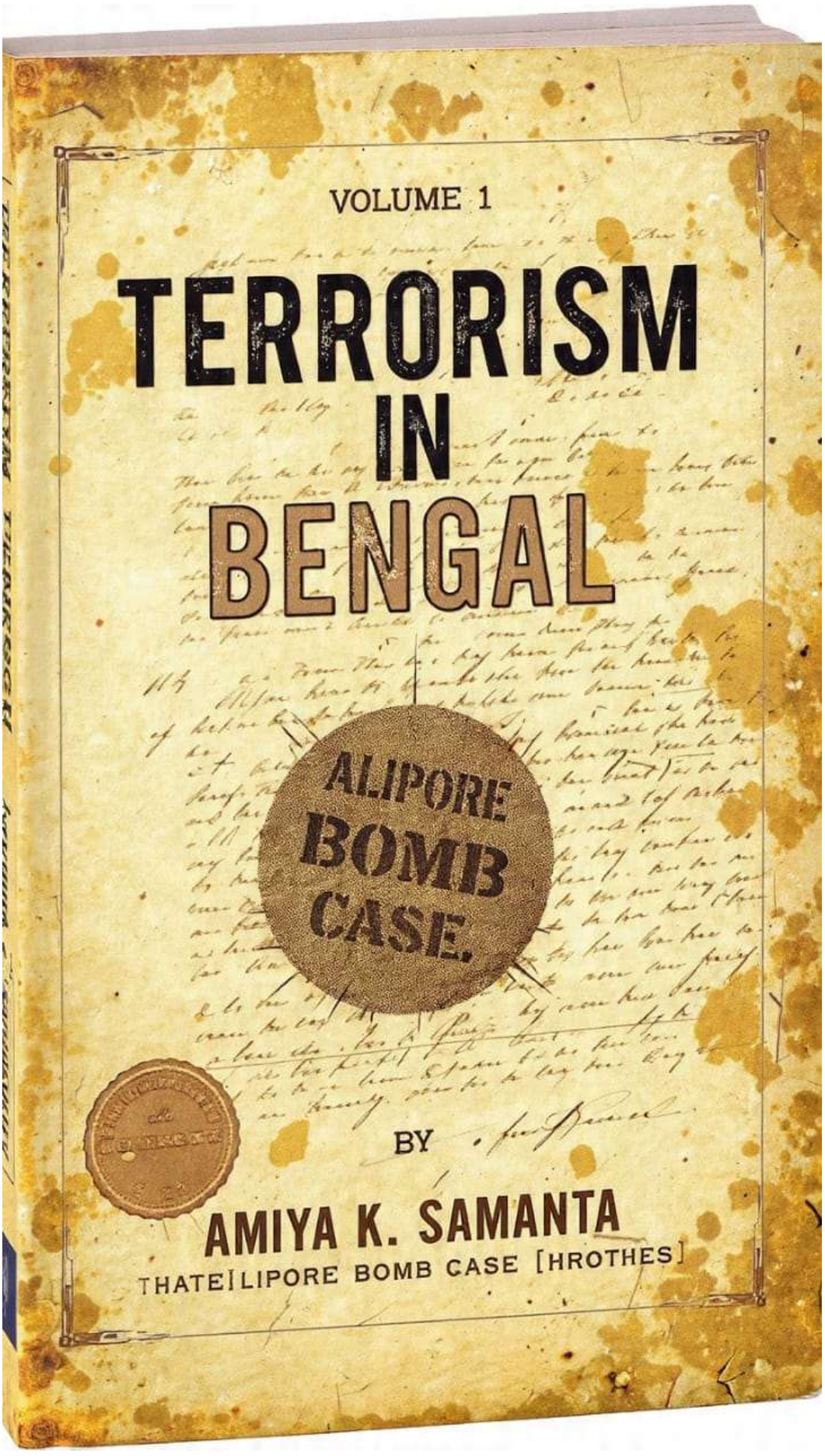
পরিশিষ্ট (খ)



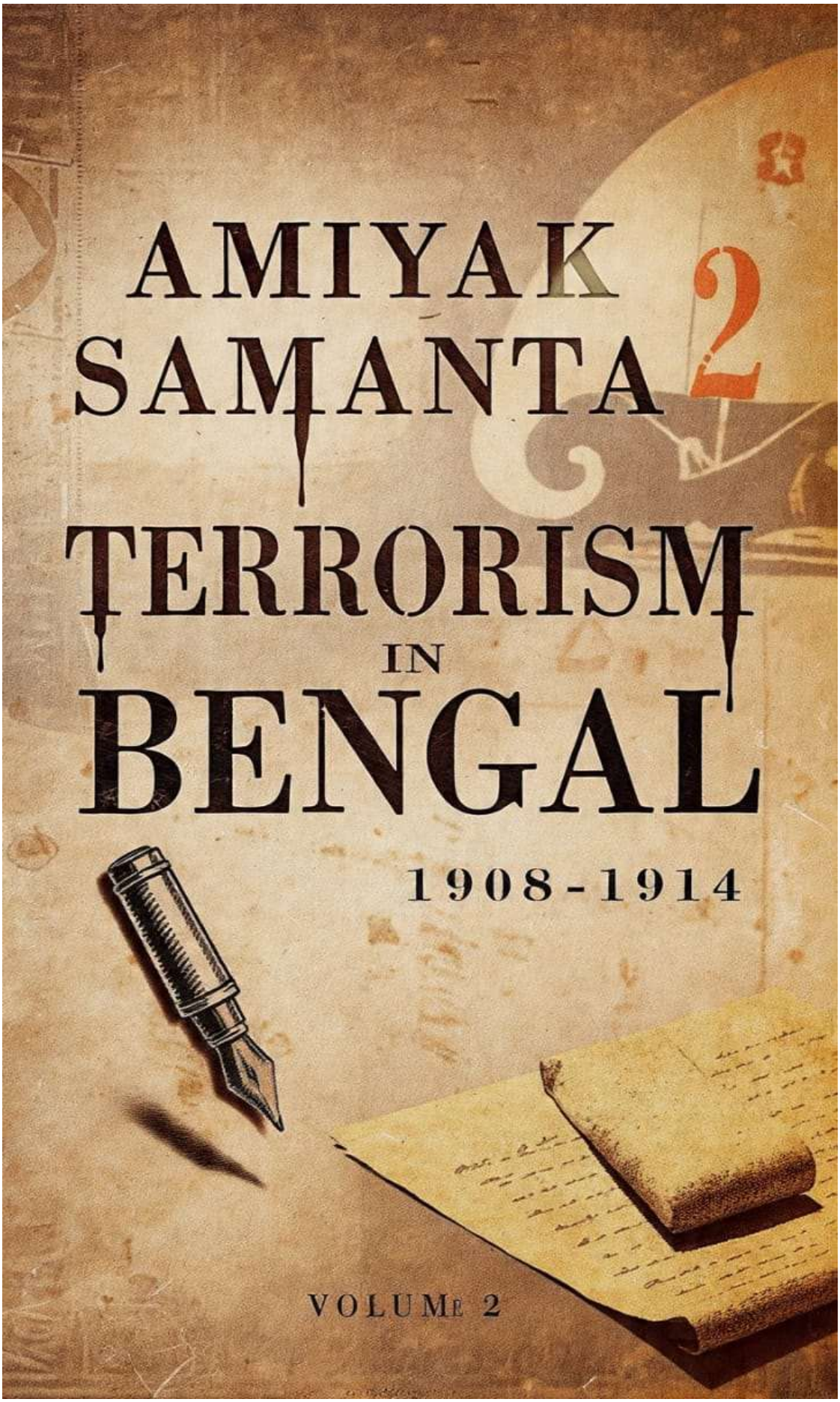
Dhaka University Institutional Repository



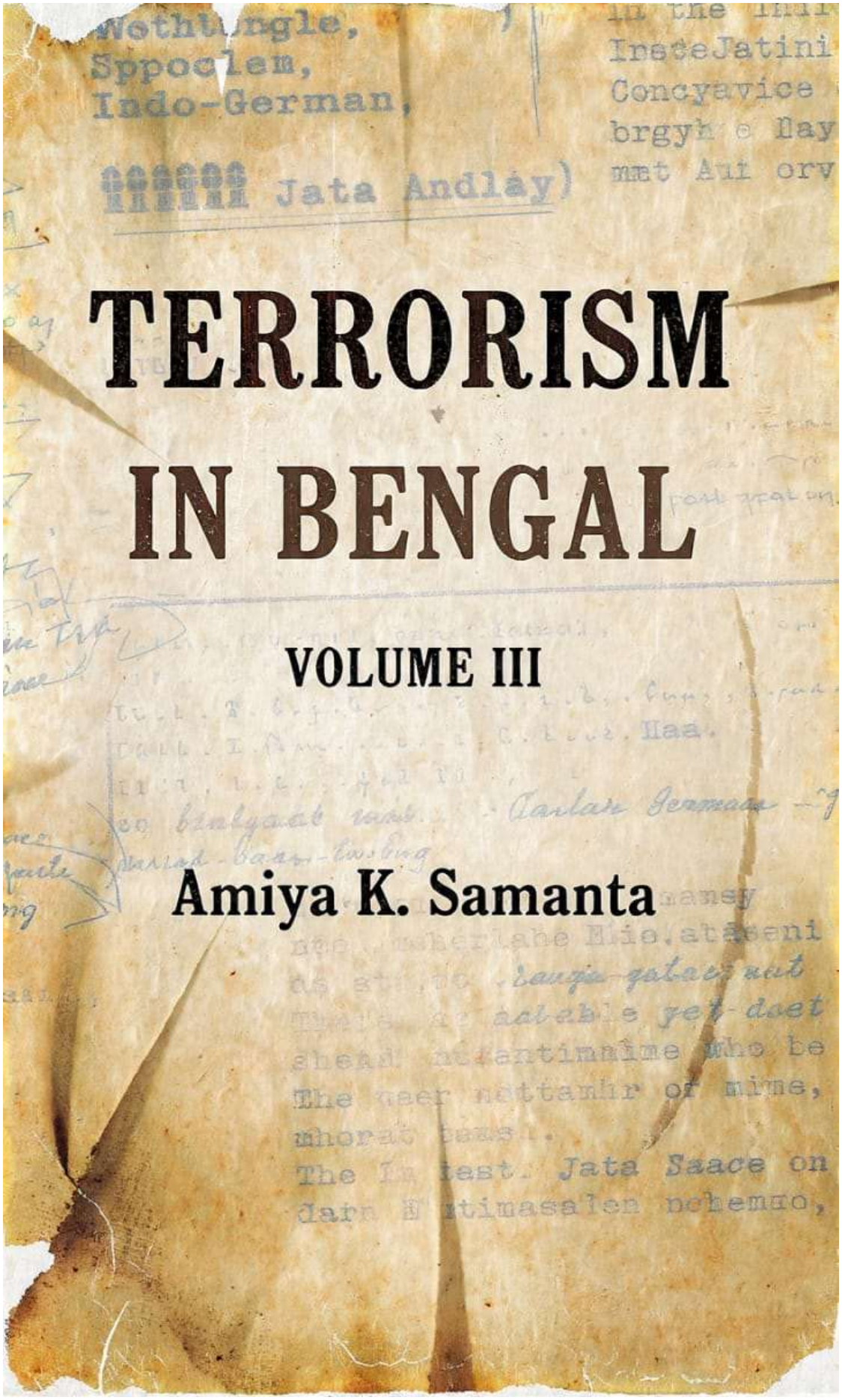
Dhaka University Institutional Repository



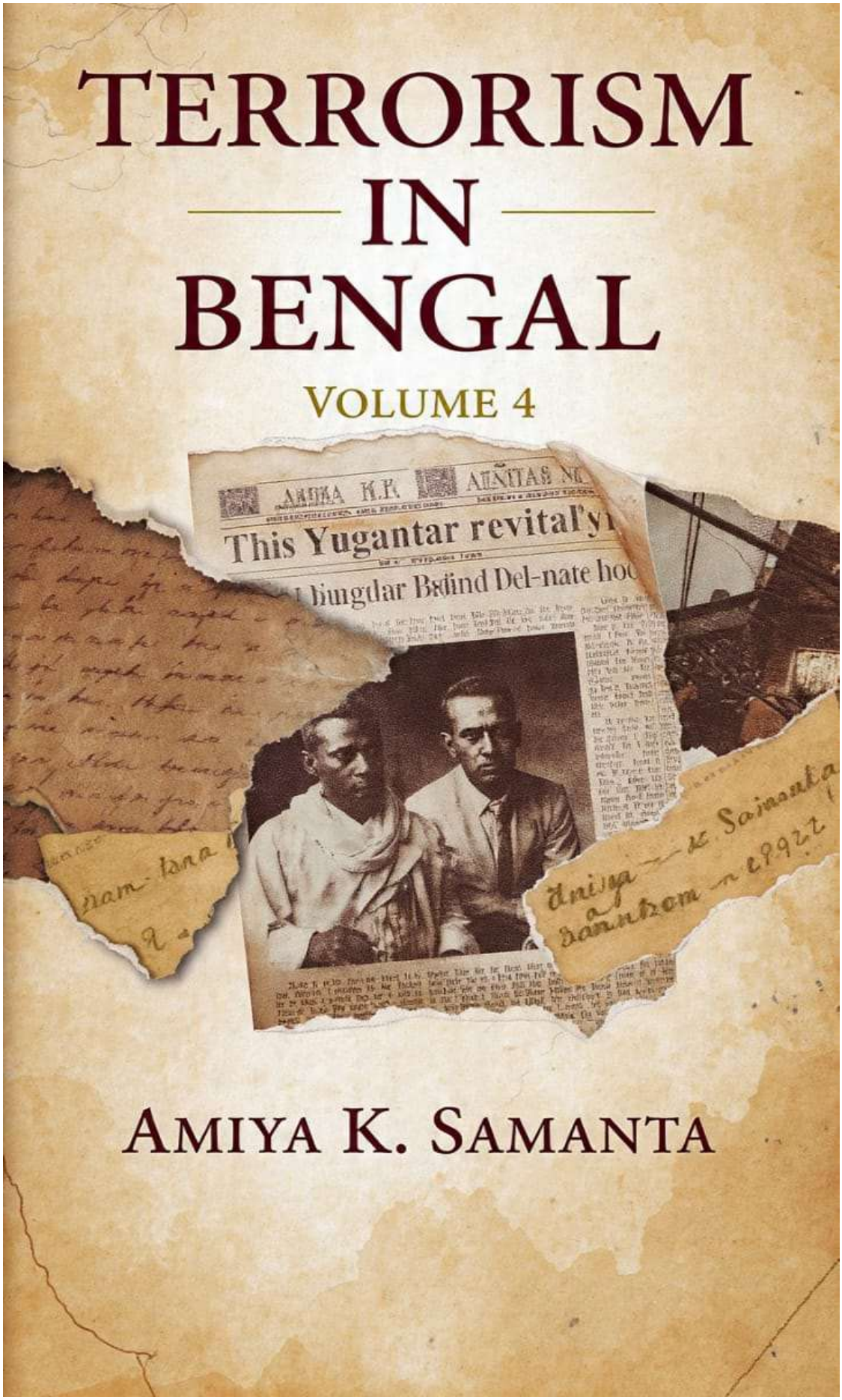
Dhaka University Institutional Repository



Dhaka University Institutional Repository



Dhaka University Institutional Repository



Dhaka University Institutional Repository

TERRORISM IN BENGAL

VOLUME 5



AMIYA K. SAMANTA
CHITTAGᵆNG ARMOURY RAID
1924--1939

AMIYA K. SAMANTA
Publication of Tyle
Other Ptur of Styhiarl Government

Dhaka University Institutional Repository

অগ্নিযুগ গ্রন্থমালা-২৩

অনুশীলন সমিতির ইতিহাস

জীবনতারা হালদার



Dhaka University Institutional Repository

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামী যিনি ১৮৭২ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারি ভারতের ভাইসরয় লর্ড মেয়োকে হত্যার জন্য দণ্ডিত হিসাবে আন্দামানে বন্দী হিসেবে ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ দেন, সেই শের আলি আফ্রিদি, যাঁকে শেরে আলীও বলা হয়, তাঁর প্রয়াণ দিবসে (১১ মার্চ, ১৮৭৩) বিনম্র শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাই।





"Youth should come up with Revolutionary Ideas. Anushilan Samiti believes in a strong rebellion against British rule. It is a revolutionary organisation for Uniting India.

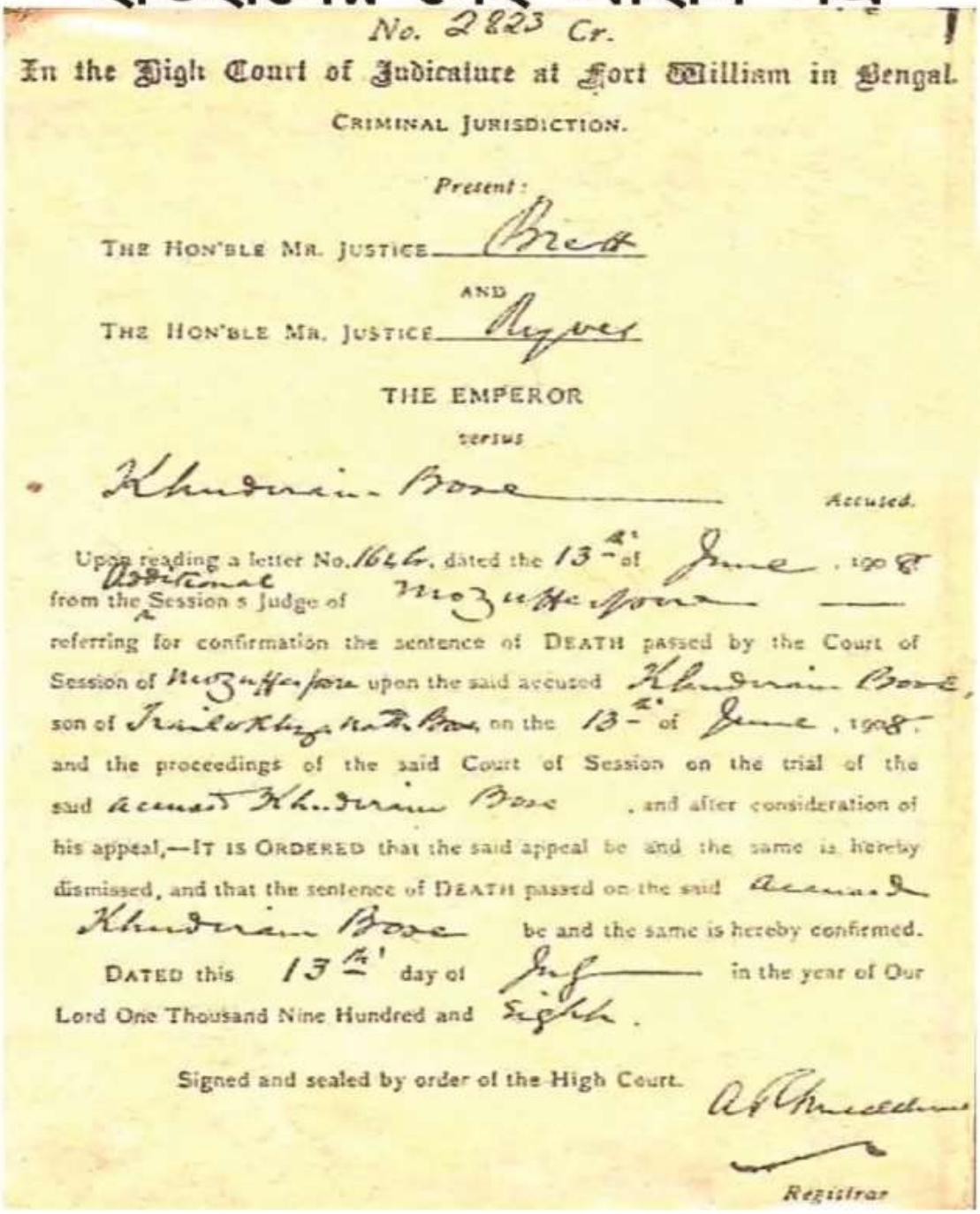
Pramathanath Mitra



লালা লাজপত রাই বাল গঙ্গাধর তিলক বিপিনচন্দ্র পাল

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষুদিরাম বসু কে ফাঁসি দেওয়া ইতিহাসের সেই আইনি পত্র



No. 2823 Cr.

In the High Court of Judicature at Fort William in Bengal.

CRIMINAL JURISDICTION.

Present:

THE HON'BLE MR. JUSTICE Beck

AND

THE HON'BLE MR. JUSTICE Ayres

THE EMPEROR

versus

Khudiram Bose *Accused.*

Upon reading a letter No. 1646, dated the 13th of June, 1908 from the Additional Session's Judge of Muzaffarpore referring for confirmation the sentence of DEATH passed by the Court of Session of Muzaffarpore upon the said accused Khudiram Bose, son of Trailokhya Nath Bose, on the 13th of June, 1908, and the proceedings of the said Court of Session on the trial of the said Accused Khudiram Bose, and after consideration of his appeal,—IT IS ORDERED that the said appeal be and the same is hereby dismissed, and that the sentence of DEATH passed on the said Accused Khudiram Bose be and the same is hereby confirmed.

DATED this 13th day of July in the year of Our Lord One Thousand Nine Hundred and Eight.

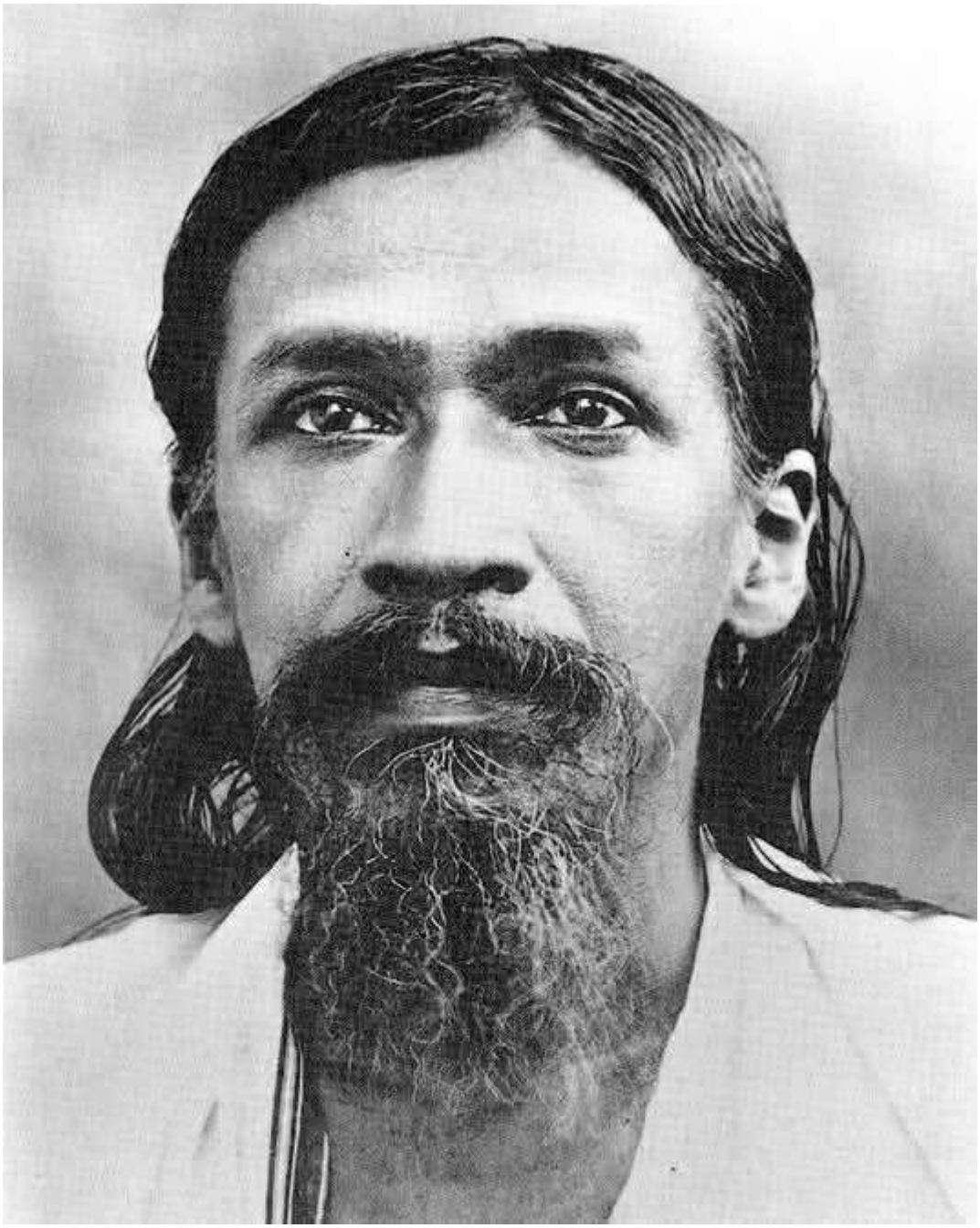
Signed and sealed by order of the High Court.

A. Chuckerbutty

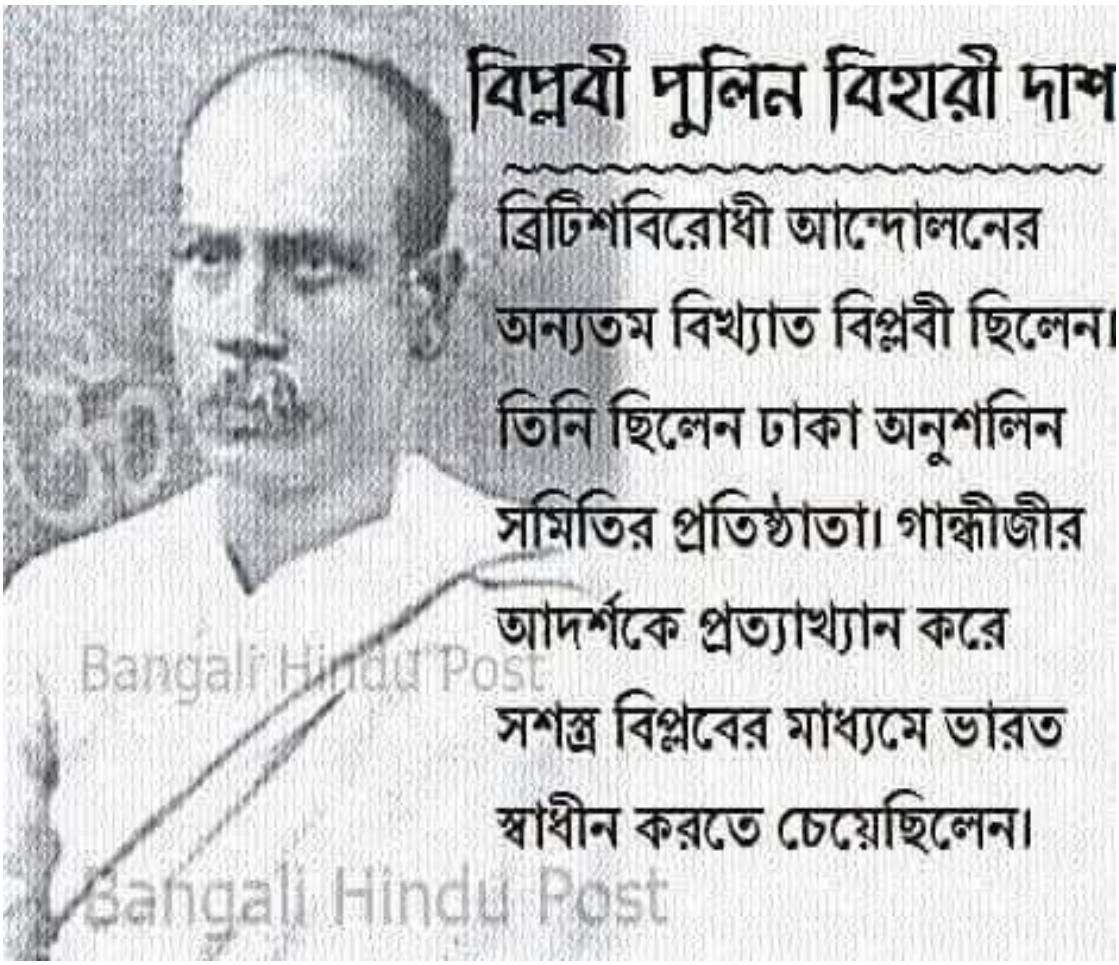
Registrar

Dhaka University Institutional Repository

অরবিন্দকুমার ঘোষ

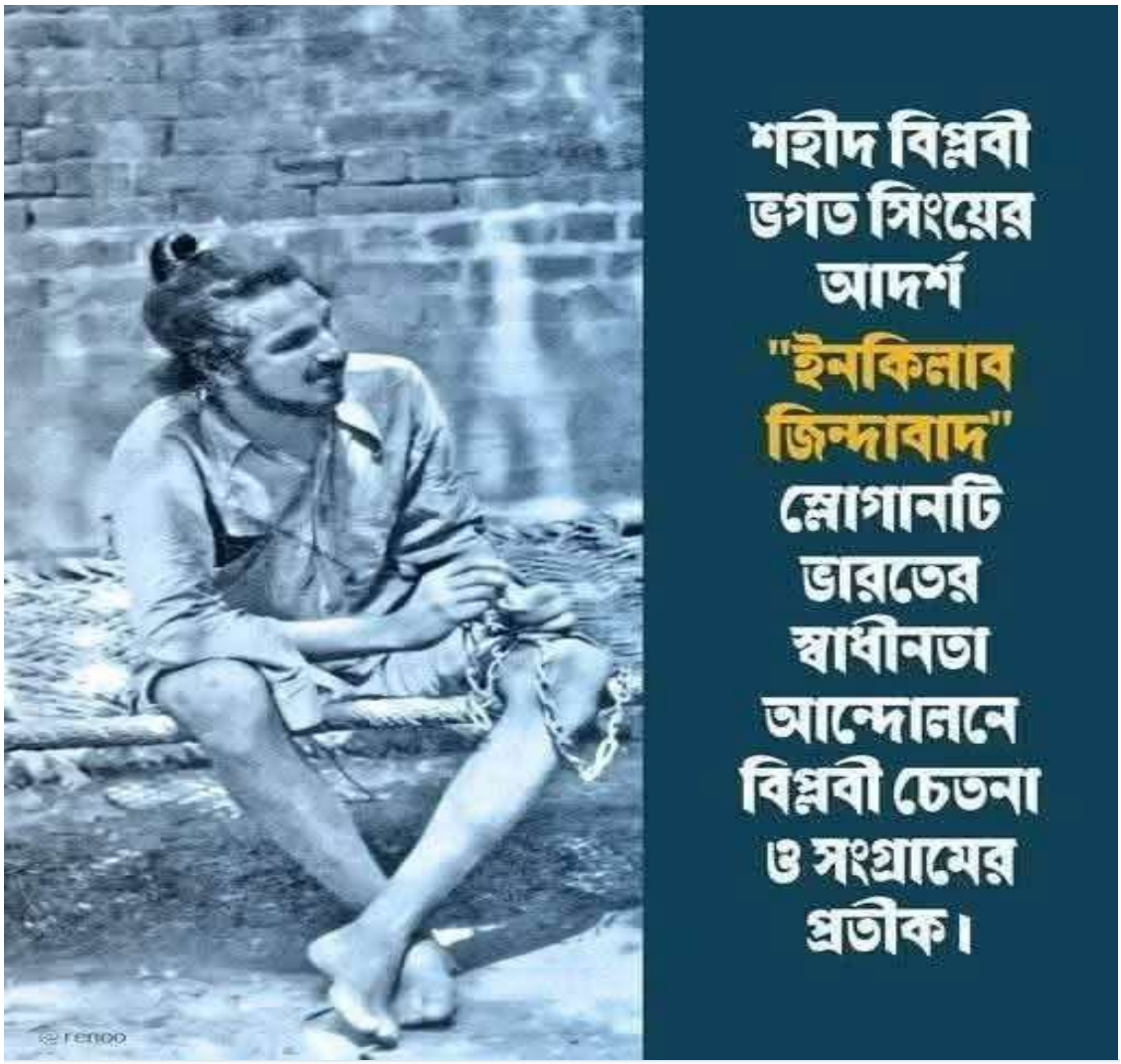


Dhaka University Institutional Repository





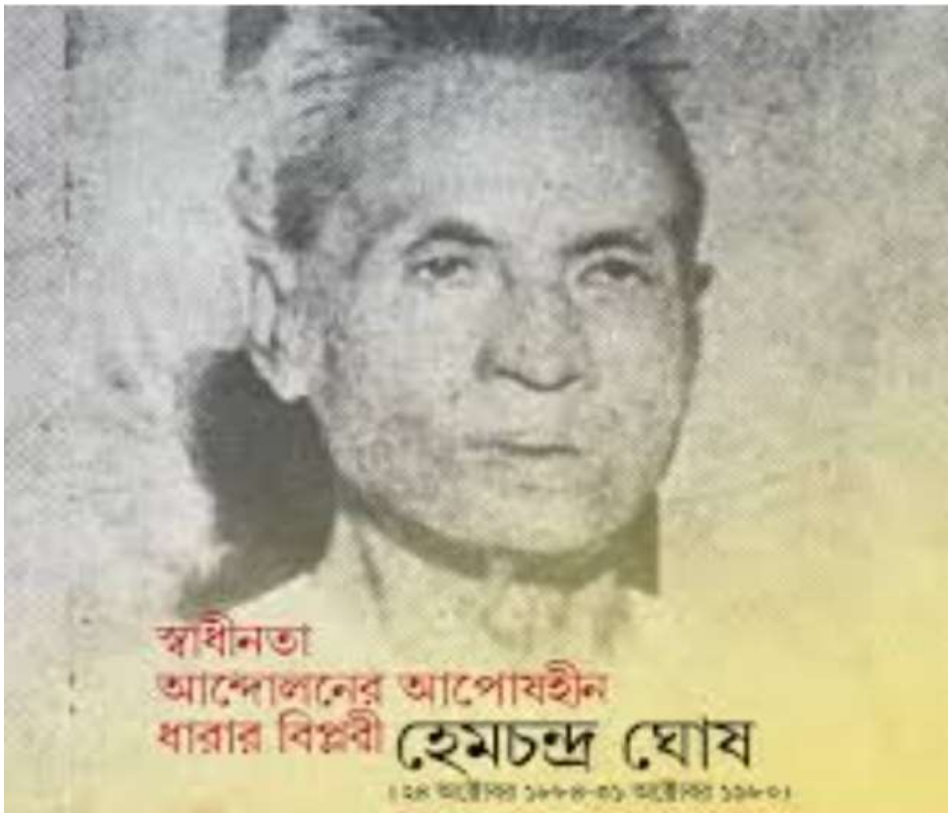
Dhaka University Institutional Repository



প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার



Dhaka University Institutional Repository



মাস্টারদা

সূর্য সেন

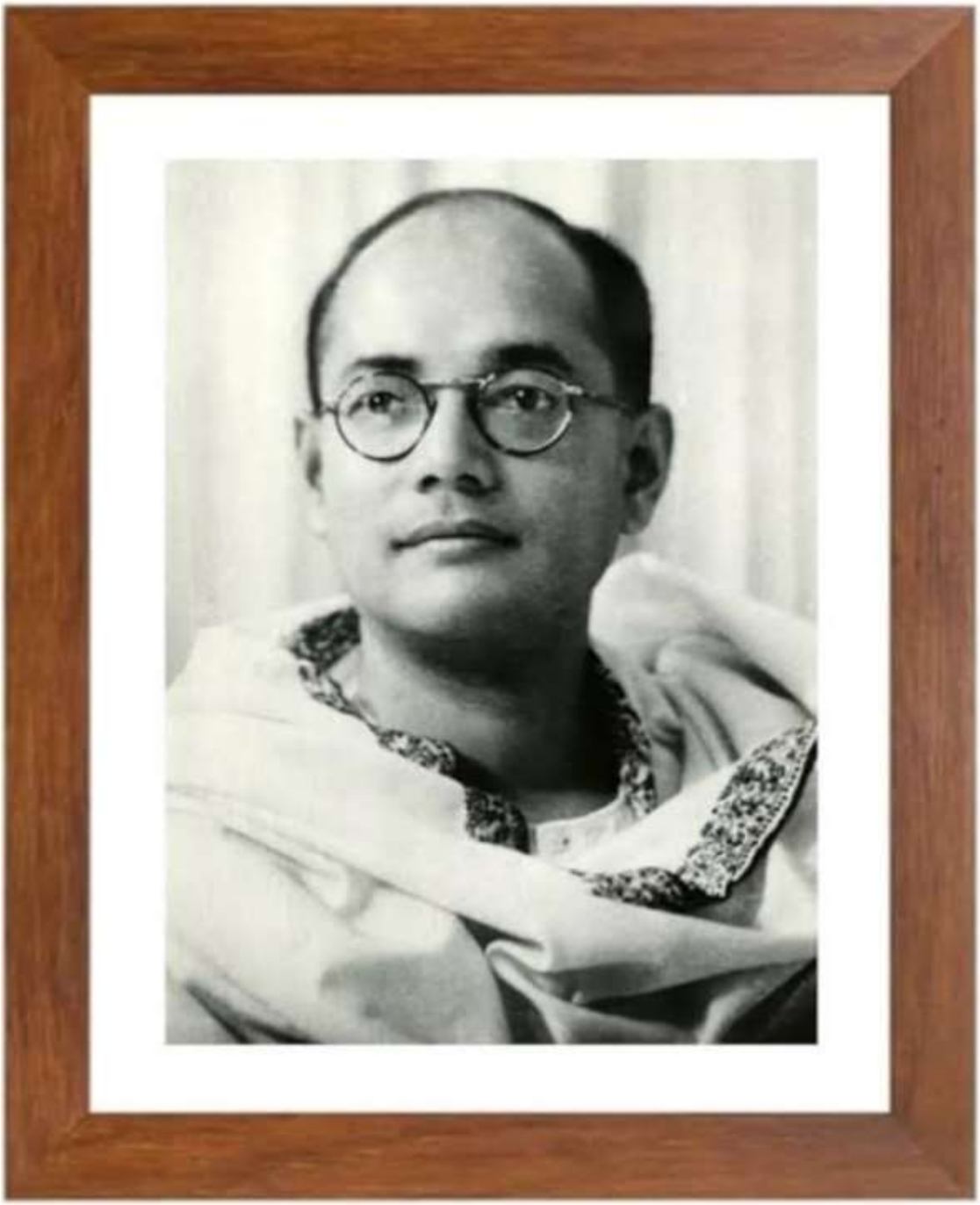


বাঙ্গালী বীর বিপ্লবী

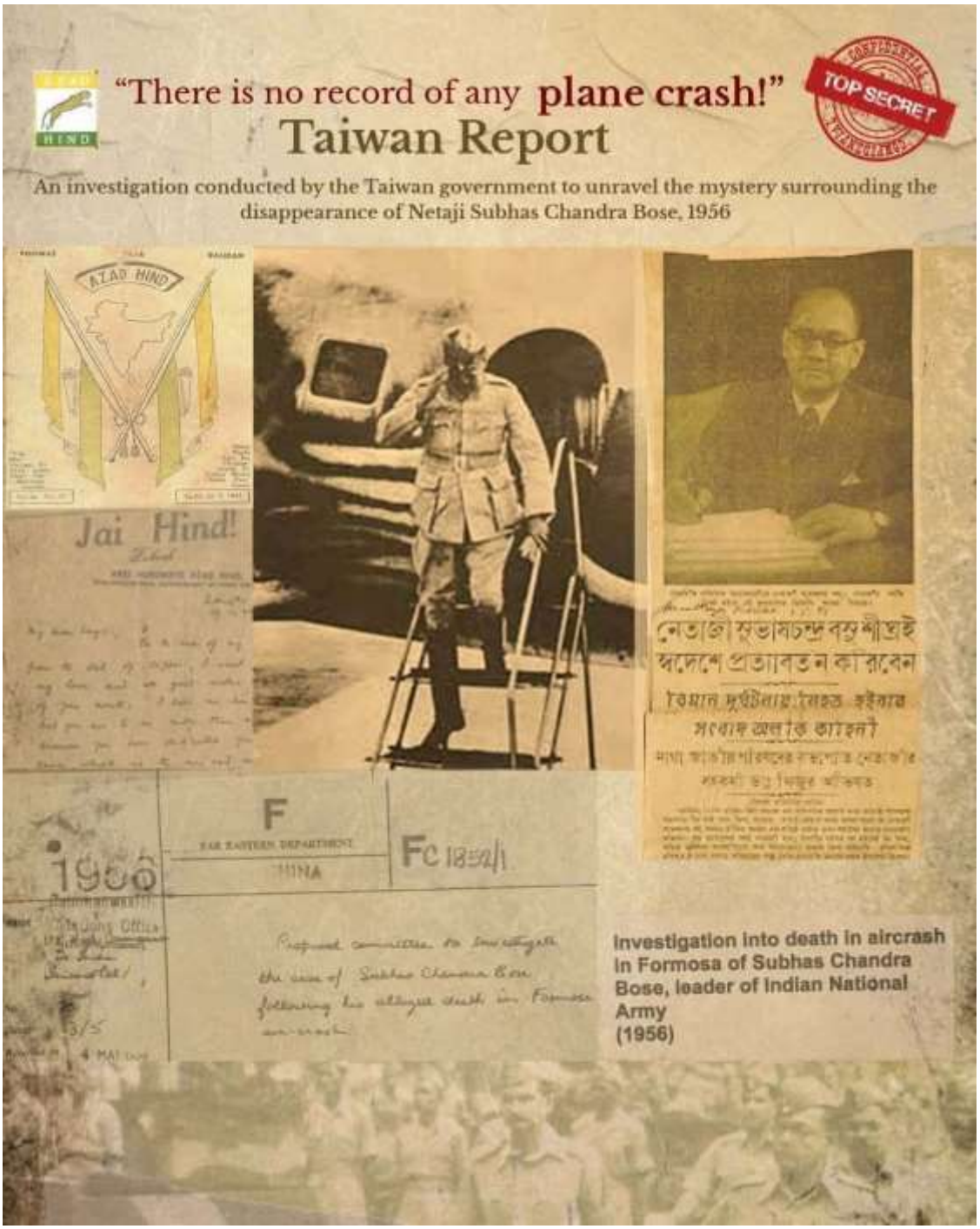
Dhaka University Institutional Repository



Dhaka University Institutional Repository



Dhaka University Institutional Repository



Dhaka University Institutional Repository

















Dhaka University Institutional Repository



আজাদ হিন্দের মুক্তির দাবীতে মুম্বাইয়ের রাজপথে সমবেত জনতা



বন্দী সেনাদের সাথে আজাদ হিন্দে-র কৌশলীগণ



লালকেল্লার সামনে আসাফ আলি সহ অন্যান্য কৌসুলীগণ

১

Dhaka University Institutional Repository



লালকেল্লার সামনে মুক্তিপ্রাপ্ত আজাদ হিন্দ সেনারা



আজাদ হিন্দ সৈনিকদের সম্বর্ধনে কলকাতায় মিছিল

Dhaka University Institutional Repository





Dhaka University Institutional Repository

মি. ক্লিমেন্ট এটলি



Dhaka University Institutional Repository

লর্ড মাউন্টব্যাটেন



Dhaka University Institutional Repository

